মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনাসমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

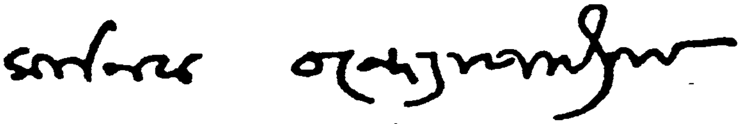

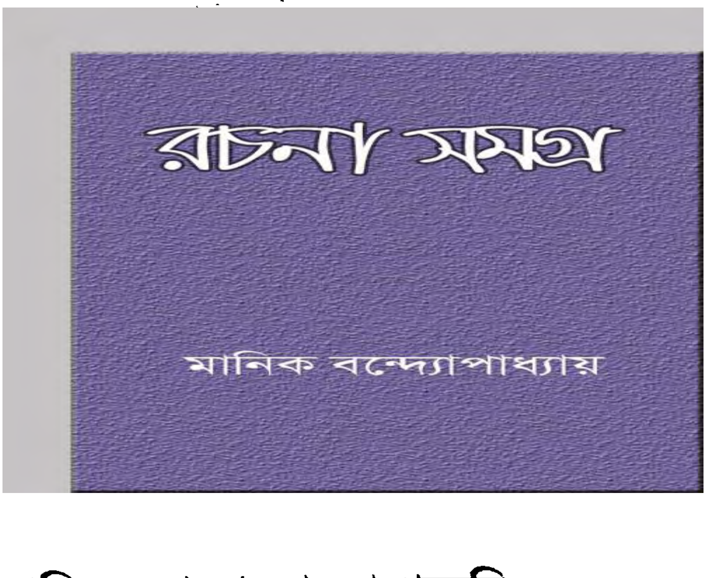

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8 (Set)

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : পঞ্চম খণ্ড

নিবেদন

শহরবাসের ইতিকথা ৯

ভিটেমাটি (নাটক) ১০৭

আজ কাল পরশুর গল্প ১৫৯

- আজ কাল পরশুর গল্প ১৬৩
- দুঃশাসনীয় ১৭৩
- নমুনা ১৭৯
- বুড়ি ১৮৫
- গোপাল শাসমল ১৮৮
- মঙ্গলা ১৯১
- নেশা ১৯৬
- বেড়া ১৯৯
- তারপর ? ২০৩
- স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই ২০৮
- শত্রুমিত্র ২১৫
- রাঘব মালাকর ২১৮
- যাকে ঘুষ দিতে হয় ২২৩
- কৃপাময় সামন্ত ২২৬
- নেড়ি ২৩০
- সামঞ্জস্য ২৩৩

চিন্তামণি ২৩৯

পরিস্থিতি ২৮৭

- প্যানিক ২৯১
- সাড়ে সাত সের চাল ২৯৮
- প্রাণ ৩০১
- রাসের মেলা ৩০৮
- মাসিপিসি ৩১৭

অমানুষিক ৩২৩
পেটব্যথা ৩৩০
শিল্পী ৩৩৬
কংক্রিট ৩৪২
রিকশাওয়ালা ৩৪৯
প্রাণের গুদাম ৩৫২
ছেঁড়া ৩৫৮
চিহ্ন ৩৬৫
গ্রন্থপরিচয় ৪৪১
পরিশিষ্ট : সহরবাসের ইতিকথা : সংস্করণগত পাঠভেদ ৪৫৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনপঞ্জি ৪৯৩

চিত্রপরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সূচনা পৃষ্ঠা
শহরবাসের ইতিকথা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১১
ভিটেমাটি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১০৯
দুঃশাসনীয় গল্পের সচিত্রিত প্রথম পৃষ্ঠা ২৩৮
চিন্তামণি-র প্রথম প্রকাশের পৃষ্ঠা ২৮৬
পরিস্থিতি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ২৮৯
পেটব্যথা গল্পের প্রথম প্রকাশের শিরোনামচিত্র ৩৬৪
চিহ্ন প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ৩৬৭
শহরবাসের ইতিকথা-র পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের শিরোনামচিত্র ৪৬১

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল-নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্য-শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দারিদ্র্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত এবং দুরারোগ্য ব্যাধি সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একপ্রস্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক পরিবার ও গ্রন্থালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক-রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান পরিবর্তন প্রথম যুগের প্রকাশকদের অনামনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন পরিমার্জন পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল উদ্রেককারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা এবং সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক-সাহিত্যের এক আদর্শ পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম চারটি খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। পঞ্চম খণ্ডও প্রকাশিত হল সময়সূচি রক্ষা করেই। ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

সচিব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
বরানগর পিপলস লাইব্রেরি
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
হিরণ লাইব্রেরি
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
শ্রীপ্রভাতকুমার দাস
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীগৌতম ঘোষ

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীকবীর সেনবরাট
শ্রীমতী ঈশানী মৈত্র
শ্রীমতী সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী অপর্ণা দাস
শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার

জন্ম : ১৯ মে ১৯০৮

মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

শহরবাসের ইতিকথা

শহরবাসের ইতিকথা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে, একটি দৈনিক পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ঘষামাজা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাচক্রে ও সব কিছুই করা হয়নি।

সংশোধন করা উচিত ছিল এ রকম খুঁত ও অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকারা বইটিকে যে সমাদর করেছেন এ জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমি দাবি করছি বইটিতে এবার কোনো খুঁত রইল না!

প্রথম সংস্করণে সবচেয়ে বড়ো অসম্পূর্ণতা ছিল শ্রীপতি আর সন্ধ্যার—একটা পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে দুটি চরিত্রেরই যেন খেই হারিয়ে গিয়েছিল। এই সোজা কথাটা সব লেখকই জানেন যে কোনো চরিত্রের বিকাশ বা কাহিনির গতি এমন জায়গায় থামানো চলে না যাতে প্রশ্ন জাগে : তারপর কী হল ? গতিটা কোন পরিণতির দিকে এটুকু অন্তত ধরিয়ে দিতেই হবে—যাতে ধারাটা কল্পনা করে অনুভব করে নেওয়া সম্ভব হয়।

যেমন পীতাম্বর। মোহনের বাড়ি ছেড়ে পীতাম্বর কোথায় গেল কী করল বলার কোনো প্রয়োজনই হয় না—অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে কোথাও কম খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে সে তার নতুন পেশা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকবে।

কিন্তু শ্রীপতির কথা যেখানে থেমেছে ওখানে তাকে থামানো যায় না, কদমের সংসারটুকুর জন্য গভীর টান এবং গ্রাম্য সংস্কার ও বিশ্বাস ভরা শ্রীপতিকে মোহনের সঙ্গে শহরে টেনে এনে কারখানায় কাজে ঢোকানোর কোনো সার্থকতাই থাকে না। কীভাবে তার চেতনা সর্বহারার চেতনায় রূপান্তরিত হল তার একটু সূত্র পাওয়া পর্যন্ত তার কথা বলতেই হবে।

এই সব খুঁত ও অসম্পূর্ণতার জন্য মনে খুঁতখুঁতানি ছিল—বর্তমান সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধনের সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছি।

আমি ভূমিকা লেখার জনাই একটা ভূমিকা জুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। দু-চারটি বইয়ে দু-চার লাইন ভূমিকা হয়তো দিয়েছি। 'শহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা জুটল।

সংশোধন করতে গিয়ে বইয়ের আকার বেশ খানিকটা বেড়েছে প্রকাশিত উপন্যাসের নূতন সংস্করণে বেশি রকম পরিবর্তন করা হলে একটা কৈফিয়ত দেওয়া লেখকের কর্তব্য বলে মনে করি।

এক

শহর পথে। আসল শহর।

রাস্তা পার হওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকার সময় এই কথা একজনের মনে হইয়াছিল। শহরের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রান্ত ক্লান্ত একজন প্রৌঢ়বয়সি মানুষের।

গতি পথে, বৈচিত্র্য পথে, অস্থিরতা পথে। নদী আর নালার মতো বড়ো বড়ো রাস্তা আর গলিতে মানুষের স্রোত, ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির প্রয়োজনে সমষ্টির শোভাযাত্রা।

শহরে পথ ছাড়া আর সমস্তই যেন আনুষঙ্গিক।

লাখ লাখ মানুষের কাছাকাছি থাকা চাই, যত কাছে পারে। কিন্তু গায়ে ঠেকাইয়া দাঁড়ানোর চেয়ে তো কাছাকাছি আসিবার ক্ষমতা নাই মানুষের, বিরাট এক প্রান্তরে যদি কয়েক লক্ষ মানুষ তেমনিভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকে, তবু সেই ভিড়ের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের দূরত্ব থাকিয়া যাইবে অনেকখানি, কাছে আসিতে প্রয়োজন হইবে পথের।

শহরের মানুষ তাই পথসর্বস্ব।

সকালে পথে বাহির হয় খোলা পথে অথবা সৌধবৃপী দেয়ালঘেরা পথে দিন কাটায়। ঘুমানো দরকার, তাই অনেক রাত্রে শ্রান্ত দেহে শয্যার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। সে শয্যা কারও ফুটপাতে বিছানো ছেঁড়া কাপড়, কারও চৌকিতে বিছানো ছেড়া তোশক, কারও খাটের গদিতে বিছানো ফুল আঁকা আস্তরণ।

পথ ছাড়া আর সমস্তই কি ফাঁকি ?

হাঁটিতে হাঁটিতে পা ব্যথা করিতেছিল ক্লান্তিতে শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। শহরের পথে হাঁটিয়া বেড়াইবার ঝোঁক তার কাটিয়া গিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া লোকটি নিজের কাছেই কী যেন সব কৈফিয়ত দিতে লাগিল।

বাস তার গ্রামে, মানুষটি সে গ্রাম্য। দুদিন আগে একটা কাজে শহরে আসিয়াছিল, আজ সকালে কাজ মিটিয়া গিয়াছে। দুপুরের গাড়িতেই অনেক দূরের গ্রামটির দিকে তার রওনা হওয়ার কথা ছিল, একটা খেয়ালে ওই গাড়িতে যাত্রা সে স্থগিত রাখিয়াছে।

কাজ শেষ হওয়া মাত্র একটা মুক্তির অনুভূতি জাগিয়াছিল, বড়ো বিস্বাদ অনুভূতি। অনেক দিন আগে, পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে, এই শহরে বিদ্যার্থীর জীবন যাপনের সময় মুক্তির যে উদ্‌ভ্রান্ত কামনায় সর্বদা মন ব্যাকুল হইয়া থাকিত, তাই যেন পচিয়া গলিয়া মুক্তির মোহে পরিণত হইয়াছে, অন্ন যেমন পরিণত হয় মদে। পথ চলিবার চিরসাথি বগলের ছাতিটি ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া মানুষটা আজ অকারণে পথে পথে কত যে ঘুরিয়াছে ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপরাহ্ণ বেলায় রাজপথের এই মস্ত চৌমাথার ধারে কি শ্রান্ত হইয়াই সে দাঁড়াইয়া ড়িয়াছে !

এখন আর কিছুই সে চায় না, পথের ওপারে গিয়া বাসে উঠিয়া হোটেলে ফিরিয়া যাইবে, নিমীলিত চক্ষে একটু বিশ্রাম করিবে, হোটেলের আরামহীন শয্যায় গড়গড়ার নলের অভাবে অস্বস্তিকর আলস্যে, তারপর ছাতিটি বগলে করিয়া পুরানো ব্যাগটি হাতে ঝুলাইয়া স্টেশনে গিয়া ধরিবে রাত্রের গাড়ি। সকালে সে গাড়ি তাকে তার গ্রামের কাঁকর-বিছানো নির্জন স্টেশনে নামাইয়া দিবে। স্টেশন হইতে ামের হাট পর্যন্ত পাকা বাঁধানো পথ, সেখান হইতে কাঁচা মাটির পথে মাইলখানেক হাঁটিলে তার ঘরের দুয়ার।

কাঁচা মাটির পথ ? একী আশ্চর্য কথা যে সেই কাঁচা মাটির পথে তাকে শহরের দিকে যাত্রা শুরু করিতে হইয়াছিল, শহরে তার নিজের প্রয়োজন ছিল বলিয়া ?

সে পথটিও কি শহরের জন্য ?

মাথাটা কেমন গুলাইয়া গেল—পথের একেবারে মাঝখানে। দুরন্ত বেগে সে পথে অবিশ্রাম গাড়ি চলাচল করিতেছিল। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে। এই শহরে সে বিদ্যা অর্জন করিতে আসিয়াছিল কিন্তু বাস তার গ্রামে, মানুষটা সে গ্রাম্য। দোতলা একটা বাসের নীচে চাপা পড়িয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সে মরিয়া গেল।

পিতা স্বর্গে গেলেন। মনোমোহন ভাবিল, এবার তবে শহরে গিয়াই বাস করা যাক।

গ্রামের জ্ঞানী বৃদ্ধেরা গুজব শুনিয়া বলিলেন, জানতাম। আগেই জানতাম বাপ চোখ বুজবার পর বছর ঘুরবে না।

মা বলিলেন, তাই কি হয় বাবা ? এখানে যথাসর্বস্ব ফেলে রেখে সবাই মিলে কলকাতা গিয়ে থাকব, এ যে পাগলের মতো কথা বলছিস তুই।

তারপর একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিলেন, তোর যদি সাধ হয়, যা না তুই, কিছুদিন বেড়িয়ে আয় গে না কলকাতা থেকে ?

মনোমোহন গম্ভীরভাবে বলিল, কিছুদিন বেড়িয়ে আসার কথা হচ্ছে না। কলকাতায় স্থায়ী বাসা করব।

ঘরদোরের কী হবে ? বিষয়-সম্পত্তির কী হবে ? মা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এ সমস্যার সমাধান মনোমোহন মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। বাড়িতে আশ্রিত এবং আশ্রিতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। নিজেদের স্বচ্ছলভাবে ভালোভাবে চলিয়া যায় এ রকম বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কর্মহীন পরাশ্রয়ী ওদের অন্ন জোগাইতে গিয়া কোনোদিন তাদের টানাটানি ঘোচে নাই। জোঁকও কষ্ট করিয়া জীবজন্তুর গায়ে নিজেকে সাঁটিয়া দিয়া রক্ত শোষণ করে—নিজের চেষ্টায়। আর এই আশ্রিত-আশ্রিতার দলটা তাদের বাড়িতে বাস করিয়া তাদের অন্নবস্ত্র ধ্বংস করাটাই একমাত্র কাজ বলিয়া মনে করে, জন্মগত অধিকার বলিয়া গণ্য করে ! তবু নিকট হোক, দূর হোক, সম্পর্ক একটা তাদের সকলের সঙ্গেই আছে। কলিকাতায় সঙ্গে নেওয়া না গেলেও এখানে তো তাদের থাকিতে দিতে হইবে।

পিসেমশায় এগারো বছর সপরিবারে এ বাড়িতে বাস করিতেছেন, সম্পর্কের হিসাবে তিনিই সকলের চেয়ে আপন, বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভারটা তাঁকে দিয়া গেলেই চলিবে। পিসেমশায় লোকটি তেমন চালাকচতুর নয়, এদিকে আবার টাকা পয়সার ব্যাপারে বিবেকটিও তাঁর তেমন সজাগ নয়। মাঝে মাঝে গ্রামে আসিয়া সে নিজে তদারক করিয়া গেলেও বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি কিছু হইবেই। আদায়পত্রের কিছু টাকা মারা যাইবেই।

কিন্তু এই ক্ষতিটা মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

বড়ো লাভের আশা থাকিলে ছোটোখাট অনিবার্য ক্ষতিকে মানিয়া নিতে হয়। শহরে সে বসিয়া থাকিবে না, উপার্জন করিবে। নিজে উপস্থিত না থাকায় সম্পত্তির আয় যতটুকু কমিবে আর শহরে বাস করিতে খরচ যতটুকু বাড়িবে, তার চেয়ে অনেক বেশিই নিশ্চয় সে উপার্জন করিতে পারিবে এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

শহরে টাকা রোজগারের অনেক সুবিধা, অনেক সুযোগ।

কেবল বাড়িতে নয়, গ্রামেও সাড়া পড়িয়া গেল। এ যাওয়ার মানে সকলেই জানে, মনোমোহন আর দেশে ফিরিবে না। শহরে যারা যায়, গ্রামে আর তারা ফেরে না।

মনোমোহনের পূর্বপুরুষ কবে এ গ্রামে আসিয়াছিলেন, বুড়া পীতাম্বর ঘটক সে খবর রাখে। খবরটা সে সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আগেও গল্পটা সকলে অনেকবার তার কাছে শুনিয়াছে।

একদিন দুটি যুবক এক সঙ্গে এই গ্রামে আসিয়াছিল, তাদের একজন পীতাম্বরের ঠাকুরদার বাবা, একজন মনোমোহনের ঠাকুরদার ঠাকুরদা। আজকের কথা নয়, তারপর শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের কি তখন এ রকম লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছিল ? কত শ্রী ছিল গ্রামের, কত ঐশ্বর্য ছিল, আজ গ্রামের ভাঙা ঘরদুয়ার দেখিয়া কে তা কল্পনা করিতে পারিবে ? মস্ত বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এই গ্রাম (কাছাকাছি নদী নাই, আশেপাশে বিশেষ কোনো পণ্য উৎপন্ন হয় না, কোনোদিন হইত কিনা সন্দেহ। তবু কি করিয়া গ্রামটা মস্ত বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা অবশ্য পীতাম্বরকে কেহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলে না)। রাজা এই গ্রামে বাস করতেন (রাজবাড়ির একটি ইট-পাথরের চিহ্নও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না)। ধরিতে গেলে এ গ্রাম তখন নগর ছিল বলা যায়।

পূর্বপুরুষ দুজন মলিন বেশে একদিন অবস্থার উন্নতির জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। পীতাম্বরের পূর্বপুরুষটি ছিলেন বুদ্ধিমান, অল্পদিনেই তাঁর অবস্থা ফিরিয়া গেল। মনোমোহনের পূর্বপুরুষটি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। পীতাম্বরের পূর্বপুরুষটির কল্যাণে কোনোরকমে তাঁর দিন কাটিয়া যাইত।

তারপর পীতাম্বরের ধর্মভীরু পূর্বপুরুষটি একদিন তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন, সমস্ত ভার দিয়া গেলেন বন্ধুকে, সরলহৃদয় বন্ধু চিরদিন যেমন তার বিশ্বাসী বন্ধুকে দিয়া যায়। তখনকার দিনে তো তীর্থভ্রমণ দুদিনের শখের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই, তীর্থ সারিয়া আসিতে সময় লাগিত অনেক, ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিত কম। যে যাইত সে একরকম চিরবিদায় নিয়া যাইত।

দু-তিন বছর পরে, ঠিক কত বছর পরে পীতাম্বরের মনে নাই, তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তার যথাসর্বস্ব বন্ধু গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, স্ত্রী-পুত্রের অন্ন জোটে না।

পীতাম্বরের পূর্বপুরুষ বলিল, বন্ধু, এ কি ?

মনোমোহনের পূর্বপুরুষ বলিল, কে তোমার বন্ধু ?

তাই পীতাম্বরের আজ এই অবস্থা। তবে ভগবান আছেন, বন্ধুকে ঠকাইয়া মনোমোহনের পূর্বপুরুষ যা পাইয়াছিল, আজ তার সিকির সিকিও নাই। মনোমোহনের বাপও কি সেদিন অপঘাতে মরে নাই, শহরের রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়িয়া মরে নাই ? পাপের পুরস্কার হাতে হাতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় তো ঘটিবেই।

পাপের শাস্তি যাইবে কোথায় ?

এই যে কলকাতা যাচ্ছে মনোমোহন, ওকে নেওয়াচ্ছে কে ? তোমাদের বলে রাখছি শোনো, সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরি হয়ে ও যদি না ফিরে আসে দুদিন পরে, ভগবান মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা। ছেলেমেয়ে যে হয়নি ওর, সে কার বিধান ? প্রায়শ্চিত্ত ভগবান আর টানবেন না ঠিক করেছেন, ক-পুরুষ ধরে পাপের ধন ক্ষয় করিয়েছেন, ওর বাপটাকে অপঘাতে মেরেছেন, ওকে এবার সর্বস্বান্ত করে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করাবেন, বংশটাও লোপ করে দেবেন।

পীতাম্বরের গায়ের চামড়া ধবধবে সাদা, প্রথম বয়সে তামাটে ছিল। মাথার চুল, ভুরু, গোঁপ দাড়ি আর গায়ের লোমগুলি পর্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। কথাগুলি বলিবার সময় আনমনে পইতাটি সে আঙুলে জড়াইতেছিল, তার কথাগুলি তাই—পইতা হাতে করিয়া অভিশাপ দেওয়ার মতো শোনাইল।

পথের ভিখারি হইয়া একেবারে বংশলোপের অভিশাপ ! বছর পাঁচেক মোটে বিবাহ হইয়াছে মনোমোহনের, ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় যায় নাই। এ স্ত্রীর সন্তান না হইলে আর একটা বিবাহ করিতেই বা তার বাধা কীসের ?

পীতাম্বরের বাড়াবাড়িটা অনেকের পছন্দ হইল না। পূর্বপুরুষের গল্প বলিতে চাও বলো কিন্তু কবে কোন যুগে কী ঘটিয়াছিল, সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল কিনা ঠিক নাই, সে প্রসঙ্গ তুলিয়া আজ এ ভাবে মানুষকে শাপ দেওয়া কেন ?

কেহ আপত্তি করিলে পীতাম্বর বলে, পাগল ! আমি কেন শাপ দিতে যাব ? আমি বলছি ভগবানের বিচারের কথা।

পীতাম্বরের এতখানি গায়ের জ্বালার কারণটাও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পীতাম্বর নিজেই বুঝাইয়া দেয়।

মতিগতি ভালো হলে বংশটা হয়তো বজায় থাকত কিন্তু ছোঁড়াটা বড়ো পাষণ্ড। ওর বাপ অপঘাতে মরেছে, কিন্তু মানুষটা সে মন্দ ছিল না। মাসকাবারে যখনই গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সাতটি টাকা হাতে তুলে দিয়েছে, হাসিমুখে বলেছে, ধরতে গেলে সব কিছু তো আপনারই ঘটক মশায়, সাতটি করে টাকা আপনার হাতে দিতে লজ্জা হয়—কিন্তু করব কী বলুন, সে অবস্থা তো আর নেই। বাপ মরার পর বছর ঘোরেনি, এ ছোঁড়া কিনা ও মাসে আমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে, স্পষ্ট বলে দিলে এখন থেকে আর একটি পয়সা দিতে পারবে না !

সকলে মনে মনে বলে, তাই বলো, এই জন্য তোমার এত রাগ !

না দিলি, না দিলি টাকা, আমি কি চেয়েছি তোর কাছে ? তোর বাপ ভক্তি করে দিত, তাই না তোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছি ? মুখের ওপর কী কথা বললে শোনো। বললে, আপনার হিসেব তো বাবা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন ঘটক মশায়। আমি তো শুনে অবাক। বললাম, কীসের হিসেব বাবা ? তোমার বাবা স্নেহভক্তি করে দিতেন, হিসেব তো কিছু ছিল না।

কথা বলিতে বলিতে পীতাম্বর এমন জায়গায় থামিয়া যায় যে শ্রোতাদের প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হয়। একজন প্রশ্ন করে, তারপর কী হল ?

পীতাম্বর বলে, আমার কথা শুনে ছোঁড়া যেন খিঁচিয়ে উঠল, আপনার বাপ-দাদার সম্পত্তি ভোগ করার পাপ যেন না লাগে, সেই বাবদে আপনার সাতটাকা করে বরাদ্দ ছিল তো ? তা সেই পাপেই যখন বাবাকে অপঘাতে মেরেছেন, আর তো আপনার পাওনা নেই।

পইতাটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে পীতাম্বর বলে, শুনলে কথা ? আমি যেন ওর বাপকে অপঘাতে মেরেছি ! আরে তোর পূর্বপুরুষ করল পাপ, ভগবান তোর বাপকে দিলেন শাস্তি, তার মধ্যে আমাকে তুই জড়াস কেন ! ভগবানের বিধান উলটে দেবার ক্ষমতা থাকলে তোর বাপকে কি আমি বাঁচিয়ে রাখতাম না, অমন ভালোমানুষ ছিল তোর বাপ ?

একজন শ্রোতা বলিল, ওর বাপ অপঘাতে মরেছে, এ কথাটা বলে বেড়ানো আপনার উচিত হয়নি। মাসে মাসে তাহলে সাহায্যটা পেতেন।

পীতাম্বর চটিয়া বলিল, সাহায্য ? কীসের সাহায্য ? আমি কি ভিখিরি যে ওর কাছে সাহায্য চাইতে যাব ? ভিখিরি হবে ও— দেখে নিয়ো, ভিখিরি হয়ে ও ফিরে আসবে।

গ্রামের লোকের প্রশ্ন আর উপদেশ বর্ষণে মনোমোহন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কলকাতা গিয়া বাস করার উদ্দেশ্যটা সকলকে সে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে না, নিজের কাছেই উদ্দেশ্যটা তার স্পষ্ট নয়। শহরের কলের জল, বৈদ্যুতিক বাতি, ট্রাম বাস, সিনেমা

থিয়েটার, সমারোহ, সভ্যতা এ সব কি তাকে টানিতেছে ? গ্রামের একঘেয়ে নিরুৎসব শান্ত জীবন ভালো লাগিতেছে না, তাই কি সে শহরের হইচই চায় ? বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপা কি তার চাই ? অথবা তার কামনা শুধু নূতনত্ব, পরিবর্তন ? এ রকম অনেক প্রশ্ন মনে জাগে, ভালোমতো একটা জবাবও সে খুঁজিয়া পায় না।

মনের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ শুধু অনেকদিন হইতে স্পষ্ট হইয়া আছে এবং কীভাবে যেন তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে না পারাই তার এই অসন্তোষের কারণ। কেন তা কে জানে ! কী যেন সব ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটিতে পারিতেছে না, অনির্দিষ্ট অনেক সম্ভাবনা যেন বাতিল হইয়া যাইতেছে, দূরে কী যেন তার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, কাছে আগাইয়া যাওয়া হইতেছে না—এমনই এক অনাবশ্যক রহস্যময় অনুভূতি সর্বদা তাকে পীড়ন করে আর গ্রামের সংকীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন তার ছটফট করিতে থাকে।

শহরে গিয়া অর্থোপার্জনের কথা অবশ্য সে ভাবে কিন্তু সেটা দেশের সম্পত্তির আয় কম হওয়া ও খরচ বাড়ার মধ্যে সামঞ্জস্য করার হিসাব। শহরে গিয়া অর্থোপার্জন করা তার আসল উদ্দেশ্য নয়।

শহরে গিয়া কোনো উপায়ে যদি লাখপতি হইয়া যাইতে পারে তা হইলে অবশ্য তার আপত্তি কিছু নাই। কিন্তু শহরের আকর্ষণটা তার লাখপতি হওয়ার কামনার জন্য নয়।

নানা আপত্তি তুলিয়া, রাগ করিয়া চোখের জল ফেলিয়া মা ছেলেব প্রস্তাবটা বাতিল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন মনোমোহনের প্রচণ্ড ধমকে তার চেষ্টা থামিয়া গেল।

ছেলের কাছে এই তার প্রথম ধমক খাওয়া। স্নেহের নয়, অভিমানের নয়, আদরের নয়, রাগ ও বিরক্তির ধমক। গরম মেজাজে বাড়ির কর্তা যেভাবে ধমক দেয়।

আজ যেন মা আর একবার ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁর ছেলের বাপটি বাঁচিয়া নাই।

তারপর হইতে মা একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। একটি কেবল অনুরোধ জানাইলেন ছেলেকে।

কর্তার বার্ষিক কাজটা এখানে সেরে যা মনু।

এ অতি সঙ্গত অনুরোধ। সে মানুষটার সারাজীবন এখানে কাটিয়া ছিল, দেশের লোকেও প্রত্যাশা করে যে তার প্রথম বার্ষিক কাজটা দেশেই সম্পন্ন হইবে ? আগে শহরে গিয়া বাসা বাঁধিলেও এই কাজের জন্য সকলকে নিয়া তাকে অন্তত কয়েকদিনের জন্য দেশে ফিরিতে হইবেই।

মনোমোহন বলিল, বেশ, তাই হবে।

শহরে যাওয়া মাস তিনেক পিছাইয়া গেল।

মোটে তিন মাস, ত্রিশ বছরের সঙ্গে আর শুধু তিনটি মাস যোগ দেওয়া। সময় বিশেষে তিন মাস সময়ও কত যে দীর্ঘ হইতে পারে ! তবে হ্যাঁ, বিদায় তাকে দিতে হইবেই জানিয়া গ্রাম যেন আয়োজন করিয়াছে তার মনোরঞ্জনের, এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এ গ্রামের স্মৃতি যাতে তার কাছে প্রীতিকর হয়। প্রতিদিন ভোরে কে যেন এখন পুবের আম কাঁঠালের বন হইতে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া তুলিয়া সূর্যকে আকাশে স্থাপন করে, পাখিদের গান ঝরায়, বিল ছাইয়া পদ্মফুল ফোটায়, ধানের খেতে ঢেউ তোলানো বাতাসে পাঠাইয়া দেয়, মুথা ঘাসের মেটে গন্ধ আর গাঁয়ের মানুষের কথায় ব্যবহারে আমদানি করে আন্তরিক প্রীতির অর্ঘ্য।

বিদায় হওয়ার অধীরতার মধ্যেও মাঝে মাঝে গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার কথা ভাবিয়া মনও বেশ খানিকটা কেমন কেমন করে বইকী।

দুই

নিজে দেখিয়া পছন্দমতো একটি ভালো বাড়ি ঠিক করিবার জন্য মনোমোহন প্রথমে একা কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিল। উঠিল শহরের এক নামকরা হোটেলে— বাহিরের চাকচিক্যের তুলনায় ভিতরের আভিজাত্য যার বেশি।

কলিকাতায় পছন্দসই বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করা যে কি হাঙ্গামার ব্যাপার, সেটা মনোমোহনের একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু বাড়ি খোঁজার একটা দিক সে একবার খেয়ালও করে নাই। কেমন একটা যুক্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তার মনে জাগিয়া ছিল যে, শহরে যখন এত রকমের অসংখ্য বাড়ি, কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড় বাছাই করার মতোই শহরে পৌঁছিয়া বাড়ি পছন্দ করিতে কোনো কষ্ট হইবে না।

তিনদিন খোঁজাখুঁজির পর হয়রান হইয়া সে বুঝিতে পারিল, একটা বোকামি করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে শহরের জানাশোনা কয়েকজন মানুষকে বাড়ির খোঁজ নিয়া রাখিতে লিখিয়া, কিছুদিন পরে তার নিজের আসা উচিত ছিল।

বড়ো মন খারাপ হইয়া গেল।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। চলনসই একটা বাড়ি এখনকার মতো ঠিক করিয়া সকলকে আনিয়া নীড় বাঁধিতে কোনো বাধা নাই, তারপর ধীরে সুস্থে খোঁজ করিলে ভালো বাড়ি কি একটা পাওয়া যাইবে না ? কিন্তু তিনদিন খুঁজিয়া মনের মতো একটা বাড়ি না পাইয়াই মনোমোহনের মনে হইতে লাগিল, শহর যেন তাকে গ্রহণ করিতে চায় না। এ যেন বিপজ্জনক ইঙ্গিত, তার বাড়ি খোঁজার চেষ্টার এই ব্যর্থতা। শহরে নূতন জীবন তার সার্থক হইবে না।

ভাড়াটে বাড়ি খুঁজিয়া না পাওয়ার ব্যর্থতা বোধ হয় মানুষের একাকীত্বের অনুভূতি তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। সে অবস্থায় হোটেলের তিনতলার ঘরে অনেক রাত্রে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নীচে রাস্তার দিকে চাহিয়া একাকীত্বের ভীরু হতাশার জন্যই বোধ হয় সন্দেহ জাগে যে, বিপ্লব হয়তো ভালো নয়, অভ্যাস মানুষের ধর্ম, ভয়াবহ অধর্মের চেয়ে মরণও ভালো।

নূতন আবেষ্টনীতে ঘুম আসে না। রাস্তার দিকে দুটি বড়ো বড়ো জানালা, কিন্তু অপরদিকের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেই ঘরে আর বাতাস ঢোকে না। ফ্যান আছে, খুলিয়া দিলেই পাক দেওয়া বাতাস গায়ে লাগে, কিন্তু বহু লোকে যেন সঙ্গে সঙ্গে জোরে শ্বাস টানার মতো ফিসফিস শব্দে আপশোশ জানাইতে শুরু করিয়া দেয়। জনবিরল পথে সশব্দে বাস চলিয়া যায়, রিকশার টুনটুন আওয়াজ কানে আসে—অথচ শহরে তখন রাত্রির স্তব্ধতা সত্য, তার মধ্যে ফাঁকি নাই। অসংখ্য শব্দের বিপুল কলরোল থামিয়া যে গভীর স্তব্ধতা সৃষ্টি হইয়াছে, গ্রামের শ্মশানেও যার তুলনা নাই, মাঝে মাঝে মোটরের গর্জন আর রিকশার ঘণ্টাধ্বনি তাকে একটু নাড়াও দিতে পারে না।

শুধু স্পষ্ট করিয়া দেয়। কানে যেন তালা লাগিয়া যায় আর শব্দহীনতা দপদপ করিতে থাকে।

নটা-দশটার সময় হইতে রাত্রি দুটো-তিনটে পর্যন্ত শ্রান্ত দেহ যখন ঘুম চাহিয়া পায় না তখন হইতে প্রতিটি মিনিট মনোমোহনের কাছে রাতজাগার কষ্টে ভারী ও মন্থর হইয়া থাকে।

তৃতীয় রাত্রি এমনিভাবে কাটিল।

পরদিন সকালে সে চিন্ময়ের বাড়ি গেল।

অনেকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে এই সাক্ষাতের আনন্দ ও উত্তেজনা মনোমোহন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া একদিন চিন্ময়কে একেবারে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে : তাকে দেখিয়া সে শহরে বাস করিতেছে জানিয়া, শহরের কোন পাড়ায় কেমন একটি বাড়ি সে কীভাবে সাজাইয়াছে লক্ষ করিয়া, বন্ধু ও

অতিথিকে বাড়িতে আদর-অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থায় নিখুঁত মার্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া চিন্ময় ভাবিবে, কই না, মনোমোহন তো মোটেই পাড়াগেঁয়ে নয় ! তিনবার তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়া তার সম্বন্ধে যে ধারণা চিন্ময়ের নিশ্চয় জাগিয়াছিল, এতকাল পরে সে ধারণা তার ভাঙিয়া যাইবে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একটি সাথির অভাব তিনদিনের মধ্যেই তাকে এমন কাবু করিয়া দিল যে চমক দেওয়া আঘাতে চিন্ময়ের ধারণা পরিবর্তন করার সাধটা বাতিল না করিয়া পারা গেল না। চিন্ময় আগেই জানিয়া রাখিবে যে সে শহরে বাস করিতে আসিতেছে।

জানুক, উপায় কী।

নামকরা হোটেলটির চার্জ বড়ো বেশি। মনে মনে খরচের হিসাব আওড়ানো মনোমোহনের অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কদিন এই অনাবশ্যক মোটা খরচের চিন্তাটা বড়ো বিঁধিতেছিল। আজ এই অপব্যয়ের সমর্থনে একটা ভালোমতো যুক্তি জুটিয়া যাওয়ায় সে স্বস্তি বোধ করিল।

চিন্ময় নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে, সে কোথায় উঠিয়াছে—হোটেলের নামটা তখন নিঃসংকোচে উচ্চারণ করা চলিবে।

চিন্ময়ের বাড়ির সামনে বাগান আছে। কয়েক হাত মোটে চওড়া, তবু নিখুঁতভাবে সাজানো ফুলের গাছে ঠাসা বাগান। এটা শহরের এই নবোদ্গত অঞ্চলের ফ্যাশান। তিন কাঠা জমিতে যে বাড়ি করিয়াছে, সে-ও খানিকটা জমি ছাড়িয়া দিয়াছে বাগানের জন্য। তবে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া চিন্ময়ের মস্ত বড়ো বাড়ি। যত বড়ো নয়, নির্মাণ-কৌশলে তার চেয়ে বড়ো মনে হয়।

তাকে দেখিয়াই চিন্ময় খুশি হইয়া বলিল, মোহন ? আশ্চর্য করে দিলে যে !

অভ্যর্থনার আন্তরিকতাতেই কয়েক বছরের অদর্শনের সংকোচ অনেকখানি কাটিয়া যায়, দুজনেই স্বস্তি বোধ করে।

আর একদিক দিয়া মনোমোহন একটু বিস্ময়ও অনুভব করে।

কিছুদিন যোগাযোগ না থাকিলে মনের মধ্যে বন্ধুও কেমন বদলাইয়া যায় ? দেখা হইলে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, এতো ঠিক সে নয় ! এতদিন মনের মধ্যে বন্ধু বলিয়া যাকে স্মরণ করিতাম ?

বন্ধুর সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া চিন্ময় বলে, তুমি সত্যি একটি আশ্চর্য মানুষ মোহন। যতবার গাঁ থেকে এসেছ, গাঁয়ের এতটুকু চিহ্ন তোমার কোথাও খুঁজে পাইনি। চুল ছেঁটেছ, তা-ও এখানকার সেলুনের ছাঁট। তোমাদের ওখানে সেলুন আছে নাকি ? এতকাল গাঁয়ে থেকে এখানে আসবার সময় কী করে গাঁয়ের সব ছাপ ঝেড়ে ফেলে দাও ?

মনোমোহন বলে, পুকুর থেকে হাঁস যখন উঠে আসে---

গায়ে জল থাকে না। কিন্তু পায়ে পাঁক লেগে থাকে। পাঁক না থাকলেও দেখলেই বোঝা যায়, পুকুর থেকে উঠে এসেছে।

গেঁয়ো বলেই হয়তো শহুরে সেজেছি।

সেজেছ কোথায় ? সাজলে তো ধরাই পড়ে যেতে—চেনা যেত শহরের জামাই এসেছ !

দুজনেই হাসে। দুজনেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। দুজনেই ভাবে যে শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন, আর রুচির দিক দিয়া প্রায় ভিন্ন রকম একজন মানুষের সঙ্গে অনায়াসে কেমন সহজ অন্তরঙ্গতা গড়িয়া তুলিয়াছে !

কিন্তু খানিক পরেই টের পাওয়া যায় দূরে সরিয়া থাকিলে বন্ধুর সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গতা বজায় থাকা এত সহজ নয়।

তারপর, খবর কি ?

চিন্ময়ের প্রশ্ন শুনিয়া মনোমোহন একটু দমিয়া যায়। অন্তরঙ্গতা বজায় আছে, কিন্তু জীবনের গত কয়েকটি বছরের হিসাবে তারা পরস্পরের অপরিচিত। যতই বিবরণ তারা পরস্পরকে দিক, সেগুলি হইবে শুধু বড়ো বড়ো কয়েকটি ঘটনার পরিচয়, অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টের মতো। অসংখ্য ক্ষণগুলির খুঁটিনাটি বিচিত্র বিবরণ পরস্পরের অজানাই থাকিয়া যাইবে।

পাঁচ বছর আগে মনোমোহনের বিবাহের সময় চিন্ময় তার গ্রামের বাড়িতে গিয়াছিল, কয়েকদিন থাকিয়া আসিয়াছিল।

সেই তাদের শেষ দেখা।

তারপর কিছুকাল ধরিয়া মাঝে মাঝে একজন আর একজনকে চিঠি লিখিয়াছে। বছর দুই আগে চিন্ময়ের বিবাহের সময় সে বন্ধুকে মস্ত একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

সে চিঠির আগাগোড়া শুধু এই সমস্যার আলোচনা ছিল, সে কি সুখী হইবে ? মোহন তো জানে, চিরদিন সে গ্রামের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, অনাড়ম্বর সহজ শান্ত জীবন সে পছন্দ করে। সন্ধ্যার অবশ্য তুলনা নাই, তাপস অথবা হিরণ্ময়কে বাতিল করিয়া সন্ধ্যা যে তার সঙ্গে জীবন কাটাইতে চাহিবে নিজের এই সৌভাগ্যে এখনও তার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। তবু মনটা মাঝে মাঝে খুঁতখুঁত করে। মনে হয়, সন্ধ্যা যদি শহর হইতে অনেক দূরে কোনো পল্লিতে গৃহস্থের অন্তঃপুরে বড়ো হইত আর বহুদিনের পরিচয়ের বদলে চিরন্তন প্রথামতো একদিন দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়া আসিত এবং আর একবার সমারোহে গিয়া সন্ধ্যাকে বিবাহ কবিয়া আনিত, কী সুখীই সে হইত জীবনে !

মোহন যেমন লাবণ্যকে নিয়া সুখী হইয়াছে।

চিঠি পড়িয়া মোহন ভাবিয়াছিল : এ কোন দেশি ন্যাকামি ? গ্রাম্য গৃহস্থের অন্তঃপুরে মানুষ হইলে সন্ধ্যা যে আর এই সন্ধ্যা থাকিত না, এটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধি কি চিন্ময়েব নাই ?

লাবণ্যও চিঠিখানা পড়িয়াছিল, স্বামীর সব চিঠিই সে পড়ে। রাগ করিয়া সে বলিয়াছিল, তার মানে আমাকে তোমার বন্ধু মুখ্যু গেঁয়ো ভূত মনে করে।

চিঠির মানে তাই দাঁড়ায়। তবে মোহন বন্ধুকে জানিত কিনা, তাই সে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল : না, ঠিক তা নয়। ওর কাছে গ্রামের মেয়ে হল কতকটা সেকালের ঋষিদের আশ্রমপালিতা কন্যার মতো। রূপগুণ বিদ্যাবুদ্ধি সব আছে, কাব্যের নায়িকার মতো ভালোবাসার খেলা জানে, অথচ এমন সরলা যে কাঁটাগাছে আঁচল আটকে গেলে—

তুমি থামবে ?

সে চিঠির জবাব মোহন দেয় নাই, চিন্ময়ের বিবাহেও আসে নাই। চিন্ময় অনেক অনুযোগ দিয়া আর একখানা চিঠি লিখিয়াছিল এবং স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিল, সন্ধ্যার সঙ্গে কয়েকদিন কোনো গ্রামে গিয়া বেড়াইয়া আসিবার কথা ভাবিতেছে।

চিঠির জবাব লিখিয়াও চিঠিখানা পোস্ট করিতে মোহন ভুলিয়া গিয়াছিল। তারপর এ পর্যন্ত দুজনেই ছিল চুপচাপ।

খবরাখবরের আদানপ্রদান হইল প্রায় আধঘণ্টা, তারপর হঠাৎ মোহন বলিল, আসল কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি। সত্যি আমি গেঁয়ো। একজনের সঙ্গে জীবন কাটাতে কেমন লাগছে ?

ভালোই।

আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে মোহন ভুলিয়া যায় নাই, চিন্ময় আপনা হইতে বলে কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। চিন্ময়ও বন্ধুর প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকায় আধঘণ্টার আলাপে

সন্ধ্যার কথা একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। এইবার বিবাহোৎসবে না আসার এবং চিঠির জবাব না দেওয়ার একটা কৈফিয়ত খাড়া করা মোহনের উচিত ছিল।

কর্তব্যটা সে সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেল।

চিঠির ইঙ্গিত ছিল খুব স্পষ্ট। মনোমোহন নিমন্ত্রণ করিলেই চিন্ময় ও সন্ধ্যা কয়েকদিনের জন্য তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াইতে আসিত। মোহন জবাব লিখিয়াও চিঠি ডাকে দেয় নাই।

তার মনে হইয়াছিল, এ চিঠি সন্ধ্যার ফরমাশে লেখা, গ্রাম্য আবেষ্টনীতে তাকে দেখিবার শখ হইয়াছে সন্ধ্যার। সন্ধ্যার কল্পনায় হয়তো সে ফতুয়া গায়ে দেয়, উবু হইয়া বসিয়া পাড়ার দশজনের সঙ্গে খোশগল্প করে আর তার বাড়ির শাঁখা সিন্দুর পরা ঘোমটা-টানা মেয়েরা কলসি কাঁখে পুকুরে জল আনিতে যায়। এ সব নিজের চোখে দেখিয়া সন্ধ্যার একটু আমোদ পাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে।

খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিতে থাকে, মোহনের জন্য চা আসে, দেয়ালের দামি ঘড়িতে কোমল ক্লান্ত আওয়াজে ধীরে ধীরে দশটা বাজে, সময়ের যেন তাড়াতাড়ি নাই।

সন্ধ্যার কাছে একটা খবর কি চিন্ময় পাঠাইবে না ? এ বেলা তাকে এখানে খাইয়া যাইতে বলিবে না একবার ? শুধু এক কাপ চা আর খাবারে তার অভ্যর্থনার শুরু ও শেষ হইবে ?

শেষের দিকে চিন্ময়কে কেমন অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল, তারপর সে এক সময় বলে, এমন অসময়ে তুমি এলে মোহন ! এখুনি নেয়ে খেয়ে আমায় আপিস ছুটতে হবে।

ও, আচ্ছা তাহলে উঠি।

নিজের বোকামির জন্য মনোমোহনের আপশোশের সীমা থাকে না। এবার তুমি বিদায় হও বলিবার সুযোগ চিন্ময়কে দেওয়ার আগেই অবস্থা বুঝিয়া তার নিজেরই বিদায় নেওয়া উচিত ছিল।

চিন্ময় কিন্তু ছাড়িতে চায় না, বলে, আরে বোসো, বোসো। তোমার এত তাড়া কীসের ? তোমার তো আপিস নেই ! যতক্ষণ সময় আছে একটু গল্প করা যাক !

মনোমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার বসে। এদের সঙ্গে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। এরা নিজেরাই ইঙ্গিতে জানায় আপিস যাওয়ার তাগিদ আছে, এবার তুমি বিদায় হও, আবার উঠিতে গেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে, এত তাড়া কীসের !

কয়েক মিনিট পরে নিজেই সে আপিসের কথাটা মনে করাইয়া দেয়।

চিন্ময় বলে যে চুলোয় যাক আপিস, সে কি কেরানি যে লেট হইলে বড়োবাবু গাল দিবে ? বিশেষ একটা দরকারি কাজ আছে তাই না গেলে চলিবে না, নয়তো এতদিন পরে তাদের দেখা হইয়াছে, আজ কি আর চিন্ময় আপিস যাইত ?

শুনিয়া মনোমোহন আবার দমিয়া যায়।

আগাগোড়া বিচারে যেন ভুল হইয়া যাইতেছে। চিন্ময় তবে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আপিসের তাগিদ জানায় নাই, অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না বলিয়া আপশোশ প্রকাশ করিয়াছিল ? যে কোনো ছুতোয় ছেলেমানুষের মতো অভিমান করিবার এবং দোষ বাহির করিবার জন্য সে কি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ?

এ তো ভালো কথা নয়।

সব অবস্থাতেই আত্মসমালোচনা মানুষকে অনামনস্ক করিয়া দেয। অন্যমনস্ক মানুষকে মনে হয মনমরা উদাসীন। চিন্ময় দুঃখিত হইয়া ভাবে, জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া, মোহন কি ঝিমাইয়া পড়িতেছে ? গ্রামে থাকিয়াও সে কি শহরের বোঁটা-ছেঁড়া মানুষের মতো বাসি হইয়া যাইতেছে ?

ও বেলা তোমার তো কোনো কাজ নেই মোহন ?

না।

সকাল সকাল আপিস থেকে বেরিয়ে তোমায় একেবারে তুলে নিয়ে আসব বাড়ি থেকে। ঠিকানাটা কি তোমার ?

নামকরা হোটেলের সাহায্যে বন্ধুর কাছে মর্যাদা বাড়ানোর সাধ পচিয়া গিয়াছিল। একটু লজ্জার সঙ্গেই মোহন হোটেলের নামটা উচ্চারণ করিল।

হোটেল ? চিন্ময় আশ্চর্য হইয়া গেল। আমি ভাবছিলাম, তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছ বুঝি। কিন্তু ও হোটেল কেন, কলকাতায় আর হোটেল খুঁজে পেলে না ? দশগুণ বেশি চার্জ দিয়ে ওখানে উঠবার মানে ?

মোটে দু-চার দিনের জন্য কিনা—

দু-চার দিনের জন্য মিছিমিছি টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয় ? এক কাজ করো তুমি, ও বেলাই হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে সটান আমার এখানে চলে এসো।

চিন্ময় একটু হাসিল।

হোটেলের মতো আরামে অবশ্য থাকতে পারবে না, তবে আমি যখন আছি, তুমিও থাকতে পারবে আশা করছি।

মোহন হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারিল না। এ বাড়িতে দু-চারদিন বাস করার কথা ভাবিতেও তার ভয় হয়।

সত্যই ভয় হয় !

দেখা করিতে আসিয়া দু-চার ঘণ্টা কাটাইয়া যাওয়া এক কথা কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা বাস করা ! দু-চার ঘণ্টা সোফায় শুধু বসিয়া থাকিতে হয়, মুখে শুধু বলিতে হয় কথা। অতিথি হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বাস করা তো সে রকম সহজ ব্যাপার নয়। পদে পদে তার গ্রাম্যতা ও অসভ্যতা ধরা পড়িতে থাকিবে, বাড়ির চাকর দাসীরও বুঝিতে বাকি থাকিবে না আধুনিক সভ্য পরিবারে বাস করিতে সে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

কাল চলে যাচ্ছি, একবেলার জন্য হাঙ্গামা করে কি হবে ?

চিন্ময়ের বাড়িতে বাস করার বিপদকে বরণ করার চেয়ে দেশে পালানোও ভালো। অবশ্য, কালই যে যাইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যাওয়া ঠিক করিয়াও মানুষ অনেক ছুতায় যাত্রা পিছাইয়া দিতে পারে !

চিন্ময় সায় দিয়া বলিল, না, কাল যদি চলে যাও, তবে আর হাঙ্গামা করে লাভ নেই। কিন্তু তুমি কলকাতা এসেছ কেন তা তো বললে না ?

মোহন বলে, চিন্ময় শুনিয়া যায়। শুনিতে শুনিতে এমন মুখের ভাব হয় চিন্ময়ের, বন্ধু যেন আত্মহত্যার পরিকল্পনা শুনাইতেছে !

সাধ করে দেশের বাড়ি ঘর ছেড়ে এসে তুমি কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাও ?

এখনকার মতো বাড়ি ভাড়া নেব। তারপর দেখেশুনে কিছু জমি কিনে একটা বাড়ি করবার ইচ্ছা আছে।

সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্ময় বলে, তুমি পাগল হয়ে গেছ মোহন। তোমার মাথার ঠিক নেই।

চিন্ময়ও সন্ধ্যাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, সন্ধ্যাও খবর পাইয়া আপনা হইতে উঁকি দিয়া যায় নাই।

সন্ধ্যার কথাটা মোহনকেই উল্লেখ করিতে হইল, তার শহরবাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্ময়ের সঙ্গে আলোচনা ও তর্কের পর বিদায় নেওয়ার সময়। সেই পুরাতন তর্ক, কলেজ জীবনে প্রতিদিন

যে তর্কে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আজও ব্যক্তিগত আলোচনাটা মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল বহুরূপী সভ্যতার বহুমুখী পরিণতি ও সম্ভাবনার বিচারে এবং এক মুহূর্তে এতকাল দূরে দূরে থাকার জন্য দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধানটা গিয়াছিল বাতিল হইয়া। একটু যে সংকোচ ছিল তাও কাটিয়া যাওয়ায় মোহনের পক্ষে যাচিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করার দাবি জানানো সহজ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার কথা উঠিতেই চিন্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, বলিনি তোমায় ? সন্ধ্যা তো এখানে নেই।

কোথায় গেছে ?

বাপের বাড়ি গেছে, আবার কোথায়।

কবে গেল ?

তা পাঁচ-ছমাস হল বইকী।

পাঁচ-ছমাস।

বিস্ময়ের ভাব ফুটিতে ফুটিতে উত্তেজিত আনন্দের হাসিতে মোহনের মুখ ভরিয়া গেল, দুহাতে সে চিন্ময়ের ডান হাতটি চাপয়া ধরিল। —খোকা, না খুকি ?

তার মানে ?

ইঙ্গিতটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল চিন্ময়ের, তারপর তার মুখেও মৃদু একটু কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল—নিস্তেজ ও অস্থায়ী হাসি।

ও, তাই বলো ! স্ত্রীরা খোকা বা খুকি প্রসব করিতে বেশিদিনের জন্য বাপের বাড়ি যায় আমার এটা মনে ছিল না। তুমি বুঝি সন্ধ্যাকে ও রকম সাধারণ স্ত্রী বলে ধরে রেখেছ ?

মোহন চুপ করিয়া রহিল।

খোকাখুকির ব্যাপারেই ও বাপের বাড়ি গেছে বটে, তবে ঠিক উল্‌টো কারণে। আমি খোকা-খুকি চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম বলে আমাকে ঠেকাবার জন্য। এখন কিছুদিন ওসব হাঙ্গামা চায় না। বছর দুই পরে ফিরে আসবে বলেছে, তারপর যদি দরকার হয়, তোমার ওই কারণে গেলেও যেতে পারে বাপের বাড়ি। তার এখনও অনেক দেরি ভাই, অনেক দেরি।

মোহন ভড়কাইয়া গিয়াছিল, কতকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, ঝগড়া হয়েছে নাকি তোমাদের ?

চিন্ময় ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ঝগড়া ? আমরা কি তোমরা যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করব আর দশ মিনিট পরে মুখের দিকে চেয়ে দুজনেই হেসে ফেলব ? আমাদের মতের অমিল হয়েছে। ও সব তুমি বুঝবে না ভাই, ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

ব্যাপারটা মোহন বুঝিতে পারে ভালোভাবেই। সন্ধ্যার প্রসঙ্গে চিন্ময়ের রাগ আর জ্বালার বহর দেখিয়া সে আর কিছু বলে না।

চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হোটেলে থেকো।

মোহনকে বিদায় না দিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বাড়ির সামনে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তের মতো বাগান, লতার চাঁদোয়ার নীচে কোলাপসিবল গেট।

চিন্ময়ের বাবা কেদারনাথ স্মার্ট আপিসি বেশে গাড়িতে উঠিতেছিল। গতি-স্বপ্নের স্থির প্রতিমূর্তির মতো গাড়িটির পালিশে সূর্যের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে মনে হয়। কেদারনাথের কাঁচা পাকা চুল একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছে, টান করা মুখের চামড়া হয়তো একটু শিথিল হইয়াছে, নিষ্প্রভ হয় নাই।

গাড়িতে উঠিয়া বসিবার পর সে মোহনের সঙ্গে কথা বলিল। মোহন গাড়ি ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কথা না বলিয়া উপায় ছিল না।

মোহন নাকি ? অনেকদিন পরে তোমায় দেখলাম।

ভালো আছেন ?

আছি, একরকম। কী করছ এখন ?

ছেলের স্কুল-কলেজ জীবনের অনেক অপরিচিত ছেলে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দেখা করিতে আসে, চাকরি চায়। অনেকক্ষণ সাধারণ আলাপের ভূমিকায় সময় নষ্ট করে, প্রত্যেকে আগেই প্রমাণ করিয়া রাখিতে চায় যে অন্তত তার জন্য কেদারের কিছু করা উচিত।

মোহনের বাড়ির অবস্থা কেদারের মনে ছিল না, তাই প্রথমেই সে জানিতে চাহিল, সে বেকার কিনা অথবা কিছু করিতেছে। সময়ও অযথা নষ্ট হইবে না, মোহনের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা চলিতে পারে তাও বুঝা যাইবে।

মোহন ধীরে ধীরে বলিল, দেশেই আছি এখন পর্যন্ত। বাবা মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয় ?

সহানুভূতি জানাইতে কেদার বলিল, মারা গেছেন ? তাই তো বড়োই দুঃখের কথা হল !

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিতে বলিল, চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? চিন্ময় বাড়িতেই আছে।

সঙ্গ ত্যাগ করার ভূমিকা হিসাবে বলিল, কটা বাজল ? দশটা তেত্রিশ ! দেরি হয়ে গেল একটু। —যাও।

যাও সে বলিল ড্রাইভারকে। শোঁ করিয়া গাড়ি চলিয়া গেল।

মোহন কখনও চাকরির জন্য উমেদারি করে নাই কিনা তাই কেদারের ব্যবহারে অমায়িকতার জোয়ার আসিবার আগেই ভাঁটা আসিল কেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

এ জন্য বিস্মিত হওয়ার অবসর কিন্তু সে পাইল না, বিস্ময় জাগিল অন্য কারণে।

পথের ওপারে দুটি নূতন তিনতলা বাড়ির মাঝখানে একটি খোলার বাড়ি, মাটি লেপা দেওয়ালে আলকাতরা মাখানো কাঠের গরাদের জানলা। খোলা দরজা দিয়া ভিতরে একটা মাচার খানিকটা অংশ চোখে পড়ে, সবুজ, সতেজ পাতার মধ্যে কয়েকটা হলদে ফুল ফুটিয়া আছে, একটি পরিপুষ্ট কুমড়া ঝুলিতেছে।

ম্যাজিক নয়তো ? এই পাড়ায় চিন্ময়ের বাড়ির এত কাছে বাঁশের মাচায় কুমড়ো ফুল এবং ফল !

দুপুরে হোটেলের ঘরে বসিয়া মোহন লাবণ্যশ্রীকে একখানা চিঠি লিখিল। চিঠিখানা লিখিবার জন্যই দামি একখানা প্যাড কিনিয়া আনিল।

লিখিল :

আসবার আগের দিন তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে তোমায় কাঁদিয়েছিলাম, অতটা বাড়াবাড়ি করা আমার উচিত হয়নি। সারাদিন তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, বিকালে তুমি নিজে খাবার এনে দিয়েছিলে কিন্তু খাইনি, রাত্রে তুমি কাঁদতে আরম্ভ না করলে হয়তো তোমার সঙ্গে ভাব না করেই কলকাতা চলে আসতাম।

আমার ও রকম জিদ চেপেছিল কেন জান ? অনেকদিন, একসঙ্গে থাকলে ও রকম হয়, সামান্য কারণে আপনজনের সঙ্গে সহজেই খিটিমিটি বেধে যায়। এখন বুঝতে পারছি, এই জন্য বউদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাওয়া ভালো। আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, সে জন্য (আমায় মাপ কোরো লিখিয়া, একটু ভাবিয়া কথাগুলি মোহন কাটিয়া দিল) মনে দুঃখ রেখো না। সে কথা

যাক, তোমায় একটা দরকারি কথা লিখতে চাই। আগেও অনেকবার এ বিষয়ে তোমায় বলেছি কিন্তু সামনাসামনি বলার জন্যই বোধ হয় কথাটা তোমার তেমন গুরুতর মনে হয়নি, অন্য প্রসঙ্গে চাপা পড়ে গেছে। এখন আমি কাছে নেই, দূর থেকে চিঠি লিখে জানাচ্ছি, হয়তো এবার আমার কথার গুরুত্ব খানিকটা বুঝতে পারবে।

তোমায় ছেলেমানুষি এবার না কমালে তো চলবে না লাবু ! তুচ্ছ বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠবে, সামান্য অনুযোগে কান্না আসবে, পাছে কেউ কিছু মনে করে ভেবে সর্বদা সকলকে ভয় করে চলবে, জোর করে কিছু চাওয়ার বদলে দশ বছরের মেয়ের মতো আবদার ধরবে আর অভিমান করবে—এ স্বভাব তোমার বদলানো চাই। তুমি যে একটা মানুষ, তোমার যে স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে, তাই যদি তুমি ভুলে থাকো, নিজের জীবনকে তুমি সার্থক করে তুলবে কী করে ? বিশেষত কলকাতায় এলে আমাদের জীবনের প্রসার বাড়বে, দশজনের সঙ্গে তোমার মেলামেশা করতে হবে, সামাজিক জীবনের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে, নতুন ব্যবস্থায় সংসার চালাতে আমায় সাহায্য করতে হবে—এখনকার মতো ছেলেমানুষ যদি থেকে যাও, এ সব তো তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। ফল কি দাঁড়াবে ভেবে দেখো।—

ইতি—
তোমার মোহন

এখনও যে বাড়ি ঠিক হয় নাই, এ খবরটা মোহন লিখিল পুনশ্চে।

দোতলায় দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমে মুখ করা চিন্ময়ের একটি নিজস্ব বসিবার ঘর আছে।

বাড়ির বাকি অংশের যে ঘর ও বারান্দা পার হইয়া এ ঘরে আসিতে হয়, তার সঙ্গে এ ঘরের অমিল নতুন মানুষকে রীতিমতো চমক দেয়।

ঘরে কিছু নাই, একেবারেই কিছু নাই। পায়ের নীচে প্রশস্ত মেঝে, চারিদিকে ফাঁকা দেওয়াল মাথার উপরে শুধু ছাদ !

বসিবার একটি আসন পর্যন্ত ঘরে নাই।

অপরিমিত শূন্যতায় পরিবেশ জোরে শ্বাস টানিবার প্রেরণা জাগায়।

শুধু একটি সিল্কের লুঙ্গি পরিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে চিন্ময় মেঝেতে বসিয়া পড়ে।

বলে বোসো। ধুলো লাগবে না, ধুলো নেই।

মোহন বসে।

পাঁচ-ছ বছর আগে ঘরখানা অন্যরকম ছিল। আলতা সিঁদুর গয়না আর রঙিন শাড়িতে জমকালো বউদের বিধবা বেশ ধরার মতো ঘরের চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে। পুরু নরম ফরাশে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিবার ব্যবস্থা ছিল আর ছিল বেতের মোড়া ও কাঠের পিঁড়ি। গড়গড়া ও রূপাবাঁধানো হুঁকা ছিল, পানের বাটা ও মশলার পাত্র ছিল, মাটির কুজো, পাথরের গ্লাস, তালপাতার পাখা ছিল। দেওয়াল ভরিয়া সাজানো ছিল পটের ছবি ও গ্রাম্য নক্‌শা।

শূন্য ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইতে বুলাইতে মোহন কেবল একটি কথায় প্রশ্ন করে, কেন ?

চিন্ময় বলে, কী করব ? গ্রামের গেরস্থ ঘরে যা কিছু থাকে সব এনেছি, কমদামি সব জিনিস কিনেছি, কিন্তু ঘরোয়া ভাবটা কিছুতে আনতে পারিনি। কখনও মনে হয়েছে ঘরে জঞ্জাল জমেছে, কখনও মনে হয়েছে নতুন একটা শহুরে ফ্যাশান সৃষ্টি করেছি, কখনও মনে হয়েছে এবার বুঝি ক্যামেরা এনে শুটিং শুরু হবে। কোথায় যেন একটা ফাঁকি ছিল ধরতে পারিনি। সব তাই ছেঁটে

ফেলেছি। ফাঁকি বজায় রেখে চলার চেয়ে এই রকম ফাঁকাই ভালো। মাঝে মাঝে এসে বসলে মনটা বেশ শান্ত হয়।

মোহন জিজ্ঞাসা করে, সেই যে তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে কদিন ছিলে, তারপর আর গ্রামে গিয়ে থেকেছ কখনও ?

চিন্ময় বলে, থাকিনি, তবে মাঝে মাঝে সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসেছি। গত রবিবারের আগের রবিবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। নরেশকে মনে পড়ে ? তাদের দেশের বাড়িতে। তাদের বাড়িতে অবশ্য বেশিক্ষণ থাকিনি, পুকুর পাড়েই সময় কেটেছিল। মস্ত একটা মাছ ধরেছিলাম। তুলতে কি পারি, অনেকক্ষণ খেলিয়ে তবে তুললাম।

কত বড়ো মাছ ?

সের দুই হবে।

দু সেরি একটা মাছ মস্ত বড়ো মাছ চিন্ময়ের কাছে।

তাদের মস্ত পুকুরটা এখন জেলেদের কাছে জমা দেওয়া হয়, আজকাল দু সেরি মাছ তার কাছেও অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু পুকুর হইতে ছিপে সে কতবার সাত-আট সের ওজনের রুই-কাতলা ধরিয়াছে—খুব বেশিদিনের কথা নয়।

সে কথা চিন্ময়কে বলিয়া লাভ নাই। সে বুঝিবে না।

বড়ো মাছ ছিপে গাঁথিয়া ধরার সুখ আর বড়ো মাছ রান্না করিয়া খাওয়ার সুখের পার্থক্য তার জানা নাই।

মাছ ধরার সুখের স্বাদটা তার জানা আছে কিন্তু সুখটা পাওয়ার আগ্রহ আছে কি ? জেলেদের পুকুরটা জমা দিলেও ছিপ ফেলিবার অধিকার সে হারায় নাই। কিন্তু গত কয়েক বছরে কতবার সে পুকুরে ছিপ ফেলিতে গিয়াছে ?

একেবারেই তাগিদ অনুভব করে নাই।

মোহন জিজ্ঞাসা করে, শীতকালে খালি মেঝেতে বসো কি করে ?

চিন্ময় হঠাৎ জবাব দেয় না।

মোহন বুঝিতে পারে হঠাৎ সে ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছে—মুখ বন্ধ করিয়া সে রাগটা সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিন্ময় মুখ খুলিলে তবে মোহন তার রাগের কারণটা বুঝিতে পারে। তার প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ মনে করিয়া চিন্ময়ের রাগ হইয়াছে !

রাগ আয়ত্তে আসিলে চিন্ময় ধীরে ধীরে বলে, হাসি পেলে হেসো মোহন। এর চেয়ে তাতে কম ঘা লাগবে মনে। তুমি পনেরো সের মাছ তুলেছিলে মনে আছে কিন্তু আমি জীবনে কখনও ছিপে মাছ ধরিনি। আট দশ সেরি মাছ তুমি হেসে খেলে তুলে থাক।

ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য মোহন সত্যই শীতকালে খালি মেঝেতে বসার সমস্যাটা টানিয়া আনিয়াছিল। সে লজ্জিতভাবে বলে, মনে মনে হাসিনি ভাই, কথাটা শুধু চাপা দিচ্ছিলাম। ছিপে মাছ ধরতে তুমি যে আনাড়ি, সেটা তুমিও জানো আমিও জানি। মুখে বলে কী হবে ?

সন্ধ্যার সময় চাকর ঘরে আলো দিয়ে গেল,—বড়ো একটি মাটির প্রদীপ। শূন্য প্রদীপের শিখাকে কাঁপিতে দেখিয়া তখন মোহনের মনে হইল শহর সত্যই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু গ্রাম কাছে আসে নাই !

লোকালয়ের বাহিরে গৃহহীন প্রান্তরে শুধু একটি আলো সম্বল করিয়া তারা বসিয়া আছে। অনেকবার তার দেশের গ্রামের উত্তরে রঙ্গনাথের মাঠে বসিয়া সে দূরে আলো জ্বলিতে দেখিয়াছে। সে আলো একটি নয়, অনেকগুলি।

মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সন্ধ্যার কথা না ওঠা পর্যন্ত কোনো কথাই তার ভালো লাগে না। চিন্ময়ের মুখে সন্ধ্যার সঙ্গে তার বিরোধের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তার মনে হয়, এই ঘরখানা যেন সেই মনান্তরের কারণটির সহজ সরল ব্যাখ্যার মতো। এত বড়ো বাড়িতে এই একটিমাত্র ঘর যেমন চিন্ময়ের পাগলামির প্রত্যক্ষ পরিচয়, সন্ধ্যার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ মিলের মধ্যে একটি মাত্র অমিলও তেমনই তার বিকারের প্রমাণ।

বিবাহের আগে চিন্ময় তাকে চিঠিতে যা লিখিয়াছিল, মোহন আগেই জানিত সে সব বাজে কথা। কোনো মন চিরদিন রূপকথার রাজকন্যার গায়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ায় না। রাজকন্যার ঈর্ষা নাই, মানুষীর সঙ্গে মানুষের সুখের ঘরকন্নায় সে বাধা দেয় না। কোনো অজানা কারণে মোহনের রাজকন্যা বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যা সাজিলেও সে জন্য সন্ধ্যাকে নিয়া তার অসুখী হওয়ার কথা নয়।

সন্ধ্যা ঘোমটা টানিয়া অন্তঃপুরচারিণী সাজিলেই বরং তার অসুবিধার সীমা থাকিত না। নিজে সে যে জীবন যাপন করে—এই ঘরে খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে দু-এক ঘণ্টা অবসর যাপন করা ছাড়া—তাতে সন্ধ্যা যেমন আছে তেমনই না হইলে জীবনসঙ্গিনী তাকে করা চলিত না। তাই ঘরে ও বাহিরে সন্ধ্যার সাজপোশাক চালচলনের এতটুকু সংস্কার চিন্ময় দাবি করে নাই শুনিয়া মোহন আশ্চর্য হয় না।

আমি কিছুই চাইনি ভাই, শুধু একটি ছেলে চেয়েছিলাম। আমার মতে বয়সে বিয়ে হলে প্রথমেই ছেলেমেয়ে হওয়া ভালো—অন্তত একটি। ও বললে পাঁচ বছরের মধ্যে ছেলেমেয়ে হওয়া চলবে না, পাঁচ বছর পরে দেখা যাবে। প্রথমে হাসতে হাসতেই আলোচনা হত, তারপর আমি যত জোর করতে লাগলাম, ওর জিদও তত চড়তে লাগল। শেষে একদিন বাবার কাছে চলে গেল। কি বলে গেল জানো ? পাঁচ বছর পূর্ণ হলে ফিরে আসবে।

পাঁচটা বছর ধৈর্য ধরলেই পারতে ? দেখতে দেখতে কেটে যেত।

কেন ? বিয়ে কি ছেলেখেলা ? একজন কমাস হইচই করে বেড়ানো বন্ধ রাখতে পারবে না বলে আর একজন পাঁচ বছর ধৈর্য ধরবে, আমি ও সব ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসি না। তা ছাড়া, বার্থ কন্ট্রোল আমার অতি কদর্য মনে হয়।

তুমি কদর্য ভাবলেই তো নেসেসিটি কথা শুনবে না। সভ্য জগতের দরকার, তাই ওটা চল হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামে নিতাই বলে একজন ডাক-পিয়োন আছে। দশ-বারো বছর বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে ছটি। খেতে দিতে পারে না। একদিন পাগলের মতো ছুটে এসে আমাদের হাসপাতালের---

তোমার হাসপাতাল আছে নাকি ?

বাবা একটা করেছিলেন ছোটোখাটো। আরও দশগুণ বড়ো একটা দরকার, কিন্তু করে কে ? বাবারও অত পয়সা ছিল না, আমারও নেই। মোহন একটু হাসে, নিতাই এসে হাসপাতালের ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গেল। পেটের নতুন ছেলেটাকে পেটেই মারবার জন্য বউকে কী যেন সব খাইয়ে দিয়েছিল, বউটা নিজেই মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে ডাক্তার আমার পরামর্শ নিতে এল, নিতাইকে পুলিশে দেবে কি না। আমি বলিলাম, না, ওকে বার্থ কন্ট্রোল শিখিয়ে দিন। এ হল বছর দুই আগের কথা। কিন্তু শেখালে কী হবে ওসব কি ধাতে পোষায় নিতাইদের ? আর একটি বাচ্চা হয়েছে নিতাইয়ের বউয়ের—এবার আর কোনো গোলমাল করেনি। ডাক্তার আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিল—কিন্তু নিতাই বলে অন্য কথা।

কী বলে ?

বলে, না বাবু, ও সব ভালো নয়। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি বললাম, তবে সেবার ও রকম কাণ্ড করতে গিয়েছিলি কেন ? বউটা মরত, নিজে জেল খাটতে ! নিতাই বলল, অত বুঝিনি বাবু। ছেলেপিলে কটার দশা দেখে মরিয়া হয়ে পাপ করেছি।

আমার ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আছে।

চিন্ময় বিরক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার সম্বন্ধে এত বড়ো গুরুতর কথা আলোচনা করার সময় গ্রামের নিতাই পিয়োনের গল্প আরম্ভ করা বোধ হয় তার উচিত হয় নাই।

কিন্তু গ্রামকে, গ্রামের সরল শান্ত জীবনকে ভালোবাসিতে গেলে নিতাই পিয়োনের সমস্যাটা তুচ্ছ করা যায় কেমন করিয়া ? গ্রামের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অশিক্ষা কুসংস্কার এ সব বাদ দিয়া গ্রাম্য জীবন কল্পনা করা যায় কী করিয়া ?

তাকে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া চিন্ময় বিরক্ত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়, ধীরে ধীরে বলে, আসল নীতিটাই তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ মোহন। কারও কারও বেলা সত্যিকারের অজুহাত থাকতে পারে—যেমন ধরো, স্বাস্থ্যের জন্য দরকার হয়। কিন্তু খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্বাধীন চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটবে—এ সব কি বার্থ কন্ট্রোলের অজুহাত ? নিতাই ছেলেপিলেকে খেতে দিতে পারে না, সেটা একেবারে আলাদা একটা অন্যায়। নিতাই অন্যায়টা মানবে কেন সে ভগবানের দোহাই দেয়—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। কিন্তু আসল কথাটা তো ঠিক। আহারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ বাড়বে কমবে—সে জন্য বার্থ কন্ট্রোল দরকার হয় না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে বলেই মানুষ মরতে মরতে দুর্ভিক্ষ ঠেকাবার ব্যবস্থা করবে। মানুষ জন্মানো বন্ধ করে কি দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায় ? গরিব সুখে থাকে ?

হঠাৎ চিন্ময় হাসে।

প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম ভাই। সন্ধ্যা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে এর থেকে একটা উপকার করেছে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে মাথা অনেক সাফ হয়ে এসেছে।

আচমকা সে প্রশ্ন করে, তোমার কি তবে এই ব্যাপার ? শহরে আসবে স্বাধীনভাবে দুজনে স্ফূর্তি করবে, তাই ছেলেমেয়ে চাও না ?

মোহন বলে, এবার আমার রাগ করা উচিত। লাবণ্যকে ডাক্তার দেখাতে কলকাতা এসেছিলাম মনে নেই ?

সত্যি মনে ছিল না ভাই।

তোমরা কি এ ঘরেই থাকবে দাদা ?

গত পাঁচ বছরে ঝরণা বড়ো হয় নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে। চিন্ময় স্নান করিতে যায়, ঝরণার সঙ্গে মোহন যায় নীচে সকলের বসিবার ঘরে।

সেখানে ঝরণার বন্ধু লীলা আর তার স্বামী বসিয়াছিল।

লীলাকে মোহন চিনিত। পাঁচ বছরে সেও বড়ো হয় নাই, একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের আলোয় ঝরণাকে মোটা মনে হইয়াছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোয় লীলাকে দেখার পর ঝরণার দিকে চাহিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ঝরণা শুধু স্পষ্ট হইয়াছে, মোটা হয় নাই। অন্য এক যুগের স্বপ্ন সামঞ্জস্য হারানোর ভয়ে কবি ও শিল্পীর মারফতেও কল্পনা যে সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, ঝরণা যেন সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে।

ঝরণা নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন। না হইয়া উপায় কি ? তার বিপদ কেউ বুঝিবে না। ঝরণার হাসি মিলানো মুখ ও কঠিন দৃষ্টির তিরস্কারে হঠাৎ সচেতন হইয়া মোহন তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেটের অন্য পকেট হাতড়াইতে আরম্ভ করে।

লজ্জায় তার কান গরম হইয়া ওঠে।

গ্রামে পুকুরঘাটে একটি স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া অসভ্য অবিবেচক মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, শহুরে ভাবে সেই রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন ঘটিয়া গেল।

চুপ করিয়া থাকা আরও ভয়ংকর। লীলাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনার মা ভালো আছেন ?

লীলার গলা খুব মৃদু, অতি ধীরে ধীরে সে কথা বলিত। এখনও তার কথা যেন দূর হইতে ক্লান্ত হইয়া কানে আসিয়া পৌঁছায়, কেবল তার নিঃশব্দ ক্ষীণ হাসিতে ধারালো দুষ্টামি আছে মনে হয় !

মা ভালোই আছেন। আমি খুব বুড়ি হয়ে পড়েছি, না ? ঝরণার মতো আমাকেও তুমি বলতেন, আজ যেন আপনি হয়ে গেছি মনে হচ্ছে ?

আর একটু হইলেই বুদ্ধিমানের মতো জবাব দেওয়ার কথাগুলি ফসকাইয়া যাইত, জড়াইয়া জড়াইয়া হয়তো মোহন বলিয়া বসিত, না না তা নয় তা নয়—। লীলার চেনা হাসি হঠাৎ তাকে প্রেরণা জোগায়, সে বলে, ছ-ফুট একজনকে সঙ্গে এনেছ, হঠাৎ তুমি বলতে কি সাহস হয় ?

সকলে হাসে।

ঝরণা বলে, আমায় খোঁচা দেওয়া হল। আজ পর্যন্ত পাঁচ ফুট একজন সঙ্গীও জোটাতে পারিনি।

মোহন স্বস্তি বোধ করে। খুশিও হয়। গ্রামের স্ত্রীলোক গালাগালি দেয়, ক্ষমাও করে নীরবেই। এরা চোখের দৃষ্টিতে শাসন করে আবার ক্ষমাও করে।

পরে সে চিন্ময়কে ব্যাপারটা বলে। সরলভাবে প্রাণ খুলিয়া বলে।

এমন লজ্জা পেলাম ভাই ! আমার মনে কিছু নেই, অবাক হয়ে দেখছিলাম যে কায়দা জানলে কত সিম্পলভাবে রূপকে কী আশ্চর্য রকম ফুটিয়ে তোলা যায়। গেঁয়ো মানুষ, খেয়াল ছিল না, ও ভাবে তাকাতে নেই।

তাকালে দোষটা কি ? এ হল ঝরণাব ন্যাকামি। সবাই দেখবে বলেই তো সাজগোজ করেছে ! সোজাসুজি খোলাখুলি স্পষ্টভাবে চেয়ে দেখলেই বুঝি দোষ হয়ে গেল ?

একটু থামিয়া চিন্ময় নালিশের সুরে আবার বলে, তোমার কাছে গ্রামের সব কিছুই খারাপ। কেউ অসভ্যতা করলে মেয়েরা সোজাসুজি গালাগালি দেবে—সেটাই তো উচিত। কিন্তু ও রকম কি সত্যি ঘটে ? আমি তো দেখেছি একঘাটে মেয়েপুরুষ কয়েক হাত তফাতে নাইছে—পুরুষেরা আগাগোড়া মেয়েদের দিকে পিছন ফিবে থাকে, তাও দেখেছি।

মোহন বলে, তা না হলে কি চলে ? সবাইকে পুকুরেই নাইতে যেতে হবে। কাজেই ও রকম নিয়মনীতি দরকার। মেয়েরা নাইছে বলে তুমি এক ঘণ্টা হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? ওদের দিকে পিছন ফিরে একটু তফাতে তোমার নাওয়ার কাজ সেরে তুমি চলে যাও !

চিন্ময় খুশি হইয়া বলে, তবে ? দ্যাখো তো কী সহজ সুন্দর নিয়ম।

পরদিন চিন্ময় একটি বাড়ির খবর দিল।

জগদানন্দ নামে এক ধনী আছে, তার গোটাকয়েক বাড়ি আছে কলিকাতায়। চিন্ময়ের বাড়ি শহরের যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলেই তার একটি বাড়ি খালি আছে, একটু ঘুরিয়া যাইতে না হইলে চিন্ময়ের বাড়ি হইতে এ বাড়িতে হাঁটিয়া আসিতে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগিত না।

বাড়ি দেখিয়া মোহনের খুব পছন্দ হইয়া গেল। আধুনিক ধাঁচের নতুন বাড়ি, জ্যামিতিক গঠন-বৈচিত্র্যে একটু ধাঁধার মতো।

ভাড়ার অঙ্কটা শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল না। এ এলাকায় এ রকম একটা বাড়ির ভাড়া যে বেশি দিতে হইবে এটা তার জানাই ছিল।

পরদিন মোহন বাড়ি ফিরিয়া গেল। বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলিয়াছে চিন্ময়, বাড়িটা ভাড়া করার ব্যবস্থাও সেই করিবে।

তিন

বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মোহন খুব সমারোহ করিল।

দেশে এই তার শেষ সামাজিক কাজ, সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পরেও বহুদিন যেন মানুষ তার প্রশংসা করে।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসিল, বন্ধু-বান্ধবেরা আসিল, একটি বৃষ উৎসর্গ করা হইল, নানা জাতের আরও অনেক লোক ছাড়া শুধু ব্রাহ্মণই ভোজন করিল সাড়ে সাতশো, দু হাজার কাঙালির পেট জীবনে হয়তো এই প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার ভরার মতো ভরিয়া গেল।

চিন্ময় আসিয়া তিনদিন থাকিয়া গেল। এত টাকা খরচ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধে এমন সমারোহ করিয়াও বন্ধুর কাছে সে কিন্তু প্রশংসা পাইল না।

চিন্ময় স্পষ্টই বলিল, লোকজন খাওয়াচ্ছ তাতে কিছু বলার নেই। বাজে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এত টাকা নষ্ট করার মানে হয় ?

না করলে লোকে নিন্দা করবে।

আত্মীয়েরা সকলে বিদায় নেওয়ার আগেই মোহন আর একবার কলিকাতায় গেল। টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলমারি, কাচ ও চিনা মাটির বাসন, কার্পেট, পর্দা, আলো, পাখা ইত্যাদি অনেক রকম জিনিস কিনিয়া ভাড়াটে বাড়িটি ছবির মতো সাজাইয়া ফিরিয়া আসিল।

দেশের বাড়ি হইতে সেকেলে জমকালো চেহারার তিনটি খাট আর বাছা বাছা কয়েকটি আসবাব ও জিনিস কেবল নেওয়া হইবে। বাকি অধিকাংশই গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। শহরের সে বাড়িতে সেগুলি মানাইবে না।

লাবণ্যশ্রী চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলিল, বাক্‌সো নেব না ?

নেব। কিন্তু খাটের নীচে ঘরের কোণে পাহাড় করে রাখতে পাবে না। সব একটা গুদাম ঘরে থাকবে।

একটা রুমাল বার করতে গুদাম ঘরে যাব ?

সর্বদা যা দরকার, সে সব কি আর বাক্‌সে থাকবে ? রুমাল থাকবে তো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে, আরও অনেক কিছু থাকবে। ড্রেসিং টেবিলটা কিনেছি তোমার জন্যে—

স্বামীর পছন্দে কিন্তু লাবণ্যশ্রীর একেবারেই বিশ্বাস নাই।

একবারটি আমায় দেখিয়ে কিনলে পারতে। সত্যি বড়ো ব্যস্তবাগীশ মানুষ তুমি !

লাবণ্যের রূপে এমন একটা কোমলতা আছে যে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তার বড়ো জমকালো রঙিন শাড়ি পরার শখ, ঘষিয়া মাজিয়া ক্রিম-পাউডার দিয়া রূপকে তীক্ষ্ণ করার দুরন্ত সাধ। প্রক্রিয়াটা মোহন পছন্দ করে কিন্তু ফলটা তাকে দমাইয়া দেয়। সন্ধ্যা কীভাবে প্রসাধন করিত সে জানে না, মনে হইত উজ্জ্বল হইয়াও মুখখানা যেন তার কোমল হইয়াছে। অল্প প্রসাধনের পরে লাবণ্যের মুখখানা শুধু চকচকে হয়, শ্রী থাকে না। হয়তো লাবণ্যের মুখ সন্ধ্যার মুখ নয় বলিয়া। অথবা হয়তো নিজের রূপকে ঘষামাজা করার কলা কৌশল লাবণ্য জানে না। তবু রূপ যে ভারে কাটে না লাবণ্যের ধারে কাটে, এটা জানা থাকায় মোহন মুখ মাজাঘষার চেষ্টায় স্ত্রীকে প্রশ্রয় দেয়, উৎসাহও দেয়।

শহরে যাইতে লাবণ্যেরও খুব আগ্রহ এবং উৎসাহ।

ধরিতে গেলে তার পরাধীন বধূজীবনের অন্ত হইয়াছে, মোহন কর্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও সংসারের কর্ত্রী হইয়াছে, রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ছেলের বউ যেমন রানি হয়।

কিন্তু এতদিন ধরিয়া শাশুড়ি ননদ গুরুজনদের কাছে ভীরু লাজুক বউ সাজিয়া থাকা এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে মোহনের হুকুমেও সে নিজেকে বদলাইতে পারিতেছে না, বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না নিজের নূতন পদমর্যাদার। নূতন জায়গায় নূতন বাড়িতে গেলে হয়তো কাজটা সহজ হইতে পারে। ক্রমাগত যে দায়িত্বের কথা বলিয়া মোহন তার মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে, সে দায়িত্ব হয়তো সেখানে পালন করা কঠিন হইবে না।

আরও একটা কারণ আছে তার উৎসাহের।

সে কারণটাও তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যাওয়ার চার-পাঁচদিন আগে সে মোহনকে খুশির সঙ্গে বলে, এক হিসেবে ভালোই হবে, একটু ভালোরকম চিকিৎসা হবে আমার। এ ব্যথা সত্যি আর সইতে পারি না।

মোহন সায় দিয়া বলে, হ্যাঁ, আমিও সে কথা ভেবে রেখেছি, একজন ভালো ডাক্তার দেখাব তোমাকে।

বেশ বড়ো একজনকে দেখিয়ো, সস্তায় সেরো না। একশো টাকা ভিজিট লাগে, দিয়ো ! এখন তো তোমার হাত।

মোহন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, আবার ? আবার এ ভাবে কথা বলছ ? এমন করে কথা বলো তুমি, তোমার যেন কোনো দাবি নেই, অধিকার নেই। তুমি না লেখাপড়া শিখেছ ?

পরীক্ষা দিলে অনার্স পেতাম—ফার্স্ট ক্লাস। দিতে দিলে কই ? লাবণ্য মুচকিয়া হাসে।

এই একটিমাত্র ভরসা তার সম্বন্ধে মোহন করে, তার কিছু পড়াশোনা করা আছে। তার গরিব বাপ মেয়েকে স্কুল কলেজে পড়াইতে, তালি দেওয়া জুতাজামা পরিয়া দিন কাটাইয়াছে। এটা অবশ্য তার কন্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ অথবা উদারতার প্রমাণ নয়—আরও অনেকেই যে হিসাবে মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়, তারও ছিল সেই একই হিসাব। লেখাপড়া জানা মেয়ের ভালো পাত্র জোটে, বিবাহে খরচ কম লাগে, বিবাহের সময় যে মোটা টাকা লাগিবেই, সেটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে অল্পে অল্পে খরচ কবিয়া গেলে দোষ কি ?

মোহনকে জামাই করার সময় বোধ হয় ভদ্রলোকের ভুল ভাঙিয়াছে।

মোটা টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে, লাবণ্যের মার গায়ে একখানা গয়নাও অবশিষ্ট নাই, দুহাতে শুধু দুটি সোনা বাঁধানো শাঁখা !

তবে এ কথাও সত্য যে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখাইলে মোহনকে জামাই করার ভাগ্য তার হইত না।

মোহনের বাপের জন্য লাবণ্যের কলেজে পড়া বন্ধ হইয়াছিল, পিছনে সায় ছিল মার। এ বিষয়ে ছেলের সঙ্গে সে আপস করে নাই। কলেজে পড়া মেয়ে আনিয়াছে তাই যথেষ্ট—এবাব তাকে অন্তঃপুরে বউ হইয়াই থাকিতে হইবে।

মোহন তাকে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করিতে দেয় নাই—কর্মহীন অলস দিন কাটাইতে লাবণ্যও বই পড়া একটা অবলম্বন করিয়াছে।

মোহন বই কেনে, লাবণ্য পড়ে। ইংরাজি সাহিত্য সে বোধ হয় বেশিই জানে মোহনের চেয়ে। কখন যে পড়ে, মোহন ভালো বুঝিতে পারে না। নূতন বই নিজের শেষ হওয়ার আগে সে উৎসাহের সঙ্গে তাগিদ দিয়া বলে, তাড়াতাড়ি পড়ে নিয়ো, আলোচনা করব—

লাবণ্য বলে, পড়েছি। শেষ বয়সের লেখা বোঝা যায়।

অন্য সব দিকে লাবণ্য তাকে হতাশ করিয়াছে।

তার খানিকটা ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস, কারণে অকারণে হাসি-কান্নার মধ্যে যার প্রকাশ, বাকিটা পরের মুখ চাওয়া পরাধীনতায় সন্তুষ্ট আড়াল-খোঁজা নিষ্ক্রিয় জড়তা। সময় সময় মনে হয়, ভয় ও

সংকোচে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে শ্যাওলা আর পানাভরা পুকুরের মতো, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষির বুদবুদ উঠে, ছোটোবড়ো মাছের মতো ভাঙা ভাঙা আত্মচেতনা লেজের ঝাপটায় একটু সময়ের জন্য পানা সরাইয়া দেয়।

এত বই পড়া, ইংরাজি সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করা তার মনের গড়ন, স্বভাব আর চালচলনে কোনো পরিবর্তনই যেন আনিতে পারে না।

ওইটুকু ভরসাই মোহনের আছে। পড়াশোনার প্রভাব চেতনায় পড়িবেই—শুধু পরিবেশের জন্য লাবণ্যের চেতনায় সে প্রভাবটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। পরিবেশ বদল হইলে সেটা নিশ্চয় আত্মপ্রকাশ করিবে।

রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগেও মোহন তাই ভাবে, সকলকে দেশের এই বাড়িতে রাখিয়া শুধু লাবণ্যকে নিয়া গেলেই বোধ হয় ভালো হইত। আত্মীয়-পরিজন আর কেউ অবশ্য যাইবে না, শুধু তার মা আর ভাইবোন। ওদেরও রাখিয়া যাওয়াই হয়তো উচিত ছিল। কেবল সে আর লাবণ্য, আর কেউ নয়। একা থাকিলে নিজেকে হয়তো লাবণ্য খুঁজিয়া পাইত। কে কী মনে করিবে সর্বদা ভাবিতে না হওয়ায় সে নিজের কথা ভাবিবার অবসর পাইত।

কিন্তু তার নিজের বড়ো মন কেমন করিবে মা আর ভাইবোনদের জন্য ! ওদের রাখিয়া বউ নিয়া কলিকাতায় বাস করিলে লোকে নিন্দাও করিবে।

গ্রামের দুজন মানুষ মরিয়ার মতো মনোমোহনকে ধরিয়া বসিল, যে তারাও তার সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে।

পীতাম্বর এবং শ্রীপতি কামার।

সারাদিন শ্রীপতি হাপর চালায়, দা কুড়াল কাস্তে শাবল লাঙলের ফলা এই সব টুকিটাকি লোহার জিনিস গড়ে, কোনোরকমে তার দিন চলিয়া যায়। খুব কষ্টেই চলে, তবু সে বেকার নয়। তাই মোহন আশ্চর্য হইয়া বলে, তুই কলকাতা গিয়ে করবি কি ?

আজ্ঞে পয়সা কামাব। এমন করে কদিন চলে ? খেটে দেহ ক্ষয়ে গেল, দুটো পয়সা জোটে না। লোহার দাম চড়ে, দা-কুড়ালের দাম চড়ালে কেউ কিনবে না। বাপটার মরণ ছিল না, ব্যাবসা শিখিয়ে গেছে।

শ্রীপতির বাপ অনেককাল মরিয়া গিয়াছে।

পয়সা কামাবি কী করে ?

কারখানায় খাটব। হেথায় হাতুড়ি পিটি, সেথায় পিটাব। মজুরি তো মিলবে ! দা গড়ে ঘরে ঘরে সাধতে হবে না, হাটে গিয়ে হা-পিত্যেশ করে খদ্দেরের পথ চেয়ে থাকতে হবে না ! আমারে নেন কর্তা সাথে।

বলিতে বলিতে সটান উপুড় হইয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া দুহাতে সে মোহনের পা জড়াইয়া ধরিল।

পা ছাড় শ্রীপতি। আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললি তো তুই আমাকে।

শ্রীপতি কিছুতে পা ছাড়িবে না।

ফেসাদ করব না কর্তা। দায় ঘাড়ে চাপাব তেমন মানুষ নই। কিছু না করতে পারি, ফিরে আসব।

অগত্যা মোহনকে রাজি হইতে হইল।

পীতাম্বর আসিল একদিন একটু বেশি রাত্রে—চুপি চুপি চোরের মতো আসিল। গ্রামের পথে তখন লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কর্মচারী দুজনকে ছুটি দিয়া মোহন বাহিরের ঘরে হিসাবপত্র দেখিতেছিল, চোখ তুলিয়া দ্যাখে নিঃশব্দে ছায়ার মতো কখন পীতাম্বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পীতাম্বর ভূমিকা করিল অনেক। বলিল, ওদের কথা শুনো না বাবা, আমি তোমার হিতৈষী। ওরা মিথ্যে করে রটায় আমি তোমার পূর্বপুরুষের নিন্দে করি। আমার দরকার নিন্দে করে ? তিনপুরুষ আগে কি ঘটেছে না ঘটেছে, সত্যি না মিথ্যে ঠিক নেই, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় ? দশজনের কাছে আমি তোমার প্রশংসা করি, তোমার ভালোই চাই বাবা। কেন ভালো চাইব না ? সংসারে কটা মানুষ মেলে তোমার মতো ?

তারপর বলিল, একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি তোমার কাছে, মুখ ফুটে বলতে ভরসা পাচ্ছি না বাবা।

বলুন না, আমার সাধ্য থাকলে করব।

আমায় তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো।

আপনি কলকাতা যেতে চান ?

হ্যাঁ বাবা, নিয়ে চলো আমাকে।

পীতাম্বরের মুখের অসহায় দীনভাবে এখন আর একটুও অভিনয়ের ছাপ থাকে না, ব্যাকুলতার মধ্যে তার সরলতা স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে বলে, শোনো বলি তোমাকে, তিনদিন হাতে একটি পয়সা নেই, ঘরে এক মুঠো চাল নেই।

কলকাতা গিয়ে করবেন কি ?

পয়সা কামাব। একটা দুটো মাস একটু মাথা গুঁজে থাকতে দিয়ো, একটা উপায় করে নেব। শহরের পথে পয়সা ছড়ানো থাকে। কাজকম্মো না পাই, ভিক্ষে করব। গাঁয়ে আমার ভিক্ষে করার পর্যন্ত উপায় নেই।

উদ্দেশ্য দুজনেরই ভালো। অবস্থার উন্নতি করিতে চায়। মোহন রাজি হইয়া গেল। এরা সঙ্গে গেলে বিশেষ ক্ষতিও নাই, অসুবিধাও নাই। এরা আত্মীয়স্বজন নয়।

বাড়ির পিছন দিকে ঠাকুর চাকরের ঘরের পাশে একটা ছোটো বাড়তি ঘর আছে, দুজনে সেখানে থাকিতে পারিবে। উপার্জনের ব্যবস্থা যদি করিতে না পারে, দু-তিন মাস দেখিয়া গ্রামে বিদায় করিয়া দিলেই চলিবে !

রওনা হওয়ার আগের দিন অনেক রাত্রে গ্রামের লোকের চোখ এড়াইয়া পীতাম্বর আবার আসিল।

একসাথে যাওয়া হল না বাবা। আমার অদেষ্টটাই মন্দ। পাঁচুর জ্বর এসেছে। পরশু যাব।

পরশু যদি জ্বর না কমে ?

কমবে,—কালকেই ছেড়ে যাবে। গাড়ির ভাড়াটা বরং দিয়ে দাও আমাকে আজ, পরশু টিকিট কেটে রওনা হয়ে যাব।

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মোহন এবার মনে মনে হাসিল।

গ্রামের লোকের চোখের সামনে মোহনের সঙ্গে সে ট্রেনে উঠিতে চায় না, সকলে টের পাইয়া যাইবে মোহন তাকে দয়া করিয়া নিয়া যাইতেছে। মোহনের কাছে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা নেওয়া চলে, সে টাকা পূর্বপুরুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মোহনের দেয়, দেখা হইলে দশজনের সামনে তার সঙ্গে ভদ্রতা রাখিয়া কথাও বলা চলে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দয়া তো গ্রহণ করা চলে না, ভাব তো করা চলে না তার সঙ্গে—এত গালাগালি ও অভিশাপ দিবার পর !

লোকে ভাবিবে পীতাম্বরের এতটুকু তেজ নাই।

রওনা হওয়ার দিন পাশের গাঁয়ে ছিল হাট।

বোঝাই গোরুব গাড়ি আর মানুষ হাটের দিকে চলিতেছে, সকলে জমিলে তবে হাট জমিবে। ছদিন হাটের আটচালাগুলি আর চারিপাশের জায়গা খালি পড়িয়া থাকে, প্রতি বুধবার সেখানে মানুষের ভিড় জমে। বাহির হইতে মানুষের ভিড় বড়ো এলোমেলো মনে হয়, যে যেখানে পারে বেসাতি নিয়া বসিয়াছে, যে যেদিকে পারে চলিতেছে, কোনো নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু ভিতরে গেলে দেখা যায় দোকান-পাটের মধ্যে চলিবার পথ আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা বিভিন্নমুখী অনেক পথ।

বেচিবার জন্য বেসাতি নিয়া বসিবার স্থানও সকলেব বহুকাল ধরিয়া সুনির্দিষ্ট হইযা আছে।

সকলে তাদের গাড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে যায়। মোহন ভাবে, সপ্তাহে এরা একদিন হাটে যায়, আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। রাত্রি বাড়িতে বাড়িতে এক সময় হাট জনশূন্য হইয়া যায়। কলকাতার হাটে বোমা পড়িতে থাকিলেও এবং বহু লোক পালাইয়া গেলেও টের পাওয়া যায় না হাটের ভিড়ের চাপ একটু কম হইয়াছে। শহরের হাট ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া গিয়াছে, এমনিভাবে শহরের মানুষের সেখানে সকলে শিকড় গাড়িয়াছে।.

ট্রেনে মোহন একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়াছিল। চিন্ময় স্টেশনে আসিতে পাবে। রিজার্ভ করা সেকেন্ড ক্লাস কামরা হইতে ছাড়া মান বজায় রাখিয়া তার সামনে নামা যায় না।

মা ম্লানমুখে এক কোণে বসিয়া থাকেন। লাবণ্য আর নলিনী পাশাপাশি বসিয়া মুখ দিয়া কথা বলে আর চোখ দিয়া বাহিবের দৃশ্য দেখিতে থাকে। খুকি এ জানালা ও জানালা করিয়া বেড়ায়। মার কাছে বসিয়া খোকা জানালার কলকব্জা পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকে।

নগেন অনেকক্ষণ হইতে উশখুশ করিতেছিল, একটা স্টেশনে গাড়ি থামিতে সে হঠাৎ নামিয়া গেল।

গাড়ি ছেড়ে দেবে নগেন।

পাশের কামরায় উঠছি। পরের স্টেশনে আসব।

মা ও দাদার সামনে অনেকক্ষণ সে সিগারেট টানিতে পারে নাই। নতুন সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে, নেশা বড়ো প্রবল। কলিকাতায় একেবারে বাড়িতে পৌঁছানোব আগে নির্জনে সিগারেটে টান দেওয়াব সুযোগ জুটিবে না ভাবিয়া সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে যে সিগারেট খায় কেউ জানে না, হঠাৎ পাশের কামরায় যাওয়ার কারণটা কেউ অনুমান করিতে পারিবে না। পাগলামি মনে করিয়া বড়ো জোব একটু বিরক্ত হইবে।

মোহন জোরে ধমক দিয়া বলিল, উঠে আয় নগেন, শিগগিব আয়। গাড়ি ছাড়ল।

নগেন মুখ ভার করিয়া উঠিয়া আসিল।

সিগারেট খাবি তো ? এখানে বসে খা। খাচ্ছিস যখন, এত লুকোচুরি কীসের ?

নগেন বিবর্ণমুখে বসিয়া থাকে, মোহন পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া একটু ইতস্তত করে, তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরাইয়া কেসটা আবার পকেটে রাখিয়া দেয়।

কলেজে ঢুকিয়াই এত অল্প বয়সে সিগারেট খাইতে শেখা নগেনের উচিত হয় নাই, তবে শিখিয়াছে যখন চোরের মতো ভয়ে ভয়ে আড়ালে না খাইয়া সামনেই খাক। নিজেই তাকে একটা সিগারেট দিয়া মোহন তার লজ্জা ভয় ভাঙিয়া দিবে ভাবিয়াছিল।

দেওয়ার সময় হাত আগাইল না।

শুধু তাই নয়, মার সামনে নিজেও সে আজ পর্যন্ত কোনোদিন সিগারেট টানে নাই, নিজেরও তার এখন দারুণ অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। সামনে ধূমপান করিলে গুরুজনের অমর্যাদা হয়, এ শুধু অর্থহীন গেঁয়ো সংস্কার, তবু মার দিকে খানিকটা পিছন ফিরিয়া না বসিয়া সে পারে না, কয়েকবার

টান দিয়াই সিগারেটটা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। নিজেকে এই বলিয়া বুঝায় যে, মা তো এখনও তার যুক্তিতর্কের খোঁজ রাখে না, মা হয়তো মনে করিবে ছেলে তাকে অবজ্ঞা করিতেছে। মিছামিছি মার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি ? কথাটা আগে মাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তারপর সামনে যত খুশি চুরুট সিগারেট টানিলেই হইবে।

আর খাব না দাদা !

মাথা নিচু করিয়া নগেন বসিয়া আছে ধরা-পড়া চোরের মতো। সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দেওয়াকে নগেন তবে ক্রুদ্ধ দাদার ভর্ৎসনা মনে করিয়া লজ্জায় অনুতাপে কাবু হইয়া পড়িয়াছে !

তাই স্বাভাবিক বটে !

এতক্ষণ সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, যাত্রা আরম্ভ করা মাত্র পারিবারিক জীবনটা তার নূতন রীতিনীতিতে চলিতে আরম্ভ করে নাই, সকলের চেতনা নূতনভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা এতকাল যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। মার মতো ওকেও বুঝাইয়া পড়াইয়া না নিলে তার কথা ও কাজের ভুল মানে বুঝিবার সম্ভাবনা পদে পদে রহিয়া গিয়াছে। কেবল ওদের দুজনকে নয়, সকলকে বুঝাইতে হইবে। সকলের চিন্তাধারাকেই তার নতুন পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। নতুবা সে কী ভাবিয়া কী বলে আর করে, ওরা বুঝিতে পারিবে না।

চিন্তাটা তাকে পীড়ন করে। মনে হয়, নূতন একটা স্টেজে অভিনয় করার জন্য সকলকে সে যেন নিয়া চলিয়াছে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় করিতে শেখানোর ভারটাও তার !

চিন্ময় স্টেশনে আসে নাই। স্টেশনের কুলিরাই তাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানায়।

লাবণ্য মুখ বাঁকাইয়া বলে, বন্ধু ! তোমার শহুরে বন্ধু !

অনেকদিন আগে চিঠিতে চিন্ময় তাকে ইঙ্গিতে গেঁয়ো বলিয়াছিল, বলিয়াছিল তাকে প্রশংসা করিবার জন্যই, কিন্তু লাবণ্য করিয়াছিল রাগ। লাবণ্য কি এখনও তাহা ভোলে নাই ?

চিন্ময় স্টেশনে আসিবে বলে নাই, মোহনও তাকে স্টেশনে হাজির থাকিতে লেখে নাই। কবে কোন ট্রেনে কখন তারা পৌঁছিবে শুধু এই খবরটা তাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই মোহন প্রত্যাশা করিতেছিল সে নিশ্চয়ই সাগ্রহে তাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিবে।

গ্রামের কত লোক তাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিতে সঙ্গে আসিয়াছিল, অনেকের চোখ সে ছল-ছল করিতে দেখিয়াছে।

এখানে তার বন্ধু আছে মোটে একজন, সেও তাকে নামাইয়া নিতে স্টেশনে আসিল না ?

চিন্ময় ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছে, কাজের জন্য আপিসের পয়সায় তাকে যখন তখন বোম্বে মাদ্রাজ ছুটিতে হয়। সকালে ট্রেনে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় নামা হয়তো তার কাছে কতকটা ট্রামে বাসে ওঠা-নামার মতো। তবু রাগ হয়, তবু মনে হয় তার আসা উচিত ছিল।

বাড়ি পৌঁছিতে রাত প্রায় নটা বাজিয়া গেল। আধঘণ্টা পরে আসিল চিন্ময়ের ভাই মৃন্ময়।

চিন্ময় কাল হঠাৎ পাটনা চলিয়া গিয়াছে, তাদের দেখাশোনা করার ভার সে দিয়া গিয়াছে মৃন্ময়কে। কখন তারা পৌঁছিবে চিন্ময় কিছু বলিয়া যায় নাই, তারও জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতে খেয়াল ছিল না, বিকাল হইতে এবাড়ি ওবাড়ি করিতে করিতে বেচারা একেবারে হয়রান হইয়া গিয়াছে।

আমি গিয়ে আপনাদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নগেনের সমবয়সি ছেলে, ছিপছিপে রোগা চেহারা, খুব লাজুক। চোখ তুলিয়া কারও চোখের দিকে চাহিতে পারে না। সে যেন লাজুক মেয়ে, মোহন যেন তার নূতন বর, লজ্জা ভয়ে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকদিন মোহন তাকে দেখে নাই, একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিছুদিন আগে কলকাতা আসিয়া সে দুরাত্রি ওদের বাড়ি খাইয়াছে, মৃন্ময় হয়তো বাড়িতেই ছিল কিন্তু সামনে না আসিয়া আড়ালে লুকাইয়া ছিল। ছেলেটার পক্ষে তাও অসম্ভব মনে হয় না !

মোহন মমতার সঙ্গে বলিল, টাইম টেবল দেখলেই জানতে পারতে কখন পৌঁছব।

টাইম টেবল ? ভুলে গেছি।

একটা চাকরকে এ বাড়িতে বসিয়ে রাখলেও পারতে। বারবার তোমাকে খোঁজ নিতে আসতে হত না।

চাকর ? খেয়াল হয়নি তো !

মৃন্ময় লজ্জার সঙ্গে অপরাধীর মতো একটু হাসিল—আমি যাই, খাবারটা পাঠিয়ে দিই। আর যদি কোনো দরকার থাকে— ?

পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে !

স্নেহ করার অধিকার যাদের আছে তাদের সঙ্গ তাকে পীড়ন করে। স্নেহের সুরে কেউ কথা বলিলে তার ভিতরটা কেমন অস্থির অস্থির করিতে থাকে, মাথা গুলাইয়া যায়। এই অবস্থায় তার কথায় একটু তোতলামির ভাব দেখা দেয়, একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুহূর্তের জন্য পরের শব্দটি বুঝি কোথায় হারাইয়া যায়, জিভ দিয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া আনিতে হয়।

মোটামুটিভাবে জিনিসপত্র একটু গুছাইয়া সকলের শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া বেশি রাত্রে মোহন নিজে যখন শুইতে গেল, মৃন্ময়ের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে যন্ত্রণার ছাপটা তখনও তার মনে আছে।

পরিশ্রমে নয় শহর যাত্রার উত্তেজনায় সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শোয়া মাত্র তারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—মোহনের ঘুম আসিতে একটু দেরি হয়। মৃন্ময়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে নগেনের কথা চিন্তা করে। হোস্টেলে থাকিয়া নগেন মফস্বলের কলেজে পড়িতেছিল, দেশের বাড়ি হইতে তিন-চার ঘণ্টার পথ। এবার তাকে কলকাতার কলেজে ভর্তি না করিয়া যেখানে ছিল সেখানে রাখিলে কেমন হয় ? উঠতি বয়সে মফস্বলের শহরের অবাধ আলো-বাতাস আর খোলা মাঠ ছেলেদের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, শান্ত আবেষ্টনী মনকে সুস্থ রাখে। কিন্তু কেউ বোধ হয় এ প্রস্তাবে রাজি হইবে না। নিজে সে পচা-ডোবা বনজঙ্গল কাদা আর মশাভরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এখানে বাড়িতে থাকিয়া কলেজে পড়ায় সুবিধা থাকিতে নগেনকে দূরে হোস্টেলে গিয়া থাকিতে বলিবে কোন মুখে ?

নগেনের ভালোর জন্যই সে যে তাকে ওখানে রাখিয়া পড়াইতে চায়, তার এ যুক্তির মানেও কেহ বুঝিবে না। বিশেষত মা।

পরদিন সকালে মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক আসিল। বলিল, আমি আপনার বাড়িওয়ালা। পরিচয় করতে এলাম।

মোহন একটু অভিভূত হইয়া বলিল, আসুন ! বসুন।

কোথায় সে যেন এইরকম একটি মূর্তিমান আভিজাত্যের মতো জমকালো চেহারার মানুষ দেখিয়াছে। মনের মধ্যে গভীর ভয় ও শ্রদ্ধায় আজও সেই মানুষটা জড়াইয়া আছে, তার স্মৃতিটা পরিণত হইয়া গিয়াছে অনুভূতিতে। কে সে ? কবে কোথায় সে তাকে দেখিয়াছিল ?

জগদানন্দ বসিল।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বলিল, পরিচয় করার এত আগ্রহ কেন বলি। বাড়িটার ভাড়াটে জুটছিল না। এ রকম বাড়ি পছন্দ করার মতো টেস্ট যাদের আছে, আর এত টাকা ভাড়া যারা দিতে

পারে, তারা নিজেরাই বাড়ি তৈরি করে বাস করে। তাই একটু কৌতূহল হচ্ছিল, বাড়িটা যিনি পছন্দ করে ভাড়া নিলেন, তিনি মানুষটা কেমন দেখে যাই।

ধীর স্পষ্ট কথা, বেশ বুঝা যায় বক্তব্যকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই তার অভ্যাস। মোহন জানে এ ভাবে যারা কথা বলে তারা ধৈর্যশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষ হয়।

বেশ বাড়িটি আপনার। সকলের পছন্দ হয়েছে।

জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করে, জমি কেনা আছে নিশ্চয় ?

মোহন হাসিল।—না। তবে কিনবার ইচ্ছা আছে।

জগদানন্দ হাসিমুখে মাথা হেলাইয়া সায় দিল, তাহলে বছর খানেক থাকবেন আশা করা যায়।

ধীরে ধীরে দুজনের আলাপ চলিতে থাকে। পরিচয় গড়িয়া উঠিতে থাকে অত্যন্ত মন্থরগতিতে কিন্তু দৃঢ়ভাবে। একজন আর একজনকে যতটুকু জানিতে পারে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। মোহনের ভালোই লাগে। তার অনেক কাজ ছিল, সেগুলি স্থগিত রাখিতে হইলেও মনে হয় না বাজে গল্পে সময় নষ্ট হইতেছে।

মোহনের কলিকাতায় বাস করিতে আসাকে সমর্থন করিয়া জগদানন্দ বলে, বেশ করেছেন। এ সব ইচ্ছাকে হাঙ্গামা বা অসুবিধার ভয়ে দমন করতে নেই। গ্রামে থাকতে ভালো না লাগলে গ্রামে পড়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। তখন শহরে আসাই ভালো।

গ্রামের ক্ষতি হয়।

কেন ? আপনি চলে আসাতে গ্রামের কী ক্ষতি হয়েছে ? লোকে বলে শুনতে পাই শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসে বলে গ্রামের আরও অবনতি হয়। আমি তার মানে বুঝতে পারি না ভাই। শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রামে থেকে গ্রামের এতটুকু উন্নতি করে ? কোন দেশে করেছে ? শিক্ষিতেরা বেকার বসে থাকে, ধনীরা টাকা খরচ করতে না পেরে টাকা আটকে রাখে। ওরা শহরে এলেই বরং দেশের উপকার বেশি। শহরের উন্নতির জন্য ওদের দরকার। শহরের উন্নতি না হলে গ্রামের কখনও উন্নতি হয় ?

বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার, কিন্তু মোহন বুঝিতে পারে না। তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া জগদানন্দ বলে, শহর মানে বড়ো বড়ো বাড়ি, ট্রাম বাস লোকের ভিড় নয়। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে প্রতিভাবান মানুষেরা যেখানে একত্র থাকে, সেটাই হল শহর। এদের দল যত বাড়ে ততই ভালো। শিক্ষিত আর ধনীরা শহরে না এলে এদের দল বাড়বে কী করে ?

এতক্ষণ পরে মোহন মনে মনে একটু রাগিয়া যায়। সে কি ছাত্র যে লোকটা বাড়ি আসিয়া তাকে পড়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে ? মানুষের এ সব ব্যক্তিগত উদ্ভট ধারণা চিরদিন তাকে পীড়ন করে।

আমি তিনখানা বই লিখেছি : ভারতবর্ষ ও সাম্যবাদ, ভারতের সংস্কার আন্দোলনের রূপ, আর বাংলায় শিল্পোন্নতির পথ। পড়েছেন ?

না। নামও শুনিনি।

জবাব শুনিয়া জগদানন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। বলিল, একেবারেই কাটছে না বই কটা। দাম বেশি করিনি, প্রত্যেক কপিতে চার আনা করে খরচ বেশি পড়েছে। তবু কেউ কিনতে চায় না। এমনি দিয়ে দিয়েই লোককে পড়াই। আপনাকেও দেব, পড়ে দেখবেন। জগদানন্দ হাসিল, তিনখানা বই কেউ পড়তে চায় না, তবু আর একটা লিখতে আরম্ভ করেছি—মানুষের ভবিষ্যৎ। চিন্তাগুলি লিখে তো রাখি, কেউ পড়ে তো পড়বে। সত্য বলে যা জানা যায় সকলকে শোনাবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, কি বলেন ?

প্রত্যেকে যদি শোনায়, শুনবে কে ?

সকলে শুনবে। যে নিজের কথা শোনায় অন্যের কথা শুনতে তো তার বাধা নেই। তা ছাড়া, সত্যের সন্ধান কটা লোকে পায় ? আমার নিজের ধারণা সত্য, এ বিশ্বাস কটা লোকের আছে ?

মোহন একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। মানুষটা জানিয়া শুনিয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছে না সরলভাবে মনের কথা বলিতেছে ঠিক বুঝিতে পারে না।

আলোচনা তাদের এবার অন্য দিকে গড়াইত অথবা আপনা হইতে থামিয়া যাইত বলা যায় না, একটা বাধা পড়িল। হাতকাটা ফরসা শার্ট গায়ে নতুন বাড়ির নতুন চাকর জ্যোতি খবর দিল, মা ডাকছেন।

মা ঠিক দরজার আড়ালেই ছিলেন, উৎসুক উত্তেজিতা মা।

উনি কে ?

মার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া মোহন বলিল, উনি আমাদের বাড়িওয়ালা জগৎবাবু।

জগৎ কি ?

জগদানন্দ ভটচাজ বোধ হয়।

জিজ্ঞেস করে আয় তো উনি শ্রীশ্রীপরমানন্দ ঠাকুরের ভাই নাকি ?

জিজ্ঞাসা করিয়া মোহনকে আর জবাবটা মাকে বলিয়া আসিতে হইল না, জগদানন্দ তার প্রশ্নের জবাব দেওয়ামাত্র মা নিজেই ঘরের মধ্যে আসিলেন। গলায় আঁচল দিয়া পায়ের জুতায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, জুতার ঠিক উপরে পায়ে আঙুল বুলাইয়া পায়ের ধুলা মাথায় দিলেন, জিভে ঠেকাইলেন।

আপনার দাদা আমাদের গুরুদেব ছিলেন।

জগদানন্দ বিব্রতভাবে বলিল, তা হবে তা হবে। আমাকে আবার প্রণাম করা কেন।

মার মুখের ভাব দেখিয়া মোহন বুঝিতে পারিল মা ভাবিতেছেন, এ কী আশ্চর্য ব্যাপার, বয়সে তিনি বড়ো বলিয়া গুরুদেবের ভাই তাঁর প্রণাম গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করিতেছেন !

আপনাদের বংশের ছোটো ছেলেটিও আমার নমস্য। আপনাদের পায়ের ধুলো ছাড়া তো আমাদের গতি নেই। অনেক জন্মের পুণ্য ছিল, না ডাকতে নিজে বাড়িতে পা দিয়েছেন। এ বেলা আপনাকে খেয়ে যেতে হবে, আমি প্রসাদ পাব।

এ বেলা ? এ বেলা তো হয় না। খাওয়ার জন্য কি, কাছেই তো আছি, আর একদিন খেয়ে যাব।

তবে দুটি ফল কেটে আনি ?

মোহন স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। তার মা গুরুদেবের ভাইকে প্রণাম করিতেছে, পুণ্যের জন্য পাতের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছে ! ভাগ্যে আজ চিন্ময় আসে নাই, এ সব দেখিয়া শুনিয়া না জানি সে কী ভাবিত !

ফল কেন, খাবার আর চা পাঠিয়ে দেবে যাও।

ছেলের রুক্ষ গলার আওয়াজে মা দমিয়া গেলেন। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন ভিতরে।

এখন পরমানন্দের কথা মোহনের মনে পড়িয়াছে। জগদানন্দের ব্রাশ করা চুল, পালিশ করা জুতা, জমকালো পোশাক বাধা না দিলে আগেই মনে পড়িত। মা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন। গুরুদেবের মূর্তি তাঁকে ধ্যান করিতে হয়, মোহনের মতো তাঁর মনে পরমানন্দের চেহারা ঝাপসা হইয়া যাইতে পারে নাই। কয়েকবার নিজেদের বাড়িতেই সে পরমানন্দকে দেখিয়াছে, শেষবার আট দশ

বছর আগে। সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে ব্যাঘ্র চর্মের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া থাকিতেন, বাড়িতে সকলে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিত, ফিস ফিস করিয়া কথা বলিত, শিশু কাঁদিয়া উঠিলে তার মা তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিত।

শেষদিন তিনি মোহনকে কাছে বসাইয়া একঘণ্টা ধরিয়া ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ দিয়াছিলেন—সকলের সামনে।

কত বয়স ছিল তখন মোহনের ? কুড়ি একুশের বেশি নয়। সে অভিজ্ঞতা মোহন জীবনে ভুলিবে না। সকলের সামনে পরমানন্দ যেন তাকে উলঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তার মনের গোপন স্মৃতি স্বপ্ন মেলিয়া ধরিয়াছেন সকলের কাছে, দুঃশাসনের চেয়ে তিনি নিষ্ঠুর।

আমারও আপনাকে চেনা মনে হচ্ছিল। একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটেছে।

বেশি আর আশ্চর্য কি ? দাদার কুড়ি বাইশ হাজার শিষ্য ছিল। আমাদের দু ভায়ের চেহারারও অনেক মিল ছিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া একটু মুখ বাঁকাইয়া সে কাপটা নামাইয়া রাখে। মোহন বিরক্ত হইয়া ভাবে, মার সঙ্গে আর পারা গেল না। দামি চায়ের সেট কিনিয়া দিয়াছে, লিকার দুধ চিনি কোথায় ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পাঠাইয়া দিবে, একেবারে কাপে চা তৈরি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। এ যেন গ্রামের চা-পিপাসু হালদার আসিয়াছে, খানিকটা গরম শরবত করিয়া দিলেই তার তৃপ্তি হইবে।

আবার জ্যোতি আসে। এবার লাবণ্য ডাকিতেছে।

মা গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। লাবণ্য বলে একটু ভয়ে ভয়ে, বিব্রতভাবে।

প্রণাম নয়, নমস্কার করবে। চলো পরিচয় করিয়ে দিই। মোহন জোর দিয়া বলে।

মা যা খুশি করুন, তাঁর অজুহাত আছে, তিনি সেকেলে মানুষ। শ্বশুর শাশুড়ির গুরুদেবের ভাই বলিয়াই একটা মানুষের কাছে স্ত্রীকে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিতে দেওয়া যায় না।

স্বামীর নির্দেশ মতো অভিনয় করিয়া লাবণ্য সবে বসিয়াছে, মা আসিলেন।

প্রণাম করেছ বউমা ?

জগদানন্দ বলে, থাক থাক, প্রণাম দরকার নেই।

লাবণ্য কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া থাকে। একবার সে যেন প্রণাম করার জন্য উঠিবার চেষ্টা করে, মোহনের দৃষ্টিপাতে সাহস পায় না। ছেলের রুক্ষ গলার কথা মা সহ্য করিয়াছিলেন, বউয়ের এ অবাধ্যতা তাঁর সহ্য হয় না।

সাধে কি তোমার এ অবস্থা হয়েছে বাছা ? পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, আজও পেটে ছেলে ধরতে পারলে না, শুয়ে শুয়ে ব্যথায় কাতরাও। আমরা হলে বিদ্যের অহংকারে ফেটে না পড়ে গলায় দড়ি দিতাম।

চার

পীতাম্বর বলিয়াছিল সে দুদিন পরে রওনা হইবে।

সাতদিন পরেও সে না আসায় মোহন যখন ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা আসিবার কথাটা তার ফাঁকি, ভাঁওতা দিয়া গাড়ি ভাড়া আর সংসার খরচ বাবদ কিছু টাকা আদায় করাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, পীতাম্বরের খবর পাওয়া গেল। বিনা টিকিটে কলকাতা আসিবার চেষ্টা করিতে গিয়া কয়েকদিনের জন্য হাজতে যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

হইয়াছে জরিমানা, সে টাকা না দিতে পারিলে অগত্যা হাজতবাস।

পীতাম্বর ভাবিতেও পারে নাই টিকিট না করার জন্য কাউকে রেল কোম্পানি আবার জেলে পাঠানোর হাঙ্গামা করিতে পারে। বড়ো জোর টানিয়া নামাইয়া দেয়, তার বেশি কিছু নয়। গাড়ি তো কলকাতায় যাইবেই, জায়গারও কোনো অভাব নাই গাড়িতে, একটা মানুষ বিনা টিকিটে উঠিলে কী এমন আসিয়া যায় কোম্পানির ? রাখাল সরকার কতবার ওভাবে কেতনপুর যাতায়াত করিয়াছে।

মোহন গিয়া তাকে ছাড়াইয়া আনিবার পর এই আপশোশটাই তার বড়ো দেখা গেল যে অন্য সকলে দিব্যি বিনা ভাড়ায় ট্রেনে চাপিয়া বেড়ায়, জীবনে একটিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া যায় কেবল সে। অদৃষ্টে কি যেন একটা প্যাঁচ আছে তার। দেবতাদের রাগ আছে তার উপর।

সব কিছুই তার ভাগ্যে মন্দ দাঁড়াইয়া যায়।

যে আমায় ধরল, সে লোকটা মন্দ নয়। বললে অন্য সময় হলে ছেড়ে দিত, হঠাৎ কদিন থেকে খুব কড়াকড়ি চলছে। মাঝে মাঝে নাকি দু চারদিন এমনই কড়া ব্যবস্থা চলে, তারপর আবার ঢিল পড়ে যায়। তা, কপাল যদি আমার মন্দ না হবে বাবা, আমি যখন আসব ঠিক সেই সময়টা ওদেরও জবরদস্তির সময় হয় ?

হাঙ্গামা করিতে হওয়ায় মোহন বিরক্ত হইয়াই ছিল, এবার রাগ করিয়া বলে, ভাড়া দিয়ে এলাম, বিনা টিকিটে আসবার আপনার কি দরকার ছিল ? যখন ধরল, তাড়াতাড়ি টিকিট কাটতে পারেননি বলে ডবল ভাড়া দিয়ে দিলেন না কেন ?

পীতাম্বর লজ্জিতভাবে বলে, ভাড়া কই বাবা ? সাত গন্ডা পয়সা সম্বল করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

মোহন চুপ করিয়া থাকে।

মেয়েটাকে আনালাম। এক বছর আনাতে পারিনি। প্রথম পোয়াতি মেয়ে, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে, গিন্নি কেঁদে কেটে অস্থির। গাড়ি ভাড়ার টাকাটাও রেখে এলাম, এটা ওটা খাওয়াতে পারবে মেয়েকে। নইলে বাঁচবে না মেয়েটা।

মোহন ভাবে, গরিবের কি আর অজুহাতের অভাব হয়। টাকাটা যে তাকে দেওয়া হইয়াছিল গাড়ি ভাড়া বাবদ, অন্যভাবে ও টাকা যে খরচ করা চলে না, এ যুক্তি পীতাম্বর বুঝিবে না।

শ্রীপতিকে জ্যোতির ঘরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, পাশের ছোটো ঘরটি দরকার হইয়াছে মার। পীতাম্বরকে কোথায় থাকিতে দেওয়া যায় মোহন মনে মনে তাই ভাবিতেছিল। গ্যারেজের সঙ্গে ছোটো একটি বাড়তি ঘর ছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া পীতাম্বর নিজেই সেখানে থাকিবে স্থির করিয়া ফেলিল। ঘর না বলিয়া খোপ বলাই ভালো, মাঝখানে শুইয়া দু হাত বাড়াইয়া দুদিকের দেওয়াল ছোঁয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে থাকিবার কথা বলিতে গিয়া মোহন চুপ করিয়া গেল। পীতাম্বরের গায়ে সাটিনের গলাবন্ধ ময়লা কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, সঙ্গে একটা রংচটা টিনের তোরঙ্গ আর শতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। তবু সে ভদ্রলোক। বাড়িতে ওকে নিজেদের মধ্যেও রাখা যায় না, চাকরবাকরের সঙ্গেও থাকিতে দেওয়া চলে না। তার চেয়ে এ ঘরে থাকাই ভালো।

তোমার আমি এতটুকু অসুবিধে করতে চাই না মোহন। আমি যে আছি তুমি টেরও পাবে না বাবা। যা তুমি করছ বুড়োর জন্যে অন্য কেউ কি করত ?

পীতাম্বর এই খোপটি বাছিয়া নেওয়ার পর তাকে বাড়ির মধ্যে থাকিতে দেওয়ার অসুবিধার কথাটা মোহনের মনে পড়িয়াছিল, আগে নয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তার মনের ভাব কি দাঁড়াইবে আগেই অনুমান করিয়া পীতাম্বর কি গ্যারেজে থাকা ঠিক করিয়াছে ? মানুষটার এতখানি বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের অস্তিত্বে মোহনের যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না।

শহরের জাঁকজমক, তার গৃহ ও গৃহসজ্জা পীতাম্বরকে এতটুকু অভিভূত করতে পারে নাই দেখিয়াও মোহন একটু ক্ষুণ্ণ হয়, এমন নির্বিকার অবহেলার সঙ্গে সে নূতন পরিবেশকে মানিয়া

নিয়াছে যে মনে হয় আরও বিরাট আরও অভিনব আরও বিস্ময়কর কিছু সে কল্পনা করিয়াছিল, মনের মতো না হওয়ায় বরং আশাভঙ্গের ব্যথা পাইয়াছে !

বাড়ির সকলে মহোৎসাহে চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম দেখিতে যায়, পাশ আনিয়া মনুমেন্টে ওঠে, নগেন প্রায় প্রতিদিন এবং তার সঙ্গে দু একদিন পরে পরে নলিনী সিনেমা দেখিতে যায়, কোনোদিন তাদের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার জন্য পীতাম্বর ভুলিয়াও অনুরোধ জানায় না। দামি একটি গাড়ি আসিয়া মোহনের শূন্য গ্যারেজ পূর্ণ করে, উত্তেজিত আনন্দে সকলে চারিদিকে পাক দিয়া দিয়া গাড়ির অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে, মোহন পুত্রস্নেহে বনেটে হাত বুলায়—পীতাম্বর স্মিতভাবে শুধু একটু হাসে, দুবার মাথা হেলাইয়া মোহনের গাড়ি কেনাকে সমর্থন জানায়, তারপর বিড়ি টানিতে টানিতে নিজের মনে কী যেন ভাবিতে থাকে।

নূতন গাড়িতে চাপিয়া একদিন শহরে একটু বেড়াইয়া আসার আগ্রহও তার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। শ্রীপতি সুযোগ আর স্থান পাইলেই জীবন সার্থক করিয়া নেয়, গাড়ি গ্যারেজ হইতে বাহির হইলে পীতাম্বর কখনও সামনে আসিয়া বলে না, চলো বাবা, আমিও একটু ঘুরে আসি।

একদিন মোহন গাড়িতে একা বাহির হইয়াছে, ভাবিয়াছে পথে গিয়া ঠিক করিবে কোথায় যাওয়া যায়। পীতাম্বরও বাহির হইয়া ফুটপাত ধরিয়া গুটিগুটি হাঁটিয়া চলিতেছিল। দেখিয়া মোহনের বড়ো মায়া হইল।

তার নতুন গাড়িতে চাপার সাধটা হয়তো বেচারা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা পায়, হয়তো সে কী মনে করিবে ভাবিয়া সাহস পায় না। নিজে যাচিয়া ওর সাধটা তার মেটানো উচিত।

গাড়ি থামে. ডাক শুনিয়া পীতাম্বর কাছে আসে। মোহন গভীর উদারতার সঙ্গে বলে, কোথায় যাচ্ছেন ? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলে, মোটরে চাপতে পারি না বাবা, কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।

তাকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি আগাইয়া যায়, মোহনের মৃদু বিরক্তি ধীরে ধীরে ভোঁতা ক্রোধে পরিণত হইতে থাকে। পীতাম্বরের অজুহাত সে বিশ্বাস করে না। যে গাড়িতে চোখ বুজিয়া থাকিলে সব সময় বুঝা যায় না গাড়িটা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে, তার সেই গাড়িতে চাপিলে ব্যাটার গা গুলাইবে !

এ শুধু পীতাম্বরের অহংকার। অনুগ্রহ নিতে তার অপমান বোধ হয়।

পীতাম্বরের অনেক চালচলনের মানে এখন যেন মোহনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায় ! তার বাড়িতে যে থাকিতে হইয়াছে এই লজ্জাতেই পীতাম্বর কাতর, প্রাণপণে সে নিজের সম্মান বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। গ্যারেজের ঘরটা বাছিয়া নেওয়ার কারণও তাই।

গলাবাজিতে গ্রামকে সে মুখর করিয়া রাখিত, এখানে আসিয়া একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছে। কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না, সর্বদা দূরে দূরে থাকে, সহানুভূতি চায় না, পরামর্শ চায় না, সুবিধা চায় না। সাত গন্ডা পয়সা সম্বল করিয়া সে বাড়ির বাহির হইয়াছিল, এ পর্যন্ত মোহনের কাছে একটি পয়সাও সাহায্য চায় নাই। সাত আনা কি খরচ হইয়া যায় নাই তার ?

গ্রামের লোকের চোখ এড়াইয়া অনেক রাতে গাড়িভাড়া ভিক্ষা চাহিতে আসার সঙ্গে এ সমস্তের একটা যেন মিল আছে।

এক সন্ন্যাসীর কথা মোহনের মনে পড়ে। ভিক্ষা করিতে দুয়ারে আসিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, বাড়ির মানুষ তাকে দেখিতে পায় নাই জানিয়াও একটি শব্দ করিত না, কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অন্য বাড়ির দুয়ারে চলিয়া যাইত। কি চাও ?—জিজ্ঞাসা করিলেও সে সাড়া দিত না, যেন শুনিতেই পায় নাই। ভিক্ষা সে চাহিতে আসিয়াছে, একমুষ্টি চাল, কিংবা একটি পয়সা তার প্রার্থনা, তবু কেউ তাকে ভিখারি ভাবিত না !

মোহন ভাবিয়া রাখে, বাড়ি ফিরিয়া আজ পীতাম্বরকে ডাকিয়া একটি টাকা দিবে, সকলের সামনে। না, এক টাকা নয়, চার আনা পয়সা। বলিবে, আপনার হাত খরচের জন্য দিলাম। রোজ আপনাকে চার আনা করে দেব। চার আনায় আপনার কুলোবে তো ?

শ্রীপতির চাহিতে লজ্জা নাই। চাওয়ারও তার শেষ নাই। সে পয়সা চায়, পুরানো কাপড় পুরানো জুতা চায়, পেসাদ চায়, আমোদ চায়, পরামর্শ চায়, কাজ চায়।

তার চেয়েও বেশি চায় দরদ।

কারও অবহেলা সে সহিতে পারে না, কড়া কথায় তার চোখে জল আসিয়া পড়ে। প্রতিধ্বনি ছাড়া যেমন শব্দ মুহূর্তের বেশি বাঁচিতে পারে না, অন্যের মুখে হাসি না ফুটিলে তার মুখের হাসি তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। জিনিস তৈরি করা আর সেই জিনিস বিক্রি করার জন্য হন্যে হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর একটানা একঘেয়ে জীবন যাপনের পর এতগুলি দিনের অবসর সে বোধ এই প্রথম পাইয়াছে, গম্ভীর নির্বাক মানুষটা অনভ্যস্ত মুক্তির আনন্দে চপল ও মুখর হইয়া উঠিয়াছে, হাতুড়ি ধরার আগে ছেলেবেলা যেমন ছিল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সে শহরকে দেখে, পূজা করে উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে, অন্তহীন প্রশ্নে। তার ভাব দেখিয়া সকলে হাসে, কিন্তু তার ভাবপ্রবণতা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সকলের বিস্ময়ানুভূতি আবার ধারালো হইয়া উঠে।

কেবল সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে, দুপুরে যখন অন্য সকলে ঘুমায়, রাত্রে যখন সে নিজে ঘুমাইতে যায়, মুখ দেখিয়াই টের পাওয়া যায় তার মন কেমন করিতেছে। স্তিমিত চোখ, নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া মুখের দুটি প্রান্ত। খাইতে বসিয়া সে নানা ব্যঞ্জনের দিকে তাকায়, ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করে। আসিবার দিন বউ তাকে কুচো চিংড়ি দিয়া কচুর ঘন্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। এ সব তরকারির স্বাদ তো সে রকম নয় ? বাড়ির পিছনে জলায় এবার অজস্র কচু হইয়াছে, বউ হয়তো রোজ কচুঘন্ট রাঁধিয়া ছেলেমেয়েদেব খাওয়ায়, নিজে খায়।

মন খারাপ হইলে শ্রীপতি পীতাম্বরের কাছে গিয়া খানিক তফাতে উবু হইয়া বসে, পীতাম্বর ধরানো বিড়িটা আগাইয়া ধরিলে দু হাত পাতিয়া জ্বলন্ত বিড়িটা গ্রহণ করে, একটু আড়াল করিয়া বিড়িতে টান দেয়।

চালটা মেরামত করা হয়নি।

হুঁ।

বিষ্টি আর তেমন হচ্ছে না এইটুকু ভরসা।

এখানে হচ্ছে না তো কি ? দেশে হয়তো হচ্ছে।

তা হয় ?

শ্রীপতি জানে বৃষ্টি যখন হয় পৃথিবীর সব জায়গাতেই হয়। এখানে বৃষ্টি নামে না ওখানে নামে, আকাশ কি ভিন্ন ভিন্ন এখানের এবং ওখানের ? দেশের আকাশ ঢাকিয়া যখন কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, এই শহর কি তখন অন্য একটি পরিষ্কার আকাশের নীচে রোদে ঝলমল করে ?

পীতাম্বর বাহিরেই বেশি সময় কাটায়, কিন্তু কোথায় যায় কী করে কারও কাছে প্রকাশ করে না। পীতাম্বর বাড়িতে থাকিলে, জ্যোতির অবসর থাকিলে, শ্রীপতি জ্যোতির সঙ্গে গল্প করে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, চুল ছাটার কায়দায় আর হাতকাটা ছিটের শার্টে তাকে খুব স্মার্ট দেখায়।

প্রথমে শ্রীপতি তো ভাবিয়াছিল, সে বুঝি মোহনের কোনো আত্মীয়।

জ্যোতির কথা কিন্তু বড়ো নোংরা। এমনি তাকে দেখিলে মনে হয় শিক্ষিত ভদ্র যুবক বুঝি চাকরের কাজ করিতেছে, তার কথা শুনিয়া শ্রীপতির চোখ কপালে উঠিয়া যায়।

কিছু কিছু অশ্লীল আলোচনায় শ্রীপতির আপত্তি নাই, গ্রামে দু চারজন বন্ধুর সঙ্গে ও ধরনের গল্পগুজবে সে আমোদও পাইত, কিন্তু জ্যোতির মুখের একবারে আটক নাই, অনায়াসে এমন সব কদর্য মন্তব্য সে করে, এমন বীভৎস বর্ণনা শোনায়, যে কিছুক্ষণের জন্য শ্রীপতির কল্পনার নরক সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়া বসে।

জ্যোতি নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনায়। আগে যাদের বাড়ি কাজ করিয়াছে তাদের সম্বন্ধে উদ্ভট ও অকথ্য কাহিনি ফলাও করিয়া রং চড়াইয়া বলিয়া যায়।

মন্তব্য করে, সব মেয়েলোক ওমনি,—সব, ওদের জাতটাই বজ্জাত।

শুনিয়া শ্রীপতির বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে।

কদম ওদিকে কী করিতেছে কে জানে !

বাড়িতে শুধু বুড়ি মা ভালো দেখিতে পায় না। বিনয় হালদার হয়তো আবার মাছ ধরিবার ছলে ছিপ হাতে বাড়ির পিছনে বিলটার ধারে বসিয়া থাকে, দীনু হয়তো নানা ছুতায় বাড়ি আসিয়া গল্প জুড়িয়া দেয়। ইন্দ্র এই জ্যোতির মতো চুল ছাঁটে, কদমকে দেখিলেই সে শিস দিতে দিতে চলিয়া যাইত, সে চলিয়া আসিবার পর এখন হয়তো চলিয়া যায় না ! কদম তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত, এখন হয়তো দাঁড়াইয়া থাকে।

কে জানে কী করিতেছে কদম?

চার বছর কদম ঘর করিতে আসিয়াছে, চার বছর কদম হাসে নাই। কাছে টানিতে গেলে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিয়াছে, এত কেন ? পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই যে তিন ব্যাটাবেটির বাপ জোয়ান মদ্দ পুরুষের, তার অত শখ কেন ? দিনরাত কানের কাছে মন্ত্র জপ করিয়াছে, গয়না দাও, শাড়ি দাও, মাছ দুধ খেতে দাও, আমি তোমার তিন ব্যাটাবেটির মা বুড়ি বউ তো নই, আমার ও সব চাই। নিজের কচি ছেলেটা তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, বউকে শাপিতে শাপিতে শ্রীপতির মা কাঁদিয়া ফেলিত, গুম খাইয়া কদম বসিয়া থাকিত। তাতানো লোহা হাতে শ্রীপতি তাকে শাসন করিতে আসিলে মুখ তুলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কদম বলিত, আমি কারও মা নই। ছেলের মার বুকে দুধ থাকে, এক ফোঁটা দুধ আছে আমার বুকে ?

বলিতে বলিতে কদম উঠিয়া দাঁড়াইত, ছেঁড়া শাড়ির আঁচল সরাইয়া বুক উদ্‌লা করিয়া দিত, সামনে রুখিয়া আসিয়া বলিত, কেটে নাও, দা দিয়ে কেটে নাও মশাই, রক্ত যা পড়বে তাই খাইয়ো ছেলেকে।

তারপর কদম হাসিয়াছিল।

পয়সা রোজগার করিতে সে বিদেশে যাইবে স্থির হওয়ার পর।

একেবারে যে নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছিল কদম। নিজেই গলা জড়াইয়া ধরিত, না বলিতে পিঠের ঘামাচি মারিয়া দিত, কীভাবে তাকে প্রসন্ন করিবে ভাবিয়া যেন দিশাহারা হইয়া থাকিত। জট ছাড়াইয়া সে মৃতা সতীনের মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিয়াছিল এতকাল পরে, সতীনের ছেলের খোস পাঁচড়া সাফ করিয়া নিমপাতা লাগাইয়া দিয়াছিল।

এত করিয়াছিল কদম তাকে দূরে পাঠানোর জন্য ! পয়সা রোজগার করিতে দূরে পাঠানোর জন্য ! এখন সে কী করিতেছে ?

নির্ভরশীল সরলবিশ্বাসী হাবাগোবা মানুষটাকে জ্যোতির খুব পছন্দ হইয়া গেল। কথা শুনিতে শুনিতে এমন অভিভূত বিচলিত হইয়া না পড়িলে কি আর কারও কাছে বাহাদুরি করিয়া সুখ হয় মানুষের ?

জ্যোতির কবি মন নিজেকে কেন্দ্র করিয়া গৌরবগাথা সৃষ্টি করে, উদাহরণসমেত জীবনের ব্যাখ্যা শোনায়, দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো ললনাকুলের হৃদয়রাজ্য জয় করে, চাণক্যের মতো বুদ্ধি

কৌশলে শত্রু নিপাত করে, শুধু ভাঁওতা দেওয়ার ক্ষমতায় বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পায়। বিব্রত হইয়া অভিভূত হইয়া উত্তেজিত হইয়া শ্রীপতি তার কথা শোনে। বুঝিতে পারা যায় সে ভাবিয়া পাইতেছে না এই বীরপুরুষটি, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি সতেরো টাকা বেতনে মোহনের বাড়ি চাকরের কাজ করিতেছে কেন !

জ্যোতি তৃপ্তি লাভ করে।

লেখকের যেন ভক্ত জুটিয়াছে, ধনীর যেন পার্ষদ জুটিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর জ্যোতি গেঁয়ো মানুষটিকে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাগ দিয়া ধন্য করার জন্য সঙ্গে নিয়া গেল।

বাড়ির পিছন দিকটা দক্ষিণ, সে দিকে কয়েক মিনিট হাঁটিলেই শহরের পুরানো দিনের সব বাড়ি মেলে, বাড়িগুলির সামনে পিছনে অলিগলিতে কিছুক্ষণ পাক খাইতে খাইতে আগাইয়া গেলে পাওয়া যায় খোলার ঘরের এক বস্তি সেখানে দুদিকের মাটির দেয়াল হইতে গা বাঁচাইয়া প্রায়ান্ধকারে চলিতে চলিতে জানালা দিয়া চোখে পড়ে আলোকিত ঘর। চেনা-অচেনা অতিথি অভ্যর্থনা করার জন্য দুয়ারে দুয়ারে সাজগোজ করিয়া খোঁপায় মালা জড়ানো মেয়েদের দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। সস্তা হারমনিয়ামের সঙ্গে জবর গান, হাসির হুল্লোড় আর বচসা কানে আসে, সমস্ত শব্দ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

এই সব গলিতে এত মানুষের চলাচল দেখিয়া শ্রীপতি অবাক হইয়া বস্তিতে ঢুকিবার আগে মনে হইয়াছিল জ্যোতি বুঝি তাকে গরিবের শান্ত স্তব্ধ এক পল্লিতে নিয়া চলিয়াছে, এখন সে অনুভব করে চারিদিকে অনেকখানি পথের মধ্যে সমস্ত পাড়াটা মৌচাকের মতো মুখরতা আর ব্যস্ততায় সরগরম।

চাঁপার ঘর।

এখানকার অনেক খোলার ঘরেও বিদ্যুতের আলো জলে, চাঁপার ঘরে লন্ঠন, মেঝেতে বিছানা পাতা, চাদরটা ফরসাই মনে হয়, গোটা তিনেক বালিশ আছে, তাদের ওয়াড়গুলি ময়লা আর একটু ছেঁড়া। এককোণে উপুড় করা ঘষামাজা বাসন, কাঠের আলনায় মোটে দুটি শাড়ি, একটি শেমিজ আর একটি গামছা পুরানো পাড়ে তৈরি ঢাকনা দেওয়া একটি বাক্‌সো, দেয়ালে আঠা দিয়া আটকানো আর পেরেকে লটকানো অনেকগুলি ছবি, কোনোটা পুরানো ক্যালেন্ডারের, কোনোটা মাসিকপত্রের, মিলের কাপড়ে যে ছবি আঁটা থাকে, তাও আছে। হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে নধর বালগোপাল, স্থূলাঙ্গী উলঙ্গিনি দেবদেবী, বাগানের মতো সাজানো বন, উইঢিবির মতো পাহাড় আর নালার মতো নদীতে মূর্তিমতী প্রকৃতি দেওয়ালে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া আছে।

একটি ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে। ছেলে কোলে এক গেঁয়ো মায়ের ছবি দেখিয়া।

ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে, ঘরের মাটি লেপা দেওয়াল আর সোঁদা গন্ধে মনে পড়ে দেশের বাড়ির ঘরের কথা। একটা লন্ঠন আছে শ্রীপতির, মাঝে মাঝে জ্বলে। চাঁপার লন্ঠনের মতো এমন পরিষ্কার আলো দেয় না, ধোঁয়া তুলিয়া মিটমিট করিয়া জ্বলে। তবু সেই আলোতেই চাঁপার বাসনগুলির মতো কদমের মাজা বাসনও এমনি চকচক করে।

সেদিন দশটার ডাকে কদমের একখানা চিঠি আসিল। মোহনের ভাগ্নে সুধীর স্কুলে পড়ে, তাকে দিয়া লিখাইয়াছে।

টাকা পাঠায় না কেন শ্রীপতি ? সকলে কি তারা না খাইয়া মরিবে ? তাড়াতাড়ি বেশি বেশি রোজগার করুক শ্রীপতি, তাড়াতাড়ি একবার দেশে ঘুরিয়া আসুক, কদম তার পথ চাহিয়া আছে।

কি করি কত্তা এখন ?

শ্রীপতির অসহায় বিমূঢ় ভাব আর স্ত্রীলোকের মতো একান্ত নির্ভর করার স্বভাব মোহনকে বিরক্ত করে, আমোদ দেয়। আমোদ দেয় বেশি, প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা জাগে। শ্রীপতি পীতাম্বরের মতো নয়, একটু আশ্রয় পাইয়াই আর সব চাওয়া সে ছাঁটিয়া ফেলে না।

কী করবি আবার ? টাকা পাঠিয়ে দে।

টাকা যে নেই কত্তা ?

তবে আর কী হবে ? তাই লিখে দে।

মোহন হাসে। শ্রীপতিও যেন তার খেলা বুঝিতে পারে, নিজে হইতে তার কাছে টাকা চায় না। মোহনের কাছে চাহিলে যে পাওয়া যাইবে এ কথা যেন মনেই পড়িতেছে না তার। বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে সে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখের পাতা মিটমিট করে।

তুই একটা আস্ত পাঁঠা শ্রীপতি। আমার কাছে টাকা চাইবি তাও আমাকেই বলে দিতে হবে গাধা কোথাকার ?

নিজের সহৃদয়তা কী উপভোগ্য !

নিজের আবেগের নেশায় মাতাল হওয়ার মতো। দানের চেয়ে দয়ার চেয়ে উদারতার খেলা মানুষকে দেবতা হওয়ার সুখ দেয়। শ্রীপতি প্রার্থী নয়, ভক্ত। শ্রীপতির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেলে মোহন নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

মোহনের অনুরোধে জগদানন্দ শ্রীপতির একটা কাজ জুটাইয়া দিল। প্রকাণ্ড একটা কারখানা আছে, অনেকগুলি মোটর আর লরি সেখানে ভাড়ার জন্য থাকে, রাশি রাশি গাড়ি মেরামত হয়।

একটা মজুরকে কাজে জুটাইয়া দিবার অনুরোধ শুনিয়া জগদানন্দ একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। তার নিজের একজন ম্যানেজার বেতন পায় হাজার টাকা, তার অনুমোদনে মানুষের দুশো চারশো টাকার কাজ জোটে, তাকে দিয়া একজন কুলির কাজ জোটানো !

অনুমোদনের এ কী অপচয় ! তারপর একটু হাসিয়া একটা শ্লিপ মোহনের হাতে দিয়া বলিয়াছিল, এটা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে যেতে বলবেন।

অতি অল্পদিনে জগদানন্দের সঙ্গে মোহনের ভাব জমিয়া গিয়াছে। দুজনের বাড়ির মেয়েদের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে।

সর্বদা যাতায়াত চলে, হাসি, গল্প, গানবাজনা, খেলাধুলায় সময় কাটে। কোথাও যাইতে হইলে দু বাড়ির সকলে একত্র হইয়া যায়—সিনেমায়, পিকনিক করিতে অথবা জগদানন্দের যে দু একজন বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে মোহনের বাড়ির সকলেরও পরিচয় হইয়াছে, তাদের বাড়িতে।

জগদানন্দের স্ত্রী ঊর্মিলা সুন্দর গান জানে।

গলাটি মিষ্টি। মানুষটা রোগা, গলাটি সরু কিন্তু গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ নয়, ঝংকারে সার্থক ও মধুর ! তার গান শুনিয়া মোহন মুগ্ধ হইয়া যায়।

গানের সুরে তার স্বামীকে এ ভাবে মুগ্ধ করার জন্য লাবণ্য তাকে একটু হিংসা করে।

অন্যপক্ষে, লাবণ্যের রূপ দেখিয়া মাঝে মাঝে জগদানন্দের চোখে দু একটা পলক পড়ে না। রূপের জন্য লাবণ্যকে ঊর্মিলা একটু হিংসা করে।

চিন্ময় বড়ো ব্যস্ত। দু চারজন বন্ধুর সঙ্গে মোহনের পরিচয় করাইয়া দিয়াই হঠাৎ সে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সময় দিতে পারে না। অফিসে কী যেন হাঙ্গামা বাধিয়াছে, পিতাপুত্রের এক মুহূর্ত অবসর নাই। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকে দু জনে এক সঙ্গে বসিয়া কাগজপত্র ঘাঁটে আর পরামর্শ করে।

কী হইয়াছে কেউ জানে না তবে দু জনের ভাবসাব দেখিয়া বাড়ির লোকেরাও একটু হকচকাইয়া গিয়াছে।

ঝরণা বলে, মেজাজ যা হয়েছে দু জনের, কী বলব আপনাকে। আমরা কেউ কাছে ঘেঁষি না। নগেন আসে না যে ? বেশ লাগে আপনার ভাইকে। এমন ছেলেমানুষ !

নগেন ছেলেমানুষ বইকী।

ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ বলার মানে মোহন বুঝিতে পারে না।

সে রকম ছেলেমানুষ বলছি না, কলেজে পড়ে তবু খুব সরল। মিনু সিগারেট খায়, আমি সেদিন নগেনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খাও না ? বললে কি জানেন ? না, খাই না দাদা বারণ করেছে ! আপনাকে খুব ভয় করে। শাসন করেন বুঝি খুব ?

শাসন ? শাসন করার দরকার হয় না। আমায় খুব ভালোবাসে। আমি যা পছন্দ করব না ভাবে, কখনও তা করে না।

ঝরণা গম্ভীর মুখে বলে, তারই নাম শাসন করা। আর কি শাসন করবেন, বেত লাগাবেন ? বড়ো ভাই সেজে থেকে ওর মনটা আপনি দমিয়ে রাখেন। ভাবলে এমন আশ্চর্য হয়ে যাই, আপনারা সব বোঝেন না যে, চেপে রাখলে এই বয়সে কারও মনের স্বাধীন বিকাশ হতে পারে না ?

ঝরণার কথার ঝাঁঝ মোহনের মনে গিয়া লাগে। কিছু সে বলিতে পারে না।

ঝরণা শুধু তাকে দোষ দেয় নাই। সব বড়ো ভাইদের,—গুরুজনদের, বিরুদ্ধে তার নালিশ ! মৃন্ময়ের জন্য হয়তো ঝরণার মনে গভীর দুঃখ আছে। মানুষের চোখে চোখে তাকানোর ভয়ে ভাইটি ঝরণার সব সময় আড়াল খোঁজে। ঝরণা কি সে জন্য দোষী করে চিন্ময়কে ? বড়ো ভাই সাজিয়া থাকিয়া চিন্ময় তার ভাই-এর বিকাশোন্মুখ মনকে কোঁকড়াইয়া দিয়াছে ?

মোহন বিশ্বাস করিতে পারে না।

মিনু কি এই জন্য এত নার্ভাস হয়েছে ?

ঝরণার মুখ লাল হইয়া গেল। বুঝা গেল, ভাই-এর জন্য মনে মনে তার লজ্জা আছে।

মিনু ? ওর কথা আলাদা। ছেলেবেলা থেকেই মিনু ও রকম, গ্ল্যান্ডের দোষ আছে। চিকিৎসা হচ্ছে, সেরে যাবে। ওকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মোহন জগদানন্দের কাছে তার ছোটো ভাই-এর ইতিহাস শুনিল। তারা তিন ভাই। ছোটোজনের নাম নয়নানন্দ। এখনও বাঁচিয়া আছে—শুধু বাঁচিয়া আছে।

গঙ্গার ধারে একটি বাড়িতে বিছানায় শুইয়া তার দিন কাটে। অর্ধেক অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, উঠিতে পারে না। নার্স তার সেবা করে, বউ অনেক আগেই বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভোঁতা মস্তিষ্কে বাহিরের জগৎ অতি ক্ষীণ সাড়া তোলে, সময় সময় মনে হয় সেটুকু বাহ্যজ্ঞানও বুঝি নাই। জগদানন্দ যদি কখনও যায়, যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছিস ? অর্থহীন অভ্যস্ত হাসির একটু আভাস হয়তো কখনও ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে, কখনও মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে, পলক পড়ার বদলে চোখের পাতা শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

কদাচিৎ দেখতে যাই। সহ্য হয় না।

তবু জগদানন্দ চায় না সে সুস্থ হইয়া উঠুক !

কোনো রকমে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতা হইতেই আবার আত্মঘাতী তাণ্ডব শুরু করিয়া দিবে, ভালো করিয়া সারিয়া উঠিবার জন্যও অপেক্ষা করিবে না।

আরেকবার তিন মাস ভুগিয়াছিল, জগদানন্দ কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ডাক্তার আশা করিতেছে দু-চার দিনের মধ্যে সলিড ফুড দেওয়া চলিবে, হঠাৎ দেখা গেল সে বাড়ি নাই। সেই

অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইলে যখন টলিয়া পড়ার উপক্রম করে, কোনো সুযোগে ঊর্মিলার বাক্‌সো খুলিয়া গয়না নিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। দু দিন পরে খবর আসিল অজ্ঞান অবস্থায় সে হাসপাতালে পড়িয়া আছে।

ধ্যানধারণা ধর্মালোচনা ছাড়া দাদা থাকতে পারতেন না, নোংরামি ছাড়া নয়ন থাকতে পারে না। দাদা তবু শরীর একটু ভার বোধ করলেই সব বন্ধ করে দিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক পর্যন্ত করতেন না। নয়নের সাধনা আরও জোরালো, মরতে মরতেও প্রাণপণে নিজের তপস্যা চালিয়ে যায়। আমার কি মনে হয় জানো মোহন ? দাদা যদি অতবড়ো মহাপুরুষ না হতেন, নয়নের বিকারটা এমন চরমে দাঁড়াত না।

মোহন চুপ করিয়া রহিল।

প্রথম অপরাধ করেছিল সতেরো আঠারো বছর বয়সে। অনেক বাড়িতে অনেক ছেলেই ও রকম অপরাধ করে। কোনো বাড়িতে একটু শাসন করা হয়, কোনো বাড়িতে শুধু উপদেশ দেওয়া হয়, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। ছেলেটা কিছুদিন মুখ দেখাতে লজ্জা পায়, তারপর ধীরে ধীরে সামলে ওঠে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে ছিলেন দাদা, আধ লাখ স্ত্রী পুরুষ যাকে দেবতার মতো পূজা করে। দাদার দোষ দিই না। তিনি কিছুই করেননি। তিনি শুধু ছিলেন, আর কিছু নয়। বাড়ির সকলে নয়নের ছেলেমানুষির কথা ভুলে গেল, কিন্তু সে যেন কেমন হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া চলছিল। নিজে কী করেছে না করেছে তার চেয়ে তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল এমন দাদার ভাই হয়ে সে অপরাধটা করেছে।

ও রকম হয়।

হ্যাঁ, একজনের মন যখন অন্য একজনের বশে থাকে, তখন সে নিজের কাজের গুরুত্ব যাচাই করে অন্য একজনের মাপকাঠিতে। দাদা একটি মেয়েকে ভালোবাসার চিঠি লিখে কেলেঙ্কারি করলে সেটা যেমন সৃষ্টিছাড়া ভয়ংকর ব্যাপার হত, নিজের কাণ্ডটা নয়নের কাছে ঠিক ততখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গদোষ ঠিক এইভাবে কাজ করে।

ঝরণার অভিযোগটা সে তেমন আমল দেয় নাই। কথাটা সত্য সন্দেহ নাই, বড়োগাছের ছায়ায় চারাগাছ বাড়িতে পায় না, কিন্তু দুর্ভাবনার কি আছে ? নগেনকে সে নিজের ছায়ায় ঢাকা দেয় নাই।

সংসারে সাধারণত বড়ো ভাই-এর কাছে ছোটো ভাই যতটা প্রশ্রয় পায়, যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার অনেক বেশিই সে বরাবর নগেনকে দিয়া আসিয়াছে। গোপনে সিগারেট খাওয়া ধরিয়াছে জানিয়া উদারভাবে সে তাকে সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি পর্যন্ত দিয়াছিল। কোনোরকমে ছোটো ভাইকে দাবাইয়া রাখিবার, দমাইয়া দিবার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড় করাইতে পারিবে না।

নগেন কিন্তু সিগারেট খাওয়া সম্পর্কে তার উদারতার মানে বুঝিয়াছিল উল্‌টো, ভাবিয়াছিল সে তিরস্কার করিতেছে।

আরও অনেক প্রশ্রয় দেওয়া, স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারেও কি নগেন এইরকম উল্‌টো বুঝিয়াছে ?

জগদানন্দের বেদনাবোধ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় এখন তার ভয় করিতে থাকে। নয়নানন্দের দৃষ্টান্তটা অসাধারণ। সে পরমানন্দের মতো মহাপুরুষ নয়, নয়নানন্দের মতো নিজেকে ধ্বংস করার প্রতিভাও নগেনের নাই। অমন সর্বগ্রাসী বিকারও নগেনের কোনোদিন জন্মিবে না। কিন্তু তার আওতায় সাধারণ মানুষের ভাই হিসাবে সাধারণ ভাবেই নগেন যদি বিগড়াইয়া যায় ? সে ক্ষতিও তো সহজ নয়।

মোহন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া যায়।

নগেন কী করিতেছে দেখিতে হইবে। নগেনের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে মনটা তার কী অবস্থায় আছে।

মোহন বুঝিতে পারে এটা তার দুর্বলতা, এ সব ব্যাপারে এমনভাবে অধীর হইতে নাই। কিন্তু চরম উদাহরণের মতো নয়নানন্দের কাহিনি বড়ো ও ছোটোর সম্পর্কের একটা দিক তাব কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তার কেবলই মনে হইতে থাকে এতকাল এ বিষয়ে উদাসীন থাকা তার উচিত হয় নাই।

নগেনের মতো ভাই বয়স্ক পুত্রের মতো। বাপ বাঁচিয়া থাকিলে আলাদা কথা ছিল। গ্রামে হোক, শহরে হোক, ভাইকে মানুষ করিবার দায় এড়াইয়া গেলে ভাইটার জন্যই তার নিজের জীবনেও অনেক অবাঞ্ছিত বিপর্যয় দেখা দিবে।

এমনি ব্যাকুলভাবে সে বাড়িতে পৌঁছায়, একতলা হইতেই শুনিতে পায় নগেনের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ !

মোহন জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে।

নিজে কলেজে পড়ার সময় বালক নগেনের অসুখের খবর পাইয়া একবার সে ব্যাকুল হইয়া বাড়ি গিয়াছিল, সমস্ত পথ ভাবিয়াছিল, নগেন বাঁচিয়া আছে দেখিতে পাইবে তো ?

বাড়ির সামনে নগেনকে চাদর গায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেদিনও তার এমনি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িয়াছিল।

মোহন একটু লজ্জা বোধ করিতে থাকে। মাঝে মাঝে কী যেন তার হয়, সামান্য ব্যাপারে একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে। কল্পনায় কোনো খুঁত হয়তো আছে, মাঝে মাঝে সাধারণ বিচারবুদ্ধির বাধা ভাঙিয়া উদ্দাম উল্লাসে খেলা শুরু করিয়া তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

ঝরণা সকলকে হাসাইতেছিল আর বিস্মিত দৃষ্টিতে নগেনকে দেখিতেছিল। এত সহজে যে কোনো কিশোরকে এভাবে হাসানো যায় সে বোধ হয় বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ছেলেমানুষ ? এমন পাকা আর চালাক ছেলেমানুষ?

মোহনকে দেখিয়া সকলের হাসি থামিয়া গেল।

লাবণ্য খসা আঁচলটি খোঁপায় আটকাইয়া দিল। হাসির শব্দ বন্ধ হইলেও অন্য সকলের মুখে হাসি লাগিয়া ছিল, নগেনের মুখে শুধু হাসির চিহ্ন নাই। এক মুহূর্তে এতক্ষণের আত্মভোলা ছেলেটা সচেতন ও সংযত হইয়া গিয়াছে।

দেখিয়া হঠাৎ মোহনের মাথাটা যেন খারাপ হইয়া যায়।

সে কারও গুরুজন ? ভারিক্কি গম্ভীর মানুষ সে ?

সে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র সকলের উচ্ছ্বসিত হাসি থামিয়া যায়, হাসি বন্ধ করিয়া তার ভাই চোরের মতো চাহিয়া থাকে ?

মিথ্যা কথা ! অতি ফাজিল, অতি হালকা মানুষ সে, এতটুকু তার গাম্ভীর্য বা আত্মমর্যাদাবোধ নাই।

থিয়েটারের কমিক অভিনেতার মতো হাস্যকর অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে পা টেপা টেপা দৌড় দিয়া গিয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়ে, বেখাপ্পা উল্লাসের সঙ্গে ব্যগ্রভাবে কী কী—কী ব্যাপার ? শুনি, আমিও একটু শুনি !

স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

মোহনের মাথা ঘুরিতে থাকে, সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। সে জানে এখন থামিবার উপায় নাই। অস্বাভাবিক কিছু করিয়াছে স্বীকার করিলে চলিবে না।

কখন এলে ঝরণা ?

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়, মুচকি হাসিয়া বলে, ও, এই ব্যাপার ! এক কাজ করো বউদি, দুটো তিনটে লেবু কেটে শরবত করে খাইয়ে দাও। এত ভড়কে যাচ্ছ কেন ? একেবারে অভ্যাস নেই, কার সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে দু এক পেগ খেয়েছেন---মাথা ঘুরে গেছে। এতে ভাবনার কি আছে ?

পাঁচ

মোহন একদিন সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

নিজের গাড়িতে স্টেশনে আসিয়া মোহন ট্রেন ধরিল। অত দামি গাড়ি নিয়া সন্ধ্যার বাড়ি যাইতে তার যেন লজ্জা হইতেছিল। কলেজে পড়ার সময় মোহনের বড়ো টানাটানি চলিত। বেশি টাকা হাতে পাইলে ছেলে বিগড়াইয়া যাইবে ভয়ে বাবা তাকে টাকা পাঠাইত হিসাব করিয়া।

সন্ধ্যা হয়তো জানে তার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। হঠাৎ অত দামি একটা গাড়ি নিয়া হাজির হইলে সে হয়তো ভাবিয়া বসিবে, গাড়িটা দেখাইতে সে গিয়াছে, নিজের বড়োলোকত্ব ঘোষণা করা তার উদ্দেশ্য। মনে মনে সন্ধ্যা হয়তো একটু হাসিবে। তার চেয়ে আগে যেমন ট্রেনে বাসে ওদের বাড়ি যাইত, আজও তেমনি ভাবেই যাওয়া ভালো।

কলিকাতা আসিয়াই একদিন সন্ধ্যার বাড়ি যাইবে ভাবিয়াছিল। বিবাহের পর সন্ধ্যাকে দেখে নাই, দেখিতে খুব ইচ্ছা হইতেছিল। তবু এতদিন যাই যাই করিয়া শুধু দিন পিছাইয়া দিয়াছে।

চিন্ময়কে না জানাইয়া সন্ধ্যার কাছে যাওয়া যায়। সে অধিকার তার আছে। চিন্ময়ের সঙ্গে সন্ধ্যার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার আগে সে তাদের বারাকপুরের বাড়িতে অনেকবার গিয়াছে, সন্ধ্যার সঙ্গে তাদের প্রকাণ্ড বাগানে হাঁটিয়া বসিয়া গল্প করিয়াছে, ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া দুজনে গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গিয়াছে অনেক দূর।

চিন্ময়ের স্ত্রীর সঙ্গে নয়, সন্ধ্যার সঙ্গে সে যখন খুশি গিয়া দেখা করিয়া আসিতে পারে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া চিন্ময়কে বলিতে হইবে। এ কথা বন্ধুর কাছে গোপন করা চলে না। একেবারে উল্লেখ না করার মতো তুচ্ছ নয় কথাটা !

সন্ধ্যা তাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে কয়েক বছরের মতো। দুজনের মধ্যে চিঠি লেখা পর্যন্ত বন্ধ। এ অবস্থায় সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে চিন্ময়ের কাছে তা গোপন করা যায় না।

এই জন্য কি এতদিন সে যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যার কাছে যায় নাই চিন্ময়কে পরে বলিতে হইবে, এই ভয়ে ? হয়তো ঠিক এই ভয়ে নয়, কথাটা আজ তার খেয়াল হইয়াছে প্রথম। তবে মনান্তরের ফলে দুজনে তারা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যে একজনের সহিত মাখামাখি করিতে করিতে আর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইতস্তত করিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা আসিয়া প্রথমে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হইলে চিন্ময়ের কাছে যাইতে সে হয়তো ঠিক এমনই অস্বস্তিবোধ করিত।

কী ভাবিবে চিন্ময়, কী বলিবে ? যদি সে ভাবিয়া বসে যে মোহন তাদের মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিল ? এ কথা ভাবিয়া যদি সে রাগ করে ? যদি হঠাৎ চিন্ময়ের দুরন্ত আশা জাগে যে মোহনের কথা শুনিয়া সন্ধ্যা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, এবার সে ফিরিয়া আসিবে ?

ট্রেন চলিতে থাকে আর মোহন এমনি সব জল্পনা কল্পনা করিতে থাকে। সন্ধ্যার সঙ্গে তার কী কথা হইয়াছে শুনিবার জন্য চিন্ময় হয়তো আগ্রহে ফাটিয়া পড়িবে কিন্তু আপনা হইতে মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না, যাচিয়া তাদের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ শুনাইতে সেও লজ্জা

বোধ করিবে। চিন্ময় হয়তো শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন আছে ? সে জবাব দিবে যে ভালোই আছে—এবং তার পর হয়তো চিন্ময় জোর করিয়া অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া আনিবে।

বাগানের গাছে গাছে তখন শেষরাত্রির বৃষ্টির জল রোদের তেজে শুকাইয়া যাইতেছে, ঘুমের বিছানা ছাড়িয়া সন্ধ্যা চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল বাথরুমে চিনামাটির পুকুরে স্নানের বিছানায়।

রুক্মিণীর কাছে খবর শুনিয়া বলে, মোহন এসেছে, মোহন ! চুলে সাবান দেব ভাবছিলাম, মোহন এসেছে ! জানতাম আসবে।

বাহিরের ঘরে মোহন ভাবে : এতক্ষণ আমায় বসিয়ে রেখেছে সন্ধ্যা ? আর কেউ কি বাড়িতে নেই ? সকালে কেউ কি বাইরে আসে না ?

আরও খানিক পরে সন্ধ্যা আসিয়া বলিল, এই যে আমার মোহন। আমার অসময়ের মোহন।

সামনে আসিয়া ডান হাতটি তুলিয়া দুহাতে মুঠা করিয়া ধরিল। ভিজা ভিজা ঠান্ডা হাত দুটি সন্ধ্যার, গায়ে সাবানের সুবাস। প্রসাধন না করিয়াই আসিয়াছে।

—এসেছ তা হলে ?

সন্ধ্যা খুশি হইয়াছে।

সহজ হাসি, কথা আর দুর্লভ অন্তরঙ্গতা দিয়া সন্ধ্যা তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। এর মধ্যে ফাঁকি কিছু নাই, সবটাই আন্তরিক।

তবু মোহন যেন আশাভঙ্গের আঘাতে একেবারে নিভিয়া গেল।

সন্ধ্যা আশ্চর্য হইয়া গেল না, এতটুকু তার উত্তেজনা জাগিল না, কী বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল না, এমনভাবে তাকে গ্রহণ করিল যেন বহুকাল পরে জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিবার পরে তাদের দেখা হয় নাই, যেন কালও সে আসিয়াছিল ! সন্ধ্যা তার সঙ্গে শুধু ভদ্রতা করিবে, শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন আছে, কোথায় আছে, কী করিতেছে—এসব ভাবিয়া আসিলে বিনা ভূমিকায় তাকে এভাবে কাছে টানিয়া নেওয়ার জন্য হয়তো সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। অনেক বিচিত্র নাটকীয় ব্যবহার কল্পনা করিয়া আসিয়া এমন আবেগহীন সহজ অভ্যর্থনা কি ভালো লাগে ?

কেমন আছ সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল—ও সব নয় মোহন। ভালো লাগে না। দেখতে পাচ্ছ না কেমন আছি ?

তবু যেন মোহন হার মানিবে না, দীর্ঘ অদর্শনের ব্যবধানকে গায়ের জোরে খাড়া করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে সে ব্যবধান অতিক্রম করার বৈচিত্র্য উপভোগ করিবে।

রোগা হয়ে গেছ।

তখন সন্ধ্যার বোধ হয় মনে পড়িয়া যায় যে ঠিক এই রকম একগুঁয়েমি করিয়া আগেও মোহন তাকে মাঝে মাঝে পাগল করিয়া তুলিত, আব্দেরে ছোটোছেলেকে চকোলেট দেওয়ার মতো কিছু ভাবপ্রবণতার ব্যথা মোহনের মধ্যে তাকে সৃষ্টি করিয়া দিতে হইত।

ব্যথা বোধ হয় আজ সে চায় না। একটু উচ্ছ্বাস চায়, বিস্ময় আর আনন্দের ! সেই সঙ্গে এতদিন অবহেলা করার জন্য কিছু কিছু অভিমান মিশাইয়া দিলে মোহন আরও খুশি হইবে।

কিন্তু কেন ?

কেন সকলে তার কাছে এ সব চায়, তার যা নাই, সে যা ভালোবাসে না ? সমস্ত জগৎ যেন ধরিয়া রাখিয়াছে মেয়ে বলিয়াই সে রক্তমাংসের জীবন্ত কবিতা—পুরুষের মনের মতো কবিতা।

কিন্তু মোহন তাকে বড়ো খাতির করিত, ভালো ছেলে মোহন। বাঁচার আনন্দে ভাঁটার সময় শুধু শ্রান্তি আর বিরক্তি,—কিছুক্ষণের জন্য যখন একেবারে লোপ পাওয়ার সাধ জাগিত, পোষা কুকুরটা ছাড়া কারও সঙ্গ সহ্য হইত না, মোহনের সঙ্গে তখন কথা বলিতে পারিত,—যে কোনো বিষয়ে কথা হোক। কুকুরটা কবে মরিয়া গিয়াছে। মোহন এখনও আছে, দুধ ভাত আর সুখ শান্তিতে পরিপুষ্ট দিব্যকান্তি মোহন। ভালো ছেলে মোহন, ধৈর্যময় মোহন, সহনশীল নিয়মতান্ত্রিক একগুঁয়ে মোহন।

ওকে কিছু ভাবালুতার খোরাক তার দেওয়া উচিত।

সন্ধ্যা বসিল, গা এলাইয়া দিল।—মানুষ কেন রোগা হয় তুমি কী বুঝবে ? মনটা ভালো নেই মোহন।

মোহন প্রায় আধ মিনিট চুপ করিয়া রহিল। কোনোদিন বোঝে নাই, আজ কি আর সে বুঝিবে এই নীরব সহানুভূতি কত অসহ্য সন্ধ্যার কাছে ?

তোমার সুখী হওয়া কঠিন, সন্ধ্যা ! যা জিদ তোমার !

ইস ? তার মানে ?—ও, জিদ ! যাকগে, সুখদুঃখের কথায় কাজ নেই। বউকে সঙ্গে আনলে না কেন, আলাপ করতাম ? আচ্ছা, আমিই তোমার বাড়ি গিয়ে আলাপ করে আসব একদিন।

মোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি জানলে কী করে আমি বাড়ি নিয়েছি ?

ওর কাছে শুনলাম।

সত্যি ? চিন্ময় তবে এসেছিল ? তবু ভালো, আমি ভাবছিলাম, তোমাদের বুঝি কথাও বন্ধ।

বন্ধু তোমার আসেনি, তবে আমাদের কথা বন্ধ নয়, দরকার হলে আমরা ফোনে কথা বলি।

মোহন ধীরে ধীরে বলিল, দরকার হলে ফোনে কথা বলো। কী রকম দরকার হলে ?

সন্ধ্যা একটু হাসিল।

যেমন ধরো আমার কিছু বাড়তি টাকা চাই। আমি ফোন করে টাকার কথা বলি, ও লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেয়।

শুধু টাকার কথা বলো ? আর কোনো কথা হয় না ?

হয় বইকী।

সন্ধ্যার মুখের হাসি নিভিয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে মোহনের মুখের ভাব লক্ষ করে, ভুরু কুঁচকাইয়া বলে, খারাপ লাগছে শুনতে ? আমাকে ভোগ করতে দিই না, তবু টাকা চেয়ে নিই, এটা খুব খাপছাড়া মনে হচ্ছে ? তা তো মনে হবেই, তোমরা পুরুষ মানুষ যে ! বিয়ে করবার আগে তোমরা বড়ো বড়ো কথা বলতে পার, বিয়ের পর সে সব কথা মনে রাখলে দোষ হয় আমাদের। সবাই নাকি জানে ওসব বড়ো বড়ো প্রতিজ্ঞা ভালোবাসার প্রলাপ ! সবাই জানে জানুক, আমি জানি না। জানতে চাই না। বিয়ে করবার জন্য পায়ে ধরে তো সাধিনি আমি ? স্পষ্ট বলেছিলাম টাকার জন্য তোমায় বিয়ে করছি, যা খুশি করব, যেখানে খুশি থাকব, কিছু বলতে পাবে না। ভালো না লাগে একসঙ্গে থাকব না, কিন্তু যতকাল বাঁচি আমায় টাকা দিয়ে যেতে হবে। মাসে মাসে আমার মিনিমাম কত টাকা চাই তাও বলেছিলাম। যদি মনে করে থাকে আমার সে সব ছলনা, আমি দুষ্টামি করে আবোল-তাবোল বকছি, ওর সঙ্গে খেলা করছি, তার জন্য কি আমি দায়ী ? তোমরা যে কী দিয়ে গড়া বুঝতে পারি না, এখনও ওর ভুল ভাঙল না। এখনও বিশ্বাস করে ওকে ভালোবাসি, আমার একটা পাগলামির পিরিয়ড চলছে, এটা কেটে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

ভালোবাসায় তুমি বিশ্বাস করো না ?

না।

তুমি কখনও ফিরে যাবে না ?

না।

মোহন যে জিদের কথা বলিয়া অনুযোগ দিয়াছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণের মতো এমন স্পষ্ট জবাব দিলে আর কী বলা যায় ?

ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। বাস্তব জীবনে যেসব চলতি এবং সর্বজন স্বীকৃত ফাঁকি আছে সেগুলিকে ফাঁকি বলিয়া মানিতে চায় না। সব ফাঁকি নয়—যেগুলি না মানিলে তার নিজের সুবিধা হয়, কেবল সেইগুলি। যেমন বিবাহের আগে প্রেমের উন্মাদনায় চিন্ময় যেসব আবোল-তাবোল কথা বলিয়াছিল প্রতিজ্ঞার মতো, চুক্তির মতো ওই কথাগুলি চিন্ময়কে সারা জীবন মানিয়া চলিতেই হইবে।

এ বিষয়ে আর আলোচনা হইল না। ভবিষ্যতে হইবার আর কোনো সম্ভাবনাও রহিল না।

মোহনের একবার ইচ্ছা হইল সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করে, চিন্ময় টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সে কী করিবে ? কিন্তু ইচ্ছাটা সে চাপিয়া গেল।

কারণ তার মনে পড়িয়া গেল, সোজাসুজি ওদের ঝগড়া হয় নাই। এভাবে চিরকাল চলিতে পারে না, ঝগড়া একদিন ওদের হইবেই। সন্ধ্যার পক্ষেও আজ বলা সম্ভব নয় যে হয় আপস করা অথবা সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার ওই বাস্তব সমস্যা দেখা দিলে সে কী করিবে !

মোহনকে সন্ধ্যা তখন ছাড়িয়া দিল না। এ বেলা তাকে এখানে খাইতে হইবে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গে বাহির হইবে।

আজ শনিবার, কলিকাতায় রেস আছে। মনসুন কাপে একটা ঘোড়ায় সন্ধ্যা অনেকগুলি টাকা রিস্ক করিবে ঠিক করিয়াছে।

ঘোড়াটা জিতিবে,—জিতিবেই। এখন ফেভারিট না হইয়া যায় ঘোড়াটা, তা হইলে বেশি টাকা পাওয়া যাইবে না !

রেসে কখনও জিতেছ সন্ধ্যা ?

উঁহুঁ। রেসে কেউ জেতে ?

তবে খেল কেন ? জিততে পারবে না জেনেও টাকা নষ্ট কর কেন ?

খেলে মজা পাই তাই খেলি।

ট্রেনে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই, গাড়িটাকে অসুখ সারাইতে হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যার এমন বিশ্রী লাগে ট্রেনে যাইতে !

ফোন করিয়া দিলে শহর হইতে গাড়ি নিয়া আসার বন্ধু অবশ্য আছে কয়েকজন, কিন্তু আজ যখন মোহন আসিয়াছে, দু-চার-ছ মাসের মধ্যে সে যখন আর আসিবে না, আজ আর কাউকে ডাকিয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যা হাসে।

ভাবপ্রবণতা নাই বলে, তবু যে সন্ধ্যা এমনভাবে কী করিয়া হাসে মোহন বুঝিতে পারে না।

আমি একটা গাড়ি কিনেছি সন্ধ্যা।

কিনেছ ? বলো কী ! বাড়িতে ফোন করে দাও না, ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে আসুক ?

এগারোটায় সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বেলা একটার সময় তারা যখন বাহির হইল, তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে।

তবু রেস খেলতে যাওয়া চাই ?

সন্ধ্যা আগের বারের মতোই ভাবের উদ্দীপনার রসালো হাসি হাসে।

বৃষ্টি থেমে যাবে।

শহরের মধ্যে পথে নানা স্থানে জল জমিয়াছে, এক জায়গায় এত জল জমিয়াছে যে ট্রামবাস সব দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিয়া গ্রামের বন্যার কথা মোহনের মনে পড়ে।

পথের বন্যা কয়েক ঘণ্টা পরে সরিয়া যাইবে, গ্রামের বন্যা দিনের পর দিন পথঘাট গৃহাঙ্গন জুড়িয়া থাকে, ঘরও ভাসিয়া যায় অনেক। গ্রামের মানুষ চুপচাপ সহ্য করিয়া যায়, এখানে এই সাময়িক অসুবিধার জন্যও মানুষ কী ভাবে গজর গজর করে, খবরের কাগজে কড়া কড়া মন্তব্য বাহির হয় ! শহরের মানুষের কি প্রাণশক্তি বেশি ? নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কি তারা বেশি বোঝে ?

অথবা হয়তো গ্রামের মানুষের জীবন দুর্বহ করেন স্বয়ং প্রকৃতিরূপী ভগবান, যার বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে না। শহরের সুবিধা অসুবিধার ব্যবস্থা মানুষের হাতে, শহরবাসী তাই সুবিধার একটু অভাব হইলেই অসন্তোষ জানায় !

সকলে জানায় কি ? শহরে উজ্জ্বল আলোর গাঢ় ছায়ান্ধকারে শহরের সব রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত যারা বাস করে ?

তাদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসাভাসা। সে শুধু আবর্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলায় বাতি জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বস্তি দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে।

ও সব স্থান ও ঘরের সকলে নালিশ জানায় কি ?

অন্যপথে গাড়ি রেসকোর্সে গেল।

এই বৃষ্টিতেও মানুষ দলে দলে রেস খেলিতে চলিয়াছে। তাদের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেকেই তারা অনেক টাকা বাজি জিতিবে, সবুর সহিতেছে না !

সস্তা এনক্লোজারের সামনে লম্বা লম্বা অনেকগুলি সারি, দেখিলেই চেনা যায় এরা সেই শ্রেণির লোক, ট্রেনেও যারা থার্ড ক্লাসে চাপে, নিয়ন্ত্রণ করা দারিদ্র্য যাদের জীবন-ধর্ম।

এদিকে মোটর গাড়ির গাদা জমিয়া গিয়াছে, মোহনের গাড়ির চেয়েও কত দামি সব গাড়ি ! এই সব গাড়ির মালিকদের জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাসিয়া বলিবে, টাকা ? টাকা কে কেয়ার করে ! এখানে আসা স্পোর্টসের আনন্দের জন্য। সন্ধ্যাও যা বলিয়াছে—রেস খেলিতে মজা লাগে তাই সে রেস খেলে, টাকা জিতিবার জন্য নয়।

আনন্দ চাই, আনন্দ ! যার আরেক নাম মজা !

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই জলকাদায় এত কষ্ট করিয়াও সে আনন্দ চাই ?—এরা কী জবাব দিবে সে জানে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই একই কথা সকলে বলিবে—কষ্ট করা ছাড়া, অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া কি আনন্দ পাওয়া যায় ?

আবার যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া কষ্ট করিলে, খাটিয়া এবং বেকারি করিয়া হাড়মাস কালো করিবার কষ্ট করিলে, রোগে আর দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে বহিবার কষ্ট করিলে আনন্দ মেলে কি ? রোমাঞ্চ মেলে কি ?

এ প্রশ্নেরও এরা কী জবাব দিবে সে জানে।

বলিবে, ওটা আলাদা প্রশ্ন, ওটা কমিউনিস্টদের প্রশ্ন।

একজন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার মাত্র মোহন রেস দেখিতে আসিয়াছিল, থার্ড এনক্লোজারে। ঘোড়ার দৌড়নোর চেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে দেখিয়াছিল মানুষগুলিকে।

রেসকোর্সের বাহিরের জগৎ সকলের কাছে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া, জকি, ট্রেনার, পজিশন, রেকর্ড এ সব ছাড়া জীবনে ও চেতনায় আর কোনো কিছুর স্থান নাই।

ভিড়ের মধ্যে পরস্পরের গায়ে গায়ে ক্রমাগত ধাক্কা লাগিতেছে, তবু প্রত্যেকে তারা একা। যে যার নিজের হিসাবে মশগুল, কারও দিকে তাকানোর অবসর নাই।

ঘোড়া দৌড়াইবার সময় যতই ঘনাইয়া আসে তত উত্তেজনা বাড়ে, আনন্দের নেশা চরমে উঠিতে থাকে। কোন ঘোড়ার উপর টাকা লাগানো যায়, সামান্য সম্বলের কয়েকটি টাকা ? অনেক হিসাব করিয়া বন্ধু দু নম্বর ঘোড়াটি বাছিয়া টিকিট কিনিতে পা বাড়াইয়াছে, পাশ দিয়া কে যেন সঙ্গীকে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, পাঁচ নম্বর সিওর, ও ঘোড়াকে মারবে কে ? বন্ধু অমনি পাঁচ নম্বরের টিকিট কিনিতে ছুটিল। যে বাসে তারা আসিয়াছিল তার নম্বর ছিল ২২২, বন্ধু তাই নিঃসন্দেহ হইয়া গিয়াছিল সেদিন দু নম্বরের ঘোড়া জিতিবে।

পর পর দুটি রেসে হারিয়া সে বিশ্বাস ভাঙিয়া গিয়াছিল।

ঘোড়া ছুটিতে আরম্ভ করিলে চিৎকার শুরু হয়, ঘোড়াগুলি যখন সামনে আসে মনে হয় এতগুলি মানুষের ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইবে। কিছু লোক শব্দ করে না, দাঁত দিয়া জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া থাকে, কেউ চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া দেবতাকে দোহাই জানায়।

সেদিন মোহনের সব চেয়ে বিস্ময়কর মনে হইয়াছিল, সকলেব দুর্ভাগাকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার প্রক্রিয়া। বাজির ফলাফল টাঙাইয়া দেওয়ামাত্র একটুক্ষণের জন্য হয়তো মুখে প্রত্যাশার জ্যোতি নিভিয়া যায়, তারপর রেস-বুকের পাতা উল্টাইয়া পরেব বাজিতে মন দেয়। এত আশা, এত উত্তেজনা যে বাজিটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তার গুরুত্ব এখন মিথ্যা, ফলাফল অর্থহীন · কোন ঘোড়া জিতিয়াছে কোন ঘোড়া জেতে নাই কি তাতে আসিয়া যায় ? এবাব যে বাজি আছে তাই নিয়া এখন মাথা ঘামাও।

জীবন যুদ্ধেও কি মানুষ অতীতেব হারজিত তুচ্ছ করিয়া ভবিষ্যতে মশগুল হইয়া থাকে না ? বন্ধুর সঙ্গে রেস দেখিতে আসিয়া সেদিনও মোহন এই কথা ভাবিয়াছিল। রেসে আধঘণ্টা পরে পবে বাজি, কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখ বিবর্ণ হওযার বেশি আপশোশের সময় থাকে না, জীবনে বড়ো রকম পরাজয় ঘটিলে মানুষ কিছুদিন আপশোশ করার সময় পায়।

এক সময় রেস শেষ হইয়া গেল সেদিনকার মতো।

প্রায় সাড়ে সাতশো টাকা জিতিয়া সন্ধ্যা গর্বে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। রেসে বাজি জেতার এ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হয়তো ভাবপ্রবণতার সম্পর্ক নাই। ভাবপ্রবণতা শুধু হৃদয়ের কাববারে থাকে !

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া শ্রান্ত মোহন জলে ভেজা কাদামাখা মানুষের স্রোতের দিকে চাহিয়া থাকে, পাশে বসিয়া সন্ধ্যা অজস্র কথা বলিয়া যায় ! কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু পরিষ্কার করা হইয়াছে তবু কাদামাখা মানুষগুলির চেয়ে নিজের গাড়ির জন্য মোহনের বেশি মমতা হইতেছিল।

বাড়ি ফিরবে তো ?

এখন ? বেশ চলো।

আমি আর যাব না, বাড়িতে কাজ আছে।

সন্ধ্যা জিদ করে, মোহন কিন্তু রাজি হয় না। চিন্ময়ের কথা তার মনে পড়িতেছিল। সারাদিন সন্ধ্যার সঙ্গে কাটিয়াছে, এখন আবার তার সঙ্গে ব্যারাকপুরে ফিরিয়া গিয়া রাত না হোক সন্ধ্যাটা কাটানো উচিত হইবে না।

শেষে সন্ধ্যা প্রায় কাতরভাবে বলে, তুমি না গেলে বাড়ি ফিরে একা একা কী করব ? সময় কাটবে কী করে ? অন্তত কোনো একটা সিনেমায় যাই চলো, তারপর বাড়ি ফিরো ?

এমন করুণ শোনায় সন্ধ্যার আবেদন, এমন কাতর মনে হয় তাকে সময়ের পীড়নে ! সময় না কাটার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে তো এ ভাবে সময়কে কেউ ভয় করিতে পারে না ?

এক একা সময় তবে কি কাটে না সন্ধ্যার !

আমার ওখানে যাবে ?

আজ থাক।

যাওয়ার অনেক বাড়ি আছে সন্ধ্যার, বন্ধুর তার অভাব নাই। দু তিনটা হোটেলের যে কোনো একটাতে গেলেই বন্ধু আর বান্ধবীদের সঙ্গে হইচই করিয়া রাত চারটা বাজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আজ সে কোথাও যাইতে চায় না, অন্য কারও সঙ্গ কামনা করে না। কারণ মোহন যে আজ সঙ্গে আছে, অনেকদিন পরে সঙ্গে আছে।

তাই তো মানে সন্ধ্যার কথার ?

শেষ বেলার সঙ্গে সন্ধ্যার ম্লান রূপের সামঞ্জস্য স্পষ্ট হইয়াছে। শাড়ির রংটাও কি বদলাইয়া যাইতেছে সন্ধ্যার ?

আকাশে দিনান্তের সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ?

এই অদ্ভুত রকম আধুনিক শাড়ি কিনিতে সন্ধ্যা না জানি কত টাকা আদায় করিয়াছে চিন্ময়ের কাছে।

দিনে সূর্যের আলোয় শাড়িটা এক রকম দেখায়, সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঠেকাইবার জন্য বানানো আলো উজ্জ্বল হওয়ায় সঙ্গে বদলাইয়া যায় শাড়িটার রঙের বৈচিত্র্য।

সন্ধ্যা তাকে একটা সাধারণ বিলাতি হোটেলে নিয়া যায়। দেশি মালিকের বিলাতি হোটেল, বিলাতি হোটেলের মতো সহজ জাঁকজমক নাই কিন্তু ঠাট আছে। রেস খেলায় থার্ড এনক্লোজারে যারা আজ জিতিয়াছে তারা এই হোটেলে ভিড় করিবে। আসল বিলাতি হোটেলে যাইতে তারা অবশ্য কিছুমাত্র ভয় পায় না—রেসে একদিন দাঁও মারিতে পারিলে টাকাগুলি পকেটে নিয়া ওই বিলাতি হোটেলেই তারা যায়—ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া সগর্বে সগৌরবে বয়কে হুকুম দিয় পেগ আনাইয়া পান করে। সায়েবের চেয়েও কড়া গলায় বয়কে ধমক দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বয়ও জানে মানুষটা আজ দরাজ হাতে বখশিশ দিবে।

সন্ধ্যা মিষ্টি হাসি হাসে।

বুঝতে পারছি তোমার ভালো লাগছে না। একেবারে ভুলেই গেছিলাম তুমি গাঁ থেকে আসছ, মেয়ে বন্ধু নিয়ে রেস খেলা হোটেলে পেগ খাওয়া তোমার পছন্দ নয়।

গাঁ থেকে এসেছি বলেই কি—

রাগলে ? রেগো না। এটুকু তোমার শেখা উচিত, আমি মোটেই ও ভাবে কথা বলছি না, তোমায় খোঁচা দিচ্ছি না। আমি কি বলছি জানো ? এতদিন শহর থেকে দূরে ছিলে বলেই বোধ হয় তুমি আমার একমাত্র বন্ধু আছ—খাঁটি বন্ধু আছ।

মোহন চমৎকৃত হইয়া যায়, অভিভূত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সে একমাত্র বন্ধু—খাঁটি বন্ধু !

সন্ধ্যা ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে।

সে ছাড়া সন্ধ্যাব বিশ্বাসী খাঁটি বন্ধু একজনও নাই !

সন্ধ্যা নিজেই একটা প্রস্তাব করে। মোহনকে বাড়ির সামনে নামাইয়া দিয়া সন্ধ্যা গাড়ি নিয়া ব্যারাকপুর চলিয়া যাইবে, পরদিন গাড়ি ফেরত দিতে আসিবে, লাবণ্যের সঙ্গেও দেখা করিয়া যাইবে।

তোমার লাইসেন্স নেই ?

তাতে কি ? পুলিশ কি ওত পেতে আছে ?

চিন্ময়ের মধ্যস্থতা ছাড়াও মোহনের সামাজিক জীবনের পরিধি বাড়িতে লাগিল। চিন্ময় কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল, জগদানন্দ কয়েকজনের সঙ্গে করাইয়া দিয়াছে, সন্ধ্যা আরও কয়েকজনের সঙ্গে দিল। এই পরিচিতেরা আবার যোগাযোগ ঘটাইয়া দিল নতুন মানুষের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল হরদম, বাড়িতেও মানুষের পদার্পণ ঘটিতে লাগিল প্রতিদিন।

একদিন মোহন মস্ত একটা উৎসবের আয়োজন করিল। সেদিন তার বাড়ির এক গেট দিয়া একত্রিশখানা গাড়ি ঢুকিয়া আরেক গেট দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েদের দামি দামি বিচিত্র শাড়িতে বাড়িটা ঝলমল করিতে লাগিল।

পুরুষ ও নারীর এই ভিড়ের মধ্যে সেদিন মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল চিন্ময় ও সন্ধ্যার।

দেখা যে হইবে দু জনেরই তা জানা ছিল—না জানাইয়া তাদের ডাকিতে মোহনের ভরসা হয় নাই। যারা দুজনের পৃথক বাস করার খবর জানিত তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া সেই যে তারা তফাতে সরিয়া গেল, পরস্পরের দিকে আর তারা চাহিয়াও দেখিল না।

মোহন শুধু বুঝিতে পারিল ওটা তাদের শুধু লোক দেখানো আলাপ নয়, পরস্পরকেও তাদের প্রথমে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল যে বিদ্বেষ তাদের নাই। পরস্পরের মধ্যে তারা বুঝাপড়া করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, আবার বুঝাপড়া হইলে একদিন কাছে আসিবে।

মোহনের ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। দেশে অত সমারোহের সঙ্গে বাপের বার্ষিক কাজ সম্পন্ন করিবার সময়েও তার এতখানি উদ্‌বেগ জাগে নাই, আজ শহরের শ খানেক নরনারীকে বাড়িতে আহ্বান করিয়াই সে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

দেশে কি ত্রুটিবিচ্যুতির ভয় ছিল না, নিন্দার ভয় ছিল না ? দেশের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত মানুষেরা কী ভাবিবে, কী বলিবে এ চিন্তা কি এতই তুচ্ছ ছিল তার কাছে ?

তাই স্বাভাবিক। তারা ছিল নীচের স্তরের মানুষ, আজ মোহনের বাড়িতে যারা আসিয়াছে তারা উঁচু স্তরের। এই স্তরে উঠিবার চেষ্টা মোহন করিতেছে, ওদের প্রথম বাড়িতে ডাকিয়া ভয়ে ভাবনায় কাবু হইয়া পড়িবে বইকী।

উৎসবের শেষে শুধু জগদানন্দ এবং সন্ধ্যা ছাড়া সকলে হাসিমুখে বিদায় নিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটা সিগারেট ধরাইয়া মোহন অসীম গর্ব ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেছে, জগদানন্দ বলিল, ত্যাগ, উদারতা, অনুভূতি, আদর্শ এসব কিছু নেই, সবকটা স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ কুটিল। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া কিছু বোঝে না, কোনো বিষয়ে মাথা ঘামায় না। শুধু বাইরের চাকচিক্য।

এ সব শোনা কথা। ব্যর্থ নিষ্পেষিত আশাহীন দুঃখী মানুষেরা এই সব অভিযোগ করে। কিন্তু কথাগুলি স্বয়ং জগদানন্দের মুখে শুনিতে হওয়ায় মোহনের চমক লাগিয়া গেল।

সন্ধ্যা বলিল, শহুরে মানুষ এই রকম হয়।

শহুরে মানুষ ? শহুরে মানুষ বলে কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষ আছে নাকি ? ওদের প্রকৃতিই এই রকম। যেখানে থাক ওদের জীবন কাটাবার মূলনীতিটাই এই রকমই থাকবে, ধরনটা একটু ভিন্ন হতে পারে। শহরের বাইরে ওরা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, অতটা চোখে পড়ে না। শহরে ওরা

দল বাঁধে, নিজেদের সমাজ তৈরি করে আর নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে বাইরের পালিশটা কার কত চকচকে। লোকে ভাবে দোষটা বুঝি শহরের। শহরে বাস করে বলেই ওরা এ রকম হয়েছে। কিন্তু একটা শহরের লোকের মধ্যে ওরা আর ক জন ! শহরের বেশির ভাগ লোক সাধারণ স্বাভাবিক। শহুরে বলতে শুধু ধরা চলে যারা গেঁয়ো মানুষ নয়, যারা গ্রামের বদলে বাস করে শহরে। অন্য রকম মনে করলে শহরের উপর রীতিমতো অন্যায় করা হয়।

সন্ধ্যা হাসিল।

শহরের নিন্দে আপনার সয় না।

কেন সইবে ? নিন্দে করার কী আছে শহরের ?

শহরের জীবন বড়ো বেশি কৃত্রিম !

কৃত্রিম ? শহরের জীবন ? প্রদীপের বদলে বালব্ জ্বালা, পুকুরের বদলে কলের জল খাওয়া, গোরুর গাড়ির বদলে ট্রামে বাসে চাপা, মেটে খড়ের ঘরের বদলে পাকা বাড়িতে থাকা—এ সবের জন্য ? অথবা শহরে হোটেল রেস্তোরাঁ সিনেমা থিয়েটার আছে বলে ? অথবা খেলার মাঠ আলোবাতাস গাছপালার অভাবে শরীর মনের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে—

সন্ধ্যা বাধা দিয়া একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে, আমি তা বলিনি। ও তর্ক পচে গেছে জানি।

শুধু পচে যায়নি, বাতিল করে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য যা কিছু দরকার তা কখনও কৃত্রিম হয় না। কোনো একটা শহর তৈরির দোষ থাকলে সেটা সাধারণভাবে শহরের দোষ বলে ধরা উচিত নয়। শহর যদি নোংরা হয়, সেটা কি শহরের দোষ ? ওদিক থেকে তর্ক তুললে আমার রাগ হত, হয়তো ঝগড়াই করে বসতাম আপনার সঙ্গে ! কিন্তু শহরের জীবনের তাড়াহুড়োকে কি আপনি কৃত্রিমতা বলেছেন ? অথবা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব তুচ্ছ করে শহরের লোকের ফরসা জামাকাপড় পরে সিনেমা দেখতে যাওয়াকে ?

না, আমি তাও বলছি না।

জগদানন্দ হাসিমুখে বলে, এ কথা বললেও রাগ করতাম। পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার মফস্বলেই বা কজনে খায়, খেতে পায় ? গ্রামে যার নেংটি পরলে ভালো খাবার জোটে, সেও নেংটি পরে না, খাবারের বদলে ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। আপনার কথা বুঝেছি, নিয়মের বিকারকে আপনি কৃত্রিমতা বলছেন। আমিও তাই বলি। কিন্তু শহরের জীবনে সেটা কি গ্রামের চেয়ে বেশি আছে ? তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না একই নিয়মে বাঁধা। নেশার আনন্দ আর প্রতিক্রিয়ার বিষাদ তো তাদের দরকার হয় না। জীবনটা ওদের কৃত্রিম মনে হয় কেন জানেন ? শহুরে জীবনের বৈচিত্র্য ওদের সহজে অবাক হবার ছেলেমানুষিটা নষ্ট করে দেয়। যন্ত্রের বিস্ময়, নানা-ধরনের মানুষ আর তাদের বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্র মতিগতির বিস্ময়, খাপছাড়া ঘটনায় বিস্ময় এ সব যায় কেটে। আর সেই সঙ্গে রূপকথার আদর্শ আর নীতিবাদের স্বাদটা একটু পানসে হয়ে যায়। আলু সিদ্ধর চেয়ে তখন আলুর চপ ভালো লাগে, স্বভাব সুন্দরীর ঘামে আর তেলে ভেজা চকচকে মুখের চেয়ে কলেজ গার্লের পাউডার দেওয়া মুখের লাবণ্য বেশি পছন্দ হয়, বোকার মতো আলাপ করার বদলে কথায় কিছু প্যাঁচ আর জটিলতা আনে, দাদামশায়ের ধাঁধার বদলে ক্রসওয়ার্ড পাজল্ সলভ করে আনন্দ পায়।

তার কথাটাই নিজের পক্ষের যুক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে সন্ধ্যা বলে, তার মানেই তো হৃদয় ওদের একটু শক্ত হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিকার এলে জীবন কৃত্রিম হয়ে ওঠে না ? শহরের লোক যে যার নিজেকে নিয়ে থাকে, কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না। পাশাপাশি বাড়ি, এক বাড়ির লোক জানেও না আরেক বাড়ির লোকেরা কী করে বেঁচে আছে, কেয়ারও করে

না। মড়াকান্না শুনলেও একবার উঁকি মেরে দেখতে যায় না কে মরল। কেবল তাই নয়, বছরের পর বছর ধরে যাদের মধ্যে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা চলেছে তাদের মধ্যেও শুধু থাকে একটা বাইরের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব হয় না, হৃদয়ের যোগাযোগ হয় না।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক ? হৃদয়হীন স্বার্থপর মানুষ স্বাভাবিক ?

হৃদয়হীন স্বার্থপর মানুষ নয়। ব্যক্তিগতভাবে একটা মানুষ ক জনের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে বলুন তো ? শহরে যারা থাকে বছরের পর বছর ধরে কত লোকের সঙ্গে তাদের মেলামেশা করতে হয় ভাবুন তো ? সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে হলে হৃদয়ের অবস্থা একটু কাহিল হয়ে পড়বে না ? বিশ্বপ্রেমিক সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সব মানুষকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ক জনের জন্য নিজের মনকে কাঁদাবার ক্ষমতা তার আছে ? একশো লোকের সঙ্গে যারা শুধু ভদ্রতার সম্পর্ক রেখে চলে, একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন ওই একশো জন ছাড়া আরও পাঁচ-সাতজন আছে, যারা তার বন্ধু। পাশের বাড়িতে মড়াকান্না শুনলে যে উঁকি মারতে যায় না, কারও সর্দি হয়েছে শুনলে সেই হয়তো ব্যস্ত হয়ে শহরের আরেক প্রান্তে ছুটে দেখতে যায় ! গ্রামের লোকের আরেক পাড়ার বাড়ির সঙ্গে পাশের বাড়ির সর্ম্পক রাখা চলে, কারণ সত্যই হয়তো, দুটো বাড়ির মধ্যে আর একটিও বাড়ি নেই। শহরে পাশের বাড়ির সঙ্গেও সে সম্পর্ক রাখা চলে না। শহরের পক্ষে সেটাই নিয়ম। মানুষের সময়, ধৈর্য, সহনুভূতি কিছুই তো অসীম নয়।

সন্ধ্যা দমিয়া গিয়াছিল। পরাজয় স্বীকার করার মতোই আলগোছে সে বলিল, যাই হোক, শহরে পাপ বেশি।

কোন হিসাবে পাপ বেশি ? শহরে লোকসংখ্যা আর পাপের পরিমাণ হিসাব করে দেখেছেন ?

না তা দেখিনি।

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল।

জগদানন্দ হাসিল না, গভীর আপশোশের সঙ্গে বলিল, শহর সম্বন্ধে আপনাদের কত রকমের যে ভুল ধারণা, ভাবলেও দুঃখ হয়।

নড়িয়া চড়িয়া জগদানন্দ সোজা হইয়া বসে। শহর সম্পর্কে আলোচনায় তার আগ্রহ এবং উৎসাহের আতিশয্য মোহনের বিস্ময়কর মনে হয়। কেবল তর্ক করিয়া নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করা নয়, শহরকে যেন মানুষটা প্রাণ দিয়া ভালোবাসে। শহরকে সমর্থন করিয়া ধীরে ধীরে সে নিজের বক্তব্য বলিয়া যায়, রাত্রি যেন গভীর হইয়া আসে নাই, সারাদিনের হাঙ্গামা ও উত্তেজনায় কেউ যেন এতটুকু শ্রান্ত নয় ! লিখিত বক্তৃতার মতো তার গুছানো কথাগুলি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় এ বিষয়ে সে কত চিন্তা করিয়াছে।

শুনিতে শুনিতে নিজেকে সত্যই একটু বিপন্ন মনে হয় মোহনের। কতগুলি বিশ্বাস ও ধারণায় তার সুনিশ্চিত নির্ভর ছিল, খেলনা-বেলুনের মতো সেগুলিকে এখন মনে হয় ফাঁপা।

লাবণ্যও মন দিয়া শুনিতেছিল। চোখ দুটি তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু। সেই চোখের দিকে চোখ পড়ায় জগদানন্দ হঠাৎ থামিয়া গেল।

ইস্, আপনাদের ঘুম পেয়েছে।

আপনার পায়নি ? লাবণ্য আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

প্রশ্নটা ছেলেমানুষি। দশ বছরের মেয়ের মুখে মানাইত। প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে অপরিমাণ শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিটা অন্য যে কোনো মানুষ সম্পর্কে হয় কৃত্রিম না বিসদৃশ মনে হইত।

তবে জগাদনন্দ এ পরিবারের গুরুদেবের ভাই, এ বাড়িতে পদার্পণ ঘটিলেই মোহনের মা তাকে প্রণাম করেন। লাবণ্যকে মন্ত্র দেওয়ার জন্য অনুরোধও তিনি জানাইয়া রাখিয়াছেন। জগদানন্দ স্বীকার

করে নাই। তবু সে এই পরিবারের গুরুবংশের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তির বর্তমান উত্তরাধিকারী। তাকে যত খুশি শ্রদ্ধা করা চলে, ছেলেমানুষের মতো ছ্যাবলামি করার মতো সেটা প্রকাশ করিয়া দেখানোও চলে।

তাই একমাত্র মোহন ছাড়া তার ছেলেমানুষিতে কেহ বিরক্ত হয় না। তার সরলতা সন্ধ্যার ভালোই লাগে।

আজ রাতটা সন্ধ্যা এখানেই থাকিবে।

আগে কিছুই ঠিক ছিল না, সকলের বিদায় নেওয়ার আগে। মোহন জানিত সন্ধ্যা গাড়িতে আসিয়াছে, গাড়িতেই বাড়ি ফিরিয়া যাইবে। বিদায় নেওয়ার সময় আসিলে সন্ধ্যা বলিয়াছিল, বেশি খাওয়া হয়ে গেছে মোহন।

খারাপ লাগছে ?

ভাবী খারাপ লাগছে।

তাই তো।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে যদি—?

তাই তো।

থাক, আজ রাতে আর যাব না। গাড়ি ফিরে যাক। সকালে বরং ট্রেনেই ফিরে যাব। সকাল ছটা পর্যন্ত বাবা আমাকে গাড়ি ধার দিয়েছে, ফিরতে দেরি হলে চটবে।

আমার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবখন।

সন্ধ্যা হাসে।

মুখ ফুটে একটু বলো এ সব কথা নিজে থেকে। রাতে এখানে থাকবার কথাটা তো যেচে বলতে হল আমাকে। তোমার মুখে খালি শুনলাম, তাইতো ! তাইতো ! যেচে যেচে তোমার কাছে সব আদায় করতে হবে নাকি ?

ড্রাইভারকে ডাকিতে পাঠাইয়া সন্ধ্যা বলিয়াছিল, মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল যে তোমার ? কী হল ? অসুবিধে হয় যদি তো খোলাখুলি সেটা বলো, ওর কাছেই নয় আজ রাতটা কাটাই গিয়ে। বাড়ি কাছেই আছে, এটুকু যেতে গাড়ির ঝাঁকুনিতে বমি আসবে না।

যেচে যাবে ?

সন্ধ্যা সুখের হাসি হাসিয়াছিল।

যেচে ? যাবার সময় অত করে সঙ্গে যেতে বলছিল, ছেলেমানুষের মতো সাধাসাধি করছিল, চেয়ে দ্যাখোনি ?

মোহন চাহিয়া দেখিয়াছিল এবং দৃশ্যটা ভুলিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্যই তবে এতখানি ব্যগ্রভাবে কথা বলিতে দেখা গিয়াছিল চিন্ময়ের ? মাঝে মাঝে চিন্ময়কে আজ সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সঙ্গে যাইতে বলা হয়তো সেই দেখারই পরিণতি। না বলিয়া থাকিতে পারে নাই।

গেলে না কেন !

কেন যাব ? আমায় দেখতে দেখতে একজনের মোহ জাগবে, আর সে ডাকামাত্র লক্ষ্মী মেয়ের মতো তার সঙ্গে চলে যাব ? আমি মানুষ নই ?

সন্ধ্যা গলা নামাইয়া প্রায় ফিস ফিস করিয়া বলিয়াছিল, তাছাড়া আজ এখানে থাকব। তোমার বাড়িতে রাত কাটানোর সুযোগ তো রোজ মেলে না।

তারপর জোরে ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল, আমার কিন্তু কিছু ভালো লাগছে না মোহন।

তা হলে আর দেরি না করে শুয়ে পড়ো। একা ঘরে ভয় করবে না তো ? তা হলে মেয়েরা কেউ বরং—

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট মুখে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, ভয় করবে ? একটা ঘরে রোজ একলা শুই জান না ?

সেটা তোমার নিজের বাড়ি।

এটা বুঝি পরের বাড়ি ? আমি বুঝি পরের বাড়িতে রাত কাটাই ? তুমি অবশ্য আমাকে পর ভাব—

সন্ধ্যা চেষ্টা করিয়া আবার একটু হাসিয়াছিল।

মোহন তখন ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই কথার পর্ব শেষ করিয়া দিল। ঘুমে কাতর লাবণ্যের উপর সন্ধ্যাকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করার ভাব ছাড়িয়া দিয়া বসিবার ঘরে চলিয়া গেল।

ঘুমে লাবণ্যের চোখ মেলিয়া রাখিতে কষ্ট হইতেছিল। কোনোরকমে সন্ধ্যাকে তার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া সে শুধু বলিল, দরকার হলেই আমাদের ডাকবেন। আমরা পাশের ঘরেই আছি।

তারপর কোনোরকমে শ্বশুর শাশুড়ি শুইয়াছেন কিনা খবরটা নিয়াই নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় গা এলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘরে ঘরে আলো নিভিয়া তারপর এক সময় সারা বাড়িটা হইয়া গেল নীরব ও অন্ধকার, আলো শুধু দেখা গেল উপরে মোহনের নিজস্ব বসিবার ঘরে ও নীচে গ্যারেজে শ্রীপতির ঘরে।

একজনের গৃহে এবং আর একজনের বাহিরে সঞ্চয় করা শ্রান্তিতে ঘুম টুটিয়া গিয়াছে।

শ্রীপতির ঘুম আসিতে আরও আধঘণ্টা সময় লাগিল। মোহনের তখনও ঘুম আসিল না।

তার শুধু শ্রান্তি নয়। তার বাড়িতে তার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া যাচিয়া সন্ধ্যা এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে, কয়েক পা হাঁটিয়া ভেজানো দরজাটি ঠেলিয়া তার কাছে যাওয়ার সুযোগ। এ কথা ভাবিতে মোহনের বুক টিপটিপ করিতেছে, এও যে জগতে সম্ভব হয় বিশ্বাস করিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ জীবনটা হইয়া যাইতেছে বিস্বাদ।

না, ও ঘরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নাই।

এই অক্ষমতাকে স্বীকার না করিলে আজ এত রাত্রের বর্তমান জীবনের কোনো অর্থ হয় না।

ফাঁকা ঘরে একা শুইয়া সন্ধ্যার ঘুম আসিয়াছে কিনা কে জানে। সন্ধ্যা যে বলিয়াছিল তার কিছুই ভালো লাগিতেছে না সেটা কিন্তু ছলনা নয়। কথার পর্ব শেষ করিয়া সন্ধ্যাকে বিছানায় আশ্রয় নিতে দেওয়ার প্রয়োজনটা খেয়াল হওয়া মাত্র মোহন সেটা টের পাইয়াছিল।

বেশি খাওয়ার জন্যই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক, সন্ধ্যার খুবই খারাপ লাগিতেছিল - দেহ এবং মন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্মার্ট থাকিতেই হইবে সন্ধ্যাকে—কথায় হারিয়া যাওয়া তার স্বভাব নয়।

জগদানন্দের সঙ্গে তর্কে সে হার মানে নাই, এমনভাবে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া তর্ক শেষ করিয়াছিল যেন তার মোট কথাটা জগদানন্দ মানিয়া নিয়াছে, খুঁটিনাটি নিয়া আর তর্ক করিয়া লাভ নাই।

সন্ধ্যার স্বাস্থ্য সত্যই ভালো নয়। সত্যই তার গা বমি বমি করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, কিছুই ভালো লাগিতেছিল না।

তবু যে আজ সে অভিসারিকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছে তার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি দেয় নাই। তার উপায় নাই ফাঁকি দেওয়ার।

মোহনকে জয় না করিতে পারিলে নিজে সে মিথ্যা হইয়া যাইবে।

চিন্ময়ের কাছে হার মানিবে।

সন্ধ্যার বদলে সে নিজে যদি এই সুযোগটা সৃষ্টি করিত ! কত পৃথক হইয়া যাইত ঘুমন্ত জগতে চুপিচুপি তার সন্ধ্যার কাছে যাওয়া। একদিন সত্যই সে এমনি অভিসারের আয়োজন করিত। সন্ধ্যার বাড়িতে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর হোটেলে যে দিনটা সন্ধ্যার সঙ্গে কাটিয়াছিল, সেই দিনই সে জানিয়াছিল শহরে বাস করিতে আসিয়া এই একটি অনিবার্য সম্ভাবনা সে জীবনে টানিয়া আনিয়াছে।

নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে একদিন হার মানার কল্পনায় তার ফাঁকি ছিল না। এটুকু জানা না থাকিলে সন্ধ্যার ধৈর্যের অভাবটা হয়তো তার এত খারাপ লাগিত না।

এটা সন্ধ্যার উচিত হয় নাই।

জীবন সস্তা হইয়া যাওয়ার দুঃখে অভিভূত মোহন হয়তো আরও দু-এক ঘণ্টা তার নিজস্ব সেই বসিবার ঘরেই কাটাইয়া দিত। হঠাৎ আরও ভয়ংকর একটা ভাবনা মনে আসিয়া তাকে ঝাঁকি দিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিল।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে সন্ধ্যা যদি ধৈর্য হারায় ? নিজে যদি সে এ ঘরে তার কাছে চলিয়া আসে ?

তাড়াতাড়ি মোহন টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপিয়া দেয়। দুইটি ঘরের রুদ্ধ দুয়ার পার হইয়া সন্ধ্যার ঘরের দরজায় হাত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যার দুয়ার ভেজানো নয়। ভিতর হইতে দরজাটি সে বন্ধ করিয়াছে। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই গভীর আরামে চোখে জল আসার মতো তাড়াতাড়ি মোহনের চোখে ঘুম আসে।

ছয়

সকালে সকলে দেরি করিয়া ওঠে।

সবচেয়ে বেলা হয় লাবণ্য, সন্ধ্যা আর নগেনের। আধঘণ্টার মধ্যেই লাবণ্য আবার ফিরিয়া যায় বিছানায়। তার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াই বুঝা যায় আজ এবং হয়তো কালও সে বিছানা ছাড়িবে না।

মোহনকে ডাকিয়া সে করুণ সুরে বলে, বড়ো ডাক্তার ডাকবে বলেছিলে যে ? ডাকো না ?

তিনজনকে তো দেখালে। আর কত বড়ো ডাক্তার দেখাবে ?

আরও বড়ো ডাক্তার—সব চেয়ে বড়ো। মরে গেলে তো আর দেখাতে হবে না।

আচ্ছা ওবেলা ডাকব।

ওবেলা নয়, এখুনি।

সন্ধ্যাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ডাক্তার এসেই তো তোমার কষ্ট কমিয়ে দিতে পারবে না।

পারবে। সন্ধ্যাকে ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসুক। তুমি আমার কাছে থাকো।

বারোটা একটার মধ্যে ফিরে আসব লাবু।

না না, তুমি যেও না। তুমি কাছে না থাকলে সইতে না পেরে আমি হয়তো গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যাব।

লাবণ্য অনেক খাপছাড়া কথা বলে, আজকের কথাটা অদ্ভুত রকমের মৌলিক তবে তার কথার মানে খুব পরিষ্কার। অন্তত তাই মনে হয় মোহনের।

সন্ধ্যাকে আমি নিজে পৌঁছে দিতে না গেলেই তোমার অসুখ কমে যাবে বলছ তো লাবু ?

লাবণ্য অবাক হইয়া মোহনের দিকে তাকায়। তার সেই খাঁটি বিস্ময়ের মধ্যে নিজের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফাঁকিটা মোহন যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

সন্ধ্যার কথা লাবণ্যের মনেও আসে নাই। যন্ত্রণা তার সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, জগতে তার একমাত্র আপনার জনটিকে তাই সে কাছে রাখিতে চায়। সন্ধ্যাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার বদলে তাকে কাছে থাকিতে বলার আর কোনো কারণ নাই।

নিজের একটা অনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে রাগে মোহনের মন জ্বালা করিতে থাকে।

আরেকটি ভেজানো দরজা খুলিতে গিয়া সে যেন বাধা পাইয়াছে। লাবণ্যের কষ্ট দেখিয়া তার মায়া হইত নিশ্চয়, এখন আর কারও জন্য মায়া মমতা কিছুই মাথা তুলিতে পারে না। লাবণ্যকে একটা বড়ি খাইতে দিয়া নিজে সে নীচে চলিয়া যায়, পাঠাইয়া দেয় নলিনীকে।

সকালে ঝরণা আসে।

কাল রাত্রে দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেও বুঝি কিছু টের পাইয়াছিল, সকালে উঠিয়াই সে সন্ধ্যার বাড়িতে ফোন করিয়াছিল। সকালে সন্ধ্যা এখন কোথায় আছে তার বাড়ির লোক বলিতে পারে নাই, শুধু জানাইয়াছে যে সে কাল সন্ধ্যায় মোহনের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে বাহির হইয়াছিল।

ঝরণারও নিমন্ত্রণ ছিল। সে অভিমান করিয়া আসে নাই।

অভিমানের কারণ, মোহন নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাকে সে নগেনকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিল। কিন্তু নগেন যায় নাই।

কিন্তু দাদার সমস্যা অভিমানের চেয়ে বড়ো।

সন্ধ্যা এখানে আছে অনুমান করিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

মোহন যখন কাছে আসিল, বউদির সঙ্গে ঝরণার বোঝাপড়াটা সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে, রাগে দুঃখে অভিমানে ঝরণা কাঁদো কাঁদো এবং মুখখানা তার লাল।

না এলে তুমি, না এলে। তুমি যা খুশি করবে, আমরা চিরকাল সয়ে যাব ভেবেছ ? দুমাসের মধ্যে দাদার যদি না আবার আমি বিয়ে দিই—

আমি বেঁচে থাকতে ? মরে যাওয়ার পরেও পারবে না ভাই, বড্ড বেশি রকম খাঁটি তোমার দাদার ভালোবাসা।

মরাই ভালো তোমার। তুমি মরো।

মোহনকে ঝরণা দেখিতে পায় নাই, দৃষ্টিটা সন্ধ্যার ম্লান মুখেই আটকানো ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষার মতো একটা মুখভঙ্গি করিয়া সে ভিন্ন সুরে বলিতে থাকে, দাদার আমি বিয়ে দেব, দেখো তুমি। এমনি না পারি, আমার বন্ধুকে দিয়ে দাদাকে নষ্ট করাব। তখন তো বিয়ে না করে পারবে না।

এবার ঝরণার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার সঙ্গে তেজও বোধ হয় তার ঝিমাইয়া যায়, ধপ করিয়া সে বসিয়া পড়ে একটা চেয়ারে।

সন্ধ্যা বাহির হইয়া গেলে মোহনও কলের মতো তার সঙ্গে যায়। সন্ধ্যাকে গাড়িতে বসাইয়া সে কিন্তু বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসে।

কাঁদিতে দেখিয়াও ঝরণার সঙ্গে সে একটি কথা বলে নাই, নিজের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করা তার অসম্ভব মনে হয়। ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিতে পায় ঝরণার কান্না থামিয়াছে এবং ইতিমধ্যে কোথা হইতে নগেন আসিয়া তার কাছে কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া আছে।

নগেনের মুখ সজল মেঘের মতো গম্ভীর।

ঝরণাই আগে কথা বলে।

বউদির জন্য দেখলেন ? মুখ তুলিয়া সে লজ্জার হাসি হাসে, আমিও যেমন, গায়ে পড়ে পায়ে ধরে বউদিকে সাধতে আসি। এই নিয়ে এগারো বারোবার সাধাসাধি করলাম।

সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে ঝরণা।

ঝরণা সজোরে মাথা নাড়ে।—আপনি জানেন না। ওর মতো নিষ্ঠুর মেয়ে জগতে নেই।

নিষ্ঠুর নয়, খেয়ালি বলতে পার।

নিষ্ঠুর আর খামখেয়ালি, দুই ই। মেয়েমানুষ খামখেয়ালি হলেই একদম বিগড়ে যায়।

শহুরে মেয়ের মুখে এমন কথা ? কলেজ ডিঙানো এই বয়সের মেয়ের মুখে, স্বাধীন মেয়ের মুখে ?

মোহন কিন্তু বুঝিতে পারে। এ সব চিন্ময়ের গ্রামকে অস্বাভাবিক রকম ভালোবাসার সকর্মক প্রভাবের পরিচয়।

নগেনের জন্য মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে ছিল। এ সব কথার ভাঙাচোরা দু-চারটি টুকরাও ওর কানে যাওয়া উচিত নয়, বয়স্ক মানুষের জীবনে এসব জটিল সমস্যার অস্তিত্বই ওর অজানা থাকা উচিত। বড়ো জোর দুটি একটি সিগারেট খাওয়ার অনুমতি ওকে দেওয়া যায়, এ সব অভিজ্ঞতার ছোঁয়াচ লাগাব বয়স এখনও ওর হয় নাই।

কে জানে কী বলিতে ঝরণা কী বলিয়া ফেলিবে, মোহন তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।

গাড়িতে মোহন বলিল, ফিরে যাও না সন্ধ্যা ?

না আমার সহ্য হয় না।

সুন্দর সুদীর্ঘ পথ সামনে হইতে পিছনে সরিয়া যায়, মোহনের মনে হইতে থাকে হঠাৎ পা পিছলাইয়া সে যেন আছাড় খাইবে। গাড়ির চাকা নয়, পা। পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটার মতো পেশিতে টান ধরিয়া শরীরটা যেমন শক্ত হয়, মনটা যেমন থ বনিয়া থাকে, ঠিক সেই রকম অনুভূতি।

চিন্ময় তোমায় ভালোবাসে মনে হয়।

তুমিও তো আমায় ভালোবাসো ?

না, তোমার জন্য আমার একটা মোহ আছে সত্যি, কিন্তু আমি জানি সেটা ভালোবাসা নয়। দশজনকে সমাজকে না মেনে ভালোবাসা হতেই পারে না। জীবনের আর সব তুচ্ছ করে দু-চারদিনের পাগল হওয়ার ঝোঁকটা কি ভালোবাসা ? জগৎ সংসার ভুলে গেলাম, সব মানুষের ভালোবাসার অধিকার আছে ভুলে গেলাম, সারাটা জীবনের কথা ভুলে গেলাম। জীবন্ত মেয়ে পুরুষের মধ্যেই ভালোবাসা হওয়া সম্ভব —জীবনের হিসাব ছাড়া কি ভালোবাসা হয় ? কাল রাত্রে তোমার ঘরের দরজায় গিয়েছিলাম জানো ? দরজা ঠেলেছিলাম ?

জানি বইকী। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি টোকা দিলেই ছিটকিনি খুলে দিতাম।

তুমি জানো আমি তোমায় ভালোবাসি না। তাই ছিটকিনিটা খুলে রাখতে ভরসা পাওনি। গাঁ থেকে শহরে এসেছে মানুষটা, যদি না বুঝতে পারে ছিটকিনি খোলা রাখার মানে ? ভালোবাসার খেলা মিটে যাওয়ার পরেও যদি একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আর দাবি করে মুশকিলে ফেলে ?

সন্ধ্যা খানিক চুপ করিয়া থাকে।

উপদেশ দিচ্ছ ? স্নেহ করো বলে ?

না। আমার মনে হয় চিন্ময় তোমাকে ভালোবাসে।

না পেলে ভালোবাসে। ফিরে গেলে কী হবে জানো ? পনেরো দিন একমাস আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর ঘণ্টাখানেক আমায় পেলেই যথেষ্ট। রাত এগারোটায় ঘরে আসবে, একটা সিগারেট ধরিয়ে এক দৃষ্টিতে আমায় দেখবে, সিগারেটটা শেষ করে বুনো জানোয়ারের শিকার ধরার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। বারোটার সময় নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে।

সন্ধ্যা মাথা নাড়ে—ভুল বললাম। ঘুমোবার সময় নাক ওর ডাকে না।

এইজন্য যাও না ? আমি ভাবছিলাম, ছেলেমেয়ের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের গন্ডগোল চলছে।

ছেলেমেয়ের ব্যাপার ? মাথা খারাপ নাকি তোমার ?

সন্ধ্যা পথের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। মোহনের অজ্ঞাতেই গাড়ির গতি বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ সন্ধ্যার অস্ফুট কাতরোক্তি তার কানে গেল, আস্তে চালাও না একটু ? মাগো, একটু আস্তে চালাও। সবাই কি সমান তোমরা ?

গাড়ির গতি শ্লথ হইয়া আসিলে সে যেন আরাম বোধ করিল, ভালো করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া দু আঙুলে আলগোছে মোহনের বাহুমূল চাপিয়া ধরিল। মেয়েদের মেয়ে বন্ধু থাকে, আমার বন্ধু পুরুষ—তুমি। আমাকে তোমার খাপছাড়া মনে হত, ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারতে না—এখনও খাপছাড়া লাগে। তার কারণ, তোমার সঙ্গে আমি ঠিক বন্ধুর মতো ব্যবহার করতাম। তুমি না থাকায় ক বছর বড়ো কষ্ট পেয়েছি মোহন। এমন একলা মনে হত নিজেকে কী বলব।

মোহন মুখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, না না, তুমি চুপ করে থাকো। আমায় কথা বলতে দাও।

তবু মোহন বলে, তোমায় একখানা চিঠি লিখেছিলাম।

মনে আছে, জবাব দিইনি। চিঠি ! মনের বোঝা কমাতে রোজ যার সঙ্গে কথা বলা দরকার, তার সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করে কী হত ?—জানো মোহন, আসলে আমি চিরদিন খুব ভীরু আর শান্ত ছিলাম ? তুমি ভাবতে সন্ধ্যা বুঝি খুব তেজি একগুঁয়ে স্মার্ট মেয়ে, কিন্তু ভেতরে সত্যি আমি খুব ঠান্ডা ছিলাম। আর দশটি মেয়ের সঙ্গে তাদের মতো চলতাম, শুধু নকল করতাম। কোনোদিন কোনো বিষয়ে কাউকে ছাড়িয়ে যাইনি। জানো, তুমি ছাড়া কোনো ছেলে আমাকে কোনোদিন একলা বেড়াতে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি ? দুচার জন মেয়ে কাছে থাকলে বুক ফুলিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারর্কি দিতাম, এমন ভাব দেখাতাম যেন আমার অসাধ্য কাজ নেই। কেউ না থাকলেই আমার বুক দুরদুর করত। এখন আমি যার তার সঙ্গে রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে দিই, হোটেলে বসে ককটেল খাই। কেন জানো ? ওঁর ভীষণ ভালোবাসা সইতে পারি না বলে। তবে—

ভীষণ ভালোবাসা ! চিন্ময়ের মতিগতি ভালো করিয়া জানা না থাকিলে মোহনও হয়তো ভীষণ ভালোবাসার মানে বুঝিয়া নিত কড়া ভালোবাসা, দুর্দান্ত ভালোবাসা। সন্ধ্যা কি অর্থে 'ভীষণ' বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে মোহন বুঝিতে পারে। চিন্ময়েব ভালোবাসা শুধু কড়া বা দুর্দান্ত নয়—কোমলও বটে, এদিকে আবার বড়ো বেশি গভীর, বড়ো বেশি সজাগ।

সন্ধ্যার জন্য নিজের প্রেম সম্পর্কে সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা সচেতন হইয়া থাকে, সন্ধ্যাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিবার সুযোগ দেয় না যে সে তাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে !

সন্ধ্যাও তাই বলে। বলে, একেই তো মানুষটা সব বিষয়ে সিরিয়াস—ভালোবাসা পর্যন্ত অত সিরিয়াস হলে মানুষের সয় ? তবে—।

তবে ?

তুমি থাকলে এ রকম হত না। আমি ঠান্ডাই থাকতাম। আমার কেউ ছিল না মোহন।

তুমি বেশ ঠান্ডা লক্ষ্মী মেয়েই আছ সন্ধ্যা।

বেলা দেড়টার সময় বাড়ি ফিরিয়া জগদানন্দকে লাবণ্যের ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মোহন আশ্চর্য হইয়া গেল।

কলিকাতার সব চেয়ে ভালো সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে নামকরা ডাক্তারকে আনার জন্য নগেনকে লাবণ্য জগদানন্দের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

জগদানন্দ নিজেই ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া এইমাত্র ডাক্তার বিদায় হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যেই লাবণ্য একটু ভালো বোধ করিতেছে।

তুমি তো চলে গেলে আমায় ফেলে, আমার এমন ভয় করতে লাগল, যদি মরে যাই ? উনি বলছেন সেরে যাব।

কে, ডাক্তারবাবু ?

না, উনি।

মোহন অস্বস্তিবোধ করিতে থাকে, বিরক্তও হয়। লাবণ্যের কাণ্ডজ্ঞান নাই, লজ্জাসরম নাই। এ কি তার জ্বর হইয়াছে যে বাহিরের লোককে ঘরে বসাইয়া অসুখের কথা আলোচনা করিতেছে ? মেয়েলি অসুখের অশ্লীল বিজ্ঞাপন রচনার পরামর্শ সভা যেন বসিয়াছে তার অন্দরে তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। দু কান মোহনের ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে।

গুরুদেবের ভাই বলিয়া জগদানন্দ যে তার মায়েরও প্রণম্য, লাবণ্যের সঙ্গে তার যে পিতার মতো সম্পর্ক, এটা মোহনের খেয়াল থাকে না।

জগদানন্দ বলে, ডক্টর উপেন সা-কে এনেছিলাম। আমার বাড়িতেও উনি চিকিৎসা করেন। জগদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি তবে যাই এবার ?

লাবণ্য বলিল, হ্যাঁ, আসুন। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, আপনার বোধ হয় খাওয়াও হয়নি।

খাওয়া মোহনেরও হয় নাই।

কিন্তু লাবণ্য যে তার খাওয়ার কথা উল্লেখ করে না, সেটা অন্যায় নয়। সন্ধ্যাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গিয়া সে বাড়ি ফিরিয়াছে বেলা দেড়টায়—তারা কী করিয়া ভাবিবে যে সন্ধ্যা তাকে খাইতে না দিয়া বিদায় করিয়াছে ?

লাবণ্যের সকাতর আবদার উপেক্ষা করিয়া সে সন্ধ্যাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যা স্নানাহার না করিয়া তাকে আসিতে দেয় নাই বলিয়াই তো ফিরিতে তার এত বেলা হইয়াছে।

এ সব মোহন বোঝে। খিদেয় তার পেট জ্বলিয়া যাওয়ার জন্য সন্ধ্যা যে দায়ি নয়, এরা তা কেমন করিয়া জানিবে।

সন্ধ্যাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার খানিক পরেই সে বিদায় নিয়াছিল। এতক্ষণ শুধু শহরের রাস্তায় রাস্তায় পাক দিয়া বেড়াইয়াছে।

কেনাকাটা সারিয়া তার বাপের যেমন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল পায়ে হাঁটিয়া শহরের পথে ঘুরিয়া বেড়ানোর— বিষণ্ণ হাসি বিনিময় করিয়া সন্ধ্যার কাছে বিদায় নিবার পর তারও তেমনি একটা অদম্য ঝোঁক চাপিয়াছিল গাড়ি চালাইয়া শহরটা চষিয়া বেড়ানোর।

শহরের পথে হাঁটিবার ঝোঁকে তার বাবা মরিয়াছিল দুর্ঘটনায়।

কয়েকটা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা হইতে সে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।

বিলাতি দোতলা বাসের রোগা কালো মাঝবয়সি বাঙালি ড্রাইভার কী ভাবে ব্রেক করিয়া অ্যাক্সিডেন্ট ঠেকাইয়াছিল ! শুধু আধ হাত— অতবড়ো দোতলা বাসটার গতি বুঝিতে আর আধ হাত বেশি আগাইতে হইলে মোহনও হয়তো আজ পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বর্গে যাইত।

ঘণ্টা তিনেক সে অকারণে চক্র দিয়াছে, তেল ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং পকেটে টাকা না থাকায় দামি হাত ঘড়িটা জমা দিয়া তেল কিনিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। এসব বাড়ির লোকের জানিবার কথা নয়।

তবু মোহনের বুকে অভিমান উথলাইয়া উঠে। একবার কি জিজ্ঞাসা করিতে নাই : তুমি খাইয়া আসিয়াছ কি ?

দেশে থাকিতে সকালে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়া বেলা তিনটায় ফিরিলেও তো লাবণ্য এবং মা ছাড়াও বাড়ির তিনচার জন মানুষ জিজ্ঞাসা করিত, খেয়ে এসেছ ?

তার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বাড়ির মানুষ উদাসীন হইয়া গিয়াছে।

লাবণ্য এবং মা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় না যে সত্যই সে খাইয়া আসিয়াছে।

জগদানন্দ বিদায় নেওয়া মাত্র মোহন বাড়ির মানুষের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া দেয়।

স্নানের ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটির জন্য জ্যোতিকে ধমকায়, মাছ না থাকায় শুধু ডাল তরকারি এবং তাড়াতাড়ি মোড়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনা দই মিষ্টি দিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিতে হওয়ায় গর্জন করিয়া ওঠে।

মা গিয়াছিলেন দামি গরদের শাড়ি পরিয়া শহরের পাড়া বেড়াইতে। আরও ঘণ্টাখানেক পাড়া বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গরদের কাপড় ছাড়িয়া থান ধুতি পরিয়া তিনি একটু শুইতেন।

মোহনের পরিত্যক্ত ধুতি পরা আশ্রিতা মঙ্গলা তাঁকে ডাকিয়া আনিল। জানাইল, মোহন বাড়ি ফিরিয়া পাগলের মতো করিতেছে লাথি মারিয়া সকলকে দূর করিয়া দিবার কথা বলিতেছে।

গরদের শাড়ি ছাড়িয়া থান ধুতি পরিতে পরিতে মা মোহনের গর্জন আর ধমকানি শুনিলেন। তারপর ছেলের সামনে গিয়া শান্ত সুমিষ্ট সুরে বলিলেন, তুই নিজেই একটা হুকুম দিবি, বাড়ির লোক তোর হুকুম মতো কাজ করলে নিজেই আবার রাগারাগি করবি ? এ কোন দেশি বুদ্ধি বিবেচনা মেজাজ হয়েছে তোর ?

কী হুকুম দিয়েছিলাম ?

তোর মনে থাকে না বলেই তো মুশকিল। এই সেদিন বেলা দুপুর করে বাড়ি ফিরলি, তোর জন্য উনান জ্বলছে, মাছটাছ সব রাখা হয়েছে দেখে যেন খেপে গেলি একেবারে। মনে নেই ? সবাইকে ডেকে ঢালাও হুকুম দিলি, বারোটার মধ্যে উনান নেবাতে হবে, খাওয়া দাওয়া সারতে হবে ? বারোটার পর তোর জন্য কিছু রাখতে হবে না, তুই বাইরে থেকে খেয়ে আসবি।

মিষ্টতা পরিহার করিয়া হঠাৎ যেন রাগিয়া টং হইয়া যান মা।

বাইরে খেয়ে খেয়ে কী চেহারাই করেছিস। দেখলে মনে হয় যেন বাড়িতে মা বউ ভাইবোন মাসিপিসি নেই, খেতে দেবার যত্ন করার কেউ নেই। শহরে এসে এমনভাবে তুই অধঃপাতে যাবি —

কথা শেষ না করিয়াই মা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। এ যে তার রাগ নয়, এতবড়ো ছেলেকে ধমক দেওয়া নয়, এ শুধু মায়ের অভিমানের তিরস্কার — ও ছেলে কি আর তা বুঝিবে !

মোহন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইবার কথা ভাবিতেছিল। মা চলিয়া যাওয়ায় সে আবার খাইতে আরম্ভ করিল।

সত্যই তার মনে ছিল না কবে ঝোঁকের মাথায় অপচয় কমাইবার জন্য সে হুকুম দিয়াছিল — তার জন্যও বেলা বারোটার পর উনান জ্বলিবে না, বাড়ি না থাকিলে তার জন্য বিশেষ পদ কটা রাঁধাও হইবে না।

মাঝে মাঝে চেনা লোকের বাড়িতে এবং প্রায়ই সে হোটেলে খাইয়া আসে।

স্নানাহারের পর বিছানায় চিত হইয়া মেজাজ ঠান্ডা হইয়া তার ঘুম পাইতেছে, মা ঘরে আসিলেন।

কত খরচ হল রে কাল ?

জানি না।

জানি না বললে কি চলে মনু ? একটু হিসেব করে খরচ করিস বাবা। শুধু খরচ করে যাওয়ার মতো টাকা কি আমাদের আছে ?

আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।

ব্যাঙ্কে আর টাকা নেই ?

আছে।

কাগজ ভাঙালি কেন তবে হাজার টাকার ?

মোহন বিছানায় উঠিয়া বসিল।—তোমার এত টাকার চিন্তা কেন বলো তো মা ?

মাও বসিলেন।

তাঁর মুখ শুধু ম্লান নয়, গম্ভীরও বটে। বেশ বুঝা যায় ছেলের রাগ বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন।

তুই ওনার মতো একটু হিসেবি হলে চিন্তা হত না মনু।

হিসেব আমার আছে। প্রথমটা খরচ একটু বেশি হয়, কত জিনিসপত্র কিনলাম—

অত দামি সব জিনিস কেনার কী দরকার ছিল তোর ? বেশ, কেনাকাটায় যা যাবার নয় গেল, এমনি যে টাকা যাচ্ছে জলের মতো ? মাস মাস তিনশো টাকা বাড়ি ভাড়া ! আমি কি জানি এত ভাড়া এ বাড়ির, দুরাত ঘুম হয়নি শুনে। তারপর দুটো চাকর, একটা ঝি, ঠাকুর, ড্রাইভার—

কী হয়েছে তাতে ?

অমন চোখ পাকিয়ে কথা বলিস নে মনু। উনি যেতে না যেতে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করেছিস তুই—

না, মার চোখে জল আসে নাই, সুরটা কান্নার নয়। এও তার একটা নালিশ। একটা জোরালো প্রতিবাদ।

মা যে তার এমন শক্ত মানুষ, এমন সতেজে তার সঙ্গে কথা বলিতে পারেন, মোহনের সে ধারণা ছিল না। জোর করিয়া শহরে টানিয়া আনায় মার রাগ হইয়াছিল, সে রাগ আর কিছুতেই কমিল না।

মোহন বিশ্বাস করে, মার আসল জ্বালা সেইখানে, টাকা খরচ হওয়াটা বড়ো কথা নয়। অন্যভাবে সে যদি আরও বেশি অপব্যয় করিত, দেশে থাকিয়া ধর্মেকর্মে আশ্রিত-পোষণে, দেশের আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ উৎসবে—মা খুশি হইতেন।

বহুদিন হইতে মার মনে বোধ হয় এই সাধটা লুকানো ছিল। কৃপণ স্বামীর মৃত্যুর পর বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন, ছেলে এবার তাঁর সাধটা মিটাইবে। বিলাস ও বাহুল্য আসিল, দশজনকে লইয়া আনন্দ ও উৎসব শুরু হইল—কিন্তু শুরু হইল ভিন্ন একটা জগতে। নিজের জগৎ হইতে ছেলে তাকে এখানে ছিনাইয়া আনিয়াছে। এখানে তাঁর ভালো লাগে না, মোটেই, এখানে কিছুই তাঁর মনের মতো নয়।

তাঁর মন পড়িয়া আছে দেশে।

এ সব মোহন মোটামুটি বুঝিতে পারে। কেবল বুঝিতে পারে না মার চোখের জলের অভাবটা।

মার শুধু সমালোচনা, তর্ক আর নালিশ, সারাদিন গজর-গজর করা। কোমর বাঁধিয়া ছেলের সঙ্গে শুধু স্নেহহীন লড়াই। মনের জ্বালায় মাঝে মাঝে মোহনের চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, মার মুখের ভাবটা এক মুহূর্তের জন্যও নরম হয় না।

আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেছি ? গায়ে পড়ে কবে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি শুনি ? বাবা মারা যাওয়ার পর তুমিই বরং যা তা আরম্ভ করে দিয়েছ আমার সঙ্গে !

আমি জানি, সব দোষ আমার। তুমি টাকা উড়াবে, বলতে গেলে দোষ হবে আমার।

কী দরকার তোমার বলার ? হাজারবার তোমায় বলেছি, খরচ যেমন বেড়েছে, আয়ও তেমনি বাড়বে।

কীসে আয় বাড়বে ? ব্যাবসা করে ? তুই করবি ব্যাবসা ! ব্যাবসা করার মানুষ আলাদা। তারা আগে আয় বাড়িয়ে তারপর খরচ বাড়ায়—তা-ও তোর মতো বাড়ায় না। ব্যবসায় লোকসান নেই ?

লোকসান যায়, আমার টাকা যাবে।

টাকা বুঝি তোর একার ? একা তোকে উনি সর্বস্ব দিয়ে গেছেন, তুই যা খুশি তাই করবি বলে ?

ভীত চোখে তারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল—দুজনেই। তারপর মা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—একেবারে যাকে বলে পলায়ন করা।

এমন স্পষ্টভাবে নগ্নভাবে মা ও ছেলের মধ্যে লড়াই হইল এই প্রথম। কে জানে এ লড়াই কোথায় গিয়া ঠেকিবে, কী পরিণাম দাঁড়াইবে ?

লড়াইটা স্থগিত রহিল প্রায় পনেরো দিন।

তার মধ্যে আর একটা উৎসব হইয়া গেল বাড়িতে, নগেনের জন্মদিন উপলক্ষে আগের বারের পার্টির চেয়েও অনেক বেশি টাকা খরচ হইয়া গেল। টাকার বিষয়ে মা কর্তালি করিতে চাওয়ায় মোহনের যেন আরও বেশি খরচ করার গোঁ চাপিয়াছে।

জন্মদিনে এত লোক ডাকিয়া এত ঘটা করিয়া উৎসব করিতে হয়, এ বাড়িতে কারও তা জানা ছিল না। বাড়িতে এত লোক থাকিতে নগেনের জন্মদিনেই বা কেন ?

বাহিরের অনেকের কাছেও ব্যাপারটা একটু দুর্বোধ্য ঠেকিতে লাগিল। সাতদিন পরেই ভাই এর জন্মদিনে সকলকে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা যদি মোহনের ছিল, সেদিন অকারণে সকলকে ডাকার কী প্রয়োজন ছিল তার ?

তাড়াতাড়ি সকলের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিবার জন্য মোহন যে কী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, জানা থাকিলে হাসিই সকলের পাইত।

সেদিন পার্টি দিয়া মোহন টের পাইয়াছিল, মানুষের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতা জমানোর এই উপায়টি সর্বশ্রেষ্ঠ—সকলকে বাড়িতে আনিয়া উৎসব করা। একটু বাড়াবাড়ি যদি হয় তো হোক। আরম্ভ করিতেই তার দেরি হইয়া গিয়াছে অনেক, তাড়াতাড়ি না করিলে চলিবে কেন, ধীরে সুস্থে শহরের সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিবার সময় তার নাই, তাকে অন্যদিকে মন দিতে হইবে। সেদিকটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—এবং গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে।

খরচ সম্পর্কে মার অনাবশ্যক কর্তালি পছন্দ না করিলেও টাকার ব্যাপারে উদাসীন থাকিবার উপায় নাই। দুশ্চিন্তা না হোক, টাকার চিন্তা করিতে হয় বইকী। টাকা যে তাকে আনিতে হইবে, সে তা জানে, প্রথম হইতেই জানিত। গ্রামে বাস করিবার সময় শহরের জীবনের কল্পনায় আয় বাড়ানোর জন্য নিজের কর্ম ব্যস্ততাও সে কি কল্পনা করে নাই ?

সে সব কল্পনার অনেক কিছুই বদল হইয়াছে সত্য, কিন্তু মূল কথাগুলি বদল হয় নাই। কেবল শহরের সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলা নয়, আয় বাড়াইবার ব্যবস্থাও তাকে করিয়া নিতে হইবে।

তবে খরচ যে এত বেশি হইবে, কাজে নামার আগে এদিকের জীবনটা গড়িয়া তুলিবার সময় সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে—এ ধারণা তার ছিল না।

তা হোক, সময় যা আছে, তাই যথেষ্ট। দশজনের মধ্যে নিজের স্থানটি দখল করার জন্য তাকে শুধু উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

নগেনের জন্মদিনের উপলক্ষ না থাকিলেও মোহন কোনো কারণ ছাড়া এমনিই সকলকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিত। মানুষকে বাড়িতে ডাকিয়া আনন্দ করা তো দোষের নয়।

এবারও অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল—আগের বারের চেয়ে বেশি। কিন্তু মা এবার কিছুই বলিলেন না।

রাগের মাথায় সেদিন যে কথা বলিয়া ফেলিয়া ছেলের সম্মুখ হইতে তিনি পলাইয়া গিয়াছিলেন, আরও স্পষ্ট করিয়া সেই কথা বলিয়া ফেলিবার ভয়ে একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন।

মোহন বুঝিল অন্যরকম। সে ভাবিল, নগেনের জন্মদিনের উৎসব কিনা, এটা তাই মার কাছে অপব্যয় নয়।

নগেনকে সে উপহার দিল একটি মোটর সাইকেল।

ঝরণাকে উপহারটি দেখাইতে গ্যারেজে গিয়া দুজনে বহুক্ষণ না ফিরিয়া আসায় মোহন নিজেকে বিপন্নবোধ করিতে লাগিল। শখানেক মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনায়, দায় দায়িত্ব এড়াইয়া সে গেল খবর নিতে। গ্যারেজে গিয়া শুনিল ঝরণা নগেনকে বলিতেছে, না না, এতেই হবে, সাইডকার দরকার নেই। ক্যারিয়ারে বসে খুব যেতে পারব আমি।

কোথায় যাবে তোমরা ?

বজবজ !

মোটরবাইকে দুজনে বজবজ বেড়াইতে যাইবে কি না, তাই বাড়ির ভিতরে মানুষের ভিড় এড়াইয়া গ্যারেজে মোটরবাইকটার কাছে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে আসিয়াছে।

পীতাম্বর রোয়াকে বসিয়া আছে, তবু এখানে পরামর্শ করাই সুবিধা, কেউ বাধা দিবার নাই। আসিয়াছে তারা অনেকক্ষণ, এক ঘণ্টার কম নয়। এত দেরি না করিলে মোহন তাদের খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করিত না।

আর কিছু নয়, সত্যসত্যই দুজনে গ্যারেজে বসিয়া গল্প করিতেছে কি না জানিবার জন্য মোহনের বড়োই কৌতূহল হইয়াছিল।

কুড়ি বছরের বালকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের নারীর বন্ধুত্ব অদ্ভুত খাপছাড়া ব্যাপার। নগেনের এই বয়সে ঝরণার সঙ্গে চার পাঁচ বছর বয়সের তফাতটা দুজনের মধ্যে চাঁদ আর পৃথিবীর ব্যবধান হইয়া থাকিবে। ড্রয়িংরুমে, বারান্দায়, নগেনের পড়ার ঘরে, নির্জন গ্যারেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনের গল্প করাটা সত্যিই যুক্তিহীন অসঙ্গত ঘটনা।

তোমায় ডাকছে ঝরণা।

কে ?

লীলা ডাকছে।

লীলা ? লীলা তো এসেই চলে গেছে কখন- -ফিরে এসেছে নাকি আবার ?

কি বলছি, লীলা নয়। লাবু তোমার খোঁজ করছিল।

প্রত্যেক মানুষকে জীবনে মাঝে মাঝে নিজের মৃত্যু কামনা করিতে হয়। ঝরণার মুখ লাল দেখায় মোহনের প্রতিফলিত অপমৃত্যুর মতো।

বলুন গে যাচ্ছি।

ঝরণা নীরবে চলিয়া গেলে, মোহনকে মনে মনে মরিয়াই থাকিতে হইত, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার অতি মন্দ আর বিপজ্জনক কর্তব্য করার গৌরবে আহত সৈন্যের মতো মোহন জীবন্ত হইয়া উঠিল।

এত যখন তেজ ঝরণার, ওকে আরও অপমান করা চলে। আরও অপমান করাই কর্তব্য।

একটু দেখা শোনা করবি যা নগেন ? তোর সত্যি কাণ্ডজ্ঞান নেই। একা কতদিক সামলাব ?

যাই।

যাই নয়, যাও।

দুজনেই গেল, আগে নগেন, তার পিছু পিছু ঝরণা। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিতে গিয়া মোহন দেখিল, আঙুলগুলি তার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

কাঠিটা দাও তো বাবা, নিভিও না।

আপনার দেশলাই নেই ? বাক্সোটা তবে রেখে দিন।

পীতাম্বর বিড়ি ধরাইয়া বলিল, দেশলাই আছে। তুমি কাঠিটা ধরালে তাই চেয়ে নিলাম।

দিয়াশলাই-এর একটা কাঠিও অপচয় করে না, মানুষটা হিসাবি বটে। মোহনের বাবারও এই রকম হিসাব ছিল, উনানে জ্বলন্ত কয়লা থাকিতে দেশলাই জ্বালিয়া টিকা ধরাইয়া তামাক দিলে আর রক্ষা থাকিত না।

হিসাবের আঁটঘাট বাঁধা তাঁর দীর্ঘজীবন এক মুহূর্তের অসতর্কতায় বাসের নীচে সমাপ্তি পাইয়াছে। মনে মনে পয়সার হিসাব কষিতে কষিতেই হয়তো তিনি অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, হয়তো ভাবিতেছিলেন, হাঁটিবেন অথবা বাসে উঠিয়া কটা পয়সা খরচ করিবেন।

কলিকাতা আসিয়াছিলেন তিনি বাজার করিতে, জিনিস কিনিয়াছিলেন কয়েকশো টাকার। তার মধ্যে তাঁর নিজের জন্য ছিল একটি চটি, দুজোড়া কাপড় আর একসের তামাক। বাকি সব কিছু তাদের জন্য। লাবণ্যের জন্য একটি সেলাই-এর কলও ছিল।

ছেলে মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনির জন্য সেই তাঁর প্রথম আর শেষ বাজার করা নয়। কার কী বাজার চাই জানিয়া কোনো চাওয়া বাতিল আর কোনো চাওয়া মঞ্জুর করিতেন, তারপর লম্বা ফর্দ নিয়া বছরে তিন-চারবার আসিতেন কলিকাতা। বাঁচিয়া থাকিতে বাপের বিরুদ্ধে মোহনের অনেক অভিযোগ ছিল, এখন সে কেবল দুঃখ বোধ করে। আজীবন এক সঙ্গে থাকিয়াও সে তাঁর জীবনযাপনে সামঞ্জস্যহীন হিসাবের মর্ম বুঝিতে পারে নাই, এখনও পারে না।

জীবনের তাঁর সবচেয়ে বড়ো কথা ছিল হিসাব এবং সে হিসাব ছিল লক্ষ্যহীন জড়ধর্মী বিকার।

বাপের অসার্থক, অসম্পূর্ণ, বঞ্চিত জীবনের কথা ভাবিয়া মোহন আজও গভীর বিষাদ অনুভব করে।

পীতাম্বর বলে, দেশ থেকে কোনো চিঠিপত্তর পেয়েছ বাবা ?

ঘনশ্যামের চিঠি পেয়েছি।

কিছু লিখেছে নাকি, আমার বাড়ির খবর ?

না।

চিঠি আসে না, কদিন থেকে ভাবছি কী হল। কী লিখেছে ঘনশ্যাম ? ফসল কেমন হল জানিয়েছে কিছু ? তেমাথায় টিউবওয়েল বসিয়েছে নাকি ? বসাবে বসাবে করে দু বছর ঘুরে গেল, চোত মাসটা ফের শীলপুর থেকে জল এনে খেতে হবে।

আলো ঝলমল বাড়ির দিকে চাহিয়া নিমন্ত্রিতদের হাসি ও কথায় মিশ্র কলরব শুনিতে শুনিতে পীতাম্বর ভাবিতেছে দেশে তার আপনজনের কথা, ফসলের কথা, তেমাথার টিউবওয়েল বসানোর কথা ! কী হইতেছে বাড়ির ভিতরে দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও কি হয় না মানুষটার ?

খেয়ে এসেছেন ?

এইবার যাব, এক ফাঁকে গিয়ে খেয়ে আসব।

বাড়ির ভিতরে গিয়া ঝরণাকে দেখিয়া মোহন স্বস্তিবোধ করিল। এতক্ষণ এইটুকুই সে আশা করিতেছিল। ঝরণা রাগ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকিলে এক বিষয়ে মোহনকে হতাশ হইয়া যাইতে হইত।

এখনও তার আশা আছে যে নগেন আসল কথা কিছু বুঝিতে পারে নাই, ছেলেমানুষ তো নগেন। ঝরণা যে অপমান পাইয়া রাগ করিয়াছে তাও হয়তো সে জানে না।

ঝরণা রাগ করিয়া না খাইয়া চলিয়া গেলে নগেনের কিছুই বুঝিতে বাকি থাকিত না।

ঝরণার সংযমে মোহন রীতিমতো কৃতজ্ঞতা বোধ করে, হঠাৎ অসভ্যতা করিয়া ফেলার জন্য তার লজ্জা ও অনুতাপ বাড়িয়া যায়।

নিজের অসঙ্গত ব্যবহারের একটা অজুহাত সে ইতিমধ্যে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এ তার দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করার ফল, যেখানে নির্জনে কোনো ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে, বিশেষত ঝরণার মতো রূপসি মেয়েকে কথা বলিতে দেখিলেই মানুষ যা তা ভাবিয়া বসে।

নিজের ব্যবহারের জন্য নিজের অতীত জীবনকে দায়ি করিয়া— ঝরণাকে সহজভাবে চলাফেরা করিতে ও কথা বলিতে দেখিয়া ক্রমাগত বেশি বেশি দায়ি করিয়া—মোহনের আরও খারাপ লাগে। তার মতো অমার্জিত সংকীর্ণ গেঁয়ো মানুষের পক্ষে ও রকম অসভ্যতা করাই স্বাভাবিক ভাবিয়া যদি ঝরণা তাকে উদারভাবে ক্ষমা করিয়া থাকে, তার চেয়ে ব্যাপারটা আরও কুৎসিত দাঁড়ানো ঢের ভালো ছিল।

অতি কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, সহজভাবে এক সময় মোহন ঝরণাকে বলে, তুমি খাবে না ঝরণা ?

একটু পরে খাব।

চিন্ময় তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলছে। ও চলে যাক, তোমায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। আমিই না হয় দিয়ে আসব। কেমন ?

আচ্ছা।

ঝরণার এই আরও বেশি উদারতায় মোহনের স্বস্তি যেমন বাড়ে, তেমনি নিজেকে আরও বেশি বেশি গেঁয়ো মনে হয়।

যাওয়ার সময় ঝরণা কিন্তু তাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল।

সঙ্গে গেল নগেন।

বিদায়গামী একটি পরিবারের সঙ্গে মোহন গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গল্প করিতে করিতে সামনে দিয়া দুজনে চলিয়া গেল, একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া দেখিল না !

বুঝা গেল নগেনকে সাথি করিয়া ঝরণা হাঁটিয়াই বাড়ি যাইতেছে !

পরদিন সকালে ঝরণাকে নূতন মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসাইয়া বজবজ বেড়াইয়া আসিতে বাহির হইয়া একশো গজ পথ যাইতে না যাইতেই নগেন একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাইয়া দিল।

গাড়ি আস্তেই চলিতেছিল, এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়া আর ঝরণার বাঁ হাতটা একটু মচকাইয়া যাওয়া ছাড়া দুজনের বিশেষ কিছু হইল না।

মোহন বুঝিতে পারিল না এই দুর্ঘটনায় মনে মনে সে কেন খুশি হইয়াছে। ভয়ানক কিছু অনায়াসেই ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই বলিয়া ?

দূরে গিয়া জোরে গাড়ি চলার সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া দুজনের মারাত্মক রকম আহত হওয়া, এমন কি মরিয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না।

সেটা ঘটে নাই বলিয়া সে খুশি হইয়াছে ?

অথবা ওদের দুজনের বজবজ গিয়া সারাটা দিন কাটাইয়া আসা সম্ভব হইল না বলিয়া ?

এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে ছেলের উপর মা আরেক চোট গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন।

বাড়ির শখানেক গজ দূরে অ্যাকসিডেন্ট করিয়া দুজনে ফিরিয়া আসিলে নগেনের এখানে ওখানে সামান্য ছড়িয়া যাওয়া কাটিয়া যাওয়ার সামান্য রক্তপাত দেখিয়াই একেবারে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া মোহনকে বলিলেন, কেন তুই এসব কিনে দিস ওকে ? ভাইটাকে মারতে চাস ?

দূর্ঘটনায় নগেন ব্যথার চেয়ে লজ্জা পাইয়াছিল বেশি।

সে তাড়াতাড়ি বলে, আমার কিছু হয়নি মা। একটু শুধু কেটে ছড়ে গেছে।

মোহন গম্ভীর মুখে কঠোর সুরে বলে, তুমি অনেকদিন থেকে মোটর-বাইকের জন্য আবদার করছিলে—জন্মদিনে তাই ওটা প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম। তোমায় মারবার জন্য দিইনি। ওটা আমি ফিরিয়ে নিলাম।

মচকানো হাতের ব্যথায় ঝরণা কাতরাইতেছিল—তার কাতরানি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

মোহন আরও কঠোর সুরে বলে, এবার থেকে আর কোনো আবদার জানিয়ে আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমার যা দরকার হবে মার কাছে চাইবে। মা বললে কিনে দেব।

সকলে মুখ কালো করিয়া থাকে।

সত্যই তো।

সকলেই জানে নগেনের একটি মোটর সাইকেলের সাধ অনেকদিনের। বাপের কাছে অনেকবার চাহিয়া পায় নাই। বাপের মৃত্যুর পর মোহন ভাই-এর জন্মদিনে উৎসব করিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভাই-এর পুরানো সাধটা মিটাইয়াছে।

সে কি দুর্ঘটনার জন্য দায়ি ? মার কি উচিত হইয়াছে ও রকম বিশ্রী মন্তব্য করা যে ভাইকে মারিয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যই সে তাকে মোটর সাইকেলটা উপহার দিয়াছে ?

ছেলের কাছে মা আরেকবার হারিয়া গেলেন !

ডাক্তার এবং ডাক্তারখানা বাড়ির প্রায় পাশেই বলা যায়। ডাক্তার আসিয়া ঝরণার মচকানো হাতে ওষুধের প্রলেপ দিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া এবং দুজনের কাটা ছড়ায় ওষুধ লাগাইয়া বলিয়া গেলেন, খুব অল্পের উপরেই গেছে। আর কিছু করতে হবে না।

ঝরণাকে বলিলেন, দু একদিন খুব ব্যথা হবে, ব্যস।

ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর ঝরণা আবার কাতরাইতে আরম্ভ করিলে মোহন বলে, তোমার নিজেরই দোষ। ছেলেমানুষ, নতুন গাড়িটা পেয়েছে, তোমায় ক্যারিয়ারে চাপিয়ে চালাতে পারে ? স্পিডে চলার সময় অ্যাকসিডেন্ট হলে কী হত বলো তো ? নগেনের হয়তো আজ প্রাণ যেত !

বলিয়াই মোহন টের পায় এটা তার কঠোরতা নয়, নিষ্ঠুরতা নয়, স্রেফ গ্রাম্যতা। সামান্য আহত নগেনকে দেখিয়াই মা যেমন আর্তনাদ করিয়া তার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িতে চাহিয়াছিলেন, ঝরণা ক্যারিয়ারে চাপিয়াছিল বলিয়াই অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়াছে ঘোষণা করিয়া সেও ঠিক একই রকম গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছে !

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়।

বলে, যাই বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকি।

কী কাতরতা ফুটিয়াছে নগেনের মুখে। লজ্জায় দুঃখে মরিতে চাওয়ার মতো মাথা হেঁট করিতে চায়, নিজের হাত পা কামড়াইতে চায়। সকলের সামনে সেটা তো করা যায় না। নীরবে ঝরণার মুখের দিকে কাতর চোখে চাহিয়া থাকে।

নিজের মনে একটা লড়াই করিতে করিতে জয়-পরাজয় তুচ্ছ করিয়া মোহন বলে, তোমার তো বেশি লাগেনি নগেন। ঝরণাকে পৌঁছে দিয়ে এসো না ? একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি।

রাত্রে মোহনের বক্ষলগ্না হইয়া লাবণ্য যেন নালিশের সুরে বলে, ধন্য তুমি। কী ভাবে সকলকে খেলালে !

খেলালাম ?

বক্ষলগ্না হয়ে থাকার সময় লাবণ্যের অসীম সাহস দেখা যায়, মোহনের পক্ষে চরম অপমানজনক কথাও সে অনায়াসে যেন খেলার ছলেই বলিয়া যাইতে পারে।

কী ভাবে মাকে জব্দ করলে। কী ভাবে ঝরণা হারামজাদিকে বুঝিয়ে দিলে তোমার ছেলেমানুষ ভাইটির সঙ্গে ইয়ারর্কি চলবে না। আবার কী ভাবে ভাইটিকে দিয়েই এক রিকশায় ঝরণাকে---

মোহন উঠিয়া গিয়া আলো জ্বালে, সোফায় বসিয়া মোটা একটা বই তুলিয়া নিয়া পাতা উলটাইতে উলটাইতে বলে, তুমি ঘুমোও। আমি কয়েকটা হিসাব নিকাশের কাজ সেরে শোব।

লাবণ্যের কান্নার শব্দ শুনিয়া বিলাতে ছাপানো ইংরাজি বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খাটের কাছে গিয়া বলে, কেঁদো না। কাঁদলে মারব---তোমার এই ছিঁচকেমি কান্না বন্ধ করে অন্য কান্না কাঁদাব।

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কান্না থামাইয়া মড়ার মতো কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে লাবণ্য। ভাবে, কী তার লাভ হল শহরে বাস করতে এসে ?

সাত

শীতের কুয়াশায় শহরে ধোঁয়া মিশিয়া আলোগুলিকে ম্লান করিয়া দেয়। অপরাহ্নে বাতাস যেন একেবারে মরিয়া যায়, ভাসিয়া যাওয়ার বদলে ধোঁয়া অতি ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কখনও কুণ্ডলী পাকাইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

চোখ জ্বালা করে, মনে বিষাদ জাগে।

এর চেয়ে অন্ধকার যেন ভালো লাগে। ভোঁতা বিষণ্ণতার চেয়ে যেমন ভালো লাগে অচেতন মন।

শ্রীপতির মনের বিষাদ কিন্তু কমিয়া গিয়াছে।

একবার সে দেশের গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছে।

দুদিনের বেশি কদম তাকে তিনদিন থাকিতে দেয় নাই, তাড়া দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে কলিকাতায় !

ক মাস দুটি পয়সা রোজগার করিয়াই রোজগারের সাধ মিটিয়া গেল নাকি শ্রীপতির ? আর ভালো লাগে না ? বউ আর ছেলেমেয়ের পেটে দুটি অন্ন যাইতেছে, অমনি বুঝি শনি ভর করিল কাঁধে ?

না, আরামে আলস্যে ঘরে বসিয়া দিন কাটানো চলিবে না শ্রীপতির, ঢিল দিলে চলিবে না। পয়সা রোজগারের যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে পুরোমাত্রায় তার সদ্‌ব্যবহার করিতে হইবে।

কদম নিজেও তো মরিয়া যাইতেছে না, ফুরাইয়া যাইতেছে না ! শ্রীপতির হইয়াই সে দেশের ঘরে কষ্ট করিয়া দিন কাটাইবে—সুখের দিনের জন্য।

জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে কদম এই একটা বিষয়ে বারবার তাকে আশ্বাস দিয়াছে—শ্রীপতির কোনো ভয় নাই, কদম তারই আছে এবং চিরদিন তারই থাকিবে। কোনো পুরুষের সাধ্য নাই কোনো প্রলোভনে তাকে ভুলায়। স্বামী বিদেশে পয়সা কামাইতে গেলে তার মান কী করিয়া বজায় রাখিতে হয় কদম তা ভলো করিয়াই জানে।

বলিয়াছে, টের পাই না ভেবেছ নাকি ? তুমি খালি ডরাচ্ছ—একলা পেয়ে কদমকে কে বিগড়ে দেবে। কদমকে চেনো না তুমি ? এতকাল এত কষ্ট সয়ে এলাম না ? আজ কদমের জন্য তুমি গেছ পয়সা কামাতে, কদম বিগড়ে যাবে। কেন, কদম মরতে জানে না ?

গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছে, আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে ? শহরে কত ডাইনি থাকে জানি না বুঝি ?

কদম বিদায় করিয়া দিলেও শ্রীপতির মনে কিন্তু দুঃখ হয় নাই। দুদিন কদম তাকে খুব যত্ন করিয়াছে, চুলে তেল দিয়া খোঁপা পর্যন্ত বাঁধিয়াছে তার জন্য। শ্রীপতি সব চেয়ে আরাম বোধ করিয়াছে কদমের জন্য তার ভয় আর সন্দেহ কাটিয়া যাওয়ায়।

মন যেন হালকা হইয়া গিয়াছে তার।

বিকালে স্টেশনে নামিয়াছিল, তখন কিন্তু শ্রীপতি বাড়ি যায় নাই। একটু রাত হইলে চুপিচুপি চোরের মতো উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু সন্দেহেই কি সে অন্ধকার দেখিতেছিল জগৎ ! তারপর ঝনঝনে আওয়াজে প্রশ্ন আসিয়াছিল, ক্যারে ?

কদমের নয়, পাড়ার নিতু পিসির গলা। বয়স চল্লিশের বেশি, কালো মহিষের মতো চেহারা। এ পাড়ায় গলা খুলিলে আরেক পাড়ায় শোনা যায়।

হ্যাঁ। শ্রীপতির বাড়ি না থাকার সুযোগে কদমের সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়াছিল গাঁয়ের দু একটা মুখপোড়া বাঁদর। কদম নিজেই অবশ্য মুখে তাদের নুড়ো জ্বালিয়া দিতে পারিত, তবু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিতু পিসিকে সে ডাকিয়া আনিয়াছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিতু পিসি তাকে পাহারা দিতে আসে।

এমনি নয়। আট গন্ডা পয়সা নেবে মাসে।

না, কদম তেমন নয়। যা খুশি করবার সুবর্ণ সুযোগ সে কাজে লাগায় না, নিজেই নিজের পাহারা বসায়।

শ্রীপতির বুকে জোর আসে, কাজে আনন্দ হয়, কদমের জন্য আরও বেশি, আরও অনেক বেশি রোজগার করিবার কল্পনা চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে পাক খাইযা বেড়ায়।

এবার শহরে ফিরিবার আগে হইতেই সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কদমকেও শহরে লইয়া আসিবে।

এখনই অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। একটা ঘর ভাড়া করিয়া কদমকে কাছে আনিযা রাখার খরচ সে কোথায় পাইবে ? মোহনের বাড়িতে থাকে আর খায় বলিয়া নিজের তার একরকম কোনো খরচ নাই, কদমকে তাই টাকা পাঠাইতে পারে। ঘর ভাড়া করিয়া নিজের পয়সায় খাইতে হইলে কদমের জন্য কটি পয়সা তার বাঁচিত ?

আরও টাকা চাই, অন্তত এখনকার দু গুণ টাকা চাই। রোজগার না বাড়িলে কদমকে সে আনিতে পারিবে না। দিনরাত্রিগুলি তার একা কাটাইতে হইবে। একেবারে একা।

পীতাম্বর আছে, জ্যোতি আছে, মদন আছে, কারখানায় কয়েকটি সহকর্মীর সঙ্গেও তার বেশ খানিকটা খাতির জমিয়াছে। কিন্তু কদম কাছে না থাকিলে কে আছে শ্রীপতির ? কদম না থাকিলে কী মানে হয় বন্ধু থাকার ! কদম থাকিলে কত ভালো লাগিত শহরে নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা !

শহর আর তেমন বিস্ময় জাগায় না, হাঁ করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি দেখা আর নতুন কাজ শেখা আর তেমন ভাবে আনমনা করিতে পারে না।

চাঁপার ঘরের নেশার ধাঁধা, আর প্রচণ্ড স্ফূর্তির আকর্ষণ ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। জ্যোতি সঙ্গে নিতে চাহিলে বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে। সে বাড়ি না থাকায় কদম ওদিকে বাড়িতে নিজের পাহারা বসায়। এখানে চাঁপার ঘরে গিয়া সে মজা করিবে ? এত কষ্টের পয়সা নষ্ট করিবে ?

না ভাই ভালো লাগে না।

ধেৎ ! ভালো লাগবে। চ।

নাঃ, পয়সা নেই।

জ্যোতির সঙ্গে না যাক, একা একদিন চাঁপার কাছে না গিয়া সে কিন্তু থাকিতে পারে না।

কদমের জন্যই যাইতে হয়। দীর্ঘ বিরহের পর কদমের সঙ্গে দুদিনের মিলন এবার তাকে যেন কী করিয়া দিয়াছে, প্রথম যৌবনে বউকে প্রথম ঘরে আনার প্রথম দিকের রোমাঞ্চকর তেজ, ধৈর্যহীন

অফুরন্ত আগ্রহ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতের হিসাব নিকাশের কোনো জবরদস্তি যেন মানিতে চায় না।

কদমের জন্যই নূতন যৌবনের জোয়ারের মতো এই উন্মাদনা।

কিন্তু কদম অনেক দূরে।

আজ নয়, কাল নয়, আগামী মাসে নয়, কে জানে কবে কদমকে কাছে আনা চলিবে !

চাঁপা কাছেই থাকে যাইবে কি যাইবে না ভাবিতে ভাবিতেও চাঁপার ঘরে গিয়া পৌঁছানো যায়।

চাঁপা খুশি হইয়া আদর করিয়া বসায়, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, একলা কেন গো ? সাঙাত কই ?

শ্রীপতি ঢোক গিলিয়া আমতা আমতা করিয়া বলে, আজকে আমিই এলাম চাঁপা।

বটে ? সে বুঝি আসবে না ?

চোখের পলকে চাঁপা যেন বদলাইয়া যায় ! কোথায় যায় তার এলোমেলা দোলন দোলন নড়াচড়ার ভঙ্গি, কোথায় যায় তার অমায়িক হাসি।

মুখ বাঁকাইয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলে একলা এলাম চাঁপা ! সাঙাত সাথে এনে চেনা করিয়ে দিল, আজকে আমি একলা এলাম চাঁপা ! বেরিয়ে যা ঘর থেকে মুখপোড়া বজ্জাত কোথাকার !

গাল দিতে দিতে জ্যোতির বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে সে দূর করিয়া দেয়।

জ্যোতিব সে যেন বিয়ে করা সতীলক্ষ্মী বউ, শ্রীপতি বাড়ি না থাকিলে, গাঁয়ের কেউ ইয়ারর্কি দিতে আসিলে কদম যেমন করে তেমনি করার অধিকার যেন তারও পুরামাত্রায় আছে।

দেহ বেচা যার ব্যাবসা তার এটা কোনদেশি নীতিজ্ঞান ? কী মানে চাঁপার এই অদ্ভুত ব্যবহারের ?

দুদিন পরে জ্যোতি তার পেটে আঙুলের খোঁচা দিয়া বলে, বেশ, দাদা বেশ, ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছ ?

লজ্জায় শ্রীপতি মাথা তুলিতে পারে না।

জ্যোতিব কিন্তু রাগ হয় নাই, সে শুধু আমোদ পাইয়াছে। সেইদিন সন্ধ্যার পরে সে জোর করিয়া শ্রীপতিকে ধরিয়া নিয়া যায়, আলাপ করিয়া দেয় চাঁপার প্রতিবেশিনী দুর্গার সঙ্গে।

চাঁপাও আজ হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলে, সেদিন তার একলা আসার ব্যাপার নিয়া তামাশা পর্যন্ত করে !

জ্যোতি জানিত, চাঁপাও বুঝিতে পারিয়াছে যে বন্ধুর সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই— তার ধারণাই ছিল না যে ওভাবে চাঁপার কাছে আসিলে কোনো দোষ হয়।

দুর্গা মোটাসোটা শান্ত ভালো মানুষ, চাঁপার মতো চপল নয়। বেশভূষা তার দ্বিতীয় বয়সি গৃহস্থ ঘরের বউ-এর মতো, সিঁথিতে সিঁদুর পর্যন্ত আছে। তার চেহারায়, তার কথায় কাজে আর চালচলনে যেন একটা তেজ আর আত্মমর্যাদাবোধ ধরা পড়ে। ভাঙাচোরা খোলার ঘরে সামান্য উপকরণ নিয়া নোংরা জীবন যাপন করিতে হওয়ায় সে যেন জগৎ-সংসারের উপর রাগ করিয়া গুম খাইয়া আছে।

প্রথম প্রথম শ্রীপতির রীতিমতো ভয় করিতে থাকে। কথা না বলিয়া সে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাতি একটু বাড়াইয়া দিয়া দুর্গা জিজ্ঞাসা করে, নতুন এয়েছ শহরে, না ?

না, নতুন কেন। অনেকদিন এয়েছি।

কারখানায় কাজ করো না ?

হাঁ। মস্ত কারখানা।

বউ আছে না ?

আছে। দেশে।

দুর্গার মুখে এবার একটু হাসি ফোটে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে শ্রীপতির সব খবর জানিয়া নেয়—সে কত রোজগার করে এই খবরটা পর্যন্ত।

শ্রীপতি বুঝিতে পারে দুর্গা তাকে সরল হৃদয় বোকাসোকা গেঁয়ো লোক বলিয়া ধরিয়া নিয়াই এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—মনে মনে তার একটু রাগও হয়। কিন্তু দুর্গাও এমন সহজ সরলভাবে প্রশ্ন করে যে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব না দিয়া সে পারে না।

সত্য কথাই যে সব বলে তা নয়। রোজগারের অঙ্কটা বাড়াইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়া বলে। দুর্গা একটু হাসে।

সন্ধ্যা বলিয়াছিল শহরে পাপ বেশি। তর্কের খাতিরে বলিয়াছিল। জগদানন্দ স্বীকার করে নাই। আর একদিন ওই প্রসঙ্গে জগদানন্দ মোহনকে বলে, শহরের বিরুদ্ধে বড়ো একটা অভিযোগ, সেখানে দুর্নীতি বেশি। খারাপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা ধরে হিসেব করলে তাই মনে হয়। কত বড়ো স্কেলে কলকাতায় দেহ বেচার ব্যাবসা চলে শুনলে আপনি চমকে যাবেন। মনে হবে শহরের একটি লোকেরও বুঝি চরিত্র ঠিক নেই। কিন্তু এই দুর্নীতির প্রথম আর প্রধান কারণ কি জানেন ? দারিদ্র্য। সপরিবারে যারা শহরে বাস করতে পারে না তাদের জন্যেই এই কুৎসিত ব্যাবসাটা এত বাড়তে পেরেছে। শুধু পেটে খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

মোহনের নবপরিচিত প্রতিবেশী অসীম বলে, কোয়াইট রাইট।

জগদানন্দ বলে, শহরে যারা থাকে, কুলি-মজুর থেকে ভদ্রলোক পর্যন্ত, আজ যদি তাদের সপরিবারে শহরে বাস করবার ক্ষমতা হয়, অর্ধেকের বেশি খারাপ স্ত্রীলোক কাল শহর ছেড়ে চলে যাবে।

অসীম বলে, আপনার কথাটা একটু জড়িয়ে যাচ্ছে।

একটু থামিয়া সে জোর দিয়া, একটু ভুল বললেন। ও রকম হলে শহরের অর্ধেক খারাপ স্ত্রীলোক শহর ছেড়ে চলে যাবে—এ কথাটা ভুলও বটে বলা অন্যায়ও বটে। মানেটা দাঁড়ায় যে শহরের দুর্নীতির জন্য ওরাই যেন দায়ি ! ভাত কাপড়ের উপায় থাকলে ওরাও কি নিজেদের দুর্নীতির শিকার হতে দিত ? শহরের সব মানুষের সপরিবারে সচ্ছলভাবে শহরে বাস করার ক্ষমতা হওয়া মানেই তো এখনকার অবস্থাটা একেবারে বদলে যাওয়া। ওরকম অবস্থায় মেয়েদেরও দেহ বিক্রি করার দরকার থাকবে না।

জগদানন্দ খুশি হইয়া সায় দেয়, বলে, খারাপ স্ত্রীলোক আমি ঠিক ওই অর্থে বলিনি। বাধ্য হয়ে খারাপ পেশা নিতে হয়েছে, এই অর্থেই বলেছি। এ রকম পেশা নিয়ে শহরের পয়সায় ভাগ বসাবার দরকার হবে না—শহরের একদিন সে রকম অবস্থা আসবে বইকী। শহরের নিন্দে করে অনেকেই, তলিয়ে কোনো কথাই কেউ তো ভেবে দ্যাখে না।

আপনি শহরকে খুব ভালোবাসেন মনে হচ্ছে।

তা বাসি। শহর আমার কাছে উন্নতি, প্রগতি, শ্রীবৃদ্ধির প্রতীক। কারও শখে শহর গড়ে ওঠে না, কেবল আরামে থাকা আর মজা লুটবার জন্য শহর নয়। শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি সব কিছুর হেড কোয়ার্টার হল শহর। শহর দেখে দেশকে চেনা যায়, দেশের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

অসীম তার শেষ কথাটা স্বীকার করে না।

অন্য দেশে স্বাধীন দেশে তা হতে পারে, আমাদের এ দেশে বোধ হয় শহর দেখে দেশ সম্বন্ধে উলটো ধারণাই জন্মে। আপনি কি বলতে চান, কলকাতার রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, পিচঢালা রাস্তা, দামি মোটরগাড়ির স্রোত, এ সব দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে এ দেশের লোক কী অবস্থায় দিন কাটায় ? কলকাতা দেখে কেউ ভাবতে পারবে কত গরিব এ দেশের মানুষ, খেতে-পরতে পায় না, লেখাপড়া জানে না, অসুখে ভুগে মরে ?

জগদানন্দ জোর দিয়া বলে, নিশ্চয় পারবে। যে কোনো দেশ হোক, শহর দেখে দেশের অবস্থা বোঝা যাবেই। জাহাজ থেকে নেমে গ্র্যান্ড হোটেলে উঠে মার্কেটে একটা চক্র দিয়ে কেউ যদি ভাবে এই কলকাতা শহর, সে অবশ্য পারবে না। সমস্ত শহরটা যে দেখবে তাকে আর বলে দিতে হবে না কীসের মানে কী—একেবারে যদি অন্ধ আর মূর্খ না হয়। এত বড়ো শহরের কোন আর কতটুকু অঞ্চল ঝকঝকে, রাজপ্রাসাদ আর চওড়া সুন্দর পরিস্কার রাস্তাগুলি কোথায়, দুদিকের দোকানপাটগুলি কী ধাঁচের, সারি সারি দামি গাড়ি কোথায় পার্ক করছে, দেখলেই আসল ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ব্যবসা বাণিজ্যের সাহেবি অঞ্চলে পাক দিয়ে দেখতে যাবে আর একটা অঞ্চল—আমাদের বড়োবাজার। মাছ-তরকারির বাজারগুলি দেখবে। যারা মোটর চাপে তাদের পাড়া, যারা ট্রামে বাসে চাপে তাদের পাড়া, আর যারা পায়ে হাঁটে তাদের বস্তি ঘুরে ঘুরে দেখবে। কতলোক মোটর চাপে, কতলোক ট্রামে বাসে চাপে, কতলোক পায়ে হাঁটে, অনুমান করবে। রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটে, তাদের কতজনের খালি গা, কতজনের গায়ে ছেঁড়া নোংরা জামা লক্ষ করবে। সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছে না ম্লান মুখে দুর্বল শরীরটা কোনোরকমে বয়ে নিয়ে চলেছে, দেখবে। শহরে কটা হাসপাতাল আছে, খুঁজে বার করবে। আর দেখবে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কী রকম। শহরতলিগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে আসবে। কত লোকের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—ফুটপাতে শুয়ে কত লোক রাত কাটায় দেখে সেটা অনুমান করবে। তারপরেও সে যদি না বুঝতে পারে আমাদের অবস্থা কী রকম—

আপনার সঙ্গে তর্ক করা কঠিন।

মোহন বলে নিন, চা খান, চা জুড়িয়ে গেল।

অনেক রাত্রে শ্রীপতি গেট খুলিয়া ভিতরে আসিল।

নিজের অপরাধে মনটা তার ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। অনুতাপ নয়, সংস্কার। নিষিদ্ধ কাজ করার অস্বস্তি বোধ।

দুর্গা চাঁপা হইলে তার এত খারাপ লাগিত না। তিনমাস আগেও দুর্গা স্বামীর সংসারে ঘরকন্না করিতেছিল। বছর দুই আগে সে স্বামীর সঙ্গে কলকাতা আসিয়াছিল।

দেশে স্বামীটা তাকে বেশ ভালোবাসিত, আদরযত্ন করিত। শহরে আসিয়া দিন দিন যেন কেমন হইয়া যাইতে লাগিল। মদ খায়, জুয়া খেলে, দুর্গাকে মারধোর করে। ঘর ভাড়া বাকি পড়ে, আজ খাওয়া জোটে তো কাল জোটে না। শেষে একদিন দুর্গার গয়না গাঁটি যা কিছু ছিল সব নিয়া কোথায় যে গেল মানুষটা। স্বামীর একটা বন্ধু ছিল—অঘোর। সে আসিয়া দুর্গাকে রাখিল এখানে। মাস দুই পরে সেও ভাগিয়াছে।

কপালের দোষ তাই মুটিয়ে গেলাম, ছেলেপিলে হল না। ছেলেপিলে হলে তেনার স্বভাব কি বিগড়াত ? এ রকম মুটকি না হলে কি আর একজন দু মাসে মায়া কাটিয়ে ফেলে পালাত ?

দুর্গাকে দেখিয়াই শ্রীপতির ভয় আর সংকোচ জাগিয়াছিল। তার এই গল্প শোনার পর গা যেন তার ছমছম করিতে লাগিল। এখন দুর্গা অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, তাকে স্পর্শ করিলে আর দোষ হয়

না, এই অকাট্য যুক্তিটা সে অবশ্য এখনও মনে মনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তবু তার কেবলই মনে হইতেছে সে যেন একটা মহাপাপ করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল তার জন্যই আজ একটি পরস্ত্রী অসতী হইয়া গেল।

পীতাম্বর ডাকিয়া বলিল, কোথায় যাস ছিপতি এত রাতে ?

আজ্ঞে একটু কাজ ছিল।

আলো জ্বালিয়া এখনও পীতাম্বর দুআনা দামের একটি খাতায় হিসাব লিখিতেছে। অনেক রাত করিয়াই বোধ হয় সে ফিরিয়াছে, আজকাল প্রায়ই তার ফিরিয়া আসিতে দশটা এগারোটা বাজিয়া যায়।

পীতাম্বরের চালচলন আজকাল রীতিমতো রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষটাও সে বদলাইয়া গিয়াছে অনেকখানি। আগে মুখ দেখিলেই মনে হইত সর্বদা সে যেন কী একটা ধাপ্পাবাজির মতলব আঁটিতেছে, প্রার্থনা জানাইয়া ভিক্ষা করিয়া ভাঁওতা দিয়া কারও কাছে কিছু আদায়ের চেষ্টার মতো কোনো প্যাঁচালো মতলব আঁটিতেছে। আগে তার নিরীহ ভাবটা ছিল তাদের মতো, পরের দয়ায় যাবা বাঁচিয়া থাকে, এতটুকু অপরাধ করিয়া ফেলার ভয়ে সর্বদা যারা সচকিত।

এখন তার মুখে কোনো চিন্তারই ছায়া দেখা যায় না, প্রশান্ত মুখে স্থির দৃষ্টিতে সে জগতের দিকে তাকায়। তার যেন কোনো দুঃখ নাই, নালিশ নাই, অভাব নাই। আপনজনদের ফেলিয়া আসিয়া মোহনের এই গ্যারেজের ঘরটিতে আশ্রয় পাইয়া সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তার যেন সন্তোষের সীমা নাই। অসহায় নম্রতার বদলে গম্ভীর অমায়িকতার সঙ্গে সে ব্যবহার করে। কথা বলে কম, আর কেমন যেন দূরে সরিয়া থাকে। ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলে যেন আরও দূরে সরিয়া যায়।

চেহারা আর বেশভূষাও পীতাম্বর বদলাইয়া ফেলিয়াছে। রীতিমতো সাজিয়া সে বাহিরে যায়।

ঘরে সে ময়লা মোটা কাপড় পরে, ফতুয়া গায় দেয়, প্রাচীন বালাপোশটি গায়ে জড়াইয়া শীত নিবারণ করে। বাহিরে যাওয়ার সময় ফরসা ধুতির উপর চাপায় ফরসা শার্ট, তার উপর পরে ভালো কাপড়ের ভালো ছাঁটের কোট, পায়ে লাগায় পালিশ করা নতুন জুতা।

ঘরে ফিরিয়া সযত্নে জামাকাপড় ভাঁজ করিয়া রাখে, ন্যাকড়া দিয়া জুতার ধুলা সাফ করে। দুখানা ভালো কাপড়, দুটি শার্ট আর ওই কোটটি তার সম্বল, তবু কখনও তাকে ময়লা জামা কাপড় পরিয়া বাহিরে যাইতে দেখা যায় না। একটি কাপড় আর শার্ট যখন ব্যবহার করে অন্য কাপড় আর শার্টটি তখন লন্ড্রিতে আর্জেন্ট হিসাবে ধোয়া হয়।

চেহারায় গ্রাম্যতার ছাপও সে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। আগাগোড়া সমান করিয়া ছাঁটা ছোটো ছোটো চুল নিয়া সে কলকাতায় আসিয়াছিল, এখন তার চুল বেশ বড়ো হইয়াছে। স্মার্ট ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়া রোজ সে সযত্নে চিরুনি চালাইয়া টেরি কাটে। ফাজিল ছোকরার বাঁকা টেরি নয়, সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত ভারিক্কি টেরি।

দাড়িও সে কামায়। প্রত্যেকদিন।

নিজেই কামায়। এ জন্য সে ভালো একটি ক্ষুরও কিনিয়াছে।

ব্রাহ্মণ বলিয়া তাকে শ্রীপতি আগেও সম্মান করিত কিন্তু সেটা ছিল শুধু তার ব্রাহ্মণত্বটুকুর সম্মান, মানুষটার নয়। আজকাল শ্রীপতি মানুষ হিসাবেও তাকে সম্মান করিতে শুরু করিয়াছে।

আগে দরকার হইলেই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিত কিন্তু তার সামনে কখনও কখনও তার সঙ্গেও, হাসি তামাশা খোশগল্প করিতে শ্রীপতির বাধিত না। পীতাম্বরকে অবশ্য খোশগল্পে টানা যাইত না, সে ম্লান গম্ভীর মুখে চুপ করিয়াই থাকিত—শ্রীপতি সেটা তেমন গ্রাহ্য করিত না।

আজ শ্রীপতি ঠিক গুরুজনের মতোই তাকে মান্য করিয়া চলে, নম্রভাবে সবিনয়ে তার সঙ্গে কথা বলে !

মাঝে মাঝে সে বিস্ময়ভরা চোখে পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া থাকে। অবাক হইয়া ভাবে, কী মানুষটা এই সেদিন গাঁ হইতে শহরে আসিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে সে কী হইয়া গিয়াছে! চোখের সামনে বদলাইয়া না গেলে হঠাৎ দেখিয়া হয়তো সে পীতাম্বরকে চিনিতেই পারিত না!

বাড়ির লোকেও অবাক হইয়া তাকে দেখে, নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে।

লাবণ্য বলে, চালাক চতুর মানুষ তো, ফন্দিফিকির করে পয়সা উপায় করছে।

মোহন বলে, কিছু কিছু উপায় করছে সেটা বোঝাই যায়—কী ভাবে করছে তাই ভাবছিলাম।

পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াও এই জন্য মোহন সংকোচ বোধ করিতেছিল।

সদুপায়ে—পাঁচজনকে অনায়াসে জানানো যায় এমন উপায়ে—পীতাম্বর ইতিমধ্যেই কলকাতা শহরে পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

জিজ্ঞাসা করিয়া পীতাম্বরকে শুধু বিব্রত করা হইবে—বানাইয়া বানাইয়া কতগুলি লাগসই মিথ্যা বলিতে বাধ্য করা হইবে।

একদিন মোহনের মনে হইল যে পীতাম্বর তার বাড়িতে থাকে, পীতাম্বরের পয়সা রোজগারের উপায়টা প্রকাশ পাইয়া গেলে তাকে বিব্রত হইতে হইবে না তো?

পরদিন সকালে পীতাম্বরের বাবু সাজিয়া বাহির হওয়ার সময় সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, কাজকর্ম কিছু করছেন নাকি?

হ্যাঁ, বাবা, করছি কিছু কিছু।

কী কাজ?

এই ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি এটা ওটা।

মোহন আশ্চর্য হইয়া যায়। এটা ওটা বিক্রি করিতে হইলে আগে তো এটা ওটা কিনিতে হয়। সে টাকা পীতাম্বর পাইল কোথায়? ওর কলকাতায় আসিবার গাড়িভাড়াটা পর্যন্ত তাকে দিতে হইয়াছিল।

কী বিক্রি করেন?

এই সাইকেল, সেলায়ের কল, রেডিয়ো, মোটর গাড়ি—

বলেন কী!

পীতাম্বরকে খুব খুশি মনে হয়। একটু গর্বের সঙ্গেই সে বলে, হ্যাঁ বাবা, কাল একটা গাড়ি বেচেছি। ধীরেনবাবু একটা গাড়ি কিনবেন শুনলাম কি না, চেনো না ধীরেনবাবুকে? কাছেই থাকেন, একুশ নম্বর বাড়িতে। তা খবরটা শুনে মোটরওলার দোকানে গিয়ে বললাম, একজন গাড়ি কিনবে, ঠিকানা বললে আমায় কত দেবে? ঠিকানা নিয়ে ওরা লোক পাঠিয়ে দিলে, সে হল গিয়ে ও মাসের তেইশ তারিখ। কাল ধীরেনবাবু গাড়িটা কিনেছেন। আমি ভাবছিলাম মোটরওলারা ঠকাবে বুঝি। তা গিয়ে চাইতেই কুড়িটা টাকা দিলে। কলকাতার লোকেরা বড্ড ভালো বাবা, কেউ কাউকে ঠকায় না।

মোটে কুড়ি টাকা দিলে?

ঠিকানা বলার জন্যে আর কত দেবে বাবা? ওই ঢের দিয়েছে। গাড়িটা বিক্রি করেছে ওদেরই লোক। নিজে যদি কারও কাছে একটা গাড়ি বেচতে পারি—

মোহন নিজে হইতে সাগ্রহে বলিয়াছিল, আমার জানাশোনা কেউ কিনবে শুনলেই আপনাকে জানাব। কুড়ি টাকা নয়, ফুল কমিশন আদায় করে নেবেন কিন্তু। এক কোম্পানি দিতে না চায়, অন্য কোম্পানি দেবে।

যত পারে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পীতাম্বর পরিচয় করে।

মোহনকে সে কোনো অনুরোধ করে না, মোহনের যারা পরিচিত তাদের দিয়া চেনা লোকের সংখ্যা বাড়ায়। পরিচিত লোক মোহনের কাছে আসিলে বাড়িতে থাকিলেও সে সামনে আসে না, অচেনা লোক আসিলে ফরসা জামা কাপড় পরিয়া গিয়া হাজির হয়, মোহনের সঙ্গে অকারণে দু-চারটি কথা বলে, পারিলে নতুন লোকটির সঙ্গেও বলে।

বেশিক্ষণ থাকে না, মোহনকে বিরক্ত হইবার সময় দেয় না।

দু একদিনের মধ্যে, তাকে ভুলিয়া যাওয়ার সময় পাওয়ার আগেই, সে নতুন লোকটির বাড়িতে যায়, বলে, মনমোহনবাবুর বাড়িতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওখানেই থাকি আমি। এক গাঁয়ে বাড়ি আমাদের, সম্পর্ক কিছু নেই, তবে মোহন আমায় কাকা বলে ডাকে।

তারপর আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিলে নিজেরই তোলা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে বলে, খাঁটি কথা, ঠিক বলেছেন ! ব্যাবসা ছাড়া পয়সা নেই। ওই মতলবেই এসেছি কলকাতায়, একটা কিছুতে নেমে পড়ব। তা আমরা হলাম অজ্ঞ গেঁয়ো লোক, আপনাদের বুদ্ধি পরামর্শ সাহায্য না পেলে—

অনেকে সন্দেহ করে, প্রথমেই সতর্ক হইয়া যায়, স্পষ্টই তাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম পীতাম্বরের মনে লাগিত, এখন আর লাগে না। প্রথম প্রথম সে কিছু কিছু মিথ্যা বলিত, বাহাদুরি করিত, চাল দিত, কত যে চেষ্টা করিত মানুষের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জনের জন্য। এখন ওসব সস্তা চালাকি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে যে এত পাকা ধাপ্পাবাজ শহরে আছে, এত রকমের ছলনা চাতুরি ধাপ্পাবাজির সঙ্গে শহরের লোকের পরিচয় যে তার গ্রাম্য বুদ্ধি দিয়া শহরের লোককে ভাঁওতা দিবার সাধ্য তার নাই।

তাই সে নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, নিজের সম্বন্ধে নিজের যা ধারণা তাই প্রকাশ করে, অন্য কিছু বলিয়া প্রমাণ করিবার কোনো চেষ্টা করে না যে সে একজন চালাক চতুর কাজের লোক। আর আশ্চর্য হইয়া লক্ষ করে যে মিথ্যা আর চালবাজি বাদ দেওয়ার পর কারও সন্দেহ অবিশ্বাস এবং অপমান করা এতটুকু ব্যথা দিতে পারে না, অল্প সময়ে বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায় বেশি লোকের !

কেন এমন হয় পীতাম্বর অবশ্য বুঝিতে পারে না।

হিসাব করা বানানো কথা বলিতে গেলে যে শব্দের অর্থ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, অপরিচিত তার সম্পর্কে অনুভব-করা পরিচয়ের সঙ্গে তার বলিয়া দেওয়া পরিচয়ের বিরোধ যে তার সম্পর্কে বিশ্বাস ও ভালো ধারণা সৃষ্টিতে ক্ষতি করে, এসব বুঝিবার মতো বুদ্ধি পীতাম্বরের নাই।

শুধু অভিজ্ঞতা তাকে বলিয়া দেয় যে সহজ সরলতায় কাজ দেয় বেশি। সহজ বুদ্ধিতে আরও একটা কথা সে বুঝিতে পারে, কারও কাছে টাকা ধার চাওয়া চলিবে না, অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলিবে না।

সে দয়া চায়, অনুগ্রহ চায়, নিজের দুঃখ ও জীবন সংগ্রামের কাহিনি বলিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া কিছু আদায় করিতে চায়, এ ধারণা সৃষ্টি হইতে দিলে চলিবে না।

ওটা ভিক্ষে করারই রকম ফের। ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ কথাটা পীতাম্বরের অজানা নয়।

মানুষ জিনিস কেনে, তার মধ্যস্থতায় মানুষ সেই জিনিসগুলি কিনিবে, শুধু এইটুকু তার দরকার। এর বেশি সামান্য কিছু চাহিতে গেলেই তার ক্ষতি হইবে। একটু বিশ্বাস আর সহানুভূতি মানুষের মধ্যে জাগাইতে পারিলেই এই সাহায্যটুকু সে অনায়াসেই পাইবে।

পাইবে কেন, পাইতেছে।

মানুষ বড়ো ভালো, বড়ো উদার।

বাড়াবাড়ি করিলে, গায়ের উপর গিয়া পড়িলে, মানুষ বিরক্ত হয়, রাগ করে, অন্যায় দাবি নিয়া উপস্থিত হইলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যার যতটুকু প্রাপ্য কেউ তা ফাঁকি দেয় না। তাই যদি দিত, চাহিয়া পাওয়ার বদলে টাকা কি উপার্জন করিতে পারিত কোনোদিন ? উপার্জন বাড়ানোর কল্পনা করা চলিত ?

একটি মোটর গাড়ি বিক্রি করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারিত ভবিষ্যতে মোহনের মতো নিজের মোটরগাড়ি চাপার ?

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা টনটন করে, অনেক দূর হইতে আশ্রয়ে ফিরিবার সময় কী যে লোভ হয় ট্রামে বা বাসে উঠিয়া বসিবার !

কিন্তু তখন পীতাম্বরের আপনজনকে মনে পড়ার সময়। সারাদিন কারও কথা তার মনে থাকে না, খাতা দেখিয়া দেখিয়া এক ঠিকানা হইতে সে শুধু আর এক ঠিকানায় যায়, কে কী কিনিবে আর কে কতটুকু লাভের ভাগ দিবে তাই শুধু সে ভাবে।

খাতাটি পকেটে ভরিয়া মোহনের বাড়ির দিকে পা বাড়ানো মাত্র শহরের মানুষের দখল একেবারে শেষ হইয়া যায়, গ্রাম আর গ্রামের আপন জনেরা সকলে মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে, মনের আড়ালে গৃহিণী আর ছেলেমেয়েরা যেন এই সুযোগের জন্য ওত পাতিয়া থাকে।

ট্রামে বা বাসে পীতাম্বরের তাই আর চাপা হয় না।

গ্রামে অকর্মণ্য পীতাম্বরের কাছে ওদের জন্যই একটি পয়সার দাম ছিল অনেক, এখানেও তাই আছে।

মোহনের বাবার ছিল অনেক টাকা। সে পাঁচ সাতশো টাকার সওদা করিতে শহরে আসিত। শহরের পথে হাঁটিয়া বেড়ানোটা ছিল তার শখ, ট্রাম বাসের খরচ বাঁচানোর প্রয়োজনে নয়।

ভাবিতে ভাবিতে আলোকিত শহরের পথেই পীতাম্বর হাঁটে, গাড়ি ঘোড়া বাঁচাইয়া চলে, মনে মনে একেবারে গ্রামে চলিয়া গিয়া ভুলিয়া যায় না সে কোথায় আছে। অতটা ভাবপ্রবণতা পীতাম্বরের নাই।

মন তার কেমন করে না, চোখের জল আসে না। কেবল দেশের ওদের কথা ভাবিতে তার ভালো লাগে। দেখিতে ইচ্ছা হয়, কাছে পাইতে সাধ জাগে।

কারও সে চাকর নয়, তবু একদিনের জন্য ছুটি তার নাই, সাধ হইলেও দেশে ওদের দেখিতে গেলে তার চলিবে না। এ কথা মনে হইলে তার কেমন একটা দুর্বোধ্য ভয় হয়, নিজেকে ধরিবার জন্য অনেক কষ্টে অনেক যত্নে নিজেই জাল পাতিতেছে—এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণায় সময় সময় মনে মনে কিছুক্ষণ ছটফট করার মতো কষ্ট পায়।

পয়সার লোভ কি একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে তাকে ?

তখন সে প্রাণপণ চেষ্টায় আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া ভাবিবার চেষ্টা করে, আহা, কেমন চাঁদ উঠিয়াছে দ্যাখো। মেয়েটা আসিয়া ফুটফুটে একটি ছেলে প্রসব করিয়াছিল। আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলিয়া নাতির কপালে টিপ দিতে পারিলে মন্দ হইত না !

পীতাম্বরের কাছে শ্রীপতি পরামর্শ চাহিলে সে মাথা নাড়ে।

না বাবু, আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারব না। আমাকে কে পরামর্শ দেয় ঠিক নেই।

শ্রীপতি বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করে, পীতাম্বর তার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

কারও দিকেই পীতাম্বর তাকায় না, কারও জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা ছোটো বড়ো সমস্যা সম্বন্ধে তার এতটুকু আগ্রহ নাই।

নিজের কথা ছাড়া কারও কথা সে ভাবে না।

জগতে আরও যে মানুষ আছে সে ছাড়া, শুধু এইটুকু সে জানে, আর কিছু জানিতে চায় না। তারা সকলেই ভালো মানুষ তাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ, এইটুকু তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কারও কান্না তার বুকে বাজে না, কারও হাসি তাকে খুশি করে না।

একটি মানুষের উপর এতটুকু হিংসা বা বিদ্বেষ পর্যন্ত তার নাই, স্বার্থপরতা তাকে এমন উদাসীন করিয়াছে।

লাবণ্য একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। এক বাড়িতে থাকিয়াও এক মাসের উপর লাবণ্যকে সে চোখেও দেখে নাই। লাবণ্য নিজেই তাকে ডাকিয়া না পাঠাইলে আরও কয়েক মাসের মধ্যে হয়তো একটিবার তার মনেও পড়িত না যে এ বাড়িতে লাবণ্য বলিয়া কেহ আছে।

লাবণ্য তাকে খাতির করিয়া বসিতে বলে। তারই জন্য যে চেয়ারটা আগেই এ ঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই চেয়ারে বসিতে বলে !

এবং পীতাম্বরও দ্বিধামাত্র না করিয়া ধীরে সুস্থে সেই চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ মা ?

শহরে এসে শরীরটা টিকছে না।

পীতাম্বর চুপ করিয়া থাকে।

তারপর লাবণ্য তাকে ডাকিয়া আনিয়া খাতির করিয়া ঘরে বসানোর আসল কথাটা বলে।

আপনি তো টোটকা জানেন অনেক রকম, অনেককে সারিয়ে দিয়েছেন। আমায় দিন না একটা কিছু ?

জোরালো চিকিৎসা আরম্ভ করার পর লাবণ্যের অসুখ বাড়িয়াছে। কদিন বিছানায় পড়িয়া থাকে সে হিসাবের বদলে এখন সে হিসাব রাখে কদিন সে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়।

আর একটু সে রোগা আর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তবু তাতেই যেন লাবণ্য তার বাড়িয়া গিয়াছে। গীতিকাব্যের ছাঁকা অনুভূতির প্রলেপ যেন পড়িয়াছে তার রূপে, দেখিলে আরও মৃদু আরও মোলায়েম প্রত্যানুভূতি জাগে।

এ ধরনের নিষ্প্রভ মায়াবোধ্য রূপ দেখার চোখ অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতি যাদের আছে তারা বিশেষভাবে লাবণ্যকে আজকাল দেখে, নিশ্বাসের ঘষায় লাবণ্যের নাকের আর ঠোঁটের ছাল উঠিয়া যাইবে ভাবিয়া শঙ্কিত হয় এবং এমন একটা উপভোগ্য মমতা জাগে বউটির জন্য প্রত্যেক সহৃদয় মানুষের যার স্বাদ অনেকটা প্রেমের মতো।

পীতাম্বর কিছুই অনুভব করে না, লাবণ্যের অস্তিত্ব তার কাছে হৃদয়ের স্বাদ গন্ধহীন হইয়া থাকে। মোহনের রুগ্ন বউটির জন্য সে কিছুমাত্র মমতা অনুভব করে না।

টোটকা ওষুধ চাইছ ? দেব বউমা, তোমায় ভালো ওষুধ দেব। তা, অসুখটা কী তোমার ?

লাবণ্য চোখ বড়ো করিয়া তাকায়। তার অসুখের খবর রাখে না এমন মানুষও যে জগতে আছে এ কথা বিশ্বাস করিতেও তার কষ্ট হয়। আর এ লোকটা এতদিন এক বাড়িতে আছে, বড়ো বড়ো ডাক্তার ডাকিয়া এত সমারোহ করিয়া তার চিকিৎসা হইল, আজ ও জিজ্ঞাসা করিতেছে তার কী অসুখ !

এমনি অসুখ।

এমনি অসুখ ? আচ্ছা, ওষুধ দেব। কিন্তু আমার ওষুধে তো ভালো ফল হয় না বউমা ?

পীতাম্বরকে ডাকিয়া পাঠানোর আগে তারই মুখে শোনা তার নিজের টোটকার গুণগান লাবণ্যের মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গ্রামের বাড়িতে আশ্রিত একজনের ছোটো একটি ছেলেকে ওষুধ দিতে আসিয়া তার ওষুধের গুণ গাহিতে এতসব বড়ো বড়ো বিশেষণ সে উচ্চারণ করিয়াছিল

যে শুনিয়া তখন লাবণ্য হাসি চাপিতে পারে নাই। আজ সেই কথাগুলি মনে করিয়া হাসি পাওয়ার বদলে আশায় সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

পীতাম্বরের মুখে উলটো কথা শুনিয়া সে রাগিয়া গেল।

যান তবে আপনি, যান।

পীতাম্বর চলিয়া যাওয়া মাত্র সে মোহনকে ডাকিয়া পাঠাইল।

পীতাম্বরকে যেতে বলো এ বাড়ি থেকে।

কেন ? কী করেছে পীতাম্বর।

আমি ডেকেছিলাম, টোটকা ওষুধ কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে। মুখের ওপর এমন কাটাকাটা জবাব দিলে ! ওই যেন বাড়ির কর্তা।

ওকে তুমি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন টোটকা ওষুধের কথা ?

তুমি তার কী বুঝবে। আমার যন্ত্রণা বুঝি আমি।

বলিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে লাগিল সে আত্মমমতায় স্বামীর উপর অকারণ অভিমানে, মুখে কিন্তু বলিতে লাগিল, অনেককাল তো আছে, এবার ওকে বলে দাও, নিজের ব্যবস্থা করে নিক। এখানে আর জায়গা হবে না। ওকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

মোহন চিন্তিত হইয়া বলিল, এ তো মহা মুশকিলে ফেললে। গ্যারেজের এক কোণে পড়ে আছে, দুবেলা শুধু দুটি খায়, কী বলে ওকে আমি তাড়িয়ে দেব ? সেটা কি উচিত হবে ?

লাবণ্য তা জানে না। হঠাৎ তার মনে একটা ভাসা ভাসা সন্দেহ জাগিয়াছে, ওই লোকটার জন্যই তার অসুখ বুঝি সারিতেছে না, আরও বেশি ভুগিতেছে। পীতাম্বর যে মোহনদের নির্বংশ হইবার শাপ দিত, গ্রামে থাকিতে এ কথাও লাবণ্যের কানে গিয়াছিল। মোহনের এক বুড়ি পিসি তাকে এমন কথাও বলিয়াছিল যে পীতাম্বরের শাপেই তার ছেলেপুলে হইতেছে না—তাকে সন্তুষ্ট করিয়া সে যাতে অভিশাপ ফিরাইয়া নিয়া তাকে আশীর্বাদ করে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

মনে তখন জোর ছিল—কলেজে পড়া, ইংরাজি সাহিত্য পড়া মনে। গ্রাম্য কুসংস্কার তুচ্ছ করিবার জন্য মোহনের তাগিদও ছিল কড়া। বুড়ি পিসির কথাটাকে সে আমল দেয় নাই।

আজ মনে হয় অসম্ভব কী ? অসুখ তার মিথ্যা নয় কিন্তু পীতাম্বরের জন্যই হয়তো তার অসুখ হইয়াছে। অসুখের জন্য অসুখ নয়, তার যাতে ছেলেপিলে না হয়, মোহন যাতে নির্বংশ হয়, সেই জন্যই অসুখ। মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক কীসব খাটাইতেছে লোকটা কে জানে। লাবণ্য ও সব বিশ্বাস করে না, অত কুসংস্কার তার নাই, কিন্তু যদিই বা কিছু সত্য থাকে ও সমস্তের মধ্যে ? তারা বোঝে না এমন কিছু যদি থাকে ?

গ্রামে থাকতে আমাদের খালি শাপ দিত মনে নেই তোমার ? আমাদের সর্বনাশ হোক তাই শুধু ও চায়। খারাপ মতলব না থাকলে সঙ্গে এল কেন আমাদের ?—আমাদের চোখের আড়াল করবে না। গ্রামের লোকেরা বলত শোনোনি ওর অনেক রকম বিদ্যা জানা আছে ? আমাদের ওপর কিছু খাটাবে বলে সঙ্গে এসেছে। নইলে আমায় ওষুধ দেবে না কেন বলো ? এদিকে আমাদের খারাপ করার জন্য ক্রিয়াত্রিয়া করছে, আমায় ভালো ওষুধ দিলে দুটো শক্তিতে বিরোধ বাধবে বলে তো ?

লাবণ্যের কথা শুনিতে শুনিতে মোহন আমোদ পায় না, অবজ্ঞার সীমা থাকে না তার। অশিক্ষিতা গেঁয়ো মেয়ে হইলেও কথা ছিল, লাবণ্য বি এ পাশ করিয়া এম এ পড়িতেছিল, তার তিনটি ভাই বৈজ্ঞানিক, একজন প্রায় বিখ্যাত। মফস্বলের শহর হইলেও তার বাপের বাড়ি বড়ো শহরে—একটা ভালো কলেজ আছে, কলকারখানা আছে। বিয়ের পর তার দেশের বাড়িতে ক বছর থাকার সময় কি লাবণ্য এ সব ধারণা সঞ্চয় করিয়াছে ?

সেখানে অবশ্য অনেকদিন এমন অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছে, পীতাম্বরের অলৌকিক ক্ষমতায় যারা চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করে। পরিবেশের প্রভাবও বোধ হয় মেয়েদের উপরেই কাজ করে বেশি।

সন্ধ্যার পর হাঁটিতে হাঁটিতে সে জগদানন্দের বাড়ি গেল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক বিশ্বাস করেন ? টোটকা ?

আপনি করেন না ?

মোহন নীরবে একটু হাসিল।

কেন করেন না ? অসম্ভব মনে হয় বলে ? নাকের কাছে ক্লোরোফর্ম ধরলে জ্যান্ত মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, গাঁজা আপিমের ধোঁয়া গিলে স্বপ্ন দেখা যায়, এমন তো লতাপাতা, ওষুধপত্র থাকতে পারে যা খাওয়ালে বা পুড়িয়ে ধোঁয়া নাকে দিলে বিশেষ রকমের মোহ জাগতে পারে মানুষের ? একটা বশীকরণের গল্প শুনেছিলাম। ঠিক কোন দিকে বাতাস বইছে হিসেব করে একজন মাঝরাত্রে গ্রামের ধারে ফাঁকা মাঠে আগুন জ্বালিয়ে লতাপাতা পোড়াতে লাগল, আধ মাইল দূরের এক বাড়ি থেকে একটি বউ ঘণ্টাখানেক পরে হাজির হল সেখানে। এটা হয়তো গল্প, কিন্তু সম্ভবপর গল্প তো ? ঘটনাটা অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু বাতাসে গন্ধ উড়ে গিয়ে বউটাকে মোহগ্রস্ত করে টেনে আনতে পারে, ঘুমের মধ্যে গন্ধটা তার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এটা খুব অসাধারণ হলেও অসম্ভব নয়।

গাঁয়ে কি বউ ছিল একটি ?

তা ছিল না। বউটির শারীরিক মানসিক বৈশিষ্ট্য হিসাব করে হয়তো লতাপাতা বেছে নেওয়া হয়েছিল।

ওসব শুধু কল্পনায় সম্ভব। ঘটতে পারে এইটুকু বলা যায়, কখনও ঘটে না। দ্রব্যগুণে তবু কতকটা বিশ্বাস করা চলে, মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক—

তাতেও বিশ্বাস করা চলে। গানের সুর মনে কাজ করে। দূরে বাঁশি বাজছে, শুনে মনটা কেমন করতে লাগল। খুব কাছে গিয়ে শুনলে হয়তো বেসুরা আওয়াজে বিরক্তি বোধ হবে, কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসছে বলে কোনো কারণে ক্রিয়াটা হচ্ছে অন্যরকম। তা এমন মন্ত্র তো থাকতে পারে কানে এসে লাগলেও শব্দটা ধরা যায় না, মনে কাজ হয় ?

ওসব অনেক শুনেছি জগৎবাবু। এ সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্ক কখনও শেষ হয় না, তর্কই থেকে যায়। আমার একটা কথার জবাব দিন তো। আমি বিশ্বাস করি না, তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম, সমস্তই সম্ভব। কিন্তু যার তার পক্ষে কি সম্ভব ? গানের কথা বললেন, গান শিখতেই মানুষকে কতকাল সাধনা করতে হয়। ওসব মন্ত্রতন্ত্র শেখা নিশ্চয় আরও কঠিন ? কিন্তু আপনি দেখবেন, যারা ও সব জানে বলে লোকে বিশ্বাস করে তারা অধিকাংশই অপদার্থ, হামবাগ।

জগদানন্দ মাথা নাড়ে।

আপনার স্ট্যান্ডার্ডে হয়তো তাই, আসলে হয়তো তারা উঁচুস্তরের মানুষ। স্তরটা ভিন্ন বলেই ওদের হয়তো হামবাগ মনে করি। আপনার লজিকটা এক পেশে, সবদিক বিবেচনা করছেন না। আপনি ভাবছেন অপদার্থ কিন্তু তুকতাক খাটাবার বিশেষ ক্ষমতার জন্য হয়তো ওই রকম হতে হয়। আপনার আমার মতো মানুষ হলে ওই বিশেষ প্রতিভা থাকে না। ফুটপাতে ফোঁটা তিলক কাটা জ্যোতিষি দেখলেই আপনার গা জ্বালা করে, আমার করে না। আপনি ভাবেন ওরা ভণ্ড, লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে, আমি তাও ভাবি না। আপনার মাপকাঠিতে বিচার করলে হয়তো সত্যসত্যই এক

নম্বরের ভণ্ড, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, আমি ওই মাপকাঠিটাই মানি না। ওদের ওই ভণ্ডামিই হয়তো সত্য, আমরা যে সদা সত্যকথা বলি সেটাই হয়তো মিথ্যা। ওরা যে বিদ্যার ভাণ করে সে বিদ্যাটা হয়তো জানে না, কিন্তু বিদ্যাটায় বিশ্বাস করে। আমরা কিছু বিশ্বাস করি না, লোকে মিথ্যাবাদী বলবে ভয়ে সত্য কথা বলি, চলতি সত্য কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতের অমিল লক্ষ করেছেন, কত বিষয়ে কতরকম অমিল ? ওটা হল অবিশ্বাসের প্রমাণ। আমরা চোখ খুলে জানবার চেষ্টা করছি এবং বিশ্বাস অন্ধ এই অজুহাতে আমরা বিশ্বাস ত্যাগ করেছি। যন্ত্রের মতো আমরা অবিশ্বাস করে যাই। বিশ্বাসী ভণ্ডরা যদি নেগেটিভ অপদার্থ নেগেটিভ হামবাগ হয়, আমরা পজিটিভ অপদার্থ, পজিটিভ হামবাগ।

মোহন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করে, আপনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন ?

জগদানন্দ মৃদু হাসিয়া বলে, না। আমিও তাই ভাবছিলাম—আমার কথা শুনে আপনি হয়তো মনে করেছেন আমি অলৌকিকে বিশ্বাসী। আমি এতক্ষণ বললাম আমাদের একপেশে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের এখনকার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে যা অসম্ভব মনে হয়, তাই আমরা অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিই। একটা ব্যাপার কেন ঘটে কীভাবে জানি না বলেই কি সেটা অলৌকিক হয়ে যাবে, ভূতুরে ব্যাপার বলে বাতিল হয়ে যাবে ? একদিন হয়তো জানা যাবে ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত কিছু নয়, বাস্তব নিয়মেই ঘটে থাকে।

কিন্তু বিজ্ঞানকে ডিঙিয়ে কোন মাপকাঠিতে তবে বিচার করব ? বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে কোন যুক্তিতে সেটা সম্ভব ভাবব ?

আপনি আমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছেন না। আমি বিজ্ঞানকে ডিঙিয়ে যেতে বলিনি। বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে সেটা অসম্ভব বলে মানতে হবে বইকী ! কিন্তু বিজ্ঞান আন্দাজে কোনো কিছুকে অসম্ভব বলে না, কেন অসম্ভব তার অকাট্য বাস্তব ব্যাখ্যাও দেয়। কিন্তু আজও বিজ্ঞানের অনেক কিছু অজানা আছে—আজও নানা আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে। আজও বিজ্ঞান যা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না সেটাকেই আমরা অলৌকিক অবাস্তব ভাবব কেন ? জগতে সবই যখন বাস্তব, চিন্তায় অবাস্তবের অলৌকিকের ফাঁকি থাকবে কেন ? ম্যাজিক দেখে তো আমরা ভাবি না অলৌকিক কিছু ঘটছে। বাস্তব জগতে দুর্বোধ্য কিছু ঘটলে হয় ভাবব অলৌকিক, নয় একেবারে উড়িয়ে দেব।

মোহন বিব্রত বোধ করে। জগদানন্দ ঠিক গুরুর মতোই কথা বলিতেছে।

জগদানন্দ তার মুখের ভাব দেখিয়া নিজের মুখে হাসি ফুটাইয়া বলে, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের কথা বাদ দিন না। ভালোবাসার কথাই ধরুন। বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না ভালোবাসাটা ঠিক কী ব্যাপার। বিজ্ঞান বলছে প্রেম কবির ফাঁকা কল্পনা নয়, মানুষের প্রেম বাস্তব ব্যাপার। পশুপাখির যৌন ব্যাপারের মতোই মানুষেরও যৌন ব্যাপার—নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করা আর বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাওয়া। মানুষের যৌন ব্যাপারে আর একটা বাড়তি বাস্তব ব্যাপার আছে—প্রেম। কাব্যে সাহিত্যে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রং দিয়ে এই বাস্তব রহস্যটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়ে আসছে। ফেনা আর রংটা ব্যাখ্যা করে বাতিল করে যৌন বিজ্ঞান প্রেমের মানে বোঝাতে চেয়ে পারেনি। শরীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যৌন বিজ্ঞান, প্রেমের এদিক ওদিক সেদিকটা বুঝিয়েছে, প্রেমকে বোঝাতে পারেনি।

বিজ্ঞান প্রেমকে বাস্তব ব্যাপার বলে নাকি ?

বলে বইকী। কাব্য সাহিত্যে প্রেমের ভাববাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়। বিজ্ঞান বলে, দেহ আর মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া প্রক্রিয়া হল প্রেম। ওটা কেন আর কীভাবে ঘটে বিজ্ঞান সঠিক বলতে পারে না। আজ পারে না, একদিন নিশ্চয় পারবে।

রাত্রে ইজিচেয়ারে চিত হইয়া মোহন একটি বিলাতি ম্যাগাজিনে গল্প পড়িতেছে, গল্পটির শেষে পাওয়া গেল একজন বিখ্যাত যাদুকরের সচিত্র প্রবন্ধ।

কয়েকটি অলৌকিক অবিশ্বাস্য পুরানো ম্যাজিক কীভাবে দেখানো হয় তার সাধারণ বোধগম্য লৌকিক ব্যাখ্যা ও বিবরণ আছে। একজন পৃথিবী বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক সম্পর্কে একটি গল্পও আছে।

অনেকদিন আগে নিজের বোনের সহযোগিতায় যাদুকর একটি অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাইয়াছিলেন, দার্শনিক উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেই খেলাটি দেখিতে দেখিতে বারবার দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল, তিনজন মহিলা মূর্ছা গিয়াছিলেন।

ম্যাজিক দেখানোর শেষে যাদুকর বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁর খেলায় অলৌকিক কিছুই নাই, আগাগোড়া সবটাই কৌশল। কিন্তু খেলাটি শেষ হওয়া মাত্র দার্শনিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত তুলিয়া প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের চুপ করাইয়া আবেগ কম্পিতকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, যাদুকর যাই বলুন তিনি বিশ্বাস করেন না অলৌকিক শক্তির সাহায্য ছাড়া এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে। যাদুকরের ভগিনীর নিশ্চয় কোনো অজ্ঞাত অশরীরী ক্ষমতা আছে।

ব্যাবসার খাতিরে সেদিন যাদুকরকে চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে সেই ম্যাজিকের ফাঁকিটা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বাস ? ম্যাজিকের ফাঁকি তুচ্ছ হইয়া যায়, প্রেক্ষাগৃহে দার্শনিকের কাল্পনিক মূর্তি আর শত শত দর্শকের মুখ ফিরাইয়া তার কথা শুনিতে শুনিতে রোমাঞ্চ অনুভব করার দৃশ্যই মোহনের কল্পনায় জাগিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের কথাই কি জগদানন্দ বলিয়াছিল ? ভুল হইলেও যা বিশ্বাসের জোরে ঠিক, মিথ্যা হইলেও যা বিশ্বাসের জোরে সত্য, যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধেও যা টিকিতে পারে ?

লাবণ্য কি সত্যই বিশ্বাস করে পীতাম্বরের জন্য তার অসুখ সারিতেছে না, বাড়িতেছে ?

কি সংকীর্ণ মন লাবণ্যের ! জগদানন্দের মতে হয়তো অন্ধ অবিশ্বাসের চেয়ে কুসংস্কারের এই বিশ্বাসও ভালো। মোহনের মনটা খুঁতখুঁত করে। সৎ উদাত্ত অন্ধ বিশ্বাস হইলেও কথা ছিল, নিজের ভালোমন্দের হিসাবে ভীরুমনের এই হীন স্বার্থপর বিশ্বাস !

চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া লাবণ্য তার কপালে হাত রাখে।

একলাটি ভালো লাগছে না।

উঠে এলে যে ?

উঠব না ? খালি শুয়ে থাকব ?

লাবণ্যের এ ভাবটা মোহনের জানা। তার হালকা ছেলেমানুষি ভাব আসিয়াছে। এখন হাসিও যত সহজ, কান্নাও তেমনি। তবে, এ অবস্থায় রাগ আর বিরক্তির ঝাঁঝটা তার থাকে না।

পীতাম্বরকে কাল চলে যেতে বলব লাবু।

পীতাম্বরের কথা লাবণ্যের মনেও ছিল না। মোহন না বলিলে আর হয়তো সে তাকে তাড়ানোর কথা কোনোদিন বলিত না।

থাকগে কাজ নেই। এত লোক তোমার ঘাড়ে খাচ্ছে, ওকে তাড়িয়ে আর কী হবে !

অবাক হওয়ার উপায় নাই। একরাশি দিনরাত্রি লাবণ্যের সঙ্গে কাটিয়াছে। জানিতে কি আর বাকি আছে যে এমনিভাবে বদলানোই তার প্রকৃতি !

মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক খাটাইয়া পীতাম্বর তাদের সর্বনাশ করিতেছে ভাবিয়া লাবণ্য যখন গেঁয়ো মেয়ের মতো লোকটাকে তাড়াইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল তখন হয়তো তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে এই লাবণ্যই আবার আধা শহুরে কলেজে পড়া মেয়ের মতো গ্রাম্যভাবের ঝোঁকটা কাটাইয়া উঠিয়া ওই পীতাম্বরের টোটকা ওষুধের লোভ এবং তার মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের ভয় তুচ্ছ করিয়া উদারভাবে লোকটাকে ক্ষমা করিবে।

চিরদিন এমনই করিয়া আসিয়াছে।

শুধু এই ব্যাপারে নয়। অনেক ব্যাপারে।

পীতাম্বরকে তাড়ানোর প্রশ্ন যেন চুকিয়া গিয়াছে এমনিভাবে লাবণ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে, আচ্ছা মা যে বলে ছেলেপিলে হলে আমি সেরে যাব, তাকি সত্যি ?

অনেকের সেরে যায় শুনেছি। যেতে বলব না পীতাম্বরকে ?

লাবণ্য ইতস্তত করিয়া বলে, থাক এখন।

কিন্তু মোহন এখন ভাবে, কাজ কি ? লাবণ্যের মনে যখন একবার ওরকম খুঁতখুঁতানি আসিয়াছিল, কী দরকার পীতাম্বরকে বাড়িতে রাখিয়া ? আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, চিরদিন ওকে আশ্রয় দানের প্রতিজ্ঞাও সে করে নাই। ওকে এবার যাইতে বলাই ভালো।

মনে মনে হয়তো লোকটা সত্যই তার সর্বনাশ কামনা করে। গ্রামে সে মুখেও তাই বলিয়া বেড়াইত, অনেকের কাছেই মোহন শুনিয়াছে। ওকে আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।

না, লাবণ্যের খাপছাড়া ধারণায় সে বিশ্বাস করে না। ক্রিয়াকলাপ তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কেউ কারও ক্ষতি করিতে পারে, তাও পীতাম্বরের মতো লোক, এই হাস্যকর ধারণায় মোহন কখনও ভয় পাইতে পারে ?

তবু, কাজ নাই তার লোকটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়া। এ জগতে কীসে কী হয় কে তা বলিতে পারে ?

ভোরবেলাই মা কিন্তু তাকে আবার ধাঁধায় ফেলিয়া দিলেন।

পীতাম্বরকে তাড়াইবার সংকল্পে ঢিল পড়িয়া গেল, পীতাম্বর রীতিমতো একটা সমস্যা হইয়া উঠিল তার চেতনায়।

মোহন ভোরের চা খাইতেছিল—আবছা ভোরে শুধু এককাপ চা। ছেলেবেলা হইতে বাবা চিরদিন ডাকিয়া তুলিতেন রাত্রির আঁধার ম্লান হইতে শুরু করা মাত্র। গ্রামের সংসারের একাংশ শহরে আনিয়া বাসা বাঁধিয়া শহরের জীবনের সঙ্গে এত অল্পদিনে মানাইয়া ফেলিয়াও সে বিছানায় শুইয়া সূর্যোদয় ঘটিতে দিতে পারে না।

দামি খাটের আধুনিক শয্যা যেন কামড়ায়।

মা ইতিমধ্যেই স্নান সারিয়াছেন।

মা বলিলেন, লাবু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়াতে চাইছে। তুই কি ঠিক করেছিস জানিনে। কিন্তু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়ানো কি উচিত হবে ?

উচিত হবে না কেন ? চিরকাল ওকে পুষব বলে তো আনিনি ? পয়সা রোজগার করছে, এবার নিজের পথ দেখুক।

আপশোশের আওয়াজ করিয়া মা বলেন, তুইও বউমার মতো এলোমেলো চিন্তা করিস। তুই না তুকতাকে বিশ্বাস করিস না ? লাবু বলল তুকতাক করে মানুষটা আমাদের সর্বনাশ করছে—তুইও ওমনি ওকে তাড়াতে রাজি হয়ে গেলি ? বউমা যে উলটো বুঝেছে, ছেলেমানুষি করছে এটা বুঝলি নে তুই ? ওনাকে অপমান করলে তাড়িয়ে দিলেই যে সর্বনাশ হবে আমাদের। ওভাবে ক্ষতি করতে চাইলে শত্রুভাবে করতে হবে তো ? তোর বাড়িতে থেকে তোর অন্ন খেয়ে তোর সর্বনাশের জন্য তুকতাক চালাতে গেলে পীতু ঠাকুর নিজেই মারা পড়বে না ?

লাবণ্য তবে নিজের উদারতায় পীতাম্বরকে ক্ষমা করে নাই, মার যুক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়াছে !

পরদিন সকালেই তাই সে পীতাম্বরকে বলিল, একটা ভারী মুশকিল হল যে পীতুকাকু, গ্যারেজের এই ঘরটা যে আমার দরকার হবে।

পীতাম্বর বলিল, তা আর মুশকিল কি ? সিঁড়ির নীচে কোণের দিকে যে ঘরটা আছে আমি বরং সেখানে যাই ?

সেটা ঠিক ঘর নয়, তিনহাত চওড়া পাঁচহাত একটা ঘুপচি, জানালার বদলে উঁচুতে একটি ছোটো ফুটা আছে, ফেলিয়া দিতে মায়া হয় অথচ কাজে লাগে না এমনি সব আবর্জনাই রাখা চলে।

ও ঘরটাও কাজে লাগবে।

পীতাম্বর চাহিয়া থাকে।

আপনি বরং অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নিন।

পীতাম্বরের মুখ দেখিয়া মোহনের মায়াও হয়, লজ্জাও করিতে থাকে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বলিয়া বসে, তাড়াতাড়ি কিছু নেই, দশ পনেরো দিন আরও থাকতে পারবেন। সুবিধামতো ব্যবস্থা করে না নিতে পারলে আমি কি আপনাকে তাড়িয়ে দেব ? দেখেশুনে সুবিধামতো জায়গা খুঁজে নিয়ে গেলেও চলবে।

দশ পনেরো দিন সময় দিয়াছে। তার মানেই অন্তত এক মাসের আগে লোকটা নিশ্চয় নড়িবে না।

মোহন মনে মনে আপশোশ করিতে লাগিল। পীতাম্বরকে বাড়িতে রাখিবে না ঠিক করিবার পর অবিলম্বে তাকে তাড়ানোর জন্য তার কেমন একটা খাপছাড়া ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। এতদিন সে আছে, যার থাকা অথবা যাওয়ার কথা এতদিন সে একবার চিন্তাও করে নাই, এখন আরও পনেরোটা দিন সে থাকিবে ভাবিলেই তার অস্বস্তির সীমা থাকিতেছে না।

সারাদিন মোহন এই কথাটাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিল, রাত্রে পীতাম্বর ফিরিলেই তাকে জানাইয়া দিবে কিনা, কাল পরশুর মধ্যেই তার যাওয়া চাই। তারপর রাত দশটার সময় খোঁজ নিতে গেল পীতাম্বর ফিরিয়াছে কিনা।

শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে জানাইল, পীতাম্বর তার যা কিছু ছিল পুঁটলি বাঁধিয়া সকালেই চলিয়া গিয়াছে।

উনি কী করেছেন বাবু ?

কিছু করেনি।

একবার বলিয়া গেল না ?

এত তেজ পীতাম্বরের ? এতদিন তার আশ্রয়ে থাকিতে পারিল, তার অন্ন ধ্বংস করিতে পারিল, যাওয়ার সময় একবার বিদায় নিয়া যাইতে পারিল না ? বলা মাত্র গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল ?

এ রকম অকৃতজ্ঞই হয় বটে এ সব অপদার্থ মানুষ।

পীতাম্বর কিছু ফেলিয়া যায় নাই, কাগজের একটি টুকরাও নয়। ফেলিয়া যাওয়ার কিছুই তার ছিল না। কোনো চিহ্নই সে রাখিয়া যায় নাই।

যে স্থানটুকু মাত্র কয়েকমাস সে দখল করিয়াছিল সেদিকে চাহিয়া শ্রীপতির বুক অনিশ্চিত আশঙ্কায় দুরদুর করে।

কে জানে মোহন কবে তাকেও দূর করিয়া দিবে।

থাকা আর খাওয়ার জন্য পয়সা খরচ করিতে হইলে কদমকে তার আর টাকা পাঠানো হইবে না, দুটি চারটি টাকার বেশি নয়। কদমের মুখের হাসি মিলাইয়া যাইবে, একটু নির্ভাবনায় থাকিয়া আর পেটে দুটো খাইয়া তার চেহারায় যে জলুস আসিয়াছে তার চিহ্ন থাকিবে না, মা-মরা

ছেলেমেয়েগুলিকে খুশি মনে আদর যত্ন করার বদলে আবার গায়ের জ্বালায় দিশা হারাইয়া তিন হাতারি পিটাইতে আরম্ভ করিবে।

না, আর দেরি করা নয় !

আয় বাড়ানোর জন্য কোমর বাঁধিয়া এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। দুর্গার পিছনে আর একটি পয়সা খরচ করা চলিবে না। নিজের খরচ আরও কমাইতে হইবে—কোনো রকমে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য যা দরকার তার অতিরিক্ত সব কিছু ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে—বিড়ি খাওয়া পর্যন্ত।

রোজগারের কী ব্যবস্থা করিবে ?

হাতাখন্তি দা কুড়ুল গড়া ছাড়া কিছুই সে যে জানে না। জগদানন্দের দয়ায় কারখানায় কাজ পাইয়াছে, প্রথম দিকে কাজের কিছুই বুঝিত না, ক্রমে ক্রমে কাজ শিখিয়াছে। কারখানাতে কাজ না করিলে এ শিক্ষার কোনো দাম নাই। জগদানন্দের খাতিরে প্রথম হইতেই ভালো মজুরি কাজ শুরু করিয়াছে। তাতে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় নাই। কাজ শিখিলেও সহজে তার কাজ পাকা করা হইবে না, বেতন বাড়িবে না। কারখানায় কাজ না করিয়া অন্য কিছু সে যদি করিতেও চায়, লোচনের মতো ছোটখাটো একটি নিজস্ব মেরামতি কারখানা খোলে, ফণীর মতো ভাঙা লোহালক্কড় কেনাবেচা করে,—টাকা কই তার ?

টাকা ?

দেশে, এক বিঘা জমি আছে। দুখানা ভাঙা ঘর আছে। কদমের গায়ে একটু সোনা আছে। আর আছে হাপর নেহাই হাতুড়ি সাঁড়াশিগুলি। ওসব বেচিয়া দিলে কিছু টাকা হয় না ?

কাজের শেষে কারখানার বাহিরে আসিয়া খাটুনির চেয়ে দুশ্চিন্তায় শ্রীপতি বেশি শ্রান্তি বোধ করে।

বিড়ি খাইতে বড়ো ইচ্ছা হয়। বিড়ি সে কেনে নাই, দুটি একটি চাহিয়া খাইয়াছে। কিনিবে না করিতে করিতে এক পয়সার বিড়ি সে কিনিয়া বসে।

শুধু একটি পয়সা। কি আসে যায় একটি পয়সাতে ?

বিশেষত আর কোনোদিন যখন কিনিবে না, আজই তার শেষ বিড়ি কিনিয়া খাওয়া। বিড়ি না খাইয়া একটা পয়সা বাঁচানো আরম্ভ করা একটা দিন শুধু পিছাইয়া গেল।

মোটে একদিন।

দুর্গার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিবে কি ?

শেষ দেখা ?

দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দেওয়াও একটা দিন পিছাইয়া দিলে খুব বেশি আসিয়া যাইবে ?

কিছু ভালো লাগিতেছে না, কেমন অস্থির অস্থির করিতেছে মনটা তার। দুর্গার কাছে গেলে কি এখন ভালো লাগিবে ? দুর্গার শান্ত ঘরোয়া ব্যবহার প্রথমটা শ্রীপতির বড়োই পছন্দ হইয়াছিল, এখন কেমন যেন ভোঁতা মনে হয় তাকে। দুর্গার সরল সহজ কথা আন্তরিক সহানুভূতি আর তেমন মিঠা লাগে না।

কারখানার ভিতরের গরমের পর বাহিরের শীতে কাতর হইযা ঘরের কোণে জড়োসড়ো হইয়া শ্রীপতি বসিয়া থাকে, এমন অসহায়, এমন অকর্মণ্য মনে হইতে থাকে নিজেকে, এমন অর্থহীন হইয়া যায় বাঁচিয়া থাকা !

টাকার জন্য প্রাণপাত করিতে সে রাজি, তার কোনো সুযোগ নাই। কদমকে ছাড়িয়া দিন কাটে না, তাকে কাছে রাখা চলে না। বিড়ি খাইতে ভালো লাগে, বিড়ি কেনা বন্ধ করিতে হয়।

কারখানায় কাজ আরম্ভ করিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছে দয়া করিয়া তাকে কাজ দেওয়া হয় নাই, তাকে খাটাইবার জন্য কর্তাদের আগ্রহের সীমা নাই।

তাকে বেশি বেশি খাটিবার সুযোগ দিয়া তাকে খাটাইতে পারিয়াই যেন তারা বর্তিয়া যায় !

ভাগ্য যেন পরিহাস জুড়িয়াছে তার সঙ্গে।

এর চেয়ে গ্রামে থাকাই তার ভালো ছিল ! যা জুটিত তাই খাইত, না হাসিলেও কদম কাছে থাকিত, এত সব দুশ্চিন্তার ধারও ধারিতে হইত না।

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতির মরিয়া হওয়ার প্রেরণা জাগে।

কেন এত ভাবনা ? কী হইবে নিজেকে এমনভাবে কষ্ট দিয়া ? খেয়ালমতো যা খুশি সে করুক না কেন ? যা ইচ্ছা করুক কদম, কদমের জন্য তাকে এ রকম যেমন খুশি খাটানোর নিয়ম সে মানিবে না। এভাবে খাটিবে না। কারও তোয়াক্কা না রাখিয়া বাঁধা নিয়মে খাটিয়া যা রোজগার করিবে এক পয়সাও সে তাকে পাঠাইবে না, রোজগারের সব টাকা খরচ করিবে নিজের জন্যে, ফুর্তি করিয়া কাটাইবে।

ভবিষ্যৎ ভুলিয়া মজা করার চেয়ে মজা আর কী আছে ! মজুরি পাইয়াছে পরশু, এখনও কদমকে পাঠানো হয় নাই। দু একদিনের মধ্যে মোহনের কর্মচারী দেশে যাইবে, তার সঙ্গে পাঠাইবে ভাবিয়া রাখিয়াছে। কদমের জন্য টাকা না রাখিয়া জ্যোতি আর মদনকে সাথি করিয়া সে যদি দুর্গার কাছে যায়, চাঁপাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে, একেবারে গোটা একটা দেশি মদের বোতল কেনে আর হইচই করে সারারাত ?

না, দুর্গার ঘরে ফুর্তি জমিবে না !

দুর্গা চাঁপার মতো নয়, গেলাসে চুমুক দেওয়ার বদলে সে শুধু ঠোঁটে ঠেকায়। অনর্গল হাসি তামাশা ছলনা চাতুরীর উল্লাসে বিশ্বসংসার ভুলাইয়া দেওয়ার বদলে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া থাকে, উত্তেজনা ঠান্ডা করিয়া দেয়।

দুগ্‌গা যেতে বলেছে দাদা।

জ্যোতি তাগিদ জানায়।

তা বলিবে বইকী, দুর্গা কি আর খবর রাখে না কবে সে মজুরি পাইয়াছে, আট দশ দিন খোঁজও নেয় নাই, এখন একেবারে তার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। মন ভুলাইতে না জানুক দুর্গা পয়সা চেনে।

না, ফুর্তি করা নয়, দুর্গার সঙ্গে সে আজ ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিবে। আজ সে যাইতেছে বটে, কিন্তু সব সম্পর্ক দুর্গার সঙ্গে চুকাইয়া দিয়া আসিবে, কোনো দিন যাতে আর যাইতে না হয়।

আসো না কেন বলো দিকি ? কী হয়েছে তোমার ?

ময়লা চাদরে ঢাকা শ্রীপতির হাতুড়ি পেটা শক্ত সুন্দর শরীরটা দুর্গা দেখিতে পায় না, তাই গায়ে পিঠে হাত বুলায়। এখানে ওখানে টিপিয়া স্প্রিং-এর মতো মাংসপেশিগুলি অনুভব করিতে দুর্গার ভালো লাগে।

পয়সাকড়ি নেই, আসব কী !

তোমার সঙ্গে আমার বুঝি শুধু পয়সার সম্পর্ক ? তেমন মানুষ নই গো, নই !

নিতে তো ছাড় না।

দিয়েছ, নিয়েছি। কেড়ে নিয়েছি তোমার ঠেঁয়ে ?

কেড়ে নেবে কেন, তক্কে তক্কে থাকো কবে মজুরি পাব ! ওমনি ডাক পড়ে। কেড়ে নেওয়ার চেয়ে ভালো নিতে জানো তুমি।

দুর্গা আহত হইয়া ঘাড় কাত করিয়া বলে, না নিলে খাব কি ? খেয়ে পরে বাঁচতে হবে না আমার ?

তারপর ঝগড়ার ভঙ্গিতে মুখটা সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলে, কত দিয়েছ যে শোনাচ্ছ এমনি করে ? ভাসিয়ে দিয়েছ দিয়ে দিয়ে। আমি তাই চুপ করে থাকি, ভাবি আসবে যাবে মায়া জন্মাবে, নিজে থেকে দেবে—আমি কেন চাইতে যাব ! নইলে দশ গুণ আদায় করতাম তোমার ঠেঁয়ে।

কথাটা মিথ্যা নয়, দেনা পাওনার হিসাবে দুর্গা এ পর্যন্ত শুধু ঠকিয়াছে। আর কেউ হইলে তাকে ঘরে ঢুকিতে দিত না। শ্রীপতির যেন মনেই ছিল না এটা দোকান, এখানে দাম দিতে হয়। দুর্গা আসিতে বলে তাই সে আসে বটে, কিন্তু কেউ তাকে বাঁধিয়া আনে না। দাম দিতে কষ্ট হইলে না আসিতে তার কোনোই বাধা নাই !

ঝগড়া হইল এই পর্যন্ত, দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কি একটা ঝগড়াই শ্রীপতি কল্পনা করিয়াছিল,—জ্যোতি আর চাঁপার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন হয়। ওদের একটি ঝগড়া সে দেখিয়াছে। তীক্ষ্ণ তীব্র অশ্রাব্য সব কথা শুনিলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা হয়, ভাবা যায় না এ জীবনে কোনোদিন একজন আরেকজনের মুখ দেখিবে।

আজ তাদের দুর্জনের প্রয়োজনীয় ঝগড়াটা যেন আরম্ভ হওয়ার আগেই ঠান্ডা হইয়া গেল।

তাই বটে, চাঁপা অনেকদিন এ লাইনে আছে, চাঁপার সঙ্গে কোনো বিষয়েই পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা দুর্গার নাই।

দুর্গা মুখ ভার করিয়া বলে, রাগ কোরো না বাবু। ঝগড়াঝাঁটি আমার সয় না। সাধ না গেলে একটি পয়সা তুমি আমায় দিয়ো না। আজ পর্যন্ত চাইনি, কখনও চাইব না।

তোমার চলবে কীসে ?

তুমি চালাবে। পাষাণ নও তো তুমি, মানুষ। খেতে পরতে পাই না দেখলে সইবে তোমার ? আজ না দাও, একদিন যেচে তুমি আমায় কাপড় দেবে, গয়না দেবে। নেব না বললে বরং রাগ হবে তখন। সেদিন আসুক, আমি চুপ করে আছি।

কদমের সতীনের মতো যেন কথা বলে দুর্গা, তার বিয়ে করা বউ-এর মতো। এই তবে মতলব দুর্গার, আগে তাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধিবে, তারপর ভাগ বসাইবে কদমের পাওনায় ?

দুর্গা চা আনিয়া খাওয়ায়, গা ঘেঁষিয়া বসে, হাই তুলিয়া হাসে, বলে যে অন্য ঘরে একজনের অসুখের জন্য দু রাত জাগিয়াছে। শ্রীপতির হৃদয়ে শুরু হয় মোহ আর ভয়ের লড়াই, দুর্গাকে সে দুহাতে বাঁধিতে চায় আর তারই মধ্যে অনুভব করে দুর্গার বাঁধন। দিন দিন তারই মোহকে জোরালো করিয়া দুর্গা তার বাঁধন শক্ত করিবে তাকে বশে রাখিবে।

দুর্গাকে আজ তার মনে হয় শোনা গল্পের সেই রহস্যময় দেশের নারী, যে দেশের মেয়েরা বিদেশি পথিককে বশ করিয়া রাখে, পথিক আর দেশে ফেরে না।

দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দিতে আসিয়াছিল, ঝগড়াটা না জমিলেও সম্পর্ক সত্যই চুকিয়া গেল।

নিজের সব ভার তার উপর ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ওত পাতিয়া আছে, আর কি তার ধারে কাছে ঘেঁষিতে পারে শ্রীপতি ?

একা কদমের ভার সে বহিতে পারে না, দুর্গার ভার নেওয়ার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে ? একটির পর একটি রাত্রি কাটে, জ্যোতি আসিয়া দুর্গার তাগিদ জানায়, জীবনব্যাপী বিরহ কামনার প্রথম দিকের ঘনীভূত বিষাদ বিষের মতো শ্রীপতিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

একটিবার, শেষবারের জন্য শুধু একটিবার দুর্গার সঙ্গে দেখা করিয়া আসার কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতি ছটফট করে। দুর্গা সস্তা ছিল, দাম বাড়িয়াছে। তাকে বশ করিয়া শাড়ি গয়না আদায় করার মতলব দুর্গার শুধুই মতলব, তাকেও দুর্গা চায়। শ্রীপতিকে একজন চায়, সিংপুরের হাতুড়িপেটা গেঁয়ো কামার শ্রীপতিকে, মজুর শ্রীপতিকে !

জাগিয়া জাগিয়া কল্পনার স্বপ্নে তো নয়ই, ঘুমের স্বপ্নেও কোনোদিন এমন ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

কদমকে সে চায়, মনে প্রাণে চায়, কিন্তু কদম তাকে চায় কিনা তা সে জানে না। কদম কোনোদিন জানিতে দেয় নাই। চিরদিন সে-ই কদমকে চাহিয়া আসিয়াছে এবং বিয়ে করা বউ বলিয়া সংসারের নিয়মে কদম তার চাওয়ার মান রাখিয়াছে।

শ্রীপতির জীবনে দুর্গাই এ জগতের প্রথম এবং একমাত্র নারী তাকে যে পুরুষের সম্মান দিয়াছে।

তার কাছে দুর্গাই তাই হইয়া উঠিয়াছে রাজার কাছে রাজ্যের মতো দামি। রানির জন্য রাজার রাজ্য ত্যাগ করার মতোই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কদমের জন্য দুর্গাকে ছাঁটিয়া ফেলা।

জ্যোতির মারফতে দুর্গার তাগিদ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া আপনা হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। জ্যোতি আসিয়া আর বলে না যে দুর্গা তাকে যাইতে বলিয়াছে।

শুধু এই তাগিদটুকুর জন্য কয়েকদিন শ্রীপতি উৎসুক হইয়া রহিল, কখন জ্যোতি আসিয়া বলিবে যে দুর্গা ডাকিয়াছে।

তারপর, জয়ী পুরুষের গর্ব আর তেজের অনুভূতি নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখে দেখার চেয়ে দুর্গাকে কল্পনায় স্পষ্টতর দেখার দৃষ্টি হইয়া আসিল ঝাপসা।

দুর্গাকে চাহিয়া শ্রীপতি আর রাত জাগে না, দুর্গাকে চাহিয়া মাঝরাত্রে আর তার ঘুম ভাঙে না।

শুধু থাকিয়া গেল একটু জ্বালা আর একটু মন কেমন করা—মৃদু এবং স্থায়ী। একটা বড়ো রকম অসুখ হইয়া কিছুদিন পরে যেন সারিয়া গিয়াছে কিন্তু আগের মতো সুস্থ হইতে পারিতেছে না।

নিছক মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নয়। মানুষটাই সে বদলাইয়া গিয়াছে।

আগের মতো আর সে বিচলিত হয় না, তুচ্ছ কারণেও নয়, বড়ো কারণেও নয়। পীতাম্বরের মতো তাকেও মোহন তাড়াইয়া দিতে পারে, এ চিন্তায় আর আতঙ্ক জাগে না। কদমকে কাছে আনিয়া রাখিতে ছ মাস এক বছর বিলম্বের সম্ভাবনা আর তেমনভাবে কাতর করে না। আজকালের মধ্যে বড়োলোক হওয়া যাইবে না বলিয়া দিশেহারা হতাশ কল্পনা নিয়া সে টাকা করার উদ্ভট অসম্ভব ফন্দিফিকিরের জাল বোনে না। কীসে কী হয় কে বলিতে পারে ?

দেখা যাক কী হয়।

পুরুষমানুষ কারখানায় খাটিয়া খায়, কী আছে তার যে হারাইবার ভয়ে কাবু হইয়া থাকিবে ?

শ্রীপতি আজকাল এমনিভাবে ভাবে।

একটা ধীর শান্ত বেপরোয়া ভাব জাগিতেছে। ধরিতে গেলে সে তো সর্বত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী !

তার কীসের ভয়, কীসের ভাবনা ? কদম ছিল অভ্যাস। নিছক অভ্যাস পুরুষানুক্রমিক একটা নেশা।

কদমের জন্যই দুর্গার মোহ সে জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়াছিল—কদমকে বাদ দিয়া দিন কাটাইতে কাটাইতে তার জন্য ছটফটানিও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

দুর্গার মতো কদমও মনের মধ্যে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া একটু মন কেমন করে, আর কিছু নয়।

নেশা কাটিয়া আসিয়াছে। আর সে পাগল হইবে না কদমের জন্য। দেশের ওই কদমের অভ্যাস কদমের নেশায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় পাগল হইয়া আর তাকে ছুটিতে হইবে না কদমের প্রতিনিধি অন্য কোনো চাঁপা বা দুর্গার কাছে !

দেহ মনে একটা অদ্ভুত শান্ত দৃঢ়তা ও তেজ অনুভব করে শ্রীপতি।

পুরানো নেশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছে, পচা বাঁধন খসিয়া পড়িতেছে—সে মুক্তি পাইতেছে প্রতিদিন।

নূতন জীবনের স্বাদ গন্ধও মিলিতেছে।

জ্যোতির সঙ্গে আর তেমন তার বনিবনা নাই। নতুন সাঙাত জুটিয়াছে।

কারখানায় তার সহকর্মী ভূপাল। জ্যোতির সঙ্গে কীভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল সাঙাতি আর ভূপালের সঙ্গে কীভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে আঁতাতি !

কাজে ভর্তি হইয়া শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কাজ শিখিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত, এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিত না সে গেঁয়ো কামার।

সহকর্মীদের চালচলন কথাবার্তা প্রায় কিছুই বুঝিত না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার কোনো চেষ্টাই করিত না। কোনো রকমে শুধু মানাইয়া চলিত।

এদের সঙ্গে উদয়াস্ত খাটিবে, কাজের জন্য দরকারি সম্পর্ক রাখিবে কিন্তু এই সব শহুরে পাকা ঝানু মজুরের সঙ্গে তার কি সমঝাওতা করা চলে।

শহুরে সাঙাত জ্যোতি। মোহনের বাড়ির চাকর হইয়াও ফরসা হাফ শার্ট আর ধুতি পরে, পায়ে স্যান্ডেল দেয়, পাঁচীর ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া মদ খাওয়ায় গান শোনায়—শ্রীপতি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কোন ভাগ্যে তার এমন শহুরে বন্ধু জুটিয়াছে শহরে আসিয়াই !

প্রথম প্রথম জ্যোতির মুখে বড়ো বড়ো লোকের বাড়ি চাকরি করা আর একধার হইতে বাড়ির মেয়ে বউদের সঙ্গে পীড়িত করার অশ্লীল গল্প শুনিতে শুনিতে শ্রীপতির মনে হইত, কলির কোনো দেবতা কি পৃথিবীতে জন্ম নিয়া শৌখিন বাড়ির শৌখিন চাকরের বেশে লীলা খেলা করিতেছেন ! শুধু পাঁচীর ঘরে গিয়া মাতলামির লীলাখেলা করার ঝোঁকটার জন্য সে তাকে চাকররূপী দেবতা বলিয়া মানিতে পারে নাই।

এখন সে টের পাইয়া গিয়াছে যে জ্যোতির দৌড় বস্তির ওই সস্তা পাঁচী পর্যন্তই। বয়স কম, চেহারায় জলুস আছে, চাকরের কাজে ঢুকিয়া দু একটা বাড়িতে দু একটা কেলেঙ্কারি হয়তো করিয়া থাকিতে পারে—একধার হইতে ভদ্রঘরের বালিকা তরুণী বয়স্কা নারীর হৃদয়রাজ্য জয় করিবার উদ্ভট উৎকট কাহিনিগুলি সবই তার বানানো।

নিজের মনের বিকারকে খাতির করিবার জন্য বানানো। তার মতো গেঁয়ো সরল মানুষকে শ্রোতা হিসাবে না পাইলে তাই তার মিথ্যা গল্প বলার রস জমে না।

হাতে পয়সা থাকিলে সে পাঁচীদের ঘরে গিয়া মাতলামি আর হল্লার লীলাখেলা করে, পয়সা না থাকিলে মন-মরা হইয়া তাকে উৎকট বীভৎস রসে রসাইয়া রসাইয়া গল্প বলিয়া নিজের বিকারকে সামলানোর চেষ্টা করে।

শুনিতে শুনিতে বিচলিত অভিভূত হইয়া যাইত ভাবিলে এখন শ্রীপতির নিজের গ্রাম্যতার অজ্ঞতায় লজ্জা বোধ হয়, হাসি পায়।

একটা গেঁয়ো বউ কদমের তাল সামলাইতে তার প্রাণান্ত হয়, দুর্গাকে পর্যন্ত ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়—মোহনের পেয়ারের চাকর বলিয়া এবং চেহারায় একটু জলুস আছে বলিয়া জ্যোতির বেলা যেন প্রেম করিতে গেলে দায় ঘাড়ে করার নিয়মটা বাতিল হইয়া যাইবে।

কদম পর্যন্ত তাকে এতটুকু রেহাই দেয় না, শহরের চালাক চতুর মেয়েরা যেন কদমের চেয়ে বোকা !

গ্রামে থাকিতে শ্রীপতি বিশ্বাস করিত, দাম দিয়া পীরিত হয় না। এখন সে জানিয়া গিয়াছে পীরিত করার দামও পুরুষকে দিতে হয় !

জানিয়া কত দিক দিয়া যে সে স্বস্তি বোধ করিয়াছে !

ভূপালও তাকে নানারকম গল্প শোনায়—শ্রমিকের লড়াই হইতে শহরের জীবন ও ঘটনা হইতে কেচ্ছা পর্যন্ত অনেক বিচিত্র কাহিনি। তার কেচ্ছা জ্যোতির নিজের বাহাদুরির বানানো কাহিনির চেয়ে কম অশ্লীল হয় না—কারণ, শুনিলেই বুঝা যায় অন্যের ব্যাপার হইলেও ভূপাল বানাইয়া বলিতেছে না, হয়তো খানিকটা রং চড়াইয়াছে।

যখন বলে একেবারে চুটাইয়া বলে, তবে জ্যোতির মতো তার এই একটিমাত্র রসই সম্বল নয়।

প্যাঁচ কষে না, কায়দা করে না, সোজা স্পষ্ট কাটাকাটা কথা বলে, তবু জীবনের কত রকমারি দিক, আশ্চর্য দিক রূপ নেয় ভূপালের কথায়। মনে হয়, প্রতিদিন তার যে নতুন অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে একেবারে অজানা বিষয়ে ভূপালের বর্ণনার সঙ্গেও যেন তার কেমন একটা মিল আছে।

মজুরের লড়াই-এর কথা শুনিতে শ্রীপতির খুব আগ্রহ জাগে। কীসের লড়াই আর কেন লড়াই তার আসল কথাটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া গিয়াছে। এ সব তারও লড়াই, তার স্বার্থের সঙ্গেও এ সব জড়িত।

মজুরি বাড়ানোর লড়াইটাই ধরো। মজুরি বাড়িলে সে কদমদের আনিতে পারে। কাজ শিখিলে তার মজুরি বাড়িয়া কাজ পাকা হওয়ার কথা।

নিজের ছোটো গেঁয়ো কামারশালায় হাতুড়ি পিটিয়া তার জীবন কাটিয়াছে, কী এমন কঠিন কাজটা তাকে এখানে করিতে দেওয়া হইয়াছে যে এতদিনেও ভালো করিয়া কাজ শিখিতে বাকি থাকিবে ?

কিন্তু কেউ এ কথা কানেও তোলে না যে সে ভালো কাজ শিখিয়াছে, এবার তার পাকা কাজের মজুরি পাওয়া উচিত !

ভূপাল একগাল হাসিয়া বলে, যা যা বড়াই করিস নে ! এর মধ্যে কাজ শিখে গেছেন, পাকা কাজ চাই, বেশি হপ্তা চাই। তোর শালা ঢের দিন বাকি কাজ শিখতে।

কাজ শিখিনি ? ঠিকমতো কাজ করছি না ?

শিখেছিস তো শিখেছিস ! ঠিকমতো কাজ করছিস তো করছিস ! তাতে কী হয়েছে রে ব্যাটা ? সময় হবে, মর্জি হবে, তবে কাজ পাকবে।

সুর পালটাইয়া মুখ বাঁকাইয়া একজন মধ্যস্থ কর্তাব্যক্তির হাবভাব নকল করিয়া ভূপাল বলে, তেড়ি-বেড়ি করিস নে বাবা, তেড়ি-বেড়ি করিস নে—দোহাই তোর। তবু তো খেটে খাচ্ছিস ? খেদিয়ে দিতে জবরদস্তি করিস নে বাবা, করিস নে—দোহাই তোর। আখেরে ভালো চাস তো চুপচাপ খেটে যা। গা থেকে পাঁকের গন্ধ যায়নি, কাজ শিখে গেছিস !

শ্রীপতি হাসিয়া ফেলে।

কাজ পাকা করার কথা বলিতে গেলে ঠিক এইভাবে এইরকম ভঙ্গি করিয়া এই কথাগুলিই শঙ্করবাবু তাকে বলিয়াছিল বটে।

তেমন বনিবনা না থাকিলেও জ্যোতির সঙ্গে বিবাদ বা বিচ্ছেদ হয় নাই। জ্যোতির অশ্লীল গল্প আজও কিছু কিছু শুনিতে হয়। তবে শুনিতে শুনিতে সে অভিভূত হইয়া পড়ে না বলিয়া, মাঝে মাঝে খাপছাড়া প্রশ্ন করে এবং খাপছাড়া ভাবে হাসিয়া ওঠে বলিয়া, তাকে গল্প শুনাইবার উৎসাহ জ্যোতির ঝিমাইয়া আসিয়াছে।

আগে জ্যোতি ছিল বক্তা, শ্রীপতি ছিল নীরব শ্রোতা। আজকাল শ্রীপতি কখনও কখনও তার অভাব অভিযোগ রাগ দুঃখ আপশোশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে—একটি কলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে জ্যোতির পীরিত জমিয়া নোংরামির ক্লাইমেক্সে উঠিবার মুখে শ্রীপতির আপশোশ ফাটিয়া পড়িলে—কয়েক মিনিট তাকে চুপচাপ শ্রীপতির কথা শুনিয়া যাইতে হয় !

খানিকটা অভিভূত ও বিচলিত হইয়াই শোনে।

মনটা যে তার ধাক্কা খাইয়াছে, নড়িয়া উঠিয়াছে, খানিকক্ষণ শ্রীপতির কথা শুনিবার পর তার অস্থিরতা শুরু হইলেই সেটা বোঝা যায়।

কত যে আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, তুই বড়ো বোকা ভাই। তোর কোনোদিন কিছু হবে না। সংসারের চালচলন কিছুই বুঝিস নে তুই।

কী বুঝিনে ?

কিছুই বুঝিস নে। কাজ কি তুই বাগিয়েছিস ? নিজের চেষ্টায় ? কাজ যারা বাগিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যা না বোকারাম হাঁদারাম ! কাজ যারা জুটিয়ে দিল, কাজটা তারা পাকা করে দিতে পারবে না ?

কথাটা যে শ্রীপতি ভাবে নাই তা নয়। কিন্তু মোহনকে কাজের বিষয় কিছু বলিতে সে বড়োই সংকোচ বোধ করে।

তার লজ্জা হয়।

মোহন জগদানন্দকে বলিয়া তাকে যে কারখানায় ভর্তি হইবার সুযোগ দিয়াছে, কাজ করিয়া কাজ শিখিবার সামান্য মজুরি পাইয়াও সে যে মোহনের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কদমকে নিয়মিত দু-চার টাকা পাঠাইতে পারিতেছে—এই তো যথেষ্ট করিয়াছে মোহন।

সাহায্য করিয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য শ্রীপতি ভুলিতে পারে না যে মোহন তাকে অনুগ্রহ করে নাই, কাজটা তাকে ভিক্ষা হিসাবে জুটাইয়া দেয় নাই।

যতই দুঃস্থ হোক, নিচুজাতের লোক হোক, মোহনের সে গ্রামবাসী। উঁচুজাতের ওই পীতাম্বরের মতোই সে-ও তার প্রজা নয়, তার এক কাঠা জমির ধারও সে কোনোদিন ধারে নাই।

শ্রীপতির স্পষ্ট মনে আছে, তার প্রায় সমবয়সি পনেরো যোলো বছরের মোহন একদিন লুকাইয়া তাদের বাড়ি আসিয়াছিল, বহুকালের পুরানো একটা তলোয়ারে ধার করিয়া দিবার জন্য তার বাবাকে অনুরোধ জানাইয়াছিল।

যেটুকু ধার ছিল তলোয়ারটায় সেটা আরও খানিকটা ভোঁতা করিয়া দিয়া তলোয়ারটা শুধু ঝকঝকে করিয়া দিয়াছিল তার বুড়ো বাবা।

মোহন খুশি হইয়া পুরো একটা টাকা মজুরি দিতে চাহিলে তার বুড়ো বাবা ফোকলা মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল, তোমার খেলনা বানিয়ে দিয়ে পয়সা নেব কি গো ! মোটেই পারি নাকো নিতে

গ্রামবাসী শত শত প্রজা আছে, খাতক আছে মোহনের। তারা একজন কেউ আবদার করিলে মোহন কি তাকে সাথে নিয়া কলিকাতা আসিতে রাজি হইত !

তারা দুজন গরিব কিন্তু প্রজা নয়, গ্রামবাসী।

মোহন যথেষ্ট করিয়াছে, গরিব গ্রামবাসী হিসাবে আবার তাকে মজুরি বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইবে, ভিক্ষা চাওয়া হইবে।

মোহন যদি বিরক্ত হয়, যদি বলে যে এ ই প্রশ্রয় দিলেই শ্রীপতিরা মাথায় উঠিতে চায়, বড়োই সেটা অপমানের কথা হইবে শ্রীপতির !

আগে ছিল না, মান অপমানের এই জ্ঞান শ্রীপতি শহরে আসিয়া অর্জন করিয়াছে, কারখানায় অর্জন করিয়াছে।

কয়েকমাস আগে হইলে অনায়াসে সময়মতো সুযোগমতো ভিখারির মতোই মোহনকে সে তার প্রার্থনা জানাইতে পারিত।

কিন্তু ভালোভাবে কাজ শেখা হইয়াছে, পাকা কাজ ও বেশি মজুরির দাবি জন্মিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসটা তখনও জন্মে নাই। সুতরাং দাবিটা আদায় করিয়া দিবার জন্য মোহনের কাছে আবেদন জানাইবার প্রশ্নও ওঠে নাই।

ন্যায্য দাবির বোধটা জন্মিতে জন্মিতে জন্মিয়া গিয়াছে মান-অপমানের নতুন বোধটাও !

মোহনের বাড়িতে চাকরদের ঘরে হইলেও বিনা ভাড়ায় পাকা ঘরে থাকিবার এবং আশ্রিত ও চাকর-বাকরের জন্য ভিন্ন রান্না করা অন্ন হইলেও দুবেলা পেট ভরাইবার অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে শ্রীপতির নবজাগ্রত আত্মসম্মান বোধে বাধে না কেন ?

আশ্রয় আর অন্ন দেওয়ার বদলে মোহন এবং মোহনের সংসার তাকে চাকরের মতোই খাটাইয়া নেয় বলিয়াই বাধে না !

জ্যোতি শৌখিন চাকর—মোহনের শৌখিন জীবন যাপনের প্রয়োজনেই শুধু তাকে রাখা।

বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নামে একটা ঠিকা ঝি রাখিলেও তার সাধ্য কি এতবড়ো সংসারের বৃহত্তম অংশটার কাজ চালায় ?

আশ্রিতা কিন্তু নিকট আত্মীয়াদের মধ্যে তিনজনকে মোহন দেশের বাড়িতে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—মার জন্য সঙ্গে আনিতে হইয়াছে। বলিতে গেলে তাদের মধ্যে অনাদৃতা দুজন ঠিকা ঝিয়ের সঙ্গে সংসারের ওই সব কাজ সারে।

অন্যজন মার পেয়ারের লোক। তার কাজ শুধু মার মন জোগাইয়া চলা।

কতগুলি কাজ আছে যে কাজ করিবার লোক নাই। শ্রীপতি করিয়া না দিলে মোহনকে আরেক জন সাধারণ চাকর রাখিতে হইত।

জ্যোতি বাজারে যায়, মুদি মনোহারি দোকানেও যায়। কিন্তু সে বাজার করে সওদা আনে শুধু মোহনদের এবং তার বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগতদের জন্য—যাদের জন্য রান্না বান্না হয় ভিন্ন, টেবিলে যারা ডিসে প্লেটে খায়।

মার নেতৃত্বে সংসারের অন্য অংশের—আমিষ নিরামিষ রান্নার বাজার এবং অন্যান্য কেনাকাটা শ্রীপতি করিয়া দেয়।

সে-ই প্রতিদিন গাড়িটা ধোয়া মোছা সাফসুফ করে বলিয়াই মোহনকে একজন ক্লিনার রাখিতে হয় নাই।

অনেক বাড়ির অনেক গাড়ির ড্রাইভার নিজেই এ সব কাজ করে- কিন্তু মোহনকে বেশি বেতনের বাবু ড্রাইভার রাখিতে হইয়াছে। এ গাড়িতে অন্য ড্রাইভার মানায় না।

বাবু ড্রাইভার ইঞ্জিনটা সাফ করে। ধুলা কাদা সাফ করা তার কাজ নয়।

মার এবং তার পেয়ারের আশ্রিতা বিধবাটির অনেক ফাইফরমাশও শ্রীপতির উপর দিয়া চলে।

কাল একাদশী গিয়াছে।

আজ সকালে মার ফরমাশে সে গোপনে পাঁচরকম শহুরে মিষ্টি শহরের নাম করা দোকান হইতে আনিয়া দিয়াছে।

কাকপক্ষী যেন টের না পায় ছিপতি।

কাকপক্ষী টের পায় নাই।

কে জানে মোহন জানে কিনা যে সে-ও তার একজন বিনা মাইনের চাকরের শামিল হইয়াই চাকরের জন্য বরাদ্দ আশ্রয় ও অন্ন ভোগ করিতেছে।

জানা অবশ্য উচিত। অন্য কাজ করে কি করে না সেটা অজানা থাক—প্রায় প্রতিদিন ভোরে সে তো তাকে গাড়িটা সাফ করিতে দেখিয়া আসিতেছে। তার বাবু ড্রাইভার নাক ডাকিয়া ঘুমায়।

চিরদিনের অভ্যাসের বশে ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া মোহন নতুন গাড়ির টানে গ্যারেজের দিকে আসে---দেখিতে পায় তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দামি গাড়িটা শ্রীপতি কত যত্নে সাফ করিতেছে।

শুধু দ্যাখে না।

গাড়িটার ঝকঝকে তকতকে নতুনত্ব বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে তাকে এখানটা ভালো করিয়া ঝাড়িতে, ওখানটা ভালো করিয়া মুছিতে বলে।

অর্থাৎ হুকুম দেয়।

বলে, মাডগার্ডের ওখানে একটু ময়লা জমেছে শ্রীপতি।

ময়লা নয়। চলটা উঠে মরচে ধরেছে।

কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য জায়গাটা সে বারবার ঘষিয়া পুঁছিয়া দেখায়।

হাজার ঘষিয়াও চাঁদের কলঙ্কের মতো মাডগার্ডের কলঙ্ক ওঠে না।

মোহন আপশোশ করিয়া বলে, এর মধ্যে চলটা উঠে গেল ? কী করে গেল ?

অন্য কোনো কথাই মোহন তার সঙ্গে বলে না। শ্রীপতি গামছা পরিয়া তার গাড়িটা সাফ করিতেছে দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, তোমার কাপড় নেই শ্রীপতি ? পায়জামা প্যান্ট নেই ?

পীতাম্বরকে তাড়াইবার আগের দিনের ভোরে শুধু একটি নিয়ম-ছাড়া প্রশ্ন সে তাকে করিয়াছিল—পীতাম্বর ঠাকুর সাধক পুরুষ না-রে শ্রীপতি ? তুই তো ওকে জানিস অনেক কাল। উনি যোগ সাধনা ক্রিয়া কর্ম খাটাতে পারেন ?

প্রশ্ন শুনিয়া বড়োই ক্ষোভ জাগিয়াছিল শ্রীপতির। তার মতো লোককে মোহনের এ রকম প্রশ্ন করা কি উচিত ?

চার হাত লনের ফুল পাতাবাহারের এদিকে ঠেলিয়া দেওয়া চাকর-বাকরের গ্যারেজ সন্নিহিত টালির ঘরে একসাথে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই তো সে ঘনিষ্ঠভাবে পীতাম্বরের বাঁচার কায়দা জানিয়াছে ?

তাকে কি উচিত জিজ্ঞাসা করা পীতাম্বরের বিষয়ে কোনো কথা ?

কোনো জবাব না দিয়াই সে বালতি নিয়া জল আনিতে গিয়াছিল।

কে জানে কোথায় গিয়াছিল মোহন অথবা নগেন, গাড়িটাতে কাদা মাখাইয়া আনিয়াছে। কাদা সাফ করিতে তাকে কমপক্ষে সাত আট বালতি জল টানিতে হইবে।

জবাব না পাওয়ায় মোহনের হইয়াছিল রাগ। ধমক দিয়া সে বলিয়াছিল, একটা কথা জিগ্যেস করলাম, জবাব দিলি না যে ?

কী জবাব দেব বলুন ? পীতম ঠাকুরকে আপনে এনেছেন বামুন সাধক বলে। আমি কলে কুলি খাটি, আপনার ঘরে চাকর খাটি—

চাকর খাটো মানে ?

বাজার করি, মশলা বাটি, আপনার গাড়ি সাফ করি

কী চালাক হইয়া উঠিয়াছে শ্রীপতি ! এমনি লাগসই ভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল মোহনের।

কে তোমায় বাজার করতে, মশলা বাটতে বলে ?

আপনার মা বলেন।

মার কাছে মাইনে চাও না কেন ? মা তোমাকে চাকর খাটায়, মার কাছে মাইনে আদায় না করে আমার কাছে নালিশ করো কেন ?

মাথা গুঁজে আছি, দুবেলা খাচ্ছি—

সে তো আমার ব্যবস্থা শ্রীপতি। মার চাকর খাটতে আমি তো বলিনি তোমায় !

শ্রীপতি দমিয়া যায়। মোহন তাকেও কাজে লাগাইতে চায় তার ঘরোয়া যুদ্ধে। মার কোনো ভাগ নাই, নগেন কিন্তু বাপের টাকা আর সম্পত্তির সমান অংশীদার।

নগেনকে বাগাইয়া মা যুদ্ধ শুরু করিয়াছেন মোহনের বিরুদ্ধে। মোহন চায় যে শুধু তার গাড়িটাই সাফ করিবে—মার কোনো হুকুম মানিবে না।

অথচ তার দুবেলা পেট ভরার ব্যবস্থা যে মার হাতে এটা মোহন জানিয়া শুনিয়া মানিয়া নিয়েছে।

মার হুকুম না শুনিলে তাকে যে না খাইয়া খালি পেটে কারখানায় খাটিতে যাইতে হইবে এই সোজা কথাটাও কি খেয়াল নাই মোহনের ?

আট

সন্ধ্যা সেদিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া আসে এবং বিস্মিত মোহনকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দিয়াই একেবারে ব্যাখ্যাটা শুনাইয়া দিয়া মোহনকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

তোমার বন্ধুর বাড়িতেই স্বামীসোহাগিনি হয়ে রাত কাটিয়েছি মোহন। অমন করে তাকিয়ো না মোহন। আমি যেচে আসিনি, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে।

ঝরণার সেই হুমকি মোহনের মনে ছিল। যেভাবে পারে সন্ধ্যাকে সে জব্দ করিবে বলিয়াছিল, দরকার হইলে বন্ধুকে দিয়া দাদাকে নষ্ট করাইয়া সন্ধ্যাকে জব্দ করিবে।

ঝরণা ?

দূর ! আমায় আসতে বাধ্য করবে ঝরণা ? অত মুরোদ থাকলে বোকা সোকা ছেলেমানুষদের বাগাতে যেত না।

ঝরণা আর নগেনের নিদারুণ সমস্যাটা সে যেন খেলার ছলেই উল্লেখ করে, তার কাছে যেন একেবারে তুচ্ছ কথা বয়সে ছ-সাত বছর বড়ো ঝরণার নগেনকে বাগানোর প্রচেষ্টা।

মোহন মুখ খুলিতে যাইতেই সন্ধ্যা অপরূপ ভঙ্গিতে আঙুল উঁচাইয়া তাকে থামাইয়া দেয়। বলে, ওদের কথা পরে বলব মোহন, আগে আমার কথা শোনো।

বলিয়া সে হাসে, শুধু নিজের কথা বলতে এসেছি ভেবো না। নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে তোমাকে এক বিষয়ে সাবধান করে দিতেও এসেছি।

নিজের কথাটাই সন্ধ্যা আগে বলে, ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে সে কেন চিন্ময়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

এতদিনে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে তোমার বন্ধুর। পাগলের মতো ভালোবেসেই যে বউকে বশে রাখা যায় না এটা বুঝে গেছে।

টেলিফোন করিয়া সন্ধ্যা টাকা চাহিলেই চিন্ময় লোক মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিত। কিছুদিন হইতে সে টাকা পাঠাইতে টালবাহনা শুরু করিয়াছিল—টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য, সন্ধ্যার দাবির চেয়ে কম টাকা পাঠানোর জন্য, খুব আপশোশের সঙ্গে নানারকম জটিল আর এলোমেলা কৈফিয়ত দিতে শুরু করিয়াছিল !

এমন করে কথা বলত চিঠি লিখত যেন সময়মতো আমার দরকারের সব টাকাটা পাঠাতে না পেরে নিজের হাত পা কামড়ে মরে যেতে চাইছে। আমি যেন রাগ না করি সে জন্য সে কী করুণ মিনতি—চিঠি পড়লে বন্ধুর জন্য তোমার চোখে জল আসত মোহন। আমিও প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সত্যিই বুঝি মুশকিলে পড়েছে। তারপর বাড়াবাড়ি দেখে টের পেলাম যে এটা নতুন চাল। একেবারে মরিয়া হয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করে আমাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে।

ভুল চাল দেয়নি দেখাই যাচ্ছে।

এটা বিষম খোঁচা। সন্ধ্যা কোনোদিন খোঁচা দেওয়া ঠেস দেওয়া কথা সহিতে পারিত না। আজ সে অনায়াসে হাসে।

তুমি ছাড়া আমার বন্ধু নেই—তাই মনের ভেতরের কথাটা তোমায় খুলে বলছি। মেয়েমানুষ মনের কথা কারও কাছে ফাঁস করে না—মুশকিল হয়, বিপদ বাড়ে বলেই ফাঁস করে না। আমাদের বাঁচার যে কত কষ্ট কত বিড়ম্বনা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তুমি বন্ধু বলেই তোমায় খুলে বলছি।

মোহন চুপ করিয়া থাকে। লাবণ্যের মুখেও এই রকম কথা সে শত শতবার শুনিয়াছে যে তার যন্ত্রণা পুরুষ মানুষ সে কি বুঝিবে !

সন্ধ্যা সোফায় এলানো গা তুলিয়া সোজা হইয়া বসে, তার একমাত্র পুরুষ বন্ধুর দিকে আগুনের ঝলক-মারা চোখে চাহিয়া বলে, তোমরা পুরুষরা আমাদের কী মনে করো বলো তো ? তোমরা ব্যবস্থা করবে, আমরা তাই মেনে নেব ? তোমাদের আইন কানুন উলটে দেবার জন্য আমরা তাই কোমর বেঁধে লড়ছি।

লড়ছ ?

লড়ছি।

যারা আইন বানায় তাদের সঙ্গে সোজাসুজি নয়, তোমাদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়ছি। সব কিছু পালটে না দিলে আমাদের আর হাসিমুখে পাশে পাবে না।

টাকা বন্ধ করেই পাশে টেনে এনেছে, এ কেমন লড়াই তোমার ?

পাশে আগে ছিলাম, বনিবনা হল না, সরিয়ে দিল। চাপ দিয়ে আবার পাশে টেনে এনেছে। হাসি মুখে এসেছি ভেবেছ নাকি ? গায়ের জোর—মানে টাকার জোরে পায়ে টানার মজাটা বন্ধু তোমার টের পাবে !

আবার গা এলাইয়া দিয়া সে সহজ সুরে বলে, যাক সে। ও সব কথা নিয়ে থিয়োরির তর্ক জুড়তে আসিনি। হিসাব নিকাশটা খুলেই বলি তোমাকে।

সে একটু থামে।

বুঝলাম, একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হয়তো একদিন টাকা আর রিভলবার নিয়ে যাবে, টাকাটা হাতে দিয়ে আমায় গুলি করে নিজের মাথায় গুলি করবে। তাই বাধ্য হয়ে সামলাতে আসতে হল।

সামলে কি করবে ?

জানি না। ঠিক করিনি।

সোফায় এলানো সন্ধ্যা যেন সার্পিনির মতো ফণা তুলিয়া সামনে ঝুকিয়া ফুঁসিয়া বলে, সামলাবার দায় আমার কেন বলো তো ? টাকায় কেনা বউ বলে ? সামলাতে দু চার মাস লাগবে। ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা ঘুষ দিতেই হবে এবার—নইলে সামলানো যাবে না। টাকায় জব্দ করে আমাদের মা করো, ধিক তোমরা পুরুষমানুষ !

মোহন ভাবে, পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যার নীতি কি আজও চলু হচ্ছে—চিন্ময় সন্ধ্যাদের সামাজিক স্তরেও ?

নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে সন্ধ্যার মন্তব্য শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

নগেনের সমস্যা তাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা এক রকম যাওয়ার মুখে নগেন ও ঝরণার প্রসঙ্গ তোলে।

এ ব্যাপারে একদম চুপচাপ থাকবে মোহন, কিছুই করবে না। কিছুই বলবে না। তুমি হস্তক্ষেপ করতে গেলেই তুমি ঝরণাকে জিতিয়ে দেবে, তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বুঝিয়ে বলো।

সোজা কথাটা বুঝতে পার না ? সব কিছুতে নগেনেরও সমান ভাগ। ঝরণা ওকে খেলাচ্ছে ভোলাচ্ছে ওই ভাগটার লোভে। নগেনকে টের পেতে দেয় না—সম্পত্তির ভাগটাই আসল, নগেন আসল নয় টের পেতে দিলে কি রক্ষা থাকবে ? একেবারে বিগড়ে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবে নগেন।

কিছুই করব না ?

কিছুই করবে না। শুধু স্নেহ দেখাবে, বিবেচনা দেখাবে। রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে মাছ দুধ মাংস খাওয়াবে, বেড়ানো দরকার বলে কাশ্মীর বেড়াতে পাঠাবে—

মোহনের মুখ দেখিয়া সন্ধ্যা গলা নামাইয়া বলে, একালের ছেলে তো ? অনেক কিছু জানে বোঝে। কর্তালি করতে গিয়ে ওর রোখ চাপিয়ে দিয়ো না, বিচার বুদ্ধি চুলোয় দেবার ঝোঁক চাপিয়ো না। ঝরণার খেলা নিজে বুঝে নিজেকে ও সামলে নেবে। এ সুযোগটা ওকে তোমায় দিতেই হবে।

মোহন আচমকা জিজ্ঞাসা করে, ক দিন এখানে থাকবে ?

সন্ধ্যার মুখে রাত্রির কালো ছায়া নামিয়া আসে।

কে জানে। কদ্দিনে পেটে ছেলে আসবে বলা যায় কি ? তারপর দশমাস দশদিন। ছেলেটাকে পাঁচ ছ মাসের না করে নড়তে পারব কি ?

সন্ধ্যা যেন ধরিয়া লইয়াছে তার ছেলেই হইবে—যেহেতু চিন্ময় ছেলে চায় মেয়ে যেন তার হতে পারে না !

আজকাল নতুন পরিবেশে যখন সামাজিক, পারিবারিক, দৈহিক ও মানসিক জীবন অনেকটা নির্দিষ্ট রূপ পাইয়াছে, মোহন মাঝে মাঝে শহরে বাস করিতে আসার উদ্দেশ্যের কথা ভাবিতে চেষ্টা করে।

গ্রাম ছাড়িয়া কেন সে শহরে বাস করিতে আসিয়াছিল ?

সভ্যতার সুখসুবিধা ভোগ করিতে আর সেই সুখসুবিধা যারা পুরামাত্রায় ভোগ করে তাদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে এবং অর্থোপার্জন করিতে ?

কারণটা এখন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন মনে হয়। গ্রামে বসিয়া দিনের পর দিন সে কি কল্পনা করিয়াছিল মেটে পথে হাঁটার বদলে পিচঢালা পথে মোটর হাঁকানো আর গরিব অশিক্ষিত মানুষের বদলে ধনী সুশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ? এ তো পুণ্য বা শান্তি লাভের চিন্তা বাদ দিয়া তীর্থবাসের ভুয়া কল্পনার মতো।

শহরের বাড়ি, গাড়ি, সঙ্গী, সাথি, সুখ, সুবিধা, আনন্দ, উৎসবের জন্য সে লুব্ধ ছিল, এ সব নতুনত্ব ও পরিবর্তন কল্পনাও করিত সর্বদা—অন্য কিছুর আশায়। এ সব ছিল আনুষঙ্গিক, আসল কল্পনা নয়। কী যেন গড়িয়া তোলার আয়োজনের মতো শহরের জীবনকে সে কল্পনা করিত।

সে কথা আজ কিছুতেই মনে করিতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠে, উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ মনে হয় জীবন, অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতোও সে স্মরণ করিতে পারে না কী চাহিয়া শহরে বাস করিতে আসিয়াছিল। অথচ এটুকু বেশ ভালোভাবেই মনে পড়ে যে তখন সেই উদ্দেশ্যই মিশিয়া থাকিত তার সমস্ত ভাবনা চিন্তায়, তার প্রেরণা সে অনুভব করিত স্পষ্ট।

আজ কেন খোঁজ পায় না ?

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ? স্বাদের মতো শুধু কল্পনা আর অনুভূতিতে মিশিয়া থাকিত বলিয়া ? বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা আরম্ভ করা মাত্র বাস্তবতার সংস্পর্শে সে স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ?

মোহনের অসন্তোষ দিন দিন বাড়িতে থাকে।

যেমন ভাবিয়াছিল, শহরের জীবনটা সে রকম হয় নাই। তার ঈর্ষাতুর কামনাকে সার্থক করিয়া শহরের বিশেষ সম্প্রদায়টির মানুষগুলি তাকে নিজেদের একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে রকম মজা লাগে কই ? ব্যাপক সামাজিক জীবনকে আয়ত্ত করিয়া সজাগ সক্রিয় জীবনযাপনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা কোথায় ?

তা ছাড়া শুধু বন্ধু পাওয়ার হিসাবটাই সে ধরিয়াছিল, এত শত্রু তার জুটিল কোথা হইতে, তুচ্ছ কারণে আর সম্পূর্ণ অকারণে তার উপর যাদের বিরাগ জন্মিয়াছে ?

মাকেও আজকাল মাঝে মাঝে মোহনের শত্রু মনে হয়। ভাইবোনদের আড়াল করিয়া মা তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন, কাছে ঘেঁষিবার উপায় নাই। ওদের মনের মতো গড়িয়া তুলিবার কল্পনাটা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

মা থাকিতে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ওদের জন্য কিছু করা একেবারেই অসম্ভব।

তাকে বাদ দিয়া ওরা শুধু পরামর্শ করে না, আজকাল তার কাছে ঘেঁষিতে চায় না, কাছে ডাকিলে অস্বস্তি বোধ করে। দূর হইতে নীরবে ওরা তার দিকে তাকাইতে শিখিয়াছে, ওদের চোখে ভীত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই সে আবিষ্কার করে, খোকাখুকির চোখে পর্যন্ত।

নগেনের সঙ্গে মার অফুরন্ত আলোচনা ওদের কানেও যায়। মোহন কতদিন দেখিয়াছে খেলার সময় খেলা ফেলিয়া খোকাখুকি মার গা ঘেঁষিয়া দু চোখ বড়ো বড়ো করিয়া মা আর ছোড়দার কথা শুনিতেছে।

বুঝিতে না পারুক, শুনিতে শুনিতে ধারণা গড়িয়া ওঠে। দাদাকে কেন্দ্র করিয়া এক ঘনায়মান দুর্বোধ্য বিপদের ভয় খোকাখুকির মনে সঞ্চিত হইতে থাকে।

নলিনী দাদাকে খুব ভালোবাসিত।

তার সঙ্গেই মোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। নগেন ছিল ভাই, খোকাখুকি ছিল ছোটো, নলিনী এই সব টুকিটাকি কাজ করিত মোহনের, এটা আনা, ওটা ধরা, সেটা খোঁজা, এর কাছে ওর কাছে তার নির্দেশ বহন করা। সেও ভয় করিতে শিখিয়াছে, তবে ভয়টা বোধ হয় তার অবুঝ নয়, তেরো বছরের মেয়ে অনেক কিছু বুঝিতে শেখে। তাই, দু চার দিন বাহিরের জীবনের ব্যস্ততায় মোহন তাকে ভুলিয়া থাকিলে সেও বিগড়াইয়া যায় বটে, অল্প চেষ্টাতেই বোনের মনকে মোহন আবার হালকা করিয়া দিতে পারে।

এখনও পারে !

প্রথমটা নলিনী একটু আড়ষ্ট হইয়া থাকে। নতুন করিয়া যেন বিচার করে এ দাদা তার কেমন মানুষ, যেন ভাবিয়া পায় না দাদার সঙ্গে আবার ভাব করা উচিত কিনা।

তোর চুলটা হঠাৎ এত লম্বা হল কী করে রে !

কই ?

এই যে বিনুনিটি এক হাত দেড়হাত বেড়ে গেছে ?

এক হাত দেড় হাত কখনও বাড়ে ? চার পাঁচ আঙুল।

রোজ তোর চুল চার পাঁচ আঙুল বাড়ে নাকি ?

তখন হাসি মুখে নলিনী বিনুনির ডগাটা দাদার সামনে মেলিয়া ধরে, বিনুনি লম্বা করার কৃত্রিম উপায়টা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সে তখন একেবারে ভুলিয়া যায় দাদার বিরুদ্ধে শোনা রাশি রাশি অভিযোগ, মোহন ভুলিয়া যায় বোনের মন ভুলানোর জন্য অভিনয় আরম্ভ করার কষ্ট আর অপমান !

ওরে পাজি মেয়ে, এইসব ফাঁকি শিখেছ ?

আমি একা নাকি ? সবাই করে।

নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেই নগেনের সঙ্গে মার পরামর্শের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাও হয় মোহনের। নগেনের সঙ্গে মা কী এত পরামর্শ করেন সে বিষয়ে তার তো শুধু অনুমান, তার কাছে মার স্পষ্ট অভিযোগ আর ভাইবোনের রকমসকম দেখিয়া আন্দাজ করা।

হয়তো সবই ভুল আন্দাজ করিতেছে—আগাগোড়া ভুল বুঝিতেছে। হঠাৎ শহরে আসিয়া শহুরে হইবার তার অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারিয়া পিছাইয়া থাকিবার ক্ষোভ দুঃখ অভিমানে ব্যাকুল হইয়া নিজেদের মধ্যে অবিরাম পরামর্শ চালাইতেছে, কী করিয়া তার নাগাল ধরা যায়। ওরা তার কাছে আসিতেই চায়, সে-ই হয়তো ওদের পিছনে ঠেলিয়া রাখিতেছে।

মনে মনে সে অনেকরকম প্রশ্ন তৈরি করে, নলিনী সে প্রশ্নের আসল মর্ম বুঝিবে না, জবাব শুনিয়া সে কিন্তু সব বুঝিতে পারিবে।

অনেক ভাবিয়া, অনেক বাছিয়া প্রশ্ন যদি বা সে ঠিক করে, নলিনীর মুখ দেখিয়া সে প্রশ্ন আর উচ্চারণ করিতে সাহস পায় না।

নলিনী কচি মেয়ে নয়, অবুঝ নয়, সরল নয়, তার কল্পনার সংসারে সাংসারিক ঘোরপ্যাঁচের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগিয়া হাসিয়া খেলিয়া সে বড়ো হয় নাই। তার কাছে পাকামি ভুলিয়া শিশু হইয়া যায়, সেটা শুধু অভ্যাস। যত কৌশলেই সে প্রশ্ন করুক ওর কিছুই বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

মা তার এক ছেলের সঙ্গে কী বলাবলি করে, মার আরেক ছেলেকে গোপনে সে খবর দেওয়ার মধ্যে হইবে নতুন এক পাকামিতে হাতেখড়ি, বাকি জীবনটা একের গোপন কথা বলিয়া বেড়াইবে অন্যকে।

কী তার আসিয়া যাইবে তাতে ?

এতই কি সে স্নেহ করে বোনকে যে ভবিষ্যতে সে বিগড়াইয়া যাইবে ভাবিয়া টাকা পয়সা সম্পত্তিতে সমান অংশীদার ছোটো ভাইটার সঙ্গে মা কী পরামর্শ করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে তার মন চায় না ?

জটিল আবর্তে পাক-খাওয়া তার চেতনাকে শান্ত সংহত করিতে নলিনীও যেন চাবুক কষায় লাগাম আঁটিয়া দিতে চায়।

জুতো ছিঁড়ে গেছে, একটা ভালো শাড়ি নেই, ব্লাউজ নেই। কী করে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে চালাই বলো তো ? তোমারই তো নিন্দে হবে।

যে প্রশ্ন তুলিতে পারিতেছিল না, যে প্রসঙ্গ আড়ালে ছিল, নলিনী ছেলেমানুষ অভিমানে সেই প্রশ্ন সেই প্রসঙ্গ সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

মা কিনে দেয় না ? নগেন কিনে দেয় না ? কী নিয়ে এত গুজগাছ ফুসফাস চলে তোদের ?

সে তো মা আর ছোড়দা ভাগ হবার কথা বলাবলি করে। আমি কিছু চাই নাকি ওদের কাছে ? চাইলেই তো মুখ খিঁচিয়ে বলবে দাদার কাছে যা। আমারই হয়েছে মুশকিল।

বাড়ির সাধারণ বেশ নলিনীর। মিলের রঙিন ফাইন শাড়িটির দাম কম নয়। জামাটি দেখিয়াই চেনা যায়—সন্ধ্যার দেখাদেখি কিনিয়াছে। পায়ে রঙিন হালকা লপেটা। নলিনী আজকাল বাড়িতেও লপেটা পায়ে দিয়া চলে !

মোহন অসহায় বোধ করে। অগত্যা উদারভাবে বলে, আজ যখন বেরোব, সঙ্গে যাস, নিজে পছন্দ করে কিনে নিস যা দরকার। ওরা ভিন্ন হতে চাইছে, না ?

চাইছে তো। মার সঙ্গে ছোড়দার বনছে না, নইলে কবে ভাগ হয়ে যেত। মা বলছে সব ভাগাভাগি করে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে, ছোড়দা চাইছে কলকাতায় ভিন্ন থাকবে, দু জনে বনছে না বলেই তো !

নগেনের নীরব ও নিষ্ক্রিয় উপেক্ষাই সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে হয়। তাকে কাছে টানিবার চেষ্টা মোহনের ব্যর্থ হয়, নিজে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া আহত হইয়া ফিরিয়া আসে। ভাইটির সঙ্গে বাজে গল্প করিবে ভাবে, গল্প জমে না, নগেন উশখুশ করিতে থাকে। তর্ক করিবে ভাবে, নগেন তর্ক করে না। তাকে খুশি করার জন্য সাংসারিক ব্যাপারে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, নগেন শুধু বলে, আমি কিছু জানি না দাদা ! তার নিজের ভালোমন্দের আলোচনা তুলিলে সে স্পষ্টই বিরক্ত হয়, এ যেন মোহনের অনধিকার চর্চা ! চুপচাপ উপদেশ শোনে, মানে না।

একদিন ধৈর্য হারাইয়া সে তাকে শাসন করিতে গিয়াছিল—তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় উঁচু করিয়া নগেন কী যেন ভয়ানক কথা বলিতে গিয়াছিল কী ভাবিয়া ভাগ্যে বলে নাই।

এখনও তবু তাকে কাছে ডাকা যায়, কথা বলা যায় গল্প করা যায়। কী সর্বনাশই ঘটিয়া যাইত নগেন কথাগুলি বলিয়া ফেলিলে ! তখন তার মনের অবস্থা এমন, হাজার অনুতাপ বোধ করিলেও মাথা নত করিয়া ছলছল চোখে দাদার কাছে সে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, গায়ে পড়িয়া সেও পারিত না তাকে ক্ষমা করিতে।

এমন হইয়া গেল কীসে ?

শুধু মার কথা শুনিয়া শুনিয়াই তার মনে এত বিরাগ জন্মিয়াছে দাদার বিরুদ্ধে, এত বিদ্বেষ, এক [illegible] জাগিয়াছে ? টাকা নষ্ট করিয়া সে ভাইবোনের সর্বনাশ করিতেছে, তার বিরুদ্ধে মার বক্তব্য শুধু এই। নগেন না হয় বিশ্বাস করিয়াছে তার স্বার্থপর দাদা তাদের ভাগের টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি নিজের সুখের জন্য উড়াইয়া দিতেছে কিন্তু এমন তীব্র এবং স্থায়ী বিদ্বেষ জন্মানোর যথেষ্ট কারণ তো সেটা নয় ?

টাকা আর ভবিষ্যৎকে এত বেশি দাম দেওয়ার বয়স তার হয় নাই। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে এমন ভীষণভাবে সচেতন হওয়ার কারণ বা প্রয়োজন তার কি থাকিতে পারে ?

যখন খুশি গাড়ি লইয়া নগেন বাহির হইয়া যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে না।

মোহনের নিজের দরকার থাকে গাড়ির, হঠাৎ জানিতে পারে নগেন গাড়ি লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কখন ফিরিবে ঠিক নাই।

মোহন বিশেষ বিশেষ এনগেজমেন্ট রাখিতে যায় ট্যাক্সি চাপিয়া। ট্যাক্সিও মোটর গাড়ি, তবু মোহনের মনে হয় নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার সমস্ত আনন্দ মাটি হইয়া গেল।

মোহন জিজ্ঞাসা করে না, মদন নিজেই তাকে খবর দেয়, ঝরণাকে সঙ্গে করিয়া নগেন গাড়িতে হাওয়া খাইতে বাহির হয়। কোনোদিন শহরের বাহিরে, কোনোদিন শহরের ভিতরে। কোনোদিন ধীরে ধীরে মদনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়ের মাঠের চারিদিকে পাক দিতে হয়, কোনোদিন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে হয় উর্ধ্বশ্বাসে।

নগেন সোল্লাসে বলে, জোরে চালাও মদন, আরও জোরে।

ঝরণা ধমক দেয়, না, স্পিড কমাও। অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে নাকি। মদনের কাছে সব কথা শুনিয়াও নগেনকে মোহন কিছু বলে না।

কাল গাড়ি নিয়ে যেও না নগেন, আমার একটু দরকার আছে। এই অনুরোধ জানাইতে পর্যন্ত তার সাহস হয় না। মার শিক্ষায় হোক আর ঝরণার প্ররোচনায় হোক, তার বিনানুমতিতে নগেনের গাড়ি দখল করার মানেটা স্পষ্ট।

বাপের টাকায় গাড়ি কেনা হইয়াছে, গাড়ি ব্যবহার করার সমান অধিকার নগেনের আছে বইকী। যুক্তিসঙ্গত অধিকার, আইনসঙ্গত অধিকার, আত্মীয়স্বজনের সমর্থিত অধিকার।

নিজের ভীরুতাকে স্বীকার করিতে হওয়ায় এ সব সহ্য করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মোহন জানে এ ভাবে চলিতে পারে না, পারিবারিক জীবনে তার যে ভাঙন ধরিয়াছে তাকে আর ঠেকানো চলে না, একদিন এ জীবন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবেই এবং তার বেশি দেরি নাই।

তবু সে প্রাণপণে সংঘর্ষ এড়াইয়া চলে, শেষ বুঝাপড়ার দিনটা যতদিন পারে পিছাইয়া দিতে চায়, মিথ্যা আশায় নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

টাকা চাই, টাকা।

টাকা আনিতে পারিলেই আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। কোনো রকমে যদি এই অশান্তি আর অপমানের জ্বালা সহ্য করিয়া সে আর কিছুদিন সংসারে এই শোচনীয় অবস্থাকেও বজায় রাখিয়া চলিতে পারে এবং সেই অবসরে উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলে, সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে।

পরিকল্পনা তো তার অনেক আগে হইতেই ঠিক করা আছে, এখন সেটা কাজে লাগাইয়া দিলেই হইল।

কিন্তু এ সব চিন্তার ফাঁকি কোথায় মোহন জানে। একটা যে মৃদু আতঙ্ক সর্বদা তার হৃদয়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সেটাই তার প্রমাণ।

তার পরিকল্পনাগুলি চমৎকার, অবাস্তব স্বপ্নও সেগুলি নয়, কারণ বাছিয়া বাছিয়া রূঢ় বাস্তবতার অনেক খুঁটিনাটি অনেক বাধাবিপত্তির চিন্তাকেও তার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তবু সেগুলি কাজে লাগিবে না। ও সব পরিকল্পনার প্রচুর নিরপেক্ষ সংস্কার প্রয়োজন, নিজের তার প্রয়োজন অনেক অভিজ্ঞতার অনেক সময়ের এবং অনেক মূলধনের।

সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন, অনিবার্য প্রয়োজন, তার নিজের অন্য ধরনের মানুষ হওয়া।

মৃদু গর্বের সঙ্গে মোহন এই আত্মস্বীকৃতিকে গ্রহণ করে। সে বোকা নয়। ব্যর্থতার সংকেতকে সে চোখ বুজিয়া এড়াইয়া চলে না। মিথ্যা আশা যদি সে পোষণ করে, জানিয়া শুনিয়া করে, নিশ্চিত মরণের প্রতীক্ষারত রোগীর ঔষধ খাওয়ার মতো।

নিজেকে সে ধিক্কার দেয় শুধু ভীরুতার জন্য। কেন সে চুপ করিয়া থাকে ? কেন সে মাকে জোর করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেয় না, শাসন করে না ভাইবোনকে ? উপেক্ষা আর অবাধ্যতা সহ্য করার বদলে গর্জন করিয়া ওঠে না ?

তার সাহস নাই। শহরের জীবন-স্রোতে সে কুটার মতো ভাসিয়া চলিয়াছে, নোঙরের ব্যবস্থা করিতে স্মরণ ছিল না।

ভিটেমাটি

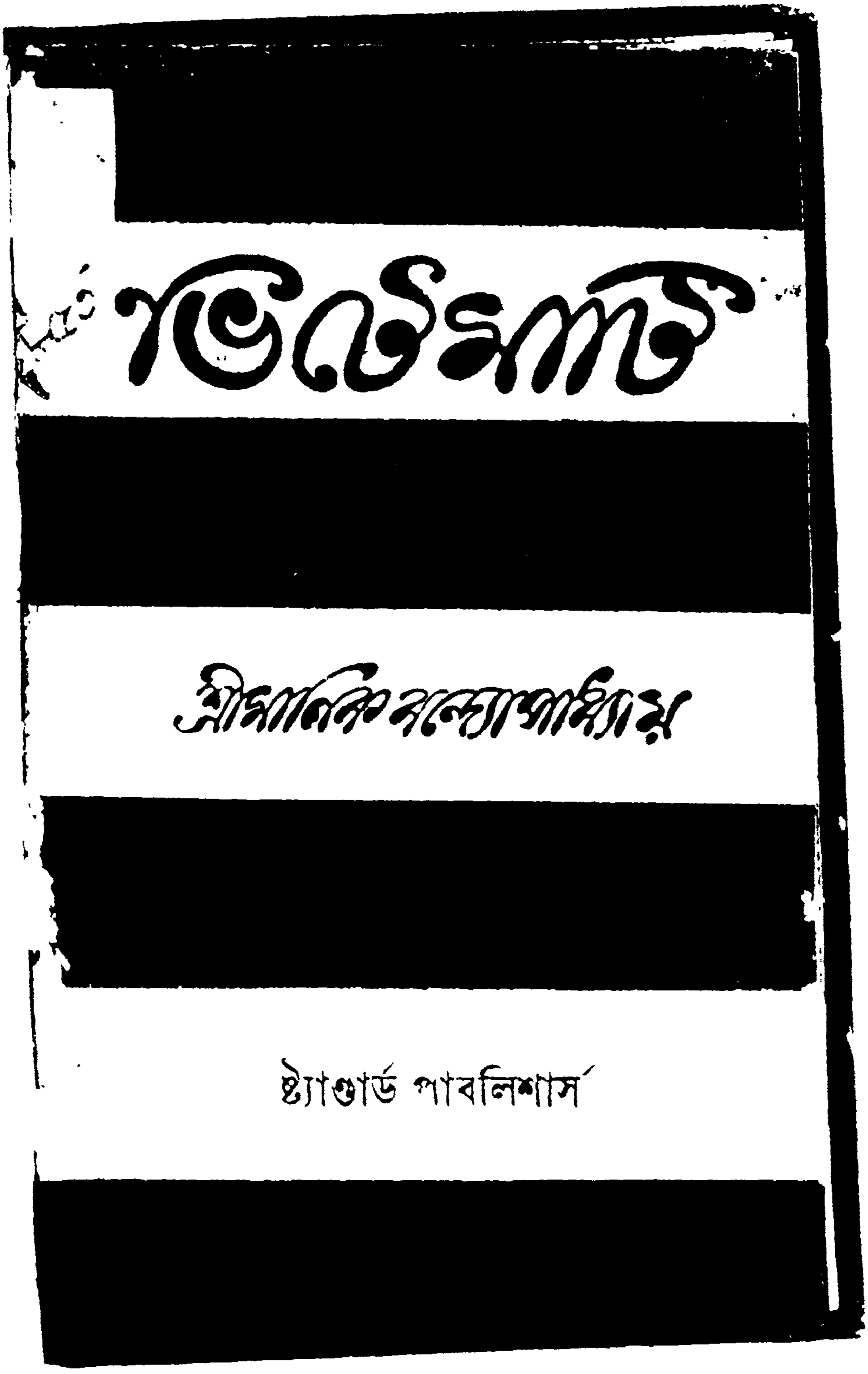

ভিটেমাটি র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

চরিত্র

মধু	:	চাষি যুবক
পদ্মা	:	শম্ভুর মেয়ে
মাখন	:	কামার যুবক
সুবর্ণ	:	ছোটলালের স্ত্রী
ছোটলাল	:	শিক্ষিত যুবক
সুভদ্রা	:	ছোটলালের বো'ন
কাদের	:	চাষি
আমিরুদ্দীন	:	চাষি
আজিজ	:	আমিরুদ্দীনের ছেলে
রামঠাকুর	:	পুরোহিত ব্রাহ্মণ
নকুড়	:	গ্রাম্য আড়তদার
ভূষণ	:	চাষি
শম্ভু	:	চাষি

প্রথম দৃশ্য

সকাল। সবে সূর্য উঠেছে। বাড়ির সামনে অঙ্গনে উবু হয়ে বসে মধু চকচকে ধারালো দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁছে সাফ করছিল। কতগুলি ছোটো বড়ো বাঁশের টুকরো কাছে পড়ে আছে। বাড়ির দেওয়াল মাটির ও চালা ছনের। পাশে একটা লাউমাচা। লাউমাচার পিছনে খানিক তফাতে ডোবা আর বাঁশ ঝাড় নজরে পড়ে।

মধুর বয়স সাতাশ আটাশ হবে, দেহ সুস্থ ও সবল। তার গায়ে কোরা একটা গামছা জড়ানো, পরনে আধ ময়লা মোটা কাপড়, হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নেমেছে। কোমরে আলগাভাবে একটা গোরু-বাঁধা দড়ি জড়ানো।

দ্রুতপদে, প্রায় ছুটতে ছুটতে পদ্মা এসে দাঁড়ায়। তার চুল এলোমেলো, একহাতে আঁচল কাঁধে চেপে ধরে আছে। এসে দাঁড়িয়ে আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে হাঁপাতে থাকে।

মধু [*উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে*] কী হয়েছে পদি ?

পদ্মা যাবার আগে একটি বার পালিয়ে এলাম।

মধু [*একটু হতাশ ভাবে*] যাবার আগে !

পদ্মা নইলে ছুটে আসি ?

মধু আমি ভাবলাম তোদের বুঝি যাওয়া হল না তাই ছুটে এয়েছিস ভালো খপরটা জানাতে। খুব ভোরে না কথা ছিল রওনা দেবার ?

পদ্মা ছিল না ? জিনিস পত্তর গাড়িতে বোঝাই দিয়েছে কখন। এটা ওটা ছুতো করে আমি দিলাম বেলা করিয়ে। ভাবছি কখন আসে মানুষটা কখন আসে, পথ চেয়ে রইছি ভোর থেকে। যেতে বুঝি পারলে না একবারটি ? না, মন করলে মরুক গে যাক, পদি গেলে মেয়া জুটবে ঢের !

মধু জুটবে না তো কি ? শম্ভু দাসের মেয়া পদ্মা দাসী ছাড়া বুঝি মেয়া নেই কো পিথিমিতে ? যাচ্ছিস বেশ যাচ্ছিস। ফিরে যদি আসিস কোনোদিন, দেখবি তোর তরে বসে নেই মধু, ভূষণ খুড়োর মেয়াটা তার ঘর করছে।

পদ্মা ভূষণ খুড়োর মেয়া ! মোহিনী !

মধু হাসি কী হল ?

পদ্মা মেয়া নিয়ে পালাচ্ছে ভূষণ খুড়ো। তোমার অদেষ্ট মন্দ।

মধু পালাচ্ছে ! ভূষণ খুড়োও পালাচ্ছে ফসল কী করবে ? গাইবাছুর কী করবে ? তিন জোড়া গাই ওর। কালো গাইটা আজ দশদিন হয়নি বিইয়েছে।

পদ্মা নকুড় ফসল তুলবে, গাইবাছুর, ঘরদোর দেখবে। যদি অবিশ্যি থাকে কিছু শেষতক।

মধু গচ্ছিত রেখে যাবার লোক পেয়েছে ভালো।

পদ্মা উপায় কি। কবে হানা দেবে আবার, ঘরদোর পুড়বে, নিজেরা প্রাণে মরবে, তার চেয়ে প্রাণ নিয়ে পালানো ভালো।

মধু যেখানে পালাবে সেখানে হানা দেবে না ওরা ?

পদ্মা বিপদ সব জাগায় সমান নয়তো।

মধু কী করে জানবে কোথা বিপদ কম ? ছোটলাল এই কথা বোঝাচ্ছে! যে ভয়ে পালাতে চাইছ এ গাঁ ছেড়ে ও গাঁয়ে, সে ভয়ের এলাকা ছেড়ে তো পালাতে পারবে না। পালাতে দেবেই না।

পদ্মা আমায় বুঝিয়ে কী হবে ! বাবাকে তো পারলে না বোঝাতে !

মধু নকুড় পরামর্শ দিচ্ছে, ভূষণ ফুসলাচ্ছে, তোর বাবা কি কিছু বুঝতে চায় ! নকুড় গুছিয়ে নিচ্ছে বেশ তলে তলে। জলের দামে কিনে সব বেচছে। ভূষণ খুড়োর গচ্ছিত যা কিছু দিয়ে যাচ্ছে তাও বেচে দেবে। তারপর সরে পড়বে খাসধুবোয়, এখেনে অসুবিধা হলে।

পদ্মা না, নকুড় বলেছে সে শ্বশুরঘরে গিয়ে থাকবে, যদ্দিন না হাঙ্গামা থামে।

মধু শ্বশুর ঘরে গিয়ে থাকবে দু কোশ দূরে ? মোদের এই জুনপাকিয়ায় হাঙ্গামা হলে বুঝি সেখানে হবে না ?

পদ্মা এবার হয়নি তো।

মধু দশগাঁয়ে হয়েছিল, জুনপাকিয়ায় হয়নি তো ! শেষতক হল। পরের বার ওখানে হবে। নকুড়ের কথা ধরিস না। ও লোকটা মতলববাজ, জাঁহাবাজ।

পদ্মা থাকগে বাবা, পরের ভাবনা ভাবতে পারি না আর। এমন ডর লাগছে মোর।

মধু তোর আবার ডর কীসের ? তুই তো পালাচ্ছিস !

পদ্মা নিজের জন্য ডরাচ্ছি নাকি আমি ? কী যে হবে ভগবান জানেন ! এত করে যেতে বললাম তোমাকে, তোমার সেই এক পাথুরে গোঁ। সত্যি বলছি তোমাকে, যেতে মন চাইছে না আমার।

মধু মন না চাইলে যাচ্ছিস কেন ?

পদ্মা সাধ করে যাচ্ছি ? নিজের খুশিতে যাচ্ছি ? তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। বাবা জোর করে নিয়ে গেলে আমি কী করব। নকুড় বেশি ঘেঁষেনি বাবার কাছে, দে মশায় কী যে মন্তর দিতে লাগল বাবার কানে, পালাবার জন্য বাবা একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। দে মশায় সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সঙ্গে করে নন্দপুর পৌঁছে দিয়ে আসবে। বলেছে, কদিন বাদে আড়তের মালপত্তর বেচে দিয়ে নিজে গিয়ে থাকবে ওখানে। কী মতলব করেছে কে জানে !

মধু তোকে বিয়ে করবে।

পদ্মা সে তো নতুন কথা নয়। ঢের দিন থেকে আমার পেছনে লেগেছে। বাবাকে তোষামোদ করছে। আমি ভাবছি, অন্য মতলব যদি করে থাকে লোকটা ! কদিন থেকে ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না কিছুর। তা যা আমার অদেষ্টে আছে ঘটবে, কোনো তো উপায় নেই। তুমি এ গাঁ ছেড়ে পালালে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম। শেষ বারের মতো এই কথা বলতে আমি এলাম। [*অধীর আগ্রহে*] যাও না ? তুমিও যাও না চলে ? তোমার পায়ে পড়ি এমন একগুঁয়েমি কোরো না। পাঁশকুড়ায় তোমার বোনের কাছে গিয়ে তো তুমি থাকতে পার বিপদের কটা দিন ?

মধু কটা দিন পদি ? বিপদ কদিন থাকবে জানিস কিছু ? ছমাস না এক বছর না দশ বছর ? জানতে পারলে হয়তো যেতাম পদি। গেলে পাঁশকুড়ায় যেতাম না, তোদের সঙ্গেই যেতাম।

পদ্মা তাই গেলেই তো হয় ! বাবা অত করে বলছে তোমাকে—

মধু তা হয় না পদ্মি। আমি কোথাও যেতে পারব না। ঘরবাড়ি, গাইবাছুর, জমিজমা ফেলে কোথায় যাব ? কী করে যাব ? ধার করে পুবের ভিটেয় ঘর তুলে দুবছর সুদ গুনেছি, গায়ের রক্ত জল করে এই সেদিন মহাজনের দেনা শুধলাম। সাত বিঘে বেশি জমি এবার ভাগে চষেছি, কাল পরশু বুইতে শুরু না করলে নয়। এগারো কাহন খড় ধরে রেখেছিলাম, এবার বেচতে হবে। বুড়ো বাপটা শুধু দুধ খেয়ে বেঁচে আছে, লক্ষ্মীকে ফেলে বিদেশে পালালে খেতে না পেয়ে বাপটা আমার মরে যাবে। জমির ধান ঘরে তুললে আমার মা বোন বাপ সারা বছর খাবে। আমার যাওয়ার উপায় নেই, [*ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে*] কেবল এ সব অসুবিধের জন্য নয়, যাবার কথা ভাবলেই মনটা হুহু করে।

পদ্মা কেন ?

মধু তুই মেয়ে মানুষ, বাপের ঘরে বড়ো হয়ে সোয়ামির ঘরে চলে যাস ঘরদোর জমিজমার দরদ তুই কি বুঝবি ? বেড়া থেকে একটা কঞ্চি কেউ খুলে নিলে টের পেয়ে যাই। খেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে। সব ফেলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে যাক, একা আমি আমার খেতখামার ঘরবাড়ি গাইবাছুর আগলে গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

পদ্মা তবে কি হবে ? তুমি এখানে থাকবে, আমি চলে যাব—

শম্ভুর প্রবেশ। পঞ্চাশ বছরের গৃহস্থ চাষি।

শম্ভু [*রুদ্ধকণ্ঠে*] তুই এখানে ? চাদ্দিকে চুড়ে চুড়ে হয়রান হয়ে গেলাম। কী করছিস তুই এখানে বেহায়া বজ্জাত মেয়ে ?

মধু আমি একবারটি ডেকেছিলাম।

শম্ভু কেন ডেকেছিলে ? আমার মেয়েকে তুমি কেন ডাকবে, আমার বিয়ের যুগ্যি এতবড়ো মেয়েকে ? আস্পদ্দা কম নয় তো তোমার ?

মধু গাঁ ছেড়ে যাওয়া নিয়ে কটা কথা বলার ছিল।

শম্ভু [*হঠাৎ উৎসুক হয়ে*] তোমার যাওয়ার কথা ? মত বদলেছ তুমি ? ভগবান সুমতি দিয়েছেন ? শোনো বলি মধু, প্রাণের ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি বটে, মন কি যেতে চাইছে মোর। বুকটা হুহু করছে। ঘরদোর এদিকে নষ্ট হবে, বিদেশ বিভুঁয়ে ওদিকে দশা কী হবে মোদের ভগবান জানেন। তুমি যদি সঙ্গে যাও, বুকে জোর পাই আমি।

মধু তা হয় না।

শম্ভু ওই এক কথা তোমার। কেন হয় না শুনি ? বীরু, ভূষণ, কানাই, নকুড়, বনমালী সবাই যেতে পারে, তুমি যেতে পার না ? এমন একগুঁয়ে হয়ো না বাবা। কথা শোনো মোর। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি বড়ো ঠাকুরের মুখে বুদ্ধিমান যে হয় সে কী করে ? না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। প্রাণ যদি থাকে বাবা, সব বজায় থাকে, প্রাণ যদি যায় তো ঘরদুয়ার, জিনিসপত্তর থেকে কী হয় মানুষের ! কিছু কি রাখবে ওরা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কীসের ভরসায় তবে গাঁয়ে পড়ে থাকা ? আমি তোমায় ভালো ছাড়া মন্দ পরামর্শ দেব না মধু। কথা রাখো আমার, চলো একসাথে যাই।

পদ্মা তাই চলো। একসাথে চলে যাই।

মধু একবার তার দিকে বিষন্ন গম্ভীর মুখে তাকাল তারপর চিন্তিতভাবে অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।

শম্ভু [*মধুর নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে*] জান বাবা, কাল আমরা চলে যেতাম, তোমার জন্য প্রাণ হাতে করে একটা দিন দেরি করলাম, শুধু তোমার জন্য। কত কষ্টে মদনের গাড়ি পেইছি মদনকে রাজি করে। বুড়ো ক্যাংটা বলদ দুটো, গাড়ি চলবে টেঙ্গস টেঙ্গস। যাহোক

তাহোক, গাড়িতে সব মালপত্তর বোঝাই দিয়েছি, রওনা হবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, তবু তুমি যদি যাবে বল মধু, আজকেও যাওয়া বন্ধ করে দিতে রাজি আছি। কাল একসাথে রওনা হব তুমি আমার ছেলের মতো, ছেলের চেয়ে বেশি। সেবার যখন ডাকাত পড়ল বাড়িতে, তুমি সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে সময়মতো হাজির হয়েছিলে বলে ধনেপ্রাণে বেঁচে গেছলাম। সে ঋণ এ জন্মে শোধ হবার নয়। নকুড় তিনশো টাকা পণ দিতে চেয়ে কত সাধাসাধি করেছে, আমি বলেছি, না, আমার জামাই হবে মধু। আজ অবস্থা যেমন হোক, মধুর চেষ্টা আছে, সে উন্নতি করবে। সে আমার ধনপ্রাণ বাঁচিয়েছে, আমার মেয়ের ধম্মো রক্ষা করেছে, সে ছাড়া কারও হাতে আমি মেয়ে দেব না। মোদের সাথে চলো মধু, যে অবস্থায় যেখানে থাকি, এক মাসের মধ্যে শুভকর্মটা সেরে ফেলব।

মধু [*অন্যমনস্ক ভাব কেটে আত্মস্থ হয়ে*] তাই যদি মন থাকে দাসমশায়, বিয়েটা সেরে দিয়ে ওকে রেখে যাও।

শম্ভু ডাকাত বেটাদের জন্যে ?

মধু আমি বেঁচে থাকতে মোর বউকে ছোঁবে !

শম্ভু তুমি বেঁচে থাকলে তো !

মধু আমি যদি মরি, মোর বউও মরতে পারবে।

শম্ভু মেয়ের আমার জোর বরাত বলতে হবে, ও মাসে বিয়েটা হয়ে যায়নি। তোমার বউ হয়ে মরে কাজ নেই, আমার মেয়ে হয়েই মেয়ে আমার বেঁচে থাকবে।

নকুড়ের প্রবেশ। শম্ভুর সমবয়সি গ্রাম্য মহাজন ও আড়তদার। গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট, কাঁধে সস্তা চাদর ও পায়ে চটি।

নকুড় এই যে পাওয়া গেছে। তা আর দেরি করা কেন, বেলা নেহাত মন্দ হয়নি।

শম্ভু না, আর দেরি নেই। দে মশায়, আমাকে আর দুকুড়ি এক টাকা ধার দেবে ?

নকুড় তা—সে নয় দিলাম। টাকাটা লাগবে কীসে ?

শম্ভু মধু বায়নার টাকা দিয়েছিল, সেটা ফেরত দিয়ে যাব। ওর সঙ্গে কোনো বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চাই না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যাব।

নকুড় দিচ্ছি। এক্ষুনি টাকা দিচ্ছি।

কোমর থেকে থলে বার করে টাকা গুনতে লাগল। বোঝা গেল হঠাৎ সে ভারী খুশি হয়ে উঠেছে। বারবার পদ্মার দিকে তাকাতে লাগল।

পদ্মা তুমি আবার দে মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ বাবা ! শোধ দেবে কী করে ?

নকুড় আহা, নাই বা শোধ দিল ! আমি কি বলেছি শোধ দিতে হবে।

পদ্মা টাকা নিলে শোধ দিতে হবে না কি রকম ? তুমি নিয়ো না বাবা দে মশায়ের টাকা।

শম্ভু তুই চুপ কর।

মধু আমার টাকা পরে দিলেও চলবে, দাসমশায়। বায়না হিসেবে রাখতে না চাও, ঋণ হিসেবেই টাকা এখন তোমার কাছে থাক। হাতে টাকা হলে তখন দিয়ো।

নকুড় [*তাড়াতাড়ি কয়েকটি নোট শম্ভুর হাতে দিয়ে*] এই নাও দুকুড়ি এক টাকা। বাড়ি গিয়ে একটা রসিদ দিয়ো—ইস্টাম্প মারা কাগজ একখানা আছে। হিসেবের জন্য একটা রসিদ নেওয়া—নয় তো তোমাকে টাকা দেব তার আবার রসিদ কি !

শম্ভু সই করে দেব দে মশায়, ভেবো না। তোমার বায়নার টাকা ফেরত নাও মধু। [*টাকাটা সামনে ফেলে দিল*] আজ থেকে মোর সাথে কোনো সম্পর্ক রইল না তোমার। চলো আমরা যাই।

নকুড় আহা হা—দলিলপত্র ফেরত নাও। এমনি টাকা দিয়ে চলে যাচ্ছ কি রকম ?

শম্ভু দলিলপত্র কিছু নেই।

নকুড় লেখাপড়া হয়নি কিছু ? এমনি টাকা দিয়েছিল ? তুমি অস্বীকার করলে যে চাইবার মুখটি ছিল না ওর !

শম্ভু টাকা নিয়েছি, অস্বীকার করব কেন দে মশায় ?

নকুড় তা বটে, তা বটে। সে কথা বলছি না। এমনি কথার কথা বলছিলাম আর কি, যে টাকা যে দিয়েছিল তারও প্রমাণ কিছু নেই।

মধু রসিদপত্র কিছু নেই, আদালতে নালিশ হত না, তবু একজন আর একজনের টাকা ফেরত দিয়েছে বলে গা জ্বালা করছে দে মশায়ের।

নকুড় টাকা তো মিলেছে অত কথা কেন আবার ?

শম্ভু চলো আমরা যাই। চল পদি বাড়ি চল।

পদ্মা বাড়ি গিয়ে আর কি হবে বাবা ? আমি ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি গিয়ে সবাইকে নিয়ে এসো। মোকে মোড় থেকে তুলে নিয়ো।

শম্ভু আয় বলছি বেহায়া বজ্জাত মেয়ে !

অন্তরালে রামঠাকুরের গলা শোনা গেল—শম্ভু নাকি হে ! ওহে শম্ভু দাঁড়াও, দাঁড়াও।

রামপ্রাণ ভট্টাচার্যের প্রবেশ। পরনে পাটের কাপড়, গায়ে উড়ুনি, পূজার বেশ। বগলে কাপড় জড়ানো পুঁথি, হাতে কুশাসন, ঘণ্টা প্রভৃতি আছে। আর আছে বেখাপ্পা রকমের মোটা একটা লাঠি। উড়ুনির একপ্রান্তে নৈবিদ্যের মতো কি যেন বাঁধা। বছর চল্লিশেক বয়স, শুষ্ক শীর্ণ কাঠখোট্টা চেহারা, তবে দুর্বল মনে হয় না। গলার আওয়াজ মোটা ও কর্কশ। জোরে জোরে কথা বলা অভ্যাস।

রামঠাকুর এই যে নকুড়ও আছ।

নকুড় প্রণাম হই ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর কল্যাণ হোক। তোমার সর্বনাশ হবে নকুড়।

শম্ভু ঠাকুরমশায়, প্রণাম।

রামঠাকুর কল্যাণ হোক। তুমি উচ্ছন্ন যাবে শম্ভু।

শম্ভু সকালবেলা শাপমন্যি দিচ্ছেন কেন ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর দেব না ? আমাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি চোরের মতো গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছ, অভিশাপ দেব না তো কি আশীর্বাদ করব ?

শম্ভু সে কি কথা ঠাকুরমশায়। আপনাকে ফাঁকি দিলাম কখন চোরের মতোই বা গাঁ ছেড়ে পালাব কেন ?

রামঠাকুর তাই তো পালাচ্ছ বাপু ? দিনক্ষণ গুনিয়ে নিলে না, রওনা হবার সময় দুটো শান্তিবচন বলতে ডাকলে না, আশীর্বাদ নিলে না, একটা খবর পর্যন্ত দিলে না, আবার ঠিক আমার গোণা শুভদিনটিতে শুভক্ষণটিতে পালাচ্ছ। বাবুলালবাবুর জন্য কত পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে আজকের শুভদিনটি বার করলাম, আমায় ঠকিয়ে আমার শুভদিনটিতে তোমরা যাত্রা করছ। ফাঁকি দেওয়া আর কাকে বলে ?

মধু শুভদিন কি আপনার সম্পত্তি নাকি ঠাকুরমশায় ? একজনের জন্য আপনি দিন দেখে দিলে সে দিন অন্য কেউ গাঁ ছেড়ে যেতে পারবে না ?

রামঠাকুর যেতে পারবে না কেন ? আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দিলেই যেতে পারবে।

মধু তাই বলেন, আপনার দক্ষিণা চাই।

শম্ভু বাবুলালবাবুও কি আজ যাচ্ছেন ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর এই মাত্র শুভযাত্রা করিয়ে দিয়ে এলাম। কালরাত্রেই বড়োবাবু ব্যাকুল হয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। পাঁচসিকে দক্ষিণা হাতে দিয়ে বললেন, কালের মধ্যে একটা ভালো দিন দেখে দিতে হবে ঠাকুরমশায়। ভালো করে পাঁজি পুঁথি দেখুন। পাঁজিতে আজ যাত্রা নিষেধ লিখেছে। বাবুলালের মা বেঁকে বসেছিলেন, আজ যাওয়া চলতেই পারে না। ঘড়ি পেতে আধঘণ্টা গুণে আমি বিধান দিলাম, আজ সকাল দশটার মধ্যে কিঞ্চিৎ পূজার্চনাদির পর যাত্রা অতীব শুভ। সকালে গিয়ে পূজার্চনাদি করে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আসছি। বাবুলালবাবু আবার দক্ষিণা দিয়েছেন পাঁচসিকে। বাবুলালবাবু লোক ভালো, তার মঙ্গল হবে। কিন্তু তোমাদের কেমন ধারা বিবেচনা নকুড় ? শম্ভু ? খবর পেয়েছ বড়োবাবুকে বিধান দিয়েছি আজ সকালে যাত্রা প্রশস্ত, বামুনকে ফাঁকি দিয়ে আজকেই যাত্রা করছ ! যাচ্ছ যাও। বারণ করিনে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। বাবুলালবাবুর যাত্রা শুভ বলে কি, তোমাদেরও আজ যাত্রা শুভ ! মানুষে মানুষে তফাত নেই ? রাশিচক্রের ভেদ নেই ?

শম্ভু রাগ করবেন না ঠাকুরমশায়। দিনক্ষণ দেখার কথা খেয়াল হয়নি মোটে। মাথার কি ঠিক আছে। এই সওয়া পাঁচআনা প্রণামি নিয়ে আশীর্বাদ করুন। [*প্রণাম করল*] ঠাকুরমশায়কে প্রণাম কর পদ্মি।

পদ্মা প্রণাম করল।

শম্ভু যাত্রা শুভ হবে তো ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর হবে বইকী। এক কাজ কোরো শম্ভু, নন্দপুরে পৌঁছে দামোদরের পুজো পাঠিয়ে দিও পাঁচসিকে। যাত্রা আরও শুভ হবে। আর তুমি নকুড় ?

নকুড় আমি দুদিন পরেই ফিরে আসছি ঠাকুরমশায়। আড়তের মালপত্রের ব্যবস্থা করে একেবারে যখন যাব, আপনাকে প্রণাম করে যাব বইকী।

রামঠাকুর দুদিনের জন্য হোক, একদিনের জন্য হোক, যাত্রা তো করছ বাপু ? বামুনের আশীর্বাদ নিয়েই নয় গেলে ! সওয়া পাঁচআনা পয়সার জন্য অত মায়া কেন ?

নকুড় অগত্যা প্রণামি দিয়ে প্রণাম করলে।

কল্যাণ হোক। বাস, এবার তোমরা যেতে পার। দামোদরের পাঁচসিকে পুজো পাঠিয়ে দিতে ভুলো না শম্ভু।

শম্ভু ভুলব না ঠাকুরমশায়।

শম্ভু, পদ্মা ও নকুড় চলে গেল।

মধু আপনি তবে রয়ে গেলেন ঠাকুরমশায় ? ও পাঁচসিকে এসে পৌঁছতে ঢের দেরি।

রামঠাকুর তোমরা যদ্দিন আছ থাকতেই হবে। যেতে হলে তো সম্বল চাই দু পয়সা ? যাবার সময় তোমরা কিছু কিছু দিয়ে যাচ্ছ, দেখি যদি তোমাদের সবাইকে শুভযাত্রা করিয়ে নিজের শুভযাত্রার সংস্থান কিছু হয় কিনা। এ বাজারে আমার ব্যাবসাটা একটু উঠেছে, এইটুকু যা লাভ মধু। যা মন্দা যাচ্ছিল। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধাঁধায় পড়ে লোকে শুধু দিচ্ছিল ফাঁকি, বামুনপুরুতকে দুটো পয়সা দিতে জ্বর আসছিল গায়ে। এখন ভয়ের চোটে এমনি দিশেহারা হয়ে গেছে যে আদায়পত্র হচ্ছে কিছু, চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে। একটু উঠেছে ব্যাবসাটা ! তবে এ আর কদিন ! এরপর যা মন্দাটা আসছে, কারবার গুটোতে হবে।

মধু আপনার আবার ব্যাবসা কি ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর ব্যাবসা বইকী মধু। অন্তত পেশা তো বটে। আমি কিছু বুঝিনে ভেবো না হে। ভক্তিতে কেউ একটি পয়সা দেয় না, যা দেয় ভয়ে। উকিল, মোক্তার, কোবরেজ, ডাক্তারের

মতো আমিও মোচড় দিয়ে যা পারি আদায় করে নিই। চলা চাই তো আমার। ওদের মতো আমিও চক্ষুলজ্জার বালাই বিসর্জন দিয়েছি।

মধু যেতে না বলে আপনি সবাইকে যেতে বারণ করেন না কেন ঠাকুরমশায় ? যে ভাবে দিশেহারা হয়ে সব পালাচ্ছে, দুরবস্থার সীমা থাকবে না। আপনি জোর করে বললে হয়তো অনেকে যাওয়া বন্ধ করবে।

রামঠাকুর কেউ যাওয়া বন্ধ করবে না বাবা। যে আতঙ্ক জন্মেছে, স্ত্রীপুত্র ফেলে যে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয়নি তাই আশ্চর্য। কথা কেউ শুনবে না মধু। যদি শুনত, বলে দিতাম এ বছর যাত্রা করার একটাও ভালো দিন নেই, সম্বৎসর অযাত্রা। যাত্রা করিয়ে কিছু কিছু পাচ্ছি, সে পাওয়ার লোভ নয় ছেড়েই দিতাম।

মধু লোভ আপনার নেই ঠাকুরমশায়।

রামঠাকুর আমি কলির ব্রাহ্মণ, আমার লোভ নেই, বলো কী হে ! লোভ আমার ধর্ম। কথা যারা শুনবে জানি, তাদের থাকতে বলছি মধু। তাও ওই লোভের হিসেবে। সবাই চলে গেলে আমার ব্যাবসাই যে মাটি হবে। যত জনকে রাখা যায় ততই আমার লাভ।

ছোটলাল ও মাখন এসে দাঁড়াল। ছোটলাল মধুর চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো, স্বাস্থ্যবান সুশ্রী চেহারা, শ্যামবর্ণ। সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের বেশ, মোটা কাপড়, সুতার মোটা কাপড়ের কোট, সস্তা মোটা গরম চাদর। পায়ে জুতো আছে, শিশির ভেজা মাটি লাগানো। মাখন তার সমবয়সি কামাবের কাজ করে। গায়ে ফতুয়া, চাদব। কাপড জামা ঘবে কেচে লালচে বকম সাফ করা। দেখলেই বোঝা যায় কোথাও যাবে বলে তৈরি হয়েছে, কারণ চুলও মোটামুটি আঁচড়ানো।

মধু আরে, ছোটোবাবু !

ছোটলাল ছোটোবাবু ডাকটা বদলাতে পার না মধু ? শুনলে মনে হয় আমি যেন তোমাদের জমিদারের ভাই অথবা ছেলে, ছোটো তরফ। সবাই ছোটুবাবু বলে, তুমি ছোটোবাবু বলে আমায় ছোটো করে দাও কেন ?

রামঠাকুর ছোটো করে দেয় ! হা হা হা !

ছোটলাল জমিদার বলা আর গালাগাল দেওয়া একই কথা ঠাকুরমশায়।

মধু ওটা বলা কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে ছোটুবাবু। আপনি গেলেন না ?

ছোটলাল কোথায় গেলাম না ?

মধু ঠাকুরমশায় বললেন আপনারা আজ রওনা হয়ে গেলেন। শুনে ভড়কে গেছলাম।

রামঠাকুর এই তো দোষ তোমাদের মধু। এমনি করে তোমরা গুজব রটাও আবোল-তাবোল, মাথা মুন্ডু থাকে না। আমি কখন বললাম ছোটলালকে রওনা করিয়ে দিয়ে আসছি ? রওনা হলেন বাবুলাল।

ছোটলাল দাদা পালালে আমিও পালাব মধু ?

মধু তাই তো ভাবছিলাম অবাক হয়ে—। বউঠান ওনারা ?

ছোটলাল আমার বউ থাকবে, আমার বোনটাও থাকবে। দাদা তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবে পুরী।

মধু যেতে দেবে ?

ছোটলাল তুমি পাগল মধু। সবাইকে কি ওরা আটকাচ্ছে—গুঁতো দিয়ে গাঁয়ে পাঠাচ্ছে আরও গুঁতো দেবার জন্য ? যারা ভালো লোক, মিহি লোক, যাদের অনুগ্রহ করলে ফল পাওয়া যায়, তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। পাস না জোগাড় করে কি আর দাদা যাচ্ছে। আর সত্যি বলি, দাদার ভাই বলেই আমিও আসতে পেরেছি গাঁয়ে। হয়তো আপশোশ করছে সে জন্য এখন !

মধু তা করছে। মোদের বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে যাবেন এমনভাবে তা কি ভাবতে পেরেছিল।

ছোটলাল দুপুরে একবার এসো মধু ভগবান মাইতির বাড়িতে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে এখানে ওখানে চলে যাচ্ছে, এটা ঠেকাতে হবে। পরামর্শ করা দরকার।

মধু মোর সাথে পরামর্শ !

ছোটলাল সবার সাথেই পরামর্শ দরকার। আচ্ছা আমি যাই, সময় নেই।

ছোটলাল চলে যায়।

মধু তুই সেজেগুজে চলেছিস কোথা মাখন ?

মাখন শ্বশুরবাড়ি।

মধু বটে ? বউ ডেকেছে বুঝি ?

মাখন জরুরি ডাক, হুকুম একদম। আজ গিয়ে নিয়ে না এলে একলা চলে আসবে। ওর বাপ ভাই আসতে দিতে চায় না, পৌঁছেও দিয়ে যাবে না। এ গাঁয়ে আসতে ওদের ডর লাগে। কি করি, আনতে যাচ্ছি।

রামঠাকুর তুমিও দেবে নাকি কিছু দক্ষিণা ?

মাখন আজ্ঞে না ঠাকুরমশায়। শুভযাত্রা করছি না, মোর এটা অযাত্রা।

রামঠাকুর না বাবা, না। এটা শুভ যাত্রাই তোমার। লোকে পালাচ্ছে গাঁ ছেড়ে, বউ ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তুমি এ সময় আনতে চলেছ বউকে ! বিনা দক্ষিণাতেই তোমায় আশীর্বাদ করছি, সবার চেয়ে তোমার যাত্রা শুভ হোক।

মাখন তুই কবে পালাচ্ছিস মধু ?

মধু আমি পালাব ?

মাখন শম্ভু মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজ। তুই যাবি না ?

মধু শম্ভু মেয়ে নিয়ে চুলোয় গেলে মোকেও যেতে হবে ?

মাখন ও বাবা ! বলিস কি রে ?

রামঠাকুর শম্ভু ওর দাদনের টাকা ফেরত দিয়েছে, সঙ্গে গেল না বলে। নকুড়ের কাছ থেকে ধার করে দিয়েছে অবশ্য।

মাখন বলিস কি রে ! তুই যে অবাক করে দিলি !

রামঠাকুর অবাক তোমরা দুজনেই করেছ বাপু। তুমি যাচ্ছ বউকে আনতে, ও যাবে না বলে ছেড়ে দিচ্ছে হবু বউকে ! হা হা হা ! যৌবনের লক্ষণ এই। শাস্ত্রে বলেছে, যৌবন—অগ্নি তাপেন উষ্ণ ভবতি শোণিত। এ কিন্তু আমার শাস্ত্র বাপুসকল, ধোঁকা দেব না তোমাদের, মুখ্যু সুখ্যু সরল মানুষ তোমরা। শাস্ত্রটাস্ত্র পাঠ করা হয়নি বাপু আমার, দুটো মুখস্ত মন্ত্র বলতে পারি বসে।

জোরে হাসতে হাসতে রামঠাকুরের প্রস্থান।

মাখন বেশ লোক ঠাকুরমশায়। ওঁর বড়ো ভাইটা ছিলেন পয়লা নম্বর ভণ্ড তপস্বী।

মধু বাবুলাল আর ছোটোবাবু যেমন।

মাখন কিন্তু মধু, এ কাজটা কি ঠিক হলো তোর ?

মধু কোন কাজটা ?

মাখন ভূষণের হাতে ছেড়ে দিলি পদিকে ? শম্ভুকে বিপদে ফেলে পদিকে ও হাত করবে নির্ঘাত। আষ্টেপিষ্টে বেঁধেছে শম্ভুকে।

মধু আমি কী করব ভাই। সবাইকে বারণ করছি গাঁ ছেড়ে যেতে, জোর গলায় বলেছি গাঁয়ের সবাই পালালেও আমি পালাব না, মা বোনকে পাঠাব না। নিজেই পালাব এখন ? মরলেও তা পারব না।

মাখন এমনি যদি হানা দিতে থাকে ?

মধু তা হলেও পালাব না। আর ও যদির হিসেব ধরলে কি কূল কিনারা পাব ভাই ? ছোটোবাবু বলেন, যদি নাগিয়ে সব কিছু ঘটানো যায়, সব কিছু বাতিল করা যায়। বুঝে শুনে তলিয়ে বিচার করে দেখতে হবে সব কথা। আমার মনে বড়ো লেগেছে কথাটা। পালাব কোথায় ? সমুদ্দুর ডিঙিয়ে যদি যেতে পারতাম অন্য দেশে তবে নয় কথা ছিল।

মাখন আমিও তাই ভেবে আনতে যাচ্ছি বউটাকে।

মধু ভালো করেছিস। মা বোনকে মামাবাড়ি পাঠাবার কথাটাও কানে তুলিনি আমি। একজনকে ভয় পেতে দেখলে দশজনে ভয় পায়। একজনের সাহস দেখলে দশজনে সাহস পায়।

মাখন কী কাণ্ডটাই চলছে দেশ জুড়ে।

মধু দেশ জুড়ে আর কই চলল ভাই। দেশ জুড়ে চললে কি আর ভাবনার কিছু থাকত, একদিনে সব ভয় ভাবনা চুকে যেত। ছোটোবাবু গোড়ায় এসে তাই বলেছিলেন। তখন ভালো রকম বিশ্বাস করিনি কথাটা। এখন সবাই জানছি এ শুধু মোদের এলাকা। ছোটো এলাকা পেয়েছে বলেই না বেড়াজালে ঘিরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে, যা খুশি করছে। এ এলাকার বাইরের মানুষ নাকি জানেও না কী হচ্ছে এখানে। লোকের মুখে দু-চার জন মাত্তর কিছু কিছু শুনছে।

মাখন শুনছি, কটা গাঁয়ের ধারে কাছে যেতে নাকি ভরসা পায় না। ভাবলে হাতুড়ি ঠুকতে হাতে যেন জোর বাড়ে।

মধু কী তেজ, বুকের পাটা, ভাবলে বুক ফুলে ওঠে সত্যি। আবার যখন ভাবি, কটা মোটে গাঁ, তখন দুঃখ হয়। যেমন বন্যা, তেমনই বাঁধ না হলে কি ঠেকানো যায়। বাঁধ বন্যায় ভেসে যায়। তবে সময় আসবে, বাঁধ আমরা বেঁধে তুলব। সবাই মিলে হাত লাগাব। সময় আসুক।

মাখন সময় কবে আসবে ভাবি।

মধু আসবে, আসবে। এমনই অবস্থা কি চলতে পারে। সবাই একজোট হবে, হেথা সেথা ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, সব ঠাঁয়ে। সে আয়োজন হয়নি বলে তো মুশকিল হল মোদের।
ব্যস্তভাবে কাদের, আমিরুদ্দীন ও আজিজের প্রবেশ। তিনজনেই চাষি শ্রেণির লোক। কাদের মাঝবয়সি, আমিরুদ্দীন বৃদ্ধ, আজিজ যুবক। আজিজের গায়ে পিরান।

কাদের এই যে মধু ভাই। তোমায় খুঁজছিলাম।

মধু কী ব্যাপার কাদের ভাই ? টাকাটার জন্য ?

কাদের হাঁ। মধু ভাই, মোর টাকাটা দাও। তাড়াতাড়ি দাও।

মধু দিচ্ছি। দেব যখন বলেছি, টাকা নিশ্চয় দেব।

কাদের কেউ দিচ্ছে না ভাই। নগদ টাকাটা কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। নালিশের ভয় দেখালে বলে, করো নালিশ। কোথা নালিশ করব, কার কাছে ! যদি বা করি, নালিশ করে, ডিক্রি হতে কত সময় যাবে, ছমাস বছর বাদে মামলার খরচ সুদ্ধ তিনগুণ দিতে সবাই রাজি, এখন একটি পয়সা দিতে চায় না। আল্লা, আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !
মধু কোমরে বাঁধা গেঁজিয়া থেকে ছটি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বার করল। শম্ভুর টাকা মাটিতে এতক্ষণ পড়েছিল, টাকাটা তুলে গেঁজিয়ায় ভরতে গিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। কাদেরকে তার পাওনা দিল।

মধু এই যে তোমার ছটাকা ছআনা।

কাদের তুমি লোক ভালো তাই চাওয়া মাত্র পেলাম। দে মশায়ের কাছে দশ মন চালের দাম এক মাসের চেষ্টায় আদায় হল না ভাই। বলেন, আরও দশ মন চাল দিয়ে একসাথে দাম নিয়ে যাবে। আরও দশ মন চাল দিলে খাব কী ! চালের দাম কত বেড়ে গেছে, উনি কিনবেন সেই আগের দামে। আল্লা, আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

মধু দুর্দিন তো বটেই। কেটে যাবে দুর্দিন। খারাপ সময় চিরকাল থাকে না।

আমিরুদ্দীন আলাপ শুরু করলে কাদের মিএা ? যেতে হবে না ?

মধু তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন ?

আমিরুদ্দীন আমরা আজ চলে যাচ্ছি।

কাদের ব্যস্ত হব না মধু ? বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার গুটিয়ে যাওয়ার হাঙ্গামা কি সহজ ! কোন দিকে যাই কী করি ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলাম। একটা গোরুর গাড়ি মিলল না। একবেলার রাস্তা কদমসাই, চার টাকা কবুল করে গাড়ি পেলাম না। মেয়েদের হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। আল্লা আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

মধু নাই বা গেলে কাদের ?

কাদের মরতে বলো নাকি তুমি ?

আমিরুদ্দীন শুধু কি মরব ? মোদের জান নেবে, মেয়েদের বেইজ্জত করবে।

কাদের কীসের ভরসায় থাকি বলো ?

ছোটলাল কীসের ভরসায় যাচ্ছ ? কদমসাই গেলে কি জান বাঁচবে, মেয়েদের ইজ্জত বজায় থাকবে কাদের ? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমাদের মেয়ে বউ যেখানে হেঁটে যাবে, ওরা সেখানে যেতে পারবে না ? সেখানে বিপদ তোমাদের বেশি হবে। আত্মীয়বন্ধু, গাঁয়ের চেনা লোক, সেখানে তোমাদের কেউ সহায় থাকবে না। বিপদ হলে সেখানে তোমাদের কে দেখবে ভেবে দেখেছ ? তার চেয়ে নিজের গাঁয়ে থাকাই তো ঢের ভালো। বিপদে আপদে গাঁয়ের দশটা লোক ছুটে আসবে।

কাদের কে আসবে ? সবাই পালাচ্ছে। মানপুরে হানা দেওয়ায় সবাই ডরিয়েছিল। ছোটোবাবু ভরসা দিয়ে থাকতে বললেন, শুনে সবার বুকে একটু সাহস জাগল। অনেকে পালাবে ঠিক করেছিল, তারা যাওয়া বাতিল করে দিল। এবার সবাই খবর পেয়েছে ছোটোবাবুরা নিজেরাই পালাচ্ছে। শুনে ফের সবাই ভয় পেয়ে গেছে।

মাখন ও মধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

মধু ছোটোবাবু পালাবেন না কাদের ভাই।

কাদের [*সন্দিগ্ধভাবে*] পালাবেন না ? তবে যে শুনলাম আজ ছোটোবাবুরা সব পালাচ্ছেন ?

মধু আজ বাবুলালবাবু চলে গেছেন। ছোটোবাবু যাবেন না।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবু একা থাকবেন। একা থাকতে ডর কীসের। যখন খুশি যেতে পারবেন। ডর তো বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েদের জন্য।

মধু একা নয় ভাই, তিনিও বাচ্চা নিয়ে, বউ আর বোনকে নিয়ে থাকছেন। ওকে শাপ দিতে দিতে চলে গেছে বাবুলাল। ওই যে ছোটোবাবু ফিরছেন—ওঁকেই জিগ্যেস করো। ছোটোবাবু ! শুনবেন একবার ?

ছোটলাল এল।

ছোটলাল কি মধু ? তোমাদের খবর ভালো ?

আজিজ ছালাম ছোটোবাবু।

ছোটলাল ছালাম। তোমার জ্বর ছেড়েছে আজিজ ?

আজিজ ছেড়ে গেছে।

কাদের ও আমিরুদ্দীন ছালাম ছোটোবাবু। আপনিও পালাচ্ছেন শুনে মোরা ডরিয়ে গেছি। আপনার দাদা চলে গেছেন নাকি ?

ছোটলাল ছালাম, ছালাম। দাদা চলে গেছেন ভাই। অনেক চেষ্টা করলাম রাখবার জন্য, কোনো কথায় কান দিলেন না, তিনি ভীরু স্বার্থপর মানুষ। দাদার কথা তোমরা ভাবছ কেন কাদের ? এ তো তার বেড়াতে যাওয়ার শামিল। তার টাকা আছে, সহায় আছে, যেখানে যাবেন আরামে থাকবেন। লোকের কথা তো ভাবেন না, কেন থাকবেন হাঙ্গামায় ? পশ্চিমে তার বাড়ি আছে। বড়োবাবু আমার ভাই, কিন্তু আমি তোমাদের জোর করে বলছি কাদের, তিনি বিদেশি, তিনি তোমাদের গাঁয়ের লোক নন। তিনি গাঁয়ে থাকলেও তোমাদের ভরসা করার কিছু থাকত না, তিনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও তোমাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। গাঁয়ের এই বাড়ি তার একমাত্র ভিটে নয়, গাঁয়ের এক কাঠা জমি তিনি চাষ করেন না। তার শখ হলে তিনি হাজারবার গাঁ থেকে পালাতে পারেন। কিন্তু তোমাদের সে শখ চাপলে তো চলবে না। তোমাদের পালানো মানে নিজের গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, জমিজমা ছেড়ে, গাইবাছুর ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে বিদেশে যাওয়া। বড়োবাবু যেখানে যান, কালিয়া পোলাও খেতে পারেন। তোমরা জমি না চষলে, ফসল ঘরে না তুললে, তোমাদের খাওয়াবে কে ?

কাদের তবে সত্য কথা বলি ছোটোবাবু, অত সব হিসাব না করেও যেতে মন চায় না। রাতভোর ঘুমাইনি, ভোরে উঠে খেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এত যত্নের নিড়ানো খেতে আগাছা ভরে যাবে ভাবতে গিয়ে মনটা হুহু করে উঠল। ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়িটা যেন কাঁদছে। কিন্তু কী করি, সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে।

ছোটলাল সবাই পালাবে না কাদের। তুমি যদি না পালাও, সবাই পালাবে না। অন্যকে পালাতে দেখে তুমি যেমন ঝোঁকের মাথায় পালাতে চাইছ, তেমনি তোমাকে পালাতে দেখে অন্য আর একজনের পালাবার তাগিদ জাগবে। কিন্তু তুমি যদি না পালাও, তোমার দেখাদেখি অন্য দশজনও পালাবে না। মধু পালাবে না কাদের।

কাদের পালাবে না ?

ছোটলাল না। শম্ভু ওকে সঙ্গে নেবার জন্য কত চেষ্টা করেছে, বলেছে, ও যদি সঙ্গে যায় সেখানে গিয়েই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে, পনেরো টাকা অর্ধেক নেবে না। মধু যেতে রাজি হয়নি।

কাদের তবে কি যাব না ছোটোবাবু ?

ছোটলাল কেন যাবে বাড়ি ফিরে যাও, আমি আর মধু তোমাদের পাড়ায় যাচ্ছি। অন্য সকলকে বুঝিয়ে ঠেকাতে হবে। সবাইকে বলো গিয়ে, যত গাঁ আছে সব গাঁ ছেড়ে লোক যদি পালাতে আরম্ভ করে, কী অবস্থা হবে ভাব দেখি ? তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো গিয়ে কাদের, ভয় পেলে চলবে না। আমরা আসছি। গাঁ ছেড়ে কেউ যাতে না পালায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে কাদের।

কাদের আচ্ছা ছোটোবাবু। ছালাম। টাকাটা তুমি তবে ফেরত নাও মধু ভাই। না যদি যাই আজ টাকা না পেলেও চলবে। তোমার সুবিধা মতো দিয়ো।

মধু না, টাকা নিয়েই যাও। আজ হোক কাল হোক তোমার পাওনা মিটিয়ে তো দিতেই হবে।

কাদের সবাই যদি তোমার মতো পাওনা মিটিয়ে দিত, তবে ভাবনা কি ছিল।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবু দুটো কথা বললেন, অমনি তোমার মন ঘুরে গেল কাদের মিঞা ?

কাদের ছোটোবাবু ঠিক কথা বলছেন।

আমিরুদ্দীন জীবন ভোর যাদের কথা শুনে কাটল, আজ তাদের কথা হল বেঠিক। নিজের কাজ বাগাতে ছোটোবাবু যা বোঝালেন তাই হল ঠিক।

আজিজ ছোটোবাবুর কথা আমারও মনে লেগেছে বাপজান।

আমিরুদ্দীন চুপ থাক। ও সব ছেলেমানুষি কথা তোর মতো ছেলেমানুষের মনেই লাগে। কাদের যাক বা না যাক, আমি যাব ছোটোবাবু আজিজকে নিয়ে। তিন তিনটে জোয়ান ছেলেকে আল্লা ডেকে নিয়েছেন, আমার আর কেউ নাই। একটা ছেলে যদি তিনি রেয়াত করেছেন, এই বিপদের মধ্যে ওকে আমি রাখব না।

ছোটলাল যেখানে যাবে সেখানে বিপদ নেই আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন বিপদ তো চারিদিকে ছোটোবাবু। এখানের চেয়ে সেখানে তবু বিপদ কম। চল আজিজ, আমরা যাই।

আজিজ তুমি আগাও বাপজান, আমি আসছি। ছোটোবাবুর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে যাই।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবুর সঙ্গে তোর কীসের কথা ? চটপট সব সেরে নিয়ে যেতে হবে না ? কত পথ হাঁটতে হবে খেয়াল আছে ?

আজিজ যেতে মন চায় না বাপজান। এক কাজ করা যাক। আজ না গিয়ে দুদিন বাদে যাব।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবু তোর মাথাও বিগড়ে দিয়েছে ? চল, চল শিগগির চল এখান থেকে।

আজিজ রসুলদের খবরটা জেনে আসি।

আমিরুদ্দীনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল।

আমিরুদ্দীন আরে আজিজ। কোথা যাস ? বদ মতলব করবি তো মেরে তোকে লাশ বানিয়ে দেব। ফিরে আয়। ফিরে আয় বলছি ! নাঃ, ছোঁড়া পালিয়ে গেল। সারাদিন হয়তো ঘরে ফিরবে না। আজ আর যাওয়া হবে না। আপনি যত নষ্টের গোড়া ছোটোবাবু।

কাদের আঃ ! কী বলো মিঞা ?

আমিরুদ্দীন বলব না ? ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিলেন ! নিজের কাজ নাই, পেছনে লেগেছেন আমাদের।

আমিরুদ্দীন দ্রুতপদে আজিজের উদ্দেশ্যে চলে গেল।

কাদের ছেলে ছেলে করে লোকটা পাগল ছোটোবাবু। জোয়ান জোয়ান তিনটে ছেলে মরে গেল, শেষ বয়সের এই ছেলেটাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না।

ছোটলাল ওরকম হয় কাদের, স্নেহে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

কাদের ওর ভয় দেখে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ছোটোবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। আমাদের পাড়ায় আসবেন নাকি ?

ছোটলাল তুমি যাও, আমরা আসছি।

কাদের চলালাম, ছোটোবাবু। আল্লা, আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

কাদের চলে গেল।

ছোটলাল আমি জানতাম মধু। আমি জানতাম, দাদার জন্য এ কাণ্ড হবে। যারা কোনোমতে বুক বেঁধে ছিল, তারা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করবে। দাদার হাতে পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছি।

মধু আপনি যে আছেন তাতে লোকে অনেকটা ভরসা পাবে। আপনার জন্য কাদের যাওয়া বন্ধ করল।

ছোটলাল আমি একা কী করব ? এ তো একজনের কাজ নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে কিছুই করা যাবে না। এইসব সরল অশিক্ষিত লোক দুর্দিনে কর্তব্যের নির্দেশ পাবার জন্য যাদের মুখ চেয়ে থাকে, এ দেশের যারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাদের ভেতরটা পচে গেছে মধু। পুরুষানুক্রমে এ দেশে তারা জন্মে আসছে, অথচ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোটলালদের বাড়ির সদরের ঘর। পুরানো পাকা একতলা বাড়ি, প্রাচীনত্বের ছাপ জানালা দরজা দেওয়াল সর্বত্রই চোখে পড়ে। দেওয়ালে কয়েকখানা বিবর্ণ তৈলচিত্র। ঘরখানা বড়ো। একদিকে জোড়া দেওয়া তিনটি বড়ো বড়ো তক্তপোশ মস্ত ফরাশপাতা, অপরদিকে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং তিনটে কাঠের ভারী চেয়ার।

এখন অপরাহ্ণ। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হেলানো রোদ এসে পড়েছে ফরাশে। পরিশ্রান্ত ছোটলাল একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে, ফরাশের একধারে বসে রামঠাকুর হুঁকো টানছেন।

রামঠাকুর চুরুট বলো, সিগারেট বলো, তামাকের কাছে কিছু নয়। শ্রান্তি দূর করতে তামাক অদ্বিতীয়। এই যে সারাটা দিন দুজনের ছুটোছুটি গেল এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে এ হাট থেকে ও হাটে, দুজনেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কি বলো বাবা ?

ছোটলাল সে আর বলতে হবে কেন ?

রামঠাকুর তুমি আধ শোয়া হয়ে বিশ্রাম করছ, আমি বসে বসে তামাক টানছি। পাঁচমিনিট তামাক টেনে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, তুমি এখনও ঝিমুচ্ছ। তামাক ধরো বাবা, তামাক ধরো। এমন জিনিস নেই।

সুবর্ণ ও সুভদ্রা ঘরে এল বাড়ির ভেতর থেকে। দুজনে তারা প্রায় সমবয়সি। সুবর্ণ একটু রোগা, তার বুকে কাঁথা জড়ানো শিশু। সুভদ্রার স্বাস্থ্য চমৎকার, দেহের গড়ন অসাধারণ। তার মুখেও শ্রান্তির ভাব সুস্পষ্ট।

সুবর্ণ বারোটা বেজেছে তোমার ?

সুভদ্রা সত্যি দাদা, কোন ভোরে বেরিয়েছ, বাড়ি ফিরে এলে বেলা চারটেয়। সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুরে বেড়াচ্ছ, আবার রাতও জাগবে। কী আরম্ভ করে দিয়েছ বলো তো ?

ছোটলাল নাওয়া নেই খাওয়া নেই তোকে কে বলল ? রতনপুরের বড়ো দিঘিতে নেয়ে দই চিড়ে দিয়ে ফলার করেছি ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে। সুবর্ণ যে অতগুলো কাঁচাগোল্লা দিয়েছিল সঙ্গে, তাও খেয়ে শেষ করেছি।

সুবর্ণ সুভদ্রা বহুক্ষণ ফিরেছে। প্রায় দশ মিনিট হবে। কি তারও দু এক মিনিট বেশি। ঘড়ি তোমাদের ভাইবোনের সমান কদমেই চলছে। এসে চা খেয়েছে, এইবার নেয়ে ভাত খাবে। সন্ধ্যার আগে নাওয়া খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে পারবে মনে হয়। অবশ্য এর মধ্যে যদি আবার বেরিয়ে না যেতে হয়।

সুভদ্রা আমি আর বেরোব না। তুমিও কিন্তু আজ আর বেরোতে পাবে না দাদা।

ছোটলাল না। যদি যাই তো গাঁয়ের মধ্যেই থাকব, গাঁয়ের বাইরে যাব না। মেয়েদের ভাব কী রকম বুঝলি সুভদ্রা ?

সুভদ্রা মেয়েদের নিজস্ব কোনো ভাব নেই দাদা। পুরুষদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, মেয়েদের মনে সাড়া জাগছে অবিকল সেইরকম। পুরুষদের ভাবনা মেয়েদের জন্য, মেয়েদের

ভাবনা পুরুষদের জন্য—ছেলেমেয়েরা কমন ফ্যাক্টর। এক বিষয়ে মেয়েদের খুব শক্ত দেখলাম। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে ভেবে পুরুষদের আতঙ্ক হয়েছে, মেয়েরা বিশেষ ভয় পায়নি। কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, অধিকাংশ মেয়ের বিশ্বাস, নেহাত হাবাগোবা মেয়ে না হলে অত্যাচার করার ক্ষমতা কারও হয় না। মেয়েদের নাকি দাঁত আছে, নখ আছে। মেয়েরা নাকি শিং মাছের মতো ধরতে গেলে পিছলে পালাতে পারে। ডোবার পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, বালিতে গর্ত খুড়ে, আর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে মেয়েরা নাকি এমন করে লুকোতে পারে যে পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে গেলেও তাদের একজনও টের পায় না। পুরুষের বেশ ধরে ধুলোবালি মেখে, পাগলি সেজে, গাছের পাতার রস লাগিয়ে হাতে মুখে ঘা করেও নাকি মেয়েরা আত্মরক্ষা করতে পারে। এত করেও যদি নিজেকে বাঁচানো না যায়, মরে যাওয়াটা আর এমন কি কাজ !—ছেলেখেলার ব্যাপার। দুটি ছেলেমানুষ বউ বিষ দেখলে সিন্দুর কৌটায় ভরে সব সময় আঁচলে বেঁধে রাখে। আর একজন একটা দেশি ক্ষুর ন্যাকড়ায় জড়িয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

ছোটলাল তোর নিজের মন থেকে বলতো সুভা। মরাটা কি তোর কাছেও ছেলেখেলার মতো তুচ্ছ ?

সুভদ্রা সর্বদা নয়, কিন্তু অবস্থায় তুচ্ছ বইকী। ধরো দশ পনেরোটা গুন্ডা আমায় জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু না পাই নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে হাতের আর্টারিটা কেটে ফেলবার চেষ্টা করব বইকী।

সুবর্ণ মাগো মা, কী কথাবার্তা তোমাদের ভাইবোনের ! শুনলে গাঁয়ে কাঁটা দেয়।

ছোটলাল গায়ে কাঁটা দিলে আর চলবে না, লংকা বাটা লাগার মতো গা জ্বালা করাতে হবে। তোমাকে পেলেও ওরা ছেড়ে কথা কইবে না।

সুভদ্রা তুমি যে রকম সুন্দরী, তোমাকেই বরং আগে ধরবে বউদি। তবে তোমার ভাগ্যে হয়তো ওপরওলা জুটতে পারে। আমায় টানাটানি করবে বাজে লোকে।

সুবর্ণ আঃ কী যে করো তোমরা ! আমার সামনে এ সব বীভৎস আলোচনা কোরো না।

ছোটলাল চোখ কান বুজে থাকলে আর চলবে না সুবর্ণ। কী হচ্ছে আর কী হবে জেনে বুঝে নিজেদের বাঁচবার উপায় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে। পাগলা কুকুর কামড়াবেই, গাছে চড়াটা শিখে রাখা দরকার।

সুবর্ণ কেন, লাঠি।

ছোটলাল লাঠি কই ? খালি হাতে চাপড় মারলে আরও হন্যে হয়ে বেশি কামড়াবে। হয় তাড়াতে হবে দূর দূর করে, নয় মারতে হবে গলা টিপে। সে তো দু-দশটা গলা বা দু-দশ জোড়া হাতের কাজ নয়। সে সময়ও হয়নি এখন। মিলেমিশে গলা সাধতে হবে, হাতে জোর করতে হবে প্রথমে।

সুবর্ণ সে কত কাল ?

ছোটলাল যত কাল দরকার হয়। পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর। অবিলম্বে আমাদের কাজ হল ধৈর্য ধরে শান্ত থেকে সাময়িক বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচানো। কিছুদিন দরকার হলে তাই গাছে চড়তে হবে। পাগলা কুকুরকে কামড়াবার সুযোগ দিয়ে তো লাভ নেই। কি বীভৎস কাণ্ড চারিদিকে জানো না তো।

সুভদ্রা জানে না ! বউদি সব জানে দাদা, সব বোঝে। ওর কথা শুনো না। কিছু যে জানতে চায় না বুঝতে চায় না বলে সব ওর ঢং। সেই যে চটি বইটা এনে দিয়েছিলে আমায়

পড়তে, কাল সন্দেবেলা লুকিয়ে উনি সেটা পড়ছিলেন। আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, মুখ লাল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাচ্চাটা কাঁদছিল, খেয়ালও নেই। আমি যে তুলে আনলাম বাচ্চাকে, তাও টের পায়নি। একটু পরে আবার গিয়ে দেখি বইটা পড়ে আছে কোলের ওপর, দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সুবর্ণ ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। শুইয়ে দিতে গেলাম। ভাতটাত যদি দয়া করে খান আপনারা, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন কি ভেতরে ? আর যদি বক্তৃতায় পেট ভরে গিয়ে থাকে তবে অবিশ্যি—

বলতে বলতে সুবর্ণ ভেতরে চলে গেল।

সুভদ্রা আমিও যাই গা ধুয়ে ফেলি। তুমি আসবে না দাদা ? ঠাকুরমশায় দুটি ভাত খাবেন তো ? কেউ জানবে না অব্রাহ্মণের রান্না খেয়েছেন।

রামঠাকুর দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি মা, অবেলায় আর খাব না। রাতে খাইয়ো। তুমিও এখন আর ভাত না খেলে বাবা।

ছোটলাল খিদে থাকলে তো খাব। ওরা বোধ হয় আসছে সবাই নকুড়কে নিয়ে।

সুভদ্রা নকুড়কে কেন ?

ছোটলাল বড়ো গোলমাল আরম্ভ করেছে লোকটা। অনেক চাল আর কেরোসিন ছিল, সব লুকিয়ে ফেলেছে। বিক্রি করছে চুপিচুপি, দশ গুণ দামে। এমন চালাক, বলছে যে হানা দিতে এসে ওর সব মাল নিয়ে চলে গেছে। সেটা অসম্ভব নয়, গাড়ি বোঝাই দিয়ে মালপত্তর অন্য গাঁ থেকে লুটে নিয়েছে শুনছি, কিন্তু এ গাঁ থেকে কিছু নেয়নি জানা কথা। নকুড় ওই ছুতো খাটাচ্ছে।

সুভদ্রা ব্যাটাকে পিটিয়ে দিয়ো আচ্ছা করে।

ছোটলাল পেটালে কি কাজ হয়। বরং গাঁয়ের লোক সবাই মিলে না ছিঁড়ে ফেলে, তাই সামলাতে হচ্ছে। বুঝিয়ে দেখতে হবে।

সুভদ্রা বুঝবে কী ? ও সব লোক বড়ো অবুঝ।

মধু, মাখন, আজিজ, কাদের ও অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে নকুড়ের প্রবেশ। নকুড়ের মুখখানা গোলগাল তেলতেলা, বোকা ভালো মানুষের মতো চেহারা।

নকুড় প্রাতঃপ্রণাম ঠাকুরমশায়। অবেলায় হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন ছোটোবাবু ?

ছোটলাল বলছি। বোসো।

অনেক তফাতে ফরাশের একপাশে নকুড় সন্তর্পণে উপবেশন করলে।

তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে নকুড়।

নকুড় অনুরোধ ছোটোবাবু ? আপনি হুকুম করবেন।

ছোটলাল তোমার লুকোনো চাল আর কেরোসিন বার করে ফেলতে হবে নকুড়। গাঁয়ের লোক লণ্ঠন জ্বালাতে পারেনি। প্রদীপ জ্বেলে কোনোমতে চালিয়ে দিয়েছে। যা বাতাস ছিল কাল, প্রদীপ নিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া যেতে পারেনি। আমার একটা লণ্ঠন জ্বলেছিল, তাও দশটা বাজতে না বাজতে নিভে গেল।

নকুড় লুকোনো কেরোসিন কোথায় পাব ছোটোবাবু ! এক টিন দু-টিন যা আনতাম সদর থেকে, তাই কিছু কিছু বেচছি। চালান বন্ধ, সব বন্ধ, মাল পাব কোথা। আপনি যদি বলেন এক বোতল নয় পাঠিয়ে দেব আপনাকে, নিজের জন্য রেখেছিলাম।

ছোটলাল কেবল আমাকে দিলে তো চলবে না নকুড়। কেরোসিন তোমার ঢের আছে আমি জানি। পাঁচ সাতটা গাঁয়ের লোকের তিন চারমাস চলে এত কেরোসিন তুমি লুকিয়ে রেখেছ।

নকুড় কে যে আমার নামে এ সব কথা রটাচ্ছে জানি না, ভগবান তার ভালো করুন। তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করে তো এক ফোঁটা কেরোসিন পেলেন না।

ছোটলাল খুঁজে পাইনি বলেই তো তোমায় আমি ডাকিয়েছি। আমি জানি, কেরোসিন তোমার আছে, কোথায় আছে তাই শুধু জানি না। টাকা তো অনেক করেছ ভাই, এই দুর্দিনে লোকের কষ্ট বাড়িয়ে আর টাকা নাইবা করলে ? কত টাকাই বা হবে ! ভয়ে লোকে, এমনিতেই গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে, কত যে দুর্দশা ভোগ করছে তার হিসাব নেই। তার ওপর তুমি যদি লোকের অসুবিধে বাড়িয়ে দাও, গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব করে তোলো, আরও বহু লোকে পালাবে। অনেকে যাই যাই করেও ঘরবাড়ির মায়া কাটাতে পারছে না, একটা বাস্তব উপলক্ষ পেলেই তাদের মন যাওয়ার দিকে ঝুঁকবে। তুমি সেই উপলক্ষ জুগিয়ো না নকুড়।

নকুড় আপনি আমায় মিছামিছি দুষছেন ছোটোবাবু। কেরোসিন লুকিয়ে রেখেছি বলছেন, একটা লুকোনো টিন বার করে আমায় ধরে এনে জুতো মারুন, জেলে দিন, কথাটি কইব না।

ছোটলাল যারা শুনতে চায়, তাদের এ সব কথা শুনিয়ে খুড়ো। অপরাধ প্রমাণ করে শাস্তি দেবার জন্য তোমায় আমরা ডাকিনি। দশজনের মঙ্গলের জন্য দশজনের হয়ে আমি তোমায় অনুরোধ জানাচ্ছি। দান করলে লোকের পুণ্য হয়। তোমাকে দান করতে হবে না। লুকোনো মাল তুমি উচিত দামে ছেড়ে দাও, দানের চেয়ে তোমার বেশি পুণ্য হবে।

নকড লুকোনো মাল ! লুকোনো মাল ! বারবার এই এক কথাই বলছেন। কোথায় আমার লুকোনো মাল ? কী মাল ? কার কাছে মাল কিনেছি ? চালের বস্তা আর কেরোসিনের টিন কি আকাশ থেকে আমার উঠোনে পড়েছে, না মাটি ভেদ করে উঠেছে ? আমার কি হাজার বস্তা চাল আর হাজার টিন কেরোসিনের ব্যাবসা যে অত চাল আর তেল লুকিয়ে ফেলতে পারব ? আমি চিরদিন ছুটকো ব্যাপারি—দু-চার বস্তা আনি, দু-চার টিন তেল কিনি, তাই খুচরো বিক্রি করি। যে পরিমাণ চাল আর তেলের কথা বলছেন, কিনবার মতো টাকাই আমার নেই।

ছোটলাল তুমি কি একদিনে কিনেছ খুড়ো, অনেকদিন থেকে সঞ্চয় করেছ। বড়ো বড়ো চালান এনেছ, সিকি ভাগও বাজারে ছাড়নি। তোমার ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি খুড়ো, কিন্তু মনুষ্যত্ব একটু দেখাও ? তোমার তো ক্ষতি কিছু নেই। লাভ তোমার থাকবেই। অতিরিক্ত লোভটা শুধু তোমায় ত্যাগ করতে বলছি।

নকুড় বলছেন তো অনেক কথাই ছোটোবাবু—আমি অমানুষ, মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, লোভী, বলতে আর ছাড়লেন কই ! লাভের কথা বলছেন, এ বাজারে চাল ডাল তেল নুন বেচে কি লাভ করার উপায় আছে ছোটোবাবু ? লোকসান দিয়ে শুধু কোনোমতে টিকে থাকা।

ছোটলাল ও তোমার লোকসান যাচ্ছে ! কোনোমতে টিঁকে আছ !

রামঠাকুর নকুড় আমাদের ডুবে গেল ছোটুলাল। টাকায় সব জিনিসে দু-টাকা লাভ হচ্ছে না, একটাকা, দেড়টাকা, পৌনে দু-টাকার মধ্যে লাভটা থেকে যাচ্ছে। ক-মাস আগে কাদেরের কাছে তিন টাকা মন চাল কিনেছিল—ঠিক কেনেনি, বাগিয়ে নিয়েছিল, আমার চোখের সামনে সেই চাল সাত গুণ দরে বিকিয়ে দিয়েছে।

নকুড় ঠাকুরমশায়ের তামাশার আর শেষ নেই।

রামঠাকুর আমার তামাশা নয় নকুড়। তোমার তামাশার প্রতিধ্বনি। দশটা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তুমি যে তামাশা জুড়েছ তাই ভাঙিয়ে দুটো কথা বলেছি আমি। তামাশার কি অন্ত আছে তোমার ! বাইরের দোকানের পিছন দিকের ঘরটাও দোকান করেছ, দু দোকানে বিক্রি করছ সামান্য যা কিছু বিক্রি না করলে চলবে না ভেবেছ, তাই। কাউকে বেচছ

বাইরের দোকানে, কাউকে বেচছ ভেতরে--একজনের বেশি দোকানে যেতে পারছে না। দাম নিচ্ছ যত খুশি—সাক্ষী থাকছে না কেউ। একে বলছ শুধু তোমায় দিলাম—ওকে বলেছ তোমায় দিলাম।

ছোটলাল কিন্তু সাক্ষী ওরা সবাই দিচ্ছে খুড়ো। এ তো আদালতের সাক্ষী দেওয়া নয়, সবাই বলছে তোমার কাণ্ডের কথা। তুমি লোকসান দিয়ে আড়ত চালাচ্ছ তাও জানতাম না খুড়ো। এবার থেকে তোমাকে যাতে আর লোকসান দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

নকুড় [*মৃদু হেসে*] আপনি কী ব্যবস্থা করবেন। এর কোনো ব্যবস্থা হয় না। যে বাজার, কেনা দামে জিনিস বেচলে লোকে নেয় না। কিছু কম দামেই সব ছাড়তে হয়।

ছোটলাল সে আমরা ঠিক করে দেব। জিনিস কিনতে চেয়ে কেউ আর তোমায় জ্বালাতন করবে না, তোমাকেও আর লোকসান দিতে হবে না।

নকুড় [*সচেতন ও সন্দিগ্ধ হয়ে*] কথাটা ঠিক বুঝলাম না ছোটোবাবু।

ছোটলাল কথা খুব সোজা খুড়ো। এ গাঁয়ের বা আশপাশের কোনো গাঁয়ের কেউ আর তোমার কাছে জিনিস কিনে তোমার ক্ষতি করবে না। এক পয়সার জিনিস কিনতেও কেউ যাতে তোমার কাছে না যায় সে ব্যবস্থা করব আমরা।

নকুড় আমায় বয়কট করাবেন ?

ছোটলাল তোমার ক্ষতি বন্ধ করব। তোমার ভালোই হবে। মাল-টাল যদি তোমার লুকোনো থাকত তাহলে অবশ্য তোমার অসুবিধে ছিল। তা যখন নেই, তোমার আর ভাবনা কি ! তোমার অজান্তে তোমার দোকানের লোক যদি কিছু মাল লুকিয়ে রেখে থাকে আশপাশে বেচতে না পেরে হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। সে জন্যে একটু কড়া পাহারার ব্যবস্থাও আমরা করে দেব। তোমার কাছে যেমন দু-এক বছরের মধ্যেও কেউ কিছু কিনতে যাবে না, পাহারাও তেমনি দু-এক বছরের মধ্যে শিথিল করা হবে না।

নকুড় এ তো শত্রুতা ছোটোবাবু।

ছোটলাল চালবাজি কথা ছেড়ে তুমি যদি সোজা ভাষায় কথা কও খুড়ো, তা হলে আমিও স্বীকার করব, এ শত্রুতা। তুমি দেশের লোকের শত্রু, তোমার সঙ্গে শত্রুতাই করব। কিন্তু এ কথাও মনে রেখো খুড়ো, শত্রুতা করতে আমরা চাই না। আমাদের শত্রু করা না করা তোমারই হাতে। লুকোনো মালগুলি ছেড়ে দাও, অন্যায় দামে কিছু বিক্রি কোরো না।

নকুড় আমার মাল নেই। যা বিক্রি করি, উচিত দামেই করি।

ছোটলাল তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ খুড়ো। কেবল আমরা নই, আরও শত্রু তুমি সৃষ্টি করছ চারদিকে। তাদের শত্রুতা যে কি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তোমার সে ধারণা নেই। আমরা তোমার ক্ষতি কিছুই করব না, শুধু তোমার অন্যায় লাভের চেষ্টায় বাধা দেব। অন্য শত্রুরা তোমায় অত সহজে ছাড়বে না খুড়ো। লোকে এমনিতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি যদি এ ভাবে চাল-ডাল তেল-নুন আটকে রেখে, বেশি দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্বহ করে তোলো, একদিন খেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে। সেদিন তোমার গোলা লুট করবে, তোমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

নকুড় আপনার হয়তো তাই ইচ্ছা। সেই চেষ্টাই করেছেন আপনি।

ছোটলাল তাহলে আর তোমায় ডেকে এনে এ সব কথা তবে বলব কেন খুড়ো ? আমার ইচ্ছা, আমার চেষ্টার কথা এ নয়। এ হচ্ছে মানুষের মরিয়া হয়ে, হন্যে হয়ে ওঠার কথা। তুমি তাদের মরিয়া করে, হন্যে করে তুলছ। হাটবাজার, কারবার একরকম বন্ধ তা জানি, মাল চালান একরকম বন্ধ করে দিয়েছে তাও জানি, কিন্তু যা আছে তা কেন লুকিয়ে রাখছ ? আমাদের পাহারা বসার ঠিক আগে ক-রাত তোমার অনেক গাড়ি গাঁয়ে এসেছিল, আমরা জানি। কী এসেছিল তাই জানি না। তুমি ভেবে দ্যাখো, বেশি লাভের আশায় খাদ্য আটকে রাখবে, দরকারি জিনিস আটকে রাখবে, লোকে উপোস করে অসুবিধা ভোগ করে তা সয়ে যাবে, তা কি হয় খুড়ো ?

নকুড় মাল আমার নেই, কিন্তু মাল যদি থাকত, নিজের মাল নিয়ে যা খুশি করার অধিকার আমার থাকত না ছোটোবাবু ? ন্যায্য অধিকার, আইনের অধিকার ? আমার পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস খুশি হলে বেচব, খুশি না হলে বেচব না। যত খুশি দাম চাইব। কিনবার জন্য কারও পায়ে ধরে তো সাধিনি আমি।

ছোটলাল সেধেছ বইকী খুড়ো। এখনও সাধছ ! নইলে কেউ তোমার কাছে কিছু কিনতে যাবে না শুনে টনক নড়ে গেল কেন ?

নকুড় টনক আমার অত সহজে নড়ে না ছোটোবাবু। আমি বলছি ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিতের কথা। আমি কারও ধার ধারি না, কারও চুরি করিনি। আমার পেছনে লাগবেন না ছোটোবাবু।

মধু আর সয় না ছোটোবাবু। দে মশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে আপনি পেরে উঠবেন না। ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের কথা নিয়ে মুখে অত খই ফুটিয়ো না খুড়ো। নিজের পাতে ঝোল টানা সবাই উচিত মনে করে। তোমার নিজের মাল নিয়ে যা খুশি করার অধিকারের কথা বলছ, সবাই সব বিষয়ে অমনি অধিকার খাটালে তোমায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ ? এক বিষয়েই বলি। টাকা জমিয়েছ এক কাঁড়ি, একটা পুকুরও কাটাওনি বাড়িতে। অন্যের পুকুরের জল খাও। যার পুকুর সে যদি আজ তোমায় বলে, আমার পুকুরের জল নিয়ো না ? যদি বলে এক কলসি জলের দাম দশ টাকা, খুশি হলে নিয়ো, খুশি না হলে নিয়ো না, নেওয়ার জন্য তোমার পায়ে ধরে সাধিনি ? তখন তুমি কি করবে শুনি খুড়ো ?

নকুড় তোর কাছে বসে আবোল-তাবোল কথা শুনব।

মধু দে মশায় আগে তোমাকে একদিন বারণ করেছি। আমায় তুই বলা তোমার সাজে না।

নকুড় তাই নাকি মধুবাবু ? আপনাকে সম্মান করে কথা কইতে হবে ? অপরাধ নেবেন না মধুবাবু। আপনি এমন মানী লোক জানতাম না বলে অমর্যাদা করে ফেলেছি। [*উঠে দাঁড়িয়ে*] আমাকে উঠতে হল ছোটোবাবু ! দু-দণ্ড বসে কথা কইবার সময় নেই। কাল ভোর ভোর নন্দপুর যাব। তার আবার হাঙ্গামা অনেক। শম্ভু দাসের মেয়ের সঙ্গে কাল আমার বিয়ে ছোটোবাবু।

ছোটলাল তাই নাকি। নন্দপুর যেতে না যেতে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

নকুড় চুকিয়ে ফেলাই ভালো। যে দিনকাল পড়েছে। আপনাকে নেমন্তন্ন করার স্পর্দা নেই ছোটোবাবু। বাবুলালবাবু স্নেহ করতেন, বাড়িতে কাজকর্ম হলে গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসতেন। সেই ভরসাতেই আপনাকে বলা।

ছোটলাল তোমার বিয়েতে আমি যেতে পারব না নকুড়। ও রকম ভণ্ডামি করা আমার পোষাবে না।

নকুড় আমার অদেষ্ট ! তা, মধুবাবু, আপনাকেও নেমন্তন্ন করে যাই। দয়া করে যদি যান। ঠাকুরমশায়কে তো বলাই বাহুল্য। উনি পুরোহিত হয়ে সঙ্গেই যাবেন।

রামঠাকুর পুরুতগিরি আমি ছেড়ে দিয়েছি নকুড়।

নকুড় আপনিও যাবেন না ঠাকুরমশায় ! আগে যে বলে রেখেছিলেন, আপনাকে পুরুত না করলে ব্রহ্মশাপ লাগবে !

রামঠাকুর তোমার বিয়েতে মন্ত্র পড়লে ব্রহ্মশাপ আমাকেই লাগবে নকুড়।

নকুড় এ কি রকম কথা হল ? আপনাকে পুরুত ঠিক করে রেখেছি, এখন বলছেন যাবেন না !

রামঠাকুর যেতে পারব না বাপু। পুরুতগিরি করা রক্তমাংসে মিশে আছে, কাজে-কর্মে ডাক দিলে দেহেমনে ফুর্তি লেগে যায়। তোমার বিয়েতে পুরুতগিরি করার ডাক শুনে মনটা কেমন দমে গেছে, গাটা ঘিনঘিন করছে।

নকুড় পুরুত অনেক পাব।

নকুড় চলে গেল।

ছোটলাল ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগছে। অজানা অচেনা জায়গায় গিয়ে এত তাড়াতাড়ি শম্ভু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন ?

রামঠাকুর নকুড়ের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে, ওর কি আর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার ক্ষমতা আছে ! যা করাচ্ছে নকুড়।

ছোটলাল কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় লোকটাকে। একদিকে যেমন ভীরু, অন্যদিকে আবার তেমনি একগুঁয়ে। আমার কি মনে হয় জানেন ঠাকুরমশায় ? টাকার চেয়ে দশটা গাঁয়ের লোককে জব্দ করার লোভটাই ওর বেশি। সেই উদ্দেশ্যে মাল লুকিয়ে রেখেছে। ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে বললে বুঝবে। কিন্তু ওর মতিগতিই অন্যরকম। মাল ও সহজে ছাড়বে না।

রামঠাকুর তাই মনে হল। ও ভালো করেই জানে আপনি চেষ্টা করলে ওর দোকানদারি বন্ধ করে দিতে পারেন, মাল যেখানে জমিয়ে রেখেছে সেইখানেই সব পচাতে পাবেন। শুনে ভড়কেও গিয়েছিল, কিন্তু নরম কিছুতে হল না। এ সব লোক একেবারে ভাঙে, মচকায় না।

ছোটলাল হয়তো অন্য কথা ভাবছে। দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ভেবেচিন্তে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে। মাল না সরিয়ে ফেলে সে ব্যবস্থাটা আজ থেকে হওয়া চাই। কাদের, রসুল মিঞাকে কাল সকালে আসতে বোলো তো, মাইতি মশায়ের বাড়ি।

কাদের বলব।

ছোটলাল তোমরাও সবাই এসো। আর এক কথা—বিশেষ দরকারি কথা। নকুড়ের ওপর কোনোরকম মারধোর গালাগালি কেউ করবে না। সবাই মনে রেখো ভাই, ওরা যেন হানা দিয়ে অত্যাচার করার কোনো অজুহাত না পায়, এটা আমাদের দেখা চাই—যত রাগ হোক, যত গা জ্বালা করুক। ঝোঁকের মাথায় কেউ কিছু করব না আমরা।

ছোটলাল, রামঠাকুর, আর মধু ছাড়া সবাই কলরব করতে করতে চলে যায়।

ছোটলাল আমি ভেতর থেকে আসছি।

ছোটলাল ভেতরে যায়।

মধু যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উঠতে বসতে স্বস্তি ছিল না।

রামঠাকুর বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছে নাকি তোমার ?

মধু গাঁ ছেড়ে সবাইকে ফেলে পালাবার কতবড়ো লোভটা ছিল, বামুন পণ্ডিত মানুষ আপনি, আপনি কি বুঝবেন। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করেছি ঠাকুরমশায়। খালি মনে হয়েছে, গেলেই তো হয় নন্দপুর। কার জন্য, কীসের জন্য এখানে পড়ে আছি। এবার থেকে নির্ভাবনা হলাম।

রামঠাকুর মালিকহীন বোঁচকা পড়ে থাকতে দেখলে চোরেরও ওই রকম যন্ত্রণাই হয় মধু। মালিক বোঁচকা দখল করলে চোর যেন বাঁচে।

মধু যা বলেছেন ঠাকুরমশায়।

খাবারের থালা হাতে ছোটলাল এল।

ছোটলাল তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম মধু। শিক্ষিত লোকের মন তো ! সুভাকে খেতে দেখে হঠাৎ মনে পড়ল, তুমিও তো সারাদিন ঘুরেছ, তোমারও খাওয়া হয়নি। [*গলা চড়িয়ে*] জল দিয়ে যেয়ো বাইরে একগ্লাস।

জল নিয়ে সুবর্ণের প্রবেশ।

রামঠাকুর কেমন লাগছে মধু ? ছোটলাল খাবারের থালা বয়ে এনে দিল, বউমা জলের গেলাস এনে দিচ্ছেন ? ছোটোলোক চাষা তুমি, চিরকাল উঠোনের কোণে পাতা পেতে উবু হয়ে বসেছ, বামুন এসে খাবার ছুঁড়ে দিয়েছে পাতে। দেখিস বাবা, লুচি যেন গলায় না ঠেকে, জল খেতে যেন বিষম না লাগে। তোর আবার মন ভালো নয় আজ। আমি আজ উঠি ছোটলাল। সন্ধেবেলা আবার দামোদরের ব্যাপার ঠেলা আছে।

ছোটলাল হ্যাঁ, আসুন। বেলা আর বেশি নেই। আপনার ছেলেকে বলবেন আজ রাত্রে তাকে পাহারা দিতে হবে না। সে যেন ভালো করে ঘুমিয়ে নেয়। আজ আরও তিনজন নাম দিয়েছে। আজিজও বলেছে কাল থেকে পাহারা দেবে। ওর বউয়ের অসুখ কমেছে।

সুবর্ণ দুটো ব্যাচে পাহারা দেবার ব্যবস্থা তুলে দিলে ?

ছোটলাল না, দুটো ব্যাচেই পাহারা দেবে। ওই ব্যবস্থাই ভালো, কারও সারারাত জাগতে হয় না। মোট এখন চব্বিশজন হয়েছে, এক রাতে বারোজন করে পাহারা দেবে। নটা থেকে দুটো পর্যন্ত ছজন, দুটো থেকে ভোর পর্যন্ত ছজন। ছজন করে পাহারা দিলেই চলবে, তার বেশি দরকার নেই। বাকি সকলে রেডি হয়েই ঘুমোবে।

মরার মতো ঘুমোলেও শিঙের শব্দ শুনবে বাবা। যে আওয়াজ তোমার ঠাকুর্দার ওই শিঙের ! শুধু ওরা কেন, গাঁ সুদ্ধ লোক আঁতকে জেগে যাবে।

ছোটলাল সবাই ও শিঙে বাজাতে পারে না। শুনেছি, ঠাকুর্দা যখন আওয়াজ করতেন মনে হত শ-খানেক বাঘ একসঙ্গে গর্জন করছে। মধু বেশ জোরে বাজাতে পারে। ওর আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় আরও জোরে ফুঁ দিতে পারলে কী রকম আওয়াজ হত।

রামঠাকুর কাজ নেই বাবা অত জোরে বাজিয়ে। তোমার পাহারাওয়ালারা যতটুকু জোরে বাজাতে পারবে তাতেই যথেষ্ট হবে। তোমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিঙেতে ফুঁ দেবার চেষ্টা যেন ওরা না করে বাবা, বারণ করে দিও। ওদের তাহলে সত্যি সত্যি শিঙে ফুঁকতে হবে।

রামঠাকুর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, আমিরুদ্দীন তার গায়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করল। পিছনে পিছনে এল কাদের।

আমিরুদ্দীন আল্লার কিরে ছোটোবাবু, আপনি যদি এমন করে মোর পিছে লাগবে, তোমায় আমি জানে মেরে দেব।

কাদের একটু সামলে কথা বলো মিঞা। চোটপাট করো কেন ?

ছোটলাল কী হয়েছে আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন কী হয়েছে জিগেস করছ আপনি কোন মুখে ? আমার ছেলের পেছনে আপনি লেগেছ ক্যানো শুনি ? ছেলেকে নিয়ে আমি যেথায় খুশি যাব, আপনি বারণ করছ কেন ?

ছোটলাল আমি সকলকেই গাঁ ছেড়ে পালাতে বারণ করছি, আমিরুদ্দীন।

আমিরুদ্দীন এ চলবে না ছোটোবাবু। আপনি এমনই বিগড়ে দিয়েছ, ছেলে মোর কথা শোনে না। আজিজ নাকি রাতে গাঁয়ে পাহারা দেবে ? এ সব কি মতলব আপনি দিয়েছ আজিজকে ? বাচ্চা বউ ঘরে একলা পড়ে রইবে, আজিজকে দিয়ে আপনি রাতভোর পাহারা দেওয়াবে তোমার গাঁয়ে ?

ছোটলাল গাঁ কি আমার আমিরুদ্দীন। আজিজ কি আমার বাড়ি পাহারা দেবে ? আজিজ পাহারা দেবে তার নিজের ঘরবাড়ি, নিজের বুড়ো বাপ আর বাচ্চা বউকে। একা নয়, বারোজন মিলে পাহারা দেবে, তাদের পেছনে থাকবে গাঁয়ের সব লোক। এতদিন সারারাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে একরাত শুধু কয়েক ঘণ্টা বাইরে এসে তোমার ছেলে পাহারা দেবে, সবার সাথে তোমরাও যাতে বাঁচো—ওর বুড়ো বাপ, ওর কচি বউ। ওরা হানা দিতে এলে আগে থেকে জানা গেলে কতটা রেহাই হয় সে তো গতবার টের পেয়েছ ? গতবার তবু ভালো ব্যবস্থা ছিল না। এবার আরও আগে আমরা জানতে পারব—মেয়েদের নিয়ে লুকোতে পারব। এ ব্যবস্থা তোমার পছন্দ হয় না আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন আপনার ও সব মতলব আমি বুঝি না ছোটোবাবু। এমনি করে আপনি আজিজকে গাঁয়ে আটকে রাখতে চাও। খাতায় নাম লেখালে, রাতে পাহারা দেওয়ালে, ছেলেমানুষ পেয়ে আপনি ওর দফা নিকেশ করছ। আজিজ পাহারা দেবে না ছোটোবাবু। আমি ওকে পাহারা দিতে দেব না।

ছোটলাল ছেলে তোমার আর ছেলেমানুষ নেই আমিরুদ্দীন। নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়স তার হয়েছে। এতকাল নিজের মতলবে তাকে চালিয়েছ, এবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও ? তুমি আর কদিন বাঁচবে ! তখন কী হবে তোমার আজিজের ? মতলব পাবে কার কাছে ?

আমিরুদ্দীন [*সগর্বে*] আরও বিশ বছর বাঁচব আমি। অনেক জোয়ান মরদের চেয়ে আজও গায়ে বেশি জোর আছে ছোটোবাবু। লাঠির ঘায়ে আজও দশটা মরদকে ঘায়েল করতে পারি।

ছোটলাল মরদের মতো কথা কও তবে। ছেলেকে মেয়েলোকের আড়াল করে না রেখে তাকেও মরদ হয়ে উঠতে দাও।

আমিরুদ্দীন শোনেন ছোটোবাবু। কাল আজিজকে সাথে নিয়ে রসুলপুর যাব। আজিজকে আপনি যদি মানা করবে, ওর মাথা বিগড়ে দেবে এ কথা সে কথা বলে, আপনাকে আমি দেখে নেব। খুন করে ফাঁসি যাব।

কাদের সমঝে কথা বলো মিঞা। চোট করো কেন ?

ছোটলাল নিজের ছেলেকে এত দরদ করো, অন্যের ছেলের জন্য তোমার দরদ নেই কেন আমিরুদ্দীন ? আমায় খুন করেও ছেলেকে তুমি সামলাতে পারবে না। মরদ হবার ঝোঁক তার চেপে গেছে। মরদের কি করা উচিত সে জেনে গেছে।

কাদের ধরে বেঁধে ছেলেকে ও হয়তো নিয়ে যেতে পারবে ছোটোবাবু। আপনি বাধা দেবেন না।

ছোটলাল আমি তো জবরদস্তি কাউকে আটকাইনি কাদের। জবরদস্তি কজনকে আটকানো যায় ?

কাদের ঠিক কথা। কসুর মাপ করবেন ছোটোবাবু, আমিও ভেবেচিন্তে দেখলাম গাঁয়ে আর থাকা উচিত নয়। ওদের সাথে আমিও কাল চলে যাব। মন ঠিক করে ফেলেছি, আমাকে আর থাকতে বলবেন না।

ছোটলাল যা বলার ছিল আগে অনেকবার তোমায় বলেছি কাদের।

কাদের তাই তো আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারলাম না। নয় তো চুপে চুপে পালিয়ে যেতাম। আপনি সব ঠিক কথাই বলেছেন। পালিয়ে যাওয়া স্রেফ বোকামি হবে। কিন্তু সবাই যদি থাকে তবে না গাঁয়ে থাকা যায়। সবাই যদি পালায় দু চারজন থেকে মুশকিলে পড়ব।

ছোটলাল [*চিন্তিতভাবে*] হঠাৎ তোমার মত বদলাবার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সবাই তো পালায়নি কাদের! দু চারজন মোটে গেছে।

কাদের আরও যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে গাঁ খালি হয়ে যাবে। তখন হয়তো আর পালাবার ফুরসত মিলবে না। তার চেয়ে সময় থাকতে পালানোই ভালো।

ছোটলাল তাই দেখছি।

কাদের [*অপরাধীর মতো*] কসুর নেবেন না ছোটোবাবু। যেতে মন চায় না। গিয়ে কী মুশকিলে পড়ব ভাবলে ডর লাগে। কিন্তু উপায় কি বলেন? বাঁচা তো চাই।

ছোটলাল কত চেষ্টায় সকলের ভয় অনেকটা কমানো গেছে। তোমরা গেলে আবার সকলের ভয় বেড়ে যাবে। আবার সবাই দিশেহারা হয়ে উঠবে। তোমাদের কেন যে—

আমিরুদ্দীন ওসব শুনতে চাই না ছোটোবাবু।

কাদের আর কিছু বলবেন না ছোটোবাবু।

ছোটলাল না, আর কিছু বলব না তোমাদের। রসুলপুরে তোমার কে আছে আমির? কার কাছে যাবে?

আমিরুদ্দীন আমার জামাই আছে, নাম খলিল। আমাদের খুব খাতির করে। আমরা গেলে বড়ো খুশি হবে ছোটোবাবু।

আজিজের প্রবেশ

আজিজ [*আমিরুদ্দীনকে*] বাড়ি এসো শিগগির। খলিল এসেছে।

আমিরুদ্দীন খলিল। খলিল কোথা থেকে এল?

আজিজ রসুলপুর থেকে আবার কোথা থেকে?

আমিরুদ্দীন খলিল এল কেন রসুলপুর থেকে? আমরা তো যাব রসুলপুরে তার কাছে। আমাদের নিতে এসেছে হবে, অ্যাঁ?

আজিজ উঁহুক। পালিয়ে এসেছে। বাপ দাদা সবাইকে নিয়ে।

আমিরুদ্দীন আমিনা?

আজিজ আরে, সব চলে এল, আমিনাকে কি ফেলে রেখে আসবে? আমিনা এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা সব এসেছে। দুটো বাচ্চার বেদম জ্বর।

কাদের ওরা পালিয়ে এসেছে কেন?

আজিজ মজিলপুরে ঘাটি পড়েছে মস্ত।

কাদের মজিলপুর তো দূর আছে রসুলপুর থেকে।

আজিজ দূর হলে কি হবে, সবাই আরও দূরে ভাগছে।

আজিজের সঙ্গে আমিরুদ্দীন চলে গেল।

কাদের আমি তবে কী করব ছোটোবাবু!

ছোটলাল তুমিও কি রসুলপুর যাচ্ছিলে নাকি ?

কাদের না, কিন্তু আমি যেখানে যাব সেখান থেকেও সবাই যদি পালিয়ে থাকে ! যার কাছে যাব, গিয়ে যদি দেখি সে নেই ! যদি বা থাকে, আবার দুদিন পরে ফের সেখান থেকে যদি অন্য কোথাও পালাতে হয়।

ছোটলাল তুমিই ভেবে দ্যাখো কী করবে ?

কাদের তবে কি যাব না ছোটোবাবু ?

ছোটলাল তুমিই বুঝে দ্যাখো।

কাদের ওই আমিরুদ্দীন বলে বলে মনটা বিগড়ে দিয়েছে ছোটোবাবু। ও তো আর যাবে না। আমিই বা তবে কেন যাব মিছামিছি !

ছোটলাল [*হেসে*] যেও না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে উশখুশ করে লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে কাদের চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্বের দৃশ্য। রামঠাকুর লিখছে। সুভদ্রা, সুবর্ণ, ছোটলাল ও মধু।

সুবর্ণ সারাদিন ঠাকুরমশায়কে দিয়ে তুমি কী অত লেখাচ্ছ বলো তো ?

ছোটলাল কতগুলি লিস্ট তৈরি করতে দিয়েছি।

সুবর্ণ কীসের লিস্ট ?

ছোটলাল গ্রাম মৈত্রী সংঘের লিস্ট। প্রত্যেকটি গ্রামকে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হতে হবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে একটা যোগাযোগ না থাকলেই বা চলবে কি করে। আমি এই যোগাযোগটা গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি।

সুবর্ণ কি রকম যোগাযোগ ?

ছোটলাল মিলেমিশে পরামর্শ করে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়া, পরস্পরকে সাহায্য করা। সংঘের প্রত্যেকটি গ্রাম সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ অন্য প্রত্যেকটি গ্রামের জানা থাকবে: লোকসংখ্যা, বাড়িঘরের সংখ্যা, স্বাস্থ্যের অবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পথঘাট, যানবাহন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ। এক গ্রামের খবরাখবর নিয়মিতভাবে অন্য গ্রামে যাবে। হাটে নানা গ্রামের লোক জড়ো হয়, প্রত্যেক হাটে সভা করা হবে। মানুষ একা হলে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে করে। আমার সম্পদ আমার একার—এই কথা ভাবতে ভাবতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে দেশের বিপদ ঘনিয়ে এলেও না ভেবে পারে না বিপদও তার একার। অন্ধকার পথে অজানা অচেনা একজন মানুষ সাথি থাকলে ভীরু লোকেরও ভূতের ভয় কমে যায়। গ্রামের সকলে মিলেমিশে দুর্দিনকে বরণ করতে তৈরি হয়ে আছে জানলে গ্রামের প্রত্যেকের ভয় কমবে—দশটা গ্রাম মিলেছে জানলে বুকে সাহস জাগবে। সকলের বুকে এই সাহস জাগানো দরকার। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থকে স্পষ্ট অনুভব করিয়ে দিতে হবে। শুধু তার প্রতিবেশী নয়, নিজের গ্রামের লোক শুধু নয়, বিশ মাইল দূরের অজানা গ্রামের অচেনা অধিবাসীও তার সঙ্গী, তার সহায়—পথ যত অন্ধকার হোক, সব কিছুকে সে ড্যামকেয়ার করতে পাবে।

সুভদ্রা এক গ্রামের লোককে আর এক গ্রামে নিয়ে যাবার কি একটা স্কিম করেছ, ও ব্যবস্থাটা আমি ভালো বুঝতে পারিনি দাদা। এদিকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বারণ করছ, আবার ওদিকে গ্রামকে গ্রাম উজার করে অন্য এক গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করছ। কেমন খাপছাড়া ঠেকছে আমার।

মধু আমিও ভালো বুঝিনি ছোটোবাবু।

ছোটলাল কোথায় কি গুজব শুনেছিস, তাই খাপছাড়া ঠেকছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে অন্য গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কিছুই হয়নি। মানুষ যাতে আরও নিশ্চিন্তমনে নিজের গ্রামে নিজের বাড়িতে থেকে চাষবাস কাজকর্ম করতে পারে তারই একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। অতি সহজ ব্যবস্থা, গ্রাম মৈত্রী সংঘ গড়ে তোলার ফলে আরও সহজ হয়ে গেছে। সংঘের একটা নিয়ম—দরকার হলে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোককে আশ্রয় দেবে, নিজেদের বেশি অসুবিধা না ঘটিয়ে যত লোককে আশ্রয় দেওয়া যায়। দরকার হলে, সত্যিসত্যি দরকার হলে অবশ্য। মনে করো তোমার বাড়িতে একখানা বাড়তি

ঘর আছে, দরকার হলেই ঘরখানা তুমি শ্যামপুরের একটি পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে। মনে করবে বাড়িতে তোমার কোনো আত্মীয় এসেছে। কোন গ্রামে কত বাড়তি লোক গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার মোটামুটি একটা হিসেব আমরা করে রেখেছি। সেই হিসেব মতো এক গ্রামের লোককে সরিয়ে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি দরকার হয়—সত্যিসত্যি যদি দরকার হয়।

সুবর্ণ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। জানা নেই শোনা নেই কারা কোথা থেকে এসে হাজির হবে, তাদের কুটুমের মতো আদর করে বাড়িতে রাখতে হবে। এ ব্যবস্থায় কেউ রাজি হবে না।

ছোটলাল সংঘে এখন তেরোটা গ্রাম, প্রত্যেক গ্রামের লোক এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। খুব খুশি হয়ে মেনে নিয়েছে, মেনে স্বস্তি বোধ করছে। আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন তো শুধু নয়, পাওয়ার প্রশ্নও আছে কিনা। যারা হয়তো বাড়িঘর ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পালাবে না, তারাও চায় যে দরকার হলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মা বউ আর বোন যাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে তাব একটা ব্যবস্থা থাক। বহু বড়োলোকে দূরে পশ্চিমে বাড়ি ভাড়া করে রেখে মাসে মাসে ভাড়া গুনে চলেছে, গরিবের কি ইচ্ছা হয় না তারও ও রকম একটা যাওয়ার জায়গা থাকে ? আমাদের ওই রকম একটা যাবার জায়গার ব্যবস্থা সকলের জন্য করা হয়েছে। সকলে তাই আগ্রহের সঙ্গে ব্যবস্থাটা বরণ করে নিয়েছে। যে গাঁয়ে হানা দিচ্ছে সে গাঁ ছেড়ে পালাবার হিড়িক উঠেছিল, সে ঝোঁক লোকের কিছুতেই যেন কমানো যাবে না মনে হয়েছিল। এই ব্যবস্থার কথা জানবার পর সকলে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। তাদের বলা হয়েছে, ঘরবাড়ি ফেলে কেউ পালিয়ো না। তাব কোনো দরকার নেই। যদি দরকার হয় আমরাই তোমাদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। সাত মাইল দূরে এক গ্রামে পালাতে চাইছ সেখানে জলের অভাব আর কলেরার প্রকোপ, আমরা তোমাদের বিশ মাইল দূরের গ্রামে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমার থাকবার জন্য ঘর ঠিক করা আছে তুমি পৌঁছানো মাত্র তোমার জন্য হাঁড়িতে চাল দেওয়া হবে। প্রথমে লোকের একটু খটকা বাঁধে। তারপর যখন গ্রামের নাম, গৃহস্থের নাম, বাড়িতে ঘরের সংখ্যা, এই সব বিবরণ লিস্ট থেকে পড়ে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস জন্মে। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা কালো পর্দা যেন সরে গেল। অবশ্য একটু রিসক্ যে নিতে হবে সেটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ যদি কোনো গাঁয়ে এসে ওরা হানা দেয়, কিছুই টের পাওয়া যায় না আগে থেকে, তবে অবশ্য কিছু করার নেই। তবে এ কথাটাও ভাবতে হবে যে কবে কোন গাঁয়ে হাজির হবে তাও কিছু ঠিক নেই।

মধু সবাই ভিটেমাটি আঁকড়েই পড়ে থাকতে চায়। যেতে হবে ভাবলে সবারই মন কেমন করে। একটু ভরসা পেলে, উৎসাহ পেলে, একেবারে বর্তে যায়।

ছোটলাল ভিটেমাটির মায়া এ দেশে সংস্কারের মতো, মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। সাত পুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। শহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়িতে বাস, বড়ো জোর একপুরুষের তৈরি বাড়িতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।

সুবর্ণ তা সত্যি। দু-এক বছর পরে পরেই বাবা দেশের বাড়িতে ছুটে যেতেন। কিন্তু ঠাকুরমশায়কে এবার তুমি ছুটি দাও। লিখে লিখে ওঁর নিশ্চয় হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

ছোটলাল আপনার কতদূর হল ঠাকুরমশায় ? কপিগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবেন তো ?

রামঠাকুর [*মুখ না তুলেই*] পাঁচসুকিয়া আর লাটুপুর মোটে এই দুটি গাঁয়ের লিস্ট বাকি। আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।

ছোটলাল সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উপায় কী। আজকেই সোনাপুরের সতীশবাবুকে কপিগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে। আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে আমার কাজে লেগে যাবেন, ভাবতেও পারিনি ঠাকুরমশায়। আপনি যে বসে বসে এমন কলম পিষতেও পারেন, তা জানতাম না।

রামঠাকুর না লিখে না লিখে লিখতেই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। কম্মো তো পুঁথি সামনে খুলে রেখে যা মুখে আসে বিড়বিড় করে বলা। অতবড়ো পণ্ডিত পিতা যে স্কুলে আর বাড়িতে পড়িয়ে বিদ্যা দিয়েছিলেন, এতদিন পরে একটু কাজে লাগল।

ছোটলাল ফ্যাসাদ হল রাখাল ছোঁড়ার জন্য। আজ সকালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিছু না বলে কয়ে ভোরে সে হঠাৎ বাড়ি চলে গেছে। ওর মার নাকি মরমর অবস্থা।

রামঠাকুর মা ওর ভালোই আছে। আমিও ছুটে গিয়েছিলাম, শেষ মুহূর্তে স্বর্গের যাবার ভাড়া হিসেবে কিছু পুণ্য আর পায়ের ধুলোটুলো দিয়ে—ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোই পুণ্যের সমান—কিছু যদি আদায় করতে পারি। তা একটা নারকোল, কটা বাতাসা আর পাঁচটি পয়সা দিয়ে যাত্রা শুভ করিয়ে নিলে !

ছোটলাল কীসের যাত্রা ?

রামঠাকুর ছেলেকে নিয়ে পানাগড় যাবে। এমনি দুবার ডেকে পাঠিয়েছিল, ছেলে যায়নি। তাই খবর পাঠিয়েছিল কলেরা হয়েছে।

ছোটলাল একবার বলে গেল না। মধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, জানত। আমি দশজনকে পালাতে মানা করছি, আমার নিজের লোক এদিকে পালাচ্ছে। এত করে শেখালাম পড়ালাম রাখালকে, একবার জানিয়ে পর্যন্ত গেল না।

রামঠাকুর খবরটা পেয়ে ছোঁড়া একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে।

ছোটলাল [*ক্ষুব্ধভাবে*] দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে, না ? একটু কিছু ঘটলেই সকলে দিশেহারা হয়ে যায়। কোনোদিন কিছু ঘটে না কিনা, সকলের তাই এই দশা। চোখ কান বুজে কোনোমতে খেয়ে পরে নির্বিবাদে দিন কাটাতে কাটাতে মনের বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। মার মরমর অবস্থা শুনে মাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না, মা মরে যাবে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। আমাদের এ কী অভিশাপ বলুন তো ? গাঁয়ে পাহারা দেবার জন্য যখন নাম চেয়েছিলাম, সকলে আঁতকে উঠেছিল।

মধু মুখ্যু লোক সব, চিরকাল মার খেয়ে আসছে, অল্পেই ভড়কে যায়। কথায় কথায় আঁতকে উঠবার ভাব অনেকটা কিন্তু কেটে গেছে। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকত, কী করবে জানত না, কিছুই বুঝতে না। কী যে ভাববে কেউ ঠিক করে উঠতে পারত না। একটু একটু ভাবতে শুরু করেই অনেকে ধাতস্থ হয়েছে।

রামঠাকুর ঊর্ধ্বশ্লেষ্মার চেয়ে সহজ চিকিৎসা।

মধু এক হিসেবে সহজ আবার এক হিসেবে ভীষণ কঠিন ঠাকুরমশায়। প্রত্যেকে দশ-বিশ গন্ডা সৃষ্টিছাড়া কথা জিগেস করবে, জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত। তার আবার অর্ধেক কথার জবাব হয় না।

ছোটলাল তবু তোমার জবাব ওরা ভালো বোঝে মধু। আমি এত পরিষ্কার আর সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি, মুখ দেখেই টের পাই সব কথা মাথায় ঢুকছে না। তুমি জড়িয়ে পেঁচিয়ে সেই কথাই বলো, সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মধু আমিও মুখ্যু, ওরাও মুখ্যু, তাই আমার কথা সহজে ধরতে পারে।

ছোটলাল [*হেসে*] মনে হল যেন গাল দিলে মধু।

মধু না, ছোটোবাবু। আপনার কথাই তো আমি বলি, একটু অন্যভাবে বলি। আপনি কত পড়াশোনা করেছেন, কত ভাবেন, সব কথা নিখুঁতভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে বলতে পারেন। এরা জন্মে থেকে উলটোপালটা এলোমেলো করে সব ভাবতে শিখেছে, গুছিয়ে কিছু বললে বুঝতে পারে না, হাঁ করে থাকে। বেশি বেশি চাষ করা দরকাব কেন কানাইকে কাল তা অত করে বোঝালেন, লংকার খেতে মুগকলায়ের চাষ করতে বললেন। আমি মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, ব্যাটা কিছু বোঝেনি। চালের চালান বন্ধ, ভাত কমিয়ে ডালটাল বেশি খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে, বিশ মন লংকার চেয়ে একসের মুগকলাই মানুষের বেশি দরকারি, এ সব কথা কি ওর মাথায় ঢোকে ! ওর মাথায় শুধু ঘুরছে, খেতে লংকা ভালো ফলে, মুগকলাই সুবিধা হয় না, তবু কেন লংকার বদলিতে মুগকলায়ের চাষ করবে ! রাত হলে বাড়ি ফিরে দেখি ধন্না দিয়ে বসে আছে। আমায় দেখেই ভয়ে ভয়ে বলল, কিছু তো বুঝলাম না মধু। মুগকলাই দিলে যা ফসল হবে, লংকা বেচে তার দুগুণ বাজারে কিনতে পাব। ছোটোবাবু মুগকলাই বুনতে তবে বলেন কেন ? আমি বললাম, ওরে গোমুখ্যু, শোন। ঘরে তোর অতিথ্ এল। দুদিন খায়নি। তুই এক ডালা লংকা আর চাট্টি ভেজানো মুগ সামনে ধরে জিগেস করলি, ওগো অতিথ্মশায়, পেট ভরে লংকা খাবে না এই দুটিখানি মুগ ভেজানো চিবোবে ? অতিথ্ কী করবে বল তো ? তারপর বললাম, লংকা নিয়ে হাটে বেচতে গেলি, গিয়ে দেখলি হাটে শুধু তুই আছিস আর আছে জগন্নাথের বাপ, কলাই বেচতে এসেছে।---

রামঠাকুর মোটে দু জন জিনিস বেচতে গেছে, সে কেমন হাট মধু ?

মধু ওমনি করে না বললে আসল কথাটা ওরা ধরতে পারে না ঠাকুরমশায়। শুনুন তারপর, কানাইকে কী বললাম। বললাম, হাটে একজন খদ্দের এল। বাড়িতে তার চাল বাড়ন্ত, ডাল বাড়ন্ত, গাছের পাতা খেতে হবে এই অবস্থা। তুই খদ্দেরকে ডেকে বললি, নেন নেন, বড়ো বড়ো ভালো লংকা নেন, চার আনায় বিশ মন লংকা দেব। জগন্নাথেব বাপ তাকে বলল, ভাঙা বোরা পোকায় ধরা কলাই বটে, আট আনায় একসের পাবে, খুশি হয় নাও, নয় বাড়ি ফিরে যাও ! খদ্দের তখন কী করবে রে কানাই ? চার আনায় তোর বিশ মন লংকা নেবে, না আট আনায় পোকা ধরা একসের কলাই নেবে ? কলাই না নিয়ে গেলে কিন্তু ছেলেমেয়েকে তার গাছের পাতা খাওয়াতে হবে বাড়ি ফিরে। কানাই তখন বলল, অ ! তবে তো ছোটোবাবু খাঁটি কথাই বলেছেন।

ছোটলাল এই জন্যই আমরা দেশের জনসাধারণের কিছু করতে পারি না, শুধু বক্তৃতা দিয়ে মরি। শেষে রাগ করে বলি, এদের কিছু হবে না, স্বয়ং ভগবানও এদের জন্য কিছু করতে পারবেন না।

রামঠাকুর তা পারেনওনি। অবতার হয়ে কমবার তো ভগবান জন্মাননি এ দেশে !

মধু যা কিছু করার আপনারাই করতে পারেন ছোটোবাবু। তবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে করা দরকার, নইলে ফল হয় না। আপনি আমাদের মনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে আরম্ভ করেছেন, অল্পদিনেই আপনার সরগড় হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের ভাষাতেই কথা কইতে পারবেন।

ছোটলাল আট আনা দিয়ে পোকায় ধরা কলাই কিনতে বললে কিন্তু চলবে না মধু। এক পয়সা বেশি দাম দিয়ে কেউ কিছু যাতে না কেনে সেই কথাই সকলকে আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

মধু [*হেসে*] ও রকম বলায় ক্ষতি হয় না ছোটোবাবু। জিনিসের জন্য বেশি দাম না দেওয়া ভিন্ন কথা, ওটা কানাইকে বুঝতে হলে ভিন্ন ভাবে বোঝাতে হত। ও তখন লংকার খেতে মুগকলাই বুনবার কথা ভাবছে, সব কথায় ওই এক ছাড়া অন্য মানে তার কাছে ছিল না। কানাইকে ডেকে জিগেস করুন, আপনি আর আমি ওকে কী বলেছিলাম। কানাই জবাব দেবে, লংকার বদলে মুগকলাই চাষ করতে বলেছিলাম। তার বেশি একটি কথাও স্মরণ করে বলতে পারবে না।

ছোটলাল তা ঠিক। এটা খেয়াল হয়েছে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কখনও করিনি। বেফাঁস কিছু বলার ভয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকি, ওরা কিন্তু ঠিক মর্ম কথাটি গ্রহণ করে, পণ্ডিতের মতো আসল কথাটি তাকে তুলে রেখে কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে তর্ক করে না। কানাই খেয়াল করেনি হাটে মোটে দুজন লংকা আর কলাই বেচতে যায় না, শুনেই কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের টনক নড়ে গিয়েছিল। এতবড়ো কথার ভুল ! কিন্তু তুমি এবার বাড়ি যাও মধু। সারাদিন অনেক ছুটোছুটি করেছ। তোমার কিছু হলে আমি পড়ব মুশকিলে।

মধু আমার কিছু হবে না ছোটোবাবু। লিস্টগুলো সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাব।

ছোটলাল কেষ্টকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি বাড়ি যাও।

মধু আমি নিয়ে যাই। সোনাপুরে আমার একটু দরকারও আছে।

ছোটলাল [*চিন্তিতভাবে*] *দুদিন থেকে তোমার কী হয়েছে বলো তো ? পেটুক যেমন সন্দেশ চায় তুমি তেমনি ছুটোছুটি করবার জন্য কাজ চেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ। এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে হলে ছটফট করতে থাক।*

রামঠাকুর কাল যে শম্ভুর মেয়ের বিয়ে হলে গেল নকুড়ের সঙ্গে।

ছোটলাল [*আশ্চর্য হয়ে*] তাই নাকি ? এ কথা তো জানতাম না মধু, ভেবেছিলাম, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল, সেটা ভেঙে গেছে, আর কিছু নয়।

মধু তা ছাড়া আবার কি ? ঠাকুরমশায় তামাশা করছেন।

রামঠাকুর ঠাকুরমশায়ের তামাশার চোটেই দুদিনে মুখ চোখ তোমার বসে গেছে। পরশু-সন্ধ্যায় নকুড় বিয়ের খবরটা জানিয়ে যাওয়ার পর থেকে গায়ে বিছুটি লাগা লোকের মতো তিড়িং তিড়িং নেচে নেচে বেড়াচ্ছে !

মধু হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সে অপদার্থ মেয়ের জন্য নেচে বেড়াব। ভয়ে যে গাঁ ছেড়ে পালায়—

ছোটলাল তার দোষ কি মধু ? শম্ভু জোর করে নিয়ে গেলে সে কী করবে।

মধু গোঁ ধরতে পারল না ? বাপের আহ্লাদি মেয়ে, যেতে না চাইলে তার সাধ্যি ছিল ওকে নিয়ে যায়। আসলে ওর ইচ্ছে ছিল বড়ো লোকের বউ হবে।

রামঠাকুর সমস্যায় ফেলে দিলে বাপু। ভয়ে না, বড়োলোকের বউ হবার লোভে মেয়েটা গাঁ ছাড়ল—

নকুড়ের প্রবেশ।

আরে, বলতে বলতে স্বয়ং নকুড় এসে হাজির যে।

নকুড় পদ্মাকে কোথা রেখেছিস মধু ?

মধু তুই তোকারি কোরো না দে মশায়। অনেক বারই তো বলে দিয়েছি।

নকুড় চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা ! তোকে আবার আপনি বলতে হবে ! শম্ভুর মেয়েকে চুরি করে কোথায় লুকিয়েছিস বল শিগগির।

মধু [*নকুড়ের গলা ধরে*] চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা আগে তোমার দাঁত কটা ভাঙবে, গাল দেওয়ার জন্য—

মুখে ঘুঁষি মারতে নকুড়ের একপাটি বাঁধানো দাঁত ছিটকে পড়ল।

রামঠাকুর বাঁধানো দাঁত ! চুকচুক !

মধু এ গেল গালাগালির জবাব। এবার জিগেস করব, পদির কী হল। না যদি বলো এক্ষুনি সত্যি কথা দে মশায়—

ছোটলাল ছেড়ে দাও মধু। লোকে ভাববে গায়ের ঝাল ঝাড়ছ।

মধু নকুড়কে ছেড়ে দিয়ে সবে দাঁড়াল।

[*নকুড়কে*] গায়ে জোর নেই, মনে সাহস নেই, রাগ সামলাতে পার না ? কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো মানুষকে গালাগাল দাও কেন ? গোঙিয়ো না বাপু, বেশি তোমার লাগেনি। বাইরে বালতিতে জল আছে, দাঁত কটা ধুয়ে মুখে লাগিয়ে এসো।

নকুড় দাঁত কুড়িয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

মধু কেমন রাগ হয়ে গেল ছোটোবাবু। নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

ছোটলাল ও রকম হয়।

মধু দিদি আর বউঠান দাঁড়িয়ে আছেন মনেই ছিল না।

সুভদ্রা শহুরেপানা শুরু কোরো না মধু। পদ্মার কী হয়েছে জানবার জন্য মনটা ছটফট করছে।

সুবর্ণ দাঁত লাগাতে কতক্ষণ লাগাচ্ছে দ্যাখো !

নকুড় ফিরে এল।

ছোটলাল পদ্মার কী হয়েছে নকুড় ?

নকুড় কাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কটমট করে মধুর দিকে তাকাল।

সুবর্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? সে কি !

সুভদ্রা কাল না বিয়ের কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

ছোটলাল বিয়ে হয়নি ?

নকুড় [*হঠাৎ ক্রুদ্ধভাব ত্যাগ করে কাতরভাবে*] কই আর হল ছোটোবাবু, বিয়ের ঠিক আগে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। [*আবার মুখ কালো করে, কটমট করে মধুর দিকে তাকিয়ে*] ওর কাজ। নিশ্চয় ওর কাজ। কতকাল থেকে দুজনে—

ছোটলাল এবার মধু তোমায় যত মারুক, আর কিন্তু আমি থামতে বলব না, খুন করে ফেললেও না। বড়ো বেয়াদপ তুমি, মাথা ঠান্ডা রেখে কথা কও।

রামঠাকুর বিয়ে হয়নি নকুড় ? চুকচুক। হোক না কলিকাল, ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয় হে বাপু !

ছোটলাল মধু কিছু করেনি নকুড়। ও কিছুই জানে না। কদিন নিশ্বাস ফেলার সময় পায়নি। ওর কদিনের চব্বিশ ঘণ্টার সমস্ত গতিবিধির খবর আমি রাখি।

নকুড় ও কি আর নিজে গিয়ে শম্ভুদাসের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ছোটোবাবু, অন্যকে দিয়ে সরিয়েছে। আগে থেকে যোগসাজশ ছিল। যাবার দিন একবার পদ্মা পালিয়ে এসেছিল, শম্ভু নিজে এসে ধরে নিয়ে যায়। তখনই দুজনের পরামর্শ হয়েছিল।

ছোটলাল আন্দাজে আবোল-তাবোল বোকো না। আর তাও যদি হয় নকুড়, সে মেয়ে যদি ওর দিকে এমন করে ঝুঁকেছে জানো, ওকে তুমি বিয়ে করতে গিয়েছিলে কি বলে ?

নকুড় আগে কি জানতাম। এ সব ওর আমাকে জব্দ করার ফন্দি। আমাকে জব্দ করবে বলে এই বুদ্ধি খাটিয়েছে। নইলে এতদিন মেয়েকে সরাতে পারত না, বিয়ের রাত্রির জন্য

অপেক্ষা করে থাকত ? দশজনের কাছে আমার যাতে মাথা হেঁট হয়, সবাই যাতে আমাকে টিটকারি দেয়···

রামঠাকুর তা এমনিতেই সবাই দেয় নকুড়। এবার থেকে নয় একটু বেশি করেই দেবে। চামড়া তোমার মোটা আছে।

নকুড় চুপ করুন ঠাকুরমশায়। এর মধ্যে আপনিও আছেন।

রামঠাকুর আছিই তো। আমিই তো ব্রহ্মশাপ দিয়ে বিয়েটা ফাঁসিয়ে দিলাম।

নকুড় বাজে কথা বলেন কেন ঠাকুরমশায় ? বাজে কথার ধাপ্পায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আপনি সব জানতেন। নইলে পরশু বিয়েতে যাবার নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিতেন না। বিয়ে পণ্ড হবে জানা না থাকলে পাওনা গন্ডার লোভ সামলানো আপনার কম্মো নয়।

রামঠাকুর তুমি দেখছি ন্যায়শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত নকুড়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে কথা কইতে জানো। প্রমাণ জ্ঞানও তোমার প্রচণ্ড। প্রমাণ যখন আছে, থানায় নালিশ ঠুকে দাও না ? বিয়ের কনে চুরি করার অপরাধে আমি আর মধু অসময়টা নিশ্চিন্ত মনে জেলে কাটিয়ে দিই। এ উপকারটা যদি কর, তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করব—সুমতি হোক, সুমতি হোক।

নকুড় [*রাগে কাঁপতে কাঁপতে*] জেলে না পাঠাতে পারি সহজে আপনাকে ছাড়ব ভাববেন না ঠাকুরমশায়। [*মধুকে*] তোকে আমি দেখে নেব মধু। বাবুলালবাবু থাকলে আজ এইখানে তোর পিঠের ছাল তুলে দিতাম। বড়োবাবু নেই তাই বেঁচে গেলি। কিন্তু আমি তোকে দেখে নেব।

মধু [*শান্তভাবে*] আর একবার তুই তোকারি করলে চোখে অন্ধকার দেখবে।

তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে নকুড় চলে যাচ্ছিল, ছোটলাল তাকে ডাকল।

ছোটলাল একটা কথা শুনে যাও নকুড়। তোমায় অত করে বলেছিলাম, তুমি মোটে পাঁচ বস্তা চাল আর পাঁচ টিন কেরোসিন বার করেছ। বেশি বেশি দাম যেমন নিচ্ছিলে তেমনই নিচ্ছ।

নকুড় এই কি আপনার ও সব কথা বলার সময় হল ছোটোবাবু ?

ছোটলাল কথাটা কি কম দরকারি ?

নকুড় আমার আর মাল নেই।

ছোটলাল আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি নকুড়। তুমি নিজের সর্বনাশ টেনে আনছ। সবাই জানে তোমার অনেক চাল আর তেল মজুত আছে। দশটা গাঁয়ের সবাই শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলে নয় নকুড়।

নকুড় চোর ডাকাত গুন্ডা অনেক আছে জানি। কিন্তু আমি কী করব। আমার আর কিছু নেই। আপনি যদি দশজনকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেন—

ছোটলাল আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না।

নকুড় চলে গেল।

সুবর্ণ কী আশ্চর্য মানুষ তুমি ! কাল থেকে পদ্মার খোঁজ নেই, তুমি তেল আর কেরোসিনের আলোচনা আরম্ভ করলে।

সুভদ্রা পদ্মার খোঁজ করা আগে দরকার দাদা।

ছোটলাল তাই ভাবছি। খোঁজাখুঁজি অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয়। শম্ভু চুপ করে বসে নেই। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। নন্দপুরে একজন লোক পাঠানো দরকার। সেখানে ইতিমধ্যে কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা খবর নেওয়া দরকার। সব বিবরণ ভালো করে জানা দরকার। [*সহানুভূতির সুরে*] আমার কি মনে হয় জানো মধু ? এর মধ্যে পদ্মাকে হয়তো পাওয়া গেছে।

মধু ও যা কাঠখোট্টা শক্ত মেয়ে, নন্দপুরে যদি নাও ফিরে থাকে, অন্য কোথাও কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি হাজির হয়েছে নিশ্চয়। পুকুরে ডুবে টুবে মরেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না ছোটোবাবু। আমার বিশেষ ভাবনা হয়নি।

ছোটলাল তা দেখতেই পাচ্ছি।

রামঠাকুর ভাবনার অভাবে মাথা ঘুরে বসে পড়েছ।

মধু আপনার হয়েছে ঠাকুরমশায় ? হয়ে থাকলে কাগজগুলো দিন। আমি একবার সোনাপুর ঘুরে আসি ছোটোবাবু।

সুবর্ণ বাহাদুরি কোরো না মধু। মেয়েটার খোঁজখবর না নিয়ে তুমি সোনাপুর ছুটবে কি রকম ? সতীশবাবুর কাছে লিস্ট নিয়ে যাবার লোক আছে।

মধু সোনাপুর একবার আমার যেতে হবে বউঠান। সেখানে আমার একটি জানা লোকের আজ নন্দপুর থেকে ফেরার কথা। তার কাছে খবর জেনে আসব।

সুভদ্রা তা হলে যাও। লিস্টের জন্য দেরি করে দরকার নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।

রামঠাকুর আমার হয়ে গেছে। [*কতগুলি কাগজ গুছিয়ে ছোটলালের হাতে দিল। ছোটলাল সেগুলি দেখে ভাঁজ করে মধুকে দিল*] লিস্ট খুব তাড়াতাড়ি সোনাপুর পৌঁছানো চাই ছোটলাল।

সুবর্ণ ঠাকুরমশায়, কিছুই কি আপনাকে বিচলিত করতে পারে না ? কোনোদিন দেখলাম না কোনো ব্যাপারে আপনার হাসি তামাশার ভাবটা একটু কমেছে। অথচ কোনো ব্যাপার যে তুচ্ছ করেন তাও নয়।

রামঠাকুর বিচলিত হয়ে পড়ার ভয়ে তো হাসি তামাশা বজায় রেখে চলি, বউমা। আগে যথেষ্ট বিচলিত হতাম, নিজের ব্যাপারে পরের ব্যাপারে, সব ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম গরিব পুরুত বামুনের অত বিলাস পোষায় না। তারপর থেকে আর বিচলিত হই না। যদি বা হই, চট করে সামলে নিই।

ছোটলাল নকুড় আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

রামঠাকুর আমাকে। ওর বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। সে ব্যাটা তবু মরে গিয়ে আসল ভূত হয়েছে, নকুড়টা তো এখনও নিছক জ্যান্ত ভূত। ওর কতটুকু ক্ষমতা !

মধু আমি যাই ছোটোবাবু।

রামঠাকুর একটু আস্তে যেও।

মধু চলে গেল।

সুবর্ণ তুমি যদি ভালো করে খোঁজ না করাও মেয়েটার কালকেই আমি কলকাতা চলে যাব। এদিকে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছ, গ্রাম সংঘ করছ, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ চরকির মতো, একটা মেয়ে হারালে খুঁজে বার করতে পারবে না !

ছোটলাল হারিয়েছে কি না তাই বা কে জানে ?

সুবর্ণ তার মানে ?

ছোটলাল কেউ হারালে তাকে খুঁজে বার করা সহজ হয়, নিজেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা যে তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাজটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুবর্ণ তাই বলে খোঁজ করবে না ?

ছোটলাল করব বইকী। তবে আমার মনে হয় পদ্মা নিজেই একটা খোঁজ দেবে আজকালের মধ্যে।

পদ্মার প্রবেশ। ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা। দেখলেই বুঝা যায় দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেই এসে পড়েছে।

পদ্মা আমি পালিয়ে এসেছি।

সুবর্ণ তা আমরা জানি। বেশ করেছিস। বাপ ধরে বেঁধে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে লক্ষ্মী মেয়েরা পালিয়েই আসে।

পদ্মা বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল।

রামঠাকুর তাই বাড়ি না গিয়ে মধু এখানে আছে শুনে ধুলো পায়ে ছুটে এসেছিস বুঝি ?

পদ্মা বড়ো ভয় করছে আমার। বাবা আমাকে মেরে ফেলবে একেবারে।

ছোটলাল তোর বাবাকে আমি বুঝিয়ে ঠান্ডা করবখন। তুই তো পালিয়েছিলি কাল সন্ধ্যাবেলা, সারারাত সারাদিন ছিলি কোথায় ?

পদ্মা পথ ভুলে সমুদ্দুরে চলে গিয়েছিলাম।

সুবর্ণ ধন্য মেয়ে তুই। আমাদের হার মানালি। আয় ভেতরে আয়। আমার কাছেই তুই থাকবি এখন, তোর বাপ না আসা পর্যন্ত।

পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণ ভেতরে গেল।

ছোটলাল যাক, একটা ভাবনা দূর হল। শম্ভুকে একটা খবর পাঠাতে হবে।

রামঠাকুর সেও এসে পড়েছে।

ধীরে ধীরে শম্ভুর প্রবেশ। তারও ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত মূর্তি।

ছোটলাল এসো শম্ভু। পদ্মা এখানে আছে।

শম্ভু নীরবে একটু মাথা হেলিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শ্রান্তভাবে ফরাশে বসল।

ওকে কিছু বোলো না শম্ভু।

শম্ভু ছোটলাল। কেলেঙ্কারি ? কি আর বলব ? কেলেঙ্কারি যা হবার হল। ঠিক লগ্নের সময় মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিয়ের আসরে দশজনের কাছে মাথা কাটা গেল আমার, মুখে চুনকালি পড়ল। নকুড় আবার রটিয়ে দিল, মধুর সঙ্গে পালিয়েছে।

ছোটলাল এমন হঠাৎ বিয়ের ব্যবস্থা করলে কেন ?

শম্ভু সে কথা আর বলেন কেন ছোটোবাবু। সব নকুড়ের কারসাজি। ওর ভরসায় গেলাম, গিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়লাম বলার নয়। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, চাল-ডাল কিনতে পাই না, গাছতলায় উপোস দেবার জোগাড় হল। শেষে নকুড় বললে, বিয়েটা হয়ে যাক তাড়াতাড়ি, সব ঠিক করে দেব। ও ব্যাটা যে এত বজ্জাত তা জানতাম না ছোটোবাবু।

ছোটলাল জেনেও তো বজ্জাতের হাতে মেয়ে দিচ্ছিলে।

শম্ভু কি করি। পণের টাকা অর্ধেক নিয়ে নিয়েছিলাম আগেই। চটপট বিয়ে না দিলে টাকাটা ফেরত নেবার কথাও বলতে লাগল। সব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে গেল ছোটোবাবু। বাড়ি হয়ে আসছি, বাড়ির অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। জানালার পাট আলগা, বাঁশ খুঁটি সব কে নিয়ে গেছে। পুবের ভিটের চাল থেকে নতুন খড় অর্ধেক কে সরিয়ে ফেলেছে।

ছোটলাল জানি। তোমরা যেদিন গেলে সে দিন রাতেই সব চুরি হয়েছিল। তখনও পাহারা দেবার দলটা ভালো গড়তে পারিনি। যা যাবার সেই রাতেই গেছে, পরে আর একটি কুটোও তোমার চুরি যায়নি।

সুবর্ণ, সুভদ্রা ও পদ্মার প্রবেশ। পদ্মা মমতার একখানা ভালো শাড়ি পরেছে। শম্ভু একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে দু-এক পা এগিয়ে পদ্মা দ্বিধা ভরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কাদের ও আজিজ ধরাধরি করে মধুকে নিয়ে এল। মধুর মাথা ফেটে সর্বাঙ্গে রক্তমাখা হয়ে গেছে।

পদ্মা ওগো মাগো, একী হল।

সুবর্ণ কে মারল এমন করে ?

সুভদ্রা ইস্ ! বেঁচে আছে তো ?

ছোটলাল [*শান্তভাবে*] বেঁচে আছে। ফার্স্ট এডের বাক্‌সোটা নিয়ে এসো।

মধুকে ফরাশে শুইয়ে দিয়ে সে জামার বোতাম খুলে দিল। ফার্স্ট এডের বাক্‌সোটি এলে তুলো দিয়ে রক্ত মুছে ওষুধপত্র দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।

শম্ভু এ নকুড়ের কাজ। নিশ্চয়ই এ নকুড়ের কাজ।

ছোটলাল ওকে কোথায় পেলে কাদের ?

কাদের শিবু তার গাড়িতে নিয়ে এসেছে। সোনাপুরে যাবার রাস্তায় রায়বাবুদের আম বাগানের ধারে পড়েছিল, শিবু গাড়ি নিয়ে গাঁয়ে ফিরবার সময় দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

শম্ভু নকুড়ের এ কাজ।

ছোটলাল [*মধুর জামার পকেট থেকে কাগজ বার করে*] কাদের এই কাগজগুলো এক্ষুনি সোনাপুরে সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। পারবে তো ?

কাদের কীসের কাগজ ছোটোবাবু ? এই কাগজের জন্য ওকে ঘায়েল করেনি তো ?

ছোটলাল না ভয় নেই কাদের, তোমাকে কেউ ঘায়েল করবে না।

আজিজ [*সাগ্রহে*] আমাকে দিন ছোটোবাবু। আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ছোটলাল তোকে দিয়ে কাজ করালে তোর বাপ যদি আমায় খুন করে ?

আজিজ বাপজান ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর কিছু বলবে না।

ছোটলাল তা হলেই ভালো। [*কাগজগুলি আজিজকে দিয়ে*] এক্ষুনি গিয়ে কিন্তু সতীশবাবুকে দেওয়া চাই।

আজিজ সোজা চলে যাব ছোটোবাবু। পা চালিয়ে চলে যাব।

আজিজ চলে গেল।

সুবর্ণ তুমি কি গো, অ্যাঁ ? এত কাণ্ডের মধ্যে ওই লিস্টের কথা তুমি ভুলতে পারলে না !

ছোটলাল ভুললে কি চলে !

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিপ্রহর। শম্ভু দাসের বাড়ির উঠান ও বারান্দা। পদ্মা উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। চুপি চুপি নকুড়ের প্রবেশ।

পদ্মা [*অবিচলিতভাবে*] বাবা বাড়ি নেই।

নকুড় তা জানি। গাঁয়ের লোকও অনেকেই গাঁয়ে নেই। সোনাপুরে মিটিং করতে গেছে। এমন সুযোগ সহজে জোটে না।

পদ্মা কীসের সুযোগ ?

নকুড় এই তোর সঙ্গে মন খুলে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইবার সুযোগ।

পদ্মা তোমার সুখ-দুঃখের কথা শুনবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না। তুমি মরলে মন্দিরে পুজো পাঠিয়ে দেব। তাই মরো গে যাও না অন্য কোথাও ?

নকুড় আমার সঙ্গে তুই এমন করিস কেন বল তো পদ্মরাণি ! এত অপমান সয়েও আমি তো কই তোর উপর রাগ করতে পারি না ?

পদ্মা করলেই পার ? কে তোমার রাগের ধার ধারে !

নকুড় কেন রাগ করিনি জানিস ? তুই ছেলেমানুষ, নিজের ভালোমন্দ বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই। শোন পদ্ম, তোকে একটা খবব দি। এ অঞ্চলে কেউ এ খবর জানে না। শুধু আমি জানি। সদরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাজিববাবু দু-চার টিন কেরোসিন কিনে রাখবে বলে খুঁজে খুঁজে টিন পাচ্ছিল না, আমি কেনা দামে তেল জোগাড় করে দেওয়ায় খুশি হয়ে চুপিচুপি গোপন খবরটা আমায় জানিয়েছে। প্রকাশ পেলে বেচারির চাকরিটা তো যাবেই জেল হয়ে যাবে সাত বচ্ছর।

পদ্মা [*মৃদু কৌতূহলের সঙ্গে*] খবরটা কী ?

নকুড় আজ বিকেলে এ গাঁয়ে তাঁবু পড়বে। ওরা আসছে।

পদ্মা [*ছেলেমানুষি আগ্রহ ও উত্তেজনায়*] সত্যি ? আসছে ! ছোটোবাবুকে তো খবরটা জানাতে হবে। তুমি একবার যাও না ছোটোবাবুকে জানিয়ে এসো ?

নকুড় পাগল হয়েছিস নাকি ? আমি বলে তোকে বাঁচাবার জন্য গোপন খবরটা তোকে বললাম, ছোটোবাবুকে জানাবি কি রকম ? জানাজানি হলে চারিদিকে হইচই পড়ে যাবে না ? তখন কি আর পালাবার উপায় থাকবে !

পদ্মা তুমি কেমন মানুষ গো দে মশায় ? যারা তোমার এত করলে, ধনপ্রাণ বাঁচালে তোমার, তাদের বিপদে ফেলে পালাবে ? পালাবার অসুবিধে হবে বলে খবরটা জানাবে না ?

নকুড় ছোটোবাবু আর মধুকে জানাব ? যারা আমার সর্বনাশ করেছে !

পদ্মা পোকা পড়বে তোমার মুখে। সবাই যখন হল্লা করে সেদিন তোমার দোকান আড়ত ঘরবাড়ি লুটতে গিয়েছিল, কারা গিয়ে বাঁচিয়েছিল তোমায় ? কাঁপতে কাঁপতে কার পায়ে ধরে বাঁচাও বাঁচাও বলে কেঁদেছিলে ? তোমার লোক কদিন আগে পেছন থেকে লাঠি চালিয়ে হীবু জ্যাঠার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তোমার বিপদে তাও সে মনে রাখেনি। ওরা গিয়ে না পড়লে তোমার সেদিন কী অবস্থা হত দে মশায় ? সব লুটেপুটে

নিয়ে ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে তোমায় খুন করে সব চলে যেত। কি রকম খেপে ছিল সবাই দ্যাখোনি ?

নকুড় কে ওদের খেপিয়েছিল শুনি ? মাল লুকিয়ে রেখে ওদের দুরবস্থার একশেষ করেছি বলে বলে কে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল ? তিন চার হাজার টাকা লোকসান গেছে আমার। কত চেষ্টায় কিছু চাল আর তেল সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে বেচে কিছু পয়সা করব। ছোটোবাবু আর মধু আমার সর্বনাশ করলে, বিলিয়ে দিতে হল সব।

পদ্মা বিলিয়ে দিতে হল কী গো ? ছোটোবাবু না নগদ টাকা দিয়ে সব কিনে নিলে তোমার ঠেঁয়ে ? নিয়ে বিক্রির জন্যে ব্রজ শা-র দোকানে জমা রাখল ?

নকুড় তুই বড়ো বোকা পদ্ম। চার হাজার টাকা লাভ হলে রানির হালে ভোগ তো করতি তুই। আর মাস ছয়ের মধ্যে তলে তলে সব মাল বেচে দিয়ে টাকাটা গুছিয়ে নিয়ে তোকে সঙ্গে করে চলে যেতাম সেই পশ্চিমে। তোর কপালে নেই, আমি কী করব !

পদ্মা ছমাস ধরে বেচতে ? তবে যে বললে ওরা এসে পড়ছে ?

নকুড় পড়ছেই তো। ও ছিল আগের মতলব। খবরটা পেলাম বলেই তো যেচে ছোটোবাবুকে সব বেচে দিলাম। ও মাল আর হচ্ছে না, ছয়লাপ হয়ে যাবে।

পদ্মা উল্টা পাল্টা কতই গাইলে এইটুকু সময়ের মধ্যে ! তোমার একটা কথাও সত্যি নয়। সব কথা বানিয়ে বললে। সেদিন আর নেই গো দে মশায়, যা খুশি গুজব রটাবে আর চোখ কান বুজে সব বিশ্বাস করব। কী করে ফাঁকি ধরতে হয় সুভাদিদি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। ছোটোবাবুর কাছে কেঁদে কেঁদে ঘাট মেনেছিলে বলে এতক্ষণ কথা কইলাম তোমার সঙ্গে, হীরু জ্যাঠার ছেলের তুমি মাথা ফাটিয়েছিলে তবু। এবার যাও দে মশায়।

নকুড় চল একসঙ্গেই যাই। আর দেরি করা সত্যি উচিত নয়, তোকে হাঁটতে হবে না, ঘরের পেছনে আমবাগানে পাল্‌কি এনে রেখেছি।

পদ্মা [*সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধা বড়ো একটি হুইস্‌ল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে*] আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছ ?

নকুড় ছেলেমানুষ নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়স তোর হয়নি। মিথ্যে বলিনি পদ্মা, আজ ওরা এসে পড়বে। গাঁকে গাঁ উজার করে দেবে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। কেউ কি বাঁচবে ভেবেছিস ?

পদ্মা তুমি নিশ্চয় বাঁচবে। হাতে পায়ে ধরে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে তোমায় ওরাও মারতে পারবে না। দলে ভর্তি করে নেবে—জুতো সাফ করার জন্য।

নকুড় তামাশার কথা নয় পদ্মা। আজ মাঝরাতে হয়তো এসে পড়বে, বিছানা থেকে তোকে টেনে নিয়ে যাবে, বিশ পঁচিশ জনে মিলে অত্যাচার করবে, তারপর উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। আমার সঙ্গে চল, কাশী গিয়ে থাকব দুজনে, চাকর দাসী রেখে দেব, গা ভরা গয়না দেব, দামি দামি কাপড় দেব, রানির মতো সুখে থাকবি।

পদ্মা তুমি বড়ো বোকা দে মশায়। বোকার মতো ভয় দেখালে। রানির মতো সুখে থাকবার জন্য যদি বা তোমার সঙ্গে যেতাম, বাবাকে ওভাবে মরতে রেখে তো যেতে মন উঠবে না।

নকুড় তোকে যেতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে। নিতে যখন এসেছি, না নিয়ে যাব না।

পদ্মা না গেলে ধরে নিয়ে যাবে তো গায়ের জোরে ? একা এসেছ, না লোক আছে সঙ্গে ?

নকুড় লোক আছে। জোর জবরদস্তি করতে চাই না বলে তাদের বাড়ির মধ্যে আনিনি। নিজের ইচ্ছেতেই তুই চল পদ্মা, কটা ছোটো জাতের লোক তোকে ছোঁবে, আমার তা ভালো লাগে না।

পদ্মা ডাকো না তোমার লোককে, আমায় ছোঁবার চেষ্টা করুক।

নকুড় [*পদ্মার নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব দেখে একটু ভড়কে গিয়ে*] কী করবি তুই ? কী তোর করার ক্ষমতা আছে ! ডাকলেই ওরা এসে মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যাবে। কী করে ঠেকাবি তুই ? তোর বাবা বাড়ি নেই, গাঁয়ে দু-চারজনের বেশি পুরুষ নেই। কে তোকে উদ্ধার করতে আসবে ? [*সন্দিগ্ধভাবে*] তোর হাতে ওটা কি ?

পদ্মা অস্ত্র। তোমার মতো এমনি ভাবে এসে কেউ যাতে আমাদের মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যেতে না পারে সেই জন্য সুভাদিদি এই অস্ত্র দিয়েছে। গাঁয়ের সব মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বউ থাকলে সেও একটা পেত।

নকুড় কী অস্ত্র ? পিস্তল নাকি ?

পদ্মা পিস্তল নয়, বাঁশি। আমাদের বাড়িটা অন্য সবার বাড়ি থেকে একটু দূরে কিনা, তাই আমার সবচেয়ে বড়ো বাঁশিটা দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় যাদের ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, তাদের ছোটো টিনের বাঁশি,—সরু আওয়াজ বেরোয়। আমার এ বাঁশিটা সদর থেকে কেনা, টিনের বাঁশিগুলো বানিয়েছে মদন কম্মোকার। একদিনে ও তিন কুড়ি বাঁশি বানাতে পারে।

নকুড় বাঁশি ! তাই বল।

পদ্মা বাঁশি বলে গেরাহ্যি হল না বুঝি ? আমি এটা মুখে তুললে কী হবে জানো ? এদিকে ক্ষেন্তি, বকুল, পদীপিসি, মনোর মা, ওদিকে ছুতোর বউ, মাখনের মা, আন্নাকালী, আর ওই পশ্চিমে বিধু, কৈবর্তী, মালতী ওরা সবাই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধা বাঁশি মুখে তুলে ফুঁ দেবে, নয় তো, শাঁখ বাজাবে সেই বাঁশি শুনে দূরে দূরে যত বাড়ি আছে সব বাড়িতে বাঁশি আর শাঁখ বাজতে থাকবে। সারা গাঁয়ে হইচই পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ যারা আছে দু-দশজন তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে আর মেয়েরা আঁশবটি নিয়ে ছুটে এসে তোমাদের দফা নিকেশ করবে। তার মধ্যে আমিও তোমাদের দু-একজনের দফাটা নিকেশ করে রাখব।

নকুড় তুই তবে যাবি নে পদ্মা ? সত্যি যাবি নে ? পাল্‌কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব ?

পদ্মা তাই যাও ভালোয় ভালোয়।

নকুড় তবু একমুহূর্ত ইতস্তত করল। লোভাতুর চোখে পদ্মাকে দেখতে দেখতে সে যেন হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে মুখ চেপে ধরার সম্ভাবনার কথাই বিবেচনা করতে লাগল। তারপর পদ্মার বাঁশি ধরা হাতটি ধীরে ধীরে মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তার যেন চমক ভাঙল। আরও এক মুহূর্ত পদ্মার দিকে তাকিয়ে থেকে সে চলে গেল।

পদ্মা [*আপন মনে*] মনে করেছিলাম, সুভাদিদির সব ছেলেমানুষি, এ ছেলেখেলার বাঁশি কোনো কাজেই লাগবে না। কাজে তো লাগল ! বাজিয়ে দিলেই হত বাঁশিটা, বুড়োর কিছু শিক্ষে হত। ব্যাটা লোক দিয়ে পেছন থেকে লাঠি মেরে সে মানুষটার মাথা ফাটিয়েছে ! যাক গে, মরুক। পাগলামি যা করছে, আমার জন্যেই তো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রাগও হয়, মায়াও হয় বুড়ো ব্যাটার জন্যে।

হুইস্‌ল ও টিনের বাঁশির আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে।

বাঁশি বাজছে না ? কার বাড়িতে আবার কী হল ! আমাকেও তো বাজাতে হয় ! [*সজোরে হুইসেলে ফুঁ দিল*] আঁশবটি নিয়ে যাব নাকি ? নিয়েই যাই, দু-এক কোপ যদি বসাতে পারি কোনো হতচ্ছাড়া চোর ডাকাতকে।

পদ্মা বাইরে যাবার উপক্রম করতে নকুড়ের গলায় কাঁধের উড়ানিটি বেঁধে রামঠাকুর তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। রামঠাকুরের হাতে মোটা একটা লাঠি।

রামঠাকুর ধরেছি পদ্মা। চোরের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনে আমবাগানে পাঁচ ছটা যণ্ডা যণ্ডা লোকের সঙ্গে ফিসফাস করছিল। হাঁক দিতেই তারা ভেগেছে। ভাগবে আর কোথায়, যে শ্যামের বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছি। গিন্নির জন্যে বাঁশিটা কোমরে গোঁজা ছিল !

পদ্মা করেছ কি ঠাকুরমশায় ? এখুনি যে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে জড়ো হবে। দে মশায় বিদেয় নিয়ে চলে যাচ্ছিল যে।

নকুড় ও পদ্মা, বাঁচা আমায়। গলায় ফাঁস লাগল ! [*রামঠাকুর উড়ানি খুলে নিতে*] সবাই এলে বলিস কিন্তু আমি কিছু করিনি, আমি চলে যাচ্ছিলাম। গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলিস পদ্মা। তোর বলতে বলতে যেন কেউ কোপটোপ না বসিয়ে দেয়।

রামঠাকুর রাম, রাম ! বিদেয় কান্না কাঁদতে এসেছিস তা কি জানি আমি ! বাজা বাজা শাঁখটা বাজা শিগগির।

পদ্মা শঙ্খ মুখে তুলে তিনবার বাজাল। চারিদিকে বাঁশির শব্দ মিলিয়ে গেল।

নকুড় তিনবার শাঁখ বাজালে কেউ আসবে না নাকি ?

পদ্মা আসবে। বাঁশি যখন বেজেছে পাড়ায় যারা পাহারা দেয় তাদের একজন খোঁজ নিতে আসবেই। সঙ্গে শাঁখ এনে তুমিও তো তিনবার বাজিয়ে দিতে পারতে !

নকুড় তা দিতাম না পদ্মা, দিতাম না। আমি তোর অনিষ্ট করতে চাইনি। তোকে আমি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করি পদ্মা।

রামঠাকুর কার ছেলেবেলা থেকে ?

মধুর প্রবেশ। মাথায় এখনও তার ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাতে মোটা একটা লাঠি। সঙ্গে ছোটলাল, কাদের, আমিরুদ্দীন, আজিজ ও শম্ভু।

শম্ভু কী হয়েছে পদ্মা ?

পদ্মা দে মশায় আমার কোনো অনিষ্ট করতে না চেয়ে একটা পাল্‌কি আর পাঁচ সাতজন যণ্ডা গোছের লোক সাথে নিয়ে এসেছিল—

নকুড় আমি তোর কিচ্ছুই করিনি পদ্মা !

পদ্মা ভয় পাচ্ছ কেন দে মশায় ? আমি কি বলেছি তুমি কিছু করেছ ? তারপর আমার কোনো অনিষ্ট না করেই দে মশায় চলে যাচ্ছিলেন, ঠাকুরমশায় দেখতে পেয়ে বাঁশি বাজিয়ে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনেছেন।

রামঠাকুর গামছা নয়, উড়ানি। পুজোর ফুল পাতা নৈবিদ্য বাঁধা হয়, এ উড়ানি অতিশয় পবিত্র। গলায় দিলে কারও অপমান হয় না। স্পর্শে বরং পুণ্য হয়।

মধু দুর্মতির কি তোমার শেষ নেই দে মশায় ? কখনও ভুলেও সোজা পথে চলতে পার না ? মাঝে মাঝে সাধ যায় তোমার মনটা কী দিয়ে গড়া তাই দেখতে। আধ পেটা খেয়ে দিন কাটত, নিজের চেষ্টায় অবস্থা ফিরিয়েছ, ঘরবাড়ি টাকা পয়সা লোকজন কোনো কিছুর অভাব তোমার নেই। দুঃখকষ্ট সয়ে উন্নতি করার কথা বলতে লোকে তোমার কথা বলে। তুমি তো অপদার্থ নও, বুদ্ধিমান লোক তুমি। সাধ করে কেন বাঁকা পথে

চলে অন্যায় কাজ করো ? ভালো করো না করো, পরের পানে মই না দিয়ে শুধু মানিয়ে চললে দশজনে তোমার নাম করত, খাতির করে চলত তোমায়। তার বদলে অন্যায় কাজ তুমি করেই চলেছ একটার পর একটা। তিন গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে তোমার ঘরদুয়ার জ্বালিয়ে তোমাকে খুন করতে গেল, গাঁয়ের বাস তুলে তোমার দেশছাড়া হতে হচ্ছে, তখনও তোমার এই মতিগতি !

নকুড় [*তেজের সঙ্গে*] তুই আমাকে তত্ত্ব কথা শোনাস না মধু।

মধু আবার তুই তোকারি আরম্ভ করলে ?

নকুড় মারবি ? আয় মধু, মার। আর তোকে আমি ভয় করি না। তোর বাহাদুরি ঢের সয়েছি, আর সইব না। আয় এগিয়ে, এই বুড়ো বয়সে তোর সঙ্গে আজ আমি হাতাহাতি মারামারি করব। আয় বলছি পাজি বজ্জাত হারামজাদা—গাল দিলাম যা-তা বলে। মারমুখো হয়ে আয় দিকি একবার। তুই একটা ছোরা নে, আমায় একটা ছোরা দে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক তোতে আমাতে। কইরে শুয়ার আয় ? আজ যে বড়ো গাল শুনেও রাগ হচ্ছে না তোর ! বাপ তুলে গাল দেব ?

মধু মুখ সামাল দে মশায় !

নকুড় তোর ভয়ে ? গায়ে তোর জোর বেশি বলে ? গাঁয়ে মেয়েগুলো পর্যন্ত ভয় ডর ভুলেছে, কোমরে ছোরা গুঁজে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি পুরুষ হয়ে তোকে ডরাব ? নে, গাল আর দেব না কিন্তু খুন তোকে আজ আমি করব মধু। নয় তোর হাতে আজ খুন হব। তুই আমাকে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া করেছিস, কুকুর বেড়ালের মতো আমায় গাঁ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে, তোকে যে জ্যান্ত রেখে যাচ্ছিলাম কেন তাই ভাবি। লাঠি, ছোরা, রামদা, যা খুশি একটা নে মধু, চ দুজনে বাগানে যাই।

শম্ভু কেন মাথা গরম করছ দে মশায় ? রওনা হয়ে বেরিয়েছ বাড়ি থেকে, যেখানে যাচ্ছিলে চলে যাও।

কাদের কত বড়ো খারাপ মতলব নিয়ে এ বাড়ি ঢুকেছিলে, ভুলে গেছ এরই মধ্যে ? জেলে না দিয়ে তোমায় এনারা ছেড়ে দিলে। তুমি আবার হম্বিতম্বি করছ !

রামঠাকুর এ লোকটা কী !

নকুড় [*সকলের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে, রামঠাকুরের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে*] বাপের ব্যাটা যদি হোস মধু, লাঠি নিয়ে বাগানে চল।

মধু [*হেসে*] চলো। এত যদি লাঠি চালাতে জানো দে মশায়, পেছন থেকে লাঠি মেরে জখম করেছিলে কেন ? সামনাসামনি আসতে পারনি সেদিন ?

নকুড় আমি লাঠি মারিনি। আমার লোক মেরেছিল। আজ সামনাসামনি মারব।

পদ্মা [*মধুকে*] যেও না তুমি। দে মশায়ের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার হাতে খুন হয়ে তোমাকে ফাঁসি দেওয়াতে চায়।

মধু এত কাণ্ড করেও তোমার সাধ মিটল না ? যাবার আগে আবার একটা হাঙ্গামা করতে চাও ?

নকুড় আমি যদি না যাই !

রামঠাকুর সে কী হে ? পাল্‌কি বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে তুমি না বিদায় কান্না কাঁদতে এসেছিলে ? এখন যাব না বলছ কী রকম ?

নকুড় কেন যাব ? আমার সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আমি যাব কেন ? কী করেছি আমি !

রামঠাকুর তা বটে।

নকুড় নিজের পয়সা দিয়ে জিনিস কিনেছি, আমি তা মাটিতে পুঁতে রাখি, জঙ্গলে লুকিয়ে রাখি, খানা ডোবায় ফেলে দিই, তোমাদের বলবার কী অধিকার আছে ? আমার অন্যায় কোথায় ! যার পয়সা নেই, যে কিনতে পারে না, সে এসে ভিক্ষে চাইল না কেন, আমি ভিক্ষে দিতাম। গায়ের জোরে ইচ্ছামতো দাম দিয়ে কিনবার কী অধিকার আছে তোমাদের ?

সকলে হেসে ফেলে, পদ্মা সুদ্ধ। নকুড় চেয়ে থাকে উন্মাদের মতো বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

পঞ্চম দৃশ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। গ্রামের পথ, কাছাকাছি কয়েকখানা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। একদিকে গাছপালা ঝোপ ঝাড়। অন্যদিকে মাঠ, খেত। চারিদিকে নিঃশব্দ, পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ শোনা যায় না। ঝোপের আড়ালে লুকানো দুজন লোক ছাড়া আশেপাশে মানুষ চোখে পড়ে না। লোক দুজনের লুকিয়ে থাকার জন্য নির্জনতা কেমন রহস্যময় মনে হয়। সেই রহস্যের অনুভূতি আরও গভীর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে দু-একজন চাষি শ্রেণির লোকের ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করায়। তারা নিঃশব্দে চলে যায়।

তারপর প্রবেশ করে শম্ভু ও ভূষণ। দুজনে প্রায় সমবয়সি, শম্ভুর চেয়ে ভূষণকে একটু বেশি বুড়ো দেখায়। গাছের আড়াল থেকে মধু ও মাখন বেরিয়ে আসে।

মধু খবর কি খুড়ো ?

ভূষণ নতুন খবর আর কি। ওই গুজবটাই শুনছি, আজকালের মধ্যে গাঁয়ে হানা দেবে।

শম্ভু আজ রাতে এলেই বিপদ।

মধু আজ রাতে এলেও বিপদ, কাল রাতে এলেও বিপদ। বিপদ যা তা আছেই।

মাখন আমি বলি, দিনের চেয়ে রাতে এলেই ভালো। মেয়েছেলে, গোরুবাছুর নিয়ে বন জঙ্গল খানা ডোবায় পড়া যায়, গুঁতোও দেয়া যায় ফাঁকতালে দু-একটাকে দু-এক ঘা।

ভূষণ আর গুঁতো দিয়ে কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে। গুঁতোর ঠেলা সামলাতে প্রাণ গেল।

মাখন যাবার জন্যেই তো প্রাণ।

ভূষণ তোর তামাশা রাখ মাখন। সব সময় ভালো লাগে না তামাশা।

শম্ভু মোর ভাবনা আজ রাতের লেগে। রাতে মোর পাহারা নয়নদিঘির মোড়ে। ঘরটা থাকবে খালি। বলায়ের মা থাকবে বলেছে বটে রাতে মেয়েটার কাছে, তা মেয়েমানুষ তো বটে দুজনাই। কী করবে, কোনদিকে যাবে দিশেমিশে পাবে না হয়তো।

মধু মোরা তো আছি। কিছু হলে পৌঁছে দেবখন গড়ে। কিন্তু তোমায় আবার পাহারায় দিলে কেন সামন্তমশায়, মোরা এত জোয়ান মদ্দ থাকতে ?

শম্ভু [*সগর্বে*] আমি যেচে নিইছি। সবাই বলে এই করেছি, ওই করেছি, আমি পারি নে ? বুড়ো এখনও হইনি বাপু, নিজেকে যতই জোয়ান ভাবো।

মধু তা রাতে কেন ? দিনে পাহারা নিলেই হত।

শম্ভু যেমন লিস্ট করেছে।

মধু আচ্ছা, কাল আমি তা ঠিক করে দেব সামন্তমশায়।

পদ্মা এল, শম্ভুরা যেদিক থেকে এসেছিল তার অপর দিক থেকে।

পদ্মা বাবা ! বাবা !

শম্ভু কী ছুটোছুটি করিস পদি, বয়েস হয়নি ? খুকিটি আছিস এখনও ?

পদ্মা খপর দিতে এলাম।

শম্ভু কী খপর ?

পদ্মা আজ রাতে পাহারায় যেতে হবে না তোমায়। নিতুর বাবা আর রসিক মামা বলল আমায়।

শম্ভু বাড়ি এয়েছিল ?

পদ্মা অ্যাঁ ? বাড়ি ? মোদের বাড়ি ? না তো।

শম্ভু কোথায় বলল তবে তোকে ?

পদ্মা আমি গিছলাম কিনা মাইতি বাড়ি।

শম্ভু কেন গেছলি মাইতি বাড়ি ?

পদ্মা এমনিই গেছলাম !

শম্ভু সত্যি বল পদি কেন গেছলি তুই মাইতি বাড়ি। ও বাড়িতে ওনারা পরামর্শ করতে জড়ো হন, ওখানে তোর যাবার কী দরকার ?

পদ্মা তোমার শুধু কেন আর কেন। কেন এই করেছিস, কেন ওই করেছিস। ভালো খপরটা দিলাম।

শম্ভু কেন গেছলি বল পদি।

পদ্মা তোমার কথা বলতে গিছলাম।

শম্ভু কেন ? আমার কথা বলতে গেছলি কেন ?

পদ্মা যাব না ? দুপুর রাতে বেরিয়ে সারারাত তুমি বাইরে কাটাবে, ঠান্ডা লাগবে না তোমার ? অসুখ করবে না ? শখ হয়েছে, দিনের বেলা পাহারা দিয়ো।

মাখন মন্দ কি করেছে কাজটা ? বুদ্ধি আছে তোর পদি।

পদ্মা নেই ভেবেছিলে নাকি তবে ? নিতুর বাপ কী বলল জানো মাখনদাদা, বলল—ভাগ্যে তুই এসে বললি পদি, নয় তো ভুল করে বুড়ো মানুষটাকে রাতের পাহারায় পাঠিয়ে মুশকিল হত অসুখ-বিসুখ হলে।

শম্ভু [*গুম খেয়ে*] ছোটলাল যদি রাগ করে ?

মধু [*হেসে*] খেপেছ নাকি সামন্তমশায় ? ছোটলাল যা করে সবার সাথে পরামর্শ করেই করে। কারও ন্যায্য কথা অমান্য করে না কখনও। বারবার মোদের বলেছে শোনোনি—সে হাকিম, না পুলিশ, না জমিদার যে হুকুম জারি করবে ?

মাখন লোক ভালো ছোটলাল। এত বড়ো বুকের পাটা কিন্তু কী নরম মানুষটা। আবার গরম হলে আগুন।

মধু কথা বলে খাঁটি। বলে, আমার একার কথা কি কথা ? তোমাদের যদি বোঝাতে পারলাম তো ভালো, না পারলে তোমাদের কথার পরে আর কথা নেই। কী ভাবে বোঝালে মোদের, কী ভাবে সামলালে।

ভূষণ ছোটলাল দেখি দেবতা হয়ে উঠেছে তোমাদের।

মধু দেবতা কীসের ? বন্ধু।

মাখন তুমি হও না দেবতা ?

ভূষণ চলো হে চলো, আমরা যাই।

পদ্মা, শম্ভু ও ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ছুটে পদ্মা ফিরে এল।

পদ্মা মাখনদাদা, কত বড়ো পেয়ারা হয়েছে দ্যাখো। তিনটে এনেছি তোমাদের জন্য।

মাখন আমি দুটো মধু একটা তো ?

পদ্মা ভাগ নিয়ে তোমরা কামড়াকামড়ি করো। আমি কী জানি ?

পদ্মা চঞ্চল পদে চলে গেল।

মাখন [*পেয়ারা খেতে খেতে*] আজকালের মধ্যে মোদের গাঁয়ে হানা দেবে শুনছি পাঁচ সাতদিন ধরে। কদিন এমন চলবে ?

মধু যদ্দিন ওনারা চালান। কাল পলাশপুরে ছোঁ মেরেছে। আজকালের মধ্যে মোদের জুনপাকিয়ায় আসতে পারে, আশ্চর্য কি ?

মাখন আসেই যদি তো আসুক, ঢুকে বুকে যাক। যে কটা মরে মরুক যে কটা ঘর পোড়ে পুড়ুক।

মধু গায়ের ঝাল কিছু ঝাড়বেই, সে তো জানা কথা। হেথায় হাঙ্গামা বলতে গেলে কিছুই হয়নি, তবে ওদের কি আর বাছ-বিচার আছে। এ দুর্দিনে বাঁচবার জন্য একসাথে মিলছি, এটাই মস্ত দোষ হয়েছে হয়তো। পলাশপুরও যখন বাদ গেল না, জুনপাকিয়া সহজে ছাড়া পাবে না।

মাখন কিন্তু মেয়েদের ইজ্জত !

মধু সেটা কি আর মোরা বেঁচে থাকতে যাবে ?

মাখন গেছে তো অনেক জায়গায়, পুরুষরা বেঁচে থাকতেও।

মধু জুনপাকিয়ায় যাবে না।

মাখন তোর জুনপাকিয়াও অন্য গাঁয়ের মতোই মধু।

মধু সে তো ঠিক কথাই। একি আর একটা গাঁয়ের বাহাদুরি দেখানোর ব্যাপার ? কখনও যা ঘটেনি তাই ঘটল বটে, তবু একজন একা বীর হলে কী হবে। দশটা গাঁর বীরত্বে কী হবে। এটা কি জানিস, বড়ো একটা চিহ্ন শুধু। তবে ছোটলাল বলে, যা করার তা করতে হবে, যা সওয়ার তা সইতে হবে। দিন তো আসবে একদিন মোদেরও। আর সব সয়ে যাব, মেয়েদের ওপর অত্যাচার সইব না। সরিয়ে ফেলে, লুকিয়ে রেখে, বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছি ওদের—তবু যদি ওদের ওপর ছোঁ মারতে যায়, তখন আর সইব না। প্রাণ থাকতে নয়। তাই বলছিলাম, মোরা বেঁচে থাকতে জুনপাকিয়ায় মেয়েদের ডর নেই। সবাই মরলে তারপর যা হবার হবে।

মাখন মুখ বুজে সইব, এ যেন এখনও মোর কেমন ঠেকে।

মধু ওই যে ছোটলাল বললেন, যা করার তা করতে হবে। মুখ থাকতে মুখ বুজবো কেন ? তবে যে যার খুশি মতো বললে আর করলে কি কোনো লাভ আছে।

মধু তোকে বলি মাখন, কারু কাছে ফাঁস করিস না।

মাখন তোতে আমাতে বেঁফাস কথা কইবার কি আছে শুনি ?—কে ? কে যায় ?

চাদর মোড়া এক মূর্তি এল। দ্রুতপদে আসছিল, থমকে দাঁড়াল! কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত।

আগন্তুক আমি, আমি। আমি বাবা, আমি।

মধু দে মশায় ? এমন করে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়েছ কেন ? মুখ দেখার জো নেই, যেন কনে বউটি।

নকুড় যা শীত বাবা।

মধু সন্দে বেলাই এত শীত ?

মাখন তা, এই শীতে কোথা গিয়েছিলে খুড়ো ?

নকুড় বুড়ো মানুষ বাবা, একটু শীতে কাঁপন ধরে। হাড় কনকন করে। তোমাদের বয়েস কি আছে বাবা।

মধু এমন বুড়ো তুমি নও দে মশায়। তোমার চেয়ে বুড়ো লোক রাতে পাহারা দিচ্ছে।

মাখন বিয়ে তো করলে এই শীতে ভূষণ খুড়োর মেয়েটাকে। এমনই চাদর মুড়ি দিয়েছিলে নাকি বিয়ের আসরে ? আচ্ছা, সে নয় খুড়িকে শুধোবো কেমন কেঁপেছিলে ঠকঠক করে বিয়ের রাতে। এখন বলো দিকি, গিছলে কোথা ?

নকুড় এই কি জানো, গিছলাম বাবা বীরগাঁ, বোনাইবাড়ি। তোমাদের খুড়ি কাল থেকে খেপে আছে, খালি বলে যাও, যাও, খপর নিয়ে এসো মোর বোনের। তা করি কি যেতে হল।

হৃদয় এল। পরনের গামছা হাঁটুতে নামেনি। আটহাতি ছেঁড়া মোটা ধুতিটি চাদরের মতো গায়ে জড়ানো। হাতে একটা মোটা লাঠি। সহজ, সরল চাষি মজুর—একটু বোকাসোকা।

হৃদয় দেখলে খুড়ো ? লাগাল ধরেছি ঠিক। বললে কিনা, মাঠে যাবি তো যা হিদয়, তত খনে ঘর পৌঁছে যাব। হিদয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারলে খুড়ো ? ধরিছি না গাঁয়ের ঢোকার আগে ! পয়সা কটা কিন্তুক আজ দিতে হবে খুড়ো। খুদির মা নয়তো খেয়ে ফেলবে মোকে।

মাখন খুড়োর সাথে গিছলে নাকি হিদয় ?

নকুড় হ্যাঁ বাবা, হিদয়কে সাথে নিছলাম। আয় হিদয়, যাই। পয়সা দেব তোকে আজই।

মাখন দাঁড়াও খুড়ো, একটু দাঁড়াও। বলি ও হিদয়, বীরগাঁ গেলে একবার বলে যেতে পারলে না মোকে ? একটা চিঠি দিতাম ছোটোমহালের নায়েবকে ?

হৃদয় বাঃ রে কথা ! বীরগাঁ ? বীরগাঁ গেলাম কবে ? খুড়ো বলল হিদয়, খাসধুরো যাবি আসবি মোর সাথে, দশগন্ডা পয়সা পাবি। আমি বললাম, খুড়ো দশগন্ডা নয়, এগারো গন্ডা দিতে হবে, সাত কোশ রাস্তা। তা খুড়ো বললে, হিদয়, আটগন্ডা যদি নিস তো খেতে পাবি পেট ভরে, ভাত, রুটি, মাংসো, বিস্কিউট—ব্যাটা জীবনে খাসনি ! খুড়ো মোকে ব্যাটা বললে, শুনছো ? খুড়ো বলে ডাকি, মোকে বললে ব্যাটা !

নকুড় ব্যাটা পাগল।

মাখন খুড়ো, খাসধুরো গিছলে কেন ?

নকুড় তোর তাতে দরকার ? মোর যেথা খুশি যাব।

মাখন চটছো কেন খুড়ো। আমার কী দরকার, গাঁয়ের লোক যে জানতে চাইবে, নকুড় খুড়ো এত ঘন ঘন খাসধুরো যায় কেন, ওনাদের খাস আড্ডায়। তলে তলে কারবার করছে নাকি ওনাদের সাথে ?

নকুড় বড়ো তোরা বাড়াবাড়ি করিস বাপু। আমি গেলাম দর জানতে সর্ষে আর সোনার, কীসের আড্ডা কাদের আড্ডা কীসের কি, আমি তার কী জানি। তোদের খালি সন্দেহ বাতিক।

মধু সর্ষে আর সোনার দর ?

নকুড় না তো কি ? সর্ষে কিছু ধরা আছে, ভেবেছিনু নতুন সর্ষের সাথে মিশিয়ে বেচব। তা খুড়ি তোদের গোঁ ধরেছে, সাতদিনের মধ্যে গয়না চাই। হঠাৎ বিয়েটা হল, গয়নাগাঁটি তৈরি তো হয়নি কিছু। যত বলি সময় মন্দ, দুদিন যাক, খুড়ি তোদের কথা শোনেন না।

মাখন ছেলেমানুষ তো, পদির চেয়ে ছেলেমানুষ। ভাবছে হয়তো ফাঁকি দেবে।

নকুড় তামাশা রাখ মাখন।

মাখন তামাশা কি খুড়ো, এমন গোঁ তোমার বিয়ে করার যে শেষে ভূষণ খুড়োর ওই কচি মেয়েটাকে বিয়ে করে বসলে, গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে দিলে বিয়ে তোমার ঠেকায় কার

সাধ্যি ! ভাবলে বুঝি যে গাঁয়ের লোককে জব্দ করলে বিয়ে করে। তোমার তামাশায় আমরা হাসছি কদিন। তা যাক গে খুড়ো সে কথা, সর্ষের ব্যাপারটা কী শুনি।

নকুড় তোদের বড়ো জেরা বাপু।

মাখন জেরা কীসের খুড়ো, সর্ষে বেচে খুড়িকে গয়না দেবে এ তো সুখবর, আনন্দের কথা। দশবিশ হাজার যা জমা আছে টাকা তোমার, তাতে তো আর গয়না হবে না খুড়ির—সর্ষে না বেচা হলে বেচারা ফাঁকিতে পড়বে। তা সর্ষে বেচলে ?

নকুড় ভালো দর পেয়েছি। ভাবলাম চুপি চুপি বেচে দেব কাউকে না জানিয়ে, তা তোদের জ্বালায় কি চুপচাপ কিছু করবার জো আছে।

মাখন সর্ষে দেখাবে খুড়ো ?

নকুড় আরে বাবা, সেকি হেথায় রেখেছি ? বীরগাঁয়ের বোনায়ের ওখানে আছে।

মাখন গল্প বানাতে ওস্তাদ বটে তুমি খুড়ো। বলি হিদয়, খুড়ো কোথা কোথা গিছল রে খাসধুরোয় ?

হৃদয় কে জানে বাবা। মোকে হীরুর তেলেভাজার দোকানে বসিয়ে রেখে খুড়ো গেল খালধারে তাঁবুর দিকে। তারপর কোথা কোথা গেল ভগবান জানে।

নকুড় [*তাড়া দিয়ে*] হয়েছে, হয়েছে। আয় হিদয়, যাই আমরা।

মাখন একবার মাইতি বাড়ি হয়ে যেতে হবে খুড়ো।

নকুড় তোর হুকুমে নাকি ?

মাখন ছি ছি, হুকুম কীসের। এই জোড়হাতের আবদারে। মধু, খুড়োর সাথে ঘুরে আসছি মাইতি বাড়ি। হিদয়, তুমিও এসো সাথে। ভয় নেই। যা যা শুধোবে, ঠিক ঠিক জবাব দিও।

গজর গজর করতে করতে নকুড় চলে গেল। সঙ্গে গেল মাখন ও হৃদয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এল। দূর থেকে শোনা গেল এক শাঁখের আওয়াজ বহুদূর থেকে।

মধু একটা শাঁখ ! সাঁঝেও তো শাঁখ বাজানো বারণ। কারও বাড়িতে ভুলে গেল নাকি ?

তারপর কাছে ও দূরে অনেকগুলি শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠল। মধু তার হাতের শাঁখটি মুখে তুলে বাজাল। দূরে শোনা গেল কোলাহল আর্তনাদ ও দুমদাম শব্দ। মধু ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে; তারপর আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, সঙ্গে পদ্মা।

মধু কি বলে তুই এ দিকে এলি বল দিকি।

পদ্মা না এসে থাকতে পারলাম না। মনে হল এদিকেই ওরা আসছে, কী জানি তোমার কী করবে।

মধু তাই তুই বাঁচাতে এলি আমায়। যদি বা বাঁচতাম—এবার দুজনেই মরব। অত করে শিখিয়ে দিলাম, গড়ের ধারে যেখেনে গিয়ে লুকোবে সব, সেখানে যাবি। তুই এলি এদিক পানে ছুটে !

পদ্মা তোমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে।

কোলাহল কাছে এগিয়ে আসে।

মধু বেশ করেছিস। কী করি এখন তোকে নিয়ে আমি।

পদ্মা আমার জন্যে ভেবো না। দুজনে লুকোই চলো। ওরা বুঝি এল।

মধু এই পুকুরে নাম গিয়ে। পানায় গলা ডুবিয়ে থাকবি। নিমুনিয়া হবে নির্ঘাত—কিন্তু উপায় কী।

পদ্মা আর তুমি ?

মধু যা বলি তা শোন। কথা বলিস না। নিজে যদি বাঁচতে চাস, মোকে বাঁচতে দিতে চাস, কথা শোন। নয়তো দুজনে মরব।

অনিচ্ছুক পদ্মা কয়েক পা এগিয়ে গেছে, কাছে বন্দুকের আওয়াজ হল। মধু পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। পদ্মা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মধু পালা ! পালা ! বেইজ্জত করবে তোকে—পালা।

পদ্মা না। তোমায় ফেলে পালাব না আমি।

মধু তুই না থাকলেই বাঁচব পদি। তুই থাকলে আরও মেরে ফেলবে আমায়। তুই কাছে না থাকলে মরার ভান করব। কিছু করবে না। যা—পালা শিগগির। মোকে যদি বাঁচাতে চাস, পালা।

পদ্মা উঠে পালিয়ে যায়। পরক্ষণে অল্প দূর থেকেই শোনা যেতে থাকে তার আকাশচেরা আর্তনাদের পর আর্তনাদ। হঠাৎ সে আর্তনাদ থেমে যায়। মধু প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও কিছুতে উঠতে পারে না, কেবলই পড়ে পড়ে যায়।

—যবনিকা—

আজ কাল পরশুর গল্প

গল্পগুলি একটা বিশেষভাবে পরপর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, যাতে 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামটির সংগতি হয়তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে। 'সামঞ্জস্য' গল্পটি শেষে যাওয়া একেবারে উচিত হয়নি। অন্য গল্পগুলিও এ রকম আগে পরে চলে গেছে।

গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।

বৈশাখ, ১৩৫৩ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ কাল পরশুর গল্প

মানসুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরোনো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিকে আছে, ছ মাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাড়ি-কলসিগুলি পর্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আর তোলেনি। কার জন্য তুলবে ? দাওয়ার দুপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকো থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদর বউ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সিঁথির সিঁদুরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভালো করে। এতে আর শাড়ি-পরার ভঙ্গিতে আর চলন-ফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভুসো গেরস্থঘরের বউ, অন্য দুজন শহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বউ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়িখানা বুঝি দামিই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সুরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কম দামি ময়লা শাড়ি মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানসুকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা ঠাকরুনরা রামপদর বউকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদর ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড়ো গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

কজন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমনভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুণে ওখানে নজর আটকে যায়।

রামের বউটা তবে এল ?

তাই তো দেখি। নিকুঞ্জ বলে, তার আধপোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কি না ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চারজনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বউ মারা গেছে ও বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, রাম নেবে ওকে ?

না নেবে তো না নেবে। ওর বয়ে গেল। জোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, উচিত তো না ঘরে নেয়া।

গোকুলকে সে ধমক দেয় না 'তুই থাম ছোঁড়া' বলে। তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে ! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কী দরকার ছিল ছুঁড়ির ?

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হালকা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়িখানা। সকলের মতো সেও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোনটা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্রমানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষাভুসোদের কমবয়সি মেয়ে-বউরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্যন্তই পৌঁছায়। বয়স্করা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া ছ্যাঁকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বউ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

ক্যান লা মাগি ? গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কী পাটা নিয়ে ? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ ! যা।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হলকায় হলকায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। সুরমা স্মিতমুখে মিষ্টিকথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে এক পা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা বুঝি শেষ পর্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দেবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে গামছা-পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ির মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, বাঃ বাঃ বেশ। একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্য পাতা তালগাছের কাণ্ডটার এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহুদূরের মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা !

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে ! শুনতে পাও না ?

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক সংবিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এলিয়ে যায়।

ডাকছে ? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি ? যাই লো গিরি, যাই !

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড়ো কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে জোগাড় করা তামাক।

আসেন। রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মতো। তিনজন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

তোমার বউকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর একদিন এসে আমরা দেখে যাব।

দিয়ে তো গেলেন। বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবার সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিটপিট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্বাঙ্গজোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

যাবে বলেছিলে, গেল না কেন রামপদ ?

তাই তো মুশকিল হয়েছে দিদিমণি।

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বউকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা কজন। ঘনশ্যাম একরকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষাভুসোদের, অর্থাৎ চাষি গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সেই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য কজন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদর। একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু !

নৌকোতে পাতবার শতরঞ্চিটা কাঁঠালতলায় বিছিয়ে তিনজন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তো এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোটো হয়ে গেছে। ছোটো ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদর মুখের দিকে। বউয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোনোদিন দ্যাখেনি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মতো নয়। একজন বড়ো মাতব্বর আর তার ধামাধরা কজন তুচ্ছ লোক রামপদর পারিবারিক ব্যাপারে নিয়ে কর্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। দু-চারজন হয়তো ঠাট্টা বিদ্রুপ করত কিছুদিন, দু-চারজন হয়তো বর্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কী কাণ্ড ? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোনো বাড়ির দশজন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দুজন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বউ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বউ কোথায় কমাস নষ্টামি করে ফিরে এসেছে, এ কী আবার একটা গণ্য করার মতো ঘটনা ? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা কজন যখন গায়ে পড়ে উসকে দিতে চাইছে সবাইকে, কী জানি কী ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, যাই হোক, বউয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ ?

আজ্ঞে আপনাবা ?

আমাদের ব্যবস্থা আছে। বউকে দুটি খেতে দাও তো তুমি। চালাটা তোলোনি কেন ?

তুলব। তুলব।

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে দুটি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদর সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝাপড়া হওয়া দরকার। গ্রামের একজন কর্মী শঙ্করের বাড়িতে তাদের এ বেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

নাইবে ? রামপদ শুধোয়।

মোর জন্যে রেঁধে রেখেছ ! বলে মুক্তা।

শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু ?

এগারো মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি বেশি রয়ে রয়ে অল্প দুটি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড়ো যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে : ছেলেটা তার ছিল সাতমাসের রামপদ যখন বিদেশ যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম কদিন। চাল ফুরলে কী দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কী ! তাতেই শেষ হল।

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয় ! আগে পাবত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু কমাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে ? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তার।

শেষ দুটো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—

মুক্তা এবার কাঁদে।

কেউ কিছু করলে না ?

দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে ? জানলে পরে রাজি হতাম, বাচ্ছাটা তো বাঁচত। মরণ মোর হলই, সেও মরল।

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ত দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

খোকন মরল, তোমার কোনো পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাইনে। এক রাতে দুটো মন্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশেমিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।

দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে ! রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝালো সুরে।—যা তুই, নেয়ে আয় গা।

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসে : রামপদ !

তুই খা।

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারি সমনজারির পেয়াদার মতো গরম গাম্ভীর্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

বউ এসেছে রামপদ ?

আজ্ঞে।

ঘরে নিয়েছিস ?

আজ্ঞে।

বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।

ভাত খাচ্ছে।

রামপদর ভাবসাব জবাব ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, তোর মতলব কী ?

রামপদ ঘাড় কাত করে।—আজ্ঞে।

বউকে রাখবি ঘরে ?

বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে ?

এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। মানসুকিয়ার চাষাভূসোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট সবাই যদি সব রকমে বর্জন করে রামপদকে, কথা পর্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদর। সমাজের নির্দেশ অমান্য করলে শুধু একঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না, তাও জানা কথা। টিটকারি, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে তখন। সবাই এ সব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুশি অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড়ো ভালোবাসে এমন যারা আছে কজন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড়ো খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়েরই মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যতা বেরিয়ে আসে। রামপদর কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়েই সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুন কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদর বিচার থেকে রোমাঞ্চলাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্ট বলে বসল, ছেড়ে দ্যান না, যাক গে। অমন কত ঘটছে, কদিন সামলাবেন ? যা দিনকাল পড়েছে।

আপনজনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য শহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশি জোরালো। এ রকম কিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও কটাই বা আছে !

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।

বটে ?

সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন একদিন, ঢুকে যেত, বিচারসভা ডেকে বসলেন। দশজনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা ? দুগগার কথা যদি তোলে কেউ ?

তুই চুপ থাক হারামজাদা। ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনটা রামপদর স্পর্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিকতে দিলে বউকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। আগের চেয়ে কত বেশি খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদর কাছে সে হার মানবে ! মনটা জ্বালাও করেও ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচারসভা। সদরে জরুরি কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দুটোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মতো হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে রকম। মনটা তার আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতি খাবার। গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্ণে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে।

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামি বিলাতি বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, দুজন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না—এই ! শোন, শোন। বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

ভাগছ যে ? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।

ওনারা কারা ?

তা দিয়ে কাজ কী তোমার ? গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে। ঢোক গিলে দাঁতে দাঁতে ঘষে।

মা নাকি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা ?

আছে না ?

আছে ? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর ? খেপেছে কে, মুই ! তা খেপিছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষ্মীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—

ও গিরিবালা ! সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভুঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে ?

ওনারা বলেছে বুঝি ?

মিছে বলেছে ? গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, ও বাবা ! মোর নেগে তুমি খুন হলে গো বাবা ! এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা। ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে : ও গিরিবালা ! তোমার বাবা মরেছে কে বললে ? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু। বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন ?

নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস। গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁটো বাসনগুলির অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমারা চারজনে বেরিয়ে

আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরি থেকো।

সকালে আসবে কেন ?

মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এসো, বসবে।

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কী করা যায় কী করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেশে বলে, গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি ? আমি বরং—

বরং টরং রাখো তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা নাগে। নয়তো কী কেলেঙ্কারি করি দেখো। ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছাড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক,। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না, কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছুদিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত ! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তে হত না ভদ্রঘরের ও এই ধিঙ্গি মাগিগুলোর কল্যাণে।

এত পয়সা করেছ, বিড়ি টানো। গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, রামপদর পেছনে নেগেছ তুমি ? একঘরে করবে ? সাধুপুরুষ আমার ! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না ? ওর বউকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি ? মোকে একঘরে করবে না সবাই ?

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘনঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে বুগণের যাতনাভরা লোলুপতা, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

বিলাতি ?

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।

মদের গ্লাসে দু-চারবার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোনো উপায় নেই। ভয় দেখানো জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীবু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, কী করি বল ? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব কদিন পরে। মাঝে সাঝে গাঁয়ে যেতে দিয়ো মোকে, অ্যাঁ ? ভেবো না, ফিরে আসব।

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ি ভিজে যায় গিরির। খিলখিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচারসভায় লোক খুব বেশি হল না, মানসুকিয়ার ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচ-ছটা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহুলোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা, নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্‌গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভালো লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচারসভা বসেছিল এই চাষাভুসো শ্রেণির, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কী চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গমগম করছিল। কী ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারি জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কী করা উচিত বুঝিয়ে দিতে !

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝবয়সি আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিতভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে---উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জনসাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের সঙ্গে আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে। সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড়ো কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বারবার গিরির ওপরে গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্বপরামর্শ মতো বুড়ো টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা শুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আর একটা হাতাছেঁড়া ময়লা খাকি শার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, কীসের বিচার ? কার বিচার ? রামপদর বউ কোনো দোষ করেনি।

সবাই জানে, বনমালীর বউকে সদরের দত্তবাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যাবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বউটাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি করে কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনও সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, আহা, দোষ করছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।

বনমালী রুখে বলে, বটে ? কোনো দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি ? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোনো মেয়েছেলে গাঁ ছেড়ে কদিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ !

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামি কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কীসের ?

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দুটি খেতে-পরতে দিতে ?

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বউ আর বড়ো ছেলের বউকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিনজনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ওনি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থরথর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব।

কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কী ? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পাড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মতো মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, খেটে খায়নি তো কী ? মোরা একসাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু বাড়ি ঝিগিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার ?

প্রায় সকলেই জানে এ কথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য করে দেয়—খুব বেশি নয়। যে দিনকাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দীই শুধু বলে, কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণি বলছে সে নিজের চোখে—

মাঝবয়সি বেঁটে ফণি চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও কথা বলতে যাব ?

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারও মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু হাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, যাক, যাক। ভাইসব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলবে না। আমি বলি কী, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদর ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।

বনমালী ফুঁসে ওঠে, কীসের প্রাচিত্তির ? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কীসের ?

গিরি গলা চেরে, মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি তবে ?

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বউ চোখভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধরে চুমো খেতে গিয়ে গলাটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিতভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিতভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই ?

বনমালী আশ্চর্য হয়ে যায়।—ফিরে নেবে না তো খুঁজে মরছি কেন ?

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘরসংসার আর যোগ্য না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসারের। কিন্তু কী হবে ও কথা বলে বনমালীকে ? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বউয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বউ হিসাবে ওর বউয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

চেষ্টা করে দেখি কী হয়। বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানসুকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলার ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজকাল বেলতলার ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানসুকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা চাপা দিতে—

ঘনশ্যাম বলে, চোখ-কান নেই ? দ্যাখোনি, আমি কী বলি না বলি তাতে কী আসত যেত ? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।

গিরির বাড়ি বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ি যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

কে গা ?

আমি গা গিরি, আমি।

অঃ ! এত রাতে এখানে বসে আছ ?

এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এল, গাঁয়ে গিরির মন টিকবে কি টিকবে না।

কী দেখলে ?

টিকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটা ছেলেপিলে যদি হত তোর, ক বছর ঘর-সংসার যদি করতিস, তবে হয়তো—না, গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিকবে না।

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দুটো ভারী কথা না শুনেই, ভালোমতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কীসে যেন টান পড়ে টনটন করে উঠেছে বুকের শিরাটিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেক বার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথামুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, মা ? ওমা ?

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, কে গো বাছা তুমি ? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে ?

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশিদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, খেত, ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এ সবই জোগাত ভরসা, রাতদুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সংগত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছমছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কী দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে শহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এই রকম কোনো ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়োই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কী সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ি। বাড়ির সামনে ভাঙা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশির সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, কে ? কে গো ওখানে ?

কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনি করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে, মা, মাসি, খুড়ি, পিসি, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি বউ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুনসির সঙ্গে দু আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতি ধুতিখানা বাড়ির মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোনো সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বউ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজো ছেলে পটলের বউ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা ?

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

আর সয় না।

বলে শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাশ করে ঠুকে দেয়। আর সয় না, আর সয় না গো ! বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধুলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা !

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজেকে আর বউটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এ পাশে রাস্তা এবং ও পাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দু বিঘে বিচ্ছিন্ন ধান-জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটী। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেয়াল, বাঁশের দুয়ার, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপথপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, বাড়াবাড়ি করছিস ছোটো বউ, বাড়াবাড়ি করছিস বড়ো। মোর কাছে তোর লজ্জাডা কী ?

তার বউ মানদা ভেতর থেকে বলে, মুখপোড়া বজ্জাত ! বোনকে কাপড় দিয়ে বউয়ের সঙ্গে মশকরা ? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা তক ঝাঁপের দু পাশে এমনি গালাগালি চলে দুজনের মধ্যে। বাড়ির তিনদিকে মাঠ ভরে শণ উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাশরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শণের বনের মাঝখানের পায়ে হাঁটা পথ ধরে বেনারসি শাড়ি পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু হকুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দ্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত দুটো চারটে বাসন আর কলসি নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগি ?

শণ খেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মশকরা করে বেনারসি পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোলো বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালানো চলে। ইস ! কী সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

অ বিন্দু ! দাঁড়া। রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড়ো ডর লাগছে আজ।

বেনারসি পরা মালতী বলে, ইহিরে, খুকি মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল কাপড়। যাবি তো চ, নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে যা।

বৈকুণ্ঠ বলে, ঝাঁপ ভাঙব ছোটো বউ।

মানদা বলে ভাঙো—মাথা ভাঙব তোমার আমি।

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামির কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কী?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বারো। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগারো দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, মা, ওমা ! খিদে পায় যে ?

ভূতি বলে ভেতর থেকে, শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।

পাড়তে পারি না যে। তুই দে।

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, যাবো ? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কী আসে যায় ? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুইই বল মা, যাবো ? বল মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল !

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে ? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না, জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুকনো, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

দাঁড়া একটু।

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দু হাতে মুখ ঢেকে শুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝেয় ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।

রাবেয়া কদিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষির ঘরের বউ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ। খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন ?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, আজিজ সাব খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।

সবুর ! আর কত সবুর করব ? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার। শেমিজ না পরলে দু ফেরতা শাড়ি পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোনো দিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায় ? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী ! আল্লা, এ কোন মরদের হাতে সে পড়েছিল !

রাত্রের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুনের বস্তা ! বস্তার নীচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে ! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শো চাষি ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াই শো ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এ ভাবে সিধে আক্রমণের উসকানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজো ছেলে বঙ্কু আর তার সতেরো জন সাঙ্গোপাঙ্গ। সতেরো মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশো তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শো গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এ সব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সওয়া মাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পালটা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারও ভাবতে হবে না। মনোহর শার প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কী।

দুজনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট করা কাপড়ের ভাগ তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটোখাটো একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পুব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হল ?

গোলমাল হয়েছে একটু।

গোলমাল ? কীসের গোলমাল ?

কলকাতা থেকে মাল আসেনি। ভাইসব, আমরা জীবনপাত করে—

বঙ্কুর সাঙ্গোপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরোমরো হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিশ দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুনে গুনে চালান দিল।

ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের কোটা আসেনি।

কবে আসবে ?

আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে ?

হতাশ ম্রিয়মান জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরি রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের

মতো হাত নেড়ে ইশারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইশারা দ্যাখে, ড্রাইভারকে কী যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরিটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধুলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দুপা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনও ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোশাক পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে ! লাল পাগড়ি আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কীসের যেন চ্যাপটা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে যেন ভেতরে কাঁচা কয়লায় আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

কীসের ভিড় ?

কাপড় চায়।

হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ি। বাড়ির সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ি তল্লাশ করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে। রসুই ঘরে ফেরারি ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ি সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল মশায়। সব কটাই প্রায় বুড়ি, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কী বলব আপনাকে ! পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো, গায়ের রং দেখে তো আমি মিস্টার—

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশি। এ ভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাতলে দিত।

জান নয় দিলাম রে আব্বাস, আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, কী জন্যি জানটা দিব তা বল ?

ভোলা বলে, লুট করে তো আনতে পারি দু-এক জোড়া, কিন্তু তারপর ?

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোটো চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড়ো হবে। কদিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ির বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারের বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ি পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা কজন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরির কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতেরো মাইল দূরে কাপড় তৈরির কলে, তবে কেন ও অবস্থা তাদের ? সবাই ভাববার চেষ্টা করে।

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

তবে যে টেঁচরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে ? সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে একঘণ্টা ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ি গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ি না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ি ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভালো করে বুঝতে চান আগে। কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ি অন্তত আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক, তাও মন্দের ভালো। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্তত বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, জানি। তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু-চারদিনের মধ্যে শাড়ি পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, জানি।

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ি। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনোয়ার অনেকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, খাবেনি ? চলো।

চলো।

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

ঘিন্না লাগে বড়ো। গা কুটকুট করছে।

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

ফের নেয়ে নি।

ঘর থেকে ভরা কলসি এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

পানি ঢেলে দিলি সব ?

ফের আনব।

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এ রকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু-তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগেও কেশব ভালো ছেলে খুঁজেছে, নগদ গহনা জামা-কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশি না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটেনি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলেমেয়ের এবং ওই শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভালো করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড়ো ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাস্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরনের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে জোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আর একটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেকদিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরি হয়ে গেল।

সদয় ডাক্তার বলল, পাগল, ও খুব ভালো কুইনিন। নতুন ধরনের কুইনিন—খুবই এফেক্টিভ। নইলে দাম বেশি নিই কখনও আপনার কাছে ?

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন ? শুধু কুইনিনে কখনও জ্বর সারে ? পথ্য চাই না ? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোটো ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সে জন্য কেশবের মনে কোনো আপশোশ নেই। সে বরং ভাবে যে মেয়েটা মরে বেঁচেছে। সেও বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড়ো মিষ্টি। বড়োই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাশে। ছোটো ছোটো চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কীভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক,

কালাচাঁদের দাদা কীভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কাঁলাচাঁদ তাকে জোর জবরদস্তি করে একটা বাড়ির বাড়িউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ি নয়। অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়িতে তখন দশ বারোটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়িটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু বাড়িতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতেরো আঠারো। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ির কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধা-হাতা শেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কী আর এ সব ঘরের মেয়ে বাগানো যায় ? তাছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভালো খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরি করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলানো রূপসৃষ্টির স্থূল রঙিন ফুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আপশোশ করে কালাচাঁদ বলে, আহা চুক্ চুক্ ! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায় !

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দুটি একটু ছলছল পর্যন্ত করল না ! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কী যেন হয়েছে দেশসুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ও সব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

শহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি, নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে !

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারি এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দু বেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়িও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর শেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে এক সময়।

শৈলকে নিয়ে যাবে ? চিকিচ্ছে করাবে ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বড়ো কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যাবসা সম্পর্কে কানাঘুষো কেশবের কানেও এসেছিল। সে চাপা আর্তকণ্ঠে বলে, তোমার বাড়িতে রাখবে ? শৈলিকে বাড়িতে রাখবে তোমার ?

বাড়িতে নয় তো কোথা রাখব চক্কোত্তি মশায় ?

কেশব রাজি হয়ে বলে, একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি। কালাচাঁদ খুশি হয়ে বলে, বুধবার আসব। একটু বেশি রাতেই আসব, গাড়িতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কী আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ি গেছে। কেশব চোখ বুজে বলে, কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারও অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটাতে বড়ো সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে ! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এ ভাবে বিক্রি হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ কটাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

ছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত ? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ি সচল হয়। তালাধরা কানে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুলচন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উলটো-পালটাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলর বাপ !

কচুশাক দিয়ে ফেনভাত দুটি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড়ো বড়ো হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই ! কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না ; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোটো ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ সানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পইতে মুখেভাতে চিরকাল সানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে সানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনোমতে বাড়ি এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এ রকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়িতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা

স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সেই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়িতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ি রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়িতে যেন তখনও অস্পষ্ট সুরে সানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, ও বাবা কালাচাঁদ।

আজ্ঞে ?

এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ?

এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না ? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়িতে আছে। তিন বস্তা চাল—

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, চটপট করাই ভালো। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, মালগুলো সব আনগে যা বদ্দি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়িতে বসে থাকে।

মেঝে লক্ষ করে কালাচাঁদ টর্চটা জ্বেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙিন-শাড়ি, শায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

একটা তবে অনুমতি করো বাবা।

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

বলুন।

শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।

বিয়ে ? আপনি পাগল নাকি ?

শৈলর হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে যে বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক, তবু বেশি লোক সঙ্গে না করে মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, যা করবার করুন চটপট।

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙিন শায়া ব্লাউজ

শাড়ি পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেটব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, শিগগির করুন। ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভালো লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজি না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়া মাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গাও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানির কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোনো পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয় ; কালাচাঁদের ভালো লাগছিল না। শৈলও থ বনে গিয়েছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, আমি যাব না।

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ির আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হালকা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁগোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায় ? আর কি মেয়ে নেই পিথিমিতে ?

কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।

ঝোঁক চেপে গেল ! মাইরি ? ওই একটা বোঁচানাকি কালো হাড়গিলে দেখে ঝোঁক চেপে গেল !

দুত্তোরি, সে ঝোঁক না কী ?

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেককাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিস। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথাব্যথা, আদরযত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও শেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হালকা দামি ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

ওকে বাড়ি নিয়ে যাব ভাবছিলাম।

কেন ?

মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বউ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ি নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী চাকরানির মতো।

দুজনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে বাকি দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ি নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

শৈলির ঘরে লোক আছে।

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

লোক আছে ! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুনতে আরম্ভ করল। গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

লোকটা কে ?

সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশি টাকা কী ? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।

বুড়ি

বুড়ির বড়ো পুতি আজ যাবে বিয়ে করতে। ছেলের ছেলে তার ছেলে, বড়ো সহজ কথা নয়। বুড়িকে বাদ দিয়েই বাড়িতে চলেছে আপনজনে-ভরাট বাড়ির ছেলে বিয়ে করতে গেলে যত কিছু কাণ্ডকারখানা হয়—রোজ সংসারের সাধারণ হইচইও যেন ওকে বাদ দিয়ে চলে। তবু যেন বুড়ি আজও হাজির আছে সব কিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে, বাড়ির প্রতিদিনের সমবেত জীবনযাত্রাতেও যেমন থাকে। তিন কুড়ি বছরের জীবন্ত উপস্থিতির অভ্যস্ত ডালপালা আব শিকড় নিয়ে আছে—বড়ো ঘরের পশ্চিমের ওই মরা হাজা শুকনো গাছটার মতো, যার ডালে সারাদিন পাখি কিচিরমিচির করে আর নিশুতি রাতে ভাঙাচোরা হাওয়া আওয়াজ তোলে মরমর মরমর।

ন্যাকড়া কাঁথার কাঁড়ি আর পুঁটুলি বালিশ নিয়ে বুড়ি দাওয়ায় বসে থাকে, দাওয়ায় চালা নিচু করে নামানো। মরচে-ধরা কোমর, বাঁকা পিঠ, শণের নুড়ি চুল, লোল চামড়া, ফোকলা মুখ, তোবড়ানো গাল, ছানিকাটা নিষ্প্রভ চোখ। লাঠি ধরে গুটি গুটি চলতে ফিরতে পারে, শক্তই আছে মনে হয় চামড়া-ঢাকা হাড় আর পাঁজর-ঢাকা ফুসফুস—বেশ জোরে চেঁচাতে পারে। শুয়ে বসেই থাকে বেশি, বিড়বিড় করে আপন মনেই বকবক করে কাটায় বেশির ভাগ সময়। থেকে থেকে তারস্বরে সংসারের খুঁটিনাটি ব্যবস্থার সমালোচনা করে। পোড়া তামাকপাতা গুঁড়ো খায়। মাঝে মাঝে অকারণে অদ্ভুত আওয়াজে খলখলিয়ে হাসে।

মরণ ! বলে বউ আর নাতবউয়েরা। কেউ জোরে, কেউ নিচু গলায়। নিচু গলায় বলে কচি বউয়েরা। বুড়িকে মান্য করে নয়, বুড়ি শুনলেও কানে তোলে না, কানে তুললেও কিছু আসে যায় না। ছোটো মুখে বড়ো কথা শুনে শাশুড়ি ননদরা পাছে চটে যায়, এই ভয়।

নন্দ বাহারে চুল ছেঁটেছে নিতাই পরামানিককে দিয়ে। নগদ আটগন্ডা পয়সা আদায় করেছে নিতাই, তার ছেলে বরের সঙ্গে যাবে, কত কিছু পাবে, তবু। বাড়ির সাতজন এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিতাইকে মন্দ বলেছে। এ রকম দিনে ডাকাতি এদের সয় না।

বুড়ি ডাকে পুতিকে, বলে, অ নন্দ, অ ঘাড়-ছাঁটানি ছোঁড়া, শোন, শোন ইদিকে, একটা কথা বলি। বিয়া তো করবি ছোঁড়া, মেয়াটা কুমারী বটে তো ?

নন্দর মা শুনতে পেয়ে জাকে বলে, মরণ ! কথা শোনো বুড়ির। তারপর চিন্তিত হয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, নয় বা কেন। মেয়া নাকি বড়ো বাড়ন্ত ধাড়ি মেয়া।

ঘর ভালো।

ভালো ঘরে মন্দ বেশি। নয় ধাড়ি করে রাখে মেয়াকে ?

বুড়ির কাছে উবু হয়ে বসে নন্দ বলে, কুমারী না তো কী—তোর মতো বুড়ি ?

পাবি মোর নাখান কুমারী পিথিমি ঢুঁড়ে ? ফোকলা মুখে বুড়ি গালভরা হাসি হাসে, একরাত্তির শুয়েছি তোর দাদুর সাথে ? বিয়ের রাতে ভোঁস ভোঁসিয়ে পটল তুলল না তোর দাদু ! সে এক কাণ্ড বটে ! ভোঁসভোঁসানি শুনে আমি তো ডরিয়ে গিয়ে কান্না ধবেছি গলা ছেড়ে—হাউমাউ করে দোর খুলে বাইরে গিয়ে। বাড়িসুদ্ধ ছুটে এসে বলছে, কী কী, হয়েছে কী ? আর হবে কী, মোর কপাল ! বুড়োর ততখনে হয়ে গেছে গা। বুড়ি খলখলিয়ে হাসে।

পুতি কিন্তু তার হাসে না। পুতির মুখে তার দ্বিধা সংশয় সন্দেহ, অবিশ্বাসের পাতলা মেঘ। খানিক ঘাড় বাঁকিয়ে থেকে সে বলে, তাও হবে বা। মস্ত ধেড়ে মেয়ে, ও কী ঠিক আছে !

বুড়ি গালে হাত দেয়।—মর তুই বাঁদর। নিজে না পছন্দ করলি তুই বড়ো মেয়ে দেখে ?

তা তো করলাম—

বোকা, হাবা, বজ্জাত ! কুমারী মেয়ে নষ্ট হয় ? আমি নষ্ট হইছি ? বিয়ার রেতে সোয়ামি মোলো, দিন দিন যেন বাড়ল সবার মোকে নষ্ট করার চেষ্টা, নষ্ট হইছি আমি ? কুমারী না হই তো তোর বাপের কীরে ! মেয়া বদ হয় সোয়াদ পেয়ে, কুমারী কি খারাপ হয়রে বেজম্মার পুত ? মরণ তোর !—ষাট, ষাট ! দুগগা, দুগগা ! তোর বালাই নিয়ে মরি আমি।

সত্যি বলছিস ? পুতি বলে তার মেঘকাটা মুখে আলো ফুটিয়ে।

না তো কী?

কাজ অকাজের ফাঁকে ফাঁকে সবাই দ্যাখে নন্দ উবু হয়ে বুড়ির সামনে বসে আছে তো বসেই আছে। কথার যেন শেষ নেই দুজনের। থেকে থেকে দুজনে আবার হেসে উঠছে খলখলিয়ে, হিহি করে।

মেনকা হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, আমি কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ? মোর কে আছে ?

নন্দর বউকে বাড়ির কারও পছন্দ হয়নি। একে ধাড়ি মেয়ে, তাতে দূর সম্পর্কের মামাবাড়িতে মানুষ, বিয়েতে পাওনাগন্ডা জোটেনি ভালোরকম, গয়না যা দেবে বলেছিল মেয়ের ধড়িবাজ মামা—তা পর্যন্ত সবগুলি মেনকা নিয়ে আসেনি। তার ওপর নন্দ নিজে পছন্দ করে বাড়ির লোকের অমতে তাকে বিয়ে করেছে—বিয়ে করে এনে বাড়ির লোকের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে মাথায় করে রেখেছে বউকে। বিয়ে সম্পর্কে ছেলের অবাধ্যতার জ্বালা মানুষের জুড়োয় না, মন বিষাক্ত হয়ে থাকে বউয়ের ওপরেই। রোজগেরে ছেলের ওপর তো গায়ের ঝাল ঝাড়া যায় না !

তার ওপর বিয়ের এক বছরের মধ্যে নন্দ মারা গেল। বর্ষার শেষে পথঘাট উঠানের কাদা যখন শুকোতে আরম্ভ করেছে, বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে নন্দ তখন বউ নিয়ে দু মাসের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যাবার জন্য আয়োজন করছে। এ বাড়ির কোনো বউ কোনো কালে একা স্বামীর সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোথাও বেড়াতে যায়নি।

এমন অলুক্ষুনে বউকে কে বাড়িতে রাখবে ?

মেনকার মামাকে লেখা হয়েছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। সে জবাবও দেয়নি, রাখালের সঙ্গে তাকে তাই পাঠিয়ে দেবার আয়োজন হচ্ছে। মামাবাড়ির দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে রাখাল চলে আসবে, তারপর যা হবে তা বুঝবে মেনকা আর তার মামা।

মেনকা কিন্তু যেতে নারাজ। মামাবাড়িতে শুধু মারধোর আর ছ্যাঁকা দেওয়ার ভয় থাকলে কথা ছিল না, মামাবাড়িতে তাকে ঢুকতেই দেবে না সে জানে। দরজা থেকেই তাকে পথে নামতে হবে।

মেনকা তাই হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, আমি কোথা যাব ? কার কাছে যাব ?

রোয়াকে বসে বুড়ি ডাকে, এই ছুঁড়ি, শোন।

মেনকা কাছে এসে দাঁড়ায়।

কাঁদিস কেন হাপুস চোখে, জোয়ান মদ্দ মাগি ?

আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে গো।

তাড়িয়ে দিচ্ছে ? কে তাড়িয়ে দিচ্ছে ? তাড়িয়ে দিলেই তুই যাবি ? তোর শ্বশুর ঘর, কে তাড়াবে তোকে ?

মেনকা চুপ করে থাকে।

মোকে পেরেছিল তাড়াতে ? একরাত ঘর করিনি সোয়ামির, বিয়ের রাতে ছটফটিয়ে মোলো। সবাই বলে, দূর দূর, অলুক্ষুনে বউ ! বিয়ে হল, সোয়ামি খেয়ে কুমারী রল, একি মেয়ে গা ? দূর ! দূর ! আমি গেলুম ? মাটি কামড়ে রইলাম এখানকার। পারল কেউ তাড়াতে মোকে ? অ্যাদ্দিন তুই সোয়ামির সঙ্গে শুলি, বাড়ির বউ হয়ে রলি। তোকে যেতে বললে তুই যাবি ? মাটি কামড়ে থাক। খুঁটি আঁকড়ে থাক।

মেনকার চোখে আশার আলো দেখা দেয়। সে সামনে উবু হয়ে বসে বুড়ির।

বাড়ির সবাই তাকিয়ে দ্যাখে মেনকা আর বুড়ির মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস কথা চলেছে তো চলেইছে, কথার যেন শেষ নেই !

গোপাল শাসমল

সাতপাকিয়ার গগন শাসমলের ছেলে গোপাল গিয়েছিল জেলে। একদিন ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরল। জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়িতে ছিল মন পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গোরু, পুঁইমাচা লাউ-মাচা আর তিনটে সজনে গাছ। বাড়ি ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গোরুটা নেই, পুঁইমাচায় নেই পুঁই, আর লাউমাচায় নেই লাউ। সজনে গাছ তিনটে আছে। সজনে গাছ তিনটির বয়স প্রায় গোপালের সমান। গাছগুলির অনেক ডাঁটা আর আঠা গোপাল খেয়েছে। জেলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ডাঁটার চচ্চড়ি এবং ছেলেমানুষ থাকার বয়সটা পার হওয়া পর্যন্ত আঠা। আধপেটা ভাত খেয়ে এই ত্রিশ বছর সে জমাট বাঁধা সজনে আঠা সংগ্রহ করে করে চিউয়িং গামের মতো চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল এই কথাটাই ভাবল যে জেল-ফেরত ছেলেকে আধপেটা ভাত দিতে মা উপোস দিয়েছে আর বোনকে না খাইয়ে রেখেছে, এ তো ভাল কথা নয়। এর চেয়ে জেলে থাকাই যে ভালো ছিল !

তারপর গাঁ ঘুরে আসতে বেরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার সাধ হতে লাগল, পথের ধুলায় কিম্বা কাঁটা বনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছে তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে। বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। খুব বেশি জীবন্ত কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু যেটুকু ছিল তাতেই দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি পূজাপার্বণে উৎসব এমন কী সময় সময় মারামারি কাটাকাটিও করেছে গাঁয়ের লোক। আজ সকলে ধীর স্থির শান্ত সুবোধ মানুষ—চোখে হতাশার পর্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন—আর কেন, কী আর হবে, সব মায়া, মরা ভালো ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এত ব্যাপক না হলেও অন্য রোগেরও ছড়াছড়ি। এমন প্যাঁচড়া গোপাল জীবনে কখনও দ্যাখেনি। যাকে ভালো করে ধরেছে তার হাড়ে লাগানো মাংসটুকু পর্যন্ত যেন খসে খসে পড়ছে। গফুর আর বনমালীকে দেখে প্রথমে সে ভেবেছিল এ বুঝি কুষ্ঠ বা ওই ধরনের কোনো ব্যারাম। ভূষণের কাছে সে রোগের নামটা শুনল। ভূষণের হাতে ও পায়ে প্যাঁচড়া হয়েছে।

ভূষণ গোপালের মামা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু আরও বুড়ো দেখায়। একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। জোতদার কানায়ের কাছে বিশ বাইশ বছর কাজ করার অবসরে সব আবার ভুলে গেছে।

কাজ ? না, কাজ নেই। অসুখে ভুগলাম দু মাস, তারপর হাতে পায়ে হল এই প্যাঁচড়া। ভাগিয়ে দিয়েছে।

আজ শুধু বুড়ো নয়, ভূষণকে কেমন অদ্ভুত দেখায়। মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দু হাতের থাবা উঁচু করে তার বসার ভঙ্গিটা পাছা-পেতে-বসা বুড়ো ভালুকের মতো। থ্যাবড়া মুখটা এমন লম্বাটে হয়ে গেছে, দুপাশ থেকে যেন পিষে দিয়েছে কোনো জোরালো পেষণ যন্ত্র।

নগা কিছু করছে না ?

ঘানি টানছে। তুই যা অ্যাদ্দিন করে এলি। আমায় ছাড়িয়ে দেওয়ায় কানায়ের ওপর চটে ছিল। সীতু, রাখাল, বদ্যি আর কটা ছোঁড়াকে নিয়ে কেনালে কানায়ের চালের নৌকো ধরিয়ে দিতে গেছল বাহাদুরি করে। ফাটা মাথা নিয়ে ডাকাতির চার্জে জেলে গেছে। ব্যাটা কুপুত্র চণ্ডাল। দু বেলা খেতে পাবার মতলব ছিল ব্যাটার।

ভূষণের মেয়ে রতন এসেছিল একখানা তাঁতের কাপড় পরে।

কী যা-তা বলছ বাবা। দাদা গেল তোমার জন্যে শোধ নিতে, তুমি বলছ তার মতলব ছিল। খেতে পাবার জন্যে কেউ জেলে যায় ?

বলে সে হাঁটু বাঁকাবার যন্ত্রণায় মুখ বাঁকিয়ে গোপালের পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করল।

গোপাল এসে মামাকে প্রণাম করেনি। যাবার সময় ভূষণের পায়ের পাতার আধ হাত তফাতে মাটি ছুঁয়ে সে প্রণাম সারল।

পথে নেমে জোতদার কানায়ের বাড়ির দিকে হাঁটকে হাঁটতে গোপাল ভাবে, পৃথিবীতে যা সব ঘটছে তা তার বোধগম্য হবে না। বিশ বছরের বেশি যে কাজ করে এসেছে সে দু মাস অসুখে ভুগে অশক্ত হয়ে পড়ায় কানাই তাকে ভাগিয়ে দিল ! কেবল তাও তো নয়। দু এক যোজন দূরের হোক, কানায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্কও যে আছে তার ভূষণমামার। যে সম্পর্কের জোরে তারও অধিকার আছে কানাইকে বড়োমামা বলার।

জোতদার কানায়ের বাড়ির কাছে এসে কান্নার আওয়াজ শুনে গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাঁয়ে পা দেবার পর এই কান্নার শব্দে যেন তার নিজস্ব একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার আবেষ্টনী ভেঙে পড়ল এতক্ষণে, বেলা যখন খতম হয়ে এসেছে। এখন তাব খেয়াল হল, গাঁয়ের এতগুলি নারীপুরুষের বুকভরা শোক কান্নায় রূপ পায়নি, কান্না সে শোনেনি গাঁয়ে এসে। মৃত্যুপুরীর নীরবতাকে এতক্ষণ সে অনুভব করেছে কিন্তু কতগুলি জীবন্ত কঙ্কাল চোখে পড়ায় সে অনুভূতিকে বুঝতে পারেনি। অথচ এ অনুভূতি তার কত চেনা ! কতবার জনহীন শ্মশানে তার হৃদয় মন এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

দাওয়ায় বসে কানাই আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে অদৃষ্টকে শাপ দিচ্ছিল ! গোপাল প্রণাম না করায় চটে গেলেও শ্রোতা পাওয়ায় সে খুশি হল। তার ছেলের আজ ফিট হয়েছে। দু বছরে তেরো হাজার টাকা উপায় করেছে এমন সোনার চাঁদ ছেলে। কোনো বিশেষ অপদেবতা বা অপদেবী নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কেন এই নজর দেওয়া, এত ধম্মো কম্মো পূজা অর্চনা করার পর !

দু বচ্ছর চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাবার জন্যে হবে বা ? শশী একটু ভয় কাতুরে বটে তো।

কীসের ভয় ভাবনা ? সবিস্ময়ে কানাই শুধোয়।

এই ধরা টরা পড়ে জেলে যাবার ভয়। চোরাই কারবারে ভয় তো আছে।

কচু আছে। হাজার হাজার লোক করেছে না ও কারবার ? তুই বাঁদর, জেল খাটিস। ওর জেলের ভয়টা কীসের ? থেমে গিয়ে কানাই থুতনিটা ঘন ঘন এ পাশ ও পাশ নাড়ে আর লোমবহুল বুকে বাঁ হাতের তালু ঘষে—অম্বলের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকটা।

সুধাময়ী এসেছে আজ।

বটে নাকি ? বেশ।

এয়েছে মানে আমি আনাইনি—এয়েছে। এনে ফেলে দিয়ে গেছে আমার বাড়ি। বেয়াই বেটা, জানিস গোপাল, বজ্জাতের ধাড়ি।

গোপাল খবরটা শুনেছিল। কানাইয়ের মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছিল গত বছর আশ্বিন মাসে। এ বছর কার্তিকের গোড়ায় সে প্রসব হতে এসেছে বাপের বাড়ি। জামাই এসে রেখে গেছে।

হুঁকো এসেছিল। কানাই হুঁকো টেনে কাশে আর বলে, পেটে তিনবার লাথি মেরেছে। নক্কে ভেসে যাচ্ছে পিথিমি। তাই ফেলে রেখে গেল হারামজাদার দল। এখন আমি ডাকব ডাকতার

কোবরেজ, টাকা খসাব মুঠো মুঠো—মরবে জানি, তবুও সব করা চাই। কেন বাবা ? তিলে তিলে দগ্ধে মারা কেন বাপু ? মরণ সংবাদ দিলেই হত একবারে !

ডাকতার এনেছেন কাকে !

মধুকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়েছি। ওর গাছগাছড়া অব্যথ্য। ভীমের মাকেও আনেয়েছি। ও বড়ো ভাল দাই। একাজ করে করে চুল পেকে গেছে।

গোপাল শোনে আর ভাবে, কানায়ের বাড়ি কেন এসেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হঠাৎ উঠে সে বিদায় নেয়।

কানায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জীবনে প্রথম নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করে গোপাল নিজেকে ধিক্কার দেয়, ভূষণের বাড়ির কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত। সুধার রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। ভীমের সত্তর বছরের বুড়ি মা, যে কানে কম শোনে, চোখে কম দ্যাখে, সে সুধাময়ীকে মারছে। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য মনে তার কেটে কেটে বসে গিয়েছে অথচ দুঃখ বেদনার বদলে সে অনুভব করছে সন্তোষ ! যা হওয়া উচিত এ যেন তাই হয়েছে ! নিয়ম রক্ষা—নীতির সম্মান বজায় থেকেছে। কানাই কষ্ট পাক, তাতে পরম তৃপ্তি বোধ হোক, ততখানি হিংসুটে ছোটোলোক হতে জেলখাটা গোপালের আপত্তি নেই। কিন্তু কানাইকে শাস্তি দেবার জন্য সুধাময়ীর রক্তে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়ার মতো অমানুষ হওয়া কি তার উচিত ?

গাঁয়ের অনেকের বাড়ি ঘুরেও কার কজন আপনজন না খেয়ে মরেছে শুনেও, ভূষণমামার সঙ্গে আলাপ করে সুধাময়ীর জন্য ব্যথা বোধের অক্ষমতায় গোপাল কাবু হয়ে রইল। ভূষণের বাড়ির কাছে যখন সে পৌঁছাল, সন্ধ্যা উতরে গেছে। চাঁদ বুঝি উঠবে মাঝরাতের কাছাকাছি, আকাশের কুয়াশায় তারাগুলি ম্লান, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ভূষণের মেয়ে রতন সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে এসে গোপালের হাত ধরল।

চাল এনেছ তো ? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু—হুস করে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল।

কে ? কে তুমি ? প্রশ্ন না করেই রতন তাকে ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তখন আবার গোপাল টের পেল পথ নির্জন। সন্ধ্যার খানিক পরেই এত বড়ো গাঁয়ের মৃত জনহীনতায় একা সে জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দায়িক হয়ে। সুধাময়ীর কথা সে ভুলে গেল। রতনকে সে বড়ো স্নেহ করত।

মঙ্গলা

শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মঙ্গলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ডোবা থেকে উঠে আসে। পুলিশ হঠাৎ গাঁয়ে হানা দিয়েছিল মাঝরাতে। সেই থেকে এই সকাল পর্যন্ত সে ডোবার জলকাদায় আগাছার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছে।

হাঙ্গামার পর থেকে এই নিয়ে পুলিশ সাতবার হানা দিল গাঁয়ে। আবার যদি হানা দেয় কিছুকাল পরে, শীত যখন আরও বেড়ে যাবে, এতক্ষণ ডোবায় এ ভাবে লুকিয়ে থাকতে হলে ডোবার মধ্যেই সে জমে কাঠ হয়ে যাবে নিশ্চয়, উঠে আর আসতে হবে না। অঘ্রানের শেষেই হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে, পোষ মাঘের বাঘ মারা শীত সইবে কতক্ষণ !

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে দিশেহারা হয়ে ছুটে ডোবায় নামবার সময় বাঁ পায়ের তলাটা কীসে যেন কেটে গিয়েছিল অনেকটা, ভাঙা কাচে না শামুকগুলিতে কে জানে। কত রক্ত যে বেরিয়ে গেছে দেহ থেকে ঠিকানা নেই। আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি বহুক্ষণ, চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়েছে সে বেশ টের পেয়েছে। আঁচলটা কী লাল হয়েছে দ্যাখো।

সকাল বেলার রোদের মৃদু তেজে মঙ্গলার অসাড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ধীরে ধীরে সাড়া আসে, ঘনঘন কেঁপে কেঁপে সে শিউরে ওঠে। হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে ফুঁপিয়ে। প্রায় জমে যাওয়া অনুভূতিগুলিও যেন তার সূর্যের তাপে এতক্ষণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি শীতের কাঁপুনি কমাতে কানাই এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়েছিল। দুহাতে ছিলিমটা পাকিয়ে ধরে সাঁসাঁ করে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আধবোজা গলায় সে বলে, কাঁদিসনি মঙ্গলা। পরের বার ভাগবনি আর। ঘরে থাকব। যা করার করবে।

পাছা টনটন করে ওঠে মঙ্গলার। পাছায় সে বেত খেয়েছিল দুমাস আগে, সে ব্যথা আজও থাকার কথা নয়। তবে উলঙ্গ করে বেত মারা হয়েছিল বলে বোধ হয় ঘটনার সঙ্গে শারীরিক বেদনাটাও তাজা কটকটে হয়ে আছে স্মৃতিতে।

কানাইয়ের ছোটো ভাই বলাই ডোবায় না গিয়ে উঠেছিল বাড়ির দক্ষিণে তেঁতুল গাছটায়। ওদের মতো জলকাদায় ভিজে শীতে কষ্ট না পেলেও সমস্ত শরীরটা তার ব্যথায় টনটন করছে। কলকেটা নিয়ে দাদার দিকে পিছন ফিরে বসে টান দিয়ে সে বলে, মোদের আর কিছু করবে না মন করে। ফেরার ক জনার জন্যে তো হানা দিচ্ছে, মোদের মারধোর আর না করতে পারে।

বলেছে তোমার কানে কানে, পিরিতের স্যাঙাত তুমি।

মঙ্গলা গর্জে ওঠে। সেই সঙ্গে তারস্বরে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগতে যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের চোদ্দোপুরুষকে।

বাড়ির সামনে পথ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি শুনতে পায় অধর ঘোষাল। হনহনিয়ে বাড়ির মধ্যে এসে মুখে হাত চাপা দেওয়ার মতো ব্যস্ত বিহ্বল মানায় তাকে থামিয়ে দেয়।

থাম ছুঁড়ি, থাম। কে গিয়ে খবর দেবে, মরবি যে তখন ?

ঠিক। সবার হাঁড়ির খবর যাচ্ছে, অবাক কাণ্ড।

ভূষণ শালা একজন, ও বাড়ির ভূষণ মাইতি।

অধর ব্যাকুলভাবে ধমকে বলে, থাক না বাবা, থাক না। অত দিয়ে কাজ কি তোদের, চুপ মেরে থাক না ?

চুপ মেরেই তো আছি গো বাবু। বোবা বনে গেলোম। বলে মঙ্গলা এতক্ষণে পিঁড়ি এনে অধর ঘোষালকে বসতে দেয়।

না, আর বসব না। বলে অধর ঘোষাল উবু হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

অধর রোগা, ঢ্যাঙা, চিকণ শ্যামবর্ণ। চুলে সবে পাক ধরেছে কিন্তু ভুরু একেবারে সাদা। শীর্ণতা, লম্বা গলাবন্ধ কোট আর পাকা ভুরুর জন্য তাকে ভারী হিসেবি, বিষয়ী ও বিবেচক মনে হয়।

বলতে তো ভরসা হয় না তোদের, পেটে কথা রাখতে পারিস নে। বলে বেড়াবি দশজনকে।

কিছু বলতে চায় বুড়ো। পেটে কথা চেপে রাখতে পারছে না। তাই এমন মুখের ভঙ্গি করেছে যেন তাদের অবিশ্বাস করেও অনুগ্রহ করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করছে। অধরের কথা আর ভঙ্গিতে গা জ্বলে যায় মঙ্গলার।

সুদেব আর ভূদেব কাল রাতে এয়েছিল। মরো-মরো মা-টাকে দেখতে।

বটে ? কানাই আর বলাইয়ের মুখ হাঁ হয়ে যায়।

সাহস কী, মাগো ! গাঁয়ে এল ! মঙ্গলা বলে।

খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল।

ধরেছে নাকি ? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে তিনজনে।

অধর মাথা নাড়ে।—না। পালিয়ে গেল। কী করে পালাল ভগবান জানে, চাদ্দিকে ঘিরে ফেলেছিল। অধরের চোখ প্রায় বুজে আসে, মৃদু ক্ষোভ আর আপশোশের সুরে বলে, পুলিশ এবার বলবে, গাঁয়ের লোক ওদের লুকিয়ে রাখছে, সাহায্য করছে। ফের তল্লাসি চলবে নতুন করে, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, চষে ফেলবে গাঁটাকে। দ্যাখো দিকি বাপু, তোদের ক জনার জন্যে গাঁসুদ্ধ লোকের কী দুর্ভোগ ? নিজের মা বোন বাপ ভায়ের কথাটাও ভাববিনে তোরা ?

মঙ্গলা থতোমতো খেয়ে যায়। কথাটা তো ঠিক বলেছে হাড়হাবাতে বজ্জাত বুড়ো !

বজ্জাত ? আজ প্রথম মঙ্গলার খেয়াল হয় গাঁয়ের প্রায় সব লোক কতকাল অধরকে মনে মনে বজ্জাত বলে জেনে রেখেছে তার হিসেব হয় না, অথচ ওর কোনো বজ্জাতির খবর তো তারা রাখে না ! সে নিজেও মনেমনে লোকটাকে কত খারাপ বলে জেনে এসেছে চিরকাল, অথচ চিরদিন সাধু, ভদ্র, পরোপকারী বিবেচক মানুষ যেন সে এমনি ব্যবহারই করে এসেছে তার সঙ্গে। ও কেন খারাপ, কোন বিষয়ে অসাধু, অভদ্র, অনিষ্টকারী বা অবিবেচক তা তো সে কিছুই জানে না।

কিছুদিন থেকে একটু বেশি যাতায়াত আর ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করায় মনে হয়েছিল, বুড়ো বুঝি মজেছে। বয়স কাঁচা না থাক, যৌবন যা আছে তাতেই বুড়োকে সাতঘাটের জল খাইয়ে ছাড়তে পারবে ভেবেছিল সে। কিন্তু এক ঘাটের জল খেতে চাওয়ার সাধও তো শেষ পর্যন্ত বুড়োর দেখা যায়নি !

কতকাল পালিয়ে বেড়াতে পারবি বল ? খানিক থেমে থেকে, একটু প্রায় ঝিমিয়ে নিয়ে, অধর বলে, ধরা পড়বি, দুদিন আগে আর পরে। নিজেরাই ধরা দে, হাঙ্গামা চুকুক, আমরা বাঁচি। গাঁয়ে বা আসবার কী দরকার ছিল তোদের দুজনের ? পালিয়েছিস, দূরে পালা, পুলিশ জানুক গাঁয়ের ধারে কাছে তোরা নেই। মাকে দেখতে এয়েছে ? কত দরদ মায়ের জন্যে ! বুড়ো বাপ থেঁতুনি খাচ্ছে, মায়ের চিকিচ্ছে নেই, ধরা না দিয়ে দরদ করে দেখতে এলেন মাকে। খুব তো দেখলি, গাঁসুদ্ধ লোককে হাঙ্গামায় ফেলে গেলি ফের !

আর একটু বেলা করে অধর উঠল। যাবার সময় বলে গেল, আমার গোরুটা খুঁজে দিস, কানাই বলাই। কাল থেকে পাত্তা নেই। খোঁয়াড়ে যদি ফের দিয়ে থাকে যদু দত্ত, দেখে নেব এক চোট যদুকে আমি, এই বলে গেলাম তোদের।

আরও বেলায় মঙ্গলা বড়ো পুকুরে নাইতে যায়। গা-গতর জমে থাক, ব্যথা হোক, ভেঙে আসুক, নাইতে হবে, রাঁধতে হবে, পোড়া পেট শুনবে না। দত্তদের বড়ো পুকুরের ঘাটে মেয়ে পুরুষ নাইতে আর জল নিতে এসেছে, এ ঘাটে বাসন মাজা বারণ। ফিসফাস গুজগাজ চলে গত রাত্রের ব্যাপারের। অধর গোপন কথা কিছু ফাঁস করেনি, সবাই জানে সব কথা। বরং ঘটনা কিছু বেশিই জানে অধরের চেয়ে। কেবল সুদেব আর ভূদেব নয়, ফেরারিদের আরেকজনও নাকি গাঁয়ে এসেছিল কালরাত্রে। কে সে ঠিকমতো জানা যায়নি। কেউ বলে দীনু বসাকের ছেলে তিনকড়ি, কেউ বলে সতীশ সামন্তের ভাই যতীশ সামন্ত, কেউ বলে পদ্মলোচন সাউ নিজে। মঙ্গলার হঠাৎ খেয়াল হল অধরের কথার আসল মানেটা। না, তাদের পেটে কথা থাকে না বলে ব্যাপারটা তাদের শোনাতে ভাবনা হয়নি অধরের, ব্যাপারটার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আর পলাতকদের যে সমালোচনা সে শুনিয়েছে তাই ছিল তার গোপন কথা। কে জানে গাঁয়ের মানুষ দুর্ভোগ চায়, না, ফেরারিরা ধরা দিয়ে তাদের একটু স্বস্তি দিক, এটা চায় ! সে দিনকাল আর নেই, ঘা খেয়ে খেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে শান্তশিষ্ট অলস নির্জীব মানুষগুলি। ওদের মন বোঝা ভার !

তবে, কিছুই না করে, বাড়ি বাড়ি অন্তত খানাতল্লাস আর সকলকে জেরা পর্যন্ত না করে, ভোর ভোর পুলিশ গাঁ ছেড়ে চলে গেল কেন ভেবে সবাই অবাক হয়ে গেছে। মঙ্গলাও এই কথাটাই ভাবছিল।

কালু দাসের কচি বউটা, স্বামী যার এখনও আটক আছে, জলে কলসি আর পা ডুবিয়ে বসে চুপ করে সকলের কথা শুনছিল, মাথাটা একটু হেঁট করে একদৃষ্টে কালচে জলের নীচে খেলায় রত দত্তদের পোষা বড়ো বড়ো লালচে রুই কটার দিকে চেয়ে। মঙ্গলা কলসি কাঁখে তুলে উঠছে, সে হঠাৎ বলে, যাবেনি ? একবার ওনারা এয়েছেন, ফের তো আসতে পারেন, তাই চলে গেছে। ফের ওনারা এলে, তখন ধরবে।

শুনে কেউ অবাক হয় না, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না। পুলিশ কেন কী করে জানা যেন চাষির ঘরের এতটুকু কচি বউয়ের পক্ষে আশ্চর্য নয়। বাড়িটার দিকে চলতে চলতে মঙ্গলা ভাবে, তা বটে, ওরা আসতে পারে আবার। সুদেব আর ভূদেবের আসবার সম্ভাবনাই বেশি, মায়ের ওদের আজ-মরে কাল-মরে অবস্থা, অন্যেরাও আসতে পারে, তাদেরও মা বোন ভাই আছে।

গোলোক যদি আসে ? ওর অবশ্য তেমন আপন কেউ নেই এখানে। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা ধরলে আছে, না ধরলে নেই। তবু, কিছুদিন তো ছিল তার কাছে লোকটা, আর ছিল বলেই ওর জন্য ভোগান্তি তার কম হয়নি এবং হচ্ছে না, খবর নিতে কি আসতে পাবে না একবার ?

যদি আসে, একচোট ওকে নেবে মঙ্গলা। পাছাটা টনটন করে ওঠে মঙ্গলার, কোমরটা একটু বেঁকে গিয়ে কলসির জল খানিকটা উছলে পড়ে যায়। ইস, কী হয়ে গেছে দেহটা তার, এক কলসি জল বইতে এত কষ্ট ! জেল হোক, দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক, গোলোকের নাগাল পেলে মঙ্গলা তাকে ধরা দিতে বলবে। নিজে ধরা না দিলে, সেই তাকে ধরিয়ে দেবে। কেন, কীসের অত খাতির ওর।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে মঙ্গলার। পায়ের কাছে ঘাসে কলসিটা নামিয়ে রেখে চারিপাশের জগতকে প্রাণভরে গলা ফাটিয়ে একচোট গালাগালি দিতে মনটা তার ছটফট করে। মাঠ জঙ্গল নালা ডোবাকে, আস্ত তার পোড়া চালার ভস্মগুলিকে, ফসল ভরা আর ফসল-পোড়া খেতগুলিকে, অঘ্রানের সোনার সকালকে, চলমান মানুষ আর গোরু বাছুরগুলিকে। মাটিতে পায়ের পাতায় কাটার ব্যথা ভুলে গিয়ে লাথি মারে মঙ্গলা মোটে একবার। গোলোকের কাছে সে সতীত্ব দিতে পারত খুশি মনে আর গোলোকের জন্য তার সতীত্ব গেল আস্তাকুঁড়ে, লাঞ্ছনা হল অকথ্য। পা দিয়ে আবার রক্ত বেরোল, দ্যাখো ! তার খবর নিতে কেন আসবে গোলোক !

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে মঙ্গলা দুটি ভাত সিদ্ধ করে শুয়ে পড়ে। পা-টা তার একটু একটু করে ফুলতে থাকে সারাদিন, সন্ধ্যার সময় ফুলে ঢোল হয়ে যায়। রাত্রে আরও ফুলবে সন্দেহ থাকে না। পলাশ পাতা পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দাওয়ায় শুয়ে মঙ্গলা কাতরায়। জ্বরের ঘোরে তার কেমন নেশার মতো আচ্ছন্ন ভাব এসেছে, মনে তার দেহের জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি একটু ভোঁতা হয়েছে। কানাই গেছে অধরের হারানো গোরুটা ফিরিয়ে দিতে, বেগুন খেতে ঢোকায় দত্তরা সতাই নাচালের খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল—আড়াই ক্রোশ পথ। বলাই গেছে বসন্ত কবিরাজের বাড়ি, মঙ্গলার জন্য ওষুধ আনতে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা লোক সোজা উঠান পেরিয়ে দাওয়া ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেও মঙ্গলা ভয় পায় না।

ঝিমানো সুরে শুধোয়, কে ? কে গো ?

গোলোক বলে, আমি গো, তুমাদের দেখতে এলাম।

সাঁঝ সকালে জানান দিয়ে দেখতে এলে ? ধরবে যে ?

ধরে ধরবে। ধরা দিতেই তো এইছি।

ধরা দিতে এয়েছ ? অ !

সবাই এইছি ধরা দিতে। পরামর্শ করে এইছি। গাঁয়ের সবাই মোদের বেঁধে ধরিয়ে দেবে—মোরাই বলব ধরিয়ে দিতে, জরিমানাটাও যদি মাপ হয় গাঁয়ের। ইস, এ যে অনেক জ্বর গো !

গোলোকের ঠান্ডা হাত গা থেকে সরিয়ে মঙ্গলা কপালে রাখে।

গাঁয়ের লোক ধরিয়ে দেবে ? দিচ্ছে—পায়ে ধরে সাধো গা। খানিক খানিক খপর কি পায়নি হেথা কেউ, তোমরা কোথায় আছ, কী করছ ? মুখ খুলেছে কেউ ? নাগসায়রে তুমি যেতে পারো, এ কথাটি বলতে পারতাম না আমি ? বলেছি ? দাঁতে দাঁত কামড়ে থেকেছি আগাগোড়া। মঙ্গলা একটু ঝিমায়। ধরা দিতে এয়েছ। অ্যাঁ ? নাই বা দিলে ধরা ? যাক না কিছুকাল। দেখা যাক না কী হয়।

নাঃ। মোদের জন্যে গাঁসুদ্ধু লোক ভুগবে ? আজ রাতটা যে যার বাড়ি কাটাব, সকালে দত্তদের ওখানে সবাইকে ডাকিয়ে বলব, মোদের আটক করে খপর পাঠাও।

মঙ্গলা জ্বরের ঘোরে হাসে। সবাইকে ডাকিয়ে বললে খপর যাবে না। সবাই মিলে বরং বলবে, পালাও শিগগির। খপর দেবার যে আছে দু-একজন তারাই খপর পৌঁছে দেবে ঠিক।

বলতে বলতে কানাই বলাই এসে গোলোককে দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

গোলোক বলে, ভয় নেই, খপর নিতে এইছি।

বলাই ঢোক গিলে মঙ্গলাকে বলে, কবরেজ মশায় মালিশ দিলে একটা। আর বললে সেঁক দিতে।

এ কথার জবাব না দিয়ে মঙ্গলা কানাইকে শুধোয়, বুড়ো ঘরে ছিল ?

ছিল।

তখন মঙ্গলা উঠে বসে। বলাই আর গোলোককে বলে, তোমরা বসে থাকো, এখুনি আসছি।

কষ্টে দাওয়া থেকে পা নামিয়ে বলাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, ধরে নিয়ে চল দিকি ভাই আমাকে একটু। চটপট চল। থামো বাবু তোমরা, ফপরদালালি কোরো না, যা বলছি শোনো।

বলাইয়ের ঘাড়ে ভর দিয়ে ফোলা পা-টা টেনে টেনে মঙ্গলা বাইরের কুয়াশায় বেরিয়ে যায়। কুয়াশা গোয়ালের খড়ের ধোঁয়ায় ভারী হয়েছে।

কোথা যাবে ?

চল্ না দাদা। মঙ্গলা কাতরে ওঠে।

অধরের বাড়ি পৌঁছে মঙ্গলা ভেতরে যায় না, বাড়ির সামনে কদম গাছটার তলে দাঁড়িয়ে থাকে। বলাই ডেকে আনে অধরকে।

শোনেন। খপর আছে।

লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের চেহারা দেখে অধরের সাদা ভুরু কুঁচকে যায়। সেই লণ্ঠনের আলোতেই মঙ্গলা অধরের সদরের ঘরের জানালায় দেখতে পায় ভূষণ মাইতির মুখ।

ওরা আজ গাঁয়ে আসছে, ধরা দিতে। সব ক জনা আসছে।

ধরা দিতে আসছে ?

হাঁ, সব ক জনা। গোলোক এসেছিল, মোকে বলে গেল।

অ, তা গোলোক চলে গেছে নাকি ?

আসবে ফের। মোর কাছে থাকবে। বললে কি, আজ রাতটা যে যার ঘরে থাকবে আপনজনের সাথে, কাল সকালে ধরা দেবে। রাতে যদি খবর পেয়ে পুলিশ আসে, তবে নাকি ফের পালাবে, আর আসবেনি ধরা দিতে কোনোকালে। বলে কি জানেন, গাঁয়ের লোকের মুখ চেয়ে ধরা দেব বলে আসছি, একটা রাত যদি না ঘরে থাকতে দেয় তারা, তবে কাজ কি মোদের ধরা দিয়ে ! মোর ডর লাগছে গো বাবু। কালকের মতো যদি পুলিশ আসে তো সর্বনাশ। ওরাও ধরা দেবেনি, মোদেরও মরণ ?

কথাটা বিবেচনা করতে করতে ধীর শান্তভাবে অধর বলে, পুলিশ কি খপর পাবে ?

মঙ্গলা কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, যদি পায় ? কী হবে তবে ? একজনাও ধরা পড়বেনি জানেন তো, গাঁয়ের আধক্রোশের মধ্যে পুলিশ এলে গাঁয়ে জানাজানি হয়ে যায়। কালের মতো পুলিশ আসবে, এসে দেখবে সবাই পালিয়েছে। কী উপায় হবে ?

অধর চোখ বুজে বলে, ভগবান যা করেন। আমরা কী করতে পারি বল ? তবে কি জানিস, কাল এসেছিল, আজ আবার পুলিশ আসবে মনে হয় না।

বাড়ি ফিরে মঙ্গলা শুয়ে পড়ে ধপাস করে।

বলে, আলোটা জ্বাল বলাই, যেটুক তেল আছে জ্বেলে দে। দুভাই মিলে রাঁধাবাড়া কর কী আছে ঘরে, একটা লোক এয়েছে, থাকবে একটা রাত, খেতে দিতে হবে না তাকে ? আর তুমি একটু মালিশ করো পায়ে।

নেশা

পুলকেশের সিনেমা দেখার নেশা একেবারে ছিল না। যতীনেরও তাই। সত্যিকারের কোনো ভালো ছবির খবর পেলে, রুচি, রসবোধ আর বিচারশক্তি আছে বলে তারা বিশ্বাস করে এমন কোনো বিশ্বাসী লোকের কাছে খবর পেলে হয়তো কখনও নিজেরা শখ করে গিয়ে দেখে আসত ছবিটা। তাছাড়া ইচ্ছে করে কখনোই তারা সিনেমায় যেত না। মাঝে মাঝে তবু যে যেতে হত তার কারণ ছিল ভিন্ন। সিনেমা যাবার ভীষণ শখ আছে অথচ কেউ না নিয়ে গেলে যেতে পারে না এমন যার বা যাদের আবদার এড়ানো চলে না, তাকে বা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হত।

ছায়াছবি যে একেবারে তারা দু বন্ধু উপভোগ করে না তা নয়। একটু উলটোভাবে কিছু কিছু উপভোগ করে—দর্শকের যেরকম উপভোগের জন্য ছবিটা মোটেই তৈরি হয়নি। বাংলা আর হিন্দি ছবি হলেই পুলকেশ আর যতীনের অভিনব উপভোগটা জমে বেশি। উদ্ভট অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া একঘেয়ে কাহিনি, চরিত্রগুলির অমানুষিক খাপছাড়া আর সঙ্গতিহীন কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি, যেখানে সেখানে গান, উৎকট হাসি কান্না আর ভাঁড়ামি ইত্যাদি তাদের হাসির অনেক খোরাক জোটায়। অন্য সকলের তন্ময়তার মর্যাদা রাখার জন্য যেখানে সশব্দে হাসা সম্ভব হয় না সেখানে মুখে রুমাল গুঁজে হাসিটা চাপা দেয়। সময়টা তাই একরকম তাদের কেটে যায় হাই না তুলে, ঘুম না পেয়ে।

মৃন্ময়ী একদিন আশ্চর্য হয়ে পুলকেশকে বলেছিল, তুমি কেঁদে ফেললে ! দৃশ্যটা খুব করুণ সত্যি, কিন্তু—

কোন দৃশ্যটা ?

মেয়েটা যেখানে রাতদুপুরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে—

ও দৃশ্যটা করুণ নাকি ? আমার তো ভারী কমিক লাগছিল। এত কাণ্ডের পর অচেনা বাপের সঙ্গে রাতদুপুরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনো মানে হয় ? আমরা নয় জানি ও লোকটা মেয়েটার বাপ। কিন্তু মেয়েটাও কি তা জানে ? আমি তো ভাবছিলাম মেয়েটা যাতে বাড়িতেই থাকে তার জন্য প্লট এত ঘোরাল করা হচ্ছে !

মৃন্ময়ী আহত হয়ে বলে, ও, তুমি কাঁদোনি ? হাসি চাপছিলে !

দেহমনে স্বাস্থ্য, জীবনে আনন্দ, অসংগতির হাস্যকর দিকটাই চোখে পড়ে আগে। তাই, জীবনের সঙ্গে ছবিগুলির সংযোগের অভাব দেখে, কষ্টকল্পনা দেখে, সস্তা ও হালকা রোমান্সের গ্যাঁজলা রস থইথই করতে দেখে, এমন কী মানুষের মনে ছবিগুলির প্রভাব যে কিছু কিছু ক্ষতিকর তা ভেবেও, পুলকেশরাও বিদ্বেষমূলক সমালোচনার ঝাঁঝ অনুভব করে না। এই সব ছবি দেখার জন্য যারা পাগল তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবও পোষণ করে না। কেবল এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায় যে ছেলেভুলানো এ জিনিস দিয়ে বয়স্ক মানুষ নিজেকে ভোলায় কী করে ! নিজেদের ভোলাবার এত জিনিস রয়েছে জগতে ! এ রকম আশ্চর্য হওয়ার মধ্যে নিজেদের বেশ বস্তুতান্ত্রিক ভাবপ্রবণতাহীন মনে হয় বলে খুব তারা গর্ব অনুভব করে !

তারপর জীবন আসে পরবর্তী বাস্তব অধ্যায়ের নিয়ম, অনিয়ম, প্রয়োজন আর ঘাতপ্রতিঘাতের সূচনা নিয়ে। যেভাবে আরম্ভ করবে ভেবেছিল, পুলকেশ বা যতীন কারও আরম্ভটাই সে রকম হয় না। হাসিমুখেই তারা সেই আরম্ভকে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন হওয়ায় বৈচিত্র্যময় প্রেমের লীলাখেলায় কত সময় যে তার কোথা দিয়ে কেটে যায় !

শেষের তিন বছর একবারও পুলকেশ কোনো সিনেমায় যায়নি। এই নিয়েই একদিন মৃন্ময়ীর সঙ্গে তার দারুণ কলহ হয়ে গেল। সিনেমায় মৃন্ময়ী হরদম যায়, অন্যের সঙ্গে। কিন্তু কেন তা হবে ? কেন তাকে পুলকেশ একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে পারবে না ? কোন স্বামী এ রকম ব্যবহার করে স্ত্রীর সঙ্গে ? তার নিজের যেতে ভালো না লাগুক, মৃন্ময়ীর কি শখ থাকতে নেই।

আরেকদিন নিয়ে যাব।

আরেকদিন কেন ? আজ নিয়ে চলো।

তাই করতে হল শেষ পর্যন্ত। বহুদিন পরে পুলকেশ সেদিন একটি বাংলা ছবি দেখল। খাপছাড়া অদ্ভুত মনে হল বটে ছবিটা, কিন্তু আজ আর হাস্যকর মনে হল না। এমন কী অজানা নতুন তরুণ ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে পা দেওয়া মাত্র কম্পাউন্ডারের বয়স্থা কুমারী মেয়েকে তার সঙ্গে মাঠে গিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে লাফাতে লাফাতে ডুয়েট গান করতে দেখেও তার হাসি পেল না, বরং বেশ মিষ্টি আর রসালোই লাগল ব্যাপারটা।

মশগুল হয়েই পুলকেশ শেষ পর্যন্ত ছবিটা দেখে ও শুনে গেল।

পরের শনিবার অফিসের এক সহকর্মীর সঙ্গে সে আবার সিনেমায় গেল। পরের সপ্তাহে গেল তিনবার। কয়েকমাসের মধ্যে সে নিয়মিত ভাবে সিনেমায় যেতে এবং ভালোমন্দ নির্বিচারে ছবিগুলি তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের সঙ্গে ছবি আর তারকাদের বিষয় আলোচনা ও তর্ক করে কেটে যেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একদিন ম্যাটিনিতে নাচে গানে প্রেমে বিচ্ছেদে আর শেষ মিনিটের মিলনে জমকালো এক ছবি দেখে পুলকেশ বাইরে এসেছে, দেখা হল যতীনের সঙ্গে। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছিল, যতীন ছাতি মাথায় দিয়ে হাঁটছিল ফুটপাতে। যতীনকে হঠাৎ দেখে পুলকেশ চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। তার শরীর ভেঙে পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে আধময়লা জামাকাপড়। যতীন নিজেই তাকে দেখে কাছে এগিয়ে এল।

এতদিন পরে দেখা, কিন্তু এমনি নির্জীব হয়ে পড়েছে দু জন যে উল্লাসটা তেমন জোরালো হল না। কিছুটা আশ্চর্য আর কিছুটা খুশি হয়ে পুলকেশ বলল, যতীন ! কলকাতা এলি কবে ?

যতীন বলল, মাসখানেক। তোর বাড়ি যাব যাব ভাবছিলাম, হয়ে ওঠেনি।

যতীনের মুখে পুলকেশ মদের গন্ধ পায়। চোখে দেখতে পায় নেশার আবেশ। কথায় একটা অস্বাভাবিক টলোমলো প্রফুল্লতা। দুই বন্ধু কথা বলে ধীরে সুস্থে, খবর নেয় আর দেয় ছাড়া ছাড়া ভাবে এতগুলি বছর ধরে অজস্র কথা জমেছে কিন্তু বলার বা শোনার তাড়া যেন তাদের নেই।

যতীন বলে, আয়, বসে কথাবার্তা কই।

কোথায় বসবি ?

আয় না। কাছেই।

খানিক এগিয়ে বাঁয়ে গলির মধ্যে একটা দেশি মদের দোকানে যতীন তাকে নিয়ে যায়। শনিবারের বিকাল, ইতিমধ্যেই লোক জমে জায়গাটা গমগম করছে—ছেঁড়া কাপড় পরা খালিগায়ের লোক থেকে ফরসা জামাকাপড় পরা পর্যন্ত সব ধরনের বাঙালি ও অবাঙালি লোক। দোকানঘরের বেঞ্চিগুলি সব ভরতি, দাঁড়িয়ে এবং উবু হয়ে বসেও অনেকে মদ খাচ্ছে। পাশের ঘরে একটা বেঞ্চে জায়গা ছিল, পুলকেশকে বসিয়ে যতীন বলে, বোস, একটা পাঁট আনি। একটু সেলিব্রেট করা যাক।

আমি তো ও সব খাই না।

একদিন একটু খাবি, তাতে কী হয়েছে ? অ্যাদ্দিন পরে দেখা, একটু ফুর্তি না করলে হয় ?

এখানে ঢুকেই যতীনকে আগের চেয়ে বেশি তাজা, বেশি উৎসাহী মনে হচ্ছে। সেলিব্রেট করার একটা ভালো উপলক্ষ পেয়ে সে যে ভারী খুশি হয়েছে বেশ বোঝা যায়, বেশি মদ খাওয়ার জন্য

নিজের মনটা আর তাকে কামড়াবে না। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে যুক্তি পেয়েছে, কৈফিয়ত পেয়েছে, সমর্থন পেয়েছে বেশি মদ খাবার। যতীন মদ আনতে যায়, পুলকেশ বসে বসে ভাবে। যতীনের অধঃপতনে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়।

যতীন এসে বসলে সে জিজ্ঞেস করে, কদিন খাচ্ছিস ?

বছর দু-তিন ?

এটা ধরলি কেন ?

প্রশ্ন শুনে যতীন হাসে।—খেলে একটু ভালো লাগে আবার কেন !

গেলাসে মদ ঢেলে ঢেলে খেতে খেতে যতীনের অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে, কথা সে বলতে থাকে তাড়াতাড়ি, বেশি বেশি। একবার চুমুক দিয়েই পুলকেশের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল, বমি ঠেলে উঠেছিল। আর খাবার চেষ্টা না করে সে যতীনের কথা শুনে যায়। অদৃষ্ট বড়ো খারাপ ব্যবহার করেছে যতীনের সঙ্গে, ঘা মেরে মেরে থেঁতলে দিয়েছে জীবনটা, কোনোদিন বিশেষ সুবিধা করতে দেয়নি। চাকরির গোড়ায় বাপ মারা গেল। কিছু টাকা হাতে পেয়ে চাকরি ছেড়ে একটা ব্যাবসা আরম্ভ করেছিল, সুবিধা হল না। বিমার দালালি করেছিল কিছুদিন, সুবিধা হল না। একটা এজেন্সির কারবার ধরেছিল, সেটাতে কিছু হল না। দুটো ছেলে হবার পর বউটা পড়ল অসুখে, সেই থেকে একটানা ভুগছে। বোনের বিয়ে দিয়েছিল, বোনটাকে তার স্বামী নেয় না। বিরক্ত হয়ে সকলকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সে কলকাতায় নতুন একটা ব্যাবসা ফেঁদেছে।

সংসারের হাঙ্গামা নেই, খরচের টাকা পাঠাই, ব্যাস। এবার ঠিক গুছিয়ে নেব। দু বছরের মধ্যে যদি না মোটর কিনি তো—

জমজমাট নেশা হয়েছে যতীনের। সগর্বে বুক ঠুকে সে পুলকেশকে শোনায় ব্যাবসাতে তার কেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অল্পদিনে কী ভাবে সে ফেঁপে উঠবে, অন্য লোকেরা কী ভুল করে আর সে কী ভুল করবে না, এমনি সব বড়ো বড়ো কথা। জীবনে অসামান্য সাফল্য লাভের অহংকারেই সে যেন সিধে হয়ে বসে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

পুলকেশ তার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, নটার শোয়ে প্রিয় ছবিটা তৃতীয়বার দেখতে যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, না একাই যাবে।

বেড়া

বাড়ির ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া। খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাতখানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙিয়ে কারও নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। নজর দেবার অন্য উপায় আছে : ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়িটাকে সমান দু ভাগ করেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ করে, উঠান ভাগ করে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়িতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল করতে দাঁড় করানো সামনের পর্দা-বেড়াটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, গোবর্ধন ও জনার্দনের বাপ অনন্ত হাতী যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়িতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পুব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল করা পর্দা-বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পুব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার-বেরোবার পথই যদি না থাকল, বাড়ির এমন ভাগ দিয়ে সে কী করবে— গোবর্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিকদের মানতে হয়েছিল যে তার আপত্তি সঙ্গত। অনেক মাথা ঘামিয়ে তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরেস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্তী জ্যোতির্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দুপাশে সদব বেড়া দুহাত করে কেটে দুই অংশের ঢুকবার-বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরানো পর্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে ; কারণ ওবেড়াটাও দুভায়ের বাপের সম্পত্তি। অতএব দুজনের ওতে সমান অধিকার।

জনার্দন আপত্তি করে বলেছিল আড়াল-করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরানো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ির বউ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কী হবে ? সে এমন কী অপরাধ করেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ করে তাকে বন্ধ করতে হবে বেড়ার ফাঁক ! রীতিমতো সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিন হাত বেড়ার ফাঁক বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্ধন রাজি আছে।

অনেক তর্কবিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটার চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু পাশে দু হাত করে পথ করতে সদর বেড়ার মাঝখানে চার হাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরানো ফাঁক !

এমনি দুর্যোধনি জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হয়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতীর শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল। আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত লড়াই হয়ে গেছে দু ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি গালাগালি হয়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তারও যেন প্রতীক হয়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ হয়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হয়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাবড়া, ওখানে গোঁজা হয়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হয়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে উঁকি মারা চলত—দু পাশ থেকেই। হঠাৎ গোবরগোলা জল বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্ধনের মেয়ে পরীবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান করে দিল তার চোখের

মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরীবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্ধন ও জনার্দন দু ভায়ের, কদিন পাড়ায় কান পাতা গেল না দু বাড়ির মেয়েদের গলাবাজিতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকতে দিলে অদৃশ্য হয়ে যেত। এঁটোকাঁটা, নোংরা, ছেলেমেয়ের মল বেড়া ডিঙিয়ে পড়ত এক পাশ থেকে অন্য পাশে। এ পাশের পুঁই বেড়া বেয়ে উঠে ও পাশের আয়ত্তে একটি ডগা একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙিয়ে অহরহ আসা যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি, অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু পাশের দুটি পরিবারের মধ্যে যে সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ও পাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলাতে না পেরে এ পাশে নিজের চালাতেই আগুন ধরিয়ে দেয় !

গোলমাল এখনও চলে, বিদ্বেষ এখনও বজায় আছে পুরো মাত্রায়। তবে গোড়ার দিকের মতো খুঁটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপাব নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দুপাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস করতে বাধ্য হয়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জিত হয়ে উঠেছে। এ পাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও পাশে সমবয়সি বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা করে মার দেওয়া হয় বলাইকে। এ পাশ থেকে হাঁক ওঠে, কানাই ! কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও বাড়ি মরতে গেছিলি কেন রে, বেহায়া পাজি বজ্জাত ? ও পাশ থেকে জবাব আসে বলাইয়ের প্রতি আরও জোর গলার শাসানোতে, ফের যদি ও বাড়ির কারও সঙ্গে তুই খেলিস হারামজাদা নচ্ছার...

দু পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তাদের বোঝানোও যায় না যে, বেড়ার ও পাশ যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। এ পাশের বেড়াল ও পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বউ রাণীবালার পোষা বিড়ালটা মেউ মেউ করে বেড়াচ্ছে খিদেয় কাতর হয়ে, গোবর্ধন একদিন কোথা থেকে জোগাড় করে নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ ! মাছ দেখে খুশি হয়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু মুঠো চাল সেদিন বেশি নেওয়া হল এই উপলক্ষে। গোবর্ধনের ছেলে সূর্যকান্তের বউ লক্ষ্মীরাণী আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হয়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যকান্ত বউয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, কোথা থেকে রাণীবালার আদুরে বিড়াল এসে এক টুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছকাটা বঁটিটা তুলেই সূর্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রাণীবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্যন্ত না করে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরাণী সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থেকে মরা বিড়ালটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিল না কিন্তু ঘরে তার একটু নুন আর একটু হলুদ-লংকা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দুটি খুদকুড়ো চণ্ডী জোগাড় করে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সেদিন সে দু বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রাণীবালা পেল পাঁচুর মার কাছে। ও বাড়িতে পাঁচুর মা দুটি চালের জন্য গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধন্না দিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কী কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা-ষষ্ঠীর বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা ?

দুটি চাল দিবি বউ ? দে মা, দুটি চাল ? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুঁড়ো যা হোক দুটি দে।

কোথা পাব গো ? চাল বাড়ন্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ি আগলে আছে।

বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কাঁদতে থাকে, বাড়ির সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালোবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও বাড়ির লোক হত্যা না করলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনার্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, আঃ চুপ করো বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে ?

রাণীবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কী। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারও পেট কলমিশাক সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা করে শুয়ে থাকলেও !

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্ধন ও জনার্দন দু জনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দু জনে পরামর্শ করে ঠিক করেছে প্রাণধন চক্রবর্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোনো কারণে গোবর্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুশকিল হবে।

ঝগড়াঝাটি কোরো না খবরদার, কদিন মুখ বুজে থাকো।

বিড়াল মারার সময় গোবর্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সেও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে বলে, একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের ? এমনি করে ফ্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম। খেয়ো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ করে। খবরদার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে ! মুখ বুজে থাকো কদিন।

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপিচুপি, চাপা গলায়, নিজেদেব মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেঁচাল, ও কানাই, ওদের বেগুন খেতে গরু ঢুকেছেরে ! ওপারও চেঁচাল এপারকে শুনিয়ে, ও বলাই, ওদের পুটু পুকুরপাড়ে একলা গেছে রে ! আমতলায় কানাই-বলাইকে খেলতে দেখে কোনো পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরাণীর বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বারবার নিশপিশ করে উঠলেও রাণীবালা পর্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁইগাছের সতেজ ডগাটি লকলক করে বাতাসে দুলতে লাগল এপারের এলাকায় !

কথা যা বলাবলি হল তিন দিনে দু পারের মধ্যে, তা শুধু গোবর্ধন আর জনার্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এ ভাবেও তো সাত বছর তারা কথা বলেনি।

দলিল রেজিস্ট্রি করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্ধন বলে, কখন রওনা হবে, জনা ?

এই খানিক বাদেই, জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনার্দন যোগ দেয়, ফেলনার জ্বরটা বেড়েছে।

ফেলনা রাণীবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় দু জনে, জনার্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্ধনকে। একসাথে বাড়ি থেকে বেরোবার কোনো দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্তীর বাড়ি হয়ে তারা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে

রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলত। কিন্তু সাত বছর বিবাদ করে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাটাবার পর দু ভাই যখন শান্তভাবে কদিন ধরে কথা বলে, তখন কি আর দরকার আছে অত হিসেব করে সব কাজ করার ! দু জনে চলতে থাকে একরকম নির্বাক হয়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছরে দু জনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, দুর্ভিক্ষের গত দু বছরেই যেন বেশি বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কী আছে ভগবান জানেন।

দরটা সুবিধা হল না।

উপায় কী ?

ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।

ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভালো ফসল দিয়েছে গতবার। গোবর্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—শোন বলি, জনা। না বেচলে হয় না জমিটা ? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দু জনে মিলে।

চক্কোত্তি মশায় কি রাজি হবে ?

রাজি না হয়তো মধু সার কাছে বাঁধা দেব। নয়তো রথতলার নিকুঞ্জকে। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মতো। যদি রাখা যায় !

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন ও জনার্দন—অনন্ত হাতীর দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা করে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ করছে দুটি স্যাঙাত।

এদিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্যের মা ইতস্তত করে অনেকক্ষণ, ফিসফিস করে সূর্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, যাব নাকি ? তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরাণীর বিনুনি কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া কান্না শুনে এপারের বাকি সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া কান্না উঠেছে জনার্দনের অংশে, কিন্তু গোবর্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দুদিকের মেয়েরা বেড়ার একদিকে হয়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মতো কাণ্ড আরম্ভ করলে সূর্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্ধন ও জনার্দন যখন বাড়ি ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েছে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে এপারের মাদুরে কাঁথায়, এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হয়ে গেল দু পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরানো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ তাহলে দেবতা হয়ে যেত ! তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করাবার তাগিদ কোনো পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙে জ্বালানো হতে লাগল দু পারেরই উনানে। দু পারের কাঁটার সঙ্গেও সাফ হয়ে যেতে লাগল বেড়ার টুকরোর আবর্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ির মেয়েদের ঝাঁটায় দুটির বদলে একটি উঠান তকতক করছে।

তারপর ?

কাণকালি গাঁয়ের খালে একবার একটা কুমির এসেছিল। মানুষখেকো মস্ত কুমির। পরপর তিনটি বউকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের। একজন মাঝবয়সি, দুজন তরুণী। একজন রোগা ন্যাংলা, একজন বেশ মোটাসোটা, আরেকজন ছিপছিপে দোহারা গোছের লম্বাটে। মোটা বউটি কুমিরের পেটে গিয়েছিল একাই। অন্য বউ দুটির একজনের গর্ভ ছিল সাত আট মাস, অন্যজনের কাঁখে ছিল ছোটো একটি শিশু। তার পেটেও একটা কিছু ছিল কয়েক মাসের। তাকে যখন কুমির ধরল, বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য তাকে সে যত জোরে যত দূরে পারে ছুঁড়ে দিয়েছিল। মায়ের প্রাণ তো !

কান্তি দাসের বিধবা বোন সনকা বাচ্চাকে তুলে আনে।

সেই শিশুর বয়স এখন পনেরো বছর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ! টেরা বাঁকা আধ শুকনো বাঁ হাতটা একেবারেই অকেজো, আঙুলগুলি শক্ত হয়ে গেছে, বাঁকে না। ডান হাতে বেশ জোর আছে, বিশেষ কর্মতৎপর নয় বটে, কারণ কোনো কাজেই পটুতা অর্জন করার ধৈর্য তার নেই, কিন্তু হাতটি যেন সব সময়েই কাজের জন্য অস্থির ও চঞ্চল হয়ে থাকে, অথবা অকাজের জন্য। তার বাবা গিরিশ আবার বিয়ে করেছিল এগারো মাসের মধ্যেই, কিন্তু প্রথম পক্ষের একমাত্র খুঁতে ছেলেটাকে মানুষ করার চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি—স্কুলে পর্যন্ত দিয়েছে। স্কুলে গজেন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠেছিল। ফেল করে করেই সে ক্লাসে উঠেছিল বরাবর কিন্তু একবার, ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠেছিল ফার্স্ট হয়ে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই চমকপ্রদ ঘটনায়। কিন্তু শুধু ওই একবার। তার আগে বা পরে আর কখনও সে পরীক্ষায় পাশ করেনি—একমাত্র ড্রয়িং-এর পরীক্ষা ছাড়া। ড্রয়িং-এ হাতটা ছিল পাকা। এক হাতে এত সহজে এত ভালো ড্রয়িং সে করতে পারত যে অন্য ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে থাকত। ড্রয়িং মাস্টারের চেয়ে তার আঁকা পাখি ও গাছ জীবন্ত হত বেশি। তবে ছেলেবেলাতেই কেমন বখাটে হয়ে গেল ছেলেটা। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করার পর আর তাকে পড়ানোই গেল না। পরপর কয়েকটি কেলেঙ্কারির পর গিরিশ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেবার পরেও সে অবশ্য গিরিশের বাড়িতেই থাকে। তাড়ানো ছেলের মতো থাকে।

এই বয়সেই দড়ির মতো পাকিয়ে দেহের মাংসপেশিগুলি তার শক্ত হয়ে গেছে, রোগা শরীরটাতে শক্তি আর সহিষ্ণুতা আশ্চর্যরকম। মুখে স্থায়ী চাপ পড়েছে একটা শ্রান্ত সকরুণ জিজ্ঞাসার, ভাঙা বাঁকা নাকটা যেন জিজ্ঞাসার ভারেই নুয়ে গেছে। আর কী ভীরু তার দুটি চোখ ! সবাই যেন যখন তখন তাকে মারে, আপন পর ছোটো বড়ো দেবতা মানুষ নারী পুরুষ যে যেখানে আছে। নিরুপায় সহনশীলতায় সে যেন চুপচাপ সয়ে যায়। অসহ্য হলে অন্তরালে কাঁদে।

মাঝে মাঝে দু চার দিনের জন্য সে গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। এবার প্রায় ছ মাস কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এল কেউ জানে না। সবাই যখন ভাবতে শুরু করেছে যে আরও অনেকের মতো সেও দুর্ভিক্ষের কবলে গেছে চিরদিনের মতো তখন সে একদিন ফিরে এল। সাজপোশাকের তার উন্নতি দেখা গেল অদ্ভুত রকমের—সিল্কের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি, চকচকে বার্নিশ করা জুতো। গাঁয়ে থাকবার তার ঝোঁক দেখা গেল না, যদিও গিরিশ আর বাড়ির লোকের কাছে খাতিরের এবার আর সীমা রইল না তার। দু একদিন থাকে, ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ জমায়, বড়োই তাকে মিশুক বলে মনে হয় এবার। ক্ষণে ক্ষণে পাঞ্জাবির পকেট থেকে উদ্ভট চেহারার একটা কেস বার করে তা থেকে খাঁটি মার্কিন মিলিটারি সিগারেট নিয়ে টানে—আগে সে তামাক আর বিড়ি খেত, মাঝে মাঝে পয়সায় দুটোওলা সিগারেট।

লালু আর মবুবকেও সিগারেট দেয়। ওদের সঙ্গে এবার তার বড়ো ভাব হয়েছে। লালুর বয়স এগারো বছর, মবুবের বারো। সমবয়সি বয়স্ক লোকের মতোই তারা তাদের মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাবসার কথা বলে, অশ্লীল হাসিতামাশাগুলি পর্যন্ত তাদের হয় বয়স্কদের মতো।

গজেন বলে, মদনের বোনটা পিছায় কেন রে ?

লালু বলে, ডরায়। লালমুখো গোরাদের যদি ধরিয়ে দি ?

লালমুখো গোরা কীসের ? গজেন বলে বেজার হয়ে।—মোদের বিবিসাব কী কয় ? মেহের বিবিসাব ?

মবুব বলে, কয় কি, তোরা পোলাপান, তোদের কথায় গিয়ে মরব ?

পোলাপান ঠাউরেছে, না ?—একটা কুৎসিত ইঙ্গিতে তারা যে পাকাপোক্ত পুরুষের চেয়ে বেশি কিছু সেটা প্রমাণ করে তিনজনে হাসে। মানুষ বুড়ো হয়ে মরে গিয়ে যত বুড়ো হয় গজেন তার চেয়ে পাকা। হাসাহাসির পর সে বলে, তা কথা বেঠিক না। মাগি ছাড়া মাগিরা ভরসা পায় না। চপলার জন্যে এ মুশকিল।

চপলার খারাপ রোগ হয়েছে, সর্বাঙ্গে ক্ষত। দামি কাপড় পরে হাসিমুখে সে আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কটিবাজারে কাজ করতে যাবার জন্য মেয়েদের ভরসা দিতে পারে না।

কথাটা ভাববার মতো। ভাবতে ভাবতে গজেন বাড়ি যায়। বাড়ি পৌঁছেই ভাত বাড়বার হুকুম দেয়, এখুনি তাকে কটিবাজার রওনা হতে হবে। রোজগেরে ছেলেকে বাড়ির মেয়েরাই সাগ্রহে ভাত বেড়ে দিত কিন্তু তারা কেউ নড়বার চড়বার আগেই ওবাড়ির হাবো যেন উড়তে উড়তে পিঁড়ি পেতে তার ভাত বেড়ে এনে দেয় ! গজেনের নতুন মা, মাসি আর পিসিরা অসন্তুষ্ট হয়ে আড়চোখে তাকায়। ছুঁড়ি যে গজেনেরই দেওয়া নতুন রঙিন শাড়ি পরে এ বাড়িতে এসে ফরফর করে উড়ছে, এতে তাদের চোখ জ্বালা করে আরও বেশি।

ফিরবে কবে ? সভয় ভক্তিতে হাবো জিজ্ঞেস করে। গলা তার প্রায় বুজে আসে আবেগে।

পরশু তরশু ফিরব।

হাবোকে মন্দ দেখাচ্ছে না রঙিন কাপড়ে, গজনে ভাবে। একটু আশ্চর্য হয়েই সে মেয়েটার সারা গায়ে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয়—মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এদিক ওদিক আর তার একান্ত অনুগত এই যে একটা মেয়ে আছে এর কথা তার খেয়ালও হয়নি একবার। একটু হাবাগোবা মেয়েটা, চোখ একটু ট্যারা, হাড়গিলের মতো রোগা শরীর। কিন্তু বয়েস তো কম ! তাছাড়া, এ রকম হাবা গোছের মেয়েই ভালো, সহজে বাগানো যায়, ভয় দেখিয়ে সহজে কাবু করা চলে।

হাবো, সঙ্গে যাবি ? কাজ করে খাবি ? কাপড় গয়না পাবি ।

যাব !

হাবোর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

চিরদিন এই মেয়েটা কেন যে তার এত অনুগত গজেন জানে না—পৃথিবীতে এই একজন ! কোনোদিন ভাবেও না। হাবো তার কাছে অতি সস্তা, তাকে অন্ধ আবেগের সঙ্গে ভক্তি করে বলে। তার পঙ্গু, বিকারগ্রস্ত জীবনেরই একটা অঙ্গ হিসাবে মেয়েটা তার জীবনে মিশে ছিল বরাবর। আছে তো আছে, এইভাবে। তার নতুন ব্যবসায়ের কাঁচা মাল হিসাবে আজ মনে মনে ওকে যাচাই করতে গিয়ে মেয়েটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠে তার এলোমেলো ভাবনা জাগে। কেমন আঁকুপাঁকু করে মনটা নানা বিরুদ্ধ চিন্তায়। বিধবা ভাগ্নি রাসিকে হারাধনের আস্তানায় পৌঁছে দিতে পারলে কী রকম হয়। রাসি খুব রূপসি, ওকে দেখলে কথাটা সে না ভেবে থাকতে পারে না। ভাবতে গেলে আবার কেমন জ্বালাপোড়া আর অস্থির ভাব শুরু হয়। সে কি আর সত্যি নিজের ভাগ্নিকে

হারাধনের কবলে দিয়ে আসবে। কিন্তু তবু ভাগ্নিটার জন্য সে জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। ওকে দেখলেই মন তার দাম কষা শুরু করে !

হাবো তার সঙ্গেই বার হয়। অনেকক্ষণ হাঁ করে থাকায় লালা গড়িয়ে পড়েছিল, সসপ্ করে একবার লালা টেনে সে মুখটা বন্ধ করে দেয়। কয়েকটা বাড়ি পরেই হাবোর বাবা দয়ালের খড়ের ঘর। গজেনের সঙ্গে মেয়েকে আসতে দেখে দয়াল ভ্রূকুটি করে তাকায়, কিন্তু গজেন কাছাকাছি এলে তার মুখখানা বেশ অমায়িক মনে হয়।

তেল এক টিন দিলি না বাবা ?

দেব দেব। পরশু কি তরশু নিয়ে আসব সঙ্গে।

কোটের বাঁ হাতটা ঝুলছিল লডবড় করে, ডগাটা পকেটে গুঁজে সে খাল ধারে এগিয়ে যায়। মিলিটারি, সরকারি, আধা-সরকারি আর লাইসেনি নৌকা চলছিল খাল দিয়ে। একটা নৌকাকে সে হাঁক দেয়, জানায় তার পাশ আছে। নৌকা ধারে এসে তাকে তুলে নেয়।

কটিবাজারে সমারোহ ব্যাপার। চারিদিকে অস্থায়ী চালাঘরের অরণ্য, মাছির মতো মানুষের ভিড়, নতুন রাস্তা কাঁপিয়ে হরদম লরিব আনাগোনা। ফাঁকায় পাহাড় সমান স্তূপাকার চালের পচা গন্ধে চারিদিক মশগুল।

হারাধনকে গজেন ক্ষেন্তির ঘরে খুঁজে বার করে। হারাধন লোকটা বেঁটে ও বলিষ্ঠ, ঘাড়ে-গর্দানে এক করা, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথার চুলে পাক ধরেছে। এই অবেলায় মদ খেয়ে চোখ লাল করে ফেলেছে।

মাগি চাই একটা।

গজেন তাকে খবরাখবর দেবার পর হারাধন বলে এক ঢোঁক মদ গিলে। ছোটো ছেলে দিয়ে একদিকে যেমন সুবিধা আছে, অন্যদিকে তেমনি অসুবিধাও অনেক। ছোটো ছেলে যে কোনো বাড়ি গিয়ে যে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কেউ কিছু সন্দেহ করে না। মেয়েলোক কেউ আনাগোনা করলে বরং খটকা লাগতে পারে লোকের মনে কিন্তু এগারো বছরের ছেলে যে মেয়ে ভজানোর কাজে লেগেছে লোকের এ ধারণা সহজে হয় না। কিন্তু অতটুকু ছেলেব কথাতে আবাব ভরসা করতে মেয়েরা সাহস পায় না, এই মুশকিল। খাঁটি গেরস্ত ঘরের দু তিনটি মেয়ে প্রায় তৈরি আছে, চপলার মতো চালাকচতুর হাসিখুশি নাদুসনুদুস একজন মাগির এখন একবার গাঁয়ে ঘুরে আসা দরকার। শাড়ি গয়না পরে গিয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে আসবে ওদের যে ওদের জন্যও কেমন পেটভরা খাওয়া, ভালো ভালো কাপড় আর দামি দামি শাড়ি গয়না রয়েছে তৈরি হয়ে, কটিবাজারে এসে খেটে উপার্জন করে নিলেই হয়।

বেশি গয়না না কিন্তু।

গজেন তা জানে। বেশি গয়না দেখলে খটকা লাগে মানুষের মনে। গবিব মানুষের মনে।

না, বেশি গয়না না।

দু দিন পরে ফুল, একটিন কেরোসিন এবং আরও নানারকম জিনিসপত্র নিয়ে গজেন নৌকায় কাণকালি আসে। ফুল দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয় কিন্তু তার চেহারায় একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে ঘরোয়া ভাবের। মা শিশুকে আদর করতে করতে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লে তখন তার যে রকম মুখের ভঙ্গি হয় তারই স্থায়ী ছাঁচে ঢেলে যেন মুখখানা গড়া হয়েছে ফুলের। তার কথা মিষ্টি, হাসি মোলায়েম। তবু তাকে যারা চেনে তারা তাকে ভয় করে। এই শান্ত নম্র গেরস্ত বউটির মতো চেহারার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে তার ধারে অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

কাণকালি পৌঁছে একটা দুঃসংবাদ শোনা যায়। কোনো এক নারীসংঘ থেকে দু জন মহিলা কর্মী গাঁয়ে এসেছে আগের দিন সকালে। বৈরাগী দাসের সেই বউটাকে তারা সঙ্গে এনেছে কটিবাজারের

বাজার থেকে সংগ্রহ করে, ওদের কথায় জীর্ণ শীর্ণ জ্বরগ্রস্ত বউটাকে বৈরাগী ক্ষমা করেছে, গ্রহণ করেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়ে দু জন সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে লোকের কথায় ভুলে মেয়েরা যেন কোথাও না যায়। লোভে পড়ে গিয়ে দু দিনে মেয়েদের কী অবস্থা হয়, রোগে ব্যারামে শরীর একটু ভাঙলেই কী ভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হয়, বাগে পেলে কী ভাবে দূরে দূরে চালান করে দেওয়া হয় সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। বৈরাগী দাসের বউটাকে সামনে ধরছে প্রমাণ হিসাবে।

সঙ্গে দু জন বাবু আছে তাদের। লালু আর মবুবকে তারা কত উপদেশই যে দিয়েছে ! স্কুলের ছেলে তারা, এই বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খারাপ কাজে লাগা কি উচিত ?—এমনি সব বড়ো বড়ো কত কথা।

সিগারেট চাইতে ছোকরা বাবুটা রেগে টং !

লালু আর মবুব খিলখিলিয়ে হাসে।

গজেন চিন্তিত হয় ফুলকে নৌকায় রেখে একাই নেমে যায়। অবস্থাটা ভালো করে না বুঝে মাগিটাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের মধ্যে যেতে তার ভরসা হয় না। কেরোসিন তেলের টিনটা সে সঙ্গে নিয়ে দয়ালের বাড়ি পৌঁছে দেয়।

তখন শেষ দুপুর। বাকি বেলাটা সারা গাঁয়ে ঘুরে গজেন ভড়কে যায়, চটেও যায়। যারা তাকে দেখতে পারত না কোনোদিন তাদের কথা বাদ যাক, জিনিসপত্র দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে যে সব দুর্বল অসহায় মানুষের কাছে তার বেশ খাতির জমেছিল তারাও যেন অনেকে কেমন দূরে সরে গিয়েছে, তাকে ভালো করে আমল দিতে চায় না। ঘোষপাড়ায় ঢুকবার পথে পাড়ার পাঁচটা ছেলে তার পথ আটকাল, স্পষ্ট বলে দিল পাড়ায় ঢুকলে তার একটি মাত্র আস্ত হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেবে। হাত কার ভাঙে আর কার আস্ত থাকে গজেন তা দেখে নেবে, কিন্তু অবস্থা তো সুবিধাজনক নয়। মদন আমতা আমতা করে আবোল-তাবোল কী যেন বকল। তার বোনটা কথাই বলল না তাদের সঙ্গে। মেহের দরজা খুলল না।

সন্ধ্যার সময় মন খারাপ করে গজেন নৌকায় ফিরে যায়। দু চোখে তার ঘনিয়ে আসে গভীর বিষাদ। নৌকার গলুইয়ে বসে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে এক অজানা দুর্বোধ্য বেদনার রহস্যময় সঞ্চারে তার মন উদাস অবসন্ন হয়ে আসে। বিকৃত উত্তেজনার অবসান ঘটলেই চিরদিন তার এ রকম মন কেমন করে।

ফুল বলে, কী গো, ভাব লাগল ?

ভাবছি। আজ নামা হয় না, নায়ে থাকব।

ও বাবা, ডর লাগবে।

আমি থাকব।

তাতে বুঝি ডর কম ?

ফুলের পিপাসা পেয়েছিল। আজ আর নামতে হবে না স্থির হওয়ায় সে বোতল বার করে তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করে। গজেনকে ডেকে নেয় ছইয়ের মধ্যে। সেখানে কড়া মিলিটারি চোরাই মদ আর ফুলের সাহচর্যে ক্রমে ক্রমে গজেনের উত্তেজনা ফিরে আসায় কাব্যিক বিষাদ কেটে যায়।

আরও কিছু পরে বেশ মেতেই ওঠে তারা দু জনে।

ছইয়ের বাইরে হাবোকে প্রথম দেখতে পায় ফুল। গজেনকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বলে, তুমি কে গো ?

গজেন মুখ ফিরিয়ে বলে, কীরে হাবো ? কী করছিস হেথা ?

হাবো পা গুটিয়ে হাতে ভর দিয়ে বসে হাঁ করে দেখছিল। মুখ দিয়ে তার লালা গড়িয়ে গড়িয়ে নৌকার পাটাতনে জমেছে। সসপ্ করে লালা টেনে মুখ বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়ায়, এক লাফে ডাঙায় পড়ে, ছুট দেয় গাঁয়ের দিকে।

দূরে থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজবার খানিক পরে দয়ালের বাড়িতে 'আগুন ! আগুন !' চিৎকার ওঠে। পাড়ার লোক হইহই করে ছুটে যায়। পুরো একটিন কেরোসিন গায়ে বিছানায় ঢেলে হাবো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘরে পর্যন্ত আগুন ধরে গেছে দয়ালের।

খবর শুনে বৈরাগী দাসের বউ চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, এক টিন তেল ! কুপি জ্বালার তেল মেলে না এক ফোঁটা, ছুঁড়ি এক টিন তেল ঢেলেছে।

অনেকেই আপশোশ করে।

স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই

কৈলাস বসুকে সকলে স্বার্থপর আর সংকীর্ণচেতা বলে জানে। মানুষটার চালচলন আচার ব্যবহার তো বটেই, চেহারাও সকলের এই ধারণাকে অনেকটা সমর্থন করে। বেঁটে, আঁটোসাঁটো ধরনের মোটা, প্রায় গোলাকার মাথায় বুরুশের মতো শক্ত ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, লম্বা নাকের দু পাশে মোটা ভুরু নীচে খুদে খুদে দুটি চোখ। চোখ দুটিকে কটাই বলা চলে। ছোটো এবং কটা, তবু সে চোখের দৃষ্টি বড়ো বড়ো নিকষ কালো চোখের অধিকারীদের কাছে বড়ো বেশি স্পষ্ট সমালোচনা আর তিরস্কারে ভরা মনে হয়। মুখের আটক নেই এমন অভদ্র মানুষকে এড়ানোর মতো সকলের চোখ তাই কৈলাস বসুর চোখকে এড়িয়ে চলে।

কৈলাস কথা যে কম বলে তা নয়, মৃদু রসিকতা ভরা হাসির সঙ্গে মিষ্টিকথাই সাধারণত বলে, তবু লোকের মনে হয় সে যেন বড়ো বেশি গম্ভীর, সব সময় মুখ বুজে কেবল নিজের কথা ভাবছে। কারণটা সম্ভবত এই যে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায়ই তার কথার কোনো যোগ থাকে না। অবিনাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে হয়তো তার দেখা হয়ে গেল, তাকে চমকিয়ে দেবার জন্য অবিনাশ হয়তো সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, ঘোষালের কীর্তিটা শুনেছেন, দাদা—ওপাড়ার কেদার ঘোষালের নতুন কীর্তি ? ছি, ছি ! ভদ্দরলোকের এমন পিরবিত্তি হয়, এমন কাজ ভদ্দরলোকে করে !—

কৈলাস হয়তো জিজ্ঞেস করে, ছেলের কোনো খপর পেলেন চক্কোত্তি মশায় ? চিঠিপত্র এল ?

অবিনাশ একটু দমে যায় ! শহরবাসী রোজগেরে ছেলে তাকে ত্যাগ করেছে সত্য, চিঠিও লেখে না খবরও পাঠায় না, কিন্তু এই কি সে কথা তুলবার সময় ! সহানুভূতি জানানোর তো সময় আছে ? তবু ধৈর্য ধরে অবিনাশ হয়তো বলে, না, চিঠিপত্তর পাইনি। কী জানেন দাদা, এ যুগটাই এ রকম, কারও কাণ্ডজ্ঞান নেই। নইলে ঘোষাল এমন কাণ্ডটা করতে পারে ? বামুন মানুষ তুই, গলায় তোর পইতে আছে, সন্দেবেলা তুই কিনা এক জেলেমাগির ঘরে—

কৈলাস হয়তো আবার বলে, সেই যে পাত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন খুকির জন্যে, কতদূর এগোল প্রস্তাবটা ?

অবিনাশের হাত দাঁত সুড়সুড় করে, কৈলাসের গালে এক ঘা বসিয়ে দিতে, গায়ের কোথাও কামড়ে দিতে।

নবীন সরকারের দাওয়ায় বসে হয়তো পাঁচজনে নানা কথা আলাপ করছে। সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সেক্রেটারি কীসে সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলল যে সাত টাকা এগারো আনা বিপিন মুদির দোকানে ধার থেকে গেল, সকলে যখন এ সমস্যার কূলকিনারা পাচ্ছে না, কৈলাস হয়তো তখন আপন মনে বকে চলেছে, এ বছর বর্ষা কম হওয়ার ফলটা এ পর্যন্ত কী দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে। গ্রামান্তরে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার সময় ভূষণের বিধবা শালির গর্ভটা ঠিক ক মাসের হয়েছিল, সকলে যখন এই তর্কে মশগুল হয়ে আছে, কৈলাস হয়তো তখন কেবলই সকলকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে, বিপিন মুদির দোকানে দুর্গোৎসবের ধারটা সে এখন ঘরের পয়সা দিয়ে মিটিয়ে দেবে বলেনি, কয়েকজনের কাছে তার যে টাকাটা পাওনা আছে সেটা পেলে তখন মিটিয়ে দেবে।

এ কী কথা বলা ? আলাপ করা ? এ ভাবে কথা বলার চেয়ে মুখ বুজে থাকা কি ভালো নয় ?

কৈলাস কখনও কোথাও চার আনার বেশি চাঁদা দেয় না, কোনো উপলক্ষেই নয়। অন্তত পাঁচ টাকায় বিক্রি করা চলে এমন কিছু বাঁধা না দিলে পাঁচটা টাকা ধার পর্যন্ত দেয় না। পাড়ায় যে থাকে,

যার ছেলে শহরে একশো টাকা বেতনে চাকরি করে, তাকে পর্যন্ত নয় ! হাসি মুখে আবার বলে যে, এ ভাবে টাকা ধার না দিলে শোধ করার কথাটা কারও মনে থাকে না, শোধ করার চেষ্টাও থাকে না। সকলের চোখের উপরে নিজের খুশিমতো সে একটি ছোটো পাকা বাড়ি তুলেছে—ক খানা এবং কতবড়ো ঘর করা উচিত, দরজা জানালা কী রকম হলে ভালো হয়, এ সব বিষয়ে কারও একটা পরামর্শও কানে তোলেনি। পথ সংক্ষেপ করতে সকলে পায়ে পায়ে তার জমির উপর যে পথটি গড়ে তুলেছিল, বিনা দ্বিধায় তার উপর রান্নাঘর তুলে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুযোগ অভিযোগের জবাবে হাসিমুখে বলেছে, কয়েক গজ বেশি হাঁটা মানুষের পক্ষে সমান কথা। পঞ্চাশ হাত তফাতের পথটাতেই যখন কাজ চলে সে কেন অন্য জায়গায় রান্নাঘর তুলে অসুবিধা ভোগ করবে ?

কেদার ঘোষাল সকলকে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু কেউ সাহস করেনি। অন্য লোকে হয়তো মামলার নামেই একটা মিটমাটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত, তার জমির উপর দিয়ে পাড়ার লোকের হাঁটবার অধিকারের বদলে কমপক্ষে পাড়ার লোককে মস্ত একটা ভোজ দিয়ে দিত। কিন্তু কৈলাস হয়তো মামলার নামেই আগে কলকাতা থেকে উকিল ব্যারিস্টার আনাবার ব্যবস্থা করে রাখবে।

কৈলাসের স্ত্রী অভয়ার একটু ঝগড়া করা শখ। কিন্তু সাতটি ছেলেমেয়ে আর স্বার্থপর স্বামীর জন্য বেচারির শখটা ভালো করে মিটতে না মিটতে প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সে অনুযোগ করে বলে, মানুষের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে পার না ?

কৈলাস আশ্চর্য ও আহত হওয়ার ভান করে বলে, কেন, তোমার সঙ্গে মানিয়ে চলি না ?

মানিয়ে যা চল তা ভগবানই জানেন। আমার কপাল মন্দ তাই তোমার হাতে পড়েছিলাম। লোকের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াও কেন তুমি ? তোমার কী দরকার নিন্দে করে ? সকলকে চটিয়ে লাভ কি শুনি ?

কৈলাস জবাব দেয় না। এও তার এক ধরনের স্বার্থপরতা, নিজেকে সমর্থন করার জন্যও নিজেব স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। অভয়ার অনুযোগটাও মিথ্যা নয়। কারও কুৎসা কৈলাস কানে তুলতে চায় না, উৎসাহী প্রচারককে বাজে কথা বলে দমিয়ে দেয়, তবু যে কী করে কুৎসা-প্রচারক হিসাবে তারই নামে কুৎসা রটে যায় ! তার কথায় লোকে বিশ্বাস করে বলে হয়তো প্রচারকামীরা ইচ্ছা করে তার নামটা ব্যবহার করে। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সে এমনভাবে নিজের নিজের অন্যায়গুলি উপলব্ধি করায় যে অন্যের অপবাদ কানে এলে সকলের মনে হয়, সে ছাড়া আর কে চোখে আঙুল দিয়ে পরের অপবাদ দেখিয়ে দেবে ?

কেদার ঘোষালের আধুনিকতম কলঙ্কের সঙ্গে তার নামটা বড়ো বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। অবিনাশ চক্রবর্তী রাধারমণ ভট্টাচার্যকে বলেছিল, কৈলাস বোসের অহংকার আর তো সয় না দাদা। নিজের চোখে যা না দেখবে তাই হেসে উড়িয়ে দেবে, সবাই যেন মিথ্যেবাদী। কেদার ঘোষালের ব্যাপারটা বললাম, শুনে আমার সঙ্গে তামাশা জুড়ে দিল। আমি যেন ওর তামাশার পাত্তর !

আরও অনেক কথা অবিনাশ বলেছিল। পরদিন রটে গিয়েছিল, কৈলাস স্বীকার করেছে যে সে নিজের চোখে কেদার ঘোষালকে জেলেমাগির ঘরে ঢুকতে দেখেছে। রটনাটি আরও খানিকটা বিকৃতভাবে স্বয়ং কেদার ঘোষালের কানে গিয়ে পৌঁচেছে !

সুতরাং কেদার ঘোষাল ভয়ানক চটে গেছে ! কৈলাস বদনাম রটিয়েছে বলে শুধু নয়, বদনামটা একেবারে মিথ্যা বলে। জেলেপাড়ায় কেদার গিয়েছিল কিন্তু কোনো জেলেমাগির ঘরে ঢোকেনি। কে না জানে যে আজকাল সে কেবল জেলে পাড়া নয়, কুমোরপাড়া, তাঁতিপাড়া, বাগদিপাড়া সব পাড়াতেই যাতায়াত করছে ? মিউনিসিপ্যালিটির সে সদস্য, এখানকার সর্বপ্রধান নেতা, সে যদি এ-সব পাড়ায় না যায়, কে যাবে ? এতদিন প্রয়োজন ছিল না, যায়নি, এখন প্রয়োজন হয়েছে, যাচ্ছে।

ও সব গরিব দুর্ভাগাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সে যে চেষ্টা আরম্ভ করেছে, সেটা তো সকলে জানে ? অন্তত, জানা তো উচিত সকলের ? তবু তার নামে এই মিথ্যা বদনাম !

আসলে বদনামটা কিন্তু খুব বেশি ছড়ায়নি। দু-চারদিন একটু ফিসফাস করে চুপ করে গিয়েছিল। কেদারের চরিত্রগত বেশ সুনাম আছে চারিদিকে। সকলে তাকে ভদ্র, সংযত, ভালোমানুষ বলেই অনেকদিন হতে জানে। মানুষটা সে উদার, পরোপকারী। সর্বত্র সে যে অনেকের চেয়ে বেশি টাকা চাঁদা দেয় তা নয়, মাঝে মাঝে নানা প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা দানও করে। তাকে ছাড়া সভাসমিতি হয় না, নতুন পরিকল্পনা দাঁড়ায় না। স্থানীয় হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরি প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তার যোগ আছে। বন্ধু ও পরিচিত সকলেই তাকে পছন্দ করে, অনেক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে তার পরামর্শও জিজ্ঞেস করতে আসে।

একটিমাত্র খাপছাড়া বানানো বদনামে এ রকম জনপ্রিয় মানুষের সুনাম নষ্ট হয় না। তবু, একটু ভয় পেয়ে ছোটোলোকদের পাড়ায় যাওয়া কেদার অনেক কমিয়ে দিল। এক মাসের মধ্যে জেলেপাড়ার ধারেকাছেও ভিড়ল না। কিন্তু একেবারে না গেলেও তো চলে না, নেতৃত্ব বজায় রাখা চাই। তাছাড়া ওদের অবস্থাও সত্যসত্যই বড়ো শোচনীয়, ওদের জন্য যতটুকু পারা যায় না করলেই বা চলবে কেন ? তাই, সকালের দিকে মাঝে মাঝে কেদার ও সব পাড়ায় যায় এবং কমপক্ষে সাত আটজন অনুগত ও উৎসাহী কর্মীকে সব সময় বডিগার্ডের মতো সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

আগেও অবশ্য এ রকম বডিগার্ড দু-একজন কেদারের সঙ্গে থাকত। একা ও সব পাড়ায় যেতে তার চিরদিনই ভয় করে। এখন ছোটোখাটো একটি দল বেঁধে যায়, কেউ যাতে আর কোনোমতেই ভুল করতে না পারে যে তার ভালো ছাড়া মন্দ কোনো উদ্দেশ্য আছে।

কৈলাসও মাঝে মাঝে ও সব অঞ্চলে যায় তবে কেদারের মতো কখনও নেতা হিসাবে উপরে উঠবার প্রেরণায়, কখনও গোরু ছাগলের মতো যারা জীবন কাটায় তাদের জন্য কিছু করবার সুখে, কখনও বা নবযুগের নতুন মতাবলম্বী অল্পবয়সি অনুগত কর্মীদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় অবশ্য ওদিকে যায় না, নিছক তার নিজের দরকারে। ওখানকার অনেকেই তার কাছে টাকা ধারে। টাকার পরিমাণটা অবশ্য খুবই কম, গরিবকে কৈলাস কখনও দু-পাঁচটাকার বেশি ধার দেয় না এবং সুবিধামতো হয় টাকায়, নয় মাঠের ধানে, বিলের মাছে, গোয়ালের দুধে, তাঁতের কাপড়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয় ! কৈলাসের নিজের কিছু জমি আছে, সেই জমিতে খেটে যদি কেউ দেনা শোধ করতে চায় তাতেও কৈলাস আপত্তি করে না। তবে সুদটা কৈলাসকে নগদ দিতে হয়—পাঁচ টাকা পর্যন্ত মাসিক এক পয়সা সুদ !

মফস্বলের ছোটো শহর, কোথায় শহরের শেষ আর গ্রামের আরম্ভ সরকারি কাগজপত্রের নির্দেশ দেখেও সেটা ঠিক করা যায় কিনা সন্দেহ। একদিন তাই নকুড় পালের বাড়ির সামনে কৈলাস আর কেদারের দেখা হয়ে গেল। এগারোজন বডিগার্ড অর্ধচন্দ্রাকারে কেদারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাত তিনেক তফাতে নকুড়ের আশপাশে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার কুড়ি বাইশজন লোক। কমবয়সি ছেলেমেয়েও জুটেছে অনেক, কাছাকাছি প্রায় সমস্ত বাড়ির বেড়ার ফাঁকে মেয়েদের মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সকলকে জড়ো করে কেদার সবে বলতে আরম্ভ করেছিল, কৈলাস একপাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। কৈলাসের উপর রাগ ছিল, সেই জন্য বোধ হয় তাকে দেখে কেদারের উৎসাহ গেল বেড়ে, অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি আবেগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে রোগ আর দারিদ্র্যের পীড়নে সকলের কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে সকলকে তাই ভালো করে বুঝিয়ে দিল। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকলের যে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, এই কথাটা বুঝিয়ে দিতেও তার সময় লাগল অনেকটা।

কেদারের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র কৈলাস সায় দিয়ে বলল, ঠিক কথা, ঠিক বলেছেন। তারপর মুখে একটা জোরালো আপশোশের আওয়াজ করে বলল, তবে কি জানেন, বেচারিরা করবে কী, করবার যে কিছু নেই !

কেদার রাগ করে বলল, করবার কিছু নেই মানে ?

কী আছে বলুন ?

ওই যে বললাম, সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে ?

বেশ বোঝা যাচ্ছিল কেদারের বক্তৃতায় কৈলাসের মন রীতিমতো নাড়া খেয়েছে, এ কথায় সেও যেন রেগে গেল, আপনি তো বলে খালাস চেষ্টা করতে হবে বলে। কী চেষ্টা, কীসের চেষ্টা তা বলুন ? তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, যাক যাক, আমার ও সব কথায় কাজ কী। আপনার ছেলের জ্বর কমেছে কেদারবাবু ?—আমার সেই টাকাটা নকুড় ?

নকুড় কাছে এগিয়ে এল, নিচু গলায় বলল, আজ তো লারব কর্তা।

কৈলাস মাথা নেড়ে বলল, তা কী হয় হে, আজ না পারলে কবে পারবে ? পরশু ধান বেচার টাকা পেয়েছ, তিন টাকা তিন পয়সা দিতে পারবে না ?

নকুড় বিড়বিড় করে কী বলতে লাগল কারও কানে গেল না। হঠাৎ কেদার বলল, আপনিই বা এমন নাছোড়বান্দা কেন মশায় ? গরিব মানুষ এত করে বলছে, তিনটে টাকার তো মামলা। কদিন পরেই না হয় আদায় করবেন ?—আচ্ছা, এই নিন, আমি দিচ্ছি আপনার তিন টাকা শোধ করে। তুমি তোমার সুবিধে মতো আমায় টাকাটা দিয়ো নকুড়, আর যদি নেহাত নাই দিতে পার—

নকুড় প্রথমটা থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল, কেদারকে মনিব্যাগ হতে টাকা বার করে কৈলাসের দিকে বাড়িয়ে দিতে দেখে তাড়াতাড়ি ঠিক ম্যাজিকওয়ালার মতো কোমরের ভাঁজ হতে ঠিক তিন টাকা তিন পয়সা বার করে ফেলল। টাকাটা কৈলাসের হাতে দিয়ে লজ্জার হাসি হেসে সবিনয়ে কেদারকে বলল, না, বাবুমশায়, না। মোর থেকে মিটমাট হয়ে যাকগা—হাঙ্গামায় কাজ কী ?

তারপর কৈলাস বলল, এবার ফিরবেন তো ? চলুন এক সঙ্গেই যাই।

কৈলাসের আরও কয়েকটি আদায় বাকি ছিল, কেদারও ঠিক করেছিল কিছু তফাতের আরেকটি পাড়া আজ ঘুরে যাবে। নিজের নিজের কাজ বাতিল করে দু জনে একসঙ্গে ফিরে চলল পাশাপাশি, নিঃশব্দে—অনেকটা বন্ধুর মতো। কৈলাস নিজে হতে কথা পাড়বে না বুঝে কেদার শেষে বলল, আপনি বড়ো নিষ্ঠুর।

কৈলাস বলল, কী করি বলুন, উপায় কী !

আপনার মন বড়ো ছোটো।

তা বটে। একজনের তিনটে টাকা বলে উদারতা দেখালেন, ও রকম দুশো চারশো হলে করতেন কী ? এখনও প্রায় তিনশো লোক আমার কাছে টাকা ধারে।

আমি হলে চাইতে পারতাম না—দান করে দিতাম।

কবার দিতেন ? দু দশ টাকা দিলেই যদি চিরকালের জন্যে ওদের অভাব মিটে যেত তবে আর ভাবনা ছিল না ! ফাঁকে তালে কিছু লাভ করার সুযোগ পেলে বরং ওদের স্বভাবটাই বিগড়ে যেত। ওদের আপনি জানেন না। নিজের যার রোজগার নেই অন্যে তার কী করবে, কতকাল করবে ? দেশে কি গরিবের সংখ্যা আছে !

তাই বলে চুপ করে বসে থাকবেন ?

কৈলাস হাসল।—বসে আছি ? সারাদিন তো খাটছি, মশায়। অতবড়ো একটা সংসার ঘাড়ে কতকাল ধরে কত খেটেখুটে তবে না আজ অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল করেছি। ক্ষমতা তো তেমন নেই, কী আর হবে ! কত লোক বসে বসে লাখপতি হয়, আমি জীবন পাত করে যা করলাম ছোটো একটা

বাড়ি করতেই ফতুর—তাও ঘরে কুলোয় না। ওদের অবস্থা দেখে প্রাণ কি কাঁদে না মশায় ? কখনও কি সাধ যায় না এর তিনটে টাকা, ওর পাঁচটা টাকা ছেড়ে দি ? তারপর ভাবি তাতে লাভটা কী হবে ! মাঝখান থেকে আর দশজনের কাছে আদায় করার সুখ থাকবে না। হঠাৎ কারও বিপদ আপদ ঘটল, পাঁচটা টাকা শোধ দিতে উপোস করার অবস্থা হল—তার কথা আলাদা। তাও খুব হিসেব করে আদায় বন্ধ করতে হয় মশায় ! বড়োলোক তো নই, নিজের কটা টাকা ফুরিয়ে গেলে দরকারের সময় দু পাঁচটা টাকাও তো কাউকে দিতে পারব না।

কৈলাসকে উত্তেজিত মনে হয়। জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। হঠাৎ সুর বদলে বলে, আসল কথা ক্ষমতা নেই, বড়ো বড়ো কথা ভেবে করব কি বলুন ? তাতে একূল ওকূল দুকূল নষ্ট—ছেলেমেয়েগুলির দু বেলা পেট ভরে ভাত জুটবে না। তার চেয়ে নিজের যেটুকু শক্তি আছে কারও ক্ষতি না করে—

কেদার বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। বক্তৃতায় আপনারা খুব পটু। ক্ষতি করেই বা কত ছাড়েন ! কবে আপনি আমায় জেলেমাগির ঘরে যেতে নিজের চোখে দেখেছিলেন মশায় ?

অভিযোগটা কৈলাস আগাগোড়াই অস্বীকার করল, কিন্তু কেদার বিশ্বাস করল না। মুখ ফুটে অবিশ্বাসটা প্রকাশ করলে কৈলাস হয়তো কথাটা আরও খানিকটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মুখের উপর মানুষকে ও ভাবে মিথ্যাবাদী বলাও কেদারের পক্ষে বড়ো কঠিন।

পোস্টাপিসের কাছে ছাড়াছাড়ি হল। কেদারের সঙ্গী একটি ছেলে মন্তব্য করল, চাঁই বটে লোকটা। কেমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, এ রকম স্বার্থপর ছোটোলোক তো মানুষটা তবু নকুড়, শশী এদের কাছে ওর কী খাতির।

কেদার বলল, খাতির করে, না ডরায় ?

ছেলেটি বলল, না, ঠিক ডরায় না। ওকে খুব বিশ্বাস করে।

বিশ্বাস কৈলাসকে সকলেই করে। লতাপাতা ফুল আর রঙিন কাগজে সাজানো পাটখড়ির প্রকাণ্ড মঞ্চের চেয়ে ছোটো একটা কাঠের টুলের উপর মানুষের যেমন আস্থা থাকে উচ্ছ্বসিত মমতা আর শুভকামনায় ভরপুর অনেক উদারচেতা মহাপুরুষের চেয়ে স্বার্থপর কৈলাসকে সেইরকম বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়। লটারির টিকিটে লাখ টাকা পাওয়া সম্ভব বটে কিন্তু পাঁচ টাকার নোটে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাবেই। কৈলাসের কাছে কেউ কোনোদিন বিশেষ কিছু আশা করে না কিন্তু অমন তো হাজার হাজার লোক আছে যাদের কাছে কেউ কোনোদিন কিছুই আশা করে না। জবরদস্তি আদায় করুক, দরকারের সময় পাঁচটা টাকাও তো সে দেয়। সব সময় নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবুক, অপরকে তার সুখ সুবিধা হতে বঞ্চিত করার চেষ্টা তো সে করে না। আবোল-তাবোল কথা তো সে বলে না। মানুষকে সে তো ঠকায় না। নিজের দায়িত্ব আর কর্তব্য তো সে পালন করে। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করুক কারও পাও তো সে চাটে না।

তবে লোকটা বড়ো স্বার্থপর, এই যা দোষ। একটু অভদ্রও বটে। সেদিন কেদারের বক্তৃতা শুনেই বোধ হয় কৈলাসের মধ্যে পরের ভালো করার জন্য একটু আগ্রহ দেখা গেল। কয়েকদিন পরে সে নিজেই কেদারের বাড়ি গেল, সবিনয়ে বলল, সেদিন ওদের সম্বন্ধে যা বলছিলেন, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন তো ঘোষাল মশায়। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে সেদিন থেকে !

শতরঞ্চি বিছানো চৌকির উপর সে জেঁকে বসল, হেসে বলল, বিবেক মশায়, বিবেক মুখে, যে যাই বলুক, অন্যায় করছে মনে হলে বিবেক খোঁচাবেই খোঁচাবে।

ঘণ্টাখানেক আলাপ আলোচনার পর কেদারের মুখে যখন উগ্র উত্তেজনা আর কৈলাসের মুখে গভীর অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দু জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘরে তিনজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক আর পাঁচটি কিশোর বসে ছিল, তারা সকলে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই কৈলাসের

দিকে চাইতে লাগল। কথা সে আবোল-তাবোল বলেছে, অতি পরিচিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত শব্দের অর্থ পর্যন্ত উলটে দেবার চেষ্টা করেছে, দেশের বৃহৎ ব্যাপারকে রূপ দিতে চেয়েছে ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারের, তবু তার কথাগুলি কী স্পষ্ট আর সহজবোধ্য। এ সব বিষয়েও যে কৈলাস মাথা ঘামায়, এতক্ষণ এমন তেজের সঙ্গে তর্ক করতে পারে, কেউ তা কখনও কল্পনাও করেনি। তারপর কৈলাস বলল, যাকগে, ও সব বড়ো বড়ো কথা আমার মাথায় ঢুকবে না। একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। আপনি তো মিউনিসিপ্যালিটিতে আছেন, নিজের চোখে ওদের পাড়ার অবস্থা দেখেওছেন অনেকবার, যেমন ধরুন নকুড়ের বাড়ির সামনের রাস্তাটা—

কেদার তাড়াতাড়ি বলল, চেষ্টা তো করছি। একা কী করব ?

কৈলাসও তাড়াতাড়ি বলল, একা কেন ? অন্য সকলকে বোঝাতে পারেন না ? ওঁরা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওদের যদি না বোঝাতে পারেন—

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। কেদার অবজ্ঞাভরে তামাশার সুরে বলল, আপনি পারেন ? দেখুন না একবার চেষ্টা করে !

কৈলাস গম্ভীরভাবে বলল, তাই ভাবছি। তবে ঢুকতেই যা হাঙ্গামা, ভাবতেও ভয় করে ! আপনার তো সব জানাই আছে !

কেদার আশ্চর্য হয়ে বলল, বলেন কি মশায়, আপনি এবার দাঁড়াবেন নাকি ?

কৈলাস সায় দিয়ে বলল, দেখি একবার চেষ্টা করে। আপনি এক কাজ করুন না, আপনি নিজে না ঢুকে আমায় ঢুকিয়ে দিন না ?

প্রস্তাব শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। কৈলাসের মতো স্বার্থপর মানুষের পক্ষেও কি এমন একটা খাপছাড়া প্রস্তাবকে স্বাভাবিক মনে করা সম্ভব ?

সেদিন সন্ধ্যার সময় কৈলাস বাড়িতে বসে আছে, দুটি কিশোর তার সঙ্গে দেখা করতে এল। কৈলাস দেখেই চিনতে পারল, সকালে তারা কেদারের বৈঠকখানায় বসেছিল।

কী মনে করে ভাই ?

আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম !

তখনও নির্বাচনের মাস ছয়েক দেরি ছিল। কিন্তু ধরতে গেলে সেদিন হতেই দু জনে লড়াই শুরু হয়ে গেল। নির্বাচনের মাসখানেক আগে দেখা গেল লড়াইটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রথমটা কৈলাসের বোকামিতে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল লোকটার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেদারের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার মতো লোকের দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় ? কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে দেখা গেল, কৈলাস খুব বেশি বোকা নয়। তার দিকেও অনেক সমর্থক জুটে গেছে ! যতই জনপ্রিয় হোক, কেদারের শত্রুও ছিল অনেক, তারা কৈলাসকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে। কৈলাসের সবচেয়ে বেশি জুটছে কমবয়সি সমর্থকের দল ! এতকাল যারা কেদারের নামে হইচই করেছে, বডিগার্ডের মতো সঙ্গে থেকেছে, তাদেরও কয়েকজন কৈলাসের দিকে ভিড়েছে।

তবে, ফলটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে বলা যায় না। কেদারের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশি।

এই ঘরোয়া নির্বাচন উপলক্ষে শহর অনেক কাল এ রকম সরগরম হয়ে ওঠেনি। নির্বাচনের অনেকদিন আগে হতেই সকলের মুখে শুধু এই আলোচনা। কৈলাসের দলের ছেলেরা প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, গরিবদের জন্য কৈলাস অনেক কিছু করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও, তার উদ্দেশ্যটা যে কিছু করা প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করেছে। কৈলাসকে সকলে বিশ্বাস করে।

কৈলাসের দলের প্রচারকার্যের বিবরণ শুনতে শুনতে এবং দশজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কেদার স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এবার তার জয়-পরাজয় নির্ভর করছে গরিবের জন্য তার কিছু করবার ক্ষমতায় দশজনের বিশ্বাসের উপর। গরিবদের জন্য সকলের এই অর্থহীন মাথাব্যথায় কেদারের বিরক্তির সীমা থাকে না, রাগে গা জ্বলে গিয়েছে, কিন্তু গরিবদের পাড়ায় যাতায়াতটা সে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছে, নির্বাচনের আর বাকি আছে মোটে তিনটে দিন, একদিন বিকেলে ওই গরিবদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাধবার উপক্রম দেখা গেল। উপলক্ষটা একটু খাপছাড়া। নকুড়ের বাড়ির কাছে একটা ফাঁকা মাঠ আছে। কেদার আর কৈলাস দু জনের দলের কর্মীরাই গরিবের পাড়ায় পাড়ায় বলে এসেছিল বিকেলে যেন সকলে ওই মাঠে জমা হয়। এই মাঠে এসে কেদার ও কৈলাসের কথা শুনবার জন্য আগেও কয়েকবার তাদের ডাকা হয়েছে কিন্তু একদিন এক সময়ে দু জনের কথা শুনবার জন্য নয়।

নির্বাচন নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ার উত্তেজনা গরিবদের পাড়াতেও যথেষ্ট পরিমাণে সংক্রামিত হয়েছিল। বহু লোক মাঠে এসে জড়ো হয়েছে। তারপর কী ভাবে যেন অনুপস্থিত কেদার আর কৈলাসকে নিয়ে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছে।

সভা আহ্বানের ভুলটা প্রায় শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে কেদার ও কৈলাস সভায় আসেনি। দু জনেই পরম উদারতার সঙ্গে অপরকে সভায় কথা বলার সুযোগটা দান করেছে। কিন্তু পরস্পরের উদারতার খবর না পাওয়ায় দু জনের একজনও সুযোগটা গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।

খবরের জন্য উৎসুক হয়ে কৈলাস ঘরে বসেছিল। হন্তদন্ত হয়ে নকুড় ও একটি ছেলে এসে দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনার খবরটা দিল। শুনে জুতা পর্যন্ত পায় না দিয়ে ফতুয়া গায়ে কৈলাস ছুটে গেল কেদারের বাড়ি। ব্যাপারটা কেদারকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, শিগগির যাই চলুন।

কোথায় যাব মশায় ? ওই দাঙ্গার মধ্যে ?

আপনি আর আমি গেলে দাঙ্গা বাঁধবে না। চলুন, চলুন, দেরি করবেন না !

কেদার মাথা নেড়ে বলল, এতক্ষণে বেঁধে গেছে—এখন গিয়ে কী হবে !—মাঝখান থেকে মাথাটা ফাটবে শুধু। পুলিশ সামলে নেবে লাঠির ঘায়ে।

কাজেই কৈলাসও দাঙ্গা থামাতে গেল না।

শত্রুমিত্র

আদালতের বাইরে আবার দেখা হয় দু জনের, পানবিড়ি চা মুড়ি মুড়কি আর উকিল মোক্তারের দোকানগুলির সামনে। দু জনে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। তীব্র বিদ্বেষের আগুনে যেন পুড়ে যায় দু জোড়া চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় রসুল একটা অকথ্য কুৎসিত কথা বলে। কথাটা দামোদরের কানে যায় না, ভিতরের হিংসার ধাক্কাতেই সে হাত দুটো মুঠো করে রসুলের দিকে দু পা এগিয়ে যায় নিজের অজান্তে, উচ্চারণ করে বিশ্রী একটা অভিশাপ, তারপর লাল কাঁকর বিছানো পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হনহন করে চলতে আরম্ভ করে কিছু দূরের বড়ো বটগাছটার দিকে।

বটের ছায়ায় অনেক লোক। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। গাছটার গোড়ার দিকে ঘেঁষে বসে চাঁপা আকাশ-পাতাল ভাবছিল। তার মুখের ভাবটা ভ্রুকুটিগ্রস্ত। পাশে বসে বিড়ি টানছিল দেবর মহেশ্বর। মহেশ্বরের তৈলহীন রুক্ষ চুলে নিখুঁত ভাঁজের টেরি।

দুপুরের ঝাঁজালো রোদে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। বটের বিস্তীর্ণ গাঢ় ছায়া পর্যন্ত গরম। প্রতাপগড়ের বাস ছাড়বে সেই বিকেলে, আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পর। এখানেই সময় কাটাতে হবে সে পর্যন্ত।

ফের আসতে হবে তোমাকে ? চাঁপা শুধোয়।

এগারো বছরের পুরানো উড়নি বাঁচিয়ে কোঁচার খুটে কপালের ঘাম মুছে দামোদর বলে, হ্যাঁ, শালারা সময় নিল বেগতিক দেখে। সাতাশ তারিখ।

একে দুয়ে দামোদরের অন্য সাক্ষীরা এসে সেখানে জোটে, মোট পাঁচজন। মাথার কাপড় চাঁপা আর একটু টেনে দেয়। আগে অনেকবার ভেবেছে, এখন অনেকবার ভাবে, তসরে তাকে কী ছাই মানিয়েছে কে জানে—আর কপালের প্রকাণ্ড চওড়া সিঁদুরের ফোঁটায়। এ বুদ্ধিটা বাতলিয়েছে বুদ্ধিমান কেদার উকিল। হাকিম নাকি পরম ধার্মিক। এ সব দেখলে মন ভেজে। কিন্তু কই ভিজল বুড়োর মন, ওরা আবদার করতেই তো মুলতুবি করে দিল। মরণও হয় না বুড়ো শকুনটার !

সাক্ষীরা তাদের গাঁয়েরই লোক। মামলা মুলতুবি হওয়ায় তারা খুশি না অখুশি হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। অহংকারে শীর্ণ বুক ফোলাবার চেষ্টা করে সক্রোধে তারা ঘোষণা করে যে রসুল মিয়াকে আজ শেষ করে দিয়েছিল, বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছে চালাকি করে। তারা যে সত্যই রাগ করেছে। অথচ সাক্ষী দিতে আসবার সুযোগ অনেকদিন বাড়ল বলে, আবার কিছু আদায় করা যাবে বলে, ভাবটাও ঠিক যেন তারা চাপতে পারছে না।

সাক্ষীদের মধ্যে গোঁসাই একেবারে চাক্ষুষ। গায়ের গলাবন্ধ ফতুয়াটার মতোই তার মুখ ময়লা, ঢিলে আর ছেঁড়া ছেঁড়া। সে উৎসাহে ফেলে ফেলে বলে, ভাবছ কেন ভায়া, তালিম দেয়া মিছে সাক্ষী তো নই যে জেরায় কুপোকাত হব। দিক না উকিল যাকে খুশি, করুক না জেরা যদ্দিন পারে। নিক না সময়।

হলধর সহজ সরল বোকা চাষি। —আটগণ্ডা পয়সা বেশি দিতে হবে মোকে। নইলে এসবো নি কিন্তু বলে দিলাম, হাঁ। ভুবন ঘোষ মাইনর স্কুলের মাঝামাঝি মাস্টার। সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বলে—কাণ্ড বটে বাবা। এত বেশি হেসে এ রকম একটা সাধারণ মন্তব্য করায় মনে হয় সেই বুঝি ব্যাপারটার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে মাথাওলা লোকের মতো। নইলে এমন ভীষণ কাণ্ডে তার কেন মজা লাগবে ?

চাঁপার চোখে জল আসে। এরা কী নিষ্ঠুর !

হারাধন বাস্তব বুদ্ধির লোক। সে বলে, বলি দামোদর, বাস তো ছাড়বে ও বেলা। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে বাবা। খোরাকি বাবদ কী দেবে বলেছিলে, দাও দিকিনি, খেয়ে আসি।

শুনে সকলের পেটেই খিদের জ্বালা চাড়া দিয়ে ওঠে, চাঁপার পর্যন্ত। সেই কোন সকালে গাঁ থেকে তারা খেয়ে বেরিয়েছে।

প্রতাপগড়ের একটিমাত্র বাস। প্রতাপগড়ের কাছাকাছি গিয়ে শাপুরে সবাই নামবে। দামোদরেরা বাসে উঠবার খানিক পরেই সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে রসুলও উঠে জাঁকিয়ে বসে। আদালতে এ পক্ষের আকস্মিক অচিন্তিত চালবাজিতে রসুলের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল, ওরা কায়দা করে দিন ফেলে চালবাজিটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় খেপে গিয়েছিল দামোদর। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য ছিল না। এখন সে দিশেহারা উন্মত্ত আক্রোশ আর নেই, এসেছে গভীর হিংসা আর ঘৃণা। আমি মরি মরব ওকে তো মারব, এই বেপরোয়া ভাবের বদলে দুজনের মধ্যেই জেগেছে নিজের কোনো ক্ষতি না করে অপরের সর্বনাশ করার কামনা—এমন কী পারলে অপরের সর্বনাশ থেকে নিজের কিছু লাভ করে নেবার সাধ ! চাঁপা ঘোমটা টেনে ভালো করে ঢেকে ঢুকে বসে। বাসে তিনজন লালমুখো গোরা মদে চুর হয়ে বসে ছিল আগে থেকে, মাঝে মাঝে আড়চোখে সে তাদের দিকে তাকায়। রসুলের দিকে চোখ ফেরাতে তার সাহস হয় না।

শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে আসে। পিছন আর সামনে থেকে ধুলো উড়িয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে লরি চলে যায়, শব্দ পেলেই বাসচালক কানাই গতি মন্থর করে যত পারে নর্দমার ধার ঘেঁষে সরে যায়, লরি পেরিয়ে গেলে গাল দিতে থাকে চাপা গলায় ! চাঁপা বসেছে রাস্তার ভেতরের দিকের জানালায়—লরি কিছু দূরে থাকতেই সে নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বোজে।

চোখ বুজে থাকার সময়েই একবার প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়ে পাশের বুড়িকে নিয়ে নীচে পড়ে যায়। বাসটাও একটু কাত হয়ে থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

একজন গোরা চাঁপাকে পাঁজাকোলা করে তুলবার চেষ্টা করতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। দরজা দিয়ে বেরোবার জন্য প্যাসেঞ্জারদের তখন ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু-তিনজন দরজা থেকে সোজা নালায় গিয়ে পড়ে। কানাই গালাগালি বন্ধ করে চেঁচায়, ভয় নেই, ঠিক আছে ! ভয় নেই, ঠিক আছে !

ঠিকই আছে কলটা। ডাইনের মাডগার্ডটা শুধু ভেঙেছে আর বডির খানিকটা তুবড়ে ভেতরের দিকে দেবে গেছে। আর চার-ছ ইঞ্চির জন্য বাসটা উলটে নালায় পড়েনি।

নালায় যারা পড়েছিল নামতে গিয়ে তাদের একজনের হাত মচকেছে, হয়তো ভেঙেছে। সঙ্গী জল কাদা সাফ করে দিলে বাসে উঠে সে কেবলই বলতে থাকে, নম্বর নিয়েছ কেউ ? নম্বর ?

আর একজন বলে, আরে মশায়, রাখুন। নম্বর ! নম্বর দিয়ে হবে কী ?

গাড়ি ছাড়বার আগে কানাই বলে, শালারা ! যতটুকু উচিত তার চেয়ে এক ইঞ্চি যদি সরি—

না না, গোঁয়ার্তুমি কোরো না হে। মাঝবয়সি মোটাসোটা একজন প্যাসেঞ্জার বলে।

কীসের গোঁয়ার্তুমি ? ভয় পেলেই ও শালারা মজা পায়। আমি জানি।

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। খেত মাঠ জলায় আর আকাশে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে পড়ার ব্যথা ও দুর্ঘটনার আতঙ্ক চাঁপার মিলিয়ে আসে—নতুন আর একটা লরির আওয়াজ কানে আসার সময়টা ছাড়া। ধরে তুলবার ছলে মাতাল গোরাটার অভদ্র কুৎসিত স্পর্শটাই সর্বাঙ্গে ভয়ার্ত অস্বস্তিবোধের মতো রিরি করতে থাকে। একটা মুখ-ভাঙা বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে ওরা আবার মদ খেতে শুরু করেছে। লরির ধাক্কা লাগার সময় বোতলের মুখটা বোধ হয় ভেঙে গিয়েছিল।

পাকুনিয়ার মোড়ে বাস আসে। আরও দুজন গোরা উঠে আসে। দুজন চাষাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আগের তিনজনের পাশে বসে কিচির মিচির কথা শুরু করে দেয়—একজন হাতের বোতলটা দেখায় তিনজনকে। তিনজন ঘন ঘন তাকায় চাঁপার দিকে, নতুন দুজন মাঝে মাঝে এদিক ওদিকে চোখ ফেরানোর সময়টুকু ছাড়া চাঁপার গায়েই চোখ পেতে রাখে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন একতাড়া নোট বার করে চাঁপার দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসে। দামোদর আর মহেশ্বর কটকটিয়ে তাকায়। রসুল ভ্রূকুটি করে নুরে হাত বুলোয়। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুখ বার করে দেয় জানালা দিয়ে বাইরে। গাড়িসুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

রসুলের মুখের ভাবটা দেখবার এমন জোরালো ইচ্ছা দামোদরের জাগে ! তার কেবলই মনে হয়, তার এই অপমানে রসুলের মুখে নিশ্চয় শয়তানি পরিতৃপ্তির হাসি ফুটেছে। তাকাবে না ভেবেও কখন যে সে তাকিয়ে বসে নিজেই টের পায় না। রসুলের মুখে হাসি নেই কিন্তু তার দিকেই সে তাকিয়ে আছে অনুকম্পা মেশানো অবজ্ঞাভরা এমন এক মুখের ভাব নিয়ে যার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। চুপচাপ অপমান সহ্য করার জন্য রসুল তাকে মনে করছে অপদার্থ, অমরদ কেঁচো। কানের কাছে ঝাঁঝাঁ করতে থাকে দামোদরের। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

মনে মনে বলে, রও। টের পাবে। তোমায় যদি না আমি—কী করলে যে এ অপমানের প্রতিশোধ রসুল পাবে সে ভেবে পায় না।

চাঁপার দিকে গোরাটার নোটের তাড়া বাড়িয়ে ধরার সবটুকু দোষ গিয়ে পড়ে রসুলের ঘাড়ে।

রসুল ভাবে, গোরাটা যদি হাত দিত মাগিটার গায়ে ! কী খুশিই সে হত ! তাকে জব্দ করতে চালাকিবাজি খেলার মজাটা টের পেয়ে যেত ব্যাটারা। বলবে না ভেবেও আজিজের কানে কানে কখন যে সে কথাটা বলে ফেলে। আজিজ কনুই দিয়ে তার বুকে একটা খোঁচা মেরে হাসতে থাকে।

আধখানা চাঁদ আকাশে উঠেই ছিল। দিনের আলোটা ম্লান হতে হতে এক সময় আধো জ্যোৎস্না হয়ে যায়। শাপুরের নির্জন রাস্তার মাথায় বাসটা থামলে রসুলেরাই আগে নেমে যায়।

চাঁপা নামবার সময় একজন গোরা তার আঁচলটা চেপে ধরে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে চাঁপা হুড়মুড় করে বাস থেকে প্রায় নীচে গড়িয়ে পড়ে।

আরও একটু দাঁড়িয়ে বাস ছেড়ে দেয়। তখন সেই চলন্ত বাস থেকে টুপটাপ করে নেমে পড়ে পাঁচজন গোরা।

শাপুরের রাস্তা ধরে রসুলেরা তখন খানিকটা এগিয়ে গেছে। বড়ো রাস্তা থেকে শাপুর প্রায় আধক্রোশ তফাতে, আঁকাবাঁকা গাছপালা ঢাকা পথ। প্রথম বাঁকটা ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে রসুল দেখতে পায়, চাঁপারা জোরে জোরে পথ হাঁটতে শুরু করেছে, তাদের কয়েক হাত পিছনে আসছে গোরারা।

বাসের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। খেত মাঠ জলা জঙ্গলের মুখর স্তব্ধতা ঝমঝম করে চারিদিকে। তারই মধ্যে চাঁপার আর্তনাদ শুনে রসুল ও তার সঙ্গীরা থমকে দাঁড়ায়।

কী হয়েছে তাদের বলে দিতে হয় না। ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। দুটি মূর্তি ছুটে এসে তাদের পাশ কাটিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে যায় গ্রামের দিকে— গোঁসাই আর ভুবন ঘোষ।

হলধরও ছুটছিল, এদের দেখে সে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ভাই সর্বনাশ। ছুটে এসো।

অজিজ, বলে যা যা আচ্ছা হয়েছে।

তখন বোধ হয় সরল সহজ হলধরের খেয়াল হয়, ওরা কারা এবং এরা কারা। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ হাঁ হয়ে যায়। চাঁপার আর্ত চিৎকার শোনা যায় বেশি দূরে নয়।

হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, চল যাই।

অজিজ বলে, ওদের বন্দুক আছে।

লাঠির কাছে বন্দুক ? বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।

রাঘব মালাকর

[পুরাণে বলে একদা নররূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি...এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কী পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন... তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিয়ো—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনিটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন...]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ির চৌমাথা থেকে নামমাত্র পথটা মাঠ জলা বনবাদাড়ের ভিতর দিয়ে দুক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দুক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোনো পথিকের বিপদ ঘটেনি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের পোড়া মাদুলি আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচেনি। সাপটাপ হয়তো কামড়েছে দু-একজনকে ইতিমধ্যে, কুকুর হয়তো তেড়ে গেছে ঘেউঘেউ করে, গোরু শিঙ নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারও হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু-একটা রোমাঞ্চকর কাহিনি শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোনো প্রমাণ নেই। এ পথের আশেপাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারেকাছে কখনও করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্যন্ত ওদের নেই। ও রকম কিছু ঘটলে দায়ি হবে ওরাই। পুলিশও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্তীও নয়—দুপক্ষের শাসনে থেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়েগুলি, বাতিল হয়ে যাবে আশেপাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দুজন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ির পাঁচজন আর মালদিয়ার দুজন—পরে। দুদিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও তিনচারটে বস্তি-গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবি করলে সঙ্গে পৌঁছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ি বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দায়িক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায় ফুলবাড়ি-মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় দুজন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়ের রং ছাড়া দুজনের মধ্যে পার্থক্য

বেশি নেই—অর্থাৎ লম্বায় চওড়ায় দুজনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনও হয়নি। রাঘব মালাকরের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যালজেলে পুরানো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমাণসাইজ ঘরে-কাচা আধপুরানো মিলের ধুতি, গায়ে পুরানো ছিটের শার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়ো, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোটো হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনেরো বিশ বছরের বড়ো হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খান দশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশি ভারী। দু চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, আবার নামালি ? আজ তোর হয়েছে কি র‍্যা ?

ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ ? আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, বাপ্‌স ! কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু ! এত কাপড় জম্মে দেখিনি দোকান ছাড়া।

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, কাপড় ? কাপড় কী রে ব্যাটা ? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি ? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে ?

গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।

হ্যাঁ, কাপড় ! তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি মালদিয়া ! ব্যাটার বুদ্ধি কত !

রাঘবের হাসিটা বড়ো খারাপ লাগে গৌতমের।

সদরেই তো বেচছ বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এপথে মাল আনছ মাসে দুবার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ি নেমে মজুরি দিয়ে মাল নিয়ে দুকোশ হাঁটে ? পাঁচগড়ের পথে ছোকড়া বাবুরা পাহারা দেয়, তাই তো বিপদ।

কে বলেছে তোকে ? কার কাছে শুনলি ? সভয় গর্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

কে বলবে বাবু ? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি এমন মুখ্যু মোরা ?

গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে ? মোরা কারা ? রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু কজন, না আরও অনেকে ?

তোকে চার টাকা মজুরি দি রঘু।

আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।

তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে ? তোকে বিশ্বেস করলাম, তুই শেষে নেমকহারামি করলি রঘু ?

দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে অগুন্তি—দুমাস আগে পর্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রী-পুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, নেমকহারামি ঠাকুরবাবু ? বলছ নেমকহারামি ? হাটে সেদিন সভা করে স্বদেশিবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায় ? থানায় মোরা বলতে যাইনি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কী ?

নে নে, মোট তোল। গৌতম বলে খুশি হয়ে, চটিস কেন ? আট আনা বেশি পাবি আজ, যা।

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয়, গৌতমের সাহায্যে। গৌতম তাকে ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহুকাল ধরে : কী ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ আর কী ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজি গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কী করিছি, হায় কী করিছি !

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ি আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। খান ত্রিশেক ঘর আছে, আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্তু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে ক্ষান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে বসে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু !

সাত আট রশি দূরে খান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন, মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পত্তু গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নিচু জমিতে বছরে ছমাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লির ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনও সন্ধ্যা নামেনি। বাইরে সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে ! গৌতমও জানে। এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছমছম করে গৌতমের। এই জলাজঙ্গল, কুঁড়ে পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরানো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সদৃশ্যতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায় বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয় ! বলে, টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকি পথটা মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁচোঁ কচ্ছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ যাই চটপট। পৌঁছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি ! খেয়ে দেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।

কাপড় চাই ? আচ্ছা, আচ্ছা দেবখন তোকে একখানা—গৌতম ঢোক গেলে, একজোড়া কাপড়। নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু হাতে দু পা চেপে ধরে বলে, আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বউ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, হারামজাদা ! গাঁজাখোর ! বজ্জাত ! ওঠ বলছি ! মোট তোল ! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছমাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।

মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর ? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বউ ন্যাংটো—

ন্যাংটো তো ধরে ধরে...

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিত কথা বলা উচিত হয়নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বউকে এমন কদর্য গাল দেওয়া। দুটো মনরাখা কী কী কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ

কথাটা গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশি নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই জুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

কাপড় তবে রইল বাবুঠাকুর।

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পত্তুগাঁ যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পত্তুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

আর হয় না বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়গুনো, তা তো শুনলে না।

নে না কাপড়গুনো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।

আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দান দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় লুট হল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা ?

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব ? পুলিশ আসবে সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।

দটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সি লোক চোখ পাকিয়ে বলে, মোরা এর মধ্যি নাই, রাঘব।

রাঘব বলে, নাই তো দেঁড়িয়ে রইছ কেনে ? কাপড়ের ভাগ নিয়ো না, যাও গা।

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়োদের মজলিশ বসে, এবার কী করা উচিত আলোচনার জন্য। কী করা হবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে কদিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না। কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশিক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে, কার কী চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে ? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশি লোক নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না ?

কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।

রাঘবের গর্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশি। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্যন্ত। বুড়ি পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার দা-টা উঁচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কী হবে তোদের ? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি ? ছেড়ে দে আমায়।

বলরাম বলে, কী করে ছাড়ি ? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিশ আনবে বাবুঠাকুর।

গৌতম পইতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিশকে সে কিছু বলবে না।

এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর ?

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে গৌতম বলে, শোন বলি, পুলিশকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।

পার না ?

না। বললে আমারই জেল হবে। এ কাপড় চোরাবাজারের মাল, পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কী জবাব দেব বল ? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এ পথে মাল নিয়ে আসি, তোরাই বুঝে দ্যাখ। পুলিশ কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারও কাছে বলবার উপায় নেই আমার।

রাঘব বলে, তা বটে। এটা তো খেয়াল করিনি মোরা। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কী সায় দেয় মানুষের মন ! বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কী করতে পারবে বাবুঠাকুর ? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোনো ভয় নেই।

রাঘব বলে, তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিয়ো না।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় কবার ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনোমতে বলে, জল। জল দে একটু।

মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, দে।

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিশ আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরি করে আটঘাট বেঁধে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিশ আসত। নাথগঞ্জের গগন সার প্রকাশ্যে কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিন দিন আগের তারিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পত্তুগাঁয়ে লুটকরা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পত্তুগাঁয়ে গিয়ে পুলিশ দ্যাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও ঢের বেশি গুরুতর ও সঙ্গত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গতরাত্রে। খুন হয়েছে দুজন, আহত হয়েছে অনেকে। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

যাকে ঘুষ দিতে হয়

মোটর চলে, আস্তে। ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নিশপিশ করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ি জোরে চললে তার কোনো আপত্তি হয় না কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে—নিজেদের দামি মোটর চড়ে বেড়াবার অকথ্য আনন্দ রয়ে সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

এত বড়ো, এত দামি, এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে শহরের পিচঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরন হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরানো, সস্তা, বাজে মোটর গাড়ির চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রামবাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া ! যাতে গর্ব বেশি। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হত। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড়ো বেশি মনে হওয়ায় ট্রামবাসের বাদুড়ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার ! মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব ?

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশকরা গরিবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরি কিনা একশো টাকার ! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবে চিন্তে তাই সে বলে, আমি জান্তাম।

মাখনের মনে পড়ে সুশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, জানতে ?

জান্তাম বইকী ! বড়ো হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জান্তাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে ! টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জানো না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ জাগালাম—

সত্যি ! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।

সুশীলা তখন বলে, কিন্তু যাই বলো, দাসসাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।

মাখন হাসে, বলে, তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাসসাহেব ফাঁপত না। কী ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে !

কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে।

এমনি দিয়েছে ? অত ঘুষ কে দিত ?

গাড়ি চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আরেকখানা গাড়ি, দামি কিন্তু পুরানো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ি কাছে গেলে পাশাপাশি চলতে লাগল দাসসাহেবের গাড়িটা।

কোথায় চলেছেন ?

একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।

দাসসাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলাফিরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাসসাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামি মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল।

আপনার স্ত্রী ?

আজ্ঞে।

দাসসাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ির স্ত্রী বাড়িতেই থাকে।

সুশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। যে রকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে ! ওঁর কাছে আমাকে নেহাত কচিই দেখায়। দুটি গাড়িই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ির হর্ন শুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাসসাহেব নেমে এ গাড়িতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয়, এ গাড়ির পিছনে আসতে। দাসসাহেব ভেতরে ঢোকা মাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেল বেলাই সে মদ খেয়েছে।

আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেননি ?

এই যে দিচ্ছি। শুনছ, ইনি আমাদের মিঃ দাস।

পরনের বেনারসির রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো ! বউয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাসসাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ শুরু হয়েছিল মাখনের মনে অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে বিনা আহ্বানে কেউ এ ভাবে গাড়ি চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত যাদেব সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বারবার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতেও পারত না।

দাস বলে, চা খেয়েছেন ?

সুশীলা বলে, না।

আসুন না আমার ওখানে, চা-টা খাওয়া যাবে।

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।

মাখনের দু চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিশ্বাস আটকে যায়। আজ কদিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে ! দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘনঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের দহরম মহরম দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা এক রকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায় ! এই দরকারে তাকে দাস খুঁজছিল !

সম্ভ্রান্ত শহরতলিতে দাসের মস্ত বাড়ি। সামনে সম্ভ্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর-খানসামা নিয়ে এত বড়ো বাড়িতে দাস একা থাকে। বিয়ে করেনি, বউ নেই। আত্মীয়স্বজনদের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। শখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে দুচারদিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যেই আসুক সাহেব বাড়ি নেই বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে সুশীলা,

নিজেদের বাড়িতে এখানকার কোন বিশেষত্ব আমদানি করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। এ কথা হতে হতে আসে কনট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। মাখনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মশগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তারপর দাস বলে, হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করবেন না।

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, না, না।

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, সোয়া লক্ষের মতো হবে !

বেশিও হতে পারে।

ফেরবার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাড়ি যাব। গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

মাখনবাবু ?

আজ্ঞে ?

হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন। দাস নিশ্চিন্তভাবে বসে। আমরা ততক্ষণ গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না। দাস একটা সিগারেট ধরায়। সুশীলাকে বলে, উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন ?

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরই মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ !

তারপর মাখন বলে, তুমি চা-টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, দেরি কোরো না।

না, যাব আর আসব।

গাড়ি রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে জোরসে চালাও ! জোরসে !

কৃপাময় সামন্ত

রঘুনাথ বিশ্বাসের আমবাগানের পাশ দিয়ে আসার সময় কৃপাময় সামন্তের সামনে একটা সাপ পড়ল। সংকীর্ণ মেটে পথ, পাশের কচুবন থেকে লেজটুকু ছাড়া সবটাই প্রায় বেরিয়ে এসেছে সাপটার, হাত দুই সামনে। পথ পার হয়ে ডাইনে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে। বেশ বড়ো সাপ, কৃপাময়ের পদক্ষেপের স্পন্দন অনুভব করে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবে সেই পলকের মধ্যেই লাঠির ঘায়ে ওটাকে মেরে ফেলা যায়। লাঠি উঁচু করে কৃপাময় থেমে গেল। কেন, তা না জেনেই। নাতিকে মারবার জন্যে হাত তুলবার পর আপনা থেকে হাতটা যেমন তার শূন্যে আটকে যায়।

ভোরে সামনে দিয়ে, এত কাছ দিয়ে, সাপ চলে গেলে বোধ হয় কিছু হয়। মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। কৃপাময় ঠিক জানে না। চলতে আরম্ভ করে সে ভাবে, চুলোয় যাক। মঙ্গল অমঙ্গলের এ সব ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ যে পাঠায় সেও চুলোয় যাক। সাপটাকে না মারবার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপশোশ করতে থাকে।

বাগান পেরিয়ে পুবপাড়ার বাড়িগুলি, কয়েকটা কাছাকাছি কয়েকটা তফাতে তফাতে, এলোমেলোভাবে সাজানো। পাকা বাড়ি চোখে পড়ে মোটে একখানা। চারিদিকে বর্ষার পরিপুষ্ট জঙ্গল বাড়ির বেড়া ঘেঁষে, ঘরের ভিটা ছুঁয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পাকা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে ভূধর সরকার গুনে নিচ্ছিল মাচার লাউ।

ছেলের চিঠি পেয়েছ নাকি হে সামন্ত ?

রোজ সে এ প্রশ্ন করে। রোজ কৃপাময়ের পিত্তি জ্বলে যায়।

আজ্ঞে না। চিঠি পাইনি।

এত বিলম্ব করে কেন চিঠি দিতে ? চিঠিপত্তর লিখতে তো দেয় জেল থেকে। না স্বদেশি বলে কড়াক্কড়ি বেশি ?

কী জানি।

ভূধরের বুক লোমবহুল, ভুরু ঘন লোমের মোটা আঁটি। সহানুভূতির সকাতর ধীর উচ্চারণে সে বলে, দ্যাকো দিকি ব্যাপার। বলি, তুই এক ছেলে বাপের, তোর কি স্বদেশি করা পোষায় ? কেন রে বাপু, বিয়ে থা করেছিস, ছেলে হয়েছে একটা, কাঁচা বয়েস বউটার—আঁ, কী বললে ?

কৃপাময় কিছু বলেনি, ভূধরের নিজের মন কথা কয়েছে কৃপাময়ের হয়ে। এ সব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে। ভূধর বোধ করে অস্বস্তি আর অপমান। একটু ক্ষোভ জাগে, রাগ হয়। তার যে মনে পড়েছে তার ছেলে একটা নয়, জোয়ান-মদ্দ পাঁচ পাঁচটা ছেলে, এটা যেন কৃপাময়েরই ব্যঙ্গ করা তাকে। সে যাবে কৃপাময়ের একমাত্র ছেলের জেলে যাওয়া নিয়ে আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে আর তার মনে পড়বে তার পাঁচ ছেলের কথা ? এসব লোকের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। কতদিন সে ভেবেছে কৃপাময়ের সঙ্গে কথা বলার, গায়ে পড়ে যেচে কথা বলার স্বভাবটা ত্যাগ করবে, তবু যে কেন দেখা হলেই ওর সঙ্গে সে কথা কয় !

মামলাটার কী হল সরকারমশায় ?

এ প্রশ্ন তো করবেই কৃপাময়। বড়ো ছেলে তার ঘুষের মামলায় পড়েছে, এখন সে মামলার কথা না তুললে ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ হবে কেন। কড়া কথা ঠেলে আসে ভূধরের মুখে, বলতে ইচ্ছে হয়, তোমার বাহাদুরি রাখো সামন্ত—কিন্তু মুখে আটকে যায় কথাগুলি। কেন কে জানে !

চলছে। মামলা চলছে। সাজানো মামলা, ফেঁসে যাবে।

কৈফিয়তের মতো শোনায়, আবেদনের মতো। তার ছেলে লোক খারাপ নয়, মামলা সাজানো। কৃপাময় বিশ্বাস করুক, মামলা সাজানো। থুতু ফেলার বদলে ভূধর ঢোঁক গিলে ফেলে। নিমের দাঁতনের জন্যেই নিজের থুতুটা বড়ো তেতো লাগে সন্দেহ নেই।

ওরা খুব খুশি হয়েছে, না সামন্ত ? গাঁয়ের লোক ? খুব ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে ?

এ কথা ওকে আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম, ভূধর ভাবে। কৃপাময়ও তো গাঁয়ের লোক। ওরা খুশি হয়ে থাকলে কৃপাময়ও তো খুশি হয়েছে নিশ্চয়। এক মুহূর্তের জন্যে বড়ো অসহায়, বড়ো করুণ দৃষ্টিতে ভূধর তাকায় কৃপাময়ের দিকে, সে যেন সারা গাঁয়ে বিরোধী মতের, শত্রু ভাবের, ঘৃণা ও হিংসার প্রতিনিধি হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। কৃপাময় জবাব দেবার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধাতস্থ হয়। সে ভাবটা কেটে গেলে তখন তার মনে হয় ক্ষণিকের জন্যে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছে। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, পেট গরম হয়েছিল। কেন যে বাড়ির সবাই খাও খাও করে তাকে এত বেশি খাওয়ায় ! আজ সাবধানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। দাঁত মেজেই স্বর্ণসিন্দুর খাওয়া চাই।

বিরক্তি চেপে ভেবেচিন্তে কৃপাময় জবাব দেয়, ঢাক পিটে বেড়াবে কে ?

শুনে ভূধরের মনে হয়, কৃপাময় যেন বলতে চায়, তোমার ছেলের কীর্তির কথা ঢাক পিটে রটাবার দরকার হয় না, সবাই জানে। কী আস্পর্ধা লোকটার, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা কয়, এমন ভাসাভাসা উদাসীনভাবে, অবজ্ঞার সঙ্গে। আর নয়। আর একটি কথা সে বলবে না ওর সঙ্গে। নাই পেলে এরা বেড়ে যায়। কৃপাময়ের দিকে প্রায় পিছন ফিরে ভূধর এবার মাটিতে থুতু ফেলে।

কৃপাময় একটু ইতস্তত করে। তার কি উচিত লোকটাকে একটু সাবধান করা ? ফল হয়তো কিছুই হবে না, তবু বলতে বোধ হয় দোষ নেই। দালানের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে এক জোড়া বুভুক্ষু চোখ, ভূধরের সেজো ছেলে সুরেশ। তাকিয়ে সে আছে দালানের দক্ষিণে বাপের বাঁধানো পুকুরঘাটে, যেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোনো মতে, কিংবা শুধু খানিকটা লজ্জা ঢেকে এসেছে গাঁয়ের কজন মেয়ে, না এসে যাদের উপায় নেই, নিরুপায় হয়েও কদিন পরে হয়তো যারা আসতেই পারবে না।

একটা কথা আপনাকে বলি সরকারমশায়।

হুম। ভূধর ফিরেও তাকায় না।

আপনার ছেলেকে একটু সাবধান করে দেবেন, ঘোষপাড়ায় যেন না যায়। সবাই খেপে আছে ওরা, কী করে বসে ঠিক নেই। বউ-ঝি নিয়ে টানাটানি ওরা সইবে না, এবার পাড়ায় গেলে হয়তো—

কোন ছেলে ? আমার কোন ছেলে বউ-ঝি নিয়ে টানাটানি করে ? গর্জন করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কৃপাময়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাটে বউ-ঝিদের নাইতে ও জল নিতে এবং উপরের ধাপে বসে সুরেশকে সিগারেট ফুঁকতে দেখে ভূধর আবার নির্জীব হয়ে যায়।

আপনি যদি কথা দেন ছেলেকে সামলাবেন, আমি ওদের বলতে পারি। নয় তো আমি যদ্দুর জানি ছেলে আপনার খুন হয়ে যাবে।

ছেলেটা গোল্লায় গেছে, সামন্ত।

কৃপাময়ের হাতের চাপে নরম মাটিতে লাঠির ডগায় টোল পড়ে কয়েকটা। গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। খুন হয়ে ছেলেটার নরকে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপশোশ করে।

ওকে শহরে পাঠিয়ে দেব আজকালের মধ্যে মেজো ছেলের ওখানে।

সেই ভালো।

পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশ ! যেন, মহাজন, যেন গুরুঠাকুর, যেন মাস্টার ! ভয় দেখাচ্ছে, যেন পুলিশের দারোগা !

কৃপাময়কে সে কি ভয় করে ? কোনো কারণ তো নেই ওকে তার ভয় করার ! তার সম্পদ আছে, লোকজন আছে—কৃপাময় গরিব একা। ছেলের বউ আর ছেলেমানুষ নাতিটা ছাড়া ওর কেউ নেই। ওর অর্ধেক জমি তার কাছে বাঁধা। ইচ্ছা করলে ওকে সে—

চললে নাকি সামন্ত ? একটা লাউ চেয়েছিলে, নেবে তো নিয়েই যাও আজ।

আজ্ঞে ঠিক চাইনি, তবে দ্যান যদি—

দশজনকে দিয়েই তো খাব হে। নইলে এত লাউ দিয়ে করব কী ? ওটা নাও, বড়োও হবে, কচিও আছে।

প্রথম সোনালি রোদ এসে পড়েছে মাটির পথে, মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। বর্ষায় পরিপুষ্ট সবুজ গ্রাম। শ্যাম মাইতি আর গোকুল দাসের পোড়া বাড়ির কালো কাঠ-বাঁশ-ছাই আজও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, বর্ষাও ধুয়ে নিয়ে যায়নি, নতুন কুটিরও ওঠেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা, ফিরে এসে নিশ্চয় আবার ঘর তুলবে।

কৃপাময়ের বাড়ির কাছাকাছি সোনা জেলের বউ কাতু এইটুকু মোটা কাপড়ে তার যৌবন-উথলানো তাজা দেহটা কতটা ঢাকল কেয়ার না করে মাথায় মাছের চুপড়ি বসিয়ে তার নিজস্ব কোমরদোলানো ছন্দে হনহন করে চলে, কৃপাময়কে পেরিয়ে গিয়ে থামে। ফিরে এসে আবার তার নাগাল ধরে।

বলে, খাসা লাউটি বাঃ। কত নিলে গা ?

সরকারমশায় দিলেন, কাতু।

ওমা, হাঁ নাকি ? দুটি চিংড়ি দি তবে তোমাকে।

চুপড়ি নামিয়ে একটা কচু পাতা ছিঁড়ে কাতু এক খাবলা চিংড়ি তুলে দেয়।

কৃপাময় বলে, পয়সা নেই কাতু।

কাতু বলে, পয়সা কীসের ? তুমি মোর বাপ। তোমার ছেলে মোকে বাঁচালে মিলিটাবি থেকে। তোমায় দুটি চিংড়ি দিয়ে পয়সা নোব ? ধম্মে সইবে মোর ?

কাতু আরও কিছু চিংড়ি কচুপাতায় তুলে দেয়।

ছেলে ছাড়া পাবে কবে গো সামন্তমশাই ?

কতবার শুধোবি কাতু ? দেরি আছে, এখনও দেরি আছে।

মোকে বলবে, ছেলে কবে আসবে মোকে বলবে। ছেলেকে তোমার বুই খাওয়াব; পাকা বুই, গোটা বুই আদমুনি। তোমার ছেলে যদি না মোকে বাঁচাত গো সামন্তমশাই—

কাতুর ওথলানো যৌবনের অশ্লীলতা পর্যন্ত যেন ঢেকে যায় তার চোখ-ছলছলানো মুখের মেঘে। এতক্ষণে কৃপাময় একদণ্ড তার দিকে তাকাতে পারে !

আয় তো কাতু, খানিকটা লাউ কেটে দি তোকে। দুটি প্রাণী, এ লাউয়ের আধখানাও খেতে পারব না।

লাউয়ের ফালি নিয়ে চলে গেলে কৃপাময় বলে ছেলের বউকে, লাউ চিংড়ি তো রাঁধবে বাছা, তেল কি আছে ?

আছে একটুখানি, বলে কৃপাময়ের ছেলের ছেঁড়া সেলাই-করা গেঞ্জি গায়ে আর কোমরে ভাঁজ খোলা কাঁথার লুঙ্গি-জড়ানো বউ।

তাই রাঁধো গে তবে।

বউ নড়ে না। চোখ তুলে একবার চায়, চোখ নামিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কৃপাময়ের সামনে, গেঞ্জিপরা লুঙ্গি জড়ানো রোগা প্রতিমার মতো। জলভরা চোখ দেখে কৃপাময়কে একটু ভাবতে হয়। লাউচিংড়ি রাঁধতে বলায় তার ছেলের বউয়ের চোখে জল আসে কেন ? তার ছেলের কথা ভেবে ? ছেলে তার বিশেষ করে লাউচিংড়ি খেতে ভালোবাসত বলে তো মনে পড়ে না। তাছাড়া তার সামনে এ ভাবে দাঁড়িয়ে তার ছেলের কথা ভেবে বউ চোখে জল আনত না, আড়ালে যেত।

শেষে বুঝতে পেরে কৃপাময় বলে, চাল বাড়ন্ত বুঝি মা ? তাই তো !

নেড়ী

দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটটা লাগল তারার মাথায়। তারার ছিল চুলের বাহার, মাথা ভরা চিকন কালো একরাশি চুল। মাঝে মাঝে কোনো কোনো মেয়ের এ রকম হয়—চাষাভুসোর ঘরেও। গোড়ায় তেল জুটত, বাপের বাড়িতে থাকবার সময় আর শ্বশুরবাড়ি এসে কয়েক বছর, ছেলেমেয়েগুলি জন্মাবার আগে পর্যন্ত। তারপর তেলের অভাবে চুল আবার রুক্ষ হয়ে গেছে। ফুলে ফেঁপে থাকে, ঝাঁকড়া জঙ্গলের মতো দেখায়। চুল বড়ো বেড়ে গেছে মনে হয়। সার না দিলে গগন মাইতির খেতে ভালো ফসল হয় না, দশটি ছেলেমেয়ে বিয়োবার পরেও তারার মাথায় অযত্নে চুলের ফসল ফলে থাকে অদ্ভুত, সামলাতে তার প্রাণান্ত।

তারপর এল প্রাণান্তকর অভাবের দিন। ছারেখারে যাবার দিন। দু দিনে দু ফোঁটা তেল যা জুটত তারার মাথায় দেবার, তাও গেল বন্ধ হয়ে। মাথায় জট বাঁধে, হুহু করে উকুনের বংশ বাড়ে আর পাগলের মতো মাথা চুলকে চুল ছিঁড়ে তারা বকতে থাকে, মলাম রে বাবা, মলাম। মার ভূতো, কাটারি দিয়ে কোপ মার দিকি একটা, চুকেবুকে যাক।

ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষুধার্ত গগন বিবর্ণমুখে পরামর্শ করতে আসে, বাঁচন-মরণের কথাতেও তারা মন দিতে পারে না। দু দণ্ডের বেশি স্থির হয়ে বসতে পারলে তো স্থির করতে পারবে মন ! কাতরভাবে সে তাই বলে, কী জানি বাবা, যা যুক্তি কর। চাল বাড়ন্ত ঘরে, বুঝেসুঝে যা যুক্তি কর। দাও, বেচেই দাও। পেটের জ্বালায় বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি কাঁদে, তারা তাদের থাপড়ে দেয়। কান্না ভেসে আসে শূন্যে এদিক ওদিক থেকে, আতঙ্কে বুকটা মুচড়ে যায় তারার, একটু সময় নড়নচড়ন বন্ধ করে নিথর হয়ে বসে থাকে। তারপর আবার হাত উঠে যায় মাথায়, জট ছাড়াতে, চুলকোতে আর উকুন মারতে ! চুলের অরণ্য থেকে উকুন খুঁজে এনে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে পুট করে মারবার মুহূর্তটিতে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় তারার কাছে। শরীর বেশ খানিকটা শুকিয়েছে, নোলায় জল কম। তবু জিভে দিব্যি আওয়াজ হয় উস্‌স্—উকুন মারাব পুট শব্দের সঙ্গে।

প্রথম মড়া কান্নাটা কিন্তু তার বড়োই জমজমাট হল এই চুলের জন্য। পাঁচনিখে থেকে মেয়ে মনা এল বিধবা হয়ে, ছেলে হারিয়ে কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। তার স্বামী মরবার পর শাশুড়ি আর এক ছেলেকে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তারা চুল ছিঁড়তে লাগল এলোপাথাড়ি চুলেরই যন্ত্রণায়, কিন্তু তার শোকের প্রচণ্ডতা দেখে সবাই হয়ে গেল হতভম্ব। এমন শোকার্ত হবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল খানিকটা, দেহে শক্তিও ছিল না অতখানি।

তারার কোলের ছেলেটাও ছোটো। মনা তার মেয়েটাকে মার কোলে তুলে দিয়ে বলে, একটু মাই দে মা ওকে। মোর দুধ শুকিয়ে গেছে। তারার যেন বাকি আছে বুকের দুধ শুকিয়ে যেতে ! চালের হাঁড়ি ঝেড়ে সে একটু ধুলো-মেশানো গুঁড়ো বার করে, তাই ফুটিয়ে খাইয়ে দেয় নাতনিকে, শুকনো পাতার আগুন জ্বেলে।

তিনদিন পরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের জন্য তারার কান্নাটা হয় অনেক নিস্তেজ। ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছিল। ওষুধের অভাবে যে তারা মরল ঠিক তা নয়, আসলে মরল খেতে না পেয়ে রোগটাকে উপলক্ষ করে। থেমে থেমে তারা সুর করে কাঁদল সারাদিন।

আধপোড়া ভাইবোন দুটিকে খালে ভাসিয়ে দেবার পর সকলের সঙ্গে ভূতো বাড়ি ফিরছে। হৃদয় পণ্ডিতের বাড়ির সামনাসামনি সে পেছিয়ে পড়ল। সকলের খানিক পরেই সেও বাড়ি ফিরল, এইটুকু একটা মরা ছাগল ছানাকে গামছায় জড়িয়ে। ছানাটা গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার হৃদয় পণ্ডিতের ছাগলের। স্কুল উঠে যাওয়ায় হৃদয় এখন জোতদার পূর্ণ ঘোষালের ধানের হিসেব লিখছে।

ছাগল ছানার মাংসটা মনাই রেঁধে দিল নুন হলুদ দিয়ে, বিনা তেলে। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে হবিষ্যিও জুটছিল না বলে ও সব রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে রাঁধতে রাঁধতেই মনা খানিকটা কচি মাংস খেয়ে নিল। এই নিয়ে হাতাহাতি কামড়াকামড়িও হয়ে গেল ভূতোর সঙ্গে তার। আঠারো বছরের মনা আর বিশ বছরের ভূতোর মধ্যে।

পরদিন এল হৃদয় পণ্ডিত। সদর দাওয়ায় শুয়ে ছাগল তার মাই দেয় ছানাকটাকে, আর গলা টিপে ভূতো কিনা চুরি করে আনে সেই ছানা !

দাম দে ভালো চাস তো গগন। ছেলেকে তোর পুলিশে দেব নইলে।

দাম কোথা পাব পণ্ডিতমশাই ?

মনাকে দেখে হৃদয় পণ্ডিত যেন একটু আশ্চর্য হয়েই বলল, তুই কবে এলি রে মনা ? স্বামী মরল কবে ? ছমাস পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে থেকে হৃদয় পণ্ডিতের চেহারা, তাকানি, কথার ভঙ্গি সব অদ্ভুত রকম বদলে গেছে ; স্কুলটা না উঠে গেলে কী হত বলা যায় না। চিরকাল যে মহান দারিদ্র্যের আদর্শের শোষণে থেঁতো এবং ভোঁতা হয়ে নির্বিরোধ ভালো মানুষ সেজে ছিল, তাই হয়তো সে থাকত শেষ পর্যন্ত। পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে মিশে ঝড়তি পড়তি উপায়ে টাকা কুড়োতে শিখে হঠাৎ সে মানুষ হয়ে উঠল 'ভালো'টুকুর খোলস ছেড়ে।

ছাগল ছানার জন্য আর বেশি হাঙ্গামা সে করল না। ধমক দিয়ে আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করেই ক্ষান্ত হল। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে জেঁকে বসল গগনের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে। ভিটে ছাড়া কিছুই আর নেই গগনের।

বাঁধা রাখ। রেখে চলে যা বাপ বেটা রোজগার করতে। দুটো জোয়ান মানুষ ঘরে বসে না খেয়ে মরছিস, লজ্জা করে না ?

যাবার আগে হৃদয় পণ্ডিত মনাকে বলে গেল, তুইও দেখছি চুল পেয়েছিস মায়ের মতো।

মনা বলল, উঠেই গেল সব চুল।

অনেকে গিয়েছে গাঁ ছেড়ে, অনেকে যাই যাই করছে, কেউ আপনজনদের ফেলে একা, কেউ সপরিবারে। ফিরেও এসেছে দু একজন—আপনজনদের খুইয়ে। এদের কাছে শোনা গেছে, যাবার ঠাঁই নেই কোথাও। যেখানে যাও সেখানেই এই একই অবস্থা।

দিনভর পরামর্শ চলল। ভিটে বেচবে না বাঁধা দেবে, গগন আর ভূতো দুই জনেই যাবে না একজন যাবে, অথবা বাড়িসুদ্ধ যাবে সকলেই। এবং গেলে কোথায় যাবে।

উকুনের কামড় তারা আর তেমন অনুভব করে না, বোধশক্তি আরও ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় কোনো পরামর্শই সে দিতে পারে না।

ভূতোকে আর দেখতে পাওয়া যায় না পরদিন। হৃদয় পণ্ডিতের কাছে পথের সন্ধান পেয়ে সে একাই সরে পড়েছে।

গগন বলে, একা তোমাদের নিয়ে যাই কোথা ? নিজে গিয়ে দেখি যদি কিছু হয়।

বাড়ি বাঁধা রেখে পনেরো বিশদিনের খোরাক দিয়ে গগন চলে যায়। ফিরে না আসুক পনেরো বিশদিনের মধ্যে খবর একটা পাঠাবে আর রোজগারের কিছু অংশ।

দুটি দুটি খেতে পেয়ে তারার আবার চুলের যন্ত্রণা অনুভবের শক্তি বেড়ে যায়। তার ভরা বাড়ি কীরকম খালি হয়ে গেছে আবার বুঝতে পেরে মাঝখানের নিঝুম দিনগুলির পর আবার বিনিয়ে

বিনিয়ে কাঁদতে থাকে, মনাও গলা মেলায় মার সঙ্গে। মনার মাথাতেও জট বেঁধে উকুন হয়েছে। মা ও মেয়ে বসে কাঁদে আর পরস্পরের মাথার জট ছাড়িয়ে উকুন বাছে।

খোরাক ফুরিয়ে যায়। সময় কাটে একটা মাস। গগনের কোনো সংবাদ মেলে না। শোক দুঃখ ও দৈহিক যন্ত্রণাবোধ আবার ঝিমিয়ে আসে দুজনের। মনার মেয়েটা মরে যায় দুধের অভাবে, কাঁড়া-চাল খাওয়া পেটের অসুখে। তারার কোলের ছেলেটাও মরে একই ভাবে। তারপর একে একে, এবেলা একজন আর ওবেলা একজন করে, আরও একটা ছেলে ও মেয়ে মারা যায় তারার। থাকে দুটি—মরো-মরো অবস্থায়। দশটির মধ্যে তারার চারটি সন্তান মরেছিল—এ দেশে ও রকম মরতে হয় খুব স্বাভাবিক নিয়মে—আর চারটি মরে দুর্ভিক্ষে।

হৃদয় পণ্ডিত আসে যায়, পরামর্শ দেয়, উপকার করতে চায় কিন্তু চাল দেয় না। পেটে জ্বালা না থাকলে মানুষ কথা শুনবে কেন ! বলে, চাল পাব কোথায়, চাল ? যা বলি শোন। সদরে চলো তোমরা ; খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দেব। গগন যদি ফিরে আসে, তোমরাও ফিরে আসবে।

তারা বলে, আপনি বাপ, যা ভালো বোঝেন করেন।

দু জনে রাজি হলে হৃদয় মনে মনে একটু হিসেব কষে দেখে। মনেও আসে চেষ্টাং কৃতের সংস্কৃত শ্লোকটা। তাই মনাকে আড়ালে বলে, যা করছি সব তোরই ভালোর জন্যে মনা। কিন্তু চারজনের ব্যবস্থা কি করতে পারব ? খটকা লাগছে। মা না গেলে তুই যদি না যাস—গেলে কিন্তু সুখে থাকতিস। মাছ দুধ খাবি, শাড়ি গয়না পাবি—

বলেছি যাব না ?

বলিসনি ? বলিসনি তো ? বেশ বেশ।

তারার অজান্তেই মনাকে শাড়ি গয়না পরিয়ে মাছ দুধ খাইয়ে সুখে রাখবার জন্য শহরে পাঠিয়ে নিজের মাছ দুধ খাবার আর স্ত্রীকে শাড়ি গয়না দেবার ব্যবস্থাটা হৃদয় পণ্ডিত করতে পারল।

মাঝরাত থেকে শুরু করে পরের সমস্ত দিনটা মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে দুই ছেলেকে নিয়ে তারা গেল হৃদয় পণ্ডিতের বাড়ি।

মেয়েটা পালিয়েছে পণ্ডিতমশায়।

তাই নাকি ? সত্যি ? ছিছি।

মোকে দিন পাঠায়ে সদরে। কী হবে আর ঘর আগলে থেকে ?

খানিক চুপ করে থেকে হৃদয়পণ্ডিত বলে, ওতে একটু গোলমাল হয়েছে ভূতোর মা। যেখানে পাঠাব বলেছিলাম না, সেখানে আর লোক নেবে না খবর পেয়েছি।

দুই ছেলেকে আগলে তারা ঠায় বসে থাকে দাওয়ায়। মাথায় তার কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় অজস্র উকুন। সাঁঝ বরণের অন্ধকার চাঁদ উঠে আসায় ফিকে হয়ে আসে। তারা বুঝতে পারে, তার ছেলে দুটো হৃদয় পণ্ডিতের দাওয়ার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের সেইখানে রেখে তারা চুপিচুপি রাস্তায় নেমে যায়। হাঁটতে আরম্ভ করে সদরের দিকে।

তারপর অনেক কাণ্ড ঘটে তারার জীবনে। মাসখানেক পরে এক হাসপাতালে আয়নায় নিজের মুখ দেখে তারা প্রশ্ন করে, ও কে গো ?

দেখো তো চিনতে পার কিনা। ও হল সাতাইখুনির গগনের বউ তারার মুখ।

তারা হেসেই বাঁচে না।—দূর ! তারার মাথা ন্যাড়া হবে কেন গো ? কত চুল তারার মাথায় !

সামঞ্জস্য

ভিতরে এবং বাইরে শান্ত গম্ভীর হয়ে প্রমথ সেদিন বাড়ি ফেরে। অনেকদিন পরে আজ গভীর শান্তি অনুভব করেছে, পরম মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ভেবেচিন্তে মন স্থির করে ফেলবার পরেই এ রকম আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে গেছে মনটা।

সারাদিন আপিসে সে আজ কোনো কাজ করেনি, করতে পারেনি। জরুরি কাজ ছিল অনেক। অন্যদিন আপিসে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভেতরের বিপর্যয়ের হাত থেকে সে খানিকটা মুক্তি পেয়েছে, কাজ যত হয়েছে দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে সে ভুলতে পেরেছে তত বেশি গভীরভাবে। কর্তব্য পালনের তাগিদ তার মধ্যে চিরদিনই খুব জোরালো, অভ্যাস পুরানো।

কিন্তু কাজও সব সময় ভালো লাগেনি। হঠাৎ মাঝে মাঝে কাজের প্রবল উৎসাহ কীভাবে যেন মাঝপথে জুড়িয়ে গিয়ে ঘনিয়ে এসেছে গভীর বিষাদ ও অবসাদ। এমনও মনে হয়েছে, এ ভাবে আর বাঁচা যায় না।

মনে পড়েছে গীতাকে। গীতার সঙ্গে জীবনযাপনের সমগ্র অর্থহীনতাকে।

চার বছরের সংঘাত, বিরক্তি, গ্লানিবোধ আর হতাশার কবল থেকে রেহাই পাবার চরম ব্যবস্থা সে ঠিক করে ফেলেছে। গীতার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আর সংকীর্ণ, স্বার্থপ্রধান, আদর্শচ্যুত শ্রীহীন জীবনযাপন করতে হবে না। অতি বড়ো, অতি পালনীয় কর্তব্য পালনের গৌরবও সে অর্জন করবে, আত্মবিরোধী জীবনযাপন থেকেও রেহাই পাবে। শুধু কাপড়-গয়না, ভালো খাওয়া, আড্ডা-সিনেমা নিয়ে আর বিরামহীন আবদার, মতান্তর, অভিমান, নাকি কান্না সয়ে অতিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে না। দু-চারদিনের মধ্যেই শুরু হবে আন্দোলন। আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে জেলে যাবে—গীতার নাগালের বাইরে।

গীতার হয়তো শিক্ষা হবে ভালোরকম। চাকরির মায়া না করে, ঘরসংসারের কথা না ভেবে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশের জন্য স্বামী তার জেলে যেতে পারে, এর আঘাত হয়তো তাকে একেবারে বদলে দিতে পারে। তার জেলে থাকার সুদীর্ঘ সময়টা এ বিষয়ে চিন্তা করে করে হয়তো সে বুঝতে শিখবে জীবনের গুরুত্ব কতখানি। হালকা স্বার্থপর অর্থহীন জীবনের ওপর হয়তো তার স্থায়ী বিতৃষ্ণা এসে যাবে। জেল থেকে বেরিয়ে হয়তো সে সুখী হতে পারবে গীতাকে নিয়ে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আসবে। দেশ ও সমাজের কথা একটু ভাবে, পদে পদে বিরোধিতা করার বদলে কিছু কিছু কাজ আর ত্যাগ স্বীকার করে হাসি মুখে।

পথের মানুষকে আজ তার সুখী মনে হয়। তার মতো ওদের কারও জীবনেও বিরামহীন প্রতিকারহীন সংঘর্ষ স্থায়ী রোগযন্ত্রণার মতো একটানা অশান্তি এনে দিয়েছে কিনা—প্রতিদিনের এই প্রশ্ন আজ যেন মন থেকে মুছে গিয়েছে।

একটা কথা অবশ্য প্রমথ জানে। নিজের কাছে এ বিষয়ে তার ফাঁকিবাজি নেই। দেহমন তার এমনভাবে হালকা হয়ে যাবার কারণ অন্য কিছুই নয়, গীতার হাত থেকে মুক্তি পাবার কল্পনাই তাকে এ ভাবে ভয়মুক্ত করে দিয়েছে। এ কথাটাকে সে আমল দেয় না, এ নিয়ে ভাবে না। মুক্তিলাভের এ পথ বেছে নেবার আরেকটা দিকও তো আছে। যত অসহ্যই হোক গীতাকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে রেহাই পাবার যত সহজ, সাধারণ, হীনপথই খোলা থাক, ও ভাবে সে মুক্তি পাবারও চেষ্টা করেনি, অবস্থার প্রতিকারের অন্যায় ব্যবস্থাও করেনি। স্বামী ও প্রেমিকের কর্তব্য সে পালন করে

গেছে বরাবর। গীতাকে ভালো করে জেনেশুনেও ওকে ভালোবেসে বিয়ে করার ভুলটা তার, সে ভুলের জন্য গীতাকে শাস্তি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়োবার মতো অন্যায় সে কোনোদিন করেনি। এ উপায়ের কথা না ভাবলে, এ সুযোগ না পেলে, চিরদিন সে এই আত্মবিরোধভরা বন্দীর জীবনটাই যাপন করত ! এ গৌরব সে দাবি করতে পারে।

বাড়িতে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল ছোটোভাই সুমথের কচি ছেলেটা, বারান্দায় এই অবেলায় ঘুমিয়েছে। বিয়ের দু বছরের মধ্যে একটি ছেলে হয়েছে সুমথের, চারবছরের বেশি হয়ে গেল গীতাকে সে একটি সন্তানের মা হতে রাজি করাতে পারল না ! মনে মনে সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে যায় প্রমথের।

গীতা বাড়ি ছিল না। নতুন কিছু নয়, আপিস থেকে বাড়ি ফিরে গীতার সঙ্গে তার কদাচিৎ দেখা হয়। জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করার পর সুমথের স্ত্রী তাকে চা জলখাবার দেয়, তার গম্ভীর মুখ দেখে মমতা অনুভব করে। এক সময় সুমথকে সে বলে, দাদার মুখ বড়ো ভার দেখলাম।

সুমথ গম্ভীরভাবে মাথা হেলায়।—যা অশান্তি। দাদা বলে সহ্য করে, আমি হলে—

কী করতে ?

দূর করে তাড়িয়ে দিতাম।

পারতে না। তুমিও তো দাদার ভাই।

সুমথ মুখে একটু হাসে, মনে কথাটা মানে না। সে যে দাদার ভাই এ যুক্তিটাতে নয়, সে হলেও গীতাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারত না, স্ত্রীর এই ঘোষণাকে।

রাত প্রায় আটটার সময় গীতা ফিরে আসে। খুব জমকালো একখানা শাড়ি সে পরেছে, মুখে-চোখে আর চলনে তার উপচে পড়ছে খুশির ভাব।

কোথায় গিয়েছিলাম জানো ? বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এসে প্রমথের মুখ দেখে সে মুখ বাঁকায়।—হুঁ, রাগ করেছ তো !

না, রাগ করিনি। একটা কথা ভাবছিলাম। তোমার ওপর আর কোনোদিন রাগ করব না।

তার মানে ?

কাপড় বদলে শান্ত হয়ে বোসো, বলছি।

ও বাবা ! তবে তো গুরুতর কথা !

কিন্তু তার না-বলা কথাকে বিশেষ গুরুত্ব যে সে দেয়নি প্রমথ তা বুঝতে পারে। গীতা সম্ভবত ধরে নিয়েছে, সে কিছু উপদেশ ঝাড়বে, কোনো কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। গীতার ফিরে আসতে আধঘণ্টা সময় লাগায় এই অনুমানটাই সত্য মনে হয়। নতুন কিছু তার বলবার আছে মনে করলে এতক্ষণ কৌতূহল দমন করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে গীতাকে বদলে ফেলার চেষ্টার মধ্যে যে বোকামি ছিল আজ প্রমথের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কতখানি হতাশ আর নিরুপায় বোধ থেকে গীতাকে ও ভাবে সংশোধন করার উপায়টা সে অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরেছিল ভাবতে গিয়ে আসন্ন মুক্তির রূপটাই তার কাছে আরও বিরাট হয়ে ওঠে।

আবার তার কথা শুনে গীতা কেমন চমকে যাবে ভেবেও প্রমথ বেশ আমোদ অনুভব করে।

গীতা ফিরে এসে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে টেবিল থেকে রঙিন মলাটের একটি বই তুলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। প্রমথ যে তাকে বিশেষ কিছু বলবে বলেছিল সে তা একেবারে ভুলে গিয়েছে মনে হয়। তাকে ডাকতে গিয়ে প্রমথ চুপ করে যায়। মিনিট পনেরো সে চুপ করে বসে ভাবে। তারপর শান্তভাবেই শোবার ঘরে যায়:

তোমায় যা বলছিলাম।

গীতা তার বিছানায় শুয়ে পড়ছিল। বই নামিয়ে হাই তুলে উদাসভাবে বলে, কী বলছিলে ?

প্রমথ কাছে গিয়ে বিছানাতেই বসে। গুছিয়েই সে সব কথা বলে, স্পষ্ট জোরালো ভাষায়। কিন্তু গীতার বিশেষ চমক লেগেছে মনে হয় না। কথাটাকে সে তেমন গুরুতর মনে করেছে কীনা সে বিষয়েও প্রমথের সন্দেহ জাগে।

এই বুঝি তুমি রাগ করনি ?

রাগের কথা কী হল ?

আমার জন্যে জেলে যাবে বলছ, অথচ তুমি রাগ করনি। কবে ধমকে মেরে বলবে তোমার রাগ হয়নি।

তোমার জন্যে জেলে যাচ্ছি না গীতৃ।

তবে কী জন্যে ? স্বদেশি করে জেলে যাবার জন্যে বুঝি তিনশো টাকার চাকরি নিয়েছিলে, বিয়ে করেছিলে ? জেলে যাব না ছাই, এমনি করে তুমি আমায় বলতে চাও, আমায় নিয়ে কি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। গীতার চোখ ছলছল করে, কী দোষ করেছি বলো, মাপ চাইছি। অমন কর কেন ?

প্রমথ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একি অভিনয়, না ন্যাকামি ? ন্যাকামি হওয়াই সম্ভব। ওর স্বভাবটাই এ রকম বিকারগ্রস্ত।

তোমায় বলে কী হবে ? তুমি বুঝবে না।

বুঝব না ? আমি অবুঝ ? বোকা ? না বজ্জাত ?

প্রমথ আর কথা বলে না। শান্ত নির্বিকার হয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তাতে গীতার রাগ যায় আরও বেড়ে। একতরফা কিছুক্ষণ ঝগড়া চালিয়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করে। প্রমথ তখনও বসে থাকে পাথরের মূর্তির মতো, তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

সাতদিন পরে প্রমথ গ্রেপ্তার হয় আরও অনেকের সঙ্গে। বিচারে তার জেল হয় তিন বছরের।

জেলে প্রমথের দিন কাটে একে একে। বুড়ি মা, সুমথ ও অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুরা চিঠি লেখে, মাঝে মাঝে দেখাও করতে আসে। গীতা চিঠিও লেখে না, দেখাও করতে আসে না। বিচারের সময় সে কোর্টে আসত, আহত বিস্ময় আর তীব্র অভিযোগ ভরা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। সুমথের কাছে সে খবর পায় যে বিচার শেষ হবার পরেই গীতা ঢাকায় তার বাবার কাছে চলে গিয়েছে। এটা প্রমথ বুঝতে পারে। কিন্তু দেখা করতে আসে না কেন একটিবার ? চিঠি লেখে না কেন ?

রাগ হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু এমন রাগ হবার মতোই কি বিকৃত তার মন যে রাগ কিছুতেই কমে না, অন্তত চিঠির জবাবে দু লাইন একটি চিঠি লেখার মতো ?

প্রমথ ক্ষুব্ধ হয়, মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। এই যদি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে গীতার মধ্যে তার কারাবরণ করার, ওর হৃদয়-মনের কী পরিবর্তন সে আশা করতে পারে !

কিন্তু যাই হোক, মুক্তি সে পেয়েছে। আত্মবিরোধী জীবনের তার অবসান হয়েছে চিরদিনের জন্য। বাকি জীবনটা শান্তিতে হোক অশান্তিতে হোক, সুখে হোক দুঃখে হোক, নিজের মতিগতি আর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাটিয়ে দিতে পারবে।

জেলে যখন তার দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে হঠাৎ গীতার কাছ থেকে সে অদ্ভুত চিঠি পেল। চিঠিখানা খুব সংক্ষিপ্ত।

গীতা লিখেছে : এতদিন ভেবে ভেবে সে বুঝতে পেরেছে প্রমথ আর তার মধ্যে মনের মিল না থাকলে জীবনে তারা সুখী হতে পারবে না। তাই, নিজেকে গড়ে পিটে প্রমথের উপযুক্ত করে তুলবার জন্য কিছুদিন সে এক শিক্ষাসদনে গিয়ে থাকবে স্থির করেছে। সে যেন কিছু না ভাবে। যথাসময়ে দেখা হবে !

বারবার প্রমথ চিঠিখানা পড়ে, তার ধাঁধা ঘুচতে চায় না। শিক্ষাসদন ? এমন শিক্ষাসদন কোথায় আছে যেখানে স্ত্রীদের গড়েপিটে স্বামীর উপযুক্ত করে তুলবার ব্যবস্থা আছে ? সাধন-ভজন জপতপ করে নিজেকে শোধরাবার জন্য কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাবার বুদ্ধি করেনি তো গীতা ? অথবা মাথাটা তার খারাপ হয়ে গেছে একেবারে, পাগলামির ঝোঁকে একখানা চিঠি লিখে ফেলেছে আবোল-তাবোল। নিজের দোষ যদি বুঝে থাকে গীতা, তাই যথেষ্ট ছিল। আদর্শহীন জীবনের ব্যর্থতা টের পেলে, দায়িত্ববোধ জন্মালে প্রমথ নিজেই তাকে সহজ সাধারণভাবে শুধরে নিত।

মনের মধ্যে নানা ভাবনা পাক খায়, কিন্তু নতুন একটা আনন্দ ও উৎসাহও প্রমথ অনুভব করে। তার আশা তবে একেবারে ব্যর্থ হয়নি। গীতা অন্তত এটুকু ভাবতে শিখেছে যে মনের মিল না হলে তারা সুখী হতে পারবে না !

গীতা কোনো ঠিকানা দেয়নি। প্রমথ ঢাকায় তার বাবার ঠিকানায় জবাব দেয়। লেখে যে গীতা যেন মনে না করে সে তাকে একেবারে তারই মনের মতো ছাঁচে ঢালতে চায়। গীতার ওপর কোনোদিন সে জোর খাটায়নি, কোনোদিন খাটাবার ইচ্ছেও রাখে না। তাদের বিরোধিতার অবসান হলেই তারা সুখী হতে পারবে ইত্যাদি অনেক কথা।

একেবারে শেষে সে লেখে : শিক্ষায়তনের নামটা কী, গীতা কোন শিক্ষায়তনে যোগ দিয়েছে ?

এ চিঠির কোনো জবাব আসে না।

কয়েকদিন পরে সুমথ দেখা করতে এলে তাকে সে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে। কিন্তু সুমথ গীতার কোনো খবরই বলতে পারে না। গীতা তাদের কাছে চিঠিপত্র লেখেনি একখানাও।

খবর নেব ?

প্রথম ভেবেচিন্তে বলে, না, থাক।

মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন প্রমথ জেল থেকে ছাড়া পায়—আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে। বাড়ি পৌঁছে সে দুদিন বিশ্রাম করে, তারপর ঢাকা রওনা হয়ে যায়।

গীতার রায়বাহাদুর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে জামাইকে অভ্যর্থনা করেন, এসো। বসো।

গীতা ফেরেনি শিক্ষাসদন থেকে ?

কোন শিক্ষাসদন ?

ও আমায় লিখেছিল শিক্ষাসদনে যাচ্ছে। নাম ঠিকানা জানায়নি কিছু।

রায়বাহাদুর ভুরু কুঁচকে তাকান।—শিক্ষাসদন ? ও তো জেলে।

জেলে ?

ও মেয়ের কথা বোলো না। পাগলের মতো যাতা বক্তৃতা দিয়ে সিডিশনের চার্জে ছমাস জেলে গেছে। ফাইনের ওপর দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম, তা কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এমন সব কথা বলতে লাগল—রায়বাহাদুর মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করেন, প্রমথ বুঝতে পারে ওটা আপশোশের আওয়াজ, আগে অনেকবার শুনেছে।—বেশ মিলেছ তোমরা দু জনে।

আবার রেলে স্টিমারে পাড়ি দিতে হয়। এবার প্রমথের মনে হতে থাকে মুহূর্তগুলি বড়ো বেশি দীর্ঘ। স্টিমার ও রেল বড়ো আস্তে চলে, সময় কাটতে চায় না।

জেলে গীতাকে দেখেই সে বুঝতে পারে তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে চিরদিনই ছিপছিপে, এখন বড়ো বেশি রোগা দেখাচ্ছে। তার চোখে চপল দৃষ্টির বদলে কেমন বিষণ্ণ হাসিভরা গাম্ভীর্য।

প্রমথ অনুযোগ দিয়ে বলে, মিছিমিছি জেলে আসবার তোমার কী দরকার ছিল বলো তো গীতু ? প্রতিশোধ নিতে ?

গীতার গলা আরও সরু, আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। প্রমথের কথায় সে যেন খনখন করে বেজে ওঠে, প্রতিশোধ কী ? জেল না খাটলে তোমার সঙ্গে ঘর করব কী করে ? আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই তো।

প্রমথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তা বেশ করেছ। তবে এর বদলে যদি—

প্রমথ তার এত বড়ো কাজকে সমর্থন করে না। রাগে অভিমানে লাল হয়ে যায় গীতার মুখ। জেলেও উপদেশ ঝাড়তে এসেছ ? কটা দিন নয় সবুর করতে বেরোনো পর্যন্ত !

প্রমথ ঢোক গেলে। গীতার চোখ মিটমিট করে।

দুঃশাসনীয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে, কিছুকাল আগে বেশীদিনের কথা নয়, গভীর রাতের রাখিতপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ ক্ষেত ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, কলা আমবিসর্গীন বনের জমাট ভয় থাক অন্তত পঁ্যাচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক বাঁশ্রচর পশু। বটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে ভেসে আসুক আবছা শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন অন্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম: এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সমস্ত জাগনই পরিবেশ। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার রাত্রে, সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পেয়ে নয়।

আজ ভয় পাবে। বন্যার পর বাংলার গাঁগুলির বাস্তবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না, বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে শহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তা-বোমায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা থাক, বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম যদি কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে রাখিতপুরে এসে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন অবশ। অতএব, চারিদিকে গাঁয়ের অধিকার অপমৃত্যু —নিরুত্তর। তারপর সেই চারিদিকে ছায়ামূর্তির সকরুণ চোখে এবং মর্মে অনুভব করে তার কি থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার সে ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ঘরের বেড়া দেখা যায়। বেড়ার ওপাশ। নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে বনবন এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো বড় গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছে এসে পাশে থমকে দাঁড়াবে, পলকে একটা চাপা উল্লসিনী বিদ্যুৎ মত ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। পুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কইবে ছায়ার সঙ্গে, হাসবে কাঁদবে দেবে অপুষ্টকে, আর—। বিদেশীর সাড়া পেলে চকিতে কোণের আড়াল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রশ্ন সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে ওখানে?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার

শারদীয় যুগান্তর ১৩৫২-য় প্রকাশিত দুঃশাসনীয় গল্পের সচিত্রিত প্রথম পৃষ্ঠা

চিন্তামণি

এক

খিদিরপাড়া
২৪ পরগণা
তাং ২০শা শ্রাবণ

বৈন চিন্তামণি তুমি ২/৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব বলিয়া পত্রখানার উত্তর দিতে গৌণ হইল, দাদার আমশা ১ মাস যাবত ভুগিয়াছে, আমি কাহাকে লইয়া যাইব। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়াছে। আজ ৫/৭ দিন যাবত এখানে ঝড় তুফান হইতেছে এইরূপ অবস্থাতে আমি কি করিয়া যাইব। নৌকা যে করিয়া যাইব এমন সাধ্য আমার নাই। ২/১ দিনের মধ্যেই আমি যাইব, ওখান হইতে আসিয়া আমি মাল লইয়া তোমার নিকট পত্র দিব। একা লোক খালি ঘর ফেলিয়া ১টি গাভি ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইব। এই দুর্দ্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হুঁসে আছি তাহা ভগবানই জানে। উহাদের তিন জন যাওয়াতে আমার শরিলে একটুক বল পাইতেছি না। চাঁপাবালা বসিরহাট গিয়া শ্বশুড়ের বাসায় ১৫ দিন মাত্র ছিল, উহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সোণার গয়ণা ইত্যাদি না নেওয়াতে মানে আর কি বুঝিয়া লইবে। হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। বৈশাখ মাসের ২০ তাং গিয়াছে জৈ্যষ্ঠ মাসের ২৭ তাং বিবাহ দিয়াছে। হেমীর মাকে বিবাহেতে লয় নাই। হেমীর মা তাহার কাকার বাড়ীতে আছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিবাহ দিয়াছে ঐ শোকে হেমীর মা পাগল হইয়াছে। হেমই বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে উহার মাঐ বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে, কাকী ধরিয়া স্নান করায় ও খাওয়ায় এই অবস্থাতে আছে। ছেলের বাড়ী মোদের দেশে বিন্দীপাড়া বিপিনের ভাই। এই মেয়ার বিবাহে কত আমোদ আহ্লাদ করিব। তাহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য্য করিল। হেম যে মায়ের জন্য কি প্রকার কান্দাকাটা করিয়াছে। তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব। তবু চাঁবাকে বাড়ীতে লইল না। জামাতার মুখ দেখে নাই বিবাহের নিয়ম কাজ মায়ে করে তাহাও করে নাই। আমি এই অশান্তিতে আছি তুমি সর্ব্বদা পত্র দিবে। তোমার পত্র পাইলে একটু শান্তিতে থাকি। মেয়ে জামাই লইয়া বাড়ীতে আসে নাই তাহার জন্য আশীর্ব্বাদ করিও। তোমাকে জানাইব। টাকা ত লইয়া যায় নাই। নবিন আষাড় মাসে ধান্যের কাজ করিয়া ১০্ টাকা দিয়াছে কি কাজ করে জানি না। চাঁবার পত্র পাই নাই। আমার খাওয়া চলে না।

"দিদি"

চিঠি পড়ে পটল বলে, লেখাটি কার রে ? কুচি কুচি লিখতে জানে পিঁপড়ের ঠ্যাং।

নন্দ গোঁসাই হবে। আগে নিত এক পয়সা, এখন দু পয়সার কম কথাই কয় না। তবে লেখে বটে, হ্যাঁ। যত খুশি বলে যাও সব ধরিয়ে দেবে একখানি পোস্টকাডে। একবারটি আমি ভাবনু, ঘোষাল বাড়ির মেজো বউ পাস দিয়েছে, পয়সা দিয়ে লেখাই কেন গোঁসাইকে দিয়ে ? তা বললে তুমি হাসবে পটলবাবু, বলতে শুরু করেছি কি করিনি, মেজো বউ বললে আর তো জায়গা নেই চিন্তামণি ! এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন ?

তা—তা—

কী হল তুমার ?

সত্যি কথাই বটে তো।

কী সত্যি কথা ?

খামে লেখো না কেন ?

একটা পয়সা লোকসান হয়। তাছাড়া, কাগজ কই ? মাগো বাবাগো ! কী ফ্যাকড়া বেঁধেছে কাগজ নিয়ে ! না চেয়ে মিলত আগে যত চাও তত, চাইলে পরে খিঁচড়ে ওঠে এখন ! নবীনকে দিয়ে দিস্তে দিস্তে কাগজ হেডমাস্টার বেচে দিত দোকানে। এবার মোটে দু চার দিস্তে বেচলে—পায়নি তো বেচবে কি ! তা দর যা হয়েছে কাগজের, ক দিস্তে বেচে লাভ কিছু কম হয়নি।

আর কিছুর দর বাড়েনি ?

আ কপাল আমার ! থপ করে কপাল থাপড়ে দেয় চিন্তামণি, দর যদি না বাড়বে তবে দেশ-গাঁ ছেড়ে হেথায় আসি ?

পটল ভাবে, কাণ্ড বটে ! রাঁড়ির নাকি ঘরের অভাব, ভাতের অভাব ঘটে !—তা সে একবার হবিষ্যি করুক আর তিন বেলা খাক ? বাবুর বাড়ি কচিকাঁচার পাল, কাপড় যত আছে, ছিঁড়তে লেগেই বনে যায় কাঁথা, এমনি রাঁড়ি ঘরে পুষতে বাবু একদম পাগল। কাঁচা নয় যে খাটতে নারাজ, বুড়ি নয় যে চক্ষুশূল। এদের কত দাম এমনি সব বাবুদের কাছে !

পটল যাবে কলকাতা, তার দাদার ফিরতি বিয়ে। বাবু বললে, ওহে পটল শোনো, ঝি টেঁকে না জানো। বলে, পয়সা পাব বেশি, তোমার কলে খাটাও বাবু ! সবাই যদি কলে খাটবে তো ঝি কে থাকবে ঘরে ? হিসেব বুঝিয়ে দি জলের মতো সাফ—পয়সা পাবি বেশি, এমন খাওয়া পাবি কোথা ? কাঁকড়ে চালের মোটা ভাত দুবেলা খেতে যে বেশি পয়সায় কুলোবে না হারামজাদি ? তা কে শোনে কার কথা। মাসটি গেলে মাইনে নিয়ে ভাগে, অন্য কলে খাটতে যায়।

আজ্ঞে ভালো খাওয়া ভাল্ লাগে না মাগিদের। পয়সা পেলে আধ পেটাতে খুশি।

মন্দ দিনকাল পটল। সবদিক দিয়ে মন্দ। বাপের কালের ধানকল আমার, ইদিকে সেই প্রথম। আজকে দ্যাখো, দেড়গন্ডা কল বসেছে। দু চারটে সাঁওতাল ছাড়া জোয়ান মাগি একটা আসে না কলে ! ভাদুরী ব্যাটার শয়তানি চাল আর সয় না পটল।

দাঁড়ান না, ব্যাটা ডুববে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম তোমায়। দেশের দিকে যাচ্ছ, যদি ঘর গেরস্ত এমন কাউকে পাও, আশ্রয় নেই কষ্ট পাচ্ছে, পারলে এনো দিকি একটা। খাবে পরবে ঘরে থাকবে ঘরের মানুষের মতো, বাচ্চা কটাকে দেখবে আর এটা ওটা করবে। মাইনে পাবে না, ঘরের লোকের মাইনে কি ? নেহাত যদি চায় তো না হয় দুটো টাকা হাতখরচ বাবদ দেওয়া যাবে। বুঝলে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খোঁজ করব।

বুড়ি ব্যারামি যেন না হয় বাপু। মাঝ বয়েসি স্বাস্থ্য ভালো এমনি কাউকে এনো।

তা হাওড়ায় তার দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলেনি—বয়স আছে, স্বাস্থ্য ভালো ! এমন মেয়েই কম গাঁয়ে। দুটো চারটের বেশি কোনো কালে ছিল না। আজ তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও কি হয়েছে ? না রোগাপটকা বনে গাঁয়েই আছে তাই ওই বন্ননা খাটে না ?

বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গেছে কালীঘাটে, সেখানে দেখা চরণ দাসের সাথে।

এ কথা সে কথার পর আপশোশ করে বলে, ইকি ব্যাপার আঁ ? কমবয়সি নয়, মাঝবয়সি নাদুস নুদুস মেয়ে একটা গাঁয়ে নেই ? বাবুর ফরমাশ ছিল।

চরণ বললে, হালে এয়েছে গাঁয়ের মেয়েদের সাথে একটা। জোয়ান মেয়ালোক। চেনা লোকের জানা বাবুর বাড়ি খুঁজছে—

আমার বাবু রাখবে।

তোমার সেথায় ? ও খুঁজছে কল্‌কাতায়।

শুধোও, যদি যায়।

অনেক কথা, অনেক দ্বিধা, অনেক ধাঁধার পর চিন্তামণি রাজি হল। শেষ মুহূর্তে চরণ বললে পটলকে, একটা কথা বলি। দায়ি করবে শেষে ? স্বভাব তেমন ভালো নয় শুনি চিন্তামণির।

পটলের যেন তা জানতে বাকি ছিল ! নয়তো এই বাজারে এত বছর মিহি কোরা থানকে ফেরতা দিয়ে পরে আর কপাল-ঢাকা ঘোমটা টেনে চাবির গোছায় ভারী রিং আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝোলায়, যার স্বভাব ভালো ? নানা বর্ণের নানা ধাঁচের সেলানো পাড়ের ঢাকনা তার তোরঙ্গের, শোওয়ার কাঁথা তোশক-সমান পুরু ! ওসব জানে পটল, ওতে যায় আসে না কিছু, ধোপা নাপিত কামারকুমার যারা, সমাজ তাদের এমনি মেয়ের কেলেঙ্কারি সয়, যদি সেটা সত্যমিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছু না হয়।

রাত্রিগুলি অন্ধকার। পাপ যে করে চুপেচাপে তার বিচারের ভার সেই বিচারকর্তার যার সৃষ্টি সেই অন্ধকার। হাওয়ায় ভাসা কথার বেলা সমাজ তাই কানা। পিছে যদি কেউ লাগে আর হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, হা দ্যাখো, তখন সমাজ দণ্ড দিয়ে বলে যে আজ থেকে তুমি পতিত হলে, প্রাচিত্তির করে যদি ভোজ দেও সমাজকে তবেই উঠতে পার সমাজে, নইলে নয়।

চিন্তামণিকে সে পৌঁছে দিল বাবুর বাড়ি। তার বাবুর নাম নীলকণ্ঠ ঘোষাল, দুপুরুষে হরের্নাম রাইস মিলের মালিক।

পরদিন বাবু বললে, অ পটল, এ করেছ কী ? ওনা যে বলছে দূর ! দুর ! খেদিয়ে দাও— বিদেয় কব আজকেই ? ওনার চেয়ে সাফসুরুত এ ঝি, চলন যেন রাজকন্যের দাসী। বললে না পিতায় যাবে পটল, রোয়াকটুকু পেরিয়ে যেতে সময় লাগে নতুন বোয়ের বেশি। আমি বলি যাহোক নাহোক এসেছে যখন এ্যাদ্দুরে, থেকেই যাক একটা দুটো মাস। তা ওনা বলছে আজ নয়তো, কালকে, ওকে বিদেয় করা চাই। তুমি যদি তোমার বাসায়—

আমার বাসায় ঝি ! পটল প্রায় চোখ উলটে বলে, বাবু, মাইনে কিছু আর চাল কিছু যদি না বাড়ান, আধেক মাস উপোস দিতে হবে।

বাবু চুপ। মুখে বড়োই অসন্তোষ। সব কথাতে এই কথা আনা চাই পটলের আজকাল। একবার নয়, দুবার নয়, দশবার। কলে যখন পুরোদমে কাজ, সবদিকে নজর রাখতে বাবু একদম অপারগ, চাল যেন পটল সরায় না তার বছর খোরাকি আর বছব পোশাকির মতো। কী করে সরায় তাই না শুধু জানা নেই বাবুর !

পটল তখন বলল, এক কাজ করেন বাবু। মার সামনে ধমক ধামক দিয়ে বলেন, মাইনে পাবেনি একটা পয়সা। খাওয়া পরায় থাকবে থাকো, নইলে তুমি ভাগো বাছা। আর মাকে বলেন, মাগির হাতে জল খেতে আপনার ঘেন্না করে, এমন নোংরা মাগি।

বাবু কিছু বলল কি বলল না বাবুই জানে, চিন্তামণি সেই থেকে আছে। তেমন সাফসুরুত আর নয়, ঘোমটা অনেক খাটো, চলন বেশ জোরে।

এতদূর এসে পথের ধারে শিরীষ গাছের তলায় বসে আছে, সাইকেল চড়ে বাড়ি যাবার সময় তাকে দিয়ে চিঠি পড়াবে বলে ! বাবুর বাড়িতে যেন লোক নেই চিঠি পড়বার। বাবুর ছেলে মেয়ে একসাথে ম্যাট্রিক দিয়েছে এবার, ছেলেটা ফেল করেছে খবর এসেছে দিন সাতেক আগে। আহা, পাস করেও মেয়েটার কী কান্না।

নাক সিটকানো স্বভাব বড়ো মেয়েটার পটলবাবু। বলেছিল বটে, চিঠি পড়ে দেব চিন্তামণি ? আমি ভাবলাম, কাজ নেই বাবু চিঠি পড়ে, ঘরের কথা জানাব ! আমায় দাও, পড়তে জানি আমি, বলে তাই নিয়ে নিলাম চিঠিটা। ওগো মাগো কী যে তখন দেমাক দেখালে ছুঁড়ি !

দেমাক নাকি। বললে পটল আর হাতল ধরে খাড়া করলে সাইকেলটাকে।

দেমাক নয় ? আকাশ থেকে পড়ে যেন আশ্চর্যির পার নেইকো এমনই করে বললে, পড়তে জানো তুমি ?

জানো নাকি সত্যি ? উৎসুক পটল শুধোল।

জানি নে তা ঠিক। কিন্তু জানলে অবাক হবার কী আছে শুনি ?

সাইকেল চেপে পটল যখন অনেক দূরে গেছে তখন যেন চিন্তামণির মনটা উঠল কেমন করে। শ্রাবণ শেষের বৃষ্টি ছাড়া বাতাস ছাড়া দিন, ভাদ্র মাসের উজল কড়া রোদে ঘাম ছোটানো গরম। পুজোর আর কটা দিন বা বাকি। এমন দিনে এই বিদেশে সে বিদেশিনি গো ! একেবারে একাকিনী সে !

ক—

লাল কাঁকরের পথটা এখন ধুলোর কাদায় কাদা, হেথায় হোথায় গাড়ির চাকার গর্তে জমা জল। দুপুর বলেই লোক চলাচল কম, নইলে পথে মানুষ কিছু কম চলে না। এদিক ওদিক দূরে কাছে গাঁ চোখে পড়ে ঢের, তবু যেন খেত আর ডাঙায় চারিদিকটা তেপান্তরের মাঠ। ডোবা নালায় খালবিলে ঝোপে-ঝাড়ে বনবাদাড়ে গাছ-আগাছায় ঘেঁষাঘেঁষি চব্বিশ পরগনার গাঁ, খিদিরপাড়ার চারিদিকে। ছায়া যেন আপনি নিবিড়, কচুরিপানার পাঁকাল গন্ধে ভরা। এখানে সব ফাঁকা, আশপাশের গাছগুলিকে যেন গুনে নেওয়া যায়। পথের দুপাশে খানিক দূরে দূরে মানুষ গাছ রেখেছে, তার বেশির ভাগই শাল, শিরীষ আর কদম,—দুদিক পানে দূরে তাকালে তবেই চোখে পড়ে তাদের সারি বাঁধা রূপ।

খেতগুলি আজ ফসলে ঢাকা, ডাঙা মাঠে বড়ো বড়ো তৃণ। ঝাঁকাটি ঝোপের পর্যন্ত সরস নবীন রূপ। কালচে রাঙা কাঁকর মাটির পথটি ছাড়া কদিন আগের এবড়োখেবড়ো রাঙামাটির শুকনো দেশ সবুজ হয়ে গেছে। অনেক দূরে শাল বনের সবুজ সেদিনও ছিল, লাল মাটির ধুলোয় যেদিন এই শিরীষ গাছের পাতা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল লাল।

প্রথম বর্ষণে তখন গাছের পাতার ধুলো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। কোনো খেতে লাঙলের মুখে মাটি উঠছে ডেলা ডেলা, মই লাগিয়ে ভাঙতে হবে। কোনো খেতে, হয়তো ঠিক পাশের খেতেই লাঙলের ফলা ডাবছে না মাটিতে। বড়ো বড়ো ফাটল ছিল এ খেতে শোঁ শোঁ করে জল শুষে নিয়েছে, সবটা খেত নরম হয়নি।

গৌরাঙ্গের বড়ো খেতটার একপাশে একটুখানি জমিতে লাঙল চলল, তাইতে কাহিল হয়ে পড়ল বলদ দুটো। লাঙল যেন নোঙর হয়ে ঠেকে যাচ্ছে।

খেটে দি চাঁদকাকা ?

না।

চন্দ্রকান্ত গৌরাঙ্গের আসল কাকা, সম্প্রতি ভাইপোর সঙ্গে ভিন্ন হয়েছে। ভাবে ভাবে ভিন্ন হওয়া, ঝগড়া বিবাদ নালিশ ফরিয়াদ কিছুই ঘটেনি। মাসেক পরে কী কারণে চাঁদের মন বড়োই বিরূপ হয়েছে ভাইপোর পরে। কেন যে তার মন বিগড়েছে অনেক ভেবে গৌরাঙ্গ তার হদিস পায়নি। আকাশ থেকে যেন মনোমালিন্য নেমেছে তাদের মধ্যে। কথা কয় না, খবর নেয় না, গৌরাঙ্গ যদি বা বাড়িতে যায় তো কাকি পর্যন্ত বলে না যে, আয়রে বাপা, বোস।

আরেকটু জল না পেলে খেতে তার কাজ চলবে না। বলদ তার নেই, ফের সেদিন ভাড়া করতে হবে। সারাটা দিন সামনে পড়ে আছে, কারও খেতে আজ খেটে দিলে একটা দিনের হাল বলদ আর খাটুনি তার পাওনা হয়ে থাকত।

জোড়া বলদের বদলিতে কাকা তাকে তিন বিয়োনির গাই দিয়েছে একটা আর একটা মদ্দা বাছুর। ঠকিয়েছে নাকি তাকে তার চাঁদকাকা ? খেটে দিতে বারণ করল কেন ? কাজ ফুরিয়ে গেলেও বলদ জোড়া দেবে না নাকি তাকে ?

কাল তুমার শেষ হবেনি চাঁদকাকা ?

হবে। তাই কী ?

আরেক বর্ষা নামলি মোরে বলদ জোড়া দিয়ো।

মোর কাজ নেই কো ? আদুলির ডাঙা জমিতে হাল দিতি যাব আরেক বর্ষায়।

আদুলির নামা জমি ? কুথা পেলে বটেক তুমি, আঁ ?

কিনতে পারি। পেতে পারি। জুটতি পারে। তোর কাজ কি অত খপর নিয়ে ? তোর বাপের জমি নয়।

আদুলির নামা জমি বিলি হয়েছে সতেরো বিঘা, চড়া সেলামিতে। টাকা থাকলে গৌরাঙ্গও দু-এক বিঘা নিত। কিন্তু কাকা তার টাকা পেল কোথায় ? ক বিঘে জমি সে নিয়েছে ? ভিন্ন হবার এতদিন পরে হঠাৎ আজ গৌরাঙ্গ ঈর্ষার তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এই জন্য—শুধু এই জন্য চাঁদকাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। চাঁদকাকা সম্পত্তি বাড়াবে, বড়োলোক হবে !

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ ভাবছিল, খানিকদূর থেকে ব্যাপার অনুমান করে রঘু সামন্ত হাঁক দিল, খাটবি নাকি গৌর ?

খাটতি পারি।

আয়।

গৌরাঙ্গ খুশি হয়ে জোয়াল থেকে বলদ দুটিকে মুক্তি দিল। লাঙলটা কাঁধে তুলে বলদ তাড়িয়ে খাটতে গেল রঘুর জমিতে।

বীজধানের অভাবে এবার অল্প-বিস্তর সবাই কাতর। অনেক চাষির এ অভাবটা চিরস্থায়ী দায়, কোনো বছর বাদ যায় না। বীজধান তুলে রাখে, আশা করে এবার হয়তো হাত না দিয়েই চালানো যাবে খেটেখুটে পয়সা কামিয়ে ভগবানের দয়ায়। বীজ যে লক্ষ্মী সবাই জানে, একমুঠো ছড়িয়ে দিলে ফিরে আসে দশ মুঠো হয়ে। কিন্তু প্রতি বছর পেটের জ্বালায় শেষ মুঠোটি উজাড় হয়,—যদিও পেট তখনও জ্বলে। খুঁজে পেতে কেঁদেকেটে বীজ জোগাড় হয়, অবিশ্বাস্য চড়া ধানের সুদে। এবার এই স্বাভাবিক অভাব নয়, ফাঁদে পড়া সর্বজনের সর্বজনীন অভাব। চাষিরা সব চিরকালই চাষি, চাষাড়ে জ্ঞান, চাষাড়ে মতিগতি। ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে দাদা, বাপ আর নিজে এই তিনপুরুষে তেমন শুধু স্বপন দেখা ছিল। ধানের এমন দাম চড়া মানেই চাষির লক্ষ্মী বাড়া—চাষিরা জানে এ ছাড়া আর অন্য নিয়ম নেই, অন্যথাও নেই। সোজা হিসাব, সোজা নিয়ম, প্যাঁচ থাকবে কোথায় ? তিনের দরে এক মন বেচে তিন টাকা পাই, সাতের দরে এক মন বেচে পাই সাত টাকা। চারটে নগদ টাকা, কড়কড়ে চারটে নতুন ছাপা নোট যে বেশি পাই তাতে কি আর সন্দেহ আছে ভাই ?

হরের্নাম রাইস মিলের নীলকণ্ঠবাবু, ভাদুরী রাইস মিলের জলধরবাবু আর মডার্ন রাইস মিলের বিনোদবাবু তিনজনেই দর বাড়ায়, কিন্তু তাদের চেয়ে চড়া দর দেয় অজানা অচেনা বিদেশি ক জন লোক ! মানুষ তারা অচেনা বটে কিন্তু তাদের টাকাগুলি চেনা। ধান নিয়ে তারা পালিয়ে যায় না, গাড়ি বোঝাই দিয়ে রাইস মিলেই ধান নিয়ে ফেলে। খালি মধুবনির তিনটে মিলে নয়, সাত ক্রোশ দূরে গোদাপাড়ার মিলে পর্যন্ত যায়। গোদাপাড়া জায়গা ছোটো, মিলটা কিন্তু মস্ত আর একেবারে রেল লাইনের ধারে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে কল চালাতে শুরু করে তিনটি মিলের তিনটি বাবুই যেন ধান কিনতে উদাস ভাব দেখায়। যেমন তেমন ছাঁটা ধুলো কাঁকর মেশাল দেয়া চালগুলি প্রায় চালান হয়ে এলে, মিলের কাজে কমবেশি ক্ষান্তি পড়ে গেলে, তিনটি বাবুই দর কমিয়ে ধানের দাবি জানায়, পাওনা ধান, ঋণের ধান, ছাঁটাই করে চাল ফিরিয়ে দেবার ধান।

দাদন যারা দিয়েছিল তারা অনেকে চেয়ে চেয়ে পুরোনো দরে ধান পায়নি, টাকার গরম চাষির তখন মগজ ছুঁয়েছে। বলে দিয়েছে, সুদে আসলে টাকা ফেরত নাও, ও দরে আর ধান পাবেনি। কিন্তু দাদন নিয়ে কি চাষি রেহাই পায় ? দাদনদার চেপে ধরে ভয় দেখিয়েছে যে দাদন ঋণ নয়, গচ্ছিত ধান বেচে দেওয়া চুরির শামিল পাপ—ধান না দিলে ফৌজদারিতে একেবারে জেল ! ধান যদি নেই, হিসাব মতো বাজার দরে পাওনা ধানের দামটা দিয়ে দাও !

চাষির হাতে টাকা এসেছে ঢের। যাই বাড়ুক তার খাজনা বাড়েনি সবাই ভাবছে, এতদিনে চাষিই এবার সুখী, খাজনা দেবার খরচটা সে টেরও পাবে না। কিন্তু বাঁধা খাজনার বাঁধন অটুট রেখে জমিদার যে চাষির লাভে ভাগ বসাতে পারে এ হিসাবটা সবার ফসকে গেছে। আইন রেখে আইন ভাঙার পেশায় যিনি মেডেল-যোগ্য গুণী, তিনি যেন প্রজারই ধনলাভে খুশি হয়ে ঘুমোতে পারবেন।

জমিদারও খাজনা চাইলে,—ধান। ভুলানো নয়, ঠকানো নয়, টাকার বদলে ধান ! আগের চেয়ে দাম বেড়েছে ধানের ? বেশ, আগের চেয়ে একেবারে এক টাকা বেশি ধরো। জমিদার যে অবুঝ তাও নয়। ধান যার নেই সে টাকায় খাজনা দিক, কী আর করা যাবে।

ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক, কী আর উপায় আছে।

ধান যার আছে তার ভাবনা কি, ধানেই খাজনা শোধ !

ধানের তাই বড়ো অভাব ঘরে ঘরে। বীজধানেরও চমকপ্রদ অভাব।

সদরে বীজধান দেওয়া হচ্ছে। গৌরাঙ্গ, রঘু আর সদয় সামন্ত সদরে গেল বীজধান কিনতে। তিনজনেই চাষা কি না, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরই সে কী জবর হাসি !

দম নিয় গৌরাঙ্গ বলল, যে ধান গাছে তক্তা হয়, এতে সেই গাছ হবে।

চাপরাশি কান ধরে তাদের বার করে দিল।

অনেকেরই বীজধান ছিল না, তবু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আবাদের জন্য তৈরি সমস্ত জমির জন্য যত বীজধান দরকার ছিল জোগাড় হয়ে গেছে। বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু বাঁধা পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান—জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের কবলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারি কৃষি বিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে মহাজনের ঘর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দশার বীজ হয়ে চাষিদের ঘরে। অন্য সমস্ত কিছুই যেমন যার যত দরকার তার তত জোটে না—কয়েকজন পায় অনেক, তার চেয়ে বেশি কয়েকজন পায় যথেষ্ট এবং অধিকাংশই পায় কম—প্রাণপাত সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে চাষিদের বীজধানও ঘরে এল সেই নিয়মে।

বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মতো। হারাণ করে কী, তিনুর কাছে গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ বিঘে হোক তাই কামনা করি, লক্ষ্মীমন্ত হও। তুমি দানা পেয়েছ ঢের, ভালো সরকারি দানা। তোমার দীনু ভাইটি তক্‌মাধারি চাপরাশি, আহা, তার ভালো হোক, তোমার ভালো হোক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড় করছি তোর দুটি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে বেশি নে, কিন্তু দে।

তিনু। নেই।

হারাণ। আছে বাবা, আছে। ভাই তোর চাপরাশি, তোর নেই তো আছে কার ?

তিনু। বাড়তি নেই।

হারাণ। দামও বেশি নে বাবা, দু আনা ফসলও নিস।

তিনু। জমি দাও, তিন আনা তুমি পাবে।

হারাণ। শালা ! চোর ! খচ্চর।

তিনু। ভাগ্ তবে ব্যাটা বুড়ো বাঞ্চোত ভাগ্। মেথি ঘাস বুয়ে দিবি যা, মাগনা পাবি। বোঝায় বোঝায় বেচবি ঘাস।

হারাণ। অ বাবা তিনু, একটু বিবেচনা করো বাবা। দয়া ধম্মো করো বাবা একটু। মোর জমি, মোকে তিন আনা দিবি, ই কি একটা কথা হল রে বাপ ?

তিনু। তিন আনাই তো মাগনা পাবে, মফত্ পাবে। একপাই জুটবে তোমার জমি ফেলে রাখলে ? আচ্ছা যাও বুয়েটুয়ে খেটেখুটে সব করবে, চার আনাই দেব তোমায়।

সময় নেই, উপায় নেই যে আর দশ জায়গায় চেষ্টা করবে। যত চেষ্টা সম্ভব ছিল সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তিনু শুধু মহাজন নয়, চাষি মহাজন, গত সনে তার প্রত্যাশা ছিল না, আগামী সনেও তার প্রত্যাশা নেই যে তিনুর হিসাব, বিবেচনা আর দরদ থাকবে মহাজনের মতো, যতই সেটা হোক নিজেরই স্বার্থের হিসাব আর বিবেচনা, মেকি দরদ। তিনু মহাজন চাষি, তিনু তার শত্রু। স্বার্থের সংঘাতে ভাই যেমন শত্রু হয় ভাইয়ের। তিনু তাই হারাণের জমি পেল আগামী ফসলের চার আনা ভাগের ভাড়ায়। খাজনার দায়িক হল না, ফলাবার শ্রমিক হল না, শুধু হল উর্বরতার মালিক। দাঁও মারার গৌরবে তিনু পুলকিত হয়ে রইল এবং হারাণের তিন বিঘে জমিতে ঘাস গজানোর বদলে ফসল হল !

এমনই অনেক রকমারি জটিলতার ভূমিকা তৈরি হবার পর সব খেতে ফসল ফলেছে। ফলেছে ভালোই। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে নিবিড় সতেজ তরুণ তৃণে, মোটা মোটা শিষের গোছ এদিক ওদিক দুলছে; দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আতঙ্ক জড়িত ক্লেশের মতো একটা অনুভূতির খোঁচায় সর্বদা মনে হয়, এ ফসলে কারও পেট ভরবে না। এ শুধু ফসল, অন্ন নয়। দাদ চুলকানোর আরাম ভুলে চাষিরা মাথা চুলকায়। ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এসব কী ব্যাপার। ধারণা করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু গত দিনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কী একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কী যেন মুশকিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ও সব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উলটোপালটা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভালো ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনা ভোগ। জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানি পশারি আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, ক টা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিত নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য—আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরও তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।

কে জানে এ সব কীসের সূচনা, কী আছে তাদের ভাগ্যে !

বৈন চিন্তামনি,

তোমার যে পত্রখানা দিয়াছ ইহাতে পরম সুখী হইয়াছি। অদেষ্টে সুখ নাই আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। কে দিবে যে আমার মন্দ অদেষ্ট আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। আমার জমিটুকু ওনার বড়ো ভাই জোর করিয়া গার দাপটে ভোগ দখল করেন তুমি জানিবা এবং কতকাল আমার বলিবার কিছু মুখ নাই কারণ গুরুজন বেটাছেলো তাঁহার অমান্য করিলে লোকে থুথু দিবে। বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া এবার বলাইলাম যে এই দুর্দ্দিনে আমার ভাগ দিবেন আমি এতকাল চাই নাই এখন ভাগ না পাইলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। পেটের খুধায় তুমি মধুবনী গিয়াছ বলিয়া আমার অন্তরে কত দুক্ষ জানিয়া গ্রাহ্য করিল না। সাফ জবাব দিল এমন পাষাণ। আমি কত সাধাসাধি করিলাম দাদা

গিয়া কিছু বলিল না। ১ মাস যাবত আমাশায় ভুগিবার কালে কত সেবা করিয়াছি, গু মূত ঘাটিতে ঘিন্না করি নাই। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। বৌ আংটি চাহিয়াছিল আমি দিই নাই তৎকারণে শত্তুর হইয়া আছে তুমি জানিবা, বৌর পরামর্শ দাদাকে বিরাগ করিয়াছে। আংটি বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছি আমি কেমন করিয়া আংটি দিব। বৌর কথায় মার পেটের বৈনকে ভাসাইয়া দিল। দাদা বলিল না আমি কি করিব, বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া ওনার বড় ভাইকে বলাইলাম। বিপিনের ভাইর সঙ্গে হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। ডাকাতের হাতে মেয়ের বিবাহ দিয়া কি অশান্তিতে আছি আমারই অন্তরে জানে। দাদা বলিল না আমি কি করিব। বিপিনকে বলিলাম সে গিয়া বলিল। আমি মেয়ালোক কেমন করিয়া বলিব। জামাই হেমীকে লইয়া কাকীর বাড়ীতে চাঁপাবালাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল। মাত্র ২ দিন ছিল। কাকী পত্র লিখিয়াছে জামাই শাশুরিকে প্রণামি ১ খান কাপড় দিয়াছে তাহা গামছার মত। সোনার গহনা ইত্যাদি চাহিয়া অনেক গোলমাল করিয়া হেমিকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া বিবাহ দিয়া চাঁপাবালার শ্বশুড় এইরূপ কার্য্য করিল। কাকী চাঁপাবালা আর হেমীকে রাখিতে পারিবে না বলিয়াছে। শ্বশুড়ের কাছে টাকা চাহিতে গিয়া পায় নাই, দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এমন শ্বশুড় দেখি নাই। গোঁসাই ঠাকুর বলিতেছেন আর কুলাইবে না অধিক আর কি লিখিব। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব না, কেমন করিয়া যাইব। নবিন ধানের কাজ করিয়া টাকা পায় নাই। নুনা জলে ধানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তুমি সর্ব্বদা পত্র লিখিবে। আমার খাওয়া চলে না। তুমি পেটের খুধায়।

দুই

রঘুর অবস্থা এদের মধ্যে একটু ভালো। বছরের বারোটা মাসেরই খোরাক তার জোটে, ছেলেপুলে আর বুড়ো বাপ একটু দুধ পায়, ঘরের চালা ঝাঁজরা হয়ে জল পড়ে না, মাঝে মাঝে সকলে নতুন কাপড় পরে, মেয়েরা চুলে তেল দেয়।

রঘুর দুটি বউ, বিরজা এবং দুর্গা। বিরজা বড়ো বউ, দশ এগারো বছর স্বামীর ঘর করছে। দুর্গা এসেছে তার বছর চারেক পরে। বয়সে বিরজা তার সতিনের চেয়ে বড়ো হবে কিনা সন্দেহ, হয়তো বা ছোটোই হবে দু-এক বছরের। তবে কিনা চাষি গেরস্ত ঘরে অত বছর গুনে বয়সের হিসাব রাখার গরজ কারও নেই, দরকারও হয় না। যে বয়সে বিরজা যতখানি বিয়ের যুগ্যি হয়েছিল তার চেয়ে চার বছর বেশি বয়সেও দুর্গা সে যোগ্যতা পায়নি।

আকারে বিরজা দুর্গার চেয়ে অনেক বড়ো, লম্বায়, চওড়ায়, মাংসের সংস্থানে। ছোটোখাটো বেঁটে আর রোগা প্যাটকা চেহারা দুর্গার। অনেক চেষ্টায় দেড়মাস জিইয়ে রাখবার মতো একটা খুদে ছেলে বিয়োবার পরেও তার বিয়ের সময়কার চেহারা বিশেষ বদলায়নি, শুধু মুখখানা একটু প্যাঙাসে মেরে গেছে, উপোসির মতো। বিরজার ছেলেমেয়ে হয়েছে মোট সাতটি, তার মধ্যে তিনটি বেঁচে নেই। বিরজার এই বাড়াবাড়ির জন্যই দুর্গাকে রঘুর বিয়ে করা, ঘন ঘন দীর্ঘকালের জন্য শূন্য শয্যার ফাঁকা অসম্পূর্ণ জীবন তার সয়নি। নইলে বিরজার জন্যই চিরদিন তার দরদ বেশি। বিরজা তার প্রথম বয়সের সোহাগিনি, তার ছেলেমেয়ের মা, তার সঙ্গে কি অন্য কারও তুলনা হয়। আজও সেই তার সব, বাড়তি একটা বউ ছাড়া দুর্গা আর কিছুই নয়।

ঈর্ষায় আতঙ্কে বিরজা প্রথমে খেপে গিয়েছিল। তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে সতিনকে মেরে নিজে সে বিষ খেয়ে মরে যাবে, তারপর রঘু যেন আবার বিয়ে করে, দশটা বিশটা বিয়ে করে, বিয়ের

সাধ মেটায়, সে কিছু বলতে আসবে না। দুর্গাকে দেখে, রঘুর মন বুঝে, নিজের যা কিছু ছিল সব বজায় আছে এবং থাকবে জেনে, শেষে বিরজা শান্ত হয়েছিল। তার মনে আর কোনো ক্ষোভ থাকেনি। তাকে ছেড়ে তাকে ভুলে ছেলে তার খেলার পুতুল নিয়ে মেতেছে দেখলে তার যেমন স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় জাগে, রঘুর আবার বিয়ে করাকেও সে তেমনই তার জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করার ছেলেমানুষি বলে গ্রহণ করেছে। চারিদিক বিবেচনা করে মনে মনে বরং একটু খুশিই হয়েছে বিরজা, স্বস্তি বোধ করেছে। পুরুষ মানুষের আলগা শখের জন্য এই ব্যবস্থাই মন্দের ভালো। স্বভাব বিগড়ে পুরুষ সংসারধর্মে উদাসীন হলে বড়ো বিপদ ঘটে, তার চেয়ে এ অনেক ভালো। আর যাই হোক, ঘরমুখো মানুষ এতে ঘরমুখোই থাকে।

দুর্গাকে বিরজা শাসন করে, কেটে ছেঁটে তার অধিকার খর্ব করে রাখে কিন্তু তেমন কিছু অত্যাচার করে না। রঘুর পক্ষপাতিত্বই দুর্গাকে সতিনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে। বিরজা যাই করুক তাকেই রঘু চিরদিন সমর্থন করেছে, কখনও ভুলেও দুর্গার পক্ষ নেয়নি। দুর্গাকে বেশি কষ্ট দেবার তাগিদও বিরজা তাই কখনও অনুভব করেনি।

দুর্গা বিরজার মন জুগিয়ে চলে, তার হুকুমে ওঠে বসে। ভারী ভারী কাজ করা তার শক্তিতে কুলোয় না, ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কাজ সে অবিশ্রাম করে যেতে পারে। ছেলেমেয়ে গাইবাছুর নিয়ে যে গেঁয়ো চাষির সংসার সেখানে এ রকম কাজেরও অভাব নেই। বিরজার সেবাও দুর্গা করে, তার চুলের জট ছাড়িয়ে, পিঠের ঘামাচি মেরে, পায়ের হাজায় তেল লাগিয়ে। এতে তার আপশোশ কিছু নেই। মনে নালিশ পুরে রেখে বিরজাকে সে খুশি রাখতে চেষ্টা করে না, সতিনের মন জোগানোর স্বভাবটা তার আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। পায়ের নীচে দাঁড়াবার মাটি কোথায় নরম, কোথায় শক্ত টের পাওয়ার মতো স্পষ্টভাবেই পরাশ্রয়ী মেয়েমানুষ জানতে পারে কোথায় তার আশ্রয়। মানিয়ে চলাটা তাদের মজ্জাগত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

রঘুর অবাধ্য হতে দুর্গা ভয় পায় না, কসুরও করে না তাকে চাপা গলায় দু-চারটে মন্দ কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু বিরজার সব কথা সে মেনে চলে। নির্বিচারে মেনে চলে।

এবার এক কাণ্ড করে বসেছে এই দুই সতিনে। দু জনে পোয়াতি হয়েছে প্রায় এক সঙ্গে। খেতে ফসল কাটার কাছাকাছি সময়ে তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা।

সে পর্যন্ত টিকে থেকে দুর্গা যদি অবশ্য হাঙ্গামাটা সইতে পারে। দুর্গার শরীর বড়ো খারাপ, তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দিতে হয়েছে। সময় আসা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ জেগেছে সকলের মনে এবং এ বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে যে কোনোরকমে ততদিন বেঁচে থাকলেও প্রসবের ধাক্কাটা সে সামলাতে পারবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে মারা যাবে।

ডাক্তার কবিরাজ এ কথা বলেনি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজেরাই তারা জেনেছে। বাড়ির মানুষ শুধু নয়, গাঁয়ের মেয়েরাও দেখতে এসে সায় দিয়ে গেছে এই আন্দাজে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক যারা মরে ছেলে হবার সময় এমনি অবস্থাই তাদের হয় শরীরের প্রথম থেকে। এমনি যারা বেশ সুস্থ সবল তারাই এ রকম অবস্থা হলে আর বাঁচতে পারে না, দুর্গা তো চিরদিন দুর্বল, ক্ষীণজীবী।

আপদ চুকে যায় তো যাবে, বিরজার মনে হয়েছে এ কথা। এ রকম অনেক কথাই মানুষের মনে হয়, অধিকাংশ সময়েই কিছু তাতে এসে যায় না। তা ছাড়া, ও কথা মনে হওয়ার মানে এই নয় যে আপদ চুকে যাবার প্রক্রিয়াকে বাতিল করার চেষ্টা করতে সাধ জাগবে না। বিরজা নিজেই গরজ করে রঘুকে দিয়ে দুর্গার চিকিৎসার জন্য মথুর ডাক্তারকে আনাল।

মথুর ডাক্তার বলল, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। নাড়ি একটু দুর্বল, জ্বরের লক্ষণটা ভালো নয়। এ রকম পেট খারাপ থাকলে চলবে না। তা, একরকম ঠিক হয়ে যাবে ও সব।

মথুর ডাক্তারের অভয়বাণী শুনে রঘু হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের পরীক্ষার সময় সেও কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দুর্গাকে দেখেছে। তারও জানা ছিল দুর্গা এবার মরতে পারে, আজকেই দুর্গা তার নজরে পড়েছে কয়েকবার, অথচ সে সত্যসত্যই জানত না এমন বিশ্রী হয়ে গেছে তার ছোটো বউটার চেহারা। গলা পর্যন্ত কাঁথা ঢাকা দিয়ে চিত হয়ে দুর্গা বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে, পেটটা শুধু তার উঁচু। শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দুটি কোটরে জ্বরের ধকে জ্বলজ্বল করছে কালো দুটি চোখ। বাড়িতে ডাক্তার এলে এমনি মনটা দমে যায় মানুষের, ভুলে যাওয়া রোগ শোক অজানা বিষাদ হয়ে ঘনিয়ে আসে, সমবেদনায় থমথম করে অনুভূতির জগৎ। দুর্গার দিকে চেয়ে থেকে তার যে কঠিন অসুখ হয়েছে অনুভব করে রঘুর ভেতরে অস্থির অস্থির করছিল। মথুর ডাক্তারের মুখে রোগের আশাপ্রদ আলোচনা শুনে সেটা ভয়ে পরিণত হয়ে গেল।

বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু ?

বাঁচবে না ? কেন, ওর হয়েছে কী ! ছেলেপিলে হবে বলে একটু যা ভাবনার কথা, নইলে অসুখ তো সেরে যাবে দু দাগ ওষুধে।

ওষুধ লিখে দেবার কাগজ বাড়িতে না পাওয়ায় মথুর চটে গেল। রোগের এই মরশুমের সময় চারিদিকে তার অসংখ্য রোগী, তার কি বসে থেকে নষ্ট করাবর মতো সময় আছে !

দাও বাপু, ওই ঠোঙাটা এগিয়ে দাও।

ঠোঙার কাগজেই মথুর ওষুধ লিখে দিল। তার নিজের দোকান থেকেই ওষুধ আসবে। এমনভাবে সে প্রেসক্রিপশনে লেখে যে সে ছাড়া আর কারও পড়বার ক্ষমতা থাকে না। অনেকদিন কম্পাউন্ডারি করে মথুর ছোটোখাটো একটি ওষুধের দোকান খুলে সস্তায় ডাক্তারি আরম্ভ করেছিল, চাষি মজুরদের মধ্যে তার খুব পশার। ফি সে যে শুধু কম নেয় তা নয়, তার সঙ্গে দরদস্তুর করে আরও দু-চার আনা কমানো যায়, পয়সার বদলে ফলমূল, ধান, চাল, দুধ, দই দিয়েও তার পাওনা মেটানো চলে। চাষিরা তাই অত্যন্ত পছন্দ করে তাকে। যাবার সময় মথুর বলে যায়, শুধু বার্লি আর ওই ফুডটা খাওয়াবে বাপু। যেমন বললাম তেমনই করে খাওয়াবে। ফুডটা কোথায় পাবে জানি না আমার কাছে নেই। পাও যদি তো দাম দিতে কান্না আসবে, তাও বলে যাচ্ছি আগে থেকে। কিন্তু ওটা চাই। গায়ে জোর নেই কো একদম, পেটে কিছু সইবে না, ওটা এনে খাওয়াতে হবে। দুধটুধ ভাতটাত আর দিয়ো না কিন্তু, খবরদার !

রঘু নিজের মনে খানিক চিন্তা করে বলে, হ্যাঁ, শালার ডাক্তার ভালো। ঠিক ধরেছে। ছোটো বউ, শুনছ ? যা তা খেয়োনি।

চিঁ চিঁ গলায় দুর্গা বলে, খেতে দেয় নাকি মোকে ? খিদেয় মরে যাই না ?

রঘু বিরজার মুখের দিকে তাকায়।

বিরজা মাথা নেড়ে বলে, চোখের খিদে। কাঞ্চার হয়েছিল মনে নেই ? যেমন খায় ঠিক তেমনই সব বেরোয় আর সারাখন খাইখাই করে মরে ? কতো খাওয়ানু তবু পাঁকাটি হয়ে গেল না অমন ছেল্যা মোর, মরে গেল না ! চোখের খিদে মরণ খিদে। বার্লি তোলা রইতে পারে একটুকু, ফুটিয়ে দিচ্ছি, খাওয়াও না কেনে।

বিরজা যেন রাগ করেই বার্লি ফুটিয়ে আনতে যায়। কিন্তু রঘু জানে এটা তার রাগ নয়। মৃত সন্তানের কথা মনে পড়লেই বিরজার সব কথায় কলহের সুর আসে, দুপ দাপ পা ফেলে সে হাঁটে। দুর্গার কাছে গিয়ে রঘু তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর অনুভব করে, হাতের তালু এবং উলটো পিঠ দুদিক দিয়েই জ্বরটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। মথুর ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে বলে গেছে জ্বর কত, কিন্তু রঘুর কাছে স্পর্শ না করে তাপ টের পাওয়ার কোনো অর্থ নেই। একশো তিন বেশি জ্বর তা সে জানে, কেমন ধারা বেশি সেটা তো জানতে হবে গায়ে হাত দিয়ে।

হ্যাঁ, কপালটা পুড়ে যাচ্ছে দুর্গার। গলার নীচে বুকের তাপটাও রঘু পরীক্ষা করে। ডান হাতটি বার করে দুর্গা গায়ের কাঁথার ওপরে ফেলে রেখেছিল, মরা সাপের মতো হাত। মায়া দেখাতে নয়, তাপ দেখবার জন্যেই সে হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে রঘুর যেন ধাঁধা লেগে যায়। নিজের পরিপুষ্ট সবল হাতের মস্ত থাবায় এইটুকু হাত নেতিয়ে আছে দেখে দুর্গাকে তার খানিক আগের চেয়েও অনেক ছোট্ট, অনেক ক্ষীণ মনে হয়। একটু হতভম্ব হয়ে থাকে রঘু, তার গা ঘিনঘিন করে। কিছুদিন আগে চাঁদ মাইতির আট বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গাঁয়ের ভূতনাথ সা-র কীর্তির কথাটা মনে পড়তে থাকে। ভূতনাথের জেল হয়েছে সাত বছর। যত সে নিজেকে বোঝায় যে এ তার বিয়ে করা বউ, বয়স এর কম হয়নি, অনেককাল এ তার ঘর করেছে, একবার মা হয়েছে তার ছেলের। ততই যেন শায়িতা দুর্গা ম্যালেরিয়ায় পেটমোটা কঙ্কালসার কচি একটা মেয়ে হয়ে তার আরও বেশি ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

বার্লি করে এনে বিরজা দেখল রঘু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

স্টেশনের কাছে বাজার, সেখানে সবগুলি দোকান খুঁজে ফুড মিলল না। হাফেজের মনোহারি দোকান আর রামশরণের ডিসপেনসারির সমান কিছু এ অঞ্চলে নেই। ফুডটা দুজনের দোকানেই ছিল, কিন্তু বিক্রি করার গরজ ছিল না মোটেই। এ সব জিনিসের দাম তখন দিন দিন চড়ছে চোরাবাজারে।

এ যে মুশকিল হল গৌর ?

সদরে গেলে হয়।

দুর্গাকে দেখে অবধি গৌরাঙ্গের চোখ দুটি ছলছল করছিল। বয়স তার বেশি হয়নি, যদিও সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে অনেকদিন। রঘু সদয় তিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যতই কাবু হয়ে পড়ার ভান করুক, বিয়ে করতে পারেনি বলে সংসারের ভাবনাগুলি তার এখনও খুব হালকা। এক মা, এক বিধবা ভাজ আর তিন ভাইবোনের ভাব অবশ্য কম নয় তার মতো গরিবের পক্ষে, এই ভারেই সে নির্ঘাত কাবু হয়ে পড়বে কয়েক বছরের মধ্যে, যদি না তার আগেই ওদের মরণ বাঁচন সম্বন্ধে উদাসীন হতে শিখে যায়। গৌরাঙ্গের চেয়েও অনেক বেশি কোমল হৃদয় যুবকের যে উদাসীনতা আসতে দেখা গেছে। বউ আর ছেলে মেয়ের ভালোমন্দ সম্বন্ধেও মানুষের উদাসীনতা আসে, কিন্তু সেটা সাধারণত জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসে ভোঁতা নির্বোধ হয়ে যাবার লক্ষণ। সদয়ের ভাই হৃদয়ের যেমন হয়েছে, জোয়ান মদ্দ মানুষটার বেঁচে থাকতেই যেন গা নেই।

সদরে যাবার আগে পটলের পরামর্শে রঘু নীলকণ্ঠের কাছে গেল। গৌরাঙ্গও তার সঙ্গে গেল। এ বাড়িতে সে কিছুদিন থেকে দুধ জোগান দিচ্ছে, এই সম্পর্কের জোরে ফুড সংগ্রহ সম্পর্কে বাবুর কৃপা দাবি করা হয়তো একটু জোরালো হবে। পটল আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল যে শুধু কাঁদাকাটায় ফল হবে না, একেবারে নগদ টাকা সামনে রেখে বাবুকে ধরে পড়তে হবে। দুটি টাকা নীলকণ্ঠের পায়ের কাছে রেখে কাঁদাকাটার বদলে গম্ভীর উদাস কণ্ঠে রঘু তার নিবেদন জানাল। প্যান প্যান করা তার আসে না। গৌরাঙ্গের কথাগুলি বরং শোনাল ঢের বেশি করুণ। ফুডটা যেভাবে হোক বাবু যদি জোগাড় করে না দেন তাহলে রঘুর ব্যারামি বউটা যে মরে যাবে, এইটুকু জানাতে গিয়েই গলাটা ধরে এল তার।

নীলকণ্ঠ বৈঠকখানায় তামাক খেতে খেতে এই সকালবেলাই অর্ধেক চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল,—টাকার স্বপ্ন। দু জনের কথা শুনে সজাগ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তোরাও মজেছিস ? বলি বাবা, রোগ ব্যারাম কি আগে ছিল না এ দেশে, না, বোতলভরা ফুড না খেয়ে রোগ সারেনি কারও ? বাপঠাকুরদা তোদের চোখে দেখেছিল না নাম শুনেছিল ফুডের ?

রঘু সাগ্রহে বলল, আমিও তো তাই বলি। ডাক্তারবাবু কিনা ফুড ফুড করে খ্যাপা তাইতে নিরুপায়।

কাল থেকে রঘুর মনে হচ্ছিল ফুডটা নিয়ে সে চরম দায়ে ঠেকেছে। ফুডটা দুর্লভ হওয়ায় তার কেমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল, এই বস্তুটি সংগ্রহ করার উপরেই দুর্গার বাঁচন মরণ নির্ভর করছে, ফুড খেলে দুর্গা বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না। নীলকণ্ঠের কথায় দায়বোধটা একটু হালকা হওয়ায় সে স্বস্তি পেল।

ডাকিস কেন ডাক্তার ? ও হল বিলিতি চিকিচ্ছে, বিলেতের লোকের জন্যে। যেমন দেশ, যেমন লোক, তেমনই হবে চিকিচ্ছে, এই হল রীতি। আমরা আর সায়েবরা সমান নাকি ? ওরা হল গে ম্লেচ্ছ, বর্বর—দেহসর্বস্ব জাত। একটা লোক প্রেমভক্তির সন্ধান জানে ও দেশে ? একটাও না ! ওদের চিকিচ্ছে এ দেশে খাটবে কেন বাবু ? এ দেশের ডাক্তারি নেই ? আয়ুর্বেদ হয়নি এ দেশে ? কোবরেজ মশায়কে ডাকতে পারলে না ?

আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে। ফুডের বদলিতে তালি কি খাওয়াই ?

রঘুর এ প্রশ্নের জবাব নীলকণ্ঠ দিতে পারল না। বোতল ভরা ফুডের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ পথ্য আছে ঢের, কিন্তু নীলকণ্ঠ কি মুখস্থ করে বসে আছে তার নামগুলি ? কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। শুনে রঘু আবার দমে গেল। দায়বোধটা ভারী হয়ে উঠল আবার।

তালি ওই এইগোটা জোগাড় করে দেন বাবু।

আমি কোথা জোগাড় করব ফুড ?

নীলকণ্ঠের মেয়ে সুনীতি ধিনিক ধিনিক নাচের ভঙ্গিতে অকারণেই ঘরে এসেছিল, এবার সে ম্যাট্রিক পাস করেছে। একটা ফুডের অভাবে একজনের বউ মরে যাবে শুনে মনটা কেঁদে উঠেছিল বলে নয়, ভেবে চিন্তে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই সে বলে ফেলল, আমাদের তো দুটো আছে, একটা দিয়ে দাও না বাবা ?

মেয়েকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে নীলকণ্ঠ বলল, ওর একটাও দিতে পারব না বাবু, আমি কি দোকান খুলে বসেছি ? বিপদ-আপদের জন্য রেখেছি ও দুটো, কখন দরকার হয়।

আনিয়ে দেবেন বাবু ?

না-না-না। আমি পারব না। নীলকণ্ঠ গর্জন করে উঠল। তার রাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রঘু আর গৌরাঙ্গ জানল কেন যে তার বাড়িতেই দুটো ফুড আছে ? এ এক দুর্ঘটনা বইকী ! কপালটাই মন্দ রঘুর। বাড়ির জিনিস না দিক, নীলকণ্ঠ দয়া করে একটা ফুড আনিয়ে দেবার ভারটা নিশ্চয় নিত। কিন্তু রাগ হলে মানুষ কী করে দয়া করে ?

ভোরে গৌরাঙ্গ নীলকণ্ঠের বাড়ি দুধ দিতে যায়, গাছের মাথা থেকে রোদ মাটিতে নামার আগে। গায়ের জ্বালায় পরদিন সে অনেক বেলা করে গেল আর এমন জল মেশাল দুধে যে জিনিসটা দাঁড়িয়ে গেল দুধ মেশানো জল। সময়মতো চা না পেয়ে সকলে খেপে ছিল, হিসাব মতো অভ্যর্থনা পেয়ে গৌরাঙ্গ খুশি হল। তার এই প্রথম ত্রুটিকে সবাই উদার ভাবে ক্ষমা করলে সে বড়োই ক্ষুণ্ণ হত !

এত দেরি করলি যে বজ্জাত ?

দেরি হয়ে গেল বাবু।

এ কি দুধ রে হারামজাদা ?

মোর দুধ ওমনি বাবু।

নিজেকে বেশ নির্দয় ও নির্ভীক মনে হয় গৌরাঙ্গের, যেটুকু রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার চেয়ে বিশগুণ রাগ বাবুদের হয়েছে সন্দেহ নেই। যতটা রাগ চাপা যায় চেপে রেখে শুধু যে বাড়তি অসহ্য রাগটুকুতে বাবু আর তার মাগছেলের চোটপাট, একী আর টের পেতে বাকি আছে গৌরাঙ্গের। তাকে ধরে মারতে না পেরে কী কষ্টই হচ্ছে এনাদের ? দুধের বেশ টানাটানি পড়েছে চারিদিকে। গোয়ালার গোরু কমেছে, গেরস্তের গোরু কমেছে, রোগা গোরু আরও রোগা হয়ে দুধ দিচ্ছে কম। কিছু কম দামে প্রায় খাঁটি দুধ তার কাছে এতদিন পাওয়া গেছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে মুশকিলে পড়বার ভরসা এনাদের নেই। নীলকণ্ঠের বন্ধু উকিল মধুবাবু চুপিচুপি তাকে সেধে গেছে এখানে জোগান বন্ধ করে তাকে দুধ দিতে—দাম সে বেশি দেবে, আগাম দেবে। কিন্তু তখন নীলকণ্ঠকে গৌরাঙ্গ খাতির করত, পোয়াতি একটা মেয়েছেলের প্রাণ বাঁচাতে একটা ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায়নি। কাকার সঙ্গে ভিন্ন হয়েই দুধের বদলে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে অতি দরকারি ক টা টাকা পেয়ে গৌরাঙ্গ কেনা হয়ে গিয়েছিল। কাল পর্যন্ত সে ধারণাও করতে পারেনি এ কৃতজ্ঞতার তার কারণ নেই, বাবুর দরদ সেরেফ ফাঁকি। অভিভাবকের, ভালো মন্দের দায়িকের ঋণ যেন সে শোধ করেছে কাল পর্যন্ত ভোরে উঠে সবার আগে একটুখানি জল মেশানো দুধ পৌঁছে দিয়ে। হুস করে উপে গেছে সে ভাব তার মনের বিরাগে শুধু নীলকণ্ঠের কালকের অপরাধ নয়, এতদিন ধরে তাকে ঠকানোর অপরাধেরও শোধ নিতে পারছে ভেবে হিংসার সুখে মনপ্রাণ তার তাজা হয়ে ওঠে।

অনেক লম্পটের শোষণে ছিবড়ে বনা বাজারের মেয়েলোকের মতো এ বাড়ির গিন্নির চেহারা, গলায় মোটা চেন হারটি সোনার শিকলের মতো। এতদিন কিছু মনে হয়নি গৌরাঙ্গের ভদ্রমহিলাকে দেখে মৃদু একটা অস্বস্তি বোধ ছাড়া, আজ বারেবারে তার গোরুর কথাটা মনে পড়তে লাগল, যার গলায় হারের মতো একটা কুকুরবাঁধা শিকল জড়ানো আছে আজ তিন বছর।

সবার শেষে গিন্নি থামল। গিন্নি থামা পর্যন্ত ঠায় বসে রইল গৌরাঙ্গ বারান্দার একপাশে উবু হয়ে। শেষের দিকে একবার তার সাধ হল যে বেয়াদবির পালা সাঙ্গ করে নাকে খত দিয়ে আবেগে গদগদ ভাষায় ক্ষমা চেয়ে জানিয়ে দেয় যে এমন আর হবে না কোনোদিন, ফিরে আবার প্রার্থনা জানায় একটা ফুডের জন্য।

কিন্তু সাধ জাগলেও সংকোচের জন্য সেটা গৌরাঙ্গ পেরে ওঠে না। বড়ো স্পষ্ট হয়ে যাবে তার বজ্জাতির মানে। বড়ো খাপছাড়া ঠেকবে পরের বউয়ের জন্য তার এমন ধারা ব্যাকুল হওয়া। হঠাৎ সে যেন দিশে পায়। কেউ যা করে না, মোটেই নিয়ম নয় সংসারে যা করা, সে তো তাই করেছে হাবার মতো খেয়ালের বসে অসংগত কাজ—তার যে সাতপুরুষের কেউ নয় সেই একটা রোগা ক্যাংটা মেয়েলোকের মরণ বাঁচন নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। টের পেলে লোকে হাসবে। তাকে ভাববে ছেলেমানুষ, ছ্যাবলা। সকলে হাসি তামাশা করবে, টিটকারি দেবে।

গোবর্ধনের ছেলে কালীচরণ ছিল তার স্যাঙাত। বছর চারেক আগে কালীচরণ কলেরায় মরে যেতে পৃথিবী শূন্য দেখে শোকে একটু বাড়াবাড়ি রকম কাতর হওয়ার ফলাফলটা গৌরাঙ্গের মনে পড়ে যায়। শুধু তাকে ভাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বড়োদের পরামর্শে তাকে ধরে বেঁধে জোর করে মাথা ন্যাড়া করে জল ঢালা হয়েছিল কলসি কলসি, মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল মনসা পাতার রস !

ও বেলা ভালো দুধ দেব দিদিমণি।

সুনীতি পালিশ করা চকচকে আওয়াজে বললে, আদ্দেক দুধ আর আদ্দেক জল তো। তোমার নামটি কেন গৌরাঙ্গ ? ফরসা ছিলে বুঝি ছেলেবেলা ?

তামাশায় গৌরাঙ্গের প্রাণে আঘাত লাগে। জীবন তার কাছে ভয়ানক ভারী আর গভীর, একটুখানি কুঁড়ে ঘরে বুড়ি মা, কচি বোন আর গাই বাছুরটি নিয়ে সমারোহহীন যে জীবনটুকু সে যাপন করে বিয়ে করে গাদাখানেক ছেলেপুলে না হলে এ ভাবটা তার কাটবে না, বোধশক্তি ভোঁতা হবে না।

খিড়কি দিয়ে গৌরাঙ্গ এ বাড়িতে আনাগোনা করে। মেঠো রাস্তায় তার পথ সংক্ষেপ হয় না, কিন্তু মেঠো রাস্তায় চলে তার আরাম হয়। তার ভারী আশ্চর্য লাগে যে মানুষের পায়ে পায়ে এমন সরু সুন্দর নির্দিষ্ট পথ কী করে গড়ে ওঠে। কে সকলকে বলে দেয় কোন আধ হাত পরিসরের মধ্যে পা ফেলতে হবে ? খেলার মাঠের বুক চিরে নতুন পথের রেখা সৃষ্টি হতে দেখেও সে বুঝতে পারেনি কী করে কী হল। প্রথমে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়ানো, পায়ের চাপে শুয়ে পড়া ঘাস, তারপর মরা ঘাসের বিবর্ণতার অনির্দিষ্ট রেখা ও ধীরে ধীরে সেই রেখার উদলা মাটির পথে পরিণতি। আরও কি অদ্ভুত ব্যাপার, আবর্জনার পাশ কাটাতে গোড়ার দিকে পথটি যেখানে একটু বেঁকেছিল, আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হবার পরেও পথের সে বাঁক থেকে গেল—কেউ চেষ্টা করল না সে বাঁকাকে সোজা করতে। মানুষের এ সব একার্থকতার প্রমাণ বড়োই দুর্বোধ্য আর রহস্যময় মনে হয় গৌরাঙ্গের। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বেছে বেছে গান রচনা করে সে তার এই অনুভূতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

বাঁকা পথে ছাতিমপাড়া যাতি হবে গো
উদাস নাগরে পথ দেখাবে কে।
মানুষ চলা পথে যাবার নাগর কি গো সে॥
আহা হৈ......... !
অলো সই !

নীলকণ্ঠের বাড়ির খিড়কির দরজার পরেই একটা পড়ো চালা, তার ওপাশ থেকে হাঁটা পথ গেছে দুদিকে। এদিকে মাঠ পেরিয়ে পুকুর ঘুরে বড়ো রাস্তার ধারে সেই শিরীষ গাছের কাছে, যার তলে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তামণি পটলকে সাইকেল থেকে নামিয়ে তার চিঠি পড়ায়। আর পুবদিকে পথ গেছে ছোটো জঙ্গল ভেদ করে তাঁতিপাড়ার গা ঘেঁষে গৌরাঙ্গের বাড়ির দিকে।

চালার পিছনে চিন্তামণি দাঁড়িয়েছিল। আঁচলের আড়াল থেকে একটা ফুড বার করে সে গৌরাঙ্গের গামছায় জড়িয়ে বেঁধে দিল, ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার কাণ্ডখানা কী, দুধ মাপতে বেলা কাবার হল ? এটা খাইয়ো তাকে, সেই যার ব্যারাম। কাল যে জন্যে বাবুর কাছে এইছিলে গো তোমরা, কী জ্বালা !

কোথা পেলে ?

বাবুর ঘর থেকে সরিয়েছি, কোথা আবার পাব ? জানাজানি হয়নি যেন বাবা, দূর করে খেদিয়ে দেবে মোকে। বউটা কেমন আছে ?

বাঁচে কি না বাঁচে।

আপশোশের একটা আওয়াজ করে চিন্তামণি মুখখানা করুণ করতে চায়। গৌরাঙ্গের মনে পাক খেতে থাকে জিজ্ঞাসা যে চিন্তামণির কাজের মানে কী।

চিন্তামণির মনে দরদ আছে নিশ্চয়। আজানা অচেনা পরের বউয়ের জন্য নইলে কে সাধ করে চুরি করতে যায় ? অথচ মুখ দেখে আর গায়ে পড়ে কথা বলতে শুনে মনে হয় সে যেন ভারী চালাক মেয়েমানুষ, প্যাঁচ আছে তার মধ্যে।

তাকে আরেকটু চিনবার ইচ্ছায় গৌর শুধোয়, তুমার ঘর কুথা গো ?

শুনে চিন্তামণি মুচকে হাসে। —ওটা পৌঁছে দাও গে যাও। আলাপ কোরোখন পরে যখন সময় পাবে।

বলেই দমক মেরে পিছন ফিরে সে হাঁটতে শুরু করে দেয় তাড়াতাড়ি ছোটো ছোটো পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিতে। অনেকদিন থেকে সে জানে এমনি করে হাঁটার সময় কোমরের নীচে দেহের গাঁথুনি তার মানুষের নজর টেনে নেয়। কোনোদিন তার কোমর দুলিয়ে হাঁটা দেখার কপাল যদি নাই হয়ে

থাকে এ ছোঁড়ার, আজকে দেখুক। বাবুর মেয়ে নাচে,—কী ছাই সে নাচ ! সাপের মতো হাত দুলিয়ে এপাশ ওপাশ করে হাঁটু পেতে বসে আর উঠে দাঁড়িয়ে যদি নাচ হত ওই রোগা প্যাঁটকা শরীর নিয়ে, মানুষ তবে কাঠিকে শাড়ি পরিয়ে খুশিমতো নাচাত, মেয়েমানুষ চাইত না। মেয়ে নাকি আবার প্রাইজ পেয়েছে নাচ দেখিয়ে ! গৌর যদি কোনোদিন দেখে থাকে তার দেশের ওই মেয়ের নাচ, আজ বিদেশিনি তার শুধু চলনটা দেখুক। বুঝুক, ভগবান যাকে দ্যান তার চলার মধ্যেও কত পরান আকুল করা নাচ। খানিক গিয়ে চিন্তমণি মুখ ফিরিয়ে তাকায় তার ঈষৎ হাসির চটুল ভাষা নিয়ে আর গৌরাঙ্গের মুখে সে রকম জবাবি হাসির বদলে সরল সহজ বিহ্বলতা দেখে একটু অবাক হয়ে বাড়ি ঢোকে। মানুষ যে কাঁচা থাকে, নিজে যে সে একদিন কাঁচা ছিল, কতকাল মনে পড়েনি চিন্তামণির ! নীলকণ্ঠ আর পটলের বয়স পেতে অনেক দেরি গৌরাঙ্গের, আজ তক হয়তো সে কোনো মেয়েছেলের গলা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেনি একটিবারের জন্য। মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সি সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে। আর সেই সঙ্গে সস্তা মনে হয় নিজেকে, ফাঁকা মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া চিকন গুড়ের চ্যাটালো হাঁড়ির মতো।

সেদিন বিকালে দুর্গা মারা গেল। আকাশ ফুঁড়ে ফুডটা পাওয়া গেল, বার চারেক ক্ষীরের মতো ঘন করে অনেকখানি ফুড খাইয়ে দেওয়া হল, তবু যে সে বাঁচল না তাতে কারও সন্দেহ রইল না। স্বয়ং ভগবান তাকে মেরেছেন। খবর শুনে গৌর ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে দেখল, ফুডটা জোগাড় করে ছোটোবউকে যে খাওয়ানো হয়েছে এই সান্ত্বনায় রঘু নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

ডাক্তর যা বলেছে সব করিছি। করিনি ? অ গৌর, করিনি ? এই বলে কপালটা দু বার চাপড়ে দিয়ে পাঁচুর হাত থেকে কলকেটা নিয়ে তিনবাব সাঁসাঁ শব্দে জোরে জোরে টেনে সে কাশতে থাকে। দু দিন ধরে দুর্গার জন্য তার দুর্ভাবনার বাড়াবাড়িতে গৌরের বড়ো ভয় হয়েছিল। বউটার ভালোমন্দ কিছু হলে রঘু সে আঘাত সহজে সামলাতে পারবে না, হয়তো ভেঙ্গে পড়বে অনেকদিনের জন্য, যতদিন না ভগবান শোকটা সইয়ে দেন। ভাবতেও কত যে আলোড়ন উঠে মনটা মোচড় খেয়েছে গৌরের ! মানুষের মন যে কী অবাক জিনিস ভেবে সে প্রায় রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অনেকবার। মনের তলে ছোটোবউয়ের জন্য, দুর্গার জন্য, রঘু যে এমন পাগল এতগুলি বছর রঘুর সঙ্গে মিশেও কে তা ভাবতে পেরেছিল ? রঘুর সুখদুঃখ চিরদিন তার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে বলেই না গৌরের বুকেও সহানুভূতির বান ডেকেছিল দুর্গার জন্য। অথচ কী সহজ আর স্বাভাবিক শোক হয়েছে দ্যাখো রঘুর ! তার গত দু দিনের উদ্ভট ব্যবহার বাদ দিলে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি।

শোকে উন্মত্ত-প্রায় রঘুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোকার্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয় এসে সাধারণ চলনসই দুঃখবোধ করতে গৌর খানিকক্ষণ নারাজ হয়ে থাকে। গোরুটা পর্যন্ত দুয়ে রেখে আসেনি ভেবে তার একটু রাগও হয়। ছেলেমানুষি করে করেই সে ঠকেছে চিরকাল। দুধটা চট করে বাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আর দেখা হলে চিন্তামণিকে দুর্গার মরণের খবরটা জানিয়ে এখানে এসে অনায়াসেই সে আটকা পড়তে পারত। কী এসে যেত আধঘণ্টা দেরিতে, দুর্গা যখন মরেই গেছে আর রঘু যখন দিশাহারা হয়ে যায়নি সেই মরণে।

ঘরে কাঁপা কাঁপা সুরে মেয়েরা গান করে যায় মড়াকান্নার, পাড়ার আত্মীয়বন্ধু বাঁশ কেটে আনে মাচা বাঁধার জন্য। রঘু এদিক গিয়ে ওদিক গিয়ে ধীর শান্তভাবে ছটফট করে বেড়ায়, কখনও একটু দাঁড়ায় অথবা উবু হয়ে বসে, খানিক শূন্যে তাকিয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে আর দু-এক মুহূর্তের জন্য চামড়া কুঁচকে কাঁচকে মুখখানা তার বিকৃত হয়ে যায়। দুটো কলকে অনেকের হাতে হাতে ঘুরছে। রঘু মাঝে মাঝে তামাক টানে আর কাশে। সাঁসাঁ করে বেকায়দায় টানে বলেই কাশে, নইলে এমন কড়া তামাক ভূভারতে নেই যে রঘুকে কাশাবে, চিটায় মিঠা দা-কাটা তামাকের তো কথাই নেই।

ধর, গৌর।

গলাটা ভারী রঘুর। ভিজে ঢাকের মতো ভারী !

এইসব মিলেমিশে কখন যে গৌরের হৃদয়ে যথোচিত বেদনা এনে দেয় ! সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে তার হৃদয়ের সেই বেদনাবোধে কী সব কারণে কয়েকবার খিচ ধরে ধরে তার কান্না পায়। দুঃখ তার বৈরাগ্য হয়ে দু চোখ দিয়ে গলে গলে পড়তে থাকে টস টস করে। জীবন যৌবন ঘরদুয়ার গোরুবাছুর খেতের ফসল সব মিছে, এ জগতে কেউ কারও নয়। বউ কীসের, মেয়েমানুষ কী ? সব মায়া, সব ফাঁকি !

দুধ লিতে এইছে দাদা।

গৌরের কচি বোন আন্না তাকে ডাকতে এসেছে। খানিক মূঢ়ের মতো বসে থেকে গৌর নীরবে উঠে দাঁড়াল।

যাসনি গৌর। অ গৌর, যাসনি মাইরি।

এখুনি এসবোখন—এক দণ্ডে।

রঘুর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে গৌর বেরিয়ে যায়। রঘুর জন্য তার আর চিন্তা ছিল না। ওর কিছু হবে না।

দুধ নিতে এসেছিল চিন্তামণি। তাকে দেখে গৌরের একবার মনেও হল না যে নীলকণ্ঠের চাকর বাকর কুলি মজুর থাকতে চিন্তামণি কেন দুধ নিতে এসেছে। মনটা তার এতখানি বিগড়ে গিয়েছিল।

ছেলেকে দেখেই গৌরের মা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, বার করেছে ? নিয়ে গেছে ?

গৌর বলল, না।

রঘুর বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে হাহুতাশ করার জন্য গৌরের মা উতলা হয়ে ছিল, ছেলের জবাবটা শোনামাত্র সে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ফের যাস তো ঘরে কুলুপ দিয়ে যাস।

ঘরে একটা কুলুপ আছে, তাতে চাবি ঘোরে না। কুলুপ দেবার উপায় থাকলে গৌরের মা কি আর এতক্ষণ ঘর আগলে বসে থাকে।

চিন্তামণির সাবান-কাচা সাদা কাপড় একাদশীর চাঁদের আলোর রং ফিরিয়ে দিয়েছে গৌরের একরত্তি উঠোনে। তার পায়ের কাছে পেঁপে গাছের ছায়ার ডগাটাকেও ঝাঁকড়া-চুলো দৈত্যের মাথা বলে কল্পনা করা যায়। মানুষ-মরা সন্ধ্যার আলো ছায়া দিয়ে পৌরাণিক রহস্য চারিদিকে ঘনিয়ে আনা পুরাণ-ঘেঁষা কল্পনারই কাজ।

বউ বুঝি হোথা ?

বউ ? কার বউ ?

ওমা ! বউ নেই ? আঁচলের তল থেকে হাত বার করে গালে দিয়ে চিন্তামণি অবাক হয়ে যায়। —পালাই বাবা তবে।

দুধ লিয়ে যাও।

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়েছে বুঝে চিন্তামণির একটু রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগে না। প্রথমে সে ভেবেছিল রঘুর বউ গৌরের বোন টোন কেউ হবে, তারপর পটলের কাছে শুনেছে সে ওর কেউ নয়। ওর জন্য মানুষ কি মরতে পাবে না সংসারে ? গাঁয়ের কেউ মরলেই যদি এমনি ধারা করতে হয়, টেঁকাই যে ভার হবে মানুষের।

দুধের পাত্র হাতে নিয়ে চিন্তামণি নালিশের সুরে বলল, একলাটি কী করে যাব ভাবছি।

কী করে এলে ?

এখন এইছি ? সন্দে না লাগতে এসে ঠায় বসে রইছি তোমার জন্যে।

বাছুর ছেড়ে দিয়ে গৌর চিন্তামণির অনেকখানি তফাত দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় উঠল। সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাধ জাগলেও কেমন যেন সাহস হল না। চিন্তামণি একটু পিছিয়ে গেলে সে মরমে মরে যাবে। তার ফাঁকা বাড়ির উঠোনে তাকে সামনে দাঁড়াতে দেখে চিন্তামণি পিছিয়ে গেলে তার যে লজ্জা আর অপমান হবে তার বড়ো লজ্জা আর অপমান জীবনে যেন তার জোটেনি, জুটবে বলেও মনে হল না।

সড়ক ধরে যাওগে না, যদি ইদিক পানে ডর লাগে ? রাত আর হয়েছে কত, সড়কে লোক চলছে, সাথি পাবেখন।

ডর তো সেখানে গো, কেমন সাথি জুটবে তা কি জানি ? তোমাদের দেশের মানুষ কেমন তোমরাই জানো ভালো, আমি হলাম ভিন দেশের লোক।

একাই ফিরবে ভেবেছিল চিন্তামণি, আগে ভয় তার ছিল কম। ভয়ের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এতক্ষণে ভয়টা তার সত্যই বেড়ে গেল। এদিকে মেঠো পথের নির্জনতা আর ওদিকে বাঁধা সড়কের বিদেশি অজানা পুরুষের কথা ভেবে গা তার ছমছম করতে লাগল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে এল দাওয়ার কাছে। মিনতি জানিয়ে বলল যে গৌর তাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক ! ঘরে কুলুপ না দিলে কিছু হবে না, কতক্ষণ আর লাগবে তাকে এগিয়ে দিয়ে গৌরের ফিরে আসতে ? এসেই বোকামি করেছে চিন্তামণি—ঘাট সে মানছে গৌরের কাছে।

শোনো বলি কেন এলাম।

বিদেশ বিভুঁয়ে একা পড়ে গিয়ে কী যে কষ্ট চিন্তামণির ! এসে থেকে সে সমান একটা মানুষ পায়নি, চাষি গেরস্থ ঘরের মানুষ, এক ধাঁচের মানুষ, যে মন খুলে দুটো কথা কয়ে বাঁচবে। বাবুর বাড়ি মানুষ আছে ঢের কিন্তু সবাই তারা ভিন্ন জাতের, আলাপ করে সুখ নেই। ঝি আর মজুর মাগিদের সঙ্গে কি তার বনে, সে ছিল চিরটা কাল ঘরের মেয়ে, ঘরের বউ আর ঘরের রাঁড়ি ? ওই যে কথায় বলে জলের মাছের ডাঙায় ওঠা, সেই দশা হয়েছে চিন্তামণির। তাই না সে এসেছিল দুধ নেবার ছুতোয় গৌরাঙ্গের মা বোন মাগের সঙ্গে দু দণ্ড কথা কইতে।

পৌঁছে দেবে না মোকে ?

দেব না বলিছি ?

মেঠো পথে সাপের ভয়। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে গৌর সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। অপরিচয়ের ব্যবধান তাদের তখন ঘুচে গেছে। বাবুর বাড়ির দাসী বলে চিন্তামণিকে একটু পর মনে হয়েছিল গৌরাঙ্গের, কী ভাবে তাকে নিতে হবে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। ওরা কোন জাতের মেয়েমানুষ আর কেমন ওদের হালচাল তা কে জানে ! নইলে চিন্তামণির সঙ্গে কথা কইতে কি গৌরাঙ্গের ভাবতে হত, না কোন ব্যবহার উচিত হবে ঠাহর করতে তার ফাঁপর লাগত এতক্ষণ ? চাষির মেয়ের মন না জানুক, মনের গড়ন চাষি জানে। মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে বুলিও চাষিদের এক—কথার ও ভাষার মানের গণ্ডি সম। এইটুকু পথ যেতে যেতে তাই দু জনের ব্যগ্রতাহীন অনায়াস কথোপকথনে অনেক কথার আদান-প্রদান হয়ে গেল—পরস্পরের নানা বৃত্তান্ত। হরেনাম রাইস মিলের সামনে যখন তারা পৌঁছাল, চিন্তামণি তার চোখের কথা বলছে। গত বছর চোখের অসুখ হয়েছিল বলে কটকট করায় ভাবনা হয়েছে চিন্তামণির।

চোখে কম দ্যাখো ?

না গো, কম কেন দেখব ? দুকুরবেলা চোখটা কেমন টাটায়। যা ধুলো বাবা তোমাদের দেশে !

আজ সকালেও তার দেশ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মন্তব্য গৌরের পছন্দ হত না, হয়তো কলহের সুরে পালটা জবাব দিয়ে বলত যে তোমার দেশে ধুলো নেই ? এখন কথাটায় সায় দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, পদ্মমধু দিয়ো দিকিন চোখে একটু। ও বড়ো ভালো ওষুধ।

সেখান থেকে মেঠো পথেই গৌর সোজা রঘুর বাড়ি গিয়ে হাজির হল। মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে হইচই করে দুর্গাকে পোড়াতে গেল বালিময় শুকনো নদীর বুকে। কানাই বংশী আর হরিধনের জন্য একটা দেশি মদের বোতল রঘুকে কিনতে হয়েছিল, গৌরও একটু চেখে দেখল। ভালো করে গেঁজে ওঠেনি এ রকম অল্প নেশালো তাড়ি সে দু-এক ঢোক খেয়েছে মাঝে মধ্যে. মদ কোনোদিন ছোঁয়নি।

খেদিরপাড়া
২৪ পরগণা
৪ঠা ফাগুণ

বৈন চিন্তামণি তোমায় কি লিখিব আমার লিখিবার মুখ নাই। আমি কেন জীবন্ত আছি আমার মরণ হয় না ভগমানকে দিবারাত্র জানাইতেছি। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তুমি কাঁদাকাটা করিবা বলিয়া জানাইতে বিলম্ব করিলাম। ইহার পর আব বাঁচিবার সাধ নাই কিন্তু পোড়া কপালে মরণ নাই আমি কেন মরিব একচক্ষু ভগবান আমাকে কেন লইবে। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে জানিবা। ইহার সব বিত্তান্ত ভাবিলে আমার মাথা ঘুরায় আমি দিবারাত্র মরণ কামনা করি। কাকী থাকিতে দিবে না বলিয়াছে লিখিয়াছিল ইহাতে কেমন করিয়া জানিব কাকী চাঁপাবালাকে মেয়া শুদ্ধ খেদাইয়া দিয়াছে যে তাগো খাওয়া জুটে না হৈমী এবং তাহার মাকে কেমন করিয়া রাখিবে। ইহা কথার কথা ভাবিয়াছি তাই টাকা পাঠাই নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব টাকাই বা কোথায় পাইব। গলায় দড়ি দিবে জানাইলে চুরি ডাকাতি করিয়া পাঠাইতাম কিন্তু হতভাগী ইহা জানাইল না। নবিন টাকা পাঠায় নাই। তাহার দোষ কি নূনা জলে ধানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে কাজ করিয়া টাকা পায় নাই এবং তাহার কি দুর্দ্দশা সে কলে কুলির কাজ করিতে গিয়াছে। চাঁপাবালা কয়দিন খাইতে পায় নাই হৈমীকে লইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিয়াছে এজন্য আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। গজেন মুক্তারের বাড়িতে উঠিয়া গলায় দড়ি দিয়াছে তাহা হৈমীর জন্য। গজেন মুক্তারের মুহুরির সঙ্গে হৈমী কোথায় চলিয়া গিয়াছে এই কলঙ্কে বুক ফাটিয়া চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে। সব গজেন মুক্তারের কারসাজি বলিয়া শুনিতেছি জানিবা। বিন্দীপাড়ার বিপিন হৈমীর জামায়ের বড় ভাই সে গিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিয়াছে। সব লোকে আমার মুখে থু থু দিতেছে আমি কেন জীবন্ত আছি। গজেন মুক্তার টাকার কুমীর হইয়া এমন কাজ করিল। মুহুরিকে দিয়া হৈমীকে পলাইয়া লইয়া গেল। গজেন মুক্তার থানায় গিয়া মুহুরির নামে থানা পুলিশ করিয়াছে। বিপিন বলিল ইহা তাহার কারসাজি বজ্জাতি করিয়া করিয়াছে যে লোকে বলিবে যে নির্দ্দুষী। মুহুরিকে তুমি চিনবা সে চাঁপাবালার পিসাতো ভাসুরের ছেলে শরৎ। চাঁপাবালা শ্বশুরবাড়ী থাকিবার কালে হৈমীর ছোটোকালে আসিয়া হৈমীকে কত আদর করিত। কাকী তাড়াইয়া দিলে সেই নাকি চাঁপাকে গজেন মুক্তারের বাড়ী ঠাই দিয়াছিল। শরৎ এমন ভালোমানুষ আর অল্পবয়সে তাহার কেন এমন সাহস হইবে। আমি এই হুঁশে আছি আমার মরণ নাই। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিল হৈমী কলঙ্ক করিল আমি কি করিব। শুধু বুক চাপড়াইয়া মরিব। আমার খাওয়া জোটে না। কয়টা টাকা পাঠাইতে লিখিলাম তুমি পাঠাইলে না। কয়মাস বেতন পাইয়াছ তথাপি ইহা কিবূপ। তোমাকে কতকাল খাওয়াইয়াছি ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি মধুবনী গিয়া সুখে আছ আমি না খাইয়া মরিব। পত্রপাঠ কয়টা টাকা পাঠাইবা।

"দিদি"

তিন

চোখ মেলে চাইলেই শরৎকালের শোভা নজরে পড়ে, সে শোভার রং ভারী সবুজ। লাল ধুলোর কথা তুলে গৌরের এ দেশকে নিন্দে করার ছুতো চিন্তামণির বর্ষায় ভেসে গিয়েছিল, এখন যদি বা এখানে ওখানে শুকনো কাদার ডেলা গুঁড়িয়ে ধুলো উড়ছে দু-এক ঝলক, সেটা কিছু নয়। কুয়াশার দিনগুলি পেরিয়ে গিয়ে আবার ভালো করে ধুলো উড়তে শুরু হবে, ফাগুনের দখিনায় হবে তার ওড়নের চরম বড়াই।

মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর থেকে অলস অকর্মণ্য জীবন যাপন করতে করতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। ধান কাটার সময় এল এই যা ভরসা। শিষের প্রৌঢ়তা প্রাপ্তির দিন থেকে সবাই নজর পেতে আছে ধানে রং ধরবে কবে। খাটুনি আসবে কঠিন, ঝরঝর ঘাম ঝরবে, গায়ে হাতে ব্যথা হবে, কোমর বাঁকা হয়ে যাবে তাদের বয়স যাদের একটু বেশি হয়েছে। কাজে সুখ নেই, বড়ো কষ্ট কাজে। নতুন আলু, সোনালি আখ, শাকসবজি, বুট মটর সব কিছু কাটা তোলা ধোয়া চাঁছা বয়ে নেওয়া জোগান দেওয়ার কাজে। কাজ শুরু করার খানিক পরেই মনে হবে কী যেন নেই শরীরে—একটুখানি ছিল কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকে বাকি দিনের কাজ শুধু সহ্য করার ধৈর্য দিয়ে, বাঁধা গতিতে বাঁধা নিয়মে কলের মতো। গৌর যে এমন ব্রহ্মচারী যুবক, খেটে যাতে সুখ মেলে তা তারও যেন শরীর মনে মোটে ছটাকখানেক আছে। অকেজো দিনগুলির চাপে কাতর হয়ে পড়ে বলেই তারা কাজের কষ্ট চায়। বছরে কতকাল যে চাষির বেকার কাটাতে হয় !

সবাই নয়। নিজের ও ছেলেমেয়ে মা বোনের সরু হাড় আর অলম্ব মাংসপেশি কোনোমতে যারা টিকিয়ে রাখতে পারে তারা অন্য কাজ খোঁজে না। মজুর হতে খাঁটি চাষি মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষি পর্যন্ত। পরের জমিতে মজুরগিরিই সে করে, তবু চাষ আবাদ ছাড়া আর কিছু করে না সে চাষি।

সদয়, পচা, ছোলেমান, মৈনুদ্দিন কয়েক টুকরো জমি চষে বটে কিন্তু তাঁতও বোনে বলে তারা তাঁতি। আকবর, যদু, নাসের, সুখলাল ফসল বোনা আর ফসল তোলার সময় ছাড়া বাড়ি থাকে না, কয়লা তুলতে যায় ঝরিয়ার খনিতে, ওরা তাই কুলি। গাঁওতলিতে ঘরের লাগাও সাত কাঠা জমি আছে জগুর, তাতে জগু বরাবর লাঙল দিয়ে ফসল ফলিয়ে আসছে নিজে, কিন্তু মুচিকে কে চাষি বলবে সে জন্য, সরোজ বাঁড়ুজ্যে মুদিখানা খুলেও যখন মুদি নন।

সরোজ বাঁড়ুজ্যের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে জগু জুতো সেলাই করতে বসে, প্রায় আপিস টাইম থেকে সন্ধ্যাতক। থানা আদালত জেলখানার ফাঁকা আর সাফসুরত এলাকা থেকে মধুবনির অভিজাততম পথটি আভিজাত্য হারাতে হারাতে গোটা কয়েক মোড় ঘুরে এইখানে বাঁক নিয়ে বাজারের ঘিঞ্জি অঞ্চলে ঢুকেছে, নোংরা আর সংকীর্ণ হয়ে। বাঁকেরই আন্তরিক কোণটার ওপর বাঁড়ুজ্যের মুদিখানা—দোকানও বড়ো, বিক্রিও খুব। জগুর রোজগারও মন্দ হয় না, মাসে অন্তত পাঁচ সাতদিন শ টাকা পুরে যায়—গড়পরতা তিনদিনে একদিন জগু দু-নম্বর দেশি গিলে বাড়ি ফেরে—সন্ধ্যা পার করে রওনা হয়। অন্যদিন দিনের আলো খানিকটা বজায় থাকতেই উঠে পড়ে। বড়ো পথটা ধরেই তাকে আসা যাওয়া করতে হয়—থানা আদালত আর জেলখানার সরকারি পাড়া পেরিয়ে। জেলটা তার চেনা, ভেতরে দু দফায় কিছুকাল বাস করেছে।

বাজার আর আদালতের মাঝে পথের দু ধারে বাড়িগুলি বেশির ভাগ ভাঙাচোরা ইট বার করা সেকেলে ধাঁচের পুরোনো অথবা বদরঙা সেকেলে ধাঁচের নতুন। কয়েকটি বাড়ির চেহারা শুধু খানিক আধুনিক। সকালে ও বিকালে এ সব বাড়ির কোনো কোনোটা থেকে ডাক আসে :

এই মুচি ! মুচি !

সকালে আসবার সময় জগু ডাক শোনে, দরে বনলে জুতো সারায়। বিকালে হাজার গলা ফাটানো ডাক শুনে সে ফিরেও তাকায় না।

মরা খিদেয় আর শ্রান্তিতে মন তখন তার উদাস হয়ে আছে।

পূজা উপলক্ষে পটল এক জোড়া জুতো কিনেছিল। দু দিন পায়ে দিতেই জুতোর একটা পেরেক ডান পায়ে বিঁধতে লাগল। জুতোটা হাতে নিয়ে সে দ্যাখে, খানিকটা সোল কী করে যেন কোথায় খসে পড়ে গেছে। সস্তায় জুতো কেনার প্রায়শ্চিত্ত যে দু দিনের মধ্যে শুরু হয় পটলের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। জুতোটা সারাতে দিয়ে বাঁড়ুজ্যের দোকানের ময়লা বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ সে একটানা সেই জুয়াচোরদের গাল দিতে লাগল, মানুষকে যারা নতুন বলে পুরোনো খারাপ জুতো দিয়ে ঠকায়। তার সমালোচনার মোট কথার মানে হল, ওরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি জুয়াচোর নেই।

জগু তার কামানো চিবুক নামিয়ে ঝাঁটার মতো আছাঁটা মোটা গোঁফের নীচে হাসি ফোটায়, উল্‌ল্‌ ল্‌....। বলে, ফরমাশ দিয়ে জুতো বানান, সাতটি বছর ছুঁতে হবে না জুতো।

তুই বানাবি ?

লয় কেনে? বানাইনি কো ফরমাশি জুতো ? ঠাকুরমশায় জানে—কুকুরে যদি না লিয়ে যেত—

দু আড়াই বছরের কথা, জুতোর শোকটা সরোজ বাঁড়ুজ্যের কেটে গেছে, মুখে তাই তার কথাটা স্মরণ করে হাসি ফুটতে পায়। শক্ত লোহার মতো একজোড়া জুতো তাকে জগু বানিয়ে দিয়েছিল, কয়েক মিনিট পরবার পরেই বাঁড়ুজ্যের পায়ে আর ফোসকা পড়ার স্থান থাকেনি। জুতো জোড়া খুলে রাখা হয়েছিল চৌকির নীচে। প্রথম দিনটা পরিষ্কার বোঝা যায়নি, পরের দিন টের পাওয়া গিয়েছিল যে ঘরে বেশ একটু গন্ধ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে তিন-চারদিনে ঘর ম ম করতে লাগল সেই জুতোর গন্ধে। বাইরে বার করে রাখা মাত্র রাস্তার এক নেড়ে কুত্তা এসে একপাটি মুখে করে পালিয়ে গেল।

যদি না নিয়ে যেত—

কাঁচা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাটা জুতো বানিয়েছিল। না যায় পায়ে দেওয়া, না যায় গন্ধের চোটে ঘরে টেকা। মুচির কাছে জুতো কিনো না, খবরদার !

জগু নিজেই কথাটায় সায় দিয়ে বলল, মুই মুচি লই। জাত মুচি লই।

পটল বলল, ছাগলের চামড়া ? গোরুর চামড়া বলুন।

বাঁড়ুজ্যে বলল, গোরুর চামড়া ? খেপেছ ! গোরুর চামড়ার জুতো পরব আমি !

চামড়ার মধ্যেও সে যেন টের পায় কোনটা গোরু কোনটা ছাগল ! সবার বুদ্ধি ভোঁতা তাই রক্ষা, নইলে হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করে বসত : গোরুর চামড়া আর ছাগলের চামড়ার জুতোর তফাত জানবেন কী করে ?

এমনি সময় গৌর আর রহিমকে আসতে দেখা গেল কোর্টের দিক থেকে। গৌরের হাতে একটি দলিল।

গৌরের মুখে বজ্জাতি মুচকি হাসি। দেখলেই সন্দেহ হয় কোনো একটা দাঁও মেরেছে। গরিব চাষিমজুরের মুখে এই দাঁওমারা হাসি ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল। দেখেই কাঁচ্চা খানেক এক ঝলক বাড়তি রক্ত পটলের বুকে উঠে গিয়েছিল। চিন্তামণির জন্য তার মাথা ব্যথা নেই। তবু চিন্তামণি তো মেয়েমানুষ আর বেদখলি মাল ! গৌরের সঙ্গে কিছুদিন থেকে চেনা হয়েছে চিন্তামণির। গৌর কি তবে চিন্তামণির—?

আদুলির ভাঙা জমি পেলাম খানিক পটোলবাবু।

কিনলি নাকি ?

পটল যে বেঞ্চে বসেছিল পটলের সম্মান বজায় থাকে এতখানি তফাতে সেই বেঞ্চেই জাঁকিয়ে বসে গৌর বলল, কিনতি যাব কেনে ? ভাগ পেলাম। চাঁদকাকা কিনেছে জমি, আমি ভাগ পেলাম—ফসল সুদ্ধু। কাকা দাপড়াবে, কাটা ছাগলের মতো দাপড়াবে।

রহিমকে সে খাতির করে বিড়ি এগিয়ে দেয়। জিভ দিয়ে গোড়ার দাঁতের ফাঁক থেকে শাকের কণা খসিয়ে এনে উত্তেজনায় সামনের দাঁত দিয়ে কুট কুট কাটতে থাকে। রহিমের কাছ থেকে তার চাঁদকাকা আদুলির ভাঙা জমি কিনেছে,—তারা ভিন্ন হবার আগে। গৌর তা জানত না। এবার মাঠে প্রথম লাঙল দেবার সময়ে খবরটা শুনে মনটা তার গিয়েছিল বিগড়ে, জমি জায়গা কিনবে বলে চাঁদকাকা তবে তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে, তাকে ঠকিয়েছে ! তলে তলে সংসার থেকে সরিয়ে টাকা জমিয়েছে কাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়ে নিজে একদিন এইসব করবে বলে ! পরশু তক কাঁটাটা খচখচ করেছে গৌরের মনে। পরশু আদুলিতে রহিমের সঙ্গে তার দেখা। নেহাত বিপাকে পড়ে রহিম তার জমিটুকু বেচে দিয়েছিল, আজ সেই জমিভরা জমকালো ফসল দেখে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে, গাটা জ্বালা করছে, চোখে জল আসছে। তার হাতে কোনোবার তো এমন ফসল হয়নি। বেইমান মাটি !

রহিম। বিশ রুপিয়ায় দু আনা ফসল দিবে না ? না দিলে। খোদা আছেন। না—দিলে !

গৌর। আমায় বলছ ?

রহিম। শরম নাই, আঁ ? জমিটা দিয়ে দিলাম তোমাদের আধা দামে, পয়লা বছরের দু আনা ফসল বিশ রুপিয়ায় দিবে না ! বহুত আচ্ছা। দেখে লিব।

আদুলিতে চাঁদকাকা কার জমি কিনেছে কিছুই গৌরের জানা ছিল না। রহিমের সঙ্গে খানিক আলাপ করেই জানা গেল কাকাটা তার কত বড়ো ঠক ! ভিন্ন হবার আগে জমি কিনেছে তার কাকা তাকে ভাগ দেয়নি !

চাঁদকাকার নামে গৌর তাই নালিশ ঠুকে দিয়েছে। নিজের ভাগটা পেলেই সে রহিমকে মাগনা দু আনা ফসল দেবে।

সরোজ বাঁড়ুজ্যের হাসির শব্দে গৌর চমকে গেল। বাঁড়ুজ্যে হাসে খুব কম, যখন হাসে হাসিটা তার বাজির বোমার মতো দমাস করে ফেটে চিনা পটকার মতো পটাস পটাস ফেটে চলে। দেহের অনুপাতে গলার নালিটা তার একটু সরু।

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল !

আজ্ঞে না মুক্তারবাবু বললে—

বাঁড়ুজ্যের হঠাৎ ফাটা হাসি আচমকাই থেমে যায়। ধমকের সুরে সে বলল, মোক্তারবাবুরা অমন বলে ! আরে মুখ্যু, তোর কাকির নামে যদি জমি কিনে থাকে ? যদি বলে ভিন্ন হবার পর কিনেছে ? যদি বলে সম্পত্তি সব তার, তোকে শুধু মানুষ করেছে খাইয়ে পরিয়ে ?

মুখখানা শুকনো করে গৌর দলিলের নকল দেখায়—তাকে ভিন্ন করার প্রায় আড়াই মাস আগে চাঁদকাকা নিজের নামে জমি কিনেছে। রহিম আদালতে হলপ করে বলবে যে জমি কেনার সময় গৌর আর চাঁদ একবাড়িতে একান্নে ছিল। গৌরের বাপ এ বাড়িতে বাস করেছে স্বর্গে যাওয়া পর্যন্ত, চাঁদ কী করে বলবে যে দয়া করে আশ্রয় দিয়ে তাকে মানুষ করেছে ? নাঃ, কোনো দিকে ফাঁক নেই। সনৎ মোক্তার তাকে সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।

এবার পটলের সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে বাঁড়ুজ্যে মুচকে হাসল। রহিমের ঠোঁটের কোণেও যেন হাসি দেখা গেল একটু।

তোমার কাকা কী বলে গৌর ? পটল জিজ্ঞেস করল।

কাকার কাছে যাইনি। গৌর দুবার ঢোক গিলল, যেমন ঠকিয়েছে আমায় তেমনি জব্দ হোক।

ও, ঝাল ঝাড়ছে ? পটল বলল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে।

জব্দ তুমিও হবে। বরং বেশি করে হবে। চাঁদার সঙ্গে লড়তে পারবে তুমি ? তার চেয়ে আপসে ভাগটা আদায় করে নিতে পারলে কাকা তোমার জব্দ হত গৌর।

বাঁড়ুজ্যে এক খদ্দেরের জন্য আড়াই সের চিনি ওজন করতে করতে বলল।

আমিও তাই বলছিলাম বাবু। ও মোটে কান দিলে না। —রহিম সাগ্রহে সায় দিল।

একেবারে নালিশ ঠুকে কাকাকে শাস্তি দেবার কথা সনৎ মোক্তারের পাল্লায় পড়ার আগে গৌরও ভাবেনি। উত্তেজিত উল্লসিত অভিভূত করে সনৎ মোক্তার কী যেন করে দিল তাকে, কী যেন করিয়ে নিল তাকে দিয়ে ! এখানে এই পাকা লোক দুটির ঠান্ডা সাহচর্যে জুড়িয়ে গিয়ে ক্রমেই মনটা দমে যাচ্ছে, একটু বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। সনৎ মোক্তারের হাতে গিয়ে যে কী করে পড়ল তাও সে এখন ঠিকমত ঠাহর করে উঠতে পারছে না। তার জন্যই যেন ওত পেতে অপেক্ষা করছিল সনৎ মোক্তার, ছোঁ মেরে তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল চোখের পলকে। খানিক আগে পর্যন্ত তার মনে হয়েছিল ওর মতো ক্ষমতাবান দরদি ও শুভার্থী যেন জগতে আর নেই, এই একটি লোকের হাতে সব ভার, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে পারে !

নালিশ করার আগে রঘুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করার কথা বা মাকে একবার জানাবার কথা পর্যন্ত তার মনে পড়তে দিল না সনৎ মোক্তার!

বাঁড়ুজ্যে বলল, ফসল চাঁদা কাকে বেচে দিয়েছে জানিস ? নীলকণ্ঠবাবুকে বেচে দিয়েছে, তোদের ওই হরের্নাম নীলকণ্ঠবাবুকে।

ভয়ের জেদি সাহসে গৌর বলল, বেচে দিক না। টাকার ভাগ দেবে। সাহসটা আরও বেশি প্রকট করে দেখাতে চেয়ে রহিমকে বলল, দুআনার দামটা তোমায় দেব, তুমি ভেবো না।

আর দু জন খদ্দের এসেছে সওদা নিতে—ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরা শীর্ণ রুক্ষ একটি বৃদ্ধা আর পথে কুড়ানো তালি দেওয়া হাফপ্যান্ট পরা সাত আট বছরের একটি ছেলে। বাঁড়ুজ্যে এদের সওদা দেয় না, বাম প্রান্তে নিচু কাঠের বাক্সে বসে এদের কম কম জিনিস দেয় বদ্যি। বদ্যির চারিপাশে মুদিখানার সব জিনিসই সাজানো আছে, তবে ছোটো ছোটো পাত্রে, কম পরিমাণে। বাঁড়ুজ্যের এই আড়তের মতো বড়ো মুদি দোকানের কোণে ওখানে যেন আরেকটি ছোটোখাটো ভিন্ন দোকান করা হয়েছে। বদ্যির বাটখারাটিও ছোটো—অনেকের অধিকাংশ সওদা দিতে সেটা ব্যবহারও হয় না। এক পয়সা আধপয়সার জিনিস কি কেউ ওজন করে বেচে !

বুড়ি বলে, এক ছিদাম নুন, এক ছিদাম ধনে, আধপয়সা—

বদ্যি বলে, ছিদাম নেই গো ! আধপয়সার কম নেই।

কমাস আগেও ছিদামে বেচা ছিল। মোট এক পয়সা পুরলেই হত। কেবল বাঁড়ুজ্যের দোকানে নয়, অনেক দোকানেই। দুপক্ষেরই এতে লাভ। শাকপাতা, শুঁকা বা মেছোবাজার কসাইখানার কুড়োনো পটকা হাড় কাঁটা, নাড়িভুঁড়ি কান যাকে রাঁধতে হবে দু পয়সার তেল মশলায়, সে একটু একটু সব জিনিস কিনতে পারে। ছিদামের জিনিস বেচে দাম ওঠে দু সেরের। রমেশবাবু একবার এক ছিদামের নুন আর তিন ছিদামের চিনি কিনে কিনে পয়সা পুরিয়ে সওদা করিয়েছিলেন মোট চার আনার—এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। তারপর একসঙ্গে পয়সা দিয়ে ওজন করে কিনিয়েছিলেন এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। ষোলোবারে কেনা সমান পয়সার নুন একবারে কেনা নুনের হল অর্ধেক, চিনি তারও কম। ডগসন মাঠের এক সভায় রমেশবাবু তার এই অর্থনৈতিক পরীক্ষার কথাটা এমনভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে গৌরের ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তারপর ভেবে চিন্তে সে দেখেছে, এক আধপয়সার জিনিস কিনলে দোকানি ঠকায়, তার এবং সকলের এই জানা কথাটাই রমেশবাবু একটু অন্যভাবে জটিল করে বলেছেন।

ছিদামের কারবার এখন আধপয়সায় উঠেছে। কারণ সবচেয়ে কম দামি জিনিসও ছিদামে যতটুকু দেওয়া হত, তার চেয়েও কম জিনিস কোনো কিছুর বিনিময়েও মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।

বুড়ি বলল, তবে আদলার নুন আর আদলার হলুদ দাও।

আরেক পয়সার ?

আর নয়।

পয়সা আছে ?

বুড়ি একটা আনি বাড়িয়ে দিল। বাকি তিন পয়সা তার কীসের বরাদ্দ কে জানে !

বদ্যি মাথা নাড়ল।—দু পয়সার কম সওদা নেই।

এতক্ষণে বুড়ি গেল চটে।—নেই তো নেই। ভারী দুকান দিয়েছে।

বুড়ি চলে যায় কিন্তু আধপয়সা একপয়সা করে আনা দুআনার খদ্দের ক্রমে বাড়তে থাকে। বদ্যি ক্ষিপ্রহস্তে একটু মশলা, এক চামচ নুন, আধপলা তেল, কিছু চাল কিছু ডাল ইত্যাদি বেচতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি এত জনকে এত জিনিস এত বিভিন্ন দামে সে বিক্রি করে কিন্তু পয়সার হিসেবের জন্য তাকে ভাবতে হয় না, হিসাবে ভুলও হয় না একটা আধলার।

দেখে, চাঁদকাকাকে জব্দ করতে সনৎ মোক্তারকে, আদালত আর আদালতের লোককে দিতে যা খরচ করেছে তার জন্য বড়োই আপশোশ জাগে গৌরের। আত্মপ্রসাদের সঙ্গে জাগে—সে গরিব চাষি, কিন্তু এদের মতো গরিব নয়। এরা সব বাড়তি ফেলনা মানুষ। চাষাও নয়, কুলিও নয়।

দুধ দিতে গৌরকে আর নীলকণ্ঠের বাড়ি যেতে হয় না। দাম বাড়িয়ে দুবেলা সামনে দুইয়ে দুধ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ধর্ম সাক্ষী রেখে সকলেই নির্জলা খাঁটি দুধ কষ্ট করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, কিন্তু অপরপক্ষ কষ্ট করে এসে সামনে দুইয়ে দুধ নিতে চাইলে দর একটু বাড়াতে হয়। ধর্মের দুধের চেয়ে সামনে দোয়া দুধ বোধ হয় খাঁটি হয় বেশি।

কাজটা আয়ত্ত করেছে চিন্তামণি। ভোর যখন শুধু আবছা আঁধার তখন সে পাত্র হাতে ঘুমন্ত পুরী থেকে বেরিয়ে যায়, গৌরের সজাগ বাড়িতে পৌঁছায় আবছা আলোর ভোরে। বিকালে একটু বেলা থাকতেই আসে, সঙ্গে আনে গিন্নিমার কোলের ছেলেটাকে। ঠেলাগাড়ি চেপে বেড়াবার বয়স হয়েছে ছেলেটার।

ভোরে গৌর বাড়ি থাকে। বিকালে কোনোদিন থাকে, কোনোদিন থাকে না। ভোরে দুধ নিয়ে ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি, বাবুদের চা হবে। বিকালে সময় থাকে, পাড়ার এ বাড়ি ও বাড়ি একটু বেড়ায় চিন্তামণি। বিকালের দুধটা তার সামনে দোয়া হয় কদাচিৎ।

তাতে অবশ্য আসে যায় না কিছু। দুধে জল একটু তার সামনেই মেশানো হয়। সে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছে।

গৌরের মা খ্যানখ্যান করত, একপো কমিয়েছে টাকায়, একপো ! পোষায় বাছা দুধ জুগিয়ে এ আক্রার বাজারে ?

গৌর সায় দেয়।—ভালো মানুষ পেয়েছে কিনা, সবাই মোকে ঠকায়।

একদিন দুদিন চিন্তা করে চিন্তামণির মাথায় বুদ্ধি খেলেছে।

জল মেশাও না কেন ? যাতে পোষায় এমনি করে জল মিশিয়ে দাও !

তুমি গিয়ে লাগাবে না ?

ইস্, সাতপুরুষের কুটুম কিনা ওনারা, লাগাতে যাব ! মেশাও তুমি জল।

তার আপনপনার ঘটা দেখে গৌরের মা কুরিয়ে কুরিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ছেলে তার পুরুষ তো বটে, বিয়ে যদ্দিন না করেছে মেয়েলোক একটা ঘাঁটে তো ঘাঁটুক, সস্তা আর বাজে

মেয়েলোক। কিন্তু পিরিত জানা সোহাগ-বেতর পুরুষচাটা এ মাগির খপ্পরে পড়লে ছেলে তো তার বিগড়ে যাবে !

দুধ নিতে এসে চিন্তামণি বেড়াতে গেছে রঘুর বাড়ি, কাকার নামে নালিশ করার বিগড়ানো মন নিয়ে নিজের বাড়ি না ঢুকে গৌরও এল রঘুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। বাবুর ছেলেকে চিন্তামণি কোলে নিয়েছে, রঘুর মেয়ে তার ছোটো ভাইবোন দুটিকে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে মহোল্লাসে উঠানময় হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছে।

চিন্তামণির কাঁখে বাবুর ছেলে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে, তার খেয়ালও নেই। তার নিজের চোখে জল, ধরা গলায় সে বিরজাকে তার দুঃখের কাহিনি শোনাচ্ছে। রঘু বসেছে একটু তফাতে, তাকেও শোনাচ্ছে। দুঃখের কাহিনি কোনো জাতের কোনো মেয়ে কোনোদিন বলে শেষ করে উঠতে পারেনি। গৌর এসে পড়ায় চিন্তামণিকে থামতে হল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে হল।

গৌর তাকিয়ে থাকে। চিন্তামণির দরদ আছে তার জানা ছিল কিন্তু সে যে কাঁদতে পারে আজ এই মাত্র যেন তার সে বিশ্বাস জন্মাল একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে।

কাঁদছ কেন গো ?

কপালে আছে কাঁদছি।

এ জবাবে রহস্যের মুখ ঝামটা আছে, সেটা বেমানান হওয়ায় গৌর অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল পর্যন্ত চিন্তামণি তাকে তার সমস্ত দুঃখের কথাই বলেছে। এর মধ্যে এমন কী ঘটল তার কপালে যে বলতে গিয়ে তাকে কাঁদতে হচ্ছে ?

সব তো জানো, আর জিগ্‌গেস করছ কী ?

তখন গৌর বুঝতে পারে যে নতুন কিছু হয়নি, তাকে যে সব কাহিনি বলবার সময় সে শুধু অদৃষ্টকে শেপেছিল আর ভগবানকে বলেছিল মুখপোড়া, বিরজা মেয়েমানুষ বলে আজ তাকে সেই সব কাহিনি বলার সময় সে আজ কেঁদেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে গৌর রঘুকে বলল। তোমার কাছে এলাম রঘুদা। একটা কাণ্ড করেছি।

বটে ? রঘু বলল।

ওমা, সি কি ! বলল চিন্তামণি।

গৌর তার নালিশ করার কথা বলে, মেয়েরা উৎসুক হয়ে কাছে সরে আসে। বাবুর ছেলের কান্না থামাতে একটু আদর করেই চিন্তামণি বিরক্ত হয়ে তাকে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তাতে কান্না আরও বেড়ে গেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো উপায় না দেখে সে করে কি, কাপড়ের তলে খোকার মাথাটা ঢুকিয়ে স্তনের বোঁটা তার মুখে গুঁজে দেয়। বিরজা মুচকে একটু হাসে।

রঘু যেন আনমনে শুনে যায়, না করে কোনো আওয়াজ, না দেখায় কোনোরকম ঔৎসুক্য। একটু কেমন ঝিমিয়ে গেছে রঘু আজকাল, কেমন একটু নিরাসক্ত ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। চলতি কিছুর গতি একটু কম হওয়ার মতো জীবন্ত থাকার হাজার হাজার রকমসকমগুলি আগের চেয়ে একটু শ্লথ হয়েছে—একটুখানি। দুর্গার শোক এখনও তার থাকা সম্ভব নয়, নেইও। শোক কারও চব্বিশ ঘণ্টা থাকে না। একটা মানুষ আছে আছে হঠাৎ একটু ডুকরে কাঁদল নয় বুক চাপড়ে হায় হায় করল নয় মুখে মেঘ নামিয়ে আনল—সেটা হল শোক। বরাবর সে এমনি হলে লোকে জানত যে লোকটাই এমনি। কিন্তু দুর্গার মারা যাবার পর সে বদলেছে বলে সময় সময় মানুষ সেটা টের পাচ্ছে।

সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে গৌর বলে যায়, এদিকে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে আকাশে। সন্ধ্যার আগে বাবুর ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে মুশকিল হবে চিন্তামণির, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না শুনে সে উঠেই বা যায় কী করে ? উশখুশ করতে করতে সে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

শোনো, তোমায় বলতে ভুলে গিইছি। বাবু তোমায় ডেকেছেন !

সকালে যাব।

উঁহুঁ, আজকেই যেও। এখ্‌খুনি নয়, খানিক পরেই যেও কথাটথা বলে। যেও কিন্তু, হ্যাঁ। ভারী দরকার—বাবু বললেন, চিন্তামণি, গৌরকে সন্দের পর আসতে বোলো, ভারী দরকার।

চিন্তামণি চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে গৌর রঘুকে প্রশ্ন করল, কী করি বল দিকি এবার ?

কী করবে ? তাইতো বটে। মুশকিল হল।

ভেবে চিন্তে পরামর্শ একটা রঘু দিল, গৌরের সেটা পছন্দ হল না। মামলা যখন ঠুকেই দিয়েছে তখন মামলা চলুক, একী একটা পরামর্শ হল ! মামলা করার, সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস রঘুর, সে কি বুঝবে প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো এখন কি হচ্ছে গৌরের মধ্যে !

কিন্তু না, দুর্গা রঘুকে কাবু করে বোকা বানিয়ে দেয়নি।

আপস ? তুই বোকা গৌর ! মামলা হলে কি আপস হয় না ? আগে আপসের চেষ্টা যখন করিসনি, এখন চুপ করে থাক। সমন পেলে চাঁদ মাইতি নিজে আসবে নয়তো তোকে ডেকে পাঠাবে। তখন আপসের কথা হবে।

বিরজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, ওকে তুমি কি শেখাবে ? সাঁতরাদের ও সাতঘাটের জল খাইয়েছে।

প্রশংসায় খুশি হওয়ায় রঘুর মুখে হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে বিরজার বুক থেকে সে মেয়েটাকে টেনে নিল নিজের কোলে। মেয়েটা মাই টানছিল বিরজার, মুখ থেকে মাইটা ছেড়ে যাবার সময় একটা শব্দ হল অদ্ভুত, যুবকযুবতির সাবেগ ও স্বাধীন চুম্বনের মতো।

গৌর বিদায় নিচ্ছে, রঘু শুধোল, ফসল বেচে দিয়েছে তোর কাকা ? ব্যাপার ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না রঘু। অনেকে বেচছে। কত লোক দর দিচ্ছে, বেচার জন্য ফুসলাচ্ছে, সবুর সইছে না। মাঠের মাল বেচাকেনা হয়, এত তাগিদ কীসের এবার ?

ঠিক। আমিও তাই ভাবছি। মিল কটার তাগিদ বেশি—আর ওই ভুবন সা আর বাঁড়ুজ্যের। বেচবে নাকি ?

নাঃ। ধরে রাখছি।

হরের্নাম রাইস মিলের পুবের প্রাচীর ঘেঁষে বড়ো রাস্তা থেকে নীলকণ্ঠের বাড়ির সদর পর্যন্ত কাঁকরের সড়ক। আধখানা চাঁদের মৃদু আলোয় এই সড়ক ধরে গৌর চলেছে, প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোটো দুয়ারটির ও পাশ থেকে চিন্তামণি চাপা গলায় ডাকল, এই ! এই ! গৌর ? এই !

গৌর ভাবছিল তার সঙ্গে নীলকণ্ঠের হঠাৎ কী জরুরি দরকার পড়ল, ডাক শুনে সে চমকে উঠে ভড়কে গেল একেবারে। আরও ভড়কে গেল চিন্তামণি যখন দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ করে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল মিল অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নির্জনতায়, টিনের শেডটার গোপন আড়ালে। চমক লাগার দপদপানি কমার আগেই বুকটা তার টিপটিপ করতে লাগল অসম্ভব কল্পনায়।

মিলের কাজ একরকম বন্ধ হয়ে আছে আজকাল, যদিও নতুন ধান নিয়ে জোর কাজ আরম্ভ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। পাকা উঠানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে ধানের মরাইয়ের চালার মতো ধানঢাকা মটকাগুলি—শেডের ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় রহস্যের মতো কিছু একটা নিশ্চয় চাপা দেওয়া আছে ওগুলির তলে, তলার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এসে যা উঠানময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে চোখের ধাঁধার মতো।

কী সে না শুনেছে আর কী সে না জানে নারীপুরুষের ব্যাপার ? তবু ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্প. হতে থাকে গৌরাঙ্গের। মানুষ কী বলে আর কী করে মেয়েমানুষকে নিয়ে এ অবস্থায় ? চিন্তামণি যদি হেসে ফেলে ! চিন্তামণি যদি নীলকণ্ঠের সেই বড়ো মেয়ে তরুবালার মতো গালে তার টোকা মেরে বলে, আ মরণ !

রাগ করেছ ? বাবুর নাম করে ডেকে এনেছি বলে ?

উঁহুঁ, না,

ওদের সামনে কী করে বলি আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তাই তো বাবুর নাম করলাম।

বাবু ডাকেনি ?

না গো না। আমি ডেকেছি, সব শুনব বলে। না শুনে যে চলে এলাম। তবু কত কথা শোনালে মাগি একটু দেরির জন্যে, দাসী বই তো নই ! তারপর কি হল ? ওই যে বলছিলে ফসল বিক্রি করে দিয়েছে না কি করেছে তোমার কাকা ?

গৌর একটু ধাতস্থ হয়। একটু জ্বালাও বোধ করে কেমন এক ধরনের।

এই জন্যে ডেকেছ ? সকালে শুনলে হত না ?

রাতে ঘুম হত ভেবেছ আমার ?

শুনে দেহমন যেন চোখের পলকে উল্লসিত হয়ে সাম্য লাভ করায় গৌরের ভয় ভাবনা উপে গেল। উঁচু টানে বাঁধা তারের মতো টনটন রনরন করতে লাগল সে।

সহজ সরল ভাবে সে বলে গেল সব কথা। রঘুকে যতটা বলেছিল তার চেয়ে বেশি, অন্য ভাষায়, অন্য কায়দায়। তার ভয় ভাবনা আপশোশের কথা সে বর্ণনায় আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে গেল।

চিন্তামণি জোর দিয়ে বলল, না মামলা কোরো না। কাল গিয়ে বাতিল করে দিয়ো নালিশ। আপসে যদি ভাগ পাও তো পাবে নইলে কাজ নেই।

টাকাটা মাঠে মারা যাবে নালিশের।

বোকার মতো কাজ করলে ওমনি যায়।

অত বেশি অন্তরঙ্গ আপনজনের মতো চিন্তামণির এই বকুনি শুনে গৌরের সাহস যেন বেড়ে গেল। শেডে ভেজা ধানের পচাটে গন্ধ অনুভব করতে করতে ফাটল ধরা চোকলা ওঠা সিমেন্টের নোংরা মেঝেতে ঘষরে গিয়ে সে চিন্তামণির গা ঘেঁষল। চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলে বলল, আ মরণ !

চার

ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ঋণের বোঝায় চাষি কাতর। ফসল ঘরে তোলা তক ক টা দিনও কিছুতে কাটাতে না পেরে এখনও বাজু পইছা ঘটি বাটি বাঁধা পড়ছে। পেট ভরে ক জনেই বা কবে তারা খায়, এখন তাতেও টানাটানি পড়েছে ফসল তোলার আগে, সিকি থেকে আধেক নেমে গেছে সেই অ্যাতটুকু খোরাক। মাটির কুঁড়েয় ক জনেই বা কবে তারা হাসে, এটুকু তবু যে ভোঁতাটে খুশি খুশি দেখাত তাদের মুখ সে মুখে ঘনিয়েছে প্রাণহানিকর বিমর্ষতা। মাঠে মাঠে এমন যে ভালো ফসল হয়েছে এবার, তা দেখেও না জুড়োচ্ছে তাদের চোখ, না থামছে দেহমনের পোষমানা শান্তশিষ্ট নালিশ-ভোলা জ্বালা। এমন দিনে চাষি হয়েও গৌরের মনে কিনা থইথই করছে মহুয়ার মিঠে নেশার মতো সুখের মাতলামি ! একটা মা নিয়ে তার সংসার, সে সংসার ঘাড়ে চেপেছে এই সেদিন, সে কী জানবে চাষ করে বাঁচার কত মজা ! চাঁদ বেশ কৃপণ আর হিসেবি। তার সাথে থাকার সময় বরং

গৌর খানিক খানিক স্বাদ পেয়েছে গরিব চাষির পরার খাওয়ার কষ্টের। শুধু ওই কষ্ট, মনের কিছু নয়। অনেকের দায়িক হয়ে অবিরাম ঠ্যাঙানো খাওয়া ভীরু মন ভাবনার ভারে যে ভাবে ধুঁকতে থাকে সেটা সে এখনও শিখতে পারনি। কম করে শ খানেক ও রকম আধমরা মানুষের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে, তবু। চাঁদকাকার কাছে ভাগ পেয়ে সবে ভিন্ন হয়ে মা আর গাইটা পুষে সে একরকম সুখেই আছে এখনও। গাইটিও আবার রোজগেরে। অঢেল প্রেমে গা ঢেলে দিতে তার বাধা কই ?

চিন্তা বলে যায়, আজ যেয়ো।

বলে যায় সাঁঝের আগে। তারপর সন্ধ্যা নামে তো রাত আর বাড়ে না গৌরের। মন যত চনমন করে অধীরতায়, গা যেন ততই থমথম করে ধৈর্য ধরার জ্বরে। সেদিনের চাঁদ ক্ষয়ে গেছে অনেকখানি, মাঝরাত্রি পেরিয়ে তবে ওঠে। মাঝরাত্রির অনেক আগেই গৌর তারার আলোয় পথ দেখে রওনা দেয় হরের্নাম রাইস মিলের দিকে।

মা বলে, কুথা যাস বাবা ? রেতে ?

রঘুর সাথে সলা আছে।

দরজার হুড়কো খোলা তক মা চুপ মেরে থাকে। তারপর আচমকা বলে, বিয়া করলে হয়। রেত বিরেতে বাইরে যাওয়া ভালো না বাবা। বাইরে যেতে নিষেধ করা নয়, সমালোচনা নয়। একটু বিবেচনা করতে বলা, ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে দেখতে বলা যে একটা বিয়ে করলেই যখন চলে, এত হাঙ্গামায় কাজ কী।

ও সব কিছু না। কপাট দে।

তা বটে। বিয়ে একটা করলে হয়। চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে কথাটা বেশি করে গৌরের মনে জাগছে, মার মনে পড়িয়ে দেবার কোনো দরকার ছিল না। বিয়ে করার মানেও যেন তার কাছে বদলে গেছে, একটা অস্পষ্ট অভাব বোধের চাপ পরিণত হয়েছে নতুন পিরিতের মন-কেমন করা ঔৎসুক্যে। চিন্তামণির জন্য সারাদিন তার ছটফট করার ভাগ কচি বয়সের বাড়ন্ত বউদের পাওনা হচ্ছে, তাকে তারা টানছে চিন্তামণিকে নিজেদের টান ধার দিয়ে। নইলে চালকলের দিকে রওনা দিয়েও যার জন্য রওনা দেওয়া সেই একজনকে ছাড়া তার কেন মনে পড়বে ভোলার মেয়ে কালী, রঘুর ভাগনি পাঁচি, কেষ্ট শম্ভু পরাণ রসিকদের নতুন বউ আর দাঁতপুরে তার মামাবাড়ির পাড়ায় যে একটা মোটাসোটা মেয়ে থাকে, এদের কথা ? এ সব ভালো লাগে না গৌরের। ভেসে যাওয়ার সুখে মশগুল হয়ে তীরে ওঠার কথা ভাবে, একি জলের বানে ভাসা নাকি তার, অ্যাঁ ?

চাষির গাঁ কখন ঘুমিয়েছে, তার কত পরে বাবুর বাড়ি সংসারের পাট শেষ হয়ে ঘরে ঘরে আলো নিভেছে আন্দাজ করে সে পথে বেরিয়েছে। হয়তো এই একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষার উত্তেজনা শেষ হওয়ার সময় এসেছে বলেই মনটা তার বিমর্ষ হয়ে ঝিমিয়ে যায়। এ প্রণয় তার জুড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে একটা তামাশায় দাঁড়িয়ে যাবে ? সে তামাশা আজ কি গৌরের সয় !

ঘেরা শেডের নীচে পচা ধানের গন্ধ পারে না, কিন্তু তারপর চিন্তামণি এলে তার একরাশি চুলে পচা নারকেল তেলের গন্ধ তাকে বাঁচায়। চোখের পলকে সে টের পায় চিন্তামণিকে ছাড়া সে তো বাঁচবে না !

কিছু রাত হাতে রেখে চিন্তামণি বলে, ইবারে এসো। এট্টু না ঘুমোলি বাঁচব নি।

শক্ত মেঝেতে শুধু একটা চাদর বিছানো বালিশহীন শয্যা ছেড়ে গৌর উঠতে চায় না। বেজার হয়ে বলে, কাল ঘুমিয়ো, দুকুর বেলা।

চিন্তামণির হাসির সঙ্গে হাই উঠে।—কাজ নেইকো ? মোর কাছে বাচ্চা দুটো গছিয়ে গিন্নিমা দুপুরে ঘুমোয়। মজার কথা বলি শোন, ঘুমুলে গিন্নিমার নাক ডাকে ! মাইরি বলছি—তোমায় ছুঁয়ে।

মেয়ে মানষের নাক ডাকা ! হাসি যা পায়। আবার হাই তুলে চিন্তামণি বলে, দিনভোর খাটতে হয়। ঘুম পাচ্ছে, সত্যি। দুটি ভাতের জন্যে দেহ পাত করে খাটছি। ভাতার তো নেই দুটি ভাত জোগাবে পোড়া পেটের জন্যে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে এই কথাটা দু-একবার বলে চিন্তামণি, তার কেউ নেই বলে পেটের জ্বালায় দাসীগিরি করে তার জীবন গেল। শুনে মন খারাপ হয়ে যায় গৌরের। দরদ আর সহানুভূতিতে বুকটা তার ব্যথা করে।

সত্যি, পরের খাওয়া বড়ো কষ্ট।

এত রাতে আদর দিয়ে তার এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা চিন্তামণি কাঠ হয়ে গ্রহণ করে। তারপর সে এলিয়ে যায়। তারও পরে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।

গৌর প্রথমে শুধোয়, ঘুমোলে নাকি ? তারপর চোখের জলের সন্ধান পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে তার কান্না কেন, কীসের জন্য। শেষে গভীর দুঃখে আর অভিমানে কাতর হয়ে উঠে বসে বিড়ি ধরায়, নিজের হাঁটু মোড়া পা দুটিকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে।

তখন এক কাণ্ড ঘটে অদ্ভুত। তার পায়ের পাতায় হাত রেখে সলজ্জ খেদের সুরে চিন্তামণি বলে, মাপ করো। শুনছ ? মাপ চাইছি তোমার ঠেঁয়ে। আর কিছু চাইনে আমি, সত্যি চাইনে। যদি চাই তো খান্‌কি বোলো মোকে।

ঘুমে যে ঝিমিয়ে গিয়েছিল এমন হঠাৎ তার আবেগের তীব্রতায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গৌরের। পা ছেড়ে মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে চিন্তামণি যে এক মুহূর্তে যুবক গৌর নিজের কাছে শিশু হয়ে যায়।

ভোরের আগে একটু শীত শীত ভাব দেখা দিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে শ্রান্ত অবসন্ন মন দিয়ে গৌর বুঝবার চেষ্টা করে, তার কাছে কী চায় না চিন্তামণি, কী চাইবে না কখনও। এর মধ্যে কোনোদিন সে কি কিছু চেয়েছিল তার কাছে, কোনো আবদার জানিয়েছিল, সে কানে তোলেনি ? সে কি পয়সা কড়ি চায় তার কাছে ? কাপড় গয়না ? মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করতেও খেয়াল হয়নি বলে গৌরের আপশোশের সীমা থাকে না।

পরদিন দুধ নিতে এলে দেখা গেল চিন্তামণির মুখ চোখ ভারী দেখাচ্ছে। এক নজর তাকিয়েই গৌরের মনে হল সে ভয়ানক রাগ করেছে, মুখ ভার করে আছে দুরন্ত অভিমানে। তাদের ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু যে ঘটতে পারে জগতে গৌরের আজকাল সেটা খেয়াল হতে চায় না।

না না। রাগ করিনি। গিন্নিমাকে ফাঁকি দিয়ে দুকুরে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছি। তুমি বললে না কাল ?

জ্বরজারি হয়নি তো ?

এট্টু হয়েছে। দুধ দোয়া বন্ধ করে গৌর ফিরে তাকাতে সে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হেসে বলল, পিরিতের জ্বর গো। তোমায় দেখে সারল।

গাই বাছুরের গা চাটে, দুধের পাত্রে চোঁক চাঁক শব্দ হয়, মৃদুস্বরে তারা আলাপ করে। গৌরের প্রশ্নের জবাবে চিন্তামণি গভীর এক রহস্য সৃষ্টি করে জানায় যে কই, সে তো কিছু চায়নি গৌরের কাছে। কিছু যদি তার চাওয়ার থাকেই, গৌর নিজে থেকে তাকে তা দেবে, সে চাইতে যাবে কেন ! তবে কিনা, একটু ভয় করছে চিন্তামণির, এ ভাবে কতদিন তাদের দেখাশোনা চলবে ? রোজ তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে গিন্নিমা বোধ হয় সন্দেহ করেছে মনে হয়। এমন করে তাকাচ্ছে গিন্নিমা আজ কদিন থেকে, এমন সব কথা বলছে তাকে বকবার সময় !

আজ আবার পটলবাবু মস্ত একটা তালা সেঁটে দিয়েছে মোদের ঘরটার কপাটে।

জেনেছে নাকি পটলবাবু ?

গৌরের বিবর্ণ মুখ দেখে আর সচকিত প্রশ্ন শুনে চিন্তামণি খানিক তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, শেষে নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিয়ে বলল, নতুন ধান আসবে বলে তালা দিতে পারে।

জানাজানি হলে মুশকিল।

কী মুশকিল। কার মুশকিল ! তোমার নাকি ?

গৌর চুপ করে থাকায় সে আবার বলল, তুমি তো পুরুষ মানুষ।

পাকা লোক হলে গৌর মনে করিয়ে দিতে পারত যে সে বিদেশিনি, শুধু দেশে ফিরে গেলেই যার আসান হয় সে আর এমন কী মুশকিল ! অত হিসাব গৌর এখনও শেখেনি।

তোমার আমার দুজনেরই মুশকিল। তুমি কী করবে ?

কী আর করব, দেশে চলে যাব।

তা বটে। চিন্তামণির সে উপায় আছে। আটকা পড়বে সে, তার তো পালাবার পথ নেই। অবেলার ঘুমে চিন্তামণির ভারী মুখ যে অন্ধকার হয়ে এসেছে গৌরের আর তা নজরে পড়ল না। নিজের মুখ তার শুকিয়ে ছোটো হয়ে গেছে। তার গোপন প্রেমের অনেকগুলি বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনা আচমকা হুড়মুড় করে তার বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাড়ে এসে পড়ায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুরে ফিরে একটা কথাই কেবল তার মনে পড়তে থাকে যে এ শুধু তার চাষির সমাজে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের জানাজানির ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে যোগ আছে বাবুদের। চিন্তামণিকে মধুবনাতে নিয়ে এসেছে পটলবাবু। বাবুরা যদি তাকে শাস্তি দেয়, যদি বিপদে ফেলে, যদি জেল খাটায়, জানাজানি হয়ে গেলে ! চাষির সমাজে তার শুধু একটু দুর্নাম হবে, কিন্তু বাবুরা রাগি, মানী, নিষ্ঠুর মানুষ, প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের গায়ের জ্বালা কি জুড়োবে সহজে !

পরদিন সকালে গৌর মামাবাড়ি রওনা হয়ে গেল। তার মনে হল, কদিন একটু দূরে গিয়ে থেকে আসাই ভালো। রঘুকে বলে গেল, মাকে যেন দেখাশোনা করে, গরু দুইয়ে দুধ যেন জোগাড় দেয় বাবুর বাড়ি।

মামাবাড়ি হঠাৎ কেনে ?

বড়োমামা একটা বাছুর দেবে বলেছিল, নিয়ে আসি।

গৌরের মামাবাড়ি দাঁতপুরে। বাসে প্রায় আধঘণ্টার পথ পৃথীপুর, সেখান থেকে দুকোশ দূরে সিউতি নদী পেরিয়ে দাঁতপুর। নদী খুব চওড়া কিন্তু মোটেই গভীর নয়, দুটি তীর নদীর তল থেকে মানুষ সমান উঁচু হবে কি হবে না। বর্ষার ক মাস নদীতে লাল জলের স্রোত বয়ে যায়, ময়লা থিতিয়ে জল পরিষ্কার হতে না হতে জল যায় ফুরিয়ে। এক তীর ঘেঁষে ছোটো একটি ঝরনার মতো স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে যায়, নদীর বিস্তীর্ণ সমতল বুকে বালি চিকচিক করে।

বাস আজকাল বন্ধ। ট্রেনে চেপে গৌর সিউতি নদীর পুল পেরিয়ে সানকানি স্টেশনে নামল। এদিকে শালবন বেশি, ছোটো স্টেশনটির লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে কিছুদূর গিয়েই রেললাইনের দু পাশে শালবন শুরু হয়েছে।

স্টেশনের বাইরে একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো কোথায় কুলির কাজ করতে যাবে, রান্না-খাওয়ার জন্য এ বেলা এইখানে ঠাঁই গেড়েছে। কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে, কুপিয়ে কাটা হচ্ছে মোটা একটা ঢ্যামনা সাপ। রান্নার এই মাটির হাঁড়িকুড়ি সব সঙ্গে নিয়েই এরা রওনা দেবে, পুরুষ ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা টানবে শালপাতা পাকানো মোটা বিড়ি, মায়েরা কাপড় দিয়ে শিশুদের বেঁধে নেবে পিঠে। সাঁওতালদের চাষের কাজ অতি সামান্য, বনের ধারে বা বনের মধ্যে জঙ্গল সাফ করে যেমন তেমন খানিক ফসল ফলায়, তাও সকলে নয়। তবু এদের বড়ো ভালো লাগে গৌরের, জন্ম থেকে এদের চলাফেরা চালচলন দেখে এলেও ওরা তার মনে একটা

রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে, একটি ছিপছিপে কিন্তু পরিপুষ্ট সাঁওতালি মেয়েকে বিয়ে করার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আজও তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। অমন মেয়ে চাষির ঘরে জন্মায় না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক বেলায় মামাবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গৌরের কানে এল একক একটি শানাইয়ের সুর। শানাই শুনলে গৌরের মন কেমন উদাস হয়ে যায়, মনে হয় বাকি জীবনটা ঠাকুরদেবতাকে ভক্তি করে, গুরুজনকে মান্য করে আর পরস্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে কেবল ভালো কাজ করে কাটিয়ে দেওয়া চাই। সে মরলে সবাই যেন বলে, লোকটা বড়ো ভালো ছিল গো।

গৌরের মামাদের মস্ত সংসার, পায়ের ধুলো নেওয়া দেওয়ার পালা সাঙ্গ করে গৌর শুধোল, শানাই বাজে কার বাড়ি গো ?

কুনুর মেয়্যার বিয়া—লক্ষ্মীর। সেই যে মুটকি মেয়েটা ঘন ঘন আসত মোদের বাড়ি—

বটে ?

বর আজ এসে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। আজ কুটুম ভোজন কাল স্বজাতি ভোজন হবে। কুনুর নাকি ভয়ানক ফাঁকি দেবার মতলব আছে শোনা যাচ্ছে, দই চিঁড়ে আর মোটে একটা করে মিষ্টি দিয়ে সেরে দেবে। জোড়া মিষ্টি না দিলে গোলমাল হবে শোনা যাচ্ছে। কুটুমদের দেবে জোড়া মিষ্টি আর মোয়া, স্বজাতির বেলা শুধু একটা মিষ্টি—সইবে কেন স্বজাতিরা !

তোর বিয়েতে নুচি খাব গৌর।

বড়োমামি ক্ষীণকণ্ঠে বলল। বড়োমামি জীবনে আঁতুরে গিয়েছে সতেরোবার, একটা বয়সে স্ত্রীলোকমাত্রেরই সন্তান ধারণের ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবার ব্যবস্থা বিধাতার না থাকলে হয়তো আরও দু-চারবার যেত। সতেরোটি এলেও আটটি সন্তান অতি শৈশবে এবং দুটি অল্পবয়সে চলে গিয়েছে তাই রক্ষা। সাতটির মধ্যে তিনটি মেয়ে পরেরা ঘরে নিয়ে পুষছে, তাও রক্ষা। তাছাড়া, সবগুলি এসে পড়বার আগেই বড়ো দুটি ছেলে পর পর বড়ো হয়ে পর পর রোজগার করতে শিখেছে। শেষ বিয়োনোর পর দু-বছর কেটে গেছে, কেন বেঁচে আছে না জেনেই বড়োমামি টিকে আছে ক্ষয়রোগিণীর মতো জীর্ণশীর্ণ শরীর নিয়ে। জ্বর হয় মরে না, কাশি হয় মরে না, হজম না হওয়ায় প্রায়ই কাপড় বিছানা নষ্ট করে আর নিজের মনে অনর্গল কথা বলে বেঁচে থাকে।

বড়োমামা অদ্বৈতের বয়স ষাট হবে। চুলটুল পেকে সে বুড়ো হয়নি কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছে।

তার অসাধারণ কৃষ্ণভক্তির কথা দাঁতপুর আর আশেপাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে। কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে কৃষ্ণলীলার যাত্রার গান ভেঙে চুরে গাইতে গাইতে দুচোখে তার জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে !

এত লোকের মধ্যে সেই প্রথম উদাসীন আপনভোলা সুরে গৌরের আসবার কারণ জিজ্ঞেস করল।

বাছুর ? বকনাটা ? তোকে দিব কথা ছিল নাকি বটে ?

ছিল না ? মাকে না-হোক বিশবার বলেছ দুধ ছাড়লে পাঠিয়ে দেবে মাস দুয়েকের মধ্যে নয়তো খবর দেবে, আমি এসে লিয়ে যাব। ও বাছুর আমার মামা, দিতে হবে, চালাকি নয়, হাঁ।

অদ্বৈত চোখ বুজে গদ্গদ হয়ে বলল, অ গৌর, তোর ভাগ্যি ভালো, বড়ো ভালো তোর ভাগ্যি।

গৌর সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল, কীসে ?

বাছুরটি প্রভু গর্‌হন করেছেন।

অদ্বৈতের গুরুঠাকুর এসেছিলেন মাঝখানে, যাবার সময় পাটল রঙের বাছুরটির গলার দড়ি স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করে নিয়ে গেছেন। বাছুরটি আগেই যখন গৌরকে দেওয়া হয়েছিল। পুণ্যটা তারই হয়েছে সন্দেহ কী !

জানিস গৌর, অ বাবা জানিস ? বলি শোন তোকে। শোন কী অবাক কাণ্ড। যাবার আগে বলা নেই কওয়া নেই প্রভু তোর কথা শুধোলেন। তখন টের পাইনি, আজ জানছি, তেনা জানতেন। কিরপা করলেন তোকে। ভক্তির লেশটুকু তো মনে তোর নাই কিনা তাই তোর বাছুরটি গর্হন করে তোকে কিরপা করলেন।

গৌরাঙ্গ থ বনে থাকে, আপশোশে আর বিস্ময়ে। কুনুর মোটাসোটা মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে শুনে মনটা তার মস্ত একটা ক্ষতি বোধের চাবুক খেয়ে ছ্যাঁত করে উঠেছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ছিল ন্যায্য পাওনা ফসকে যাওয়ার ক্ষোভ। এ আরেকটা ক্ষতি, পাওনায় ফাঁকি পড়ায় কিন্তু ভালো করে ক্ষুব্ধ সে হতে পারল না। তার বাছুরটি একজন বাগিয়ে নিয়েছে ভেবে সে রেগে উঠতে যায়, কিন্তু সেই একজনটি এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে মামারা তাকে বাছুরটি দিয়েছে একথা না জেনেও জানতে পারেন বলে রাগ আর তার করা হয় না।

পুঁইডাঁটার চচ্চরি আর কুচো চিংড়ির টক দিয়ে তিনটে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে সে ভাত খায়। কাঁসার ভাত শেষ করে একবার চেয়ে ছোটো একমুঠো ভাত পেয়েও আবার সে ভাত চাইতে তার মেজো সেজো দুই মামি মুখ চাওয়াচাওযি করে আজ দুজনেই প্রায় একসঙ্গে অনেক দুঃখের পোড়া একটু হাসি হেসে গৌরকে আরও ভাত দেয়। ভাগ্নে এসেছে মামার বাড়ি, নিজেরা উপোস দিয়েও তার পেটটা ভরাতে হবে বইকী মামিদের।

গৌরের মামাদের অবস্থা চিরদিনই মন্দ, দুর্বৎসরে বড়ো কষ্টে দিন যায়। কিন্তু মানুষ তারা পরম শান্ত, সন্তুষ্ট এবং ধার্মিক, একান্নবর্তী আদর্শ চাষির পরিবার। গোঁয়ার শুধু গৌরের ছোটো মামা রাধাচরণ। তার ঘরে মন নেই, চাষে মন নেই, গাঁয়ে মন নেই। বছরে দু-তিন মাসের বেশি সে বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়, কী করে স্পষ্ট করে কোনোদিন সে কিছু বলে না, হঠাৎ একদিন কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি আসে, বাকি খাজনা বা ঋণ বা অন্যান্য আপদ-বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় সংসারকে তখনকার মতো, কিছুদিন পরে আবার উধাও হয়ে যায়।

অদ্বৈত বলে, মজুরগিরি করে নির্ঘাত, কুলি খাটে। চেহারা দেখছ না মজুরের মতো হচ্ছে দিনকে দিন ?

কেউ বলে, মজুরগিরি করে টাকা আনবে, ইস রে !

অদ্বৈত বলে, ভারী টাকা। বিশ-পঁচিশটার বেশি টাকা এনেছে কোনোবার ?

গৌরের এই ছোটো মামাটির একখানি চিঠি এসেছে অদ্বৈতের নামে দিন তিনেক আগে, এখনও সেই চিঠি নিয়ে পাড়াসুদ্ধ মামার বাড়িটি সরগরম হয়ে আছে। কলকাতার কাশীপুর থেকে শতকোটি প্রণাম দিয়ে রাধাচরণ নিবেদন জানিয়েছে যে চার চারটে জোয়ান মদ্দ পুরুষের বাড়িতে বসে থাকার কী দরকার আছে বাড়ির ভাত ধ্বংস করে ? বড়ো আর মেজো ভায়ের বয়স বেশি—তারা ঘরে থেকে চাষ আবাদ দেখুক, তার সেজোভাই আর জোয়ান ভাইপোরা চলে যাক তার কাছে সেই কলকাতার কাশীপুরে, কাজ করে রোজগার করুক তার মতো। সে কাজ জুটিয়ে দেবে।

গৌরের কৌতূহল জাগে। কী কাজ লেখেনি কো ?

লিখবার দরকার ? মজুরগিরি, কুলিগিরি কাজ, আবার কী। জানিস গৌর, পরভু বলেন, ওটা কংসের সম্বন্দির অবতার, আমার ওই ভাইটা। সংসারটা ওই ছারেখারে দেবে। বাপের কোনো অভাব ছিল মোদের ? জমিজমা, গাইগরু, গাছপুকুর সব ছিল সে থাকার মতো। ওটার জম্মো থেকে অবস্থা পড়তে লাগল মোদের।

নামজপের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈতের ঠোঁট নড়তে থাকে।

জবাব দাওনি কো ?

দিব। জবাব দিব।

গৌরের জোয়ান জোয়ান মামাতো ভাই রাখাল, প্রসাদ, কানাই বংশীরা মুখ বাঁকায় আর হাসে, হাসে আর মুখ বাঁকায়। ওরা প্রায় সকলেই জোতদার ভূষণ নন্দীর মজুরি করে—জমিতে, চাষের কাজে।

কুনুর বাড়ি শানাই বাজায় চণ্ডী। সস্তা শানাই, খাওয়া আর দৈনিক চার আনা। শানাই বাজানো চণ্ডীর ব্যাবসা নয়। বাড়িতে একটা বাঁশি আছে, আশেপাশে গাঁয়ের কেউ ডাকলে বাজিয়ে আসে। পোঁ ধরারও কেউ তার সঙ্গে থাকে না। তবু তার সেই বেসুরা বেতালা শানাই গৌরকে উতলা করে দেয়। রাত্রে চাটায়ে শুয়ে শানাইয়ের সুর কানে না এলেও ব্যাকুলতা তার বেড়েই চলে। হাঙ্গামার ভয়ে গন্ডগোলের প্রথম চোটটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই সে যে পালিয়ে এসেছে এ চিন্তাটিকে সারাদিন আমল দিতে অস্বীকার করেই নিজের কাছে সাফাই গাওয়ার প্রয়োজনকে সে এড়িয়ে গেছে, এখন ভণ্ডামি তার ভালোও লাগে না, কাজেও লাগে না।

চিন্তামণির দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নীলকণ্ঠবাবু তাড়িয়ে দিলে সে হয়তো তার বাড়িতে আসবে তার খোঁজে, কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়ে সে মামাবাড়ি চলে গিয়েছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। ভাববে, এমনই হয়, গৌরের মতো লোকের সঙ্গে পিরিত করলে এমনই হয় শেষতক।

মামাদের সঙ্গে সে দুপুরে কুনুর বাড়ি ফলার করতে গেল। বিয়ে আজ গোধূলি লগ্নে কিন্তু জাতভায়েরা অনুমোদন না করলে বিয়ে হতে পারবে না। দুপুরে সকলের ভোজনটা হবে অনুমোদন ! প্রায় জন ত্রিশেক লোক হয়েছে, ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে। এদের মাতব্বর নবকান্ত মাইতি। তারই আশেপাশে এলোমেলোভাবে বসে বয়স্করা জোড়ায় দু-জোড়ায় নানা কথা আলাপ করছে আর মাঝে মাঝে খিদেয় কাতর ছেলেমেয়েগুলির ওপর খিঁচিয়ে উঠে চড় চাপড় মারছে। কুনু দুবার জোড় হাতে সকলকে তাগিদ দিয়েছে কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে খেতে বসেনি। খিদে পেয়েছে সকলেরই, খিদে নিয়েই সকলে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে সবাই যেন একান্ত উদাসীন !

কুনু আবার আসে, বলে, বেলা যে অনেক হল ! দয়া করে গা তুলতে আজ্ঞা হয় মাইতি মশায়।

এবার নবকান্ত বলে, কুটুমদের নাকি একগন্ডা মিষ্টি মিলেছে কুনু ?

একগন্ডা ? কুনু কপালে চোখ তুলে জবাব দেয়, একটোর বেশি মিষ্টি দেবার খেমতা আছে যে দেব ? একটা মিষ্টি দিইছি, নার্কলে। আপনাদের জন্যে চন্দ্রপুলি আর মোয়া।

মোয়া ?

মুড়কি নয়তো মোয়া, যার যা পছন্দ।

কটা মোয়া ?

কুনু একটু ভাবে। চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়।

দুটো মোয়া। মোয়ার বদলি পোয়া মুড়কি।

তখন সকলে গাত্রোত্থান করে খেতে গেল। কুটুমদের সমান সম্মান আদায় করা হয়েছে, এখন আর ভোজন করতে অপমান নেই।

দাওয়ায় বসে খেতে খেতে লক্ষ্মী বার তিনেক গৌরের নজরে পড়ল। কাঁচা হলুদ মাখিয়ে মাখিয়ে তার নিজের বাদামি রঙ মেয়েরা প্রায় লোপ করে দিয়েছে। কেমন শুদ্ধ আর পবিত্র দেখাচ্ছে মোটা মেয়েটাকে।

গৌর তাকে না বলে আচমকা মামাবাড়ি চলে গিয়েছে শুনে প্রথমটা চিন্তামণি রাগে অভিমানে চারিদিক অন্ধকার দেখেছিল, তারপর ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়ে তার নিজেরই মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেছে। এমন ভীষণভাবে কোনো মানুষের কাছে ধরা পড়ার স্বভাব

তার নয়। গৌরকে নিয়ে নিজেকে একেবারে বেমালুম ভুলে যেতে বসেছিল, কী এমন মানুষটা গৌর ? চালচুলো ছাড়া কীইবা আছে ওর যে ওকে নিয়ে মেতে থাকলে তার সুখের সীমা থাকবে না ? কী প্রত্যাশা আছে ওর কাছে ?

অন্তত কদিনের জন্য গৌর দূরে চলে গেছে, দিনান্তে তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হবার সম্ভাবনাও এখন নেই, এটা খেয়াল করার সঙ্গে চিন্তামণি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল, মনটা তার কীভাবে গৌরময় হয়ে উঠছিল দিন দিন। ঘুম ভেঙে সে ভাবতে আরম্ভ করত গৌরের কথা, দেখা হলে কী বলবে, কী করবে আর কী হবে এই কথাই ভাবত বিভোর হয়ে সারাটা দিন। বাড়ির গিন্নি আর তার মেয়ের কাছে এ জন্য কতবার যে বকুনি খেয়েছে। যা হয়েছে তার জন্য চিন্তামণির কোনো আপশোশ নেই। অপরূপ স্বপ্ন দেখার আনন্দেই বরং হৃদয় তার ভরাট হয়ে আছে। গৌরের কথা সে এখনও ভাববে, গৌরের জন্য যে মন কেমন করছে তাও মানবে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আর নয়। একটু সামলে নিতে হবে নিজেকে, চারিদিকে তাকাতে হবে। দু-একজন যে কামনা করছে তাকে, অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায় এমন দু-একজন, তাদের সম্বন্ধে এমন উদাসীন হয়ে থাকলে তার চলবে না। গোপনে দু দণ্ড দেখা দেওয়া ছাড়া গৌর তাকে কিছু দেবে না সে জানে। তাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বসবাস করার সাধ্যও বোধ হয় গৌরেব নেই। সাধ থাকলেও ভরসা পাবে না। জানাজানি হবার আশঙ্কায় গৌরের মুখ সেদিন কী রকম পাংশু হয়ে গিয়েছিল চিন্তামণি তা ভুলতে পারেনি।

এই জ্বালাটাই তার বেশি। জোয়ান ছেলে, মা ছাড়া সংসারে কেউ নেই, কোথাও কারও কাছে বাঁধন নেই কোনোরকম, তাব কেন এত ভয় তাকে নিয়ে ঘর করার, তাকে ভাত কাপড় দেবার ! পটলের অস্তিত্বই সে একরকম ভুলে গিয়েছিল। চিঠিপত্র লেখা আর পড়ার কাজটা আজকাল তার গৌরই করে দিত— পটলের মতো অনায়াসে অবশ্য নয়, অতি কষ্টে। প্রত্যেক চিঠির দু-দশটা কথা সে তো পড়তে পারেনি। চিন্তামণি যেচে পটলের সঙ্গে আবার আলাপ জমায়। বলে, কথাই দিকি বলেন না পটলবাবু।

পটল বলে, যা তোমার দেমাক।

মুখখানা কাঁদোকাঁদো করে চিন্তামণি করুণ সুরে বলে, দেমাক দেখলেন ? আমার দেমাক ? দুঃখী মানুষ আমি দাসীগিরি করে খাই—

পটল তখন মুচকে হেসে বলে, না করলেই হয় দাসীগিরি !

দিনের আলোয় মানুষটার মুখের পাকামির ছাপের মধ্যে চিন্তামণি সাংসারিক বাস্তব দেনা-পাওনার সম্পর্ক গড়ে তোলার শক্ত পাকা বনিয়াদ খুঁজে পায়। এ যা নেবার নেবে, যা দেবার দেবে। তাদের দুজনের কারও বলবার থাকবে না আদান-প্রদানে কোনোদিন কোনোপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে। সম্পর্ক হবে সহজ সাধারণ, দিনগুলি কাটবে নিশ্চিন্ত স্বাভাবিক সুখে। গৌরের কাছে তো চড়া নেশা আর বুক ধড়পড়ানির আনন্দই শুধু মেলে। পর পর দুরাত্রি গৌরের জন্য বড়ো বেশি মন কেমন করার যন্ত্রণা সয়ে চিন্তামণির মেজাজটা তাই আরও বেশি খিঁচড়ে গেল। দিনের বেলা খুঁজে খুঁজে যেচে যেচে আরও বেশি আলাপ করল পটলের সঙ্গে।

পরদিন বিকালে একখানা চিঠি এল চিন্তামণির নামে। পড়ে দেবার জন্য চিঠিখানা হাতে নিয়েই পটল পকেটে পুরে দিল।

রাতে পড়ে শোনাব চিন্তামণি।

ওমা, রাতে কখন ?

অনেক রাতে, সবাই যখন ঘুমোবে। আজ এখানে শুয়ে থাকব, বৈঠকখানায়।

চিন্তামণির মনে হল, তাই হোক। গৌর কবে এসে পড়ে ঠিক নেই, আজ রাতেই বোঝাপড়া চুকে যাক পটলের সঙ্গে। সাতটা দিনও আর সে পার হতে দেবে না, নিজের ঘরে নিজের সংসার

পাতবে। নিজের রান্না করবে নিজে, পরবে নিজের কাপড়, জল তোলা বাসন মাজা ঘর মোছা বিছানা পাতার কাজ করবে নিজের, রাতে পাশে নিয়ে শোবে নিজের পুরুষটিকে। কী জ্বালাতেই জ্বলে যাবে গৌরের বুক !

কী করবে গৌর ?

সকাতর গৌরকে নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টায় সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, অন্ধকারের সঙ্গে এক অজানা আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে চিন্তামণির মনে। হিংসায় বুক ফেটে কি যাবে গৌরের ? দুঃখে সে কি মুহ্যমান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য ? জীবনের সাধ-আহ্লাদ কিছুই কি তার অবশিষ্ট থাকবে না ? কে জানে কী করবে গৌর ! হয়তো হাঁপ ছেড়েই সে বাঁচবে যে যাক, সব চুকেবুকে গেল ! হয়তো দেখাই সে আর কোনোদিন পাবে না গৌরের !

তা পাবে না। পটলের ভাড়া করা ঘরে গেলে কী করে সে গৌরের দেখা পাবে ? এ বাড়ি ছেড়ে গেলে গৌরকেও তার ছাড়তে হবে জন্মের মতো।

চিন্তায় ভাবনায় যেন অম্বল হয়েছে মনে হল চিন্তামণির। না খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। বৈঠকখানায় যাবে কি যাবে না স্থির করতে করতে রাত তিনটে বাজিয়ে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ক্রুদ্ধ পটলের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে সে তোরঙ্গে তুলে রাখল। কাউকে দিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে শুনবার জন্য মনটা তার এমন আকুলি বিকুলি করতে লাগল যে চারদিন পরে তার মনে হল এ যাতনা সহ্য করা যায় না। গৌরের ভাবনার চেয়ে না-পড়া চিঠির জ্বালা তার বেশি হয়েছে।

পরদিন দুপুরে গৌর ফিরে এল।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি আমি বড়নিছিপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবে। পোড়া কপালে এত কষ্ট ভগবান কেন দিয়াছিল মরিয়া গেলে সুখ পাইতাম তা মরণ অদিষ্টে নাই। তুমি আমি দুই বইন মন্দ অদিষ্ট নিয়া জন্মিয়াছি। আমার সোয়ামি থাকিয়া নাই তুমি কচি বয়সে সিঁদুর মুছিলা। তুমি আটটাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিষপত্র আগুণ হইয়াছে। বাবুরা শুদ্দ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলাপিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে। তুমি আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ তাতে কত সুখী হইয়াছি যে দিদিরে তুমি ভুলিলা না নিজে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইলা। নিজ বয়স বুঝিয়া সাবধানে চলিবা মন্দ লোক বুঝিলে কোনো সংসর্গ রাখিবা না। পেটের খিদায় তুমি মধুবনী গিয়াছ ইহা আমারই অদিষ্ট। বড়নিছিপুরে আমি ভূষণবাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আছি। ইনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। খিদির পাড়ায় বাপের বাড়ী বৌ প্রসব হইতে আসিয়াছিল তাহাকে আনিতে আসিয়া বলিলেন যে হরমণি তুমি জানাশুনা লোক তোমারে চাকরাণী হইতে বলিতে পারিব না। তুমি খাওয়া পড়া পাইবা সব পাইবা আপনজনের মতো ঘরে থাকিবা। বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া সব কাজ করিবা তাহাতে তোমার কিসের অপমান, আমার মা বৈন সংসারের কাজ করে না। তুমি জানিবা যে আমি নীচু জাতের মেয়ালোক আমার সহায় সম্পদ কিছু নাই ছাড়াও এখন না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছি তথাপি আমার মান রাখিলেন। ভূষণবাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায় ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি। তাহাতে কিরূপ লজ্জিত হইয়া তিনি

বলিয়াছেন তুমি কেন কান্দিতেছ পায় ধরিতেছ কেন আমি নিজ কর্তব্য করিয়াছি ইহা কিছু নয় তিনি এরূপ দেবতা অপেক্ষা বড়। বড়নিছিপুরের যে মস্ত কারখানা আছে তাহাতে ইনি কাজ করেন। কারখানা তুমি কি দেখিয়াছ এখন কি হইয়াছে। সিংপাড়া গাঁয়ের চিহ্ন নাই সেখানে কারখানা বসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া থ বনিয়া গিয়াছি।

আশির্বাদিকা দিদি

ছয়

পৃথিবীতে বড়ো একটা যুদ্ধ বেধেছে খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই। বাতাসে বাতাসে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। তা যুদ্ধ যদি বেধে থাকে থাকুক, বিলাত দেশে যুদ্ধ বাধবে সেটা আশ্চর্যের কথা কি এমন, গোরু শুয়োর মদ খাওয়া ম্লেচ্ছ জাত, রক্ত গরম, মাথা গরম, ওরা তো যুদ্ধ করবেই যখন তখন। হিংস্র পশুর মতো ও লালমুখো জাতের পরিচয় কি আর জানতে বাকি আছে কারও। ছাব্বিশ আর পঁয়ত্রিশ সালে বাপ বলানো গুঁতোর চোটে মর্মে মর্মে টের পেয়েছে সবাই। ওরা যদি হানাহানি কাটাকাটি না করে, করবে কারা ?

এই তো সেদিনও একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল ওদের নিজেদের মধ্যে। বেশিদিনের পুরোনো কথা নয় যে বুড়োদের শুধু মনে থাকবে, জোয়ানদেরও স্পষ্ট মনে আছে সে যুদ্ধের কথা। পুরো একটা যুগ ধরে ওরা কি হানাহানি করে মরেনি নিজেদের মধ্যে, সাবাড় হয়ে যায়নি বেশির ভাগ পুরুষ ? মাঝখানে এতদিন যে ওরা যুদ্ধ করেনি সে তো শুধু এই জন্য যে যুদ্ধ করার পুরুষ ছিল না দেশে !

জিনিস ওজন করা স্থগিত রেখে বাঁড়ুজ্জে বলে, কথা তুললে যদি তো বলি শোনো রঘু। লড়াই থামলে সবাই দেখল কি জানো ? দেখল দেশ ভরা শুধু মেয়েলোক, বুড়ি মাঝবয়সি যুবতি কিশোরী সব বয়সের গাদা গাদা মেয়েলোক— পুরুষ যে কটা হাতের আঙুলে গোনা যায়, তার আবার আদ্দেক কানা খোঁড়া। সর্বনাশ ! এ যে জাত সুদ্ধ লোপ পাবার জোগাড় ! সবাই মিলে তখন ঠিক করলে বিয়ে টিয়ে তুলে দাও, বল নাচ চালাও। বল নাচ জানো না ?

রঘু, গৌর, নিতাই, পচা, সুবলদের অজ্ঞতায় আমোদ পায় বাঁড়ুজ্যে। বেশি করে খ্যা খ্যা করে খানিকটা হেসে ফট করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

বলে, বল মানে ফুটবল নয় হে, গর্ভ। বল নাচ গর্ভধারণের নাচ, আমাদের শাস্ত্রে যাকে গর্ভাধান বলে। যেদিন যত মেয়েছেলে মাসকাবারি চান করে, তারা সবাই সেদিন থেকে বল নাচের আসরগুলিতে যায়—সেদিন থেকে দশদিন, ব্যাস। যে কটা পুরুষ বেঁচেছিল যুদ্ধে, কানা, খোঁড়া সবসুদ্ধ বলনাচের আসরে থাকে। খানিক নাচানাচি হয়, তারপর—

বাঁড়ুজ্যে গম্ভীর হয়ে বলে, উপায় কি বলো, জাত কি লোপ পেয়ে যাবে ? আমাদের গাই গোরুর কথাই ধরো। এতগুলো গাই, ষাঁড় আছে কটা ? গাই নিয়ে সবাই ছোটে একটা দুটো ষাঁড়ের কাছে, উপায় কি ! যুদ্ধ বেধেছে বাধুক। যুদ্ধের জন্যই যারা করে বংশবৃদ্ধি করে, যুদ্ধ করে তারা ধ্বংস হয়ে যাক।

বিদেশে বিদেশিদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষিদের কী সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে ? জাপান যুদ্ধে নেমেছে ? জাপানও তো বিদেশি। বিলিতি মাল আসে মধুবনীতে, জাপানি মাল আসে। বিলাতও যেমন বিদেশ, জাপানও তাই।

বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সংগত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনোমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনোদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে কোনোদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশাহারা করে দেয়। তেল নুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামেব বিক্রি বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগতভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।

জিনিসের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিসের দাম একেবারে হয়ে যায় চড়ক গাছ ! কতগুলি দরকারি জিনিস একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে। সারা মধুবনীতে বিলেতি ফুড কেনার সমস্যা চাষিদের মধ্যে এক রঘু ছাড়া আর কেউ বোধ করেনি, কিন্তু লাঙলের ফাল, দা, কাস্তে, পেরেকের সমস্যায় ভুগেছে অনেক চাষি। নিতাই কামারের হাপর বন্ধ নয়, কিন্তু হাপর চলেছে শুধু সারাইয়ের কাজে, কিছু তৈরি হবে না, লোহা নেই। বাজারের পুরোনো লোহার কারবারি রামচরণ কদিন আগে হঠাৎ এসে ডবল দাম দিয়ে লোহার গুঁড়োটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নিতাইয়ের দোকান থেকে। নিতাই কি জানত তখন এমন ব্যাপার হবে ? গোরুর গাড়ির একটা লোহার ডান্ডা রামচরণ কিনে নিয়ে গিয়েছিল সাড়ে পাঁচ টাকায়, আড়াই টাকা লাভ হয়েছিল নিতাইয়ের। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িটার জন্য সেই ডান্ডা হরেকৃষ্ণবাবু কিনেছেন তেরো টাকায়। সাড়ে সাত টাকা লোকসান নিতাইয়ের।

লাজনতলার সোমবারের হাটে কাপড় কিনত চাষিরা, দাম আট দশ আনা চড়া দেখে দু তিন হাট তারা কেনা বন্ধ রেখেছিল। পরের সোমবার দ্যাখে কি হাটে কাপড় এসেছে মোটে দু চারখানা।

ইঁদুনাখার বকুল তাঁতি কেঁদে বলে, হায়রে ঝকমারি ! একা বুনি দু চারখানা, তাতে কি ভাই সংসার চলে ? দশজনেরটা কিনে এনে বেঁচে আছি দু চার গণ্ডা লাভ পেয়ে ! শালা ছিনাত নন্দী টাকা দিয়ে সাপটে সব কিনে নিল ; ভাবলাম বড়ো দাঁও মেরেছি। দেখবি যা নন্দীর ঠেঁয়ে, দুয়ের তিনের কাপড়ের দর হাঁকছে সাত আট নয়। ইদিকে সুতো পাইনে মাইরি। নন্দী বেটা বলছে, সুতোর আমদানি নেই, কোথা পাব সুতো ! কিছু আছে দিতে পারি, তা দর কিছু বেশি লাগবে। কি দর জানো ? সোনার দর ! আর সালে সোনা কিনিছি ওই দরে নেতার মার নাকছাবির জন্যে। তাঁত বন্ধ গাঁয়ে। সব কটা তাঁত বন্ধ। এ কি হল কাণ্ডখানা ?

এখনও কিছু কাপড় আছে বকুল তাঁতির ঘরে। দিবারাত্রি তার স্বস্তি নেই, ঘুম নেই। যে কাপড় বেচে দিয়েছে সামান্য কিছু বেশি লাভে তার জন্য আপশোশ, বাজারের দর দেখে বাকি কাপড় ছেড়ে দেবার তাগিদ, দর আরও চড়ছে দেখে অপেক্ষা করার লোভ, দর পড়ে যাবার ভয়— কত কি চিন্তা যে ঘুরপাক খাচ্ছে বেচারির মাথায় ! সাতান্ন জোড়া কাপড় একশো তেইশ জোড়া গামছা, দু চারখানা গামছা আবার বেশি দরে কিনেও রেখেছে।

এ সব অভ্যাস নেই বকুলের, বেশিদিন টিকবার সাধ্য তার হয় না। ভেবে ভেবে এমন মাথা ঘোরে আর বুক ধড়ফড় করে তার যে নন্দীবাবুর লোক এসে আরও আট আনা বেশি দিতে চাওয়া মাত্র সব মাল ছেড়ে দিয়ে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

মিলের কাপড় মেলা কষ্ট।

মিল কাপড়ের দর চড়িয়ে নিলে। এই ফাঁকে সুতো পেলে মোদের কিছু হত।

চালের দাম বারো টাকা। ঘরে গৌরের চাল বাড়ন্ত, দুধবেচা পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে শোনে, চালের মন বারো টাকা, মোটা ভাঙা চাল। আড়াই টাকায় গত ফসলের যে ধান সে নিজে বেচেছে, সেই ধানের চাল বারো টাকা !

রঘুর কাছে গিয়ে সে বলে, এ তো ভারী মুশকিলের কথা হল।

রঘু হেসে বলে, ভড়কে গেলি তো ? চুপ করে থাক না কদিন। তড়কানি খেলছে ওরা, যুদ্ধ লেগেছে খবর এয়েচে কিনা তাই ভেবেছে তড়কিয়ে দিয়ে মেরে নেবে ফাঁকতালে। শালার বউয়ের মাই কিনা চাল, বারো টাকা মন বেচতে চান যুদ্ধুর নামে। কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কী, মোর পান্তায় নেই কো ঘি। যেমন হাবা তুই, ঘাপটি মেরে থাক না বসে চুপটি করে দশটা দিন ?

চাল যে বাড়ন্ত ঘরে, কিছু বোঝ না তুমি।

চাল বাড়ন্ত, চাল নে যা দু কুনো। কথা কীসের অত ?

রেজকি যখন সবে কর্পূরের মতো উড়ে যেতে আরম্ভ করেছে বাজার থেকে, গৌরের চাঁদকাকা একদিন শম্ভু সার দোকানে যায় তার মেয়ে পুঁটুর পায়ের মল সারাতে। ফিরে সে আসে চাপা উত্তেজনা আর মলের বদলে টাকা নিয়ে, কাগজের টাকা অবশ্য।

পুঁটু পোঁ করে কান্না ধরতেই চাঁদ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় গর্জাতে থাকে, চুপ যা, চুপ যা বলছি হারামজাদি। টুঁ শব্দটি করবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

মেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে চাঁদ শুধোয়, কান্না কীসের শুনি ?

পুঁটু বলে, মল কই মোর ? মল এনে দাও মোকে।

সারাতে দিলাম যে মল ?

পুঁটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলে, তবে যে বললে মাকে মল বেচে টাকা এনেছ ?

কই বললাম ? বলিনি তো। কী বললাম তুই কী শুনলি আবাগির বেটি। মেয়ের সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্য জোর করে সস্নেহ কৌতুকের হাসি হাসে, মেয়েকে কাছে টেনে তার মাথা চাপড়ে বলে, পরশু মল এনে দেব তোর, পরশু। হাঁ দ্যাখ মলের রসিদ দিয়েছে শম্ভু সা।

পকেট থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বার করে চাঁদ মেয়েকে দেখায়। তারপর আর বিলম্ব না করে ঢকঢক করে আধঘটি জল খেয়ে যায় পাশের বাড়িতে কালাচাঁদের কাছে।

কালাচাঁদের অবস্থা বড়ো শোচনীয়। ক বছর আগেও তার অবস্থা এখানকার অনেকের চেয়ে ভালো ছিল, সারা বছর একটি দিনের তরেও বউ ছেলেমেয়ের তাব পেটভরা খাবারের অভাব হয়নি। জোতদার করালী শাসমলের অতি বড়ো একটা অন্যায় মেনে নিয়ে আপস করতে রাজি না হওয়ায় তার হয়ে গেল সর্বনাশ, মামলা মকদ্দমায় আর একদিন অন্ধকার রাতে অজানা কার লাঠির আঘাতে ডান হাতটা দু জায়গায় ভেঙে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়। কপাল মন্দ হলে যে সবদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তার প্রমাণও কালাচাদ পেয়েছে, রোগের বাড়াবাড়িতে। অসুখ বিসুখ আগেও তার সংসারে ছিল, সব সংসারে যেমন থাকে, যার তাল সামলাতে রীতিমতো খানিকটা বেগ পেতে হয় শুধু, কিন্তু দিন খারাপ পড়ার সঙ্গে জগতের সব রোগ যেন ভিড় করে আসছে শুধু তারই বাড়িতে !

চাঁদ তাকে বলে, ঘেঁটুর মা কেমন আছে আজ কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ বাঁ হাতে চোখ কচলে একটা অস্ফুট শব্দ করে, কথার চেয়ে মানে যার বেশি স্পষ্ট।

চাঁদ একেবারে তামাক সেজে থেলো হুঁকোয় কলকে বসিয়ে টানতে টানতে এসেছিল, দাওয়ায় উবু হয়ে বসে হুঁকোটা সে এগিয়ে দেয় কালাচাঁদকে। খানিক এ কথা সে কথা বলে নিয়ে শুধোয়, পইছেটা বেচে দেবে শুনছিলাম, দিয়েছ নাকি ভায়া ?

দু বছর যার সঙ্গে সে কথা কয়নি আজ তাকে চাঁদ ভায়া বলে !

দেব আজকালের মধ্যে !

অ্যাদ্দিন বেচোনি ওটা, এ বড়ো আশ্চর্য !

ঘেঁটুর মা লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চিত মরবে জেনে ভয় পেয়ে তবে না ফাঁস করলে। ওটা বেচে ডাক্তার আনব, ওকে বাঁচাব, শখ কত বাঁচার ! ডাক্তার এসে বাঁচিয়ে দেছে আমার নকড়ি, সাতকড়িকে, জন্মের মতো বাঁচিয়ে দেছে ! এবার এসে বাঁচাবে ওকে !

হুঁকোয় জোরে টান দিতে গিয়ে কাশির ধমকে দম আটকে আসবার উপক্রম হয় কালাচাঁদের, এক হাত হাড়-পাঁজর বার করা শীর্ণ বুকটা চেপে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে গিয়ে হুঁকোটা কাত হয়ে কলকের আগুন ছড়িয়ে যায়।

বেচবে যখন, দাও, আমিই কিনেনি। কালাচাঁদ একটু সুস্থ হলে চাঁদ বলে, কিনতে একটা হবে আমার পুঁটুর জন্যে, পঁইছে পঁইছে করে খেপে গেছে একদম। বড়োও হয়েছে, বিয়ে শিগগির না দিলে নয়। তা ভাবছি কী, বিয়ের সময় করতে হবে একটা, দুদিন আগেই কিনি, মেয়েটা বায়না ধরেছে যখন। মজুরি বাদে যা পড়েছিল তোমার তাই দেবখন। রুপো আছে কতটা ওতে ?

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। তার পক্ষে উৎসাহের একান্ত অভাবটা বড়ো খাপছাড়া, বড়ো বিচ্ছিরি লাগে চাঁদের।

নগদ দেব—সব টাকা নগদ। বাকি কিছু রাখব না।

রুপোর দর খুব চড়েছে শুনলাম ?

কথা শুনে চাঁদের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

গৌর যাচ্ছিল কাল রাস্তা দিয়ে, ডেকে বললাম, ও বাবা গৌর, পঁইছেটা বেচে দিবি বাবা কারও কাছে, দুটো টাকা যাতে বেশি পাই ? গৌর বললে রুপোর দাম বেড়েছে, দেড়গুণ দুগুণ টাকা। সা-র দোকানে দর কষিয়ে গৌর নিজে কিনবে বললে পঁইছেটা। বলি বিয়ে টিয়ে করবে নাকি ভাইপো তোমার ?

কি জানি।

শুধিয়েছিলাম। তা চাপা দিয়ে দিলে কথাটা। মন লাগে কি, বিয়ে টিয়ে করবে নয়তো পঁইছে দিয়ে কি করবে ও, বউ আছে না বোন আছে না মেয়ে আছে ওর ? জোয়ান ছেলে, তুমি তো দিলে না, পিথক হয়ে নিজেই জোগাড় করেছে বিয়ের। ছেলেটা ভালো চাঁদ, ওর ভালো হবে। দেখে নিয়ো ভালো হবে তোমার ভাইপোর।

সবাই তবে জানে রুপোর দাম চড়ার খবর ? কেন সবাই জানল ভেবে বুকটা জ্বলে যেতে থাকে চাঁদের। সে একা না জেনে কেন সবাই জানল !

জ্বলতে জ্বলতে একটা কথা স্মরণ করে মনটা তার শান্ত হয়। মল কিনে সা তাকে শুধিয়েছিল, কাঁচা টাকা আছে চাঁদ ? থাকলে এনো। কাঁচা রুপোর পুরোনো টাকা, এডোয়ার্ড মার্কা, রানি মার্কা টাকা। চাঁদ জানে তারই বাড়ির ঘরের ভিটিতে মাটির তলায় পোঁতা আছে এক ঘটি পুরোনো টাকা, তার বুড়ি শাশুড়ির চাটাই কাঁথার বিছানার নীচে।

প্রায় চার কুড়ি বয়স হবে চাঁদের শাশুড়ির, কাঁকাল বাঁকা হয়ে সামনে নুয়ে গেছে, লোল চামড়া ঢাকা কঙ্কালসার দেহটা, লাঠি ধরে ছাড়া দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু এই একভাবে বুড়ি দিব্যি টিকে আছে চাঁদের বাড়িতে আজ পাঁচ বছর। তবু, টাকা ভরা ঘটিটা কোলে রেখেই বুড়িকে একদিন স্বর্গে যেতে হবে জেনে এতদিন চাঁদ নিশ্চিন্ত ছিল। ধরলে গেলে ও টাকা তো তার নিজেরই সঞ্চয় বলা যায়।

সারাদিন চাঁদ চঞ্চল হয়ে থাকে ঘটিটার কথা ভেবে। একটা টাকার দাম হয়েছে এক টাকার বেশি, এমন কথা শুনেছে কেউ কোনোদিন ? এমন সুযোগ এসেছে কোনো কালে ? কে জানে কদিন থাকবে এই সুযোগ ? আর শুধু কি এই একটা সুযোগ ? রুপোর গয়নার কথাটাই ধর। সত্যি সত্যি কি আর দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে রুপোর দাম চড়বার খবর, রেলের কাছে মধুবনী বড়ো জায়গা, এখানে হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে। দূরে ছোটো ছোটো গাঁয়ে হয়তো খবর পৌঁছায়নি এ ব্যাপারের। মধুবনীরও সবাই হয়তো জানে না। গৌর চালাক চতুর, বাজারে যাতায়াত আছে, দশটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে, ওরা জানতে পারে। সবাই কি ওদের মতো মধুবনীর ? বোকাহাবা লোক কি নেই এখানে ? রুপোর পুরোনো টুকিটাকি গয়না যদি সে কিছু কিনতে পারে ওদের কাছে থেকে !

মাটির টাকাগুলো যাকে বেচে লাভ হবে, টাকার বদলে পাওয়া বেশি টাকাটা এ ভাবে খাটিয়েও তার লাভ হবে !

চাষি চাঁদের মনে এই সব চিন্তা পাক খেয়ে বেড়ায়—অনভ্যস্ত এলোমেলো চিন্তা বলে একেবারে উতলা করে দেয় তাকে। রূপোর মল বেচে আশাতীত লাভ করেছে বলে শুধু এই পণ্যটির কথাই সে ভাবে, আরও কত কিছু কেনাবেচার মধ্যেও যে এ রকম লাভের সুযোগ দেখা দিয়েছে সে সব তার মনেও আসে না, সোনার কথাটা পর্যন্ত নয় !

দেখা গেল, বুড়ির ঘটি চুরি করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। ঘর ছেড়ে বুড়ি বড়ো একটা কোথাও নড়ে না। বেশির ভাগ সময় ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকে, বাকি সময়টা ঘরেরই সামনে দাওয়ায় উবু হয়ে দু পায়ের হাঁটু মাথায় ঠেকিয়ে বসে থাকে, কখনও আপন মনে বিড়বিড় করে, কখনও কাঁপা গলায় তারস্বরে চেঁচিয়ে একে ওকে গাল দেয়। নাইতে খেতে ও প্রকৃতির তাগিদে বুড়িকে অবশ্য সরে যেতে হয় কিছু কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু চাঁদ ভরসা পায় না ! বিছানা তুলে মাটি খুঁড়ে আবার গর্ত বুজিয়ে এমন ভাবে বিছানা পেতে রাখতে হবে, বুড়ির যাতে সন্দেহ না হয়। বুড়ির অনুপস্থিতির সময়টুকুতে সেটা সম্ভব নয়।

চণ্ডীতলায় পুজো দিতে যাবে বলছিলে না মা ? তা যাও না, দিয়ে এসো পুজো। চাঁদ বুড়িকে জপায়।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বুড়ি বলে, মাথায় থাক পুজো দেওয়া। অদ্দুর কি চলতে পারি ? তুই যা না বাপ, দিয়ে আয় না পুজোটা ?

বুড়ো মানুষ, সাধ হয়েছে, ডুলি করেই যাও। ডুলির পয়সা দেবখন আমি। বিন্দেকে বলে দিচ্ছি।

ডুলি চেপে চণ্ডীতলায় পুজো দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুড়ি চাঁদকে দিয়েই ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটায়। শিকল কপাটের নীচের দিকে, কুলুপটা বুড়ি আবার নিজে টেনে দ্যাখে ঠিক মতো লাগল কিনা !

ডুলি ভাড়া গচ্চা যাবার দুঃখের সঙ্গে নতুন নির্ঘাত মতলব ঠাউরাবার চেষ্টায় মাথা ঘামানোর পরিশ্রম মিশে প্রায় কাবু করে আনে চাঁদকে। ভাবতে হয় একা, বউয়ের সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। যতই হোক, সে তো মেয়ে বুড়ির। বোকা মেয়েমানুষ, হয়তো গন্ডগোল করে বসবে। বুড়ি চণ্ডীতলায় গেলে ছুতো করে বউকে গৌরের বুগ্ণা মার খবর আনতে পাঠিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবে রেখেছিল। পুরোনো মরচে ধরা এক কুলুপের জন্য সব ফসকে গেল !

গৌরের গোরুর দুধ কমে গেছে। নীলকণ্ঠবাবু চাঁদের কাছ থেকে এক সের দুধ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বাড়িতে দুধ নিতে আসবার কোনো তাগিদ চিন্তামণির ছিল না, কিন্তু সাধ করে গৌরের বাড়ি দুধ নিতে আসবার ভারটা নেওয়ায় এ বাড়িতেও তাকে ঘুরে যেতে হয়। দুজনের বাড়ি বেশি দূরে নয়।

পরদিন সকালে চিন্তামণি এসেছে দুধ নিতে, চাঁদ চেয়ে দ্যাখে কী বিধবা মেয়েটা রুপোর পঁইছে পরেছে বেহায়ার মতো। ঘেঁটুর মার গায়ে যেটা লটকে থাকত এ পঁইছেটাও যেন তারই মতো !

পঁইছে দিল কে ? চাঁদ শুধোয়।

কে দেবে, কিনিছি।

কার কাছে কিনলে ? গৌরের কাছে নাকি ?

অত খোঁজে কাজ কি তোমার ? দুধ নিতে এইছি, দুধ দুয়ে দাও, নিয়ে চলে যাই ! চিন্তামণি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দেয়। ঝোঁকের মাথায় সখের বশে পঁইছেটা গায়ে চড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, ভোরের এই সুন্দর পৃথিবীতে সব মানুষ সব ভুলে তার এই গয়নাটির দিকেই শুধু তাকিয়ে থাকছে হাঁ করে।

তোমার তো বড়ো মুখ বাছা ? বলে চাঁদ চুপ করে যায়।

রাত্রে পুঁটু তার দিদিমার কাছে শোয়। দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে সে কেমন এক খাপছাড়া ভীত কণ্ঠে ডাকে, বাবা।

দুধ দোয়া স্থগিত করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ বলে, কিরে পুঁটু ?

দিদিমা যেন কেমন করে শুয়ে আছে, দ্যাখোসে বাবা।

ডাক না ?

ঠেললাম তো। নড়েচড়ে না।

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে একনজর তাকিয়েই চাঁদ টের পায় বুড়ি মরে গেছে। বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে, মাথা ঝিমঝিম করে। তার মনে হয় সেই যেন মনে প্রাণে জোরালো কামনা করে করে বুড়িকে মেরে ফেলেছে। আর কী এ মরণ ! রোগবালাই নেই, সাড়াশব্দ হইচই নেই, রাত্রে ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি নিঃশব্দে স্বর্গে যাওয়া !

পুঁটু কেঁদে ওঠে, তার মা ছুটে এসে কান্নায় যোগ দেয়, আশেপাশের বাড়ির লোক দু চারজন এসে জুটতে আরম্ভ করে। দুধ আর চিন্তামণির নেওয়া হয় না। বুড়ির শোকে চাঁদের দুধ দেওয়ার শক্তি লোপ পাওয়ার জন্য নয়, যে বাড়িতে সদ্য সদ্য একটা মানুষ মরেছে সে বাড়ি থেকে দুধ নেওয়া চলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে শুনে চিন্তামণি চলে যায়। ভাবে, গৌরকে খবরটা দিতে হবে।

বুড়িকে পুড়িয়ে এসে চাঁদ খন্তা নিয়ে ঘটি উদ্ধার করতে যায়, পুঁটুর মা ডেকে বলে, ও কী করছ ?

টাকার ঘটিটা বার করি মেঝে থেকে ?

পুঁটুর মা বলে, ওখানে ঘটি কই ? ঘটি নেই ওখানে।

চাঁদ অবাক হয়ে বলে, কোথায় আছে তবে ? এইখানে তো পোঁতা ছিল ঘটি ?

পুঁটুর মা বলে, শোন ইদিকে, বলছি সব। ব্যাপার আছে অনেক। ভূমিকা শুনে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদের। তীব্র জ্বালাবোধের সঙ্গে সে ভাবে আশাভঙ্গের কি শেষ নেই তার ?

পুঁটুর মা বলে, ব্যাপারখানা কি জানো, ঘটি থেকে টাকাগুলো মা বার করে নিয়েছিল। বাবুকে বলে পোস্টাপিসে জমা রেখেছে ও বছর। বলাই ঘোষের ঘর পুড়ে মাটির টাকাগুলো গলে তাল পাকিয়ে গেল না সেবার, মা তখন ভয় পেয়ে গেল।

টাকা তবে আছে ? চাঁদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

আমায় বলনি কেন ?

তুমি যদি গোলমাল কর ?

কিছু হাঙ্গামার পর চাঁদ টাকাগুলি পেল—রুপোর টাকা নয়, নোট। কাগজের নোট।

বিয়ে করা কচি বউকে নিয়ে সংসার করার অস্পষ্ট সাধটা গৌর মামাবাড়ি থেকে আরও জোরালো করে নিয়ে ফিরে আসে। চিন্তামণির শক্ত বাঁধন কেটে নিজেকে সরিয়ে নেবার অস্পষ্ট ইচ্ছাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিন্তামণির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবার কথা ভেবে মনটা বড়ো বেশি কেমন করায় তার ভয় বেড়ে যায়। এ ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে চিন্তামণিই হয়তো শেষে তার সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাইয়ে দেবে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যা থাকে কপালে বলে চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মনের অবস্থা তার ঘটিয়ে দেবে চিন্তামণি।

না, এ পিরিত টেনে চলে তার মঙ্গল নেই। সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে চিন্তামণির সঙ্গে।

বড়ো কষ্ট পাবে চিন্তামণি।

অদ্ভুত উল্লাসভরা গর্ব অনুভব করে গৌর। তার জন্য চিন্তামণি পাগলিনি, সে বর্জন করলে বুক চিন্তামণির ভেঙে যাবে, চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটবে, এ কথা ভাবলে টনটনে একটা ব্যথাবোধের সঙ্গে গৌরের পুরুষ মন অহংকারে ভরে যায়।

ভোরে এসে চিন্তামণি শুধোয়, কেমন যেন ভাসাভাসা গা ছাড়া গা-ছাড়া ভাবে শুধোয়, ফিরলে কবে ?

কাল ফিরেছি।

ও। কাল ফিরেছ ?

তারপর চুপ করে থাকে চিন্তামণি, উদাস গম্ভীর মুখে। দুধ দুইতে দুইতে মুখ ফিবিয়ে ফিরিয়ে তাকিয়ে গৌরেব মনটা বিগড়ে যাবার উপক্রম করে। চিন্তামণির এ ভাব তার ভালো লাগে না।

একটা কাজ করবে ? চিঠিখানা পড়ে দেবে আমায় ?

পাঠশালায় পড়া বিদ্যায় টানা হাতে লেখা চিঠি পড়তে গৌর গলদঘর্ম হয়ে ওঠে। চিঠির সিকি অংশের বেশি পাঠোদ্ধার করার ক্ষমতা তার হয় না। দু কান তার ঝাঁঝাঁ করতে থাকে।

চিন্তামণি টের পেয়ে বলে, ওই হয়েছে নাও। আমি তো ভাবছিলাম তুমি পড়তেই জানো কি না ! চাষার ছেলের পড়ার বালাই দিয়ে কাজটা কীসের ?

তারপর তাকে যেতে না বলে, ভালোমন্দ সুখদুঃখের দুটো কথা না কয়ে, চিন্তামণি চলে যায়। তাতে আরও বিগড়ে যায় গৌরের মন।

ঠিক এমনিভাবে কেটে যায় কয়েকটা দিন, দু দণ্ডের জন্য পরস্পরের দেখা হয়ে, ভাসাভাসা দুটো কথার বিনিময় হয়ে, আবেগ ও অন্তরঙ্গতা উহ্য থেকে। একদিকে গৌব স্বস্তি পায়, ভাবে এমনিভাবে চলতে থাকলে, বিনা চেষ্টায় বিনা হাঙ্গামায সম্পর্ক ভাঙার ব্যাপারটা তাদের চুকে যাবে। অন্যদিকে ভিতরটা তার এক দুরন্ত ব্যথায় হুহু করতে থাকে। চিন্তামণিকে মনে হয় ম্লান, নির্জীব ! কী যেন দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছে সে, কথাবার্তা চালচলন চোখমুখের ভঙ্গি সব যেন তার বদলে গেছে সেই দুঃখের চাপে। ছেলে মরবার পর মেয়েলোকের এ রকম শোকাতুরা মূর্তি হতে দেখেছে গৌর। চিন্তামণিও কি নিজে থেকে সংকল্প করেছে, বুক ফেটে গেলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে ?

এমনিভাবে দিন যাচ্ছে, একদিন কালাচাঁদের পঁইছেটা গৌর নিজেই কিনে ফেলল একটা খেয়ালের বশে। বেচবার জন্য সা-র দোকানে পঁইছেটা ওজন করাতে গিয়ে তার মনে হল, চিন্তামণিকে সে কখনও কিছু দেয়নি। চিন্তামণির মনে সে যে ভয়ানক কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছে, তার কাছে এই পঁইছেটা পেলে সে কষ্ট কি কিছু কম হবে না ?

পঁইছেটা কিনে তার মনে হল, এই পঁইছে দেওয়া উপলক্ষে শেষবারের মতো একদিন চিন্তামণিকে একটু আদর করে দুটো মিষ্টি কথা বলা তার উচিত। পরদিন সে তাই নিজে থেকে সেধে চিন্তামণিকে বলল, আজ রাতে যাব ?

যাবে ? যেয়ো।

বৈন চিন্তামণি,

কতকাল তোমারে পত্র লিখি নাই ইহাতে মনে কষ্ট করিবা না নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে গৌণ হইল। আমি কাজ করিতেছি জানিবা। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈচৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ী উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের

পলক ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুন্ডা গিজগিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়াকপালী ঝির কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতে ধর্ম্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি। দুইস্থানে বাসন মাজিয়া তেরো টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই। যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাই না।

ইতি—তোমার দিদি

গৌরের ঘরে আজ আবার চাল নেই।

মা বলে, ও বেলা হাঁড়ি চড়বে না গৌর। চাল বাড়ন্ত।

আরও কয়েকদিন চলত, পুঁটুকে না খাওয়াতে হলে। কী ভাতটাই খায় এতটুকু মেয়ে ! কম দিয়ে এড়িয়ে যাবার জো নেই, যতক্ষণ না পেট ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদে চলবে ভাতের জন্য। পেটমোটা ক্যাংটা পুঁটুর দিকে চেয়ে গৌরের মনে আজ আপশোশ জাগে যে চাঁদকাকা তার না খেয়ে মরে গেছে। বেঁচে থেকে আরও কিছুকাল তিলে তিলে তার মরা উচিত ছিল। বউ আর ছেলে শুধু নয়, এই মেয়েটা চোখের সামনে মরবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা উচিত ছিল চাঁদকাকার। নিজের আত্মীয় এত বড়ো শত্রু হয় মানুষের ? বেঁচে থাকতে আজীবন শত্রুতা করে গেছে, মরেও শত্রুতা করে গেল।

কতকাল না খেয়ে না খেয়ে পেট চিমসে হয়ে গিয়েছিল পুঁটুর, হঠাৎ দুবেলা বেশি বেশি ভাত গিলে মরতেও সে পারত। উচিত ছিল তাই। অথচ কাণ্ড দ্যাখো অদ্ভুত, কদিনে চেহারা যেন ফিরতে শুরু করে দিয়েছে মেয়েটার। মুখের বীভৎস শীর্ণতা থেকে মৃত্যুর ছাপ মুছে যেতে আরম্ভ করেছে।

পাতে ভাত কম ছিল, রোজ যা খায় তার অর্ধেক। শেষ করে ভাত চাইতে মা একটু ইতস্তত করে, কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। তারপর আরও ভাত এনে ঢেলে দিতে যায় গৌরের পাতে।

মার রকম দেখে খটকা লেগেছিল গৌরের মনে, দুহাতে পাত ঢেকে সে বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর আছে তো ভাত ?

তুই খা না।

কিন্তু তা কী হয়। মাকে উপোসি রেখে পেট ভরাতে পারার মতো খিদের স্বাদ এখনও গৌর পায়নি। লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত কিছু ধান রঘু আর সে বেচে দিয়েছিল কিন্তু সে খুব বেশি নয়। তাদের দু জনের বাড়িতে তাই এখন পর্যন্ত দুবেলা হাঁড়ি চড়ছে। গৌরের মন মুচড়ে গেছে আতঙ্কে, গোরু ছাগলের মতো চারিদিকে জানাশোনা মানুষগুলিকে মরতে দেখে, দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে দুদিন পরে তার কী অবস্থা হবে এই চিন্তায়। মোটামুটি পেট ভরে খেতে না পেলে হয়তো আতঙ্কে এতটা কাবু হয়ে পড়ত না গৌর। পেটের খিদে তার চিন্তা আর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিত, বিরামহীন কল্পনার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এমন পাহাড় হয়ে চেপে বসত না তার মনে।

ধীরে ধীরে গৌর রঘুর বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। পা তার চলতে চায় না। পর হয়েও এ জগতে রঘুই তার সবচেয়ে আপনার, পরমাত্মীয়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। তবু আবার রঘুর কাছে ধান বা চাল ধার চাওয়ার কথা ভাবতেও তার কেমন বিশ্রী সংকোচ হচ্ছে। রঘু দুবার তাকে ধার দিয়েছে। মুখ ফুটে দেব না বলেনি কিন্তু শেষবার কেমন যেন বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট মনে হয়েছিল রঘুকে, ধান

মেপে দেবার পর ভালো করে কথা কয়নি। মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল বিরজার। বাড়ির অন্য সকলের কথায় ব্যবহারেও একটা চাপা শত্রুতার ভাব গৌর অনুভব করেছিল।

কিন্তু উপায় কী। পয়সা কড়ি কিছুই নেই গৌরের হাতে। চিন্তামণিকে পঁইছে কিনে দেবার শখ না জাগলে হয়তো গোটা কয়েক টাকা থাকত তার হাতে, আজ আবার গিয়ে হাত পাততে হত না রঘুর কাছে।

রঘু তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে, চিন্তিত গম্ভীর মুখে। উঠানের এক কোণে মাঝারি পাত্রটায় ধান সেদ্ধ হচ্ছে। সুমিষ্ট চেনা গন্ধে গৌরের পেটের অল্প দুটি ভাত যেন চোখের পলকে হজম হয়ে গিয়ে দুর্দান্ত খিদে পাক দিয়ে ওঠে। তাকে দেখে রঘু বিশেষ খুশি হয়েছে মনে হয় না গৌরের। হুঁকোটা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেও সে যেন ভুলে গেছে। গৌরের মনে পড়ে, গতবার ধান দেবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বারের জন্যও রঘু খবর নিতে যায়নি সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

গলা শুকিয়ে যায় গৌরের। আরও একটা নতুন আতঙ্ক তাকে প্রায় দিশেহারা করে দেয়। রঘুও কি সত্যই তাকে ত্যাগ করবে তার বিপদের দিনে ? নিজেকে কী যে অসহায় মনে হয় গৌরের ! আজ সে ভালো করে টের পায়, চিরটা কাল সে কতখানি নির্ভর করে এসেছে রঘুর ওপর, এখনও সে কতটা ভরসা রাখে ওর কাছে। ধান আজ চাইবে কি চাইবে না ভেবে পায় না গৌর। ধান চাইলে যদি ভেঙে যায় তাদের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক চুকে যায় আজ থেকে ? যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সত্যটা যে সাহায্য দূরে থাক, রঘুর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার আশাও তার নেই ? অথচ কথাটা আজ স্পষ্ট করে নিলেই বা তার লাভ কি ! রঘু যদি তাকে বরবাদ করেই থাকে, সেটা জানলে তার কী আর বেশি ক্ষতি হবে ?

এলোমেলো ছাড়া ছাড়া কথা হয় দু জনে। নিজেই হাত বাড়িয়ে গৌর হুঁকোটা নেয়।

বলে, কদিন চলবে আর এ রকম ?

রঘু বলে, ভগমান জানে। নিতায়ের মেয়েটা নাকি কোথায় ভেগেছে কাল।

মাইরি বলছিস ? কার সাথে গেল ?

ভগমান জানে। পটল নাকি পিছনে ছিল শুনলাম—শহরে সরিয়েছে।

বিরজা এসে ঘুরে যায়। ধান কেমন সেদ্ধ হচ্ছে দেখতে। খানিক পরে আবার আসে। মনের কথাটা ধৈর্য ধরে সে চেপে রাখতে পারে না।

কি সলা হচ্ছে শুনি তোমাদের ? ধান যদি চাইতে এসে থাকো গৌর ঠাকুরপো---

গৌর সজোরে মাথা নাড়ে।—না, ধান চাইতে আসিনি। তারপর অন্তরঙ্গের মতো হাসবার চেষ্টা করে বলে, চাই যদি, দেবে না ? বলো কি গো ! আমি চাইলে দেবে না ?

এ যেন তামাশার ব্যাপার !

বিরজা বলে, থাকলে কি দিতে অসাধ ? কোথায় পাব যে তোমায় দেব ! আধপেটা খাচ্ছি সব—মুঠি মেপে চাল নিচ্ছি।

তবু গৌর কথাটাকে গায়ের জোরে তামাশার পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা করে, হালকা হাসির ভান করে বলে, আমার জন্যেও নিয়ো বৌঠান আজ থেকে। বিশ মুঠো নিয়ো, তাতেই হবে, বেশি চাই না।

রঘু বলে, ধান যদি কিছু জোগাড় করতে পারিস গৌর---

জোগাড় কীসের ? গোলা ভর্তি ধান রয়েছে।

তামাশা নয় ! ধান পেলে কিছু কিছু শোধ দিস তোর কাছে যা পাব।

বিরজা যোগ দেয়, একটা পেট তোমার—মা বুড়ি আর কতই বা খায় ? তোমার ভাবনা কী বল। এত লোকের সংসার হলে টের পেতে !

গৌর তবু হাসে।—বড়োলোকের বড়ো সংসার ! আমার মতো বড়োলোক যদি হতে—

মন এদিকে তার পুড়ে যেতে থাকে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সে একরকম পালিয়ে আসে রাস্তায়।

দুপুরের রোদে যেন উজ্জ্বলতা নেই, শুধু ঝাঁঝ। দু চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে—মানুষ ও গোরুছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁখাঁ করছে। চারিদিকের প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশি একা, আরও বেশি অসহায় মনে হয়।

মনে হয়, চিন্তামণির সঙ্গে যদি ভাব রাখত ! প্রাণখুলে মনের দুটো কথা কয়ে নিজেকে হালকা করা যেত একটু। আজ তিন-চারমাস চিন্তামণির সঙ্গে সে দেখা করেনি, কথা কয়নি। রঘু আজ যে ভাবে বর্জন করেছে তাকে, একরকম এমনি ভাবেই সেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল চিন্তামণির সঙ্গে। অবশ্য পঁইছেটা সে দিয়েছিল চিন্তামণিকে—দামি ভারী একটা পঁইছে ! সে চাওয়ার আগেই রঘু তাকে জানিয়ে দিয়েছে ধান সে তাকে দিতে পারবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মতো সেই সঙ্গে ধার দেওয়া ধান শোধ চাইতেও তার বাধেনি।

আচ্ছা, চিন্তামণির কাছে সে যদি পঁইছেটা ফেরত চায় ? যদি বলে যে এখনকার মতো ওটা ফেরত দাও, সুদিন ফিরে এলে আবার তোমায় নতুন পঁইছে গড়িয়ে দেব ?

বিয়ে করে ঘরসংসার করার সাধ মেটাবে বলে যাকে সে ত্যাগ করেছে, এতকাল একটা খবরও নেয়নি যে বাঁচল না মরল, তার কাছে পঁইছে ফেরত চাওয়ার কথা ভাবতে গৌরের লজ্জা বোধ হয় না। রঘুর কাছে ধান চাইতে যাওয়ার চেয়ে এ কাজটা বরং ঢের বেশি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমন কী, পঁইছে দিতে চিন্তামণি যে অস্বীকার করতে পারে এটা তার খেয়ালও হয় না একবারের জন্য। তার যেন দাবি আছে পঁইছেটাতে এবং চাইলেই যেন চিন্তামণি বিনা দ্বিধায় সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এতটুকু। অসংগতিও নেই।

চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর আজ প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে গৌর তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। এমন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে যে বাবুদের বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাবুর মেয়েটাকেই অনুরোধ জানায় চিন্তামণিকে ডেকে দিতে।

চিন্তামণি আসে অনেক দেরি করে। একটু রোগা হয়ে গেছে চিন্তামণি। রোগা হওয়ায় আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, কম মনে হচ্ছে বয়স।

চিন্তামণি এসে গৌর মুখ খুলবার আগেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, বেশ করেছ এসেছ। তোমায় খুঁজছিলাম কদিন থেকে। তোমার গয়না ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

চিন্তামণি পঁইছেটা গৌরের হাতে তুলে দেয়।

ফিরিয়ে দিচ্ছ ? কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ ?

যে ব্যাভারটা করলে তুমি, তারপর তোমার জিনিস নেব ? চিন্তামণির গলা ধরে আসে, মাসকাবারে দেশে ফিরে যাব। তোমার জিনিস তোমার থাক, আমার কাজ নেই ওতে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে গৌর চিন্তামণির হাত চেপে ধরে, মিনতি করে বলে যে চিন্তামণি যদি তাকে ছেড়ে দেশে চলে যায় সেও তাহলে বিবাগি হয়ে বেরিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে নয়তো আত্মঘাতী হবে। আর সে এমন ব্যবহার করবে না চিন্তামণির সঙ্গে। চিন্তামণি মাপ করুক তাকে।

দুপুরবেলা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গৌরের কথা শুনতে শুনতে চিন্তামণির মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন মনে হলেও রোমাঞ্চ হয় চিন্তামণির।

পঁইছের টাকায় কিছুদিন গেল। তারপর গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা।

চিন্তামণি বলল, এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে ? তার চাইতে চ'লো বড়নিছিপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে, তুমি কাজ করবে আমি কাজ কবব, একরকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে। সেথায় তো জানা চেনা কেউ নেই তোমার, একসাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।

গৌর বলল, ভয় ? কাঁসের ভয় ? এখানেই একসাথে থাকছি এসো না আজ থেকে।

আজ গৌরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ি নেই, জমিজমা নেই, পেটে ভাত নেই—কাকে তার ভয়, কীসের তার লজ্জা।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি,

তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব। মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।.....

রাঙা মাটির চাষী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পিদিংপাড়া
২৪ পরগণা
তাং ২০শা শ্রাবণ

এক

বৈন চিন্তামণি তুমি ২।৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব বলিয়া আপনার পত্রখানার দিতে গৌণ হইল, দাদার আমশা ১ মাস যাবত ভুগিয়াছে, আমি কাহাকে লইযা যাইব। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়াছে। আজ ৫।৭ দিন যাবত এখানে ঝড় তুফান হইতেছে এইরূপ অবস্থাতে আমি কি করিয়া যাইব। নৌকা যে করিয়া যাইব এমন সাধ্য আমার নাই। ২।১ দিনের মধ্যেই আমি যাইব, ওখান হইতে আসিয়া আমি মাল লইয়া তোমার নিকট পত্র দিব। একা লোক খালি ঘর ফেলিয়া ১টি গাভী ফেলিয়া আমি কি কবিয়া যাইব। এই দুর্দ্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি দুঃসে আছি তাহা ভগবানই জানের। উহাঁদের তিন জন যাওযাতে আমার শরীলে একটুক বল পাইতেছি না। চাঁপাবালা বসিরহাট গিয়া শশুড়ের বাসায় ১৫ দিন মাত্র ছিল, উহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সোণার গয়না ইত্যাদি না নেওয়াতে মানে আব কি বুঝিয়া লইবে। হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। বৈশাখ মাসের ১০ তাং গিয়াছে জ্যৈ মাসের ২৭ তাং বিবাহ দিয়াছে। হেমীর মাকে বিবাহেতে লয় নাই। হেমীর মা তাহার কাকার বাড়ীতে আছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিবাহ দিয়াছে ঐ শোকে হেমীর মা পাগল হইয়াছে। হেমই বা কত কাদাকাটি করিয়াছে উহার মাও বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে, কাকী ধরিয়া স্নান করায় ও খাওয়ায় এই অবস্থাতে আছে। ছেলের বাড়ী মোদের দেশে নিন্দীপাড়া বিপিনের ভাই। এই মেয়ার বিবাহে কত আমোদ আহ্লাদ করিব। তাহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য্য করিল। হেম যে মায়ের জন্য কি প্রকার কান্দাকাটা করিয়াছে। তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব। তবু চাঁবাকে বাড়ীতে লইল না। জামাতার মুখ দেখে নাই বিবাহের নিয়ম কাজ যারে করে তাহাও করে নাই। আমি এই অশান্তিতে আছি। তুমি সর্ব্বদা পত্র দিব। তোমার পত্র পাইলে একটু শান্তিতে থাকি। মেয়ে জামাই লইয়া বাড়ীতে আসে নাই তাহার জন্য আশীর্ব্বাদ করিও। তোমাকে

পূর্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত রাঙামাটির চাষী নামে চিন্তামণি-র মুখপাতের পৃষ্ঠা

পরিস্থিতি

পরিস্থিতি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

প্যানিক

আপিসের বাড়িটি পশ্চিমমুখী। বাহিরে আসিয়াই ধনেশের চোখে পড়িল, আকাশটা আশ্চর্যরকম লাল। আকাশের খানিকটা পড়িয়াছে রাস্তার অপর দিকের বাড়ির আড়ালে। অন্তরালের ওই দিগন্তে নিশ্চয় স্তরে স্তরে সাজানো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মেঘ আছে। মেঘের প্রতিফলন ছাড়া আলোর ছটা এত রক্তিম হয় না।

হকারের চিৎকারে বুকটা ধ্‌ড়াস করিয়া উঠিল। এত জোরে চিৎকার করে কেন ? খবর জানিবার তীব্র আগ্রহে মনটা চড়া সুরে বাঁধা তারের মতো এমনই টনটন করিতেছে, ফিসফিস করিয়া 'জোর খবর' বলিলেই ঝনঝন করিয়া উঠে। এমন গলা ফাটানো আর্তনাদের তো কোনো প্রয়োজন নাই। দুটি পয়সা বাহির করিয়া ধনেশ একটা কাগজ কিনিল। অনেকেই কিনিতেছে। রবিবার তার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসিয়া একবার চোখ বুলানো ছাড়া খবরের কাগজের সঙ্গে জগদীশ কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখিত না, সেও আজকাল সকালে বিকালে কাগজ কেনে। একটু বেলা করিয়া তার বাড়িতে গেলেই বিনা পয়সায় কাগজ পড়িতে পাইবে জানে, কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না।

স্পষ্টই বলে, না ভাই, অত পয়সার মায়া করলে আর চলে না। যে সময় পড়েছে, একঘণ্টা আগে জানা পরে জানার ওপরেই হয়তো বাঁচন-মরণ।

এমন করিয়া বলে যে সর্বাঙ্গ যেন শিরশির করিয়া উঠে। মনে হয়, অতি সংক্ষিপ্ত একটি ঘণ্টা সময়ের ওপারেই যেন অনির্দিষ্ট ও অনন্যসাধারণ মরণ ভয়াবহ মূর্তিতে ওত পাতিয়া আছে, একটা অদ্ভুত অকথ্য সমাপ্তি ঘটিল বলিয়া !

জগদীশ তবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েকে মামাবাড়ি এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে। বাড়িতে সে থাকে একা, নিজে রান্না করিয়া খায়। যেমন হোক একজন ভাড়াটে পাইলে বাড়িটা ভাড়া দিয়া কোনো সস্তা মেস বা বোর্ডিং এ চলিয়া যাইবে। তার ভয় ভাবনা শুধু নিজের জন্য। স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে কোথাও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ধনেশের নাই। একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনিও আবার এমন জায়গায় থাকেন যেখানে নাকি ভয় আরও বেশি। এমন সঙ্গতিও তার নাই যে মফস্বলে কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দেয়।

কৃপণ ও বিচক্ষণ জগদীশকে দেখিলে সাধে কি হিংসায় তার বুকটা জ্বলিতে থাকে। মনে হয়, এই লোকটাই বুঝি তার মন্দ অদৃষ্টের জন্য দায়ি।

ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় জগদীশের গোলগাল মুখে ছোটো ছোটো চোখ দুটি পিটপিট করিতেছিল, ধনেশকে দেখিতে পায় নাই। ধনেশ নাগাল ধরিয়া বলিল, নতুন খবর কিছু নেই।

জগদীশ বলিল, তা নেই, কিন্তু—

জগদীশের মুখখানি চিন্তিত, বিমর্ষ। মাসখানেক আগে বউ আর ছেলেমেয়েরা যখন কাছে ছিল, তখনও তার চিন্তার অন্ত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সক্রিয় উত্তেজনার ভাবও তার মধ্যে দেখা যাইত। এক মাসের মধ্যে মানুষটা কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত পথিক যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য অবসন্নভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে, কথা বলিতে শুরু করিয়া সেও আজকাল তেমনইভাবে থামিয়া যায়।

একটা ব্যাপার ভালো ঠেকছে না।—ঘাড়ে বসানো মাথাটা জগদীশ ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকে, এ আর পি-র একটা বিজ্ঞাপন বার হচ্ছিল, সাইরেন বাজলে আশ্রয় নেওয়ার বিজ্ঞাপন, সেটা আজ ছাপেনি। আজকালের মধ্যে একটা কিছু হবে বোধ হয়, নইলে হঠাৎ--

ধনেশের মুখ পাংশু হইয়া গেল।—এমনি হয়তো বন্ধ করেছে।

তাই কখনও করে ? একটা বিজ্ঞাপন চলছিল, কী দরকার ওদের সেটা বন্ধ করবার ? এ তো আর তোমার খেয়াল খুশির ব্যাপার নয়, একটা মানে নিশ্চয় আছে। আমি ভাবছিলাম কি—

কথা বলিতে বলিতে দুজনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আরও কয়েকজন কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎকর্ণ, উদগ্রীব হইয়া আছে। ঢোঁক গিলিতে গিয়া জগদীশ প্রথম বারের চেষ্টায় ঢোঁকটা গিলিতে পারিল না।

—আমি ভাবছিলাম, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাত্রেই হয়তো একটা কিছু হয়ে যাবে, এটা জানাবার জন্য ওরা বিজ্ঞাপনটা বন্ধ করেছে। ভেবেছে, রোজ বিজ্ঞাপন বেরোয়, কেউ পড়ে না, আজ বন্ধ করে দিলে এদিকে সকলের নজর পড়বে। বিজ্ঞাপন ছাপলে যতটা কাজ হত তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না ছাপলে। এইসব ভেবে—

অপরিচিত যারা কথা শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজন সায় দিয়া বলিল, সেটা সম্ভব। আবার এও হতে পারে যে, খবরটা ওরা চেপে দিতে চায়। বিজ্ঞাপনটা নেই দেখে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববে এখন দু-চারদিন কোনো ভয় নেই।

আর একজন বলিল, যা বলেছেন মশায় !

ট্রামে উঠিয়া বসিয়া জগদীশ বলিল, এমন ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই কী বলব। দোটানায় পড়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়ে পাঠালাম এক জায়গায় উনি গেলেন আর এক জায়গায়, বিপদের সময় কার কাছে ছুটব আমি ? এখানে গেলে ওখানকার ভাবনা, ওখানে গেলে এখানকার ভাবনা। —দাও, একটা বিড়ি দাও।

বিড়ি নেই।

বিড়ি ছিল। জগদীশকে দিবে না। ট্রামে এতলোকের সামনেই লোকটাকে তার মারিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। সব সময় কেবল নিজের কথা ভাবে, নিজের কথা বলে। ভয়ভাবনা যেন তার একার, একচেটিয়া। ধনেশ যেন নিশ্চিন্ত মনে পরমসুখে দিন কাটাইতেছে, তার ভাবনা করিবারও কিছু নাই, বলিবারও কিছু নাই। এতকালের বন্ধু সে লোকটার, নিজে রাঁধিয়া ভালো খাইতে পায় না ভাবিয়া এক মাসের মধ্যে কতবার ওকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রতিদানে তাকে একদিন একটু মুখের সহানুভূতি জানানোর অবসরও ওর হয় না। যখন তখন শুধু শুনাইতে পারে, এবার পাঠিয়ে দাও হে, সকলকে এবার কোথাও পাঠিয়ে দাও, আর দেরি নয়।

জানাশোনা যত লোক শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে, জগদীশের মতো প্রিয়জনকে দূরে পাঠাইয়া নিজে যাওয়ার জন্য যারা প্রস্তুত হইয়া আছে, তাদের বিরুদ্ধে নিরুপায় বিদ্বেষ ও অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মানুষ সম্বন্ধে ধনেশের চেতনায় এক অদ্ভুত বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ট্রামে মানুষের ভিড়, পথে অজস্র লোক চলিতেছে। এতলোকের মধ্যে ভয়ার্ত ধনেশের নিজেকে একা, অসহায় মনে হয়। কেউ তার কথা ভাবিবে না, তার দিকে চাহিয়া দেখিবে না। শহরে শুধু চলাফেরা করিতেছে স্বার্থপর, হৃদয়হীন দুপেয়ে জীব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মুখোশ সকলের খসিয়া গিয়াছে।

মুখ ফিরাইয়া সে দেখিতে পায়, পিছনদিকের লম্বা সিটে বসিয়া একজন কী যেন বলিতেছে, আশেপাশে কয়েকজন মন দিয়া শুনিতেছে। রাস্তায় জগদীশের কথা শুনিয়া এই লোকটিই খবরের কাগজে এ আর পি-র বিজ্ঞাপন না থাকার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিল। বেশ বুদ্ধিমানের মতো চেহারা লোকটির। ভিতরের খবরও হয়তো কিছু কিছু রাখে। কাছে গিয়া শুনিলে হইত না কী বলিতেছে ?

বাড়ির সামনে ছোটো রোয়াকে বসিয়া ছোটো ভাই রমেশ পাড়ার ক্ষিতীশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। তার হাতে ছিল সিগারেট, মুখে ছিল হাসি। ধনেশকে দেখিয়া হাসি মিলাইয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। জ্বলন্ত সিগারেটটা আড়াল করার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। ধনেশের সামনে কোনোদিন সে সিগারেট খায় না। ঔদ্ধত্য দেখাইতে চাহিয়াও অভ্যাসের বশেই বোধ হয় একটু তাকে ইতস্তত করিতে হইল, তারপর সিগারেটটা মুখে তুলিয়া টান দিল জোরে।

আজ তিন দিন রমেশের সঙ্গে তার কথা বন্ধ।

রমেশ বউকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিতে আসিয়াছিল। শুনিবামাত্র ধনেশ যেন খেপিয়া গিয়াছিল একেবারে।

দাও, তাই পাঠিয়ে দাও। আজ পাঠিয়ে দাও—এই দণ্ডে। তুমিও থাকগে শ্বশুরবাড়ি—আমাদের সঙ্গে থেকে মরবে কেন !

চাকরি ছেড়ে আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব, তাই বুঝি ভাবলেন আপনি ?

ভাবব না ? বউমাকে রাখতে গিয়ে তুমি আবার ফিরে আসবে, অত বোকা বুঝিয়ো না আমায়।

না আপনি খুব বুদ্ধিমান। এত যদি বুদ্ধি আপনার, দিনরাত ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন কেন ? আপনাকে কদিন বারণ করেছি। আপনি কথা শোনেন না, পাগলের মতো করতে থাকেন। আপনাকে ও রকম করতে দেখলে বাপ মা ভাইবোনের জন্য ছেলেমানুষের ভাবনা হবে না ?

লাবণ্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া রমেশ বক্তৃতা আরম্ভ না করিলে হয়তো অন্ধ ক্রোধের প্রথম ধাক্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেও ধনেশ আত্মসম্বরণ করিতে পারিত। রমেশকেও দোষ দেওয়া যায় না। এ বাড়ির অস্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে লাবণ্যের মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সকলের অবিরাম পরামর্শ ও আলোচনায় ভয়ংকর সব সম্ভাবনা যতই অনিবার্য ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, বাপের বাড়ির সকলের জন্য সে তত উতলা হইয়া পড়ে। কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কপাল কুটিয়া অনর্থ করিতে থাকে। সে সমস্ত সহ্য করিতে হয় রমেশকেই।

ছেলে মানুষ ! বয়স ভাঁড়িয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বাপ, ছেলেমানুষ ! পারুল ছেলেমানুষ নয় ? পারুল যদি এখানে থাকতে পারে, তোমার আহ্লাদি বউও থাকতে পারবে।

পারুল ধনেশের বড়ো মেয়ে। বছর সতেরো বয়স হইয়াছে, মানুষকে বলা হয় চোদ্দো।

পারুল আমাদের কাছে আছে।

বউমাও তাই আছেন।

তখন রমেশও আর ধৈর্য ধরিতে পারে নাই।

সেই জন্যই সরিয়ে দিচ্ছি। এ বাড়িতে মানুষ থাকে না।

এ বাড়িতে মানুষ থাকে না, না ?—কী থাকে, জন্তু জানোয়ার ?

পাগল থাকে। আপনার মতো যাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে গেছে।

ঠিক পাগলের মতোই তখন দুপা সামনে আগাইয়া ধনেশ তার ত্রিশ বছর বয়সের ভাইয়ের গালে চড় বসাইয়া দিয়াছিল। ধনেশের নিজের বয়স পঞ্চাশের কাছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। মাঝখানে তিনটি বোন, তারপর এই ভাই। এত বড়ো উপযুক্ত ভাইকে চড় মারিয়া বসার ঝোঁক অবশ্য ওই একদিনের একটিমাত্র কলহে জাগে নাই। কিছুদিন হইতে মনটা বিগড়াইয়া যাইতেছিল।

মনে হইতেছিল, রমেশও বুঝি তার অবস্থা বুঝে না, তার কথা ভাবে না, অন্য সকলের মতোই সে স্বার্থপর। প্রথমে রমেশের নিশ্চিত নির্বিকার ভাব সে বুঝিতে পারিত না। যে খবর শুনিয়া তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, খবরটা মন দিয়া শুনিবার আগ্রহ পর্যন্ত রমেশের দেখা যাইত না। পরামর্শ

করিতে ডাকিলে কেমন উশখুশ করিতে থাকিত, বিরক্ত হইয়া বলিত, অত ভেবে লাভ কী ? আপিস যাইতেছে, আড্ডা দিতেছে, গান গাহিতেছে, বউ আর পারুলকে সঙ্গে করিয়া সিনেমায় যাইতেছে, কিছুই যেন হয় নাই, সর্বনাশ যেন ঘনাইয়া আসে নাই ঘরের দুয়ারে। বিস্ময়ের পর জাগিয়াছিল বিরক্তি ও ক্ষোভ আর সেই মনোভাব মনের মধ্যেই পাক খাইতে খাইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহের : ছেলে নাই, মেয়ে নাই, শুধু সে নিজে আর তার বউ, তাই কি রমেশ এমন নির্ভয় ও নিশ্চিত হইয়া আছে ?

তাই বটে। এ যুগের ভাই, বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছে এক স্কুলে পড়া ধিঙ্গি মেয়েকে, দিবারাত্রি সে মন্ত্র দিতেছে কানে কানে; তার কী দায় পড়িয়াছে দাদার ভাবনা ভাবিতে গিয়া মাথার টনক নড়িতে দিবার।

রমেশের প্রত্যেক কথা আর কাজে সে এই চিন্তার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল। তার সঙ্গে সে যে পরামর্শ করিতে চায় না তার কারণ তার দায়িত্বের ভাগ নেওয়ার ইচ্ছা তার নাই, নিজে কী করিবে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে সরাইয়া দিতে চায় বলিয়া তাকে সে তিন মাসের ছুটি লইয়া চেঞ্জে যাইতে বলে। পাটনায় একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে ? করিবে না, চাকরির ছলে এই তো তার সরিয়া যাওয়ার সময় ! খরচ কমাইয়া টাকা জমাইতেছে, তাকে বলে নাই, তার মানেও ধনেশ জানে। রমেশের গম্ভীর ও চিন্তিত হইয়া উঠিবার কারণ, তর্ক আর কথা কাটাকাটি আরম্ভ করার কারণ, শহরের হাজার হাজার লোক যে স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, সেইখানের বাপ-মা ভাইবোনের জন্য লাবণ্যকে উতলা হইতে পরামর্শ দিবার কারণ, সব ধনেশের কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

সুতরাং কারণে অকারণে খিটিমিটি বাধিতেছিল। কেউ কারও কথা সহ্য করিতে চায় না, পরস্পরের নিঃশব্দ উপস্থিতি পর্যন্ত সময় সময় দু জনের অসহ্য মনে হয়। মনের এই চিরন্তন প্যাঁচ, ঢিল দেওয়ার, আলগা করার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ। তারপর পুলককে উপলক্ষ করিয়া দু জনের মধ্যে কয়েকবার রীতিমতো ঝগড়া হইয়া গেল।

মুখ অন্ধকার করিয়া রমেশ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, পুলককে ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতে বলছেন ?

হ্যাঁ, কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুক। জবরদস্তি লড়াইয়ে পাঠাবার আইন পাশ হচ্ছে শুনলাম।

আইন পাশ হলে ওখানে ওকে ধরতে পারবে না ?

তুমি বোঝো ছাই। কলেজ থেকে নাম, ঠিকানা জেনে খুঁজতে আসবে, এখানে না থাকলে বলতে পারব, কোথায় গেছে জানি না। ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাও বলতে পারব। ধনেশের ভুরু কুঁচকাইয়া গেল, এ কথাটা তো আগে খেয়াল হয়নি ! কাগজে ওর নামে একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন আগে থেকে ছাপিয়ে দিলে তো মন্দ হয় না ?

আপনি ওর মাথাটা খাচ্ছেন দাদা। কোথায় আপনি কী গুজব শুনে আসবেন আর আপনার এতবড়ো জোয়ান মর্দ ছেলে চোর-ডাকাতের মতো লুকিয়ে বেড়াবে ! এর চেয়ে লড়াইয়ে গিয়ে মরা ভালো। আইন যদি পাশ হয়, লড়াইয়ে না যেতে চায়, জেলেই নয় যাবে। তাও ঢের ভালো।

তুমি তো তা বলবেই।

একটা বিশ্রী কলহ হইয়া গেল। কাকার কাছে বকুনি আর উপদেশ শুনিয়া পুলক একবার ঠিক করিতে লাগিল ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাইবে না, আবার উমার কান্না ও ধনেশের ধমকধামক যুক্তিতর্কে মত বদলাইয়া ফেলিতে লাগিল। ধনেশ ও রমেশের মধ্যে আরও কয়েকটা সংঘর্ষ হইয়া গেল, প্রচণ্ড এবং কুৎসিত। মনে হইল পুলকের ভালোমন্দের প্রশ্ন ভুলিয়া রমেশও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, তার জিদ চাপিয়া গিয়াছে যে পুলককে কোথাও সে যাইতে দিবে না।

এমনই যখন চলিতেছিল, লাবণ্যকে বাপের বাড়ি পাঠানোর কথাটা রমেশ তাকে বলিতে গেল এবং সংক্ষিপ্ত অর্থহীন কলহের পর ধনেশ তার গালে বসাইয়া দিল চড়। কদিন পরে মাসকাবারে বেতন ও ছুটি পাইলে রমেশ নিশ্চয় লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিবে। নিজে বোর্ডিং অথবা মেসে চলিয়া যাইবে।

মাঝখানের এ কটা দিন এমনইভাবে মুখের সামনে সিগারেট টানিয়া, নির্বিকার উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া, একা লাবণ্যকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া, তার সবচেয়ে গভীর হতাশা ও বিষাদের মুহূর্তে পাশের ঘরে ঠুংরি সুরে গান ধরিয়া দাদাকে আঘাত দেওয়া ও অপমান করার কাজে লাগাইতেছে।

সদরের চৌকাঠ পার হওয়ার সময় চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনদিনে রমেশের গায়ের জ্বালা কমে নাই। আজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়াছিল। পয়লা কি দোসরা তারিখে লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তারপর কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলিবে। বিপদের কথা নয়, ভয়ের কথা নয়, সংসারের সাধারণ কথা। কিন্তু তাকে দেখিবামাত্র সাপের মতো ক্রূর ভঙ্গিতে যে ফণা তুলিয়াছে, তার সঙ্গে যাচিয়া কীভাবে কথা বলা যায়।

সিগারেট খাক, সে জন্য নয়। ত্রিশ বৎসরের উপযুক্ত ভাই, সামনে খাইলেও দোষ হয় না। তবু একটু আড়াল দিবার, একঘরে থাকিলেও অন্তত তার পিছন দিকে জানালায় সরিয়া গিয়া সিগারেট টানিবার যে প্রথা ছিল, যুগযুগান্তের সংস্কারের চেয়ে সেটা কম বর্জনীয় নয়। রমেশ যে শত্রুতা করিতে চায় তার এত স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আর কীসে মিলিত ! একটি গাঁট ভাঙিলে শিকল ছিঁড়িয়া যায়, এই একটি নিয়ম ভাঙিয়া ভাই তার স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের বাঁধন ভাঙিয়া দিয়াছে।

বাড়ির মধ্যে ছোটো ছেলেমেয়ে দুটি প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। একজনকে মারিয়া উপরে গিয়াছে উমা, আর একজনকে পিটাইতেছে পারুল। ব্যাপারটা বুঝিয়া ধনেশ মুখ খুলিতে না খুলিতে তড়বড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া কী জোরে ধাক্কা দিয়াই সে পারুলকে হটাইয়া দিল। বেহায়া নচ্ছার মেয়ে খাইয়া খাইয়া গায়ে তার এতই কি তেল বাড়িয়াছে, সময় নাই অসময় নাই ভাইবোনদের মারে ?

তুমি মারলে আমায় ! তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিছু বললে না বাবা ?

পারুলের নাক ফুলিয়া উঠিয়াছে, সাদাটে সরু গলায় তিন চারটা নীল শিরা ফাঁপিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।—থাকব না তোমাদের বাড়িতে আমি আর। নার্স হয়ে যাব—এক্ষুনি নার্স হয়ে যাব।

আঁচল ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া মেয়েকে থামাইয়া উমা বলিল, কোথা যাচ্ছিস ?

আমি এক্ষুনি শীলাদির কাছে গিয়ে নাম লেখাব। ছেড়ে দাও বলছি আমাকে !

গা ধুইতে নীচে নামিয়াছে, গায়ে জামা নাই। ও সব যেন গ্রাহ্যও করে না, এমনিভাবে পারুল চেঁচাইতে থাকে। উমা আঁচল ছাড়িয়া না দিলে সে যেন বিনা কাপড়েই পথে বাহির হইয়া যাইবে, এমনই উন্মাদিনী মনে হয় তাকে। দেখিলে কল্পনাও করা যায় না, কয়েকমাস আগে এই পারুল ছিল ধীর, স্থির, শান্ত ও সংযত মেয়ে, চুপচাপ সংসারের কাজ করিত, মুখে ফুটিয়া থাকিত সলজ্জ নম্র হাসি।

তোরা কি আমায় পাগল করে দিবি ! ধনেশ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া লাবণ্য নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতেছে। নীচের উঠানে যা ঘটিতেছে সে সব যেন অজানা অচেনা প্রতিবেশীর বাড়ির ব্যাপার, তার কিছু বলারও নাই করারও নাই। ভাসুর আসিয়া দাঁড়ানোর অনেক আগে হইতেই সে এইভাবে এইখানে দাঁড়াইয়া উদাসীনের মতো সব দেখিতেছিল। মাজা বাসনের তাড়া উমা পা দিয়া ছুঁড়িয়া দিল—দিক। দু বছরের শিশুকে বেদম মারিয়া উমা উপরে উঠিল,—উঠুক। খেলা ফেলিয়া পাঁচ বছরের মিনু উপর হইতে সাবান

আনিয়া দিতে না চাওয়ায় পারুল তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।—করুক। মা যদি পাগলা গোরুর মতো মেয়েকে গুঁতায়, সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে যদি সদরের খোলা দরজার সামনে উঠানে কোমর পর্যন্ত উদলা করিয়া দাঁড়ায়, তাতেও তার কিছু আসিয়া যায় না। তার যে বাপ মা, ভাইবোন ওদিকে মরিয়া গেল, সাতদিন খবর আসে না !

লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়া ধনেশ চিৎকার করিয়া বলিল, তুমি কি একবার নীচে নামতে পার না বউমা ?

লাবণ্য ইঞ্চি দুই ঘোমটা টানিয়া দিল। ভাসুরের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা শাঁখের ফুঁ পড়ে, ঘরে ঘরে ধুনা দেওয়া হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বালিবার আগে মাটির প্রদীপটি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মিনিটখানেকের জন্য আলো দিয়া আসে। কিছুই বাদ যায় না, সব বজায় আছে। রান্নাঘরে রান্না হইতেছে, ছেলেমেয়েরা পড়িতে বসিয়াছে, রমেশের ঘরে রেডিও বাজিতেছে, দুধ খাইয়া প্রতিদিনের মতো কোলে শুইয়া ঘুমানোর জন্য খোকা আসিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব বজায় আছে। সকালে উঠিয়া চা খাওয়া, কাগজ পড়া, স্নানাহার সারিয়া আপিস যাওয়া, ছুটির পর বাড়ি ফেরা, খোকাকে ঘুম পাড়ানো, ছেলেমেয়েদের পড়া বলিয়া দেওয়া, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসা, খাওয়া এবং ঘুমানো। তবু সংসার তার বেঠিক বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, যেন ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া। বাহির হইতে একটা অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত প্রচণ্ড শক্তি চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া তার সংসারের আনাচে কানাচে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ভিতর হইতে বিরামহীন সক্রিয় একটা শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের।

খোকাকে কোলে শোয়াইয়া অভ্যাসমতো ধীরে ধীরে তাকে থাবড়াইতে থাবড়াইতে অবসাদে ধনেশের চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। এ আর পি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়াছে, জগদীশ আর ট্রামের সেই কাঁচাপাকা চুল বুদ্ধিমানের মতো চেহারার লোকটি বলিয়াছে, আজ রাত্রেই হয়তো কিছু ঘটিবে। এ চিন্তা মন হইতে দূর করিবার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। কিন্তু এই আতঙ্ক পর্যন্ত তার যেন আজ কেমন অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বুককাঁপানো উত্তেজনায় অবশ করা শিহরনের মতো মুহুর্মুহু শিরায় বহিয়া গিয়া মনকে দিশেহারা করিয়া দিতে পারিতেছে না। একসঙ্গে আর একটা আতঙ্ক তার চেতনাকে দখল করিতে চাহিতেছে—বাহিরের বিপদ ঘটিবার আগেই তার ঘর ভাঙিয়া যাওয়ার, সর্বনাশ হওয়ার আতঙ্ক। একটা বিষ যেমন আর একটা বিষের ক্রিয়া নাকচ করিয়া দেয়, সংসারের ভিত্তি ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে খেয়াল করায় নূতন এক ভয় তার এই কদিনের ভয়কে দুর্বল করিয়া গিয়াছে।

জগদীশ ডাকিতে আসিলে সে তাকে ফিরাইয়া দিল। পড়িতে পড়িতে ছেলেমেয়েরা অবিরত ঝগড়া আর মারামারি করিতেছে। ওদের স্বাভাবিক দুরন্তপনার মধ্যেও যেন কেমন খাপছাড়া বেপরোয়া হিংস্র ভাব দেখা দিয়াছে। মেজাজ যেন ওদেরও তিরিক্ষে হইয়া উঠিয়াছে। তারপর এক সময় ছেলেমেয়েরা ভাত খাইতে গেল, উমার গালাগালি আর মার খাইয়া পলটুর আর্ত ও মিনুর নাকিসুরে কান্না ধনেশের কানে আসিতে লাগিল। চুপ করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। অবসাদ ধীরে ধীরে কেমন একটা মৃদু ও শান্ত নেশায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, দুর্বল জ্বরো রোগীর আলস্যের মতো। ঘরের বাহিরে বারান্দায় হঠাৎ পারুল আর লাবণ্যর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হইয়াছে। সেই পারুল আর সেই লাবণ্য ! সখীর মতো গলায় গলায় ভাব ছিল এই দুটি ভাসুরঝি আর কাকিমার। কাড়াকাড়ি করিয়া লাবণ্য সংসারের কাজ করিত, উমার ছেলেমেয়ে মার চেয়ে কাকিমার আদর পাইত বেশি। সংসারের কাজ করা লইয়া পারুলের সঙ্গে আজ সে ঝগড়া করিতেছে ! একতলা হইতে উমা চিৎকার করিয়া একটা বিশ্রী কথা বলিল লাবণ্যকে। লাবণ্য ঝাঁজালো গলায় জবাব দিল, তোমার খাই না পরি যে যা মুখে আসছে বলছ দিদি ?

লাবণ্য এত জোরে কথা বলিতে পারে ? এত কর্কশ তার গলা ?

অনেকক্ষণ পরে কী কাজে ঘরে আসিয়া ধনেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। উমা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি পাড়ায় দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে বাহির হইয়াছে। বাড়িতে তার তো চুপচাপ একা বসিয়া থাকা স্বভাব নয়, বাড়ি থাকিলে এতক্ষণ কত আলোচনা, কত পরামর্শ তার চলিতে থাকে।

কী হয়েছে গো ? আজ কিছু হবে নাকি ? ভয়ে উমার কথাগুলি প্রায় জড়াইয়া গেল।

শরীরটা ভালো নেই। পুলক ফেরেনি ?

না। ঘরে বসে আছ, খেয়ে তো নিতে পারতে এতক্ষণ ? সারারাত হেঁসেল আগলে বসে থাকব ?

সকালে চার বস্তা চাল, এক বস্তা ডাল এবং নুন, তেল, মশলা মুদি দোকান হইতে আনা হইয়াছিল। বাজারে গিয়াছিল মাছ তরকারি কিনিতে, রসিকবাবু এমন ভয় দেখাইয়া দিলেন যে মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে আর ভরসা হইল না, ধার করিয়াই জিনিসগুলি কিনিয়া আনিল। মাস ছয়েকের খাদ্য বাড়িতে সঞ্চয় করা আছে তবু আরও কিছু অবিলম্বে এই দণ্ডে সংগ্রহ করিয়া ফেলাই ভালো। মুদিওয়ালা কি সহজে ধার দিতে চায় ! বিশ বছরের যে খদ্দের, তাকে পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্য বাকি দিতে সে নারাজ। বিকালে টাকা পাঠাইয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে ধনেশ জিনিসগুলি পাইয়াছিল।

পুলককে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, এখনও সে ফেরে নাই। কদিন সে বাড়ি ফিরিতে এমনই রাত করিতেছে। কোথায় যায়, কী করে ছেলেটা, কে জানে। সেও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তিন চারবছর আগে বয়স যখন তার পনেরো-ষোলো বছর, অকারণে তার চেহারা খারাপ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বভাব হইয়াছিল মেয়েদের মতো লাজুক, চোখ তুলিয়া কারও মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে বয়সের বদভ্যাস ছেলেকে ধরিয়াছে টের পাইয়া কত রাত্রি ধনেশের তখন ঘুম আসে নাই। তারপর ছেলের চেহারায় লাবণ্য ফিরিয়া আসিলে, স্বভাব স্বাভাবিক হইলে, ধনেশের যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। খাইতে খাইতে ধনেশের মনে পড়িল, কিছুদিন হইতে পুলকের চেহারা আর চালচলনে আবার যেন সেই আগেকার শোচনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দেখিয়াও এতদিন সে দেখে নাই। চারিদিকের অস্বাভাবিকতার পীড়নে, তার দিশেহারা ভয়-ভাবনার ছোঁয়াচে, আবার কি ছেলেটা বিগড়াইয়া গেল ?

মুখে ভাত রুচিল না। অর্ধেক খাইয়া ধনেশ উঠিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল পুলকের। আজ একবার ভালো করিয়া ছেলেটাকে চাহিয়া দেখিতে হইবে, তার কী হইয়াছে। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল, সংসারের কাজ ফুরাইয়া গেল, নীচের ও উপরের আলোও নিভিয়া গেল। শুধু আলো জ্বালিয়া ধনেশ আর উমা বসিয়া রহিল ছেলের অপেক্ষায়। শ্রান্তিতে ধনেশের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শঙ্কায় মন তার সজাগ, সচেতন হইয়া রহিল।

পুলক ফিরিয়া আসিল রাত্রি প্রায় একটার সময়। গলিতে রিকশার আওয়াজ শুনিয়াই ধনেশ ও উমা নীচে নামিয়া সদর খুলিয়া দিয়াছিল। পুলক রিকশা হইতে নামিল, ভাড়াও মিটাইয়া দিল। সমস্ত শরীর শক্ত আর সোজা করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সময় চৌকাঠে পা বাধিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া ধনেশের ধমকে উমা চুপ করিয়া গেল। পুলক নিজেই তখন উঠিয়া বসিয়াছে।

ছেলেকে কড়া কথা বলার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। শ্রান্তকণ্ঠে অসহায়ের মতো সে শুধু প্রশ্ন করিল, মদ খেলি কেন পুলক ?

পুলক বলিল, কেন খাব না ? কদিন বাঁচব আর, তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে কি, দুদিন বাদে সব তো ফুরিয়ে যাবে, আয় একটু ফুর্তি করে নি।—

সাড়ে সাত সের চাল

আঁধার রাত। গাঁয়ের নিঝুম পথ।

বেলে মাটির কাঁচা নরম পথে সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছিল। পথের এই গুণের কথা সন্ন্যাসীর মনে ছিল না। স্টেশন থেকে তিন মাইল দূর সালাতি পেরিয়ে আরও চার মাইল হেঁটে পলাশমতিতে পৌঁছবার কষ্ট সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। দেহ বড়ো দুর্বল, কোমর আর হাঁটুতে ব্যথা, মনে মনে সর্বাঙ্গের পুঞ্জীভূত ব্যথিত অবসাদ। প্রথমটা সন্ন্যাসী স্টেশনেই শুয়ে থাকবে ভেবেছিল। চার পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে স্টেশনের শেডটার নীচে চিতপাত হয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বাড়ির দিকে রওনা হবে !

কিন্তু সন্ন্যাসী হিসেবি লোক, কল্পনা করতেও ভারী পটু। সে হিসেব করে দেখল, সাত মাইল পথ তাকে হাঁটতেই হবে, রাতেই হোক বা ভোরেই হোক ! এক কাপ চা খেয়ে খিদেকে মেরে ফেললেও মরা খিদে রাত ভোর জীবনীশক্তি শুষে শুষে আরও একটু কাহিল করে ফেলবে তাকে। ঘুম ভাঙতে হয়তো তার বেলা হয়ে যাবে। জিরিয়ে জিরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয়তো এত দেরি হবে যে সঙ্গে তার সাড়ে সাত সের চাল থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকের মধ্যাহ্ন ভোজনটা ফসকে যাবে।

হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কল্পনা করে—না খেতে পেয়ে ক জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে ! ক জন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে ! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে—তাদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে—তার সাড়ে সাত সের চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবন মরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো—

সর্বনাশ !

সঙ্গে কিছু ছোলাও আছে। সন্ন্যাসী তাই কিছু ছোলা চিবিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে রাত্রেই রওনা দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদকে মোটে ক্ষয় করেছে চারটি তিথি। এমন জবর জ্যোৎস্নায় নরম পথে হেঁটে মনের মতো কষ্ট পাওয়া অসম্ভব। শালা, কী টানেই বাড়িটা টানছে তাকে, অনেকেই হয়তো যেখানে ভূত হয়ে গেছে মরে, সোনা বউঠান সুদ্ধ।

প্রথম গাঁ সালাতিতে বরাবর একপাল কুকুর থাকত। পথিকে গাঁ ভেদ করে যেতে গেলেই তাদের সমবেত চিৎকারে ঘুমন্ত রাত চিরকাল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনোদিন কাউকে তারা কামড়ায়নি, তাড়াও করেনি, শুধু হল্লা করেছে প্রাণপণে। তবু ভয় একটু করেছে পথিকের, হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। সন্ন্যাসীর হাতে লাঠি ছিল না, গাঁয়ে ঢুকবার আগে একটা ভাঙা বাড়ির বেড়া থেকে একখণ্ড রাখারি সে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। কিন্তু থপথপ পা ফেলে গাঁয়ের সীমানা সে পার হয়ে গেল, কুকুরের সে প্রচণ্ড কলরব তার কানে এল না। দু-চারটে খেঁকি কুকুর শুধু নির্জীব ভাঙা আওয়াজে একটু সাড়া জানিয়েই চুপ হয়ে গেল।

মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠান্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে উঠল—গাঁ পেরিয়ে যাবার পর। এখানে পথের দু পাশে শুধু মাঠ আর জলা। সামলে নিতে থমকে দাঁড়িয়ে এলোমেলো নিশ্বাস নিতে নিতে সন্ন্যাসী চারিদিকে তাকায়, স্পষ্ট বুঝতে পারে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল এই নির্জন বিস্তৃতির মধ্যে মনটা

তার ছোটো হয়ে গেল। তারই আতঙ্কে মনটা কুঁচকে গেল, ভাঁজ হয়ে গেল। শালা, চোখেও যে ঝাপসা দেখছে !

মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আগেই সন্ন্যাসী কায়দা করে বসে পড়ে পথে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিল হাতের তালুতে। কতকাল সে পেট ভরে খায়নি, প্রাণপাত করে শুধু খেটেছে। মাঝে মাঝে এ রকম হয় তার খানিক পরেই কেটে যায়।

খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার চলতে শুরু করল। হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হল শরীর যেন তার হালকা হয়ে গেছে, তার কোনো বোঝা নেই ! চালের পুঁটুলি কাঁধে নেই, সেই পুঁটুলির বাড়তি কাপড়টুকুতে বাঁধা ছোলাগুলিও সেই সঙ্গে গেছে। কোথায় পড়ল ? কখন পড়ল ? কুরু কুরু কুরু করতে লাগল সন্ন্যাসীর পিঠের খানিকটা মেরুদণ্ড। তার হিসাব, তার কল্পনা, সব ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথা ঘুরে পড়তে গিয়ে যেখানে বসে পড়েছিল সেইখানেই যে পুঁটুলি দুটির থাকার সম্ভাবনা বেশি, এটুকু খেয়াল করে আশান্বিত হবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজের দেহটাকে সে উলটো দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু গিয়েই পুঁটুলিটা পড়ে আছে দেখেও তার বিশেষ ভাবান্তর হল না। পুঁটুলির পাশে বসে মস্ত একটা আটকানো নিশ্বাস ফেলে সে শুধু নিশ্চল হয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল।

পলাশমতির কাছে পৌঁছে সন্ন্যাসীর মনে হল, সে যেন আবার আগের গাঁ সালাতিতেই ঢুকতে যাচ্ছে। পথের ধারে সালাতির যে প্রথম ভাঙা বাড়ির ভাঙা বেড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাখারি সংগ্রহ করেছিল, পলাশমতিতে প্রবেশ পথের ধারেও তেমনই একটি ভাঙা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঞ্ছার বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়ি শূন্য, মানুষ নেই।

বাঞ্ছা !

সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল। দু-একটি দুঃস্থ কুকুরের তেমনই ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে আর সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে—নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুনপাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে যেন জিজ্ঞাসা করল, কে ? সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোনো কিছুর চলার মচমচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট-ন বছর মেরামত হয়নি। তবে যা কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙে পড়েনি এখনও। বেড়া নেই। পাশের ছোটো কলাবাগান আর সবজি খেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।

দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল সন্ন্যাসী। বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে আগুন জ্বলেছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরেনি। কোনো মতে কুড়িয়ে পেতে একমুঠো দুমুঠো খেয়ে মরোমরো অবস্থায় ছেলে-বুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই বেঁচে আছে।

মনাদা !

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকল সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

মনাদা।

সাড়া নেই।

সুবল কাকা।

সাড়া নেই।

সুখী পিসি !

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিল।

সোনা বোঠান।

সাড়া নেই।

সোনা বোঠান ! সোনা বোঠান !

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আর একটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।

ভিতরের দুটি ঘরের একটিতে দরজার উপরে শিকলে তালা আঁটা, দরজার পাট থেকে ভেঙে খসে এসে শিকলটা ঝুলছে। অন্য ঘরটির দুয়ার সপাটে খোলা।

কোনো ঘরে কেউ নেই। তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে। সবাই ? দাওয়ায় সাড়ে সাত সের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটার হদিস পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচেছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বউঠান সুদ্ধ ? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল ?

কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বউঠান সুদ্ধ ?

ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।

প্রাণ

মালতীর ফিরতে আজ দেরি হচ্ছে। বেশি রকম দেরি হচ্ছে। কোথায় উঠে গেছে সূর্যটা আকাশে। ক্লেশকর একটা অনুভূতি পাক দিতে থাকে অটলের মধ্যে তার একঘেয়ে একটানা চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে। মালতীকে আজ সে খুন করবে, নিশ্চয় খুন করবে, যদি—হ্যাঁ, অবশ্য যদি কাজ সে হাসিল করে না আসে। দেরি হোক মালতীর, দেরি হওয়া তার আশ্চর্য নয়, তাতে কিছু এসে যায় না। সে জন্য অটলের রাগ বা জ্বালা নয়। মালতী ফিরে এসে যদি জানায় আজও বাবুর সাথে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে আসতে পারেনি, লজ্জায় ভয়ে পারেনি, তা হলে অটল ফেটে যাবে রাগে : মালতীকে টের পাইয়ে দেবে তার রাগ কী জিনিস, তার অবাধ্য হওয়ার ফল কী। সে অবশ্য পরের কথা। সব ঠিকঠাক করেই হয়তো আসবে মালতী। দেরি হয়তো হচ্ছে সেই জন্যই। বাবু তো আবার মান্যিগন্যি মানুষ, সুযোগ সুবিধা আড়াল না পেলে মালতীর সাথে কথাই বা বলবে কী করে, লোকে দেখলে বলবে কী ! মালতীও হয়তো হাঁ করে আছে সুযোগের জন্য, মেয়ে মানুষ তো। তবে, শকুনটার নজর যখন পড়েছে মালতীর ওপর, মালতীর কথায় রাজি সে হয়ে যাবে। খুশি হয়েই রাজি হবে, বেশি রকম আগ্রহের সঙ্গে কথাটা যতবার ভাবে অটল ততবারই মনে মনে ছ্যাছ্যা করে। জনপ্রাণী থাকলে মালতী পারবে না, তার ভয় হবে লজ্জা করবে, এতে খাঁটি গেঁয়ো ভীরু লাজুক বউ বলে মালতীর দাম বাড়বে ব্যাটার কাছে। কী বোকাই সে বনবে অটলের বুদ্ধিতে—সে আর মালতী দু জনেই !

কতকাল ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে এসেছে, উপোস করে দিন কাটাচ্ছে কী অবস্থায় লজ্জা ঘেন্না বরবাদ করে, আজও সে আছে ভীরু লাজুক গেঁয়ো বউ ! চোখের সামনে কতলোকের কত বউকে কী হয়ে যেতে দেখল অটল, নিজের বউ বলে যেন বাদ পড়েছে মালতী। মালতী অবশ্য বলে যে আজও সে সতী আছে। পেটের দায়ে ছাড়াছাড়ি হোক তাদের সকালে দুপুরে, ফিরতে কোনো কোনো দিন রাত হয়ে যাক যেদিন যেমন কাজ জোটে সারতে, তাই বলে সে অসতী হবে কেন, মুখপোড়া বজ্জাত !

মালতী ঝগড়া করে, গাল দেয়, কাঁদেও। কে জানে, তাই হয়তো হবে। এত দুর্দশা সয়েও তাকে তো আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সে এই ভাঙা নোংরা চালায় শেয়াল কুকুর তাড়িয়ে। হয়তো তাই হবে !

কিন্তু মালতী সব ভেস্তে দিয়ে এলে তার যে জ্বালা হবে সে কথা ভেবে এখন থেকে দগ্ধ হচ্ছে অটল।

হীরু, খলিল, রাধারা ফিরে এসেছে ছোটো মগের কম মাপের পাতলা খিচুড়ি নিয়ে। আর যা কিছু জোটাতে পেরেছে মিলিয়ে একসঙ্গে একবারে খাবে, নইলে মনে হয় যেন এক চুমুক একটু নোনা ঘন জল খাওয়া হল। ভাঙা পোড়ো বাড়িটার সব আনাচ-কানাচ ওরা দখল করে আছে, যে কটা ঘরের আধখানা সিকিখানা ছাদ ঝুলে আছে তার নীচে, ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে থাকলেও সরু ইটের ভাঙা দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে থেকে দুদিক তিনদিক যেখানে আড়াল করছে। সিদ্দিকের বউ সেদিন মারা পড়েছে সাপের কামড়ে। প্রথম এসে অটল ওখানে আশ্রয় খুঁজেছিল। ঠাকুরদারও ঠাকুরদার আমলের হোক, তার জন্মের আগে থেকে পরিত্যক্ত হোক, ইটের বাড়ি তো, সঙ্গীও আছে। ওরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দল বেঁধে হইহই করে, তাদের এই ভাঙা চালার আশ্রয় থেকে এখন তারা যেমনভাবে কুকুর তাড়ায়।

যাসনি বুঝি ? হীরু শুধিয়েছিল ফিরবার সময় দশজনকে শুনিয়ে, অ ! তোর বউ—ই তো গেছে !

দু মাস কি তিন মাসের ছেলে রাধার বুকে—বুক আর কই, শুধু পাঁজর। চিঁচি গলায় সে শুনিয়েছিল, মরণ হয় না ? শরম লাগে না ? বেহায়া বাঁদর ?

ওদের হাসি টিটকারির মানে ছিল সোজা। ওরা টের পেয়েছে, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর দিকে। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চালা আর নর্দমার মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অটল টানছিল কাল সন্ধ্যায় স্টেশনে কুড়ানো আধপোড়া চুরুটটা। সেই থেকে একটা অসহ্য অনুভূতি কেবলই পাক দিয়ে উঠেছে অটলের মধ্যে : মালতী যেন এসেই গিয়েছে সব কিছু ভেস্তে দিয়ে। মালতীর দিকে নজর পড়েছে বাবুর ! মালতী এনে দিচ্ছে আর ঘরে বসে সে রাজভোগ খাচ্ছে ! ওরা কি জানে কাল থেকে একটু খিচুড়িও সে খায়নি—একটু দেরি হওয়ায় তারা পায়নি খিচুড়ি। কোথাও কিছু জোটেনি কাল তাদের, কাজে যায়নি মালতী, তার চাপড় খেয়েও যায়নি। এক বেলা পেট ভরল না, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর ওপর।

ধুলায় ধূসর হয়ে মালতী ফিরে আসে। কাপড় তার মাটির মতোই ময়লা, তারও ওপর আর এক পরত ধুলোর আস্তরণ পড়েছে বেশ বোঝা যায়। বড়ো রাস্তায় সারাদিন অফুরন্ত ট্রাক চলাচল করে চারিদিক কাঁপিয়ে, ঘন হয়ে ধুলো ওড়ে চারিদিক অন্ধকার করে।

ভর্তি থলিটা মালতী কাঁখে নিয়ে আঁচল দিয়ে ঢেকে আড়াল করে বয়ে এনেছে। নামিয়ে রেখে সে আস্তে আস্তে হাঁপায়। এইটুকু থলি ! এক কাঁখে ছেলে, আর এক কাঁখে জলভরা কলসি বয়েছে মালতী ওবছর, ধানসেদ্ধর হাঁড়ি নামিয়েছে অবহেলায়। তখন খাসা চেহারা ছিল ওর। শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে আজ, হাড়গুলি *ঠেলে ঠেলে* উঠেছে। তাই বুঝি ভালো লেগেছে বাবুর। ছিপছিপে গড়ন, বয়স কম লাগে—। ছ্যাছ্যা করে অটল মনে মনে।

কী আনলি ?

অনেক কিছু দিয়েছে বাবু মালতীকে থলি ভর্তি করে। চাল ডাল তরকারি—আলু বেগুন শিম আর আস্ত একটা বাঁধাকপি। শালপাতায় জড়ানো খানিকটা মাংস। মিকচারের শিশি ভরা সোনালি সরষের তেল। পুরানো একখানা সাঁফ ধুতি আর সাবান—কার্বলিক সাবান।

চেয়ে চেয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দ্যাখে অটল, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মালতী। মিনতি করে বলে, ভরে ফ্যালো—ঢেকে ফ্যালো।

চারিদিকে ফাঁক, বাবু যা আগাম দিয়েছে কে দেখে ফেলবে কে জানে ! চোখের পলকে রটে যাবে চালায় চালায় পোড়োবাড়ির আশ্রয়ে আশ্রয়ে, কত কী উপার্জন করে এনেছে মালতী, হিংসায় বিদ্বেষে জ্বলে যাবে কতগুলি বুক, কথায় বিঁধে বিঁধে পাগল করে দেবে মালতীকে।

নে নেকামি রাখ। বেলা দুপুর হল, রাঁধবি কখন খাবি কখন ?

বাঁধাকপিতে হাত বুলায় অটল, টিপে টিপে দেখে—নারকোলি বাঁধুনির খাসা ঠাসা কপি। ও বছর বাড়ির লাগাও জমিটুকুতে সে কপি লাগিয়েছিল গন্ডা সাতেক। কী তেজি আর ভারী হয়েছিল কপিগুলি। বিশটা কপি বেচে দিয়েছিল পঞ্চুকে—ঠক, চোর, বেজন্মা পঞ্চু ব্যাটাকে। বোকা পেয়ে কী ঠকানটাই তাকে ঠকিয়েছিল। আর শুধু পঞ্চুই বা কেন ? নকুড়বাবু, জাফর মিয়া, নায়েববাবু ঠকাতে ছেড়েছে কে তাকে ধানে, জমিতে সব দিক দিয়ে ?

প্যান প্যানিয়ে কী বলছে মালতী ? শুধু চাল, ডাল সে হাঁড়িতে চড়াতে চায়, অন্য সব আজ তোলা থাক, লুকানো থাক। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, লোকেও টের পাবে না তারা বিশেষ কিছু রান্না করে খাচ্ছে !

হাঁড়িতে তরকারি ছেড়ে দি, শিগগির হবে, তেল নুন মেখে—

বাবুর সঙ্গে মালতী সব ঠিক করে না এলে যে রকম রাগ করবে ভেবেছিল, সেই খুন করা রাগে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে অটলের। চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে মালতীকে সে মাটিতে পেড়ে ফেলে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে হন্যে কুকুরের মতো দাঁত বার করে ফোঁসে, খেয়ে এয়েছিস বুঝি পেট পুরে ?

খেয়ে এলে এত জিনিস দিত ? দমের সঙ্গে আর্তনাদ আটকে মালতী বলে ফিসফিসিয়ে, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলে রাধা, মতি, বিদুর মা, সুবালা এরা সবাই হয়তো ছুটে আসবে, টের পেয়ে যাবে সব।

মেরে ফেলব, খুন করে ফেলব, ন্যাকামি করবি যদি। বলে অটল তাকে রেহাই দেয়। অটলের খুশিমতো রান্নার সমারোহ হবে। ভাত আর ডাল ভিন্ন ভিন্ন নয়—তাতে অনেক সময় লাগবে, উপোসি অটলের অত ধৈর্য নেই। চাল ডাল এক সাথে চড়ুক এক হাঁড়িতে, তাতে সিদ্ধ হোক কয়েকটা আলু আর শিম। বেগুন একটা পোড়া দেওয়া হোক উনানে। মাংস দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি হোক অন্য উনানে ভাঙা কড়াইটাতে—অন্য উনান কই ? সে ভাবনা মালতীর কেন !

পোড়া বাড়ির ইটের স্তূপ থেকে ইট এনে অটল উনান বানিয়ে দেয়। পোড়োবাড়ির পিছনের জংলা বাগান থেকে শুকনো ডালপাতা কুড়িয়ে এনে দেয় তিন দফায়—তারপর আর একবার জ্বালানি সংগ্রহের চেষ্টায় বার হতে গিয়ে থমকে থেমে পেটে কবার হাত চাপড়ে চাপড়ে বলে, আমি এক নম্বর বোকা ! জানিস বউ, এক নম্বর বোকা আমি ! টান দিয়ে বেড়ার খানিকটা পেড়ে ফেলে সে মালতীর দিকে এগিয়ে দেয় উনানে গুঁজবার জন্য। দ্যাখ দিকি খেয়াল হয়নি, আজ এখানে শেষ। বেড়াটা থেকে আর কী হবে ? মিছে ছুটোছুটি করে মরলাম জ্বালানির লেগে।

কেন এমন করতেছ ? মালতী বলে কেঁদে কেঁদে, ওরা এসে শুধালে কী বলবে কোথা এত জিনিস পেলে ? চুপচাপ থাকো তোমার পায় ধরি।

শুধাবে ? কে শুধাবে ? মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব না !

মালতী কাঁদছিল আগে থেকেই কিন্তু এবার এতক্ষণে সেটা খেয়াল হয় অটলের। খিদের জন্য তো নয়, খিদে মরে গেছে অনেকদিন, একবেলা পেট ভরে খাবার জিদে তার যেন নেশা হয়েছিল, গায়ে জোর বেড়েছিল। আর কিছু করার নেই, বসতে না বসতে ঝিম ধরে সে ঝিমিয়ে যায়। কদিন থেকে মালতীর এমনই ধরনধারণ ধাঁধার মতো লাগছে তার কাছে। কদিন থেকে ? বাবু যেদিন লোক মারফত ওকে বিশেষ টিকিট পাইয়ে দিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দুধ খাইয়েছে, শিশু আর প্রসূতিদের বরাদ্দ দুধ, সেদিন কি তার পরদিন থেকে। বেশ তিরিক্ষে কাঠখোট্টা হয়ে উঠছিল মালতী গেরস্ত ঘরের বউ মানুষের হায়াটায়া সব ভুলে গিয়ে, মতি রাধা এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাকচতুর হয়ে উঠেছিল একটু বেশি আদায় করার ফন্দিফিকিরে, কথা বলতে শিখছিল চটাং চটাং। মতি রাধাদের সঙ্গে খেঁকি কুকুরের মতো সমানে সে ঝগড়া চালিয়েছে, মুখে তুবড়ি ছুটিয়েছে নতুন শেখা নোংরা কথার ! বাবু ক দিন দুধ আর খাবার খাওয়াবার পর থেকে কেমন যেন সে ঝিমিয়ে মিইয়ে গেছে, শান্ত ভালো মানুষ হয়ে গেছে। ঘর ছাড়ার পর ঘরের কথা গাঁয়ের কথা অটল কোনোদিন শোনেনি ওর মুখে, এই কদিন মাঝে মাঝে কী যেন ভাবতে ভাবতে আনমনে ঘর সংসার আপনজন চেনা মানুষের কথা সে বলে—পুরানো হারানো দিনের কথা। এতকাল পরে হঠাৎ নতুন করে যেন ওর ঘর সংসারের জন্য কষ্ট আরম্ভ হয়েছে।

রান্না শেষ করে খেয়ে উঠতে বেলা পড়ে আসে। খেতে সময় লাগে খুব কম। যে রকম ভোজ খাবে ভেবেছিল অটল তা হয় না, অল্প খেয়েই পেট ভরে যায়, জিভে স্বাদ লাগে না। না খেয়ে না খেয়ে খাওয়ার ক্ষমতাও গেছে। তবু এ পেট ভরেই খাওয়া, দিনের পর দিন যা খেয়ে পেট ভরত না তার দশগুণ তো বটে—পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন। খেতে খেতেই কীসের যেন ঝাঁঝ, কত যেন জ্বালা

জুড়িয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করে অটল, একটানা একটা যে অদ্ভুত আওয়াজ প্রায় অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তা যেন ঝিমিয়ে আসতে থাকে দুই কানে। খেয়ে উঠে অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হতে থাকে প্রথমটা, হঠাৎ ওজন বেড়ে দেহটা যেন দশগুণ ভারী হয়েছে, ভেতর থেকে বুকে কীসের চাপ পড়ায় শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, মাথাটা হয়ে গেছে হালকা, শূন্য। তারপর ঘনিয়ে আসে গভীর আলস্য আর অবসাদ। দুঃখ কষ্ট অস্বস্তি জ্বালাবোধ সব কমে গিয়ে সৃষ্টিসংসার বুঁদ হয়ে আসে নেশায়, গভীর ঘুমে।

অটলের যখন ঘুম ভাঙল, রাত্রি হয়ে গেছে। এমন খাপছাড়া অদ্ভুত লাগে তার নিজেকে যে খানিকক্ষণ ধাঁধা লেগে সে থ মেরে থাকে। গাঁয়ে নতুন খড়ের মোটা চালার নীচে মাটির পুরু দেওয়াল ঘেরা তার নিজের ঘরেই যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তামাক টানার ইচ্ছায় কাতর হয়ে। হাত তার দু-তিনবার প্রায় এগিয়ে যায় পাশে মালতীকে ঠেলে দিতে, গলা দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসে তামাক দিতে বলার কথা রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে তামাক সেজে দিতে বললে মালতী রাগ করত না। তার জানা ছিল, তামাক খেয়ে অটল তাকে আদর করবে।

মালতী আগেই উঠে বসেছিল।

সশব্দে প্রকাণ্ড হাই তুলে অটল জিজ্ঞেস করে, ডাকলি না যে ?

ঘুমুচ্ছো, কী হবে ডেকে।

গলা ভারী মালতীর, বোধ হয় কাঁদছে। তেমন উদ্ভট লাগে না কান্নাটা এখন। গা জ্বালা করে না। শুধু মনে হয়, মালতী যেন অনেক দূরে বসে কাঁদছে।

যাবি না ?

আরও রাত হোক।

খেয়ে নিলে হত না ?

পরে খাব। তুমি খাবে তো খাও।

থাক, এক সাথে খাব।

অটলের গলা আশ্চর্য রকম মিষ্টি লাগে মালতীর কাছে, অনেকদিন শোনেনি। গলাটাই কেমন কর্কশ হয়ে গিয়েছিল তার, মাঝে মাঝে মিষ্টি কথা বলতে চাইলেও কড়া শোনাত। মালতী তাই অনেকদিন পরে জোরে কেঁদে ওঠে আদর-চাওয়া ভরসা-চাওয়া পুবানো কান্না।

আমি যাবনি। ডর লাগছে মোর।

অটল খিঁচে ওঠে না, ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলে না যে পথে-ঘাটে গন্ডা গন্ডা পুরুষ নিয়ে যার কারবার, বাবুর মতো ভদ্দরলোকদের কাছে একটা রাত কাটাতে তার ডর লাগছে ! হাত বাড়িয়ে সে হাত ধরে মালতীর, ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলে, তোর ডরটা কীসের ? একটা রাতও পুরো নয়। বাবু ভদ্দর লোক, লেখাপড়া জানা লোক, গুন্ডা তো নয়, তোর ডরটা কীসের ? একটু না করবি তো এমনই দিন কাটবে মোদের ? দুদিন বাদে সেই তো পড়বি দালালের হাতে, নয়তো ক্যাম্পে যাবি, ছিনিমিনি খেলবে তোকে নিয়ে ? তার চেয়ে বরং একটা রাত, একটা রাতও পুরো নয়, মদটদ খেয়ে বাবু বেহুঁশ হয়ে ঘুমোলে দোর খুলে দিবি মোকে——

বলতে বলতে বাইরের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চালার আবছা অন্ধকারে হুড়মুড় করে এসে ভিড় করে তাদের গত মাসগুলির বীভৎস অভিজ্ঞতা—ক্ষুধার জ্বালা, আশ্রয়ের অভাব, শীত, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নোংরামি, মৃত্যু। অটলের গলা কর্কশ হয়ে উঠতে থাকে, খেঁকি কুকুরের আওয়াজের আভাস আসে।

রাতারাতি উধাও হয়ে যাব দুজনে যা পারি বাগিয়ে নিয়ে। সুখে থাকব। বাবুকে বলেছিস তো বাড়িতে লোক থাকলে যাবি না ? লজ্জা করবে ?

বলেছি। মালতীর গলাও এবার শুকনো।

রাত বাড়ে। দূর থেকে একটা হল্লার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছিল, ক্রমে সেটা থেমে যায়। পোড়োবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাধা খ্যানখ্যানে গলায় খানিকক্ষণ পলাতক একটা মানুষকে গাল দিয়ে শুতে যায়। ও বেলার রান্না অন্নব্যঞ্জন অন্ধকারে বসেই তারা খায়। কলসির জল ফুরিয়ে এসেছে, তলার জলটুকু খেতেই শেষ হয়ে যায়। অটল ছেঁড়া ন্যাতায় এঁটো হাত মুখ মুছে নেয়। রাত আর একটু বাড়লে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়ে। ছোটো একটি পুঁটলি সঙ্গে নেয় অটল। কীই বা আছে নেবার। কাঁথাকানি চট মাটির হাঁড়ি কলসি ভাঙা কড়াই নিয়ে কী হবে।

কোথাও আলো নেই, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জন। কুকুরগুলি ছাড়া এরই মধ্যে চারিদিকে সব মরে গেছে। বড়ো রাস্তায় লরি চলার আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়েছে। বটতলায় কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মানুষ। জীবনে প্রথম চুরির কথা ভেবে অটলের এখন বেশ ভয় করে, কেঁপে উঠে আঁকুপাঁকু করতে থাকে বুকটা। কদিন ধরে সব পরিপাটিরূপে ছক কেটে রেখেছে মনের মধ্যে, ভয়ের কথা মনেও আসেনি। নিজেই চাকর ঠাকুর সরিয়ে দিয়ে বাবু থাকবে একা, মদের নেশায় উপভোগের শ্রান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোবে। জাগেই যদি নেহাত, লোহার এই যে ডান্ডা নিয়েছে অটল কাপড়ের তলে মালতীকে না জানিয়ে, তার এক ঘায়ে আবার বেহুঁস করে দেবে। কে চুরি করেছে জানাজানির ভয় তো সে করে না, জানাজানি যে হবেই কাজটা কাদের, অটল তা জানে। কাজ হাসিল করে পালাতে পারলেই তার হল। দরকার হয়তো মালতীকে ফেলে একাই নয় সে পালাবে। তবে তার ভয়টা কীসের ? আজকের আগে তো এ অন্ধ উদ্‌বেগ আর এলোমেলো দুর্ভাবনা তার ছিল না। ভয়ের বদলে বরং উল্লাস জাগত বাবুর টাকাপয়সা সব নিয়ে ভাগবার কথা আর দরকার হলে বাবুর, মাথায় ডান্ডার ঘা বসাবার কথা ভাবলে, ভিতরের অকথ্য একটানা জ্বালা যেন খানিকটা জুড়িয়ে আসত, মনে হত তাকে যেমন মেরেছে আর মারছে সবাই, একটু তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে বাবুকে মেরে। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে ওঠার পর জ্বালাটা যেন জুড়িয়ে গেছে অনেক। তখন থেকে ভয় ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করেছিল, এখন স্পষ্ট আর প্রবল হয়ে উঠেছে।

রাতে আবার না খেলেই হত। শরীরটা ভারী লাগছে, অবসাদ বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এত সব হাঙ্গামা না করে যদি ভাঙা কুঁড়েয় খড়ের বিছানায় মালতীকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকতে পারত, শুয়ে থাকলে চলত।

উপোসি পেটে একটু অন্ন পড়তেই কেমন করছে প্রাণটা।

পুরানো প্রাচীর ঘেরা মাঝারি সাইজের বাগানের মাঝখানে পুরানো বাড়ি ভেঙে কে নতুন বাড়ি করেছিল, জবরদস্তি সরকারি দখলে এসে এখন বাবুর বাসা হয়েছে। কাঠের গেট খোলাই ছিল খানিকটা। গেটটা চেপে ধরে মালতী দাঁড়িয়ে পড়তে আস্তে তার কোমরে একটা গুঁতো দিয়ে অটল ফিসফিসিয়ে বলে, যা। ডর নেই। খানিক বাদে ওদিকে ঘুরে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পিছনে লুকিয়ে থাকব, বাবু ঘুমুলে খিড়কি খুলে ডাকিস।

মালতী গেটের ভেতরে ঢোকে, আস্তে গেটটা ভেজিয়ে দিয়ে অটল সরে পড়ে। বুক তার টিপ-টিপ করছে ভয়ে, উত্তেজনায়। নিজেকে সে গাল দেয় মনে মনে, লাঙল নিয়ে মাঠচষা বলদের লেজ-মলা গেঁয়ো চাষা, তাকে দিয়ে আর কত হবে ! কেবলই তার মনে পড়তে থাকে, সে পুরুষ, মালতী মেয়েলোক। তার যদি এই অবস্থা, মালতীর দশা না জানি কী হয়েছে !

বাবুর বাড়ির পিছনে কুয়োর কাছে গোরু-বাঁধা চালাটার ছায়ায় জবাগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে বসে একটু বেপরোয়া দুঃসাহসের জন্য সে ভিতরে ভিতরে আকাশ-পাতাল হাতড়িয়ে মাথা কপাল খোঁড়ে। সাহস আসে অদ্ভুত রকমের, যা দিয়ে তার কোনো কাজ হবার নয়। এখানে চুপটি মেরে ঘুপটি মেরে বসে না থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবুর মাথায় এখুনি লোহার ডান্ডাটা বসিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল

করার ইচ্ছাটা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে, মনে হয় এ ভাবেই কাজটা সহজে হবে, ভয়ভাবনার কিছু থাকবে না। দূরে পেটাঘড়িতে এগারোটা বাজে। বাবু কি এখন হাত ধরেছে মালতীর ? কাপড়ের নীচে লোহার ডান্ডাটায় হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে অটলের। পেটাঘড়িতে হয় তো বারোটা বাজবে, একটা বাজবে, তারপর মালতী আসবে খিড়কির দরজা খুলে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব অটলের পক্ষে ! আর এক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব।

মাথায় যেন আগুন জ্বলতে থাকে অটলের। মালতী ভেতরে গেছে, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজা না ভেঙে বাড়ির মধ্যে তার ঢুকবার উপায় নেই। হাঙ্গামা করলেই সর্বনাশ। কোনো রকমে যদি সে ঢুকতে পারত বাড়ির মধ্যে এই দণ্ডে। ঢুকেই তা হলে ডান্ডাটা বসিয়ে দিত বাবুর মাথায়। সব চুকেবুকে যেত। মালতীও রেহাই পেত। কী ভুলটাই হয়ে গেছে ! বাবু ঘুমোলে মালতীকে দরজা খুলতে বলার বদলে মালতীর পিছু পিছু খোলা দরজা ঠেলে সে যদি ভিতরে যেত, ডান্ডার এক ঘায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত বাবুকে !

ও বেলা আর এ বেলা পেটে বোঝাই করা পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন যেন তাপ হয়ে তার রক্তকে গরম করতে থাকে, শক্তি হয়ে দৃঢ় করতে থাকে পেশি আর স্নায়ু। অনেকদিন পরে পেট ভরে খাওয়ার প্রথম নেশা আর অবসাদ কমতে কমতে পেটাঘড়িতে বারোটা বাজলে অটলকে পুরোপুরি সজীব, প্রাণবন্ত করে দেয়। আর সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না মালতীর অপেক্ষায়। বাড়ির চারিদিকে একবার পাক দিয়ে আসবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে সজাগ সজীব মনে হলেও উগ্র অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য তার কেটে গিয়েছে। গুরুভার বিষাদে থমথম করছে ভেতরটা। মনে এসেছে ধীর স্থির একটা সংকল্প। বাবু যদি বেঁহুশ হয়ে ঘুমিয়েও থাকে, জাগবার এতটুকু লক্ষণও দেখা না যায়, তবু সে লোহার ডান্ডাটা মারবে বাবুর মাথায়। একেবারে শেষ করে দেবে !

দুদিন তাকে দিয়ে এই বাগান বাবু সাফ করিয়েছিল। মজুরি দিয়েছিল কয়েক গন্ডা করে পয়সা। বাগানের মালির কাজটা পাবার জন্য সে বাবুর পায়ে ধরেছিল। বাবু দিয়েছিল ধমক, তার সরকারি মালি এসে গেছে। তাই না এই অবস্থা আজ তার।

দুটি একটি ছাড়া সব জানালা বন্ধ পিছনের আর পুবদিকের। খোলা জানালায় মোটা পর্দা। একটা জানালার পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বোঝা যায় ভেতরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাবুর কি আর ঘুমের তাগিদ আছে আজ। কতরাত অবধি ফুর্তি চলবে কে জানে ! দাঁতে দাঁত লেগে যায় অটলের। সামনের দিকে গিয়ে সদর দরজাটা সে আস্তে ঠেলা দেয়। যদি ওরা ভুলে গিয়ে থাকে দরজাটা বন্ধ করতে ! না, দরজা বন্ধই আছে।

পশ্চিম দিক ঘুরে বাড়ির পিছনে ফিরে যেতে গিয়ে অটল থমকে দাঁড়ায়, বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে, আর্ত চিৎকার ঠেলে আসে, হাতটা উঠে যায় মুখে। গাঁদা ঝোপের মধ্যে ঘুপচি মেরে বসে আছে সাদা ধবধবে কাপড় পরা একটা মানুষ। একদিন পেটভরে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে কতটুকু আর শক্তি আসে মাসের পর মাস ধরে উপবাসক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ দেহমনে, যুগযুগান্তের সঞ্চিত স্তূপাকার অন্ধ আতঙ্কে আলোড়িত হয়ে সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে মূর্ছার উপক্রম হয় অটলের।

ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে মালতী বলে, আমি, শুনছো, আমি।

সম্বিৎ ফিরে এলে প্রথমেই অটলের মনে আসে, তাই বটে, মালতী বাবুর দেওয়া ধোপদুরস্ত ধুতিটা পরেছিল বটে, একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা মালতীকে ওখানে গাঁদাবনে ঘুপটি মেরে বসে থাকতে দেখলে সে নিশ্চয় এমনভাবে ডরাত না, চিনতে পারত।

দুহাতে গাঁদা গাছ সরিয়ে কাছে গিয়ে অটল উবু হয়ে বসে, দুমড়ে মুচড়ে যায় গাঁদা গাছ তার পায়ের নীচে, জোরালো গন্ধ ওঠে গাঁদার !

কী হল ?

আমি—আমি যাইনি।

ভেতরে যাসনি ?

উঁহু।

ভয়ে কাঁপে মালতী, শব্দ করার ভয়ে খুব আস্তে চেপে চেপে ফুপিয়ে কাঁদে ছোটো ছোটো ফোঁপানি করে। অটল চাপা গলায় বলে, চুপ। কাঁদিসনি। চুপ। ভেতরে যাসনি একেবারে ? দেখা হয়নি বাবুর সাথে ?

না। খানিক আগে বাবু বেরিয়ে গেটতক গেল, তারপর ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল দোরে।

আগে যাসনি কেন ?

মালতী জবাব দেয় না। অটলের শান্ত শ্রান্ত গলার আওয়াজে তার ভয় খানিকটা বোধ হয় কমে যায়। আর ফোঁপাবার উপক্রম করে না। খুন যে করবে বলেছিল, খুন যে করতে চায়, সে কি এমন সুরে কথা কয় ?

অটলের গলা আরও শ্রান্ত শোনায় : সেই থেকে বসে আছিস এখেনে ?

হাঁ। এখান থেকে তোমাকে দেখা যাচ্ছিল !

পশ্চিমে হেলানো ছোটো চাঁদের তেরছা ক্ষীণ আলোয় কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে বাবুর বাগানের গাঁদাবনে। কালকের খাওয়া কুলিয়ে যাবে থলির বাড়তি চাল ডাল তরকারিতে, পরশু কী খাবে তাই ভাবে দুজনে, পরশুর পরদিন—

আর কী হবে। চল ফিরে যাই।

গেট দিয়ে বেরিয়ে দুজনে তারা ফিরে চলে তাদের ভাঙা চালার আশ্রয়ের দিকে। চলতে চলতে মালতীকে ভালোভাবে শোনাবার জন্য একবার তার গায়ে হাত দিয়ে অটল বলে, কি জানিস, এ সব মোদের কাজ নয়কো।

রাসের মেলা

আজ রাস পূর্ণিমা। রাসের মেলা বসেছে শহরতলির খালধারের এই রাস্তা আর দুপাশে যেখানে যেটুকু ফাঁকা ঠাঁই আছে তাই জুড়ে। নামকরা মস্ত মেলা, প্রতিবছর হয়। দোকানপাট বসে অনেক, দূর থেকে বহুলোক আসে কেনাবেচা করতে, অনেকে সারা বছরের দরকারি মাদুর পাটি বঁটি-দা হাতা খুন্তি ঝুড়ি ধামা কুলো ঝাঁটা গেলাস বাটি থালা কেনে এই মেলাতে। মনোহারি কাজের জিনিস ও শখের জিনিস, জামা-কাপড়, খেলনা-পুতুল, খাবারদাবার এ সব যতই কেনাবেচা হোক, আসলে গেঁয়ো কারিগরের তৈরি গেরস্তের ওইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কেনাবেচাটাই মেলার বৈশিষ্ট্য। পাশে ফাঁপতে পারে না, রাস্তা চওড়া কম, একপাশে নর্দমার খাতটা আরও সংকীর্ণ করেছে রাস্তাটাকে, মেলা তাই লম্বায় বড়ো হয়। হরদম লরিগাড়ির চলনে এবড়ো-খেবড়ো বড়ো রাস্তাটা খাল ডিঙিয়েছে কংক্রিটের পুলে উঠে। পুলের খানিক এদিকে ডাইনে গেছে মেলার রাস্তা খালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আধমাইল দূরে রেললাইনের তল দিয়ে উত্তর মুখে সোজা। মেলা বসে রাস্তার এ মাথা থেকে রেলের পুল ছাড়িয়ে আরও প্রায় পোয়া মাইল দূর তক ! মেলা সবচেয়ে জমাট হয় মাঝামাঝি স্থানে, সেখানে ওদিকে আছে রাস্তা থেকে খাল পর্যন্ত অনেকটা ফাঁকা জায়গা, আর এদিকে আছে পাশের রাস্তাটার ফাঁপোলো মোড়। ফাঁকা জায়গায় থাকে নাগরদোলা, পুতুলনাচ আর সার্কাস, মজার খেলা ও নাচগানের তাঁবু। লোক গিজগিজ করে এখানে।

রাস্তা আর খালের মধ্যে টিন-ছাওয়া ছোটো বড়ো গোলা ও আড়ত, মাঝে মাঝে দু-একটি জরাজীর্ণ পুরানো দালান। এখানে যে লাখ লাখ টাকার কারবার চলে, ভাঁটার সময় খালের কাদা ঠেলে সালতি ছাড়া ছোটো নৌকা চলতে না পারলেও এও বন্দরতুল্য, দেখে তা মনে হয় না— ঠাকুরদাদার জীবদ্দশার শৈথিল্য যেন শুধু মরচে পড়ে মরছে এখানে, আর কিছু নয় ! এ পাশের দোকান ও বাড়িঘরগুলি অনেক উন্নত, যেহেতু আধুনিক।

লড়াইয়ের আঁধার বছরগুলিতে মেলা জমেনি। আলো না জ্বালাতে পারলে কি মেলা জমে, দিনে দিনে পাততাড়ি গুটোতে হলে। এ বছর শুধু ওই সাঁঝের বাতি না জ্বালাবার হুকুমটা বাতিল হতেই মেলা জীবন্ত হয়েছে আশ্চর্য রকম। সবাই যেন হাঁ করে অপেক্ষা করছিল লড়াই শেষ হবার জন্য যতটা নয়, লড়াই শেষ হলে সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে মেলা করার জন্য। গায়ে গায়ে ঘেঁষে দোকান বসেছে তিন পো মাইল রাস্তার যেখানে ঠাঁই মিলেছে সেখানে, ভদ্রলোকের বাড়ির সামনের একহাত চওড়া রোয়াকটুকু পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে। চৌকি পেতে, কাঠের তক্তায় কিংবা স্রেফ বাঁশ দিয়ে মঞ্চ বেঁধে, চাঁচের বেড়া ও হোগলার চালা তুলে হয়েছে কোনো দোকান, কারও ছাউনি একখানি কুড়িয়ে আনার মতো মরচে পড়া ঢেউ টিনের, কারও দুখানা রিজেক্ট পিপে কেটেকুটে হাতুড়ি পিটে সোজা করা ছাদ, কারও খোলা আকাশের নীচে ড্যাম রোদবিষ্টি ড্যাম ফ্যাশনের দোকান—যেন পটারি কারখানার নল-ভাঙা কেটলি, চটলা-ওঠা হাতলহীন কাপ ইত্যাদির দোকান—দোকানটাই যেন ঘোষণা যে বড়োলোক বাবুদের জিনিস, একটু খুঁতওলা জিনিস, তাতে আর কী হয়েছে, এখানে কিনতে পাবে এমন সস্তায় তোমার পয়সায় কুলোয়, এ সুযোগ ছেড়ো না, টিনের মগে চা না খেয়ে বাবুরা যে কাপে খান সেই কাপে, শুধু একটু চটলা-ওঠা হাতলহীন কাপে, চা খাও ! আর সত্যি কথা, কাপ কেটলির দোকানে কী ভীড় মেয়েপুরুষের, চা খাওয়া যাদের ন মাসে ছ মাসে সর্দি-কাশির ওষুধ হিসেবে, বিয়োনি মেয়ের ব্যথার জোর বাড়িয়ে তাকে রেহাই দেবার টোটকা হিসাবে।

খাদু বলে, মেলা নাকি ? মেলা ? মেলায় তো যামু তবে আইজ !

দত্তগিন্নির গা জ্বলে যায় শুনে,—প্রায় দেড়বছর কাজ করছে যে মন-মরা খাটুনে ভালো ঝিটা হঠাৎ মেলার নাম শুনেই তাকে আহ্লাদে উল্লাসে ডগমগিয়ে উঠতে দেখে।

মুখ ভার করে বলে, খাদু, কী করে মেলায় যাবি আজ ? আমার শরীর ভালো না। উনি আজ একটায় আসবেন, খেয়ে দেয়ে উঠে আমায় একটু না পেলে, খোকা গোলমাল করলে—

দত্তগিন্নি হেসে ফেলে, বুঝছিস তো খাদু ? হপ্তায় একটা দিন দুকুরের ছুটি, তাও আধখানা। খোকা কাঁদাকাটা করলে বড্ড রাগেন। উনি বিকেলে বেরোবার আগে তো মেলায় তোর যাওয়া হয় না।

অ মা ! খাদু বলে অবাক হয়ে, তা ক্যান যামু ? বেলা না পড়লে নি কেউ মেলায় যায় !

মেলায় যাবার নামেই যেন বদলে গেছে খাদু। দুর্ভিক্ষের বন্যায় কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই শহরে বাবুদের বাড়ি ঝিগিরিতে। কোথায় দেশ গাঁ আপনজন, জানাচেনা অবস্থায় অভ্যাসের ধাঁচে দিন কাটানোর সুখ আর কোথায় এই বিদেশে খাপছাড়া না-বনা মানুষের ঘরে দাসীপনা, এই দুঃখে সে একেবারে মিইয়ে ছিল। আজ যেন ডাক দিয়েছে আগের জীবন, ছেলেমানুষি ফুর্তি আর উত্তেজনা জেগেছে। চুলে ভালো করে তেল মেখে স্নান করে খাদু। দত্তগিন্নির সাবানটা এক ফাঁকে মুখে হাতে ঘষে নেয় একটু। টিনের ছোটো তোরঙ্গে তোলা সাফ থানটি বার করে রাখে। শেমিজটা বড়ো ময়লা হয়েছিল, স্নানের আগেই সাবান দিয়ে সাফ করে রেখেছে।

একটা কথা ভেবে খাদু একটু দমে যায়। এই ঘটির দেশের মেলা না জানি কেমন হবে ! খোকাকে কোলে নিয়ে গিন্নিমার পিছু পিছু এক্‌জিবিশনে ঘুরে এসেছে সেদিন, সাজানো গোছানো আলোয় ঝলমলে চোখ ঝলসানো কাণ্ড বটে সেটা, থ বানিয়ে দেয় মানুষকে, কিন্তু মেলার মজা নেই একফোঁটা, প্রাণ ভরে না ঘুরে ঘুরে। ওমনি এক্‌জিবিশনকে এ দেশে মেলা বলে কিনা কে জানে !

বাবু বেরিয়ে যেতে না যেতে শেমিজ কাপড় পরে খাদু বলে, যাই মা ?

দত্তগিন্নি মুখ ভার করে বলে, যাবার জন্য তরপাচ্ছিস দেখি ! যা, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি, দেরি করিসনে।

কংক্রিটের পুলটার নীচে মেলার এ মাথায় পৌঁছে খুশিতে হাসি ফোটে খাদুর ঠোঁটের ফাঁকে মিশিঘষা কালো মজবুত দাঁতে। এ মেলা মেলাই। গরিব গেঁয়ো মেয়ে-পুরুষের ভিড়, রঙিন কাগজের ঘূর্ণি, ফুল, বাঁশের বাঁশির ফেরিওলা, মাটির ডুগডুগি, বেহালা, পুতুল, কাঠের খেলনা, তেলেভাজার দোকান, হোগলার নীচে মাটিতেই যা কিছু হোক বিছিয়ে পসরা সাজানো—সব আছে ! পুলকে কেমন করে ওঠে মনটা খাদুর। হায় গো, কেউ যদি একজন সাথি থাকত তার।

পায়ে পায়ে এগোয় খাদু এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে থেমে থেমে ঘুরে ঘুরে পিছু ফিরে এপাশ ওপাশ গিয়ে গিয়ে। কিনবার জন্য, যা কিছু হোক কিনবার জন্য, মনটা তার নিশপিশ করে। পিঠে সে অনুভব করে আঁচলে-বাঁধা কাঁচা একটা টাকা আর খুচরো এগারো আনার চাপ। কোমরের আঁচলের কোণেও বাঁধা আছে একটাকার চারটে নোট। জীবনে আর কখনও কোনো মেলায় খাদু এত টাকা পয়সা নিয়ে যায়নি, তাও আবার সব তার নিজের রোজগারের টাকা পয়সা। বাপ ভায়ের কাছে চেয়েচিন্তে, একরকম ভিক্ষে করে কয়েক গন্ডা পয়সা নিয়ে সে মেলায় যেত, আজ এসেছে নিজের কামানো পাঁচ টাকা এগারো আনা নিয়ে ! টাকা থাকার মজাটা যেন খেয়ালও করেনি খাদু এতদিন, আজ যেন তার প্রথম মনে পড়ে যে দত্তগিন্নির কাছে তার দেড়-দু বছরের মাইনের অনেক টাকা জমা আছে, দু-এক টাকার বেশি কোনো মাসেই সে নেয়নি। সে কত টাকা হবে কে জানে ! টাকার জোরে বুকের জোর যেন বেড়ে যায় খাদুর আজ মেলায় এসে নিজের পয়সা যেমন খুশি খরচ করতে পারবে খেয়াল হওয়ায়।

সেই সঙ্গে এতদিন পরে একটা ভয় ঢোকে খাদুর মনে। এতকালের মাইনের টাকাগুলি জমা রেখেছে দত্তগিন্নির কাছে, হিসেবও জানে না সে কত টাকা হবে, দত্তগিন্নি যদি তাকে ফাঁকি দেয়, যদি একেবারে নাই দেয় টাকা ? বোকার মতো কাজ করেছে, খাদু ভাবে। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে নিজের কাছে টিনের তোরঙ্গে রাখেনি বলে আপশোশ করে খাদু। হায় গো, টাকাগুলি যদি মারা যায় তার !

কী কিনবে ভাবতে ভাবতে সোনার একটা আংটি কিনে বসে খাদু বারো আনা দিয়ে। খাঁটি সোনা নয় কিন্তু ঠিক যেন সোনা, কী সুন্দর যে মানিয়েছে তার বাঁ হাতের সেজো আঙুলে। বিয়েতে একটা আসল সোনার আংটি পেয়েছিল খাদু, বছর না ঘুরতে সে আংটি কেড়ে নিয়েছিল বরটা তার, ফিরে দেবে বলেছিল বটে কিন্তু আরও যে বছরখানেক বেঁচেছিল তার মধ্যে দেয়নি। ও মিছে কথা, বেঁচে থাকলেও দিত না, খাদু জানে। তারপর কতকাল আংটি পরার শখটা খাদু চেপে রেখেছিল, এতদিনে মিটল। কিন্তু না গো, মিটেও যেন মিটল না, প্রথম বয়সের সাধ কি আর মেটে মাঝ বয়সে, নিজে নিজের সাধ মেটালে, কেউ আদর করে কিনে না দিলে।

বজ্জাতেরা তাকায়, গায়ে গা ঘষে যায় ছলে কৌশলে, খানিক আগে থেকেই পিছু নিয়েছে ওই বাবুসাজা লোকটা। ফিনফিনে পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জিটা যেমন স্পষ্ট, ওর মতলবও স্পষ্ট তেমনি। খাদু ওসব গায়ে মাখে না, রাগ করে না, বিচলিত হয় না। মেলাতে এ রকম হয়, কতকগুলি লোক এই করতেই আসে মেলায়, মেয়েলোকের গায়ে একটু গা ঠেকিয়ে মজা পেতে, পুরুষ হয়ে চোরের মতো এইটুকু নিয়ে বর্তে যায়, কী ঘেন্না মাগো। আসল বজ্জাত ওই লোকটা যে পিছু নিয়েছে একলা মেয়েলোক দেখে, গুন্ডা না হলে কেউ কখনও দারোয়ান গাড়োয়ানের চেহারা নিয়ে বাবু সাজে। নিক পিছু, ঘুরুক সঙ্গে সঙ্গে। বোকা হাবা মেয়ে ভেবেছে খাদুকে, টের পাবে ভাব করতে এলে, এই ভিড়ের মাঝে খাদু যখন গলা ছেড়ে শুরু করবে গাল দিয়ে ওর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে।

পড়ন্ত রোদের মতো তেজ কমে কমে আসে খাদুর আনন্দ ও উত্তেজনার, নিভে যেতে থাকে উন্মাদনা। একা আর কতক্ষণ ভালো লাগে মেলা, কথা কওয়ার কেউ একজন সাথে নেই।

খিদে পায়। এতলোকের মাঝে খেতে লজ্জা করে খাদুর। ভাজা পাঁপড় কিনে আঁচলের তলে লুকিয়ে ফেলে বাঁ হাতে, ডান হাতে এক এক টুকরো ভেঙে নিয়ে এমন ভাবে মুখে দিয়ে চিবোয় যে কেউ টেরও পাবে না পানসুপারি মুখে দিয়ে চিবোচ্ছে না কিছু খাচ্ছে। এমন সময় কাণ্ড দ্যাখো কপালের, খাদু সোজাসুজি সামনে পড়ে যায় দত্তবাবুর।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে দত্তবাবু উদাসীনের মতো এগিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে, আস্তে আস্তে থামে, ফিরে কাছে গিয়ে বলে, মেলা দেখতে এয়েছিস ?

যেন মেলাতে মেলা দেখতে আসেনি খাদু, এসেছে ঘাস কাটতে। তিরিশের ওপরে বয়স হবে দত্তবাবুর, বিয়ের চার বছর পরে জন্মেছে খোকাটি, খোকার তিনবারের জন্মদিন বলে ক মাস আগে খাওয়াদাওয়া হল বাড়িতে। টুকটুকে ফরসা রঙের না-মোটা না-রোগা সুন্দর চেহারা দত্তবাবুর, মুখখানা ফ্যাকাশে, চুপসানো। দেখে এমন মায়া হয় খাদুর। গিন্নিমা শুষে শুষে শেষ করে দিয়েছে বাবুকে, টাকার জন্য আপিসে খাটিয়ে আর বাড়িতে নিজের রাক্ষুসি হিড়িম্বার খিদে মিটিয়ে। আড়ি পেতে সব শুনেছে সব জেনেছে খাদু। বউ-বর খেলো দেলো শুতে গেল মিলল মিশল ঘুমাল, এই তো নিয়ম জানে খাদু, গিন্নিমা যেন মাগি মাকড়সার মতো তাতে খুশি নয়, রাত বারোটায় শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসাদে মরোমরো বরটাকে যে করে হোক জাগিয়ে তুলে খাবেই খাবে, বেশি যদি নেতিয়ে পড়ে তো ঝাঁঝিয়ে বলবে, মেয়ে বন্ধু তো গাদা গাদা, কার সাথে কারবার করে এলে আজ যে বিয়ে করা বউকে এত অবহেলা ?

আড়ি পেতে বাবুর কাতরতা দেখতে দেখতে যেন একশো বিছে কামড়েছে খাদুকে, চিৎকার করে বলতে সাধ গেছে, লাথি মেরে রাক্ষুসিকে বার করে দিয়ে ঘুমো না, কেমন ধারা পুরুষ তুই।

এই ক আনা পয়সা নে, কিছু কিনিস, দত্তবাবু বলে খানিকটা কাচুমাচু ভাবে, আর শোন খাদু, বাড়িতে যেন বলিস না আমায় মেলায় দেখেছিস।

পয়সা পেয়ে খাদু মুচকে হেসে মাথা নাড়ে। দত্তবাবু এগিয়ে গেলে পিছু থেকে জিভের ডগাটুকু বার করে তাকে অবজ্ঞার ভেংচি কাটে। এমনও পুরুষ হয়, বউয়ের ভয়ে মনখুশিতে মেলায় আসতে ডরায় !

মেলার মাঝখানে জমজমাট অংশে আটকে যায় খাদু, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এইখানেই। মোড়ের মাথায় মন্দিরের বদলে একটা চ্যাপটা ঘরের মধ্যে সিঁদুরলেপা দাঁত-খিঁচানো ভীষণাকৃতি দানবরূপী প্রকাণ্ড দেবতা, খাদু ভক্তি ভরে প্রণাম করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পুতুল নাচ দ্যাখে, রামায়ণ মহাভারতের রাজা রানিদের চেয়ে দেখে তার মজা লাগে শণের দাড়িওলা মুনিগুলো আর হনুমানকে। নুলো খঞ্জ অন্ধ ভিখারিদের দিকে না তাকিয়ে সে দুটি পয়সা দেয় জোয়ান মর্দ ভিখারিকে, কেঁদে কেঁদে ভগবান ভালো করবেন বলার বদলে সে হেড়ে গলায় সবাইকে শাসিয়ে ভিক্ষা চাইছে, তাকে না দিলে তুমি মরবে, তোমার সর্বনাশ হবে। অনেক কিছু কেনার এত সাধ নিয়েও ওই আংটি আর একটি আরশি ছাড়া আর কিছুই কেনা হয়নি খাদুর, কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়েছে, কার জন্য কিনবে, তার কে আছে, কী কাজে লাগবে তার জিনিসটা, তার ঘর নেই, সংসার নেই, সাজাগোজা নেই, আরামবিরাম নেই। কী করতে সে মেলায় এলো, কী সুখটা তার হল মেলায় এসে। আপন মনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে কী ভালো লাগে মেলায়। এত লোকের হাসি আনন্দ উৎসবের মধ্যে খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনটাতে ব্যস্ততা এনে শুধু খাঁখাঁ করানো।

মেয়েছেলেরাও উঠেছে নাগরদোলায়, দুজন চারজনে একসঙ্গে, নয়তো পুরুষ সাথির সঙ্গে, লজ্জা শরম ভুলে আওয়াজ ছাড়ছে অদ্ভুত, দিশেহারা হয়ে আঁকড়ে ধরেছে সাথিকে, খিলখিলিয়ে হাসছে যেন ভূতে পাওয়ার হাসি। একসঙ্গে ওই ভয় আর ফূর্তি, ওপরে উঠে নীচে নেমে দোল খাওয়ার ওই বিষম মজা আর তীব্র সুখের শিহরন যে কেমন খাদু কি আর জানে না। সাথি কেউ থাকলে সেও একটু নাগরদোলায় চাপত, অনেকদিন পরে আবার একটু চেখে দেখত কেমন লাগে নিজের ভেতরে ওই শিরশির করা।

কী ভাব ?

মাঝখানে কোথায় সরে গিয়েছিল, আবার পিছু নিয়েছিল লোকটা পুতুল নাচ দেখবার সময়, এখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে। ঝেঁঝে উঠত খাদু সন্দেহ নেই ; ফোঁস করে উঠে এক নিমিষে টের পাইয়ে দিত বাড়াবাড়ি করতে গেলেই বিষ দাঁতে সে ছোবল দেবে। কিন্তু কথা হল কি, লোকটার কথায় তার দেশি টান। দেশ গাঁয়ের চেনাজানা কেউ যেন ছদ্মবেশে তাকে এতক্ষণ ঠকিয়ে এবার নিজেকে জানান দিল কথা কয়ে। তাই শুধু মুখটা গোমড়া করে বলতে হয় খাদুকে, কী ভাবুম ?

দেইখাই চিনছি দেশের মানুষ তুমি।

চিনছ তো চিনছ।

পাতলা পাঞ্জাবির নীচে শুধু গেঞ্জি নয়, গেঞ্জি আঁটা চওড়া মোটা শক্ত বুক আর কাঁধ আছে, ঘনকালো কিছু লোম দেখা যায় গেঞ্জির ওপরে। জবরদস্ত গর্দান লোকটার। মুখের চামড়া খেতমজুরের মতো পুরু আর কর্কশ। দু-এক নজরে দেখে নিয়ে খাদু আবার ভাবে আপশোশের সঙ্গে, চাষাভুসোর এমনধারা বেমানান বাবু সাজা কেন ?

দোলায় চাপবা ?

না।

ডর নাই, আমারে কোনো ডর নাই তোমার। লোকটা বলে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে, পুবের আকাশের যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাশে করে রেখেছে সন্ধ্যাকে সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা বিড়ি ধরায়। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার পকেটে রেখে বিড়িটা বার করে।

তোমারে ভাবছিলাম বাবুগো মাইয়া বুঝি, কথা কইবার চাইয়া ডরাইছি। তবু মনডা কইল কি, না, বাবুগো ঘরের মাইয়ালোক সাহস পাইব কই যে একা আসব মেলায় ? কথা কমু ভাবি, ডরাই। শ্যাষে অখনে কইলাম। ডর নাই, আমারে ডর নাই।

ডরে তো মরি। লোকটার কথা শুনে বিষম খটকা লাগে খাদুর মনে। সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মতো খাপছাড়া আর হাস্যকর, চাষাভুসো ঘরের মেয়ে হয়ে বাবুর ঘরের রাঁড়ির বেশ ধরে ? ছোটো একটা তাঁবুতে পরির নাচ অর ম্যাজিক দ্যাখাচ্ছে। নাচের নমুনা ধরা হয়েছে সবার সামনে। রোগা-ক্যাংটা কালো কুৎসিত তিনটি মেয়ে মুখ গলা হাতে পুরু করে রং লেপে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাঁবুর সামনে ছোটো বাঁশের মঞ্চে ভঙ্গি করছে নাচের, গলা ছেড়ে পাঁচমেশালি সুরে গান ধরেছে ভাঙা হারমনিয়ামের সঙ্গে,—একজন ওদের মধ্যে হিজরে। মাঝে মাঝে তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শুধু এরা নয় আরও অপ্সরা আছেন ভেতরে, দু আনা চার আনায় ওই পরিদের মজাদার নাচ দেখার সুযোগ ছেড়ো না, তার সঙ্গে ম্যাজিক, ভাঁড়ামি ! চলা আও, চলা আও—দো দো আনা, চার চার আনা।

আমার পয়সা আমি দিমু কইলাম। গায়েপড়া ঝগড়ার সুরে খাদু বলে দুআনা পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে। নাচ দেখতে তাদের মধ্যে ভেতরে যাবার কথাও হয়নি তখন পর্যন্ত, তার হয়ে লোকটির টিকিটের পয়সা দেবার কথা দূরে থাক।

দিয়ো, তুমিই পয়সা দিয়ো। লোকটি বলে আমোদ পেয়ে, কিন্তু অ্যানে কী দেখবা ? খালি ফাঁকিবাজি, ঠকাইয়া পয়সা নেওনের ফিকির। দেখবা যদি, চীনাগো সার্কাস দেখি গা চল। খাসা দেখায়, পয়সা দিয়া খুশি হইবা।

দেখি না কী আছে।

সব দেখবে খাদু এবার, ভালোমন্দ যা কিছু দেখার আছে ; এত মানুষ ঠকছে সাধ করে সেও নয় ঠকবে, বিশ্বাসী সাথি যখন পেয়েছে একজন। বিশ্বাস রাখবে কিনা শেষ পর্যন্ত ভগবান জানে, কী বিপদ আজ তার অদেষ্টে আছে তাও জানে ওই পোড়ারমুখো ভগবান, তবে মেলায় কোনোরকম নষ্টামি গুন্ডামি যে করবে না লোকটা এটুকু খাদু জানে। বুঝদার বিশ্বাসী সাথির মতোই সে সাথে থাকবে, মনখোলা আলাপি কথায় হাসি তামাশায় খুশি থাকবে দুজনেই, ভালো লাগবে মেলা দেখা। মতলব যা আছে তা মনেই থাকবে ওর চাপা পড়া।

ঘেন্না জন্মে যায় সস্তা নাচ, বাজে ম্যাজিক, বগলে লাঠি খুঁচিয়ে কাতুকুতু দেওয়ার মতো ভাঁড়ামি দেখে। তবু শেষ পর্যন্ত থাকে খাদু, উপভোগও করে। এও মেলারই অঙ্গ। জেনেশুনে কত বাজে জিনিস কেনে লোকে পয়সা দিয়ে, অন্য সময় যেভাবে পয়সা নষ্ট করার কথা ভাবলেও গা জ্বালা করত, নইলে আর মেলার উন্মাদনা কীসের। নিজের ভেতরে উথলাচ্ছে আনন্দ আর উত্তেজনা, তাই দিয়ে ফাঁকিকেও সার্থকতা দেওয়া যায়। মেলায় না হলে একটা পয়সা দিয়েও কি কেউ দেখতে চাইত এ সব।

বয়সের পাকামি আছে, সে যাবার নয়, তবে ছেলেবয়সের আবেগ পুলকের বন্যাও থইথই করছে মনে। ফাঁকি যাচাই করতে করতেও উৎসুক লোভী মন নিয়ে খুশি হয়েই খাদু দ্যাখে হিমালয় পারের অজগর সাপ, এক ছেলের দুই মাথা, জন্ম থেকে জোড়ালাগা দুই মেয়ে।

অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কয় খাদু, ছেলে কাঁখে বউটির সঙ্গে, কুলো আর পাখা হাতে বিধবাটির সঙ্গে, একপাল বউ ছেলে নাতিনাতনি নিয়ে বেসামাল সধবা গিন্নিটির সঙ্গে। দেখা হয়

চেনা মানুষের সঙ্গে। সুবলের মা, পাড়ার তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। চুপিচুপি শুধোয় সুবলের মা, সাথে কে ?

দ্যাশের মানুষ, কুটুম। খাদু বলে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, নীচে অসংখ্য আলো জ্বলছে মেলার। এক্‌জিবিশনের চোখ ঝলসানো বাড়াবাড়ি আলো নয়, কাছে তেল মোম গ্যাসের শিখা, কোনোটা কাচের মধ্যে কোনোটা খোলা, তফাতে জ্যোৎস্নারাতের তারার মতো।

আরও দেখবা ?

দেখুম না, চীনা সার্কাস ? তুমিই তো কইলা।

চীনা সার্কাসের তাঁবুটা অনেক বড়ো। চার আনা আট আনা টিকিটের দাম। লোক টানবার জন্য সামনে খেলার নমুনা দেখানো হচ্ছে এখানেও, ভিন্ন রকম নমুনা। মেয়ে আছে তিনটি, দুজন হলদে রঙের চীনা, একজন কালো রঙের বাঙালি। কালো হলেও ছিরিছাঁদ আছে মেয়েটির, রং মেখে ভূতও সাজেনি, সস্তা ঢং-এর ভঙ্গিও নেই। চীনা মেয়ে দুটিকে বড়ো ছোটো বোন মনে হয় খাদুর। পিছু বেঁকে পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে, হাতের ভরে শূন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে, ছোটো লোহার চাকার ভেতর দিয়ে কৌশলে গলে গিয়ে ওরা খেলার নমুনা দেখাচ্ছে ! আঁটোসাঁটো জোয়ান বয়সি চীনাটি দু হাতের সরু দুটি ছড়ির ডগায় বসানো প্লেট দুটিকে বনবন করে ঘোরাচ্ছে। আর একজন, তাকে ওর ভাই মনে হয় খাদুর, পাঁচ-ছটা লোহার শিকের আস্ত চাকা নিয়ে চাকার সঙ্গে চাকা আটকে আবার খুলে ফেলছে, কী করে কে জানে ! ভেতরে গিয়ে খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় খাদু। পাঁচ-ছ বছরের একটা ছেলে, সে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে শূন্যে পাক খেয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বড়ো একজনের মাথায় হাতের ভর দিয়ে শূন্যে পা তুলে দিচ্ছে, এ সব দেখে রোমাঞ্চ হয় খাদুর। টেবিলে কাঠের গোলায় বসানো তক্তার দুপাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে একটি মেয়ের দোল খাওয়া দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেজো চীনা মেয়েটিকে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে টেবিল ডিঙোতে দেখে, আগুনের চাকার মাঝখান দিয়ে গলে যেতে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়, ভাবে কত কাল ধরে কী ধৈর্যের সঙ্গে তপস্যা করে না জানি এ সব কসরত আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে !

খাদু সবচেয়ে অভিভূত হয় ভেবে যে এক সংসারের বাপ-ছেলে মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে এমন চমৎকার সার্কাস দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দলের সবাইকে দেখার পর এতে আর তার সন্দেহের লেশটুকু নেই। চেহারার মিল নয় নাই ধরতে পারল সে ওদের, বয়স কখনও সবার খাপ খায় এমন ভাবে এক পরিবারের না হলে—বুড়ো একজন বাপ, মাঝবয়সি, জোয়ান, কিশোর আর ছেলেবয়সি এই চার ছেলে, তিন-চার বছর বয়সের ফারাকের দুটি জোয়ান আর ন-দশ বছরের একটি, এই তিন মেয়ে। মা বুঝি নেই ওদের। বউ বুঝি মরেছে বুড়ো বেচারার। আহা।

জোয়ান মেয়ে দুটির দুজনেই মেয়ে না একজন ছেলের বউ একজন মেয়ে কিংবা দুজনেই ছেলের বউ, এই একটু খটকা থাকে খাদুর। সিঁদুরও দেয় না যে আন্দাজ করে নেবে। কালো মেয়েটা এদের সঙ্গে কেন, সেও আর এক ধাঁধা খাদুর।

আমাগো মাইয়াটা কী করে চীনাগো লগে ? সে শুধোয় সঙ্গীকে।

ভাড়া করছে।

এরা নাকি সাধারণত হয় অল্প বয়সে চুরি করা অথবা অনাথা মেয়ে, সংসারে যাদের দেখবার শুনবার কেউ নেই। বড়ো হলে কাউকে দিয়ে করানো হয় দেহের ব্যাবসা, কেউ শেখে চুরিচামারির কায়দা, কেউ শেখে কসরত। এ মেয়েটা হয়তো ভাড়াও খাটছে, নতুন খেলাও শিখছে চীনাদের কাছে, পরে আরও দাম বাড়বে। অবাক হয়ে শোনে খাদু। বিরাট এ জগৎ সংসার, অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার সীমা নেই তাতে। কোথাকার এই বিদেশি পরিবার সার্কাস দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছে, কোথায়

কার ঘরে জন্মে আজ ওদের সঙ্গে খেলা দেখাচ্ছে এই কালো মেয়েটা। এক দুর্বোধ্য বিস্ময়কর অনুভূতিতে বুকটা তার কেমন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সে ভাবে, মানুষ কী যে করে সংসারে আর কী যে করে না !

নাগরদোলার বুক-শিরশির-করা সুখটা তিন-চার পাকের বেশি সয় না খাদুর, কাতর হয়ে বলে, নামুম। থামান যায় না ?

যায় না ?

জোরে হাঁক দিয়ে নাগরদোলা থামাতে বলে লোকটি, যেন হুকুম দেয়। আর এমন আশ্চর্য, তার হুকুমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামতে আরম্ভ করে দোলা। পাশ থেকে উঠে লোকটি আগে নামতে গেলে খাদুর খেয়াল হয়, লজ্জাশরম ভুলে দুহাতে কীভাবে ওকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

ডর করে নাকি ?

না। খাদু জোর দিয়ে বলে, গা গুলায়।

মেলায় মানুষ কমতে শুরু করেছে। বিকালে মানুষের জোয়ার এসেছিল, তাতে ধরেছে ভাঁটার টান। মেলা আর ভালো লাগে না, শ্রান্তি বোধ করে খাদু। মেলায় ছড়ানো নিজেকে এবার গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়। ফিরে গেলে ঘ্যানঘ্যান করবে দত্তগিন্নি, কৈফিয়ত চাইবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর দত্তবাবুর বুড়ি মায়ের ঘুপচি ঘরটির মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে শোয়া। সারারাত বুড়ি কাশবে, বারবার উঠবে। ভাবলেও মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় খাদুর।

কিন্তু বাড়ি সে যে যাবে, বিশ্রাম সে যে করবে, সে তো এতক্ষণের সাথিটি রেহাই দিলে তবেই ! এবার সময় হল ওর মতলব হাসিলের। বেশ ভালো করেই জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁদে ফেলেছে তাকে। এতক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগিয়েছে, এবার কোন ভয়ংকর স্থানে নিয়ে যাবে কে জানে, যা খুশি করবে তাকে নিয়ে, হয়তো ছেড়ে দেবে দলের খুনে গুন্ডাদের হাতে, হয়তো শেষরাতে গলাটা কেটে ফাঁক করে ভাসিয়ে দেবে খালে। বুকটা টিপটিপ করে খাদুর। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা কিছুক্ষণ থেকে, বারবার চোখ বুলোচ্ছে তার পা থেকে মাথা অবধি। গায়ে কাঁটা দেয় খাদুর।

যাইগা অখন রাইত হইছে। সে বলে ভয়ে ভয়ে।

যাইবা ? রাইত হয় নাই বেশি। ক্ষুব্ধ চিন্তিতভাবে লোকটা খাদুর নতুন ভাবসাব লক্ষ করে, চলো যাই, দিয়া আসি তোমারে। কলাপাড়া নন্দ লেন কইলা না ?

আমি যাইতে পারুম। ক্ষীণস্বরে খাদু বলে।

পারবা না ক্যান ? বাড়িটা চিনা আসুম, বুঝলা না ?

বোঝে না ? সব বোঝে খাদু। চলুক সাথে, বড়ো রাস্তা ধরে সে যাবে, রাস্তায় এখন গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের ভিড়। পাড়ায় গিয়ে নির্জন গলিতে ঢুকবে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তার ভয়টা কী, লোকজন জেগেই আছে সব বাড়িতে এখন।

কী কিনা দিমু কও।

তিন্যটি না।

তোমার খালি না আর না। লোকটা বলে বেজার হয়ে।

কংক্রিটের পুলের গোড়ায় বড়ো রাস্তার পাড়ে লোকটা রিকশা ডেকে বসে একটা, খাদুকে চমকে আর ভড়কে দিয়ে।

না না, রিকশা লাগব না।

লাগব। ধমকে দিয়ে বলে এবার লোকটা, সব কথায় না না করো ক্যান ? উইঠা বস রিকশায়, কও তো হাঁইটা যামু নে আমি লগে।

খাদু কিছু বলে না, কী আর বলবে। লোকটা তার পাশে উঠে বসে। আংটিপরা হাতে একবার হাত বুলিয়ে দেয় ধমক দেবার দোষ কাটিয়ে সান্ত্বনা দিতে। ঘেমে জল হয়ে গেছে খাদুর গা তখন, হাত-পা যেন অবশ হয়ে এসেছে।

রিকশা চলে ঘণ্টা বাজিয়ে, চলতে চলতে লোকটা হঠাৎ বলে রিকশাওয়ালাকে, ডাইনে যাও।

না না, বড়ো রাস্তায় চলুক।

এইটা রাস্তা না ?

রিকশা ঢোকে ডাইনের রাস্তায়। এটা সোজা পথ কলাপাড়া যাবার খাদু জানে, কিন্তু বড়ো রাস্তা ছেড়ে রিকশা যখন ঢুকেছে এই গলিতে তখনই খাদু জেনেছে কলাপাড়ায় নন্দ লেনে দত্তবাড়িতে আর সে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। দুপাশে ঘিঞ্জি বস্তি, টিন আর খোলার চালে জ্যোৎস্না, সরু সরু গলিতে অন্ধকার। ওর মধ্যে কোথায় যেন জোরালো হল্লা চলেছে, মেয়েমানুষ গানও গাচ্ছে হারমনিয়ামের সঙ্গে ! এর মধ্যে নিয়ে যাবে কি লোকটা তাকে ? এ অঞ্চল পেরিয়ে রিকশা রাস্তায় বাঁক ঘুরলে খাদু একটু স্বস্তি পায়। এ অঞ্চলটা শান্ত, দুপাশে কাঁচা পাকা বাড়িতে গেরস্থ, আধা-গেরস্তের বাস।

কিন্তু খানিক এগিয়েই লোকটা থামতে বলে রিকশাওয়ালাকে। ঘনিষ্ঠ সুরে বলে, আমার ঘরখান চিনাইয়া দেই তোমারে, কী কও ?

পুরানো একটা পাকা গ্যারেজ ঘর, দরজা এখন তালাবন্ধ। এখানে সে থাকে, রাঁধে বাড়ে খায়, ঘুমোয়। পাশে গায়ে গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনে দোকানের মতো মস্ত দুপাট কপাট, ওপরে নীচে দুটো তালা সাঁটা। ওপরে একটা তেরাবাঁকা সাইনবোর্ড, দুপাশে সাইকেলের দুটো পুরানো টায়ার ঝুলছে। এটা তার সাইকেল মেরামতি দোকান—দামোদর সাইকেল ওয়ার্কস !

নাম কই নাই তোমারে ? আমার নাম দামোদর।

রিকশার জোয়াল নামিয়ে রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তাদের নামবার অপেক্ষায়। শক্ত করে পাশটা চেপে ধরে ঝোঁক ঠেকিয়ে খাদু কাঠ হয়ে বসে থাকে।

নামবা না ?

না। তুমি নাম।

চাঁদের আলোয় পথের আলোয় বেশ দেখা যায় মুখে যেন তপ্ত রাগের ছ্যাঁকা লেগেছে দামোদরের। একহাতে সে খাদুব আংটিপরা হাতের কবজি চেপে ধরে, এত জোরে ধরে যেন খেয়াল নেই ওটা মেয়েছেলের নরম হাত, হাড় ভেঙে যেতে পারে মট করে, আর এক হাতে সে মুঠো করে ধরে খাদুর বুকের কাপড় শেমিজ।

মার। আমারে মাইরা ফেলাও। খাদু কেঁদে ফেলে হুস করে, জোরে নয়, চেপেচুপে, ক হাত দূরে রিকশাওয়ালাও টের পায় কি না পায় ! আগে থেকে সে যেন তৈরি হয়েই ছিল এমনিভাবে কাঁদবার জন্য।

দামোদর ভড়কে গিয়ে বুকের কাপড় হাতের কবজি ছেড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ, থ বনে গিয়ে গুম হয়ে থাকে কয়েক লহমা। তারপর রিকশাওয়ালাকে চলতে বলে কলাপাড়ার দিকে।

রিকশাওয়ালা চলতে আরম্ভ করলে খাদুকে বলে, ব্যারামস্যারাম নি আছে মাথার ?

সে রাস্তা থেকে বড়ো রাস্তায় পড়ে রিকশা, আবার ইটের রাস্তায় বাঁক নেয় শহরতলির শান্ত নিঝুম উঠতি ভদ্রপাড়ার এলাকায়। মাঠ, পুকুর বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো নতুন বাড়ি, ছোটো সীমায় ঠাসা গরিবের পুরানো বস্তি। শরীর জুড়ানো হাওয়া বইছে অবাধে, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক,

কোনো বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে-আসা বাঁশির বাবুয়ানি মিহি সুর। আকাশে মুখ তুলে চাঁদ দেখতে হয় না, চারদিকে চাঁদেরই আলো চোখের সামনে ছড়ানো।

নন্দ লেনের মোড়ে ঘন তেঁতুলগাছের ছায়া। খাদু দাঁড়াতে বলে রিকশাওয়ালাকে। তোমার লগে দেখলে বাড়ির লোক কী কইবো ? আমি নামি।

নাম।

খাদু রিকশায় বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে দত্তবাবুর বাড়ির হদিস তাকে বাতলে দেয়, বলে, ডাইনা দিকে তিনখান বাড়ির পরের বাড়িখান, দোতালা বাড়ি। দেইখাই চিনবা।

বাড়ি চিনতে হাঙ্গামা কি। দামোদর বলে উদাস গলায়, নন্দ লেনে দত্তবাবুর বাড়ি খুঁইজা নিতে পারতাম না ?

ফুরফুরে হাওয়ায় তেঁতুলগাছের ছায়া ঘেঁষে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে খাদু যেন চোখের সামনে দেখতে পায় দত্তবাড়ির অন্তঃপুর, খোকার কান্নায় স্বামীর পাশে শুতে দেরি হচ্ছে বলে রেগে গজর গজর করে শাপছে তাকে, মাছের মতো মরা চোখে চেয়ে দেখছে ঘুমকাতুরে গাল-চুপসানো দত্তবাবু, নীচের ঘরে চৌকিতে কাঁথার বিছানায় বসে দত্তবাবুর বুড়ি মা কেশে চলেছে খকখক করে আর মেজেতে শুয়ে খাদু ঝি এপাশ ওপাশ করছে অজানা কষ্টে। আজ রাতে কবজিটা টনটন করবে।

হাতটা মুচরাইয়া দিছ একেবারে, ব্যথা জানায়। আহত কবজি তুলে ধরে খাদু তাতে অন্য হাতের তালু ঘষে আস্তে আস্তে।

ষাইট, সোনা ষাইট। দামোদর বলে ব্যঙ্গ করে, কবিরাজি ত্যাল আইনা লাগাইও, মাথায়ও মাইখো ঘইষা ঘইষা।

লোক আসতে দেখে খাদু তেঁতুলগাছের ছায়ায় পিছিয়ে যায়। রিকশা আর গাছের ছায়ায় তার আবছা মূর্তির দিকে চাইতে চাইতে মানুষটা চলে গেলে এগিয়ে আসে। রিকশাওয়ালা তখন জোয়াল তুলে ধরেছে রিকশার।

আসি গো ঠাইরান। বলে খাদুর কাছে বিদায় নিয়ে দামোদর রিকশাওয়ালাকে বলে, যাও জোরসে চলো। বখশিস দিমু।

খাদু বলে, শোনো, শুনছ ? একটা কথা ভাবতেছিলাম।

রিকশা থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে দেয় দামোদর।

খাদু বলে, তুমি তো বাড়ি চিনা গেলা আমার। কই দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনলা আমারে, তোমার ঘর চিনা নিতে পারুম কিনা ভাবি।

কি করবা তবে ? দামোদর জিজ্ঞেস করে ভয়ে উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপিয়ে।

গিয়া দেইখা চিনা আসুম ? খাদু বলে প্রায় অস্ফুট স্বরে। দামোদর স্পষ্ট শুনতে পায় প্রত্যেকটি কথা। রাসপূর্ণিমার বিনিদ্র উতলা রাত্রি হলেও সেখানে তাদের আশে পাশে আর তো কোনো শব্দ ছিল না।

মাসিপিসি

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারী আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড়ো সালতি বোঝাই আঁটি-বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সি, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আর একটা সালতি, দুহাত চওড়া হয় কি না হয়। দু মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সি একটি বউ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটোসাটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি ক-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়। আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, বেলা আর নেই কৈলেশ। পিছন থেকে পিসি বলে, অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।

মাসিপিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খপরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দুমাথায় থাকলে বলা সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসি বড়ো সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি, কৈলাশ শুরু করে, মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয় ? এত বড়ো সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো—

মাসি বলে, খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কি ?

পিসি বলে, খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এটটু—মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।

মাসি বলে, চায়ের দোকান না কীসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী ?

পিসি বলে, শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারোমাস সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু ?

কৈলাশ ফাঁপড়ে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বউকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাইতে নিতে আসে না আর। আমি বলি কি, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দাও মেয়াকে।

মাসি বলে, পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে ? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে ? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিনভোর রাতভোর ?

পিসি বলে, লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে ? না মরতে ?

গভ্‌ভোপাত ? কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, ফের গভ্‌ভোপাত ? সত্যি নাকি মাসি ? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসি ?

মাসি বলে, কীসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘন ঘন ওকে নিতে ? থাকেনি দুদিন চারদিন করে ?

পিসি বলে, মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই আদরে তাকে ? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস ?

মাসি বলে, ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন ? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।

পিসি বলে, না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা ছল-ছল চোখে এক একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোটো অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোরজবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল রহমান। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নেই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোটো, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বউ নেওয়ার জন্যে। তার বিয়ে করা বউকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বউকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজ কালের মধ্যে। মরবে তোমরা জানো মাসি, জানো পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদী একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে ?

বলে, মাসি বড়ো সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তর-তর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আর একটা গাছের দিকে, ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কি তার পাখা ঝাপটানি।

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারির একটা রোগে, কলেরায়, সে তার বউ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেকদিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত—ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরোমরো মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিকে সামলাবে ? মাসিপিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপমাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসিপিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্যে লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই।

অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি, একদিন মাসি বলে পিসিকে, একটা কাজ করবি বেয়াইন ? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারও সাথে হয়তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে কেই বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়া মাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উপে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার

ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেটভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়ে ছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনও মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায় ?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনের মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ডরাসনি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ও সব কথা বলায় মোদের ?

পিসি বলে, দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ও সব কিছু বলিনি কৈলেশকে !

মাসি বলে, চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা ! মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।

পিসি বলে, ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মতো, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপিচুপি এনে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে বসতে বলি তো বসে, রাত দুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে পাগলের মতো দিবারাত্তির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেল।

মাসি বলে, তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।

পিসি বলে, তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাসনি, ডর কীসের ?

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচরা, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসিপিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসিপিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার

চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন ?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষ মানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত ওটা করা উচিত নয় এ সব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসিপিসি—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে সেও যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দুজনের। এখন এল চৌকিদার কানাই ! হাঙ্গামা না করতে ও আসে না রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই-চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাই-এর সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।

মাসি বলে, এত রাতে ?

পিসি বলে, মরণ নেই ?

কানাই বলে, দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা ! বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনেস্টবলের সঙ্গে। ওবা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, মোদের একজন গেলে হবে না কানাই ?

পিসি বলে, আমি যাই চল ?

কত্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসিপিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।

পিসি বলে, সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, এক দণ্ড লাগবে না।

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাব।

পিসি বলে, এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই ?

কানাই ফুঁসে ওঠে, না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, বটে ? ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।

পিসি বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না ? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।

দু পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি কিন্তু দুটো একটাকে মারব জখম করব ঠিক।

পিসি বলে, মোরা নয় মরব।

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর ! ও ঘোষ মশায় ! ও জনার্দ্দন ! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী...

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি ?

পিসি বলে, তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজন।

মাসি বলে, সজাগ রইতে হবে রাতটা।

পিসি বলে, তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুপিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।

আস্তে চুপিচুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গোরুটা নেই, মাটির গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরানো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় ছাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসিপিসি।

অমানুষিক

সে ছিল ও রকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকিপেটার বেশি না খেয়ে, কখনও বা দু-চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ছিদামের ইতিহাসটাও আর দশজনের মতো সাধারণ, যদিও ভয়াবহ। প্রথমে গেল তৈজসপত্র, তারপর গেল গাইটা। কুঞ্জার রুপোর পইছেটা দিল সে নিজেই, কানের লুকানো মাকড়ি খুঁজে বার করে কেড়ে নিতে হল জমিটুকু যাওয়ার পর। ভিটেটুকু বাঁধা পড়ল সকলের শেষে,—মাকড়ি আগে যাবে না ভিটে আগে যাবে এই নিয়ে মনান্তর হয়েছিল কুঞ্জার সঙ্গে ছিদামের। সবই যে যাবে, তখন একরকম স্থির নিশ্চয়ভাবে জেনে গিয়েছে ছিদাম, ছেলেটাও তার তখন মরে গেছে। তবু ঘরদুয়ারটা সে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অদৃষ্টে বিশ্বাস আর তার ছিল না, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস আর তার ছিল না, ধুঁকতে ধুঁকতে তবু এক দুর্লভ স্বপ্নের রং একটু সে মনে পুষে রেখেছিল যে মাথা গুঁজবার ঘরটা থাকলে হয়তো বেঘোরে প্রাণটা তার যাবে না, আবার একদিন সব আসবে, জমিজমা গাইবাছুর তৈজসপত্র কুঞ্জার গয়না, কুঞ্জার গর্ভে সন্তান। ললিতবাবুর কাছে বাড়িটা বাঁধা দেবার পর তাই সে হতাশায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

একদিন ভোরবেলা বুড়ি মা, জোয়ান বউ আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে রওনা দিয়েছিল অন্য কোথাও কিছু করা যায় কিনা এই রকম একটা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। মরবে তো তারা সকলেই। সেও মরবে, বউ মরবে, মেয়েটাও মরবে, মাও মরবে। দেখা যাক বাঁচবার কোনো পথ যদি খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীর কোথাও, যেখানে রোজ ইস্টিমার ভেড়ে, বড়ো বড়ো লোক থাকে বড়ো বড়ো দালানে, বড়ো বড়ো কারবার চলে বড়ো বড়ো আড়তে, রোজ দুবার বায়োস্কোপ দেখানো হয়, হাকিমরা বসবাস করে।

কিছুই সে প্রায় সঙ্গে নেয়নি। শুধু ছেঁড়া ধুতি আর পিরানের বান্ডিলটা, তার মধ্যে কলকে আর তিন পুরুষের তাবিজটা, তামার। বাহুতে আঁটা তাবিজটা খুলে সে বান্ডিলে ভরেছিল অবিশ্বাসে। ফেলে দিতেও পারত, তা দেয়নি। কোনো কিছু ফেলে দেবার স্বভাব তার নয়। তাছাড়া, গায়ে না রাখুক একেবারে ফেলে দিতে মনটাও খুঁতখুঁত করেছিল।

কুঞ্জা শুধিয়েছিল সসন্দেহে, যাও কই ?

আসি, দেইখা আসি। কিছু নি করন যায়।

কুঞ্জার মনে বুঝি খটকা লেগেছিল তার হাতের বান্ডিল আর ভাবসাব দেখে। গাঁয়ের আরও কত লোক এ রকম 'আসি' বলে চলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ক্ষীণ আর্তসুরে সে বলেছিল, কই যাও কইয়া যাও, মরা মুখ দেখবা।

কমু অনে। ফিরা৷ আইসা কমু অনে।

হনহন করে এগিয়ে গিয়েছিল ছিদাম কথা আদানপ্রদানের সীমানা ছাড়িয়ে, পালিয়ে যাওয়ার মতো। হাপরের মতো ফুঁসতে শুরু করেছিল তার দুর্বল ফুসফুসটা ওইটুকু জোরে হেঁটে।

তারপর কতকাল কত পথ হেঁটেছে ছিদাম, কত দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, বাজারে বাজারে ফালতু ফেলে দেওয়া পচা তরকারি মাছ ডিম কাড়াকাড়ি করে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচাকাঁচা খেয়ে খেয়ে, এর বাগানের ফলটা ওর বাগানের মূলটা চুরি করে করে, এ কেন্দ্রের খিচুড়ি নিয়ে আর এক কেন্দ্রে

পাবার আশায় ছুটতে গিয়ে দম নিতে পথের ধারে ছায়ায় বা রোদে, রোয়াকে বা ধুলো-কাদায় বসে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুঁকে আর ধুঁকে। এমনিভাবে গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, শীত গেছে।

কত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ছিদাম। দেখেছে শুনেছে সে অনেক কিছু, নিজেও করেছে অনেক কাণ্ড। তার মধ্যে গাবোকে বউ সাজিয়ে তার কোলে হাড়ে চামড়ায় এক করা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দিয়ে দুঃস্থ গৃহস্থ সেজে ভিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ছিদাম জীবনে ভুলবে না, ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান। কাদের ক শো বছরের পুরানো দালানের এক পরিত্যক্ত অংশে কোলাকুলি দুটো দেওয়াল আর এপাশে ভাঙা ইটের স্তূপের মধ্যে তিনকোনা ছাদহীন শাপ-শেয়ালের বাসটিতে সে আশ্রয় নিয়েছিল, গাছতলায় থাকলে পুলিশে জুলুম করে বলে, শীতে জমে যেতে হয় বলে। এখানে আকাশের হিম পড়ুক তার গায়ে, দুকোনা ভাঙা দেওয়াল দুটোতে উত্তুরে হাওয়া আটকাত, পুলিশ সামনের পথ দিয়ে গটমটিয়ে হেঁটে গেলেও লাঠির খোঁচা তাকে দিয়ে যাবার সুযোগ পেত না!

ওইখানেই গাবো এসে জুটেছিল একদিন না ডাকতেই। কুকুর বেড়াল তাড়ানোর মতো করে ছিদাম বলেছিল, যা যা, ভাগ।

গাবো তার পিছু নিয়েছিল নিশ্চয়, চট কাপড় কাঁথা মোড়া একটা পুরুষ পদ্মপাতার মস্ত এক খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাগের আশায়, লোভের বশে। খাবারের ঠোঙাটা সেদিন মরিয়া হয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল ছিদাম, আকাশের চিল যেমন মরিয়া হয়ে মানুষের হাতের খাবারের ঠোঙায় ছোঁ দেয়।

স্টিমার স্টেশন আর রেল স্টেশনের রাস্তা যে মোড়ে মিলেছে, যেখানে অনেকগুলি খাজা গজা রসগোল্লা পানতোয়ার দোকান আর মুরগি পাঁঠার মাংস ডিম কারিকোপ্তা ইলিশমাছের ঝোলের ভাতের হোটেল জাঁকিয়ে চলেছে, সেইখানে ভিক্ষা করছিল ছিদাম। তার সামনের দোকান থেকে বেঁটে রোগা নিকেলের চশমা পরা টাকওয়ালা এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক, যাকে দেখলে মনে হয় কোনো আড়তের খাতালেখা কর্মচারী, হাকিমের মতো জোর গলায় হুকুম দিয়ে খাবার কিনলে সাড়ে তিনটাকার, পরোটা এত, পানতোয়া এত, জিভে গজা এত, অমৃত এত। চেঙারিতে পদ্মপাতার ঠোঙায় সব খাবার নিয়ে সে যখন চলতে শুরু করল ইস্টিমার ও রেলস্টেশনের উলটো দিকের পথটাতে, ভিখারি ছিদাম এক নিমেষে হয়ে গেল ডাকাত, আকাশের ছোঁ-মারা চিল। সোজা গিয়ে ছোঁ মেরে ঠোঙাটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশ কাটাল পাশের মেয়ে-বস্তির সরু মোটা গলিঘুঁজির গোলোকধাঁধায়। সেখান থেকেই বোধ হয় গাবো তার পিছু নিয়েছিল। সরকারি মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে গাবো।

ধ্যাত্তেরি, ভাগ বলছি হারামজাদি কুত্তি!

গাবো ভাগেনি। ইটের স্তূপ ডিঙিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তার পায়ে একটা হাত দিয়ে, আর একটা হাত উঁচু করে ধরা খাবারের ঠোঙাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। জোড়াতালি লাগানো গায়ের ঢাকনিটা তার খসে গিয়েছিল। আকাশে কোন তিথির চাঁদ ছিল কে জানে। ছাদহীন পোড়োবাড়ির আশ্রয়ে ছালা কাপড়ের ঢাকনাহীন গাবোর দেহে এসে পড়েছিল মোটাসোটা চাঁদের তেরছা আলো। খাবারে কিন্তু গাবো বেশি ভাগ বসাতে পারেনি। কিছু খেয়েই সে গলা আটকে বলেছিল, জ-জ-জ জল—

জল খেয়েছিল একগাদা। খেয়ে আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, যেন মরে গেছে এমনি ভাবে!

বাচ্চাটাকে যোগাড় করেছিল গাবোই। বুঝিয়ে বলেছিল, শোন বলি। না না, এডা আমার পেটের না। কুড়াইয়া পাইছি, লইয়া আইছি আমাগো রোজগার বাড়ানের লেইগা।

চামড়া ঢাকা একরত্তি একটু প্রাণ, তেলফুরানো পিদিমের নিভু নিভু শিখার মতো, চামড়া ভরা ঘা।

রাতটা বাঁচবো ?

ক্যান বাঁচবো না ? গাবো গর্জে উঠেছিল ক্ষীণকণ্ঠে, মাই দিয়া দুধ পড়ে অখনো, দ্যাখো নাই ?

মাই টিপে দুধ বার করে আবার সে দেখিয়েছিল ছিদামকে। বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিয়েছিল মাই। সেই চামড়াঢাকা প্রাণটুকুর যে কোনো মায়ের স্তন্যপানের শক্তিশালী লীলাটা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ছিদাম। তারপর, আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য ইস্টিমারের একজন চাষাভুসো ধরনের যাত্রীর চটলা-ওঠা টিনের স্যুটকেস চুরি করে সে পোশাক সংগ্রহ করেছিল, ভদ্র চাষি গেরস্তের পোশাক।

দুখানা ঘরে-কাচা নহাতি মোটা শাড়িও সেই টিনের বাক্সে, খুশিতে গদগদ হয়ে গিয়েছিল গাবো।

অনেক আশা নিয়ে মাসখানেক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছে ছিদাম। গেরস্ত চাষিই সে ছিল ভিক্ষুক হবার আগে, এবার সে ভিক্ষা শুরু করেছে আবার গেরস্ত চাষি সেজে। গাবোকে কুব্জারই মতো গেরস্ত চাষির বউ সাজিয়ে সঙ্গে নিয়েছে কোলে মরোমরো বাচ্চাটাকে দিয়ে। কিন্তু বিশেষ কিছু তারতম্য হয়নি তাদের উপার্জনের। শহরের দালানের বড়ো বড়ো লোকেরা যেন খেয়ালও করতে চায়নি সন্তান-যুক্ত গেরস্ত চাষি পরিবার ভিক্ষা চাইছে না ছালা জড়ানো ঘেয়ো কুষ্ঠরোগী ভিক্ষা চাইছে, ভিক্ষাই যাদের ব্যাবসা। তারপর বাচ্চাটা মরল। গাবো একদিন কোথায় গেল নীল প্যান্ট পরা আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে ছিদাম জানতে চায়নি।

তার মন তখন কেমন করছিল ফুলদিয়ার খোড়ো ঘরের একটি স্ত্রীলোকের জন্য, যার নাম কুব্জা, যার কোলে কেবল গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের আগে সে রেখে এসেছিল গাবোর কুড়ানো বাচ্চাটার মতো চিমসে একটা বাচ্চা মেয়েকে, সুনিশ্চিতভাবে তারই ঔরসে কুব্জার গর্ভে যেটার জন্ম হয়েছিল।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে, দই-কাদার পিছল পথে ছিদাম থুপথুপ হাঁটে, বেলা পড়ে এসেছে। এ ছিদাম সে ছিদাম নয় সে তো জানা কথাই। ফুলদিয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে মনটা তার ধাত ফিরে পেয়েছে খানিকটা।

বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা তার জেগেছিল অনেকদিন আগেই. কিন্তু লজ্জা আর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। অসময়ে মা-বউ-মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত মরণের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার লজ্জা, ওরা কেউ বেঁচে আছে কিনা এই ভয়। ঘরে যখন ধান থাকে, তৈজসপত্র থাকে, গাইবাছুর থাকে, বউয়ের পইছেটইছে মাকড়িটাকড়ি রুপো-সোনার গয়না, চারিদিকে আশাভরসা ছড়ানো থাকে বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার—তখন পুরুষ মানুষ খেয়ালের বশে হোক, বৈরাগ্যে হোক, গোসায় হোক, মা-বউ-মেয়ে ফেলে গিয়ে অনায়াসে দু-একটা বছর বাইরে কাটিয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বাড়ি ফিরতে পারে—বাড়ি ফিরেই কৃতার্থ করা যায় বাড়ির লোকগুলিকে। কিন্তু গাঁয়ের যত কাছে এগোচ্ছে থুপথুপ পা ফেলে তত যেন লজ্জা ভাবনার তোলপাড়টা বাড়ছে ছিদামের মনের মধ্যে। সে অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল তখন, যখন আর কোনো সন্দেহই ছিল না যে সবই মরবে, সে সুদ্ধ। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যও সে পালায়নি, সবাইকে বাঁচাবার উপায় খুঁজবার জন্যই পাগলের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। কিন্তু এতদিন কাজে লাগলেও ফুলদিয়ায় পা দেবার পর আজ এ সব যুক্তি যেন ভাবনার বানে কুটার মতো ভেসে যাচ্ছে।

কে যেন মনে বসে প্রশ্ন করছে : সবাইকে বাঁচাতে চাইলে সঙ্গে নিলে না কেন সবাইকে ? তুমি বেঁচেছ—ওরাও বাঁচত—তোমার মা বউ মেয়ে !

হয়তো বাঁচত— কুঞ্জা। কীভাবে বাঁচতো ছিদাম জানে। গাবোর মতো মেয়েটার কঙ্কাল কাঁখে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরত ভিক্ষে করে, মেয়েটা মরলে নীলপ্যান্ট পরা কারও সঙ্গে চলে যেত অন্য সুখের সন্ধানে।

তবে সে বাঁচত। সে যখন বাঁচাতে পারল না, কুঞ্জা যেভাবে বাঁচুক তার তো কিছু বলবার থাকত না।

বাড়ি তার নেই, বেদখল হয়ে গেছে, বদলে গেছে—অথবা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। বাড়িটা কী অবস্থায় কার হয়ে আছে এ বিষয়ে খটকা ছিল ছিদামের কিন্তু বাড়ির কেউ যে তার বেঁচে নেই এতে সন্দেহের লেশটুকু তার ছিল না। কুঞ্জা মরে গিয়েছে ধরে নিয়েই অনেকদিন ধরে অনেকরকম উদ্ভট পরিকল্পনা সে গড়ে তুলেছে কী করে বাঁচানো চলতে পারত কুঞ্জাকে—সকলকে ! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা হলেও বড়ো প্রিয় ছিল পরিকল্পনাগুলি তার কাছে।

তাই, বাড়ি তার ভালো আছে দেখে, বাড়ির সামনের শিউলি গাছটা আজও ঝাঁকিয়ে উঠেছে দেখে আর সেই তলায় সাবান-কাচা তাঁতের কোরা রঙিন শাড়ি পরা কুঞ্জাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ছিদাম থ বনে যায় ! কলসি কাঁখে ঘাটেই কুঞ্জা যাচ্ছিল, আগে যেমন যেত। ছালা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো একটা লোককে বাড়ির বেড়ার সামনে দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কথা মনে জাগে ছিদামের : আজও কুঞ্জা বেলা শেষ করে ঘাটে যায় ? ঘাট অবশ্য লাগাও, তবু—

চেহারা ফিরেছে কুঞ্জার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুঞ্জাকে। এ বড়ো অদ্ভুত কাণ্ড, নয় কি ! বিয়ের সময়কার রোগা প্যাঁটকা মেয়েটা ছ-সাত বছর যদ্দিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাঁকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্ধানের সময়টাতে সে মরার বদলে পুড়ন্ত বাড়ন্ত যুবতি হয়ে গেছে !

কুঞ্জা ঝেঁজে বলে, বাড়ন্ত সব, আর এক বাড়ি যাও।

ছিদাম বলে, চিনলা না মোরে ? আমি যে ফির‍্যা আলাম।

কুঞ্জা দুপা এগিয়ে যায়।—তুমি·ফির‍্যা আসছ ? কন থেইকা আইলা তুমি ?

সে যেন ভূত দেখেছে। এই মাটির পৃথিবী না মৃত্যুর দেশ কোথা থেকে আজ সে এই ছায়াচ্ছন্ন পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হয়েছে এ বিষয়ে তার রীতিমতো সংশয়।

ম্রিয়মান ছিদাম বেড়া পেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, উদাস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, যামু গা ?

ক্যান ? যাইবা ক্যান ? দাওয়ায় কুঞ্জা ভালো পাটি বিছিয়ে দেয় ঘর থেকে এনে, বলে, বসবা এক দণ্ড ? জলডা নিয়া আসুম ? ঘরে এক পলা জল নাই, কমু কি তোমারে।

কুঞ্জা একরকম পালিয়েই যায় কলসিটা তুলে নিয়ে কিন্তু আদর করে পাটি পেতে বসিয়ে গেছে বলে মনটা বিগড়ে যায় না ছিদামের। ঘাট থেকে ফিরে আসবে কুঞ্জা, তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। ও শুধু একটু দম ফেলতে গেছে, সব কথা বিচার করে দেখতে গেছে ঘরে এক ফোঁটা জল নেই বলে জল আনতে যাবার ছুতো করে ! দম ফেলার দরকারটা, বিচার বিবেচনার প্রয়োজনটা জড়িয়ে আছে ওর বেঁচে থাকার, বাগানে ফুল ফোটাবার, রঙিন শাড়ি গায়ে জড়াবার, পরিপুষ্ট হবার রহস্যের সঙ্গে। তাকে বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসিয়ে নইলে সে কখনও গা ধুতে জল আনতে যায় ! তার বাড়ি ছিল এটা। ও ছিল তার বউ। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘর এবং ঘরের ভেতর দিয়ে আর এক ঘর হয়ে উঠান রসুইঘর গোয়াল সব দেখে ফিরে এসে পাটিতে গুম হয়ে ছিদাম বসে থাকে।

বাইরের দাওয়ায় বসে থাকা পর্যন্ত রহস্য তার আয়ত্তে ছিল, বাড়ির ভেতর ঘুরে আসবার পর সে হার মেনে হাল ছেড়ে দেয়। গাবোর মতোই কোনো একটা পুরুষকে বাগিয়ে কুঞ্জা বেঁচে থেকেছে,

রঙিন শাড়ি পরেছে, পুড়ন্ত হয়েছে, জানা কথা। কিন্তু তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্তে শহুরে শয্যা, জিনিসপত্র, প্রসাধনসামগ্রী দেখে, ললিতবাবুর বাড়ির বুড়ি ঝি সুবালার মাকে উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন করে গড়া চালার নীচে কোনো একজন রাঁধুনি রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম।

বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসে এদিক ওদিক একটু ভাবতে না ভাবতে অনেক পথ হাঁটার ফলে ঝিম না ধরে গেলে ছিদাম বোধ হয় উঠে পালিয়ে যেত আর একবার।

ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে কুব্জা একটু রাগ করে। প্রকাশ্য রাস্তার সামনে এখানে এই বেশে এই চেহারায় বসে থাকাটা কি উচিত হয়েছে ছিদামের, কত লোক না জানি দেখে গেল তাকে, কত লোক না জানি কত কথা বলেছে কুব্জার নামে !

কে আর কি কইব তোমার নামে ? কইও আমি ফির‍্যা আইছি। কাইল কইও।

কমু ?

কইবা না ?

আসো, আসো, আসো—ভিতরে আসো।

কুব্জা তাকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে দেয়, খাটে ছিদাম বসে তার জীবনে এই প্রথম, দামি খাটে গদি, তাতে তোশক, আবার চাদর পাতা ধবধবে পরিষ্কার !

তামাক দিবার পার এক ছিলুম ?

কুব্জা তাক থেকে টিন সামনে ধরে সিগারেটের। একটা সিগারেট নিয়ে হুস করে একটানে ধারয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছিদাম ভাবতে থাকে।

আসি। বলে কুব্জা বেরিয়ে যায়। পরে ফিরে এসে বলে, সুবলের মা, ঠাকুর সব কয়টারে বিদায় দিলাম। ব্যাটাব্যাটিরা কি বজ্জাত জানো, কওন মাত্র গেল গিয়া। আমারে মানে না।

কারে মানে ?

ললিতবাবুরে।

অস্ফুট ক্ষীণস্বরে কুব্জা জবাবটা দেয়, বজ্রের মতো স্পষ্ট শোনে ছিদাম। অনেক কিছু চোখে দেখে সে অনুমানে আগেই শুনেছিল বলা যায়, এখন সেটাই প্রমাণিত হল মাত্র। আইনে প্রমাণ না হলে চাযাভুসার মন মানে না।

ললিতবাবু কখন আইব ?

আইজ আইব না।

ছিদাম ভাবে, তাই এত মেয়েলিপনা ! ললিতবাবু আজ আসবে না, যদি আসবার কথা থাকত তবে কুব্জার চালচলন কথাবার্তাও অন্যরকম হয়ে যেত।

যামু ?

ক্যান যাইবা ? বস। কই ছিলা এতকাল ?

সে কথার জবাব না দিয়ে হাত-পা ধোওয়ার প্রয়োজন জানানো মাত্র কুব্জা তাকে পরিষ্কার কাপড় ও গামছা দেয়, ভিতরের রোয়াকে জলও দেয় নতুন বালতি ভরা, কাঁসার ঘটি দেয়, নতুন। তৈজসপত্র আবার হয়েছে কুব্জার, আগের চেয়ে ভালোভাবেই হয়েছে। গয়নাগাঁটি কেমন হয়েছে বলা যায় না, কানে পুরানো মাকড়ি দুটি ফিরে এসেছে চোখে পড়ে। ললিতবাবুর কাছেই মাকড়িটা ছিদাম বিক্রি করেছিল।

খিদেয় নিজেকে অসুস্থ ঠেকছিল ছিদামের। মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার ধুতিখানি পরে ঘরে গিয়ে সে বসেই থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সাগ্রহে কুব্জা দু-একটা কথা বলে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, তাকে কিছু খেতে দেবার কথাই তোলে না। ছিদাম শেষে মরিয়া হয়ে বলে, মুড়ি চিড়া আছে না কিছু ?

কুব্জা গুটিসুটি মেরে তার দিকে কাত হয়ে বসেছিল, তড়াক করে যেন লাফিয়ে উঠে বলে, দেই দেই ! অখনি দেই।

এক ডালা মুড়ি আর এক খাবলা গুড় সে এনে দেয় ছিদামকে, তিনজনের খাবার মতো। ছিদাম মুড়ি চিবোতে চিবোতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

কুব্জা দীপ জ্বালে, ধুনো পোড়ায়। বেড়ায় টাঙানো মালা জড়ানো সেই পুরানো আবছা ছবিটার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। মুড়ি চিবানো সাঙ্গ করে জল খেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে ছিদাম। সন্ধ্যা সেরে আবার নিঝুম হয়ে বসে থাকে কুব্জা তার দিকে পাশ ফিরে।

কেমন যেন হয়ে গেছে কুব্জা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা। এতক্ষণের লক্ষণগুলি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ছিদাম। নিজে থেকে যেচে সে তাকে এতটুকু আদর যত্নও করেনি। তামাক চাইলে সিগারেট দিয়েছে, মুখ হাত ধুতে চাইলে কাপড় গামছা জল দিয়েছে, খেতে চাইলে মুড়িগুড় খেতে দিয়েছে। দিয়েছে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে, আগ্রহে একেবারে যেন অধীর হয়ে পড়ে, কিন্তু চাইলে তবে দিয়েছে, যা চেয়েছে, শুধু সেইটুকু। কিছু যেন খেয়াল নেই কুব্জার, মনে নেই। একদিন সে স্বামী ছিল সেটা নয় বাদ গেল, একটা মানুষ ঘরে এলে, একটা মানুষকে ঘরে ডেকে বসালে, তার সুখসুবিধার দিকে যে একটু তাকাতে হয় তাও কুব্জা ভুলে গেছে। খেয়ে উঠেছে, তাকে এখন আর একটা সিগারেট দিলে হয়। না চাইলে কি দেবে ! চাইলে হয়তো লাফিয়ে উঠবে দশটা দেবার জন্য।

তবে, গোড়ায় ভড়কে গিয়ে বিদায় নিতে চাইলে কুব্জা তাকে বসতে বলেছিল। মুখ ফুটে ছিদামকে বলতে হয়নি, বসুম না কী ? তা, এক হিসাবে ধরলে, এতকাল পরে ফিরে এসেই চলে যাওয়ার কথা বলা মানেই তো ডেকে বসতে বলতে মনে করিয়ে দেওয়া !

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ছিদাম। কুব্জাকে এ ভাবে আবিষ্কার করার অস্বস্তি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু। বাইরে বাদলার আঁধার, ঘরে পিদিমের মিটিমিটি আলো, তারা দুজন থাকলেও তাদের ঘিরেই যেন নির্জনতা আর স্তব্ধতা থমথম করছে। তার ভাঙাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বউটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতি—নতমুখে ঝিম হয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। ছিদামের মধ্যে যুগযুগান্তের পুঁজি করা স্তূপাকার রহস্যানুভূতি আর ভয় পাকিয়ে পাকিয়ে মাথা তুলতে থাকে ধীরেধীরে। এ রকম কত গল্প সে শুনেছে কত লোকের মুখে। দশ পনেরো বছর পরে বিদেশ থেকে মানুষ ফিরল সাঁজসন্ধ্যায়, দেখল ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিল তেমনই গিজগিজ করছে বাড়িভরা আত্মীয় পরিজন—অথবা ভেঙেচুরে গেছে ঘরবাড়ি, তার মধ্যে মাথা গুঁজে আছে দু-একজন আপনার লোক। অথচ অনেকদিন আগেই একরাত্রে রোগে কিংবা দুর্ঘটনায় ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সব মরে বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর সে পোড়োবাড়ির ধার দিয়ে কেউ হাঁটে না ! বাড়ি যে তার শুধু মায়া, আপনজনেরা রক্তমাংসের জীব নয়, বিদেশি মানুষটা তা শুধু টের পেয়েছে বউকে কাঠের বদলে উনানে নিজের পা গুঁজে রাঁধতে দেখে অথবা কোনো জিনিস চেয়ে সেটা আনতে বউকে একঘর থেকে আর এক ঘরে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখে।

কে জানে এ ঘরবাড়িও তার মায়া কি না ! কুব্জা হয়তো সুশ্রী সুন্দর করেছে বাড়িটা, নিজেকে করেছে সুন্দরী তাকে ভোলাবার জন্য। গায়ে হাত দিয়ে দেখবে একবার কুব্জার গায়ে খাঁটি রক্তমাংস কি না ?

মা ও মেয়ের কথা এতক্ষণ জিজ্ঞেস করেনি খেয়াল হয় ছিদামের। খানিকটা সে কাছে সরে যায় কুব্জার।

নাই, কেউ নাই, সগ্‌গলে মরছে। কুব্জা বলে মুখ না ফিরিয়েই, আমি পোড়াকপাইলা আমি ছাড়া মইরা জুড়াইয়েছে সব।

ছিদাম একটা হাত রাখে কুন্তার পিঠে। কুন্তা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়, তাকিয়েই থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার মুখ সোজা করে আগের মতোই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বেড়ার দিকে।

কী বলবে কী করবে তারা ভেবে পায় না, তেমনি ভাবেই বসে থাকে দুজনে। আর একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে টানা যেতে পারে, এ কথাটা সবে মনে পড়েছে ছিদামের, বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

কেডা ? কুন্তা শুধায়।

আমি। জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিসফিস করে কুন্তাকে শুধায়, ললিতবাবু নাকি ?

কুন্তা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

কী করন যায় এখন ?

কী জানি।

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়, আবার ললিত ডাকে। কুন্তা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মতো বসে থাকে।

খুলে দে। ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ভিতরের রোয়াক থেকে ভিখারির ছাড়া পোশাকের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বাঁশবনের ধার ঘেঁষে রাস্তায় নেমে পড়ে। টিপিটিপি বৃষ্টিটা তখন ধরেছে। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি, বিদ্যুতের ঘনঘন চমক ও আওয়াজ।

পেটব্যথা

কথা মতো মানোর মা শেষ রাত্রে ভৈরবকে তুলে দিতে গিয়ে টের পায় সে জেগেই আছে। মুখে আগে ডেকে আর দেখবে কী একেবারে ঠেলা দিয়ে মানোর মা বলেছে, ওগো ওঠো। শুনছ ? ওঠো গো।

তাতে গোসা হয়েছে জাগন্ত ভৈরবের।

এত তাড়া কীসের, আঁ, কীসের তাড়া এত ? ঘুমোসনি রাতে বুঝি কত্খনে কালীকে তাড়িয়ে হাড় জুড়োবি ভেবে ?

এ পর্যন্ত বললে কোনো কথা ছিল না, মানোর মা গায়ে মাখত না কথা। পুরুষ মানুষ অমন বলেই থাকে। কিন্তু উঠে এসে হাইটাই তোলার পর জানলার চাঁদের আলোয় নেংটি ছেড়ে ছেঁড়া মোটা হেঁটো ধুতিটি পরবার সময়তক জের চলে ভৈরবের গোসার।

হাঃ, সে বলে মাঝখানে যত ঘরোয়া কথা হয়েছে তা ডিঙিয়ে তার প্রথম রাগের কথাটাই একটানা বলে যাওয়ার মতো, মেয়েলোক নইলে বলে কাকে। পেলে-টেলে মেয়ে বেচে দেয় পেটের লেগে। মেয়ের মত পেলে একটা ছাগল বেচতে চেয়ে পাগল হবে সে তো ডালভাত।

এতে অগত্যা গোসা করতে হয় মানোর মাকে।

ছাগল লোকে বেচে না পোড়ার মুখো, অভাবে নয়তো স্বভাবে ? মানোর মা বলে কলহের গরম অবস্থায় গাল দেবার সুরে, মেয়ের কথা বলো না যদি শরম থাকে একরতি। না খেয়ে মরেছে মেয়েটা, হায় গো ! ছাগলটা বেচলে তখন বাঁচত মেয়েটা। ছাগলের মায়ায় নিজের মেয়েকে খেতে না দিয়ে মারতে পারে কেউ পুরুষলোক ছাড়া ! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে মানোর মা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

ছাগল বেচলে বাঁচত ? মানোর মার ধাঁধায় কাবু হয়ে পড়ে ভৈরব, ছাগল কোথা ছিল তখন ? কালী তো জন্মালে দু-চার দিন আগে, মানো যাওয়ার দু-চার দিন আগে ওই গোয়ালঘরটায়।

ওর মাটাকে বেচা যেত না ? বাচ্চা কটাকে ?

কার ছাগল কী বিত্তান্ত কিছু জানি না, বেচে দেব ? আর সবে বিইয়েছে দুটো তিনটে দিন আগে ?

রওনা দেও না ? এসো না গিয়ে ভালোয় ভালোয় ? মানোর মা বলে লড়াইয়ে জেতা রানির মতো, বেলা যে দুকুর হয়ে যাবে সদরে পৌঁছতে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে ?

গলায় কাপড়ের পাড় বেঁধে কালীকে টানতে টানতে ভৈরব রওনা দেয় সদরের উদ্দেশে শেষ রাত্রির অস্তগামী চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায়। দু-পা গিয়েছে কি না গিয়েছে মানোর মা ছুটে এসে বাঁশের কঞ্চিটা হাতে তুলে দেয়। উপদেশ দেয় যে টানতে টানতে ছাগল নিয়ে যাওয়া চলে তিন কোশ পথ ? কালীকে সামনে দিয়ে পেছন থেকে কঞ্চির বাড়ি মেরে মেরে নিয়ে গেলে যদি ভরসা থাকে আজ সদরে পৌঁছবার।

উপদেশটা কাজে লাগে ভৈরবের, বউয়ের উপদেশ। সে যেন জানে না ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কায়দা, জন্মভোর খেত চষে আর গোরু-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চুলে তার পাক ধরেছে। তবে কি না কালীকে বারবার কঞ্চির বাড়ি মারতে হয় এই যা দুঃখ। পাড়ের দড়ি বেশ লম্বা ও শক্ত। বাঁধন খুলে পালাবার চেষ্টা করে করে কালী শেষে হার মানে। যুদ্ধের আগের সস্তা শাড়ির পাড়, চওড়া যেমন শক্ত তেমন। ঘরে কাপড় নেই ভৈরবের। এই কটা পাড় আজও টিকে আছে, গোরু-বাঁধা দড়ির কাজ পর্যন্ত বুঝি ভালো চলত আজকালকার দড়ির চেয়ে এই পাড় দিয়ে, যদি গোরুটা তার থাকত।

কোথা থেকে কার একটা ছাগল এসে তার ভাঙা গোয়ালের ফাঁকা চালাটার নীচে পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছিল। মানোর শোকে কাতর, না খেয়ে না খেয়ে আধমরা মানোর মা শুকনো পাতা জ্বেলে মাঘের বাঘ-মারা শীত থেকে বাঁচিয়েছিল ছাগল আর তার বাচ্চা কটাকে নয়তো ছাগলটা বাঁচলেও কটা বাচ্চা টিকত কে জানে ! কয়েক দিন পরে জাফর এসেছিল তার ছাগল আর বাচ্চা নিয়ে যেতে। একটা বাচ্চা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছিল।

দুধ না খেয়ে বাঁচবে তো ? জাফর শুধিয়েছিল। বাঁচাব। বলেছিল ভৈরব উদাসীন ভাবে। মনে মনে সে ভাবছিল, বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো কচি ছাগলের মাংস একদিন মন্দ লাগবে না খুদের সঙ্গে দুটো পেঁয়াজ যদি কোনো মতে তুলে আনা যায় কাল্লুর খেত থেকে।

তার মেয়ে মানো কিন্তু সত্যিই না খেয়ে মরেনি। চলতে চলতে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভৈরব অন্তত দশবার মনের মধ্যে জোর গলায় বলে যে মানো না খেয়ে মরেনি। মানোর মা ওকথা বলে গায়ের জ্বালায়। নয়তো পেটের জ্বালায়। মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয়তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয়তো মরত না, তবু না খেয়ে যে মরেছে এ কথা কোনো মতে মানবে না ভৈরব তার বাপ হয়ে। মানোর মা মরত না তা হলে ? জোয়ান মদ্দ মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরল আর তার মা বেঁচে রইল, এ কখনও হয় ! সেও তো মরেনি, তার আর দুটো ছেলেমেয়ে। দুর্ভিক্ষটা কোনোমতে সামলেছে ভৈরব। একবেলা আধবেলা শাকপাতা খুদকুঁড়ো কোনোমতে জুটিয়ে হাড়-চামড়া টিকিয়ে রেখে কোনোমতে বেঁচে গেছে সবাই মিলে,—মানো ছাড়া। মানোর অসুখ হল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনও অসুখ হলে। অসুখটা যদি না হত, না খেয়ে মানো মরত না, শাকপাতা খুদকুঁড়ো তারও জুটত, মানোও বেঁচে থেকে দেখত খেতে খেতে ভরপুর অজস্র ফসল, অনেককাল যেমন ফসল কারও মাটিতে ফলেনি।

আর কটা দিন পরে মাঠের ফসল তার ঘরে উঠবে—জমিদার অবশ্য যদি কেড়ে না নেয় বাকি খাজনার দায়ে। তা, করালীবাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্য, এত বোকা কি হবে করালীবাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে, বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন !

আনমনা ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে কৈলাস বলে, বলি চলেছ কোথা ছাগল নিয়ে শুঁড়ির পো ?

গায়ে যেন হাজার বিছে লাগে ভৈরবের। সা বটে তার উপাধি, কিন্তু পাঁচ-পুরুষে শুঁড়ির কর্ম তো কেউ করেনি তার বংশে, পাঁচ-পুরুষে তারা চাষি। তার এক দূর সম্পর্কের কুটুম সদরে মদ বেচে টাকা করে। এ জন্য তাকে শুঁড়ি বলা আর বাপ-মা-বউ মেয়ে তুলে গাল দেওয়া সমান কথা।

এই যাচ্ছি হেথা হোথা।

কৈলাস ব্যাপার বুঝে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। সুর বদলে বলে, রাগ কোরো না। ওটা নিছক তামাশা। তামাশা বোঝ না, কেমন চাষি তুমি ? যাই হোক, যত হোক, তুমি লোক ভালো, তা কি জানি না আমি ? তবে কথা কি জানো, ছাগল নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

সদরে বেচে দেব ছাগলটা। ফসল তোলা-তক কটা দিন আর চলে না কোনোমতে।

সদরে গিয়ে ছাগল বেচবে ? কৈলাস বলে আশ্চর্য হয়ে, তোমার তো আস্পদ্দা কম নয় ভৈরব ! গাঁয়ের গোরু-ছাগল সব কিনে নিচ্ছি আমি যে যা বেচতে চায়, আমার লোক চাদ্দিকে রয়েছে, বেচতে যাতে কারও অসুবিধা না হয়, তুমি সদরে চলেছ একটা ছাগল বেচতে ? আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে চাও দেখছি তুমি !

পুবের আকাশে সূর্য তখন কয়েক হাত উঠেছে। কালাপুর ছাড়বার পথ এটা, একটু আগেই পুল। খালের চেয়েও মরা-মজা ছোটো-খাটো নদীটা লোকে অনায়াসে হেঁটেই পার হয়ে যেত, পুল

তৈরি করে দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়ে কৈলাস গুছিয়ে নিয়েছিল। ভোরের রোদে ঝলমলে বাঁকাটে পুলটার দিকে চেয়ে ভৈরব ভয়ডর ভুলে যায়।

আপনাকে গোরু-ছাগল দেওয়া মানে তো খয়রাত করা।

বটে না কি ? সবাই তাই আমাকে গছিয়ে দিতে পাগল ! নাক ঝেড়ে কৈলাস বলে, শোন বলি তোকে, ছ টাকা সবাই পায়, তোকে আট দিচ্ছি আর কাউকে বলিস না। এমনি ছাগলের জন্য আট টাকা করে দিতে হলে ব্যাবসা গুটোতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে লতিফকে এ চিঠিটা দিবি যা—পেনসিলে লিখে দিলাম তো কী হয়েছে, ওতেই হবে। ছাগলটা জমা দিলে লতিফ তোকে আটটা টাকা দেবে।

রও, রও। ভৈরব সাতঙ্কে বলে, আট টাকা কীসের ? সদরে এ ছাগল আঠারো টাকায় বেচব।

কৈলাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।—বাড়াবাড়ি করিস নে ভৈরব। ছাগল নিয়ে সদরে যাবার তোর রাইট নেই। তা জানিস ব্যাটা ?

কী জন্যে ? আমার ছাগল আমি যেথা খুশি নিয়ে যাব।

মাইরি ? কৈলাস খেঁকিয়ে ওঠে বাঘা কুকুরের মতো, আমি দশ-বিশ হাজার ঢেলে লাইসেন্স নেব সরকারের কাছ থেকে, আর তোমরা যার যেথা খুশি নিয়ে গোরু-ছাগল বেচবে ? সরকার আইন করে দিয়েছে, চাল কাপড়, কেরোসিনের মতো গোরু-ছাগল কেউ গাঁয়ের বাইরে নিতে পারবে না। আরে বোকা, আইন যদি না থাকবে তো অত টাকা ঢেলে কে নেবে লাইসেন্স ?

ভৈরবকে ভড়কে যেতে না দেখে কৈলাস আশ্চর্য হয়ে যায়। ভৈরব নিশ্চিন্তভাবে বলে, বোকা পেলে না কি কৈলাসবাবু ? আইন শুধিয়েছি। চালানি কারবারে নামি যদি তো আইন দেখিও তখন।

ভৈরব বলতে শুরু করলে কৈলাস ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে ভাবে। একটা ছাগল কিছুই নয়, কিন্তু লক্ষণটা মন্দ। দশজনে জেনে বুঝে সাহস পেয়ে এ রকম শুরু করলেই তো সে গেছে। এ বিদ্রোহ দমন করা দরকার।

শহরে ঢুকতে না ঢুকতে সহজেই কালী বিক্রয় হয়ে যায় একুশ টাকায়। ভৈরব খুশি হয়। শুধু ভালো দাম পেয়েছে বলেই নয়, গেরস্ত ঘরে কালীকে বেচতে পেরেছে বলে। পোষা ছাগল বেচতে হওয়ার খেদটা তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এই ভাবনায় যে কার কাছে কালীকে বেচবে, কেটেকুটে গর্ভিণী কালীকে হয়তো খেয়ে ফেলবে, নয় মাংস বেচে দেবে। যে দিনকাল পড়েছে। কৈলাসের কাছে তো গোরু মহিষ পাঁঠা খাসি ছাগলের কোনো তফাত নেই, মাংস হলেই হল। কুকুর-বেড়ালও নাকি সে মেশাল দেয়, সে যে মাংস দৈনিক জোগান দেয় তাতে। কালী ভালো ঘরে পড়েছে। ফল ফুল আনাজের মস্ত বাগানের মাঝখানে পুরানো একতলা বাড়ি, ছেলেপুলে নিয়ে সংসারী ভদ্র গৃহস্থ, কালী বিয়োলে তার দুধটা খাবে, কালীকে নয়। বাড়ির লাগাও মাঠ-জঙ্গল আছে, কালী চরে বেড়াতেও পারবে।

কিছু সওদা করতে বাজারে যায় ভৈরব। একখানি গামছা কেনে, শাড়ির বদলে এতেই মানোর মার একরকম চলে যাবে। আধ সের আলু এক সের ডাল মোট সাড়ে ছ-আনার হলুদ লংকা ধনে আর জিরে, চার পয়সাতে সোডা আর দু-আনার একটি কাপড় কাচা সাবান কিনে গামছায় বাঁধে। শেষে ভেবেচিন্তে দু-আনার তামাকপাতাও কিনে ফেলে মানোর মার জন্য।

তারপর পথের ধারে তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসে গাঁয়ের দিকে চলতে শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম করতে ও কিছু তেলেভাজা খেয়ে নিতে। তেলেভাজা বড়োই পছন্দ করে।

বাদাম তেলের চেনা গন্ধে পুরানো দিনের খিদে যেন পাক দিয়ে চেগে ওঠে ভৈরবের মন ও পেটের মধ্যে। বসে বসে অনেকগুলি তেলেভাজা সে খেয়ে ফেলে, জল ও তেলেভাজায় পেট ভরে যাওয়া পর্যন্ত। পেট ভরার আরামে অলস অবশ হয়ে আসে সর্বাঙ্গ, মাথা ঝিমিয়ে আসে মধুর শান্তিতে। শুধু তার জীবনটা নয়, জগৎটাও জুড়িয়ে গেছে ভৈরবের। সামনে নোংরা রাস্তায় ধুলো

উড়িয়ে যে মিলিটারি লরিগুলো চলছে, দিক কাঁপিয়ে সেগুলি চলতে শুরু করার পর দেখতে দেখতে দুর্দশা তার চরমে এসে ঠেকেছে, সেগুলিও এখন আর বুকের মধ্যে অভিশাপের দপদপানি জাগায় না। রাগ দুঃখ আপশোশ দুর্ভাবনা সব তলিয়ে গেছে ভরা পেটের তেলেভাজার তলে !

ঘুম আসা চোখে ভৈরব বাইরে বেলার দিকে তাকায়। গাঁয়ে যখন ফিরতে হবে, রওনা দেওয়াই ভালো। তেমন নাছোড়বান্দা হয়ে যদি চেপেই ধরে ঘুম, পথের ধারে কোনো গাছতলায় ঘুমিয়ে নিলেই হবে খানিক। গামছায় বাঁধা জিনিস কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে শুরু করে। আসবার সময় চোখে লাগানো ছিল নানা ভাবনার ঠুলি, দেখতে পায়নি, এবার শহর ছাড়িয়েই দুদিকে ছড়ানো পরের খেতের ফসল দেখে চোখ তার জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায় ওই সবুজের মতোই তাজা খুশিতে। তার নিজের খেতটুকু যেন লুকিয়ে আছে যে দিকে তাকায় সেইখানে।

ডাক দিয়ে তাকে দাঁড় না করিয়ে এবার কৈলাস সামনে থেকেই তার পথ আটকায়। তার সঙ্গে এবার দুজন ষন্ডাগুন্ডা চেহারার মানুষ।

ছাগল বেচলি ভৈরব ?

ভৈরব উৎসাহের সঙ্গে বলে, বেচেছি গো কৈলাসবাবু, তোমার আশীর্বাদে। দর পেয়েছি এক কুড়ি এক টাকা।

তাই না কি ! তা বেশ করেছিস, আমার বেচাকেনার ঝক্কিটা তুই নিজেই পুইয়েছিস। আট গন্ডা কমিশন দেব তোকে। বার কর দিকি টাকাটা।

কৈলাস তাকে ছোঁয় না, সঙ্গের লোক দুজন ভৈরবকে ধরে কোমরে-বাঁধা টাকা বার করে তার হাতে দেয়। টাকা পয়সা গুণে হিসাব করতে করতে কৈলাস বলে, হুঁ, খরচা করা হয়েছে এর মধ্যে। দাঁড়া, হিসেব করে তোর পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোর ছাগলের দাম বাবদ আট টাকা আর আট আনা মেহনত—সাড়ে আট টাকা। একুশ থেকে সাড়ে আট গেলে থাকে সাড়ে বারো, এই আমি নিলাম সাড়ে বারো, বাকিটা তোর।

এ কেমন ধারা তামাশা কৈলাসবাবু ? ছাড়ো আমায়, ছেড়ে দাও।

তামাশা ? ব্যাটা, তুই আমার তামাশার পাত্র ? দাঁতে দাঁত ঘষে কৈলাস গালে এক চড় বসিয়ে দেয় ভৈরবের, বলিনি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গোরু-ছাগল কেনাবেচার লাইসেন্স কারও নেই, ছাগল বেচতে হলে আমাকে বেচতে হবে ? ঘাড়ে তোর কটা মাথা রে হারামজাদা, গটগট করে সদরে চলে গেলি ছাগল বেচতে বারণ না মেনে ?

ভৈরব ক্রুদ্ধ অসহায় আর্তনাদের সুরে বলে, ডাকাতি করে গরিবের পয়সা কেড়ে নেবে ? নাও—আমি থানায় যাব, নালিশ করব।

থানায় যাবি ? নালিশ করবি ? কৈলাসের মুখে হাসির ব্যঙ্গ দেখা দেয়, যা ব্যাটা থানায়, নালিশ কর গা। বলে তাকে থানার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যই যেন পা তুলে জোরে এক লাথি কষিয়ে দেয় তার বাঁ কোমর লক্ষ করে। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে।

পথচলতি রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা ভৈরবকে জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে দুজন কাছাকাছি এসে পড়েছিল ঘটনাটা ঘটবার সময়। লাথি মারাটা তারা দেখেছে,—কৈলাসকেও কে না চেনে এ অঞ্চলে ! তারা কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কৈলাসেরা অবশ্য চলতে শুরু করে দিয়েছিল ভৈরবকে রাস্তায় ফেলে রেখে,—দৌড়ে পালায়নি, কৈলাস আগে আগে হাঁটছিল হেলেদুলে, পিছনে চলছিল সঙ্গী দুজন, কিছুই যেন ঘটেনি এমনিভাবে। পথে পড়ে মানুষটাকে দুমড়ে মুচড়ে কাতরাতে দেখে, বমির সঙ্গে রক্ত তুলতে দেখে,

রাম-শ্যাম গোড়াতে ভড়কেই গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু যদু-মধুরা এসে পড়বার আগেই কাছাকাছি খানা থেকে আঁচলা ভরে জল এনে ভৈরবের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেও আরম্ভ করেছিল।

দুহাতে পেট চেপে ভৈরবের বেঁকে তেবড়ে যাওয়া কিছুতে কমছে না দেখে সবাই পরামর্শ করে চলতি এক গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

আর ভৈরবের এমনই সৌভাগ্য যে, এই অসময়ে বাড়িতে দিবানিদ্রা দেওয়ার বদলে স্বয়ং কুঞ্জ ডাক্তার হাসপাতালে হাজির ছিল। কৈলাসের প্রতিনিধি বলাইয়ের সঙ্গে কুঞ্জ ডাক্তারের কুইনিন সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল একটা।

হাসপাতালে পৌঁছেই আর একবার বমি করে ভৈরব। একগাদা তেলেভাজার সঙ্গে উঠে আসে একগাদা রক্ত। কুঞ্জ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে করতে শুধোয়, কী হয়েছে ?

মধু বলে, রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল আর রক্তবমি করছিল ডাক্তারবাবু। আমরা তুলে এনেছি।

যদু বলে, কারা না কি মারধোর করেছে।

শ্যাম বলে, পেটে লাথি মেরেছে একজন।

রাম বলে, ছি, ছি, পেটে এমন লাথি মানুষ মারে মানুষকে ! মরে যদি যায় !

কুঞ্জ ডাক্তার বলে, লাথি মেরেছে ? কে লাথি মেরেছে ? ধরতে পারলে না তোমরা তাকে ?

রাম বলে, আজ্ঞে, লাথিটা মারলেন কৈলাসবাবু।

শুনে বলাই বলে, হুম।

শ্যাম বলে, মোরা দুজন আসতেছিলাম, কাছে যেতে যেতে লাথি মেরে কৈলাসবাবু চলে গেলেন সাথের লোক নিয়ে।

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো বাবু তোমরা একটু, লোকটাকে দেখতে দাও ! বলে কুঞ্জ ডাক্তার গম্ভীর মুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভৈরবকে পরীক্ষা করে, লোকদেখানো অনাবশ্যক পরীক্ষাও করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দিয়ে। বমিটা ভালো করে দেখে। তারপর সে রায় দেয়, কলিক। কলিক হয়েছে।

বলাই বলে, আঃ ! তাই বটে। পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের শুনিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার বলে, কলিকের ব্যথা উঠেছে। কলিকের ব্যথা হল, যাকে তোমরা শূলবেদনা বল। ঠেসে তেলেভাজা খেয়েছে, দেখছ না বমি তেলেভাজায় ভর্তি ?

মধু বলে, কিন্তু ডাক্তারবাবু—ও রক্তটা ?

কলিকে রক্ত ওঠে।

যদু বলে, পরশু মোকে শূল বেদনায় ধরেছিল ডাক্তারবাবু। রক্ত তো ওঠেনি ? বমি হতে পেট ব্যথাটা নরম পড়ল।

রোগের লক্ষণ সবার বেলা একরকম হয় নাকি ?

শ্যাম বলে, আমরা যে দেখলাম ডাক্তারবাবু লাথি মারতে ?

দেখেছ তো বেশ করেছ। ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানো তুমি ? লাথি কে মেরেছে কে মারেনি জানি না বাবু, তেলেভাজা খেয়ে ওর কলিকের ব্যথা উঠেছে।

রাম বলে, কৈলেসবাবু লাথি মারতেই পড়ে গেল, রক্তবমি করতে লাগল—

যাও দিকি তোমরা, যাও। যাও, যাও, বাইরে যাও, ভিড় কোরো না। ওষুধপত্তর দিতে দাও মানুষটাকে, চিকিৎসা করতে দাও। বেরোও সব এখান থেকে।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নেমে যায়। ভৈরব দুমড়াতে মোচড়াতে থাকে হাসপাতালের দুটি লোহার খাটের একটিতে। আর একবার সে বমি করে। এবার তেলেভাজা ওঠে

কম, রক্ত ওঠে বেশি। মনে হয়, রক্তবমি করে তার পেটব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে। তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।

বাইরে থেকে গুঞ্জন কানে আসে কুঞ্জ ডাক্তারের, বাড়ি যাবার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরোতেই ক্রুদ্ধ ঝাপটার মতো এসে লাগে গুঞ্জনধ্বনিটা। ইতিমধ্যে রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তেঁতুলগাছটার তলায় জোট বেঁধে তাদের উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাশ কাটিয়ে খানিক তফাত দিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার এগিয়ে যায়।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমের আয়োজন করছে কুঞ্জ ডাক্তার, সেই উদ্ধত ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি দূর থেকে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়ায় তার বাড়ির দরজার সামনে।

বাইরে থেকে হাঁক আসে : ডাক্তারবাবু ! ও ডাক্তারবাবু ! শূলবেদনার রুগি এসেছে আর একজন—কলিকের রুগি।

ভয়ে বিবর্ণ কুঞ্জ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে গিয়ে দেখতে পায়, তারই সদরের চৌকাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গোঙাচ্ছে কৈলাস। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা বলে, পোলাও মাংস খেয়ে শূলবেদনা ধরেছে ডাক্তারবাবু, কলিক হয়েছে।

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাসকরা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে ! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ও সব উদ্‌বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বউকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোটো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু একখানা ভালো, মদন তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভালো, কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে মেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল !

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয় : উঠে হাঁটো দু পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে : কী হল গো ? বলি হল কী ?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বউটা তার ন মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপিচুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপিচুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ যে না, একগুয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে ? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ, একদম যেন মিত্যু যন্তনা, মরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনে টুনে ঠিক করে দিলেন পা-টা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো তাই তো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড়ো ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও— উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দু পাশের ডালপালা দু জনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থমথম করছে : শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ও সব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন !

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে ! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা ? অত কথায় কাজ কী। যন্তনা গেছে না মদন ? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এ সব কথা—এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড়ো বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী ? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একী কথা ? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে ? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা ?

নইলে ইদিকে সে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জানো ? ভুবন আপশোশের শ্বাস ফেলে, যাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপশোশ করবে। আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে ? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুরঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে ? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি ?

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুসড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা বউ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বউ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনও পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জটবাঁধা চুল চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া এ সব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনি। ও সব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ও সব শাড়ি।

মদন তাঁতি ! মদন তাঁতির কাপড় ! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল ? বলল ও সব কথা ? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড়ো বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে : এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত !

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ও সব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলে তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে : মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে-এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতি পাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড়ো খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হাহুতাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয় যেন রাজামহারাজা !

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তারপরেই মাসির গলা : ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড়ো বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কী হয়েছে মদনের বউয়ের ? কী হতে পারে ? গুরুতর কিছু যদি হয়.....

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না ?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

এখনও গেলে না যে ?

যাব। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত ? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড়ো বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগগা বুড়িকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ : ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু ? সুতো নেই বুঝি ?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে ?

বেনারসি ? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপশোশের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে ! এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কী করবে মদন তাঁতি ?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুরশিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁতঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপাল ? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব ?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে ?

তা ছাড়া কী আর ? কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, রাতদুকুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে ? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি ?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি ?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ায় অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় : ভুবনের ঠেয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন ? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপিচুপি ?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে ?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব ? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে ? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

কংক্রিট

সিমেন্ট ঘাঁটতে এমন ভালো লাগে রঘুর। দশটা আঙুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেন্টের স্তূপে, দুহাত ভর্তি করে তোলে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে খাপড়ায় সিমেন্ট, নয় শুধু এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে। জোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধুলোখেলার সুখ। কখনও খাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনও গোপনে করে। কী চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলা বরন। মুক্তার বুক দুটির মতো। বলতে হবে মুক্তাকে তামাশা করে, আবার যখন দেখা হবে।

এই শালা খচ্চর !

গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব বসানো কিম্ভূত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরও বেশি। রুমাল-পোঁছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হুলো বোলতা, গিরীন তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হুলো বেড়ালের মতো রগচটা আর বেঁটেখাটো ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে হলেও। যত বদমেজাজি হোক, যে কোনো হাসির কথায় হ্যা হ্যা করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারও দুঃখদুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মতো গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় যেন রোলার মেশিনে পাথর গুঁড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

রুমাল-পোঁছা এলো না দিকি ?

না।

এলো না এলো, তোর কি রে বাপ্পোত ? ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন ? আমি আছি কী করতে ?

কথা না করে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দুবার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ— এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোঁছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরীন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢং-এ, উৎসুক চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।

দু মাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—

বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগচটা গিরীন রাগের চোটে বিড়বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে তাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভোঁ পড়ার মোটে দেরি নেই, টহল দিতে বার হল কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোঁ-র টাইম হয়ে এলে কাজে ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কী রকম দেখতে ? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব !

খিদেয় ভেতরটা চোঁ চোঁ করছে রঘুর, তেষ্টায় কিনা তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোঁ-র জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না

মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দুমুঠো খেয়ে নেবে আগে, এই সব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বউটার মতো। বউ একটা বটে বেন্দার ! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কী বাস রে মাগিটা, মুক্তার মতো কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, রুটি চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ ছেঁচকি।

হঠাৎ বড়ো শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এ রকম লাগলে কী ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মতো একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি ; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দুহাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশিটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেন্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে বাঘের মতো, গলায় দুবার খাঁকারি দেয় আড়ালের রোলার মেশিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আমি সাত বচ্ছর খাটছি, তুই শালা দু-চার বছরে খতম হয়ে যাবি।

ট্যাঁক ফ্যাফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্যাঁকে দু-এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু-এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেশিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা।

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মতো রঘু নড়ে চড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে দ্যাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁত ঠেকে গিয়ে খিঁচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিসহিসানির আওয়াজে সে বলে, যা যা, ভাগ। পালা শিগগির।

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, শোন। এখানে এইছিলে খপর্দার বলিসনি কাউকে, মারা পড়বি—খপর্দার।

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আর কি, নয় তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কাল ঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির ধমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উলটেপালটে পাক খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে শুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কী রে !

জল খেলি ? গিরীন শুধোয় বাপের মতো সুরে।

হাঁ খেলাম।

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাত পায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারও। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কী তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেশিনে পিষে থেঁতলে মারা গেছে খানিক আগে—এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্য, তারপর অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কী রকম হল ? হুহু করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনার, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন রকমের ধ্বনি হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির ছেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে

ভাসাভাসা শুনতে পেয়েছে কীসে কী ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে ওখানে গন্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, আহা রে ! বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পেরানটা গেল কপাল দোষে।

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, বারবেলার কপাল দোষ ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে ? পোঁছার পা-চাটা শালা ঘাগি বুড়ো ! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস ? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে, চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক ওদিক ঘোরে সে, ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোটো ছোটো দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয়তো চুপ হয়ে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ কটমটিয়ে। যেটুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র—গোপন কারসাজির কথা।

আরেকবার ভোঁ বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা আমতা করে বলে, একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপার্টে, রোলার মেশিনে ও গেছল কেন ?

বদলি করল না ওকে ক রোজ আগে ? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা।

হাঁ—? বটে—?

কী তবে ? গিরীন ফের চটে যায়, রগচটা গিরীন, কী বলতে চাস তুই ? এক রোজ যে কাজ করেনি সে কাজে বদলি করবার মানেটা কী ?

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতর হয়ে উঠছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথায় মানে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছিদামও তাই ভাবছিল।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড়ো খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছা জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের হদিস তাকে দিত, সেই সঙ্গে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বকশিশ। সে রকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটোখাটো দয়া আজও তার জোটে, ছোটোখাটো কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মতো বিছার মতো তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গোখুরি ছাড়া আন্দাজ কি করতে পারত কেউ। আপশোশে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায় ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়ার মতো কী বোকামিটাই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙাতদের কাছে নিজের মান বাড়াবার কী ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয় আর এমনভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড়ো বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক ঠিকানা ছিল না. কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম ! একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াত ওপর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেশিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না !

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কি একটা সুযোগ হারাবে বোকার মতো। উশখুশ করতে করতে এক সময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাঁপেও।

কী যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা। চুপিচুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, কী বলছ ? বোকার মতো কী কাজ ?

সবাই কি বলাবলি করছে জানিস ?

কী বলাবলি করছে ? চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

হুঁ, হুঁ, ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন ? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কি বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।

বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, চলো বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।

পোঁছাবাবু বলে, কীরে ছিদাম, খবর আছে ?

আজ্ঞে।

পোঁছাবাবু তাকে বসতে বলে, চেয়ারে ! প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পোঁছাবাবু—ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে, ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পোঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পোঁছাবাবু কী করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে ভালোরকম জানে না, পোঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আর একটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পোঁছা বলে, কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না, কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলব তোকে।

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পোঁছাবাবু। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে। এবার থেকে সে ওদের দলে।

শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষি দেব তোদের হয়ে।

তোর সাক্ষি চাই না।

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরও তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায়নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে—নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোঁছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোঝুলি করছিল আট-দশ দিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ চিৎকার শোনেনি, মেশিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে ! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, রুমাল-পোঁছার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকি থাকে কারও কেন তাকে মরতে হল, কী করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আপশোশে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মতো যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পোঁছার টুঁটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে।

সে পারে। একমাত্র সেই শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড়ো যে এক খটকা আছে রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওলাদের ? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখেনি ওরা ধরি মাছ না ছুঁই পানির কায়দায় ? কোনো যোগসাজশ কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া—

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনও না বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দুপাত্র খাওয়ায়। রানী খুশি হয় তাকে দেখলে, এসো বোসো বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে-রাঁধা এটা ওটা খাওয়ায়, হাসি তামাশা রঙ্গরসে মশগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খাঁখাঁ করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলন ফিরন নড়নচড়ন দেখে রক্ত তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কী বুঝদার মেয়েটা, কত আপনভাবে তাকে। কদিন আগে হঠাৎ খেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করেনি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলেনি, নিজে তফাত হয়ে থাকেনি আগেরই মতো হাসিখুশি আপনভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করেনি কেষ্ট বাতাপিকে পোঁছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মতো। ট্যাক তার ফাঁকা থাকে না কখনও, ঘরে বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মতো বিঁধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলি কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবি করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেশিনের ঘর্ঘর আওয়াজ চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ছেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতেও সে একা। অন্যঘরের বাসিন্দাদের হইচই বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা-ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোঁদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুব্জার বয়স গড়ন মুক্তার মতো, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশির মতো—ভাঙা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে বেন্দা কি দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন থেকেই টানছে জোরালো টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়। মনটা তার বিগড়ে গেছে বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠছে। সোজা সহজ একটা কথা বারবার মনে পড়ছে যে এ সব লোকের সাথে দহরম-মহরম রাখতে নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, এদের সাথে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত—

মালতীর ন বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ির মতো বলে, কীগো, আজ রাঁধবে না ?

বলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখবিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না রাঁধবার, যদি বলে, দুটি রেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ

পেটটা ভালো করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিঁড়ো না, ঠ্যাং ছিঁড়ো না বলছি ! ও বছর পুষ্পর বাপ লক্ষ্মণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পাটা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নীচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

আলসেমি লাগছে পুষ্প।

মাকে ডাকি ? বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ করে বসে আছে লোকটা ঢেলে ঢুলে ?

চলো যাই।

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরও স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলি জড়ানো। নেশা আরও চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয় তো মিনিট কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশেপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, যাক, শ্যাল শকুনের কোঁদল থামল।

গলি থেকে আরও সরু গলি, তার মধ্যে ঘর বেন্দার, কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফুর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা। ভাঁড়ের বদলে আজ কাচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

হুঁহুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামি চিজ।

[illegible] গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরও ছুঁচোল হয়ে চামড়া আরও বেশি কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর শেমিজ, রং বেরোচ্ছে। দানা দানা মিহি বুদবুদ উঠছে ভর্তি গেলাসের টলটলে রঙিন পানীয় থেকে।

ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাইনি ঠোঁটে।

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে একচুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে, হঠাৎ খেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

আরে আরে, রয়ে সয়ে খাও। রানী বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিকটা জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, বাপস ! ভাগ্যে এলি এলি তুই এলি আচমকা, অন্য কেউ নয়। প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কণ্ঠাতে মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই। ধড়ে প্রাণ এল। আরও দুবার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, তবে, কী আর হত ! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।

আরেক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছে থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরি দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সায়েবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সায়েব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড়ো রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

দুত্তেরি শালার নিকুচি করেছে। বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তুই বোস রঘু, খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো—

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দার খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়েই, ঝাঁঝে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, কী হল, খাও ? হাত বাড়িয়ে গালটা সে টিপে দেয় রঘুর।

ভালো করে বসে আরেকটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘুর গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাবখন দেখিয়ে। ফিরতে দেরি আছে একঘণ্টা তো কম করে।

গায়ে লেগে কানে কথা কয় রানী, তার মদ পেঁয়াজের গন্ধ ভরা নিঃশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙিন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, বাসরে, ধৈর্য নেই এতটুকু ? গেলাসটা শেষ করো ?

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল নিজেই তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আরেকটু মদ ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, আর তোমার ভাবনাটা কি ? কত বিলিতি খাবে তুমি এবার নিজের রোজগারে। তুমি চালাক চতুর আছ ওর চেয়ে, ওতো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি।

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

যাই বাবা ও ঘরে, কখন এসে পড়বে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, একটা কথা বলি শোনো। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে নিয়ো। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের ? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিচ্ছু দিলে না পোঁছাবাবু ? তাহলে দেবে। চোখ ঠেরে রানী হাসে, বাতলে দিলাম, ভাগ দিতে হবে কিন্তু মোকে।

কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ সেই—তার মতো। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মতো ছিদামের মতো। এই তার পথ ! আর একমুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনি ভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হনহন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই তার হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকাছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলেনি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেশিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্ত বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

রিকশাওয়ালা

ময়দানে নধর পরিপুষ্ট গোরুগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছিল। ভদ্রলোক প্রথমে আঙুল নিয়া কাছাকাছি কয়েকটি, তারপর হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা চারিদিকে ছড়ানো সবগুলি গোরু দেখাইয়া বলিলেন, ওরা সব নাকি আদর্শবাদের জীবন্ত রূপক। জীবন্ত, বাস্তব ও প্রামাণিক রূপক। জীবন্ত যে তাতে আর সন্দেহ কী। বাস্তব প্রমাণেই। বাংলার সমস্ত গোহাটা, মাঠঘাট ও গো-পোষা গেরস্ত ঘরে প্রত্যক্ষ, শহর ও মফস্বলের দুধের স্বাদ-গন্ধ ভোলা বা স্বাদ-গন্ধ না-জানা ছেলেপিলেগুলির সংখ্যা ও চেহারায় তথ্যমূলক এবং চিতার ধোঁয়া ও কবরের মাটিতে পরোক্ষ প্রমাণ।—হোয়াট, আঁ আঁ, হোয়াট ? ঠিক না ?

তার ঢুলু ঢুলু লাল চোখে জল আসিয়া পড়িল। না চাহিতে গছানো সরকারি বিবৃতির মতো আমার পাঁজরে সজোরে আঙুলের খোঁচা মারিয়া স্বীকার করিলেন যে, হুইস্কি খাইতেছিলেন। মোটে চার পেগ। নেশা হয় নাই। নেশা হয় না। নতুন কন্ট্রাক্ট পাইলে, বিলের টাকা পাস হইলে, ট্যাক্সের নোটিশ আসিলে ব্যাঙ্কে কত ছিল কত হইয়াছে আর কত হইবে ভাবিলে এবং এ রকম আরও কতগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বুকটা তার ধড়ফড় করে, দিনের বেলাই খান। দিনে শুরু করা প্রায় অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নেশা হয় না। ময়দানে একটু হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন। ভগবান যদি দয়া করেন, ফিরিয়া গিয়া আর গোটা চারেক পেগ খাইলে সন্ধ্যাতক নেশা লাগিতে পারে।

বাঁচাই অসম্ভব দাদা। টাকায় দু সের দুধ, তার অর্ধেক জল, তাও পাওয়া মুশকিল। রিকশাওয়ালা ছআনা নিলে—শালা ব্লাডি ডাকাত। ওই হোটেল আর এই মনুমেন্ট, এইটুকু আসতে ছআনা—ছ ছ গন্ডা পয়সা ! দেশ কি অরাজক ?

ভদ্রলোককে নামাইয়া দিয়া রিকশা রাখিয়া অ্যাসফল্ট দেওয়া ময়দানি ফুটপাথের প্রান্তে ঘাসের রাজ্যে আসিয়া রিকশাওয়ালা দুহাতে পেট চাপিয়া উবু হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ কাশিয়াছিল মনে আছে, ঘুংরি কাশিতে যেমন হয় তেমনিভাবে হুস্‌প হুস্‌প শব্দে আটকানো দম টানিয়া টানিয়া। কেন কাশিয়াছিল জানি। রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, দশটা মিনিট বসিয়া থাকিতে হয় না, বেশি রেটে ভাড়া মেলে, কতজন্মের পুণ্যফল ! টাকার দামের পুরানো সংস্কারটা এখনও টিকিয়া আছে, টাকার দাম যে কমিতে পারে ধারণায় আসে না। খরচ বাড়িয়াছে, সেটা ঠিক কথা, কিন্তু ভিন্ন কথা।

তাই হরেদরে যাতে সমান না দাঁড়াইয়া যায় সে জন্য এরা খরচ কমাইয়াছে। খাওয়ার বাবদেই বেশি যায়, এ খরচটা ছাঁটিয়াছে মোটা রকম। একদিন রাত এগারোটার পর কালীঘাট হইতে রিকশায় টালিগঞ্জ যাইতেছিলাম। রেলের পুলটার কাছে হঠাৎ রিকশা উলটাইয়া ডিগবাজি খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলাম। খুব একচোট গালাগালি আর বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা চড় বসাইয়া দিব স্থির করিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখি, রিকশাওয়ালা সটান মুখ থুবড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। চড় মারার বদলে পানের দোকান হইতে শরবতের গ্লাসে পান-ধোয়া জল আনিয়া লোকটির সেবা করিতে হইল। মাথার উপরে আকাশে চাঁদটা ছিল প্রায় আস্ত। রিকশাওয়ালাটিকে ভালো করিয়া দেখিব বলিয়াই যেন সেই সময়টুকুর জন্য চাঁদ জ্যোৎস্নার জোর খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। লোকটির বয়স ত্রিশের নীচে। চিত হইয়া শোয়ার জন্য পেটের চামড়া খাদে নামায় ভাঁজ নাই কিন্তু ভাঁজের দাগগুলি বেশ স্পষ্ট। মুখের চামড়া মরা শুকনো ট্যাংরার মতো সিটা। চিকণ বিবর্ণ গোঁপের উপর বনেদি ধাঁচের

চোখা দীঘল নাকটা সশব্দ শ্বাস টানার সঙ্গে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছিল। দূরে সেই শ্বাস টানার শব্দ যেন আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কাছে আগাইয়া আসিতেছিল। একটু পরে টের পাইলাম, রেলগাড়ি আসিতেছে। প্রায় আধ মাইল লম্বা মালগাড়ি টানিয়া একটা ইঞ্জিন আগুনের হলকা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া পরম উপভোগ্য বিরাট ঝনঝনির কলরবে পুলে উঠিয়া পড়িল।

তখন খেয়াল হয় নাই। আজ ময়দানে এই হৃদয়বান দার্শনিকের জীবন্ত উপমার কথায় মনে হইল, সে রাত্রে কল্পনা করা হয়তো আমার উচিত ছিল যে রিকশাওয়ালা ও ইঞ্জিনটার একই হাঁপানি রোগ হইয়াছে। একটি খটকা শুধু মনে খচখচ করিতে লাগিল। রিকশাওয়ালা জিদ ধরিয়াছিল প্রতিদিনকার নিয়ম সে কিছুতেই ভাঙিবে না, খাইতে যদি হয় আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সোয়ারি পাইলে সোয়ারি লইয়া ফিরিয়া দু-আনায় কেনা বুটি দুখানি বিনা পয়সায় পাওয়া ছোলার ডাল ও ছ্যাঁচরাটুকু দিয়া খাইবে। সামনের মিষ্টির দোকানে তাকে ছ-আনার দুধ মিষ্টি খাওয়াইতে আমাকে যেরকম ধস্তাধস্তি করিতে হইয়াছিল, ইঞ্জিনে কয়লা দিতে কি ড্রাইভারের সে রকম হাঙ্গামা ও পরিশ্রম করিতে হয় ?

বেচারার করুণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইয়াছিল আমাকে পুলিশেরও অধম ভাবিতেছে। আমি দাম দিলে অবশ্য সে খুশি হইয়া খাইত। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া দিই নাই। কেবল চুক্তির ভাড়াটা চুকাইয়া দিয়া বাকি পথটা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম।

আজকাল অভিযোগ শুনিতে পাই রিকশাওয়ালাদের পায়াভারি হইয়াছে। সোলজারগুলোকে ঠকিয়ে মোটা পয়সা পায় আমরা ডাকলে কথাই বলতে চায় না। স্পষ্ট মুখের ওপর বলে বসে মশায়, যাব না ! অনুযোগে যে পরিমাণ জ্বালা প্রকাশ পায়, কোনো রিকশাওয়ালা সেই অনুপাতে তেজ দেখাইয়া কোনো ভদ্রলোককে অপমান করিয়াছে বিশ্বাস করিতে পারিলে খুশি হইতাম। খুব খানিকটা খাতির আর সম্মান দেখায় নাই, সত্য বোধ হয় শুধু এইটুকু। ট্যাক্সিওয়ালার হুমকি আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের টিটকারিতে বাবুদের বেশি লাগে না। কিন্তু রিকশাওয়ালা জাতটাই নিরীহ গোবেচারি ভীরু। তাদের দেহ কাবু হয় জঘন্য শ্রান্তিতে যা প্রায় ক্ষয়রোগ ও হাঁপানি রোগের সমবেত আক্রমণের মতো : মৃদু এবং শ্লথ কিন্তু দুর্নিবার। মন কাবু হয় আত্ম-তুচ্ছতার কঠিন রোগে। সবাই গাল দেয়, হুমকি দেয়, ধমকায়। সবাই অন্যায় করে, অবিচার করে, অত্যাচার করে। সুস্থ সবল তেজস্বী মানুষ কয়েকবছর রিকশা টানিবার পর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ঝিমায়, বিশ্বাস করে যে রিকশা টানাটাই চুরি করা বা ভিক্ষা করার মতো হেয় কাজ। লোকে যে রিকশা চাপিয়া পয়সা দেয় সেটা শুধু অনুগ্রহ করা নয়, উদারতার পরিচয়ও বটে—রিকশা টানার অপরাধ ক্ষমা করার উদারতা। অস্পৃশ্যরা কঠিন নোংরা কাজ করিয়া টিকিয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার মধ্যে জাতওলাদের যে উদারতা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ বোধ করে। নিরীহতম দু-একটি কেঁচো হয়তো যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার চাপে নিরীহ হেলে সাপ সাজিয়াছে, তাতেই চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে অনেকের। ছদ্মবেশী বিষাক্ত সাপগুলি যে কিলবিল করিতেছে চারিদিকে তাতে কোনো আপশোশ নাই।

এই নিপীড়িত ক্ষয়িষ্ণু মানুষগুলির সহজ সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করে। ভয় বা খাতিরের বিনয় নয়, বকশিসের লোভের খোশামোদ নয়, খাঁটি সৌজন্য। অন্যের আন্তরিকতাকে চিনিয়া গ্রহণ করিয়া আন্তরিকতার প্রতিদান যার মর্মকথা।

এই রোখো ! হিঁয়া রোখো !

সোয়ারির গর্জন শুনিয়াও মোড়ের মাথার কাছে প্রধান রাস্তাটির উপরে সেখানে গাড়ির ভিড়ের মধ্যে রিকশা থামানো গেল না। একটু আগাইয়া বাঁক ঘুরিয়া বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকিয়া রিকশাওয়ালা গাড়ি নামাইয়া রাখিল। সোয়ারি নামিয়াই রিকশাওয়ালার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল।

সোয়ারি বাবু নয়। লুঙ্গিপরা গেঞ্জি গায়ে গামছা কাঁধে শ্রেণির মানুষ। সেখানে কুড়ি পঁচিশটা রিকশা ছিল, রিকশাওয়ালারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া লোকটিকে ঘিরিয়া ধরিল। পথিকও জমিয়া গেল কয়েকজন।

সোয়ারির সেদিকে খেয়াল আছে মনে হইল না। চড় মারিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিয়া সে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রিকশাওয়ালার মুখের দিকে তাকাইয়া হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ সে দুহাতে রিকশাওয়ালার ঘণ্টাসমেত ডান হাতটি চাপিয়া ধরিল।

মাপ কিজিয়ে ভেইয়া। কসুর হুয়া।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সে আবার বলিল, মায় কভি এসা নাহি কিয়া ! বলিয়া রিকশাওয়ালার হাতটি তুলিয়া নিজের গালে চড় বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

আরে রাম রাম !

কতক্ষণ দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আলাপ করিয়াছিল জানি না, মিনিট দশেক পরে বন্ধু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন।

বন্ধু বলিলেন এতে সৌজন্যের কী আছে ? তোমার গালে চড় মেরে কেউ যদি ও ভাবে মাপ চায়, তুমিও তাকে ক্ষমা করবে।

তাতে অন্তত এটুকু প্রমাণ হয় তো যে ও আমার চেয়ে ছোটো লোক নয় ?—বলিয়া আমি যোগ দিলাম, আমি শুধু ক্ষমা করতাম। ওদের মুখের ভাব দেখেছিলে, কথা শুনেছিলে ? ক্ষমা করে ও রকম দিলদরিয়া হবার ক্ষমতা তোমার আমার নেই।

সেই দিনই রিকশাওয়ালা মহাবীরের কাছে তার মুশকিলের কাহিনি শুনিয়াছিলাম। সোয়ারি নিয়া সে চেতলায় গিয়াছিল। একটি বিধবা স্ত্রীলোককে লইয়া কালীঘাটে আসে। কালীঘাটে আত্মীয়ের বাড়ি স্ত্রীলোকটি আর খুঁজিয়া পায় না। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। মহাবীরেরও চেতলা ফিরিয়া যাওয়ার উপায় নাই। গাড়ি জমা দিতে হইবে। অনেক কষ্টে শেষে চেতলা এলাকার একটি গাড়ির খোঁজ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে তাতে উঠাইয়া দিয়া রেহাই পায়। কালীঘাটে সোয়ারি পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়িটি চেতলা ফিরিয়া যাইতেছিল।

ও আপত্তি করল না মহাবীর ? ভাড়া ফসকে যাবার ভয় ছিল তো ?

আপত্তি কীসের ? মহাবীরের ভাড়াও তো একরকম ফসকাইয়া গিয়াছে ! বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীলোকটি যদি ডবল ভাড়া দেয়, দেখা হইলে চেতলায় সেই রিকশাওয়ালা—তাকে মহাবীর চেনে না—অর্ধেক মহাবীরকে দিবে। ভাড়া যদি অবশ্য না পায়—

আজ সকালে যা ঘটিয়াছে সেটা শিশুশিক্ষার গল্পের মতো শোনাইবে। বেলা তখন সাড়ে দশটা। শহর ব্যস্ত, বিব্রত উদ্‌বিগ্ন এবং একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক।

আমি অন্ধ বাবা। আমি অন্ধ ভিখিরি বাবা। আমায় পথটা পার করে দাও ! অন্ধ বাবা...

আরও কয়েক মিনিট এ ভাবে চেঁচানোর পর অন্য কেউ হয়তো তাকে পথ পার করিয়া দিত, একজন রিকশাওয়ালা আগেই কাজটা করিয়া ফেলিল। অন্ধকে যে দয়া করিল ঘটনাক্রমে সে রিকশাওয়ালা তাই উল্লেখ করিলাম। রিকশাওয়ালারাই শুধু অন্ধজনে দয়া করে এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়।

আমি ? আমি কি করিতেছিলাম ? আমি দেখিতেছিলাম অন্ধকে কেউ পার করিয়া দেয় কিনা, কে দেয় এবং কী ভাবে দেয়।

প্রাণের গুদাম

গুদামটা আগে ছিল পুরানো একটা শেড, তাড়াতাড়ি টিন দিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেলে গুদামে পরিণত করা হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কন্ট্রাক্টর, মেঝেটা পাকা করে দেবার দায়িত্বও ছিল কন্ট্রাক্টরের। কথা ছিল নতুন টিন দেবার, কিছু কিছু যে দেওয়া হয়েছে নতুন টিন তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। মেঝেটা উঁচুও করা হয়েছে চারিদিকের জমি থেকে হাতখানেক, গুদামের বাইরের ভিটেটুকুতে সিমেন্ট ঝকঝক করে। ভেতরে ইট পড়েছে কী রকম, সিমেন্ট খরচ হয়েছে কত, লোক খেটেছে কতজন সে সব জানবার প্রয়োজন কারও হয়নি। জেনে লাভও নেই।

মাল বোঝাই হবার আগে গুদামের ভেতরটা ছিল আবছা অন্ধকার। মাল বোঝাই হবার পর তো মেঝে একেবারে আড়াল হয়ে গেছে। তা ছাড়া, গুদাম একরকম একটা হলেই হল—মানুষ সহজে কোনো খাদ্য চুরি করে নিতে না পারে এইটুকু ব্যবস্থা থাকলেই যথেষ্ট। তাই বোধ হয় ফাঁকায় খাদ্যের বস্তাগুলি গাদা করে না রেখে শেডের নীচে ঘেরা জায়গায় ঢুকিয়ে সামনে সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাত থেকে খাদ্য বাঁচল, সেই সঙ্গে বর্ষা বাদলেও খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। আর কী চাই ?

শিবরামের হাত থেকে কন্ট্রাক্টটা ফসকে চলে গিয়েছিল মি. রায়ের হাতে, আত্মীয়তামূলক যোগাযোগের বাড়তি টানে, ঘুষে মি. রায় শিবরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি এ কথা নিশ্চয়। শিবরাম ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিল, শুধু টাকার ঘুষের আর সে রকম দাম যেন নেই অনুগ্রহকারীদের কাছে, দেবতার কাছে নিছক চাল-কলার নৈবিদ্যের মতো, সেই সঙ্গে ফুল চন্দন ধূপ-ধুনা প্রভৃতিরও দরকার হয়েছে আজকাল। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা থাকে তো ভালোই, নয়তো আনাগোনা, টুকিটাকি উপহার, মিঠেকথা, মোসাহেবি এ সব উপচারে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেও বজায় রেখে চলতে হয়। মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যে তাহার ভুল হয়নি পরে শিবরাম তার প্রমাণ পেয়েছে। মি. রায়ের হাত থেকে কন্ট্রাক্ট খসে চলে এসেছে তার কাছে। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে কেন মি. রায় তার সঙ্গে, সেই সঙ্গে সে যদি মানুষকে বশ করতেও আরম্ভ করে অন্যভাবে তবে আর কথা কী।

শিবরাম বলেছিল, এমন ফাঁকি আমরাও দিতে শিখিনি, আমাদেরও বিবেক আছে। তিনভাগ টিন মরচে ধরা, ফেলে দিতে হত। ভেতরে একটু সিমেন্টগোলা জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ইট তো দেয়নি ভিটেতে—জঞ্জাল আর আবর্জনায় ফাঁপা করে রেখেছে। এমনিতেই লাখখানেক ইঁদুর বাসা করত, এখন শেয়াল গর্ত খুঁড়ে বাচ্চা মানুষ করবে !

শশাঙ্ক বলে, উপায় কী, এক জায়গায় তো জমা করে রাখতে হবে, বাজারে ছাড়লেই তো পড়বে গিয়ে আপনাদের এজেন্টদের হাতে। এমনি তবু গরিবদের পাবার ভরসা আছে দু-দশ ছটাক, তখন আর চোখেও দেখতে পাবে না।

ও সব আটা ময়দা চাল আমরা খাই না মশায়।

আপনারা ভালো জিনিস খান, কিন্তু বেচেন তো এ সব। খাবার জন্যে না কিনুন, চালান দেবেন, নয় চালানি দামে আশেপাশে বেচবেন।

এমনিভাবে কথা বলে শশাঙ্ক, জীর্ণ শীর্ণ আধবুড়ো এক কেরানি। এই দুর্ভিক্ষের দিনে তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়ে বুকটা যেন তার কেঁপে উঠেছে। দায়িত্ব তো ভারী, শুধু দেখা যে বড়ো বড়ো তালাগুলি ঠিকমতো লাগানো আছে আর দারোয়ান ও পাহারাওয়ালা

ক জন ঠিকমতো কাজ করছে। একটা তালা খুলবার ক্ষমতাও তার নেই। তবু তার কথা শুনে মনে হয়, চারিদিকের ওতপাতা মুনাফাখোরদের কবল থেকে সেই বুঝি এই খাদ্যগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়ে সাধারণ দুঃখী লোকের জন্য জমিয়ে রেখেছে। তবে, শশাঙ্ক কখনও শত্রুতা করে না। হাতের তালুতে ভাঁজকরা কিছু নিয়ে ওর হাতে হাত মেলালে খালি হাত ফিরে আসে, খাতির বাতিল করার বাহাদুরি ওর নেই। তার সরবরাহ আটহাজার মন আটা দেখে সেও মুখ বাঁকিয়েছিল, কিন্তু সময়মতো জায়গামতো ঠিক কথাটি বলতে কসুর করেনি,—আটা মোটা হলে একটু ভোঁতা গন্ধ ছাড়ে হুজুর, নতুন আটাতেও। লোকে এ আটা পেলে লুফে নেবে !

না বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না কিছু। কেনা মাল যেমন হোক গুদামে তোলাই তখন কাজ। পরের কথা পরে।

শশাঙ্ক নিজেও জানে না বিশেষ দরকার না থাকলেও নিবারণ বা মি. রায়ের পক্ষ টেনে সময় মতো ও সব সমর্থনের কথা কেন সে বলতে যায়। কতটুকুই বা ক্ষমতা তার উপকার করা বা ক্ষতি করার। সব কিছু ঘটে একরকম তার নাগালের বাইরে, দু-চারটে নোট তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয় সে যাতে কোনো গোলমাল না করে, চুপ করে থাকে। মুখটা বন্ধ করে রাখার পুরস্কার ওটা। কেন তবে সে বাহাদুরি করতে যায় ? টাকার কৃতজ্ঞতায় ? অথবা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দিতে, আমিও আছি এর মধ্যে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আমি আপনার অনুগত, আপনারই পক্ষে ?

হয়তো ভালোই হয়েছে ফলটা। তাকে যে বিশ্বাস করে ওপর থেকে, তার তো প্রমাণই পাওয়া গেল। কিন্তু উপার্জনটা বড়ো কমে গেছে এই বিশ্বাসের বোঝায়। এই কাজে এসে উপরি তেমন জুটছে না। আগেকার বাটোয়ারার জের টেনে কিংবা নায়েবের সঙ্গে এখনও তার খাতির আছে এই জন্য ভিক্ষার মতো কিছু যদি কেউ দেয়।

বিশেষ কিন্তু আপশোশ হয়নি শশাঙ্কের। মনটা তার চিরদিনই একটু স্পর্শপ্রবণ ছিল, চারিদিকের আকাশছোঁয়া লোভ ও স্বার্থপরতার চাপে কঠিন হয়ে গেলেও এখনও দুঃখের ছোঁয়া লেগে তাকে একটু উন্মনা করে দেয়। অন্তরের এই বিলাসিতাটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সে পুষে রেখেছে, সময় ও সুযোগ মতো উপভোগ করে। চারিদিকে অনাহারে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চোখে দেখে এবং বর্ণনা শুনে ও পড়ে সে দুঃখিত হতে সাহস পায়নি, নিজেকে উদাসীন করে রেখে দিয়েছে। আনমনা হয়ে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যেতে পারে, এ তো পরের, গরিবদুঃখীর না খেয়ে মরার জন্য সমবেদনা বোধ করা।

এখন আর অতটা মনকে বাঁচিয়ে চলবার দরকার হয় না শশাঙ্কের, খেতে না পেলে ক্রমে ক্রমে নানা বয়সের মানুষের কী অবস্থা হয়, কী অবস্থায় তারা মরে পড়ে থাকে পথের ধারে, এ সব এখন সে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারে, দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলতে পারে। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য তার মনে এই জোরের সঞ্চার করছে। এই বিরাট খাদ্যভাণ্ডারের সংস্পর্শে থেকে সে অনুভব করে, আর ভাবনা নেই, না খেয়ে এবার আর মরবে না কেউ এ শহরে বা আশেপাশের গ্রামে। কে পেট ভরে খেল কার আধপেটা জুটল সে হিসেব চুলোয় যাক, না খেয়ে কেউ আর মরবে না এত খাদ্য থাকতে !

টিনের ফুটো আর ফাঁক দিয়ে খাদ্যের গন্ধ প্রতিদিন নাকে এসে লাগে শশাঙ্কের, খাদ্যবস্তুর এই অবিস্মরণীয় ঘনিষ্ঠতায় তার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে যায় : হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই খাদ্য দুর্দিন পার করে দেবে।

স্টেশনে নেমে লাইন ধরে হেঁটে লেভেল-ক্রসিংয়ের রাস্তা দিয়ে শহরে যাবার সময় গুদামটা ডাইনে পড়ে। এ রাস্তায় লোক চলাচল কম, গাড়িঘোড়াই চলে বেশি। দুপুরবেলা হঠাৎ জামাই সত্য এসে প্রণাম করায় শশাঙ্ক টের পায়, একটার গাড়ি থেকে নেমে সত্য বাড়িতে যায়নি, লেভেল-ক্রসিং হয়ে সোজা এখানে এসেছে। কারণটা শশাঙ্ক বুঝে উঠতে পারে না। এইখানে যে তার আপিস হয়েছে আজকাল তাও বা জামাই কী করে জানল সে ভেবে পায় না।

বাড়িতে যাওনি ?

আজ্ঞে না। ভাবলাম যাবার পথে আপনাকে প্রণাম করে যাই। এই নাকি ফুড স্টোরেজ ?

এসে দাঁড়িয়েই মুখ বাঁকিয়েছিল সত্য, মুখের ভঙ্গিটা তার আরও গভীর ভাবোদ্যোতক হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক নিজে থেকে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, আটা ময়দা থাকলে ও রকম গন্ধ একটু হয়। চলো তোমাকে নিয়ে বাড়ি যাই।

আপিস ?

আপিস আর কী, বসে থাকা। একদিন একটু তাড়াতাড়ি গেলে কিছু হবে না। ন মাসে ছ মাসেও এখানে কেউ খোঁজ নিতে আসে না।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কুলির মাথা থেকে সত্যের মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়। প্রথম মেয়ের প্রথম জামাই, বিয়েও হয়েছে মোটে বছর দুই, তাকে এ ভাবে নিজে হাজির থেকে আদর অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে শশাঙ্ক খুব খুশি হয়। আগের কাজে থাকলে এ ভাবে হঠাৎ যখন খুশি জামাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হত না। তবে, আগের কাজে থাকলে জামাই বাড়ি যাবার পথে তাকে প্রণাম করার জন্য অতটা ঘুরে যেত কিনা সেটা ভাববার কথা বটে।

আপনার ও আটাময়দা কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

গরিবদুখি খেতে পায় না, তাদের আবার ভালো আর খারাপ।

দু-একমাস পরে আর মানুষের গ্রহণের যোগ্য থাকবে না। ভেতরে গিয়ে কেউ কখনও দ্যাখে না ?

কই, না ? দরকার লাগলে বার করা হবে, কে আবার দেখতে যায় গেট খুলে ভেতরে গিয়ে ? তুমি তো ভাবিয়ে দিলে আমায় !

ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখবার কায়দা আয়ত্ত করতে হয়েছে শশাঙ্ককে অনেকদিনের চেষ্টায়, নতুন জামাইকে সঙ্গে রেখে অত ভাবনা ভাবলে চলবে কেন। কিন্তু রাস্তার দু পাশের শত শত চিহ্ন যেন ষড়যন্ত্র করেছে কথাটা তাকে ভুলতে দেবে না। গাছের ছায়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে গাঁ ছেড়ে পলাতক কঙ্কালগুলি, সূর্যাস্তের সঙ্গে ওদের কতকগুলির জীবন অস্ত যাবে কে জানে। ছায়া না খুঁজে দুপুরের এই খররোদে হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেক কঙ্কাল ধুলায় ধূসর হয়ে, উৎসুক ভয়ার্ত চোখে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চেয়ে ওরা কী কামনা করছে শশাঙ্ক জানে। জামায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার ভীরু করুণ উদাস চাউনি দেখে সত্য অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বাড়ি পৌঁছেই শশাঙ্কের ছুটি, জামাইকে লুপে নেয় মেয়েরা। নীচে পিছন দিকের ছোটো ঘরখানায় বসে শশাঙ্ক আকাশ-পাতাল ভাবে। গন্ধ ? গুদামের ভেতর থেকে গন্ধ কিছু বেরোচ্ছে বইকী, সে তো রোজই টের পাওয়া যায়। সে কি ভেতরের সমস্ত খাদ্য পচবার গন্ধ ? অথবা অত খাদ্য একসঙ্গে জমা করা থাকলে এখানে ওখানে একটু আধটু পচন ধরে ও রকম গন্ধ ছাড়ে, যার কোনো প্রতিকার নেই। মানুষের খাদ্য নিয়ে যত সাজানো গুছানো কায়দা করা মিথ্যা কথা শশাঙ্ক শুনেছে আর নিজেও বলেছে আজ সেই কথাগুলিই তার মনের মধ্যে ভাঁজ খুলে খুলে নতুন যুক্তি

আর সত্যের রূপ নিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চায়। মেঝেতে যে যে বস্তা লেগে থাকে ড্যাম্প লেগে সে বস্তাগুলি খারাপ হয়ে গন্ধ বেরোয়—কিন্তু উপরের বস্তাগুলির কিছুই হয় না। একটা বস্তা কোনো কারণে আগে থেকেই খারাপ হয়ে থাকলে সেটা ক্রমে ক্রমে চারপাশের অন্য বস্তাগুলি নষ্ট করতে থাকে, তাতেও পচা গন্ধ বার হয়, কিন্তু তাই বলে একটু তফাতের বস্তা কেন নষ্ট হবে ! সত্য এ সব বিষয়ে কী জানে যে বাইরে থেকে শুধু গন্ধ শুঁকেই সে বলে দিতে পারবে ভেতরের সব জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে ! ভাঁড়ারঘরে একটা ইঁদুর পচলেও তো মনে হয় সমস্ত জিনিস বুঝি পচে গলে ভাপসে উঠেছে। সেই ভুলই হয়তো করেছে সত্য ?

মন শান্ত হয় না। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য যদি সত্যসত্যই নষ্ট হতে বসে থাকে, প্রায় অযোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে মানুষের খাবার ? তার নিজের কোনো ক্ষতি নেই, শশাঙ্ক জানে। গুদামের জিনিস কী অবস্থায় আছে দেখবার দায়িত্ব তার নয়। সে শুধু দেখবে তালা ঠিক মতো লাগানো আছে কি না, পাহারা ঠিকমতো চলছে কি না আর লিখিত হুকুম এলে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিস ডেলিভারি হল কি না। তার বেশি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তার নয়। দোষ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তবু এই দুর্দিনে তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য নষ্ট হওয়ার কথা ভাবলেও নিজেকে কেমন তার দুর্বল মনে হয়। পুণ্যের বোঝা ফাঁকা দেখলে পাপীর যেমন হয়, তেমনই যেন অসহায় ঠেকে তার নিজেকে।

দুটি ভিক্ষে দাও গো মা।

খিড়কির এই দরজাতে ভিখারিনি এসে জুটেছে, জঙ্গল বাঁশঝাড়ের বাধা না মেনে ? এঁটো-কাটা ফেলবার আস্তাকুঁড় বাড়ির পিছনে থাকে বলে বোধ হয়—জঞ্জালও ঘাঁটা চলে, ভিক্ষাও চাওয়া চলে। বাড়ির পিছনে ছিটাল দিয়ে ভিখারিও চলাফেরা করে কম। জানালা দিয়ে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে ভিখারিনির দিকে। জটবাঁধা রুক্ষ চুলের নীচে শ্যাওলা ধরা মেঝের মতো স্যাঁতসেঁতে মুখ, কোলে একটি শিশু। বাচ্চাটিকে দেখে কেমন একটা ক্লেদাক্ত ভয়ের স্পর্শে সর্বাঙ্গে তার শিহরন বয়ে যায়, গা ছমছম করতে থাকে। এতটুকু মানুষের বাচ্চা মাথা উঁচু করে অস্ফুট আওয়াজে কাঁদছে ? একটা অপুষ্ট ভ্রূণ যেন অভিনয় করছে জীবন্ত শিশুর। দড়ির মতো পাকানো রুগ্ণ শিশু দেখেছে শশাঙ্ক, কী করে বেঁচে আছে ভেবে দেহ শিরশির করে উঠেছে কিন্তু এ বাচ্চাটার দিকে তাকালে যেন ধাঁধা লেগে যায় চোখে।

ভিখারিনি ক্ষীণস্বরে ডেকে চলে, দুটি চাল কেউ দিয়ে যায় না। জামাইকে নিয়ে বাড়ির সকলে ব্যতিব্যস্ত।

এই শোন। এদিকে আয়।

ভিখারিনি উবু হয়ে বসেছিল, জানালায় একটু তাকিয়ে ঠোটে ঠোট পিষে ফেলে মুখের একটা ভঙ্গি করে। ভেতরটা রিরি করে ওঠে শশাঙ্কের। নির্জন দুপুরে আধবুড়ো ভদ্রলোকও জানালা দিয়ে হাতছানি দিয়ে কেন ডাকে এত বেশি করে ভিখারিনি তা জেনে গেছে, লোল চামড়া বুড়ির চেয়েও ভাঙা শিথিল ও রোগজীর্ণ ওই বয়সকালের দেহটি নিয়ে।

কচুগাছ সরিয়ে ভিখারিনি জানালার সামনে আসে।

ক মাসের ছেলে ?

বছর পুরবে বাবু।

বছর পুরবে। খানিকক্ষণ শশাঙ্ক কথা কইতে পারে না। কাছে থেকে বাচ্চাটাকে দেখে ভেতরটা তার পাক দিয়ে উঠতে থাকে।

এ সব বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ভিখারিনির পরিচয় আছে, সে বলতে থাকে, হওয়ার পর বাপ মোলো। আমি না খেতে পেলে দুধ পাবে কোথা ? খেতে না পেয়ে ওমনি হয়ে গেছে।

না খেয়ে হয়েছে ? না, ভিক্ষে বেশি পাবি বলে নিজে করেছিস ?

কার জন্যে ভিক্ষে করা বাবু ? ওরই জন্যে তো। নইলে—ভিখারিনি নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকায়, মরলে বাঁচি, তা মরবে না। আমার পোড়াকপাল তাই বেঁচে রয়েছে, মেরে ফেলতে পারি না তাই !

এক বছর আগেও সে গেরস্ত ঘরের বউ ছিল, স্বামী নিয়ে ঘর করত, আজ তার মুখে হৃদয়ের ছায়াপাত হয় না, শুধু জ্বালার প্রতিচ্ছবি ছাড়া। শশাঙ্ক নিজে উঠে গিয়ে কিছু চাল আর বাটিতে দুধ নিয়ে আসে, দুধের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করতে হয়।

জামাইয়ের এদিকে দুধ কুলোবে না, একবাটি দুধ তুমি দাতব্য করছ !

ও বেলা এক সের দুধ বেশি এনে দেব।

খিড়কির দরজা খুলে দুধের বাটি নামিয়ে রেখে শশাঙ্ক ভিখারিনিকে বলে, আমার সামনে বসে খাওয়া ছেলেকে পেট ভরে।

আমি খেয়ে ফেলব ভাবছ বাবু ? গাছের পাতা ছিঁড়ে চট করে একটা চামচ বানিয়ে সে বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করে, এই জন্য বেঁচে আছে বাবু, তোমাদের দয়ায়। কেন দয়া কর বাবু, কেন দয়া কর ? মরলে যে আমি রেহাই পাই !

গুদামের পচা খাদ্যের গন্ধ নাকে লাগায় শশাঙ্ক আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এখানেও গন্ধ আসচে কোথা থেকে ? ভিখারিনি উঠে দাঁড়াতে গন্ধটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পচা মানুষের গন্ধও কি পচা খাদ্যের মতো ? আশ্চর্য কি, খাদ্যই তো প্রাণ মানুষের, খাদ্য থেকেই তো দেহ ! ভিখারিনি চলে যাবার পর তেত্রিশ হাজার মন খাদ্যের রক্ষক বলে নিজের মধ্যে যে অর্থহীন স্বস্তিটা সে গড়ে তুলেছিল তার অস্তিত্বটুকুও যেন আর খুঁজে পায় না। মনে হয় তারই বোকামিতে তারই একটু অবহেলায়, ওই খাদ্যে যতলোকের জীবন রক্ষা হতে পারত ততগুলি লোক মরে পচে উঠতে আরম্ভ করেছে, দায়িত্ব তার। পচা গন্ধে মশগুল হয়ে উঠেছে চারিদিক, সে কী বলে চুপচাপ বসে রয়েছে শুধু গুদাম পাহারা দিয়ে ?

শশাঙ্ককে জামাকাপড় পরতে দেখে তার স্ত্রী বলে, আবার বেবুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, সায়েবের সঙ্গে একবার দেখা করব।

জামাই বলছিল তোমার সঙ্গে কী দরকারি কথা আছে।

ডাকবো নাকি, না, আমিই যাব ? শশাঙ্ক ভাবে, জামাইরা সত্যি লাটসাহেব !

তুমিই যাও না, জিজ্ঞেস করো কী বলবে।

খেয়ে উঠে ওপরের ঘরে পান চিবুতে চিবুতে সত্য সিগারেট টানছিল, শশাঙ্ককে দেখে সিগারেটটা একটু আড়াল করে অনেক ভূমিকা ও ভণিতার পর সে তার দরকারি কথায় আসে।

জানেন তো চাকরি করি না, আমি এখন সুখনলালের এজেন্ট। ব্যাবসাই করছি বলা চলে একরকম। কমিশন যা পাই কোনোকালে ব্যাবসা করে অত পার্সেন্ট লাভ কেউ করেনি। এখন কথা হল কি, আপনার গুদামের আটা ময়দা তো পচে যাচ্ছে।

কথার যোগাযোগটা বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু বুকটা শশাঙ্কের ধরাস করে ওঠে।

গুদামটা আমার নয় বাবা ! সে বলে কোনোমতে।

সত্য হাসে, ও একই কথা। সে যাই হোক, এখনও গুদামের মাল বাজারে বেচাকেনা চলবে। আমার হাতে কিছু রদ্দিমাল আছে, সেটা বদলে দিতে হবে আপনাকে। তেল যা লাগে খরচ করব, তাতে আটকাবে না। আপনারও কোনো ভয় নেই, চ্যালেঞ্জ করলে বলবেন গুনে দ্যাখ মেপে দ্যাখ। যে পরিমাণ নেব ঠিক সেই পরিমাণ রিপ্লেস করব।

পাংশু বিবর্ণ মুখে ঢোঁক গিলে শশাঙ্ক বলে, কিন্তু আমার কাছে তো চাবি নেই।

নিরুপায় হয়ে মিথ্যা কথাই বলে শশাঙ্ক। গুদামের আপিসে সত্যের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা এতক্ষণে তার কাছে পরিষ্কার হয়।

সত্য আশ্চর্য হয়ে বলে, গুদামের চাবি আপনার কাছে নেই ? দরকার হলে গুদাম খোলে কে ?

আমিই খুলি, সায়েব তখন আমাকে চাবি দেয়। অন্য সময় নিজের কাছেই রাখে।

তাই তো ! সত্য বলে চিন্তিত হয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মি. নন্দীর কাছে হেঁটে যাওয়ার ধৈর্য শশাঙ্কের থাকে না, সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বসে। তার চিরকুট পেয়ে খাসকামরায় উঠে গিয়ে সেখানে মি. নন্দী তাকে ডেকে পাঠায়।

আটা ময়দা পচে যাচ্ছে ? এই জন্য আপনি এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন ?

অতগুলি ফুড হুজুর। কতলোক খেয়ে বাঁচত।

ট্যাড়া দিয়ে বিতরণ করতে চান না কি ?

আজ্ঞে না।

তবে ? মি. নন্দীর মুখে হাসি ফোটে, আপনি তো বড়ো নার্ভাস লোক মশায় ! নষ্ট হয় তো হবে, আমাদের কী করার আছে ! স্টোর করার কথা, আমরা স্টোর করেছি। তার বেশি কিছু করার ক্ষমতাই বা কই আমাদের ? ইনস্ট্রাকশন না পেলে কিছুই করা চলে না। তাছাড়া—মি. নন্দীর হাসিটা এবার করুণাদ্যোতক মনে হয়, নানা কোয়ালিটির জিনিস পোরা হয়েছে, সব মাল খারাপ হয়ে দাঁড়ালে ধরা যাবে না। ভাববেন না, সব ঠিক আছে।

বাড়ি ফিরে শশাঙ্ক শোনে, জামাই নাকি সে বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। সন্ধ্যার সময় মি. নন্দীর বাংলোতে শশাঙ্কের ডাক আসে। সেখানে সে দেখতে পায় সত্যকে।

মি. নন্দী বলে, আপনার কথাটা ভাবছিলাম শশাঙ্কবাবু। আটা ময়দা নষ্টই যখন হয়ে যাচ্ছে, কিছু বাজারে গেলেও লোকে খেতে পাবে। ইনি দু হাজার বস্তা খারাপ মাল বদলে নিতে চান। স্টোর থেকে ওঁকে পছন্দসই দু হাজার বস্তা দিয়ে, ওঁর বস্তা সেখানে রেখে দেবেন।

কেউ জিজ্ঞেস করলে—

জিজ্ঞেস করলে বলবেন, কিছু নতুন মাল এল, কিছু পুরানো মাল চালান গেল। রিপোর্ট ঠিক করে নেবখন।

শালাশালিরা বলামাত্র জামাই বাড়িতে সে রাত্রে মস্ত ভোজ দেয়, হইচই চলে অনেক রাত পর্যন্ত। শরীর খারাপের অজুহাতে শশাঙ্ক সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ঘুম কিন্তু তার আসে না সহজে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে।

সকালে সত্যসত্যই শরীরটা খারাপ লাগে। খেয়ে দেয়ে আপিসে বেরোবে, সদরের সামনে দেখা হয় গতকালের সেই ভিখারিনির সঙ্গে।

এগিয়ে এসে নিস্পন্দ বাচ্চাটিকে সে শশাঙ্কের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

তোমার দুধ খেয়ে মরেছে বাবু।

ছেঁড়া

সেকেলে বুড়ো ছেঁড়া মাদুরে বসে ঝিমোয়। একেলে বুড়ো তার সামনে একগাদা বই খাতা নিয়ে বসে থাকে গোমড়া মুখে। ছেঁড়া প্যাকিং কাগজের মলাট দেওয়া ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল।

ইংরেজি পড়বি না, ইংরেজি ? ভালো করে ইংরেজি পড়। বেশি করে পড়। ইংরেজি ভালো জানলে বাস।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঝিমোনো কথা, তবু প্রত্যাশা ও উৎসাহ বেশ আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পড়ন্ত রোদ কাপছে খড়ের জীর্ণ চালায় রংটুকু হারিয়ে সিক্ততায় চিকচিকিয়ে কাঁদছে। পচার চোখ চকচক করে উঠছিল ভেজা গাছপালার দিকে চেয়ে, ওই আড়ালের ওপারে খেলার মাঠের কাদা, নদীর ধারের পিছল তীর। শ্রান্তিতে মিইয়ে যায় মুখের ভাব, বসার ভঙ্গি। সারাদিন স্কুল করে এসে আবার পড়া তৈরি করা, দিনের আলোয় যতক্ষণ পড়া যায়। ভাঙা লণ্ঠন জ্বলবে না সন্ধ্যার পর। কেরোসিন নেই। কিন্তু খেলাধুলোও যে চলবে না সন্ধ্যার পর, তা কি ভাবে দাদু. মামিমা মানে।

ইংরেজি পড়, ইংরেজি শেখ। ইংরেজি একটু জানলে, বাস, আর ভাবনা নেই। রাখাল দুটো ইংরেজি কথা কইতে শিখেছিল ফাস্টোবুক পড়ে, কলকাতায় দালান রেখে গেছে। বোকাসোকা ছিল, তবু। ভাঙা ভাঙা ঝিমোনো কথা, তবু প্রত্যাশা ও ঈর্ষার সুর মেলে। বাঁধা বলদটা হাড় পাঁজরায় ধুকছে উঠোনের কোণে কাদা গোবরে দাঁড়িয়ে, নিজেকে গুতুচ্ছে থেকে থেকে পোকা মাছির জ্বালায়। আগামী চাষের আয়োজনে লাঙল টানার জন্য ওকে পুষতে হবে দিন মাস ধরে, এবারের কাজ ওর সারা। ও বছরের কুমড়ো মাচাটি ফাঁকা, লিকলিকে লাউ চারাটি সবে উঠেছে মাচাতে। অনেক কুমড়ো দিয়ে গেছে গাছটা। ফুল আর ডগাও খাইয়েছে অনেক। কোথায় যে গেল তার চিহ্ন !

পড়তে বলছি না ? চুপচাপ বসে রয়েছিস ?

হাতড়ে কঞ্চিটা খুঁজে নিয়ে সেকেলে বুড়ো সপাৎ করে বসিয়ে দেয় পচার পিঠে, মুখবিহীন গোল যে ফোড়াটা বড়ো হয়ে উঠছে সেটাকে প্রায় ছুঁয়ে।

ফুলু সুখী হয় তার চিৎকার শুনে। বুড়োটা মেরেছে পচাকে, বুড়ো চটেছে পচার ওপর। এই তার অস্থায়ী একটু অবসর ছোঁড়াটাকে দুটো গালমন্দ শাপমন্যি দেবার। বুড়ো চটেছে, কিছু বলবে না। নাতিকে গাল দিতে শুনেও।

চেঁচাল কেনে ষাড়ের মতো ? মরণ হয় না ! ঘরের পক্ষী তাড়াবে চেঁচিয়ে। মরণ নেই ! টেনে নিতে পারে না বাপে মায়ে যেথা গেছে ?

ননদ পো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সংসারে বাপ-মাকে খেয়ে। খাওয়া পড়া দিয়ে রেয়াত নেই, ইস্কুলে পড়ছেন। বই খাতা কাগজ পেন্সিল, মাস গেলে মাইনে, কত কী। বুড়ো দেয় বটে খরচা, কিন্তু কেন পয়সা ঢালবে বুড়ো ওর পেছনে ? ওকে দিতে না হলে তো সংসারে দিত।

দিত কি ? গায়ের জোরেই মনকে বলাতে হয়, দিত, দিত, নিশ্চয় দিত। মনকে এ কথা না বললে জোর থাকে না জ্বালার আশা থাকে না মরণ কামনা ফলবে।

মা, ওমা মা ! খিদে পায় যে, মা ওমা, মাগো ?...

নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে শুনু পিছন থেকে ছেঁড়া পচা কাপড় চেপে ধরে। ওকেও মরতে বলার ঝোঁকে দমক মেরে ঘুরতে যেতেই পাছার কাছে ফেঁসে গেল জ্যালজেলে কাপড়।

খা ! খা ! খা ! মোকে খা ! পাঁজর-ভাঙা মরণ কান্না ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে। বুড়ো বেঁচে থাক, পচা সুখে থাক, তার কেন মরণ হয় না ভগবান। দিনে রাতে সাপের ছোবল আর সয় না।

হেথায় কেন গোল কর শুনুর মা। পচা পড়ছে। ইংরেজি পড় পচা। চেঁচিয়ে পড়।

উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ঝমঝমিয়ে। গলগল করে উগলানো ধোঁয়া পিছনে পড়ে থাকছে গুমোটে মরার মতো এলিয়ে। দখিন কোণে দূরের ওই লোহার চোঙা থেকে ধোঁয়া সোজা উপরে উঠছে আকাশের নাগাল পেতে। ওর কাছে স্টেশনটাতে থেমে এসে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

কোঠাবাড়ির মনাবাবুর বউটা কলেরায় মারা গেছে পরশু, ট্রেনে কি মনাবাবু আজ এলো ? এতদিন আসেনি, বউ মরেছে খবর শুনে আসবে নিশ্চয়। ছেলেটা হল দেড় বছরের, গা-ভরা ঘায়ে কী কষ্ট ওইটুকু কচি ছেলের।

শুনুর বাপও যদি আসে এই গাড়িতে ! বউটা তার মরেনি, জলজ্যান্ত বেঁচে আছে মরে যাওয়া উচিত হলেও, তবু যদি এখনই আসে, হঠাৎ কোনো মনের খেয়ালে আসে চার-ছমাস আসেনি বলে। যদি নিয়ে আসে রেশনের একজোড়া নতুন শাড়ি, রঙিন একটি শায়া, টুকটুকে লাল কি বেগুনি রঙের। আর সস্তা সাদা গোছের ঘি, পাঁপর, চানাচুর লেবেঞ্চুস—

ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে। একটা দুটো তিনটে। ছিঁড়ে দিয়ে গেল সব স্বপ্ন, মাড়িয়ে দিয়ে গেল সাধ। বুক দুরু দুরু করে ফুলুর। এখানে উনুনের সামনে বসে সে দেখতে পায় বড়ো প্রকাণ্ড জোড়া চাকা রাস্তায় খাদগুলির জল কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে। কানাই আর নিধুর দুটো ঘর ডিঙিয়ে জল কাদা যেন ছিটকে এসে তার গায়ে লাগবে এখানে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে পচা বুড়োকে শুনিয়ে। একটা পাখি শিস দিল এই ঘর-ছোঁয়া আমগাছটার ডালে। আমের সোয়াদ এবারও জিভে লাগল না, এবারও তিনটে গাছই বুড়ো জমা দিয়েছিল রামশরণকে। একটা গাছ রাখ নিজেদের জন্যে, ওই বর্ণচোরার গাছটা, সবুজ-কালো আমগুলিতে যেন মধু পোরা, কী রং আর কী মিষ্টি গন্ধ। তা নয়, সবগুলি গাছ বুড়ো জমা দিয়েছিল। নাতিকে পড়াবে, ইস্কুলে পড়াবে। মরণ হয় না।

কাঠ কুড়িয়ে ফিরল বুঝি পিসি, ভিজে কাঠপাতা আজ আর জ্বলছে না। এখনও বেলা আছে, আর খানিকক্ষণ খুঁজে পেতে আর কটা বেশি শুকনো ডাল, ঝোপটোপ আনা পোষাল না পিসির, দুবেলা খাবার মুখটা আছে।

পদী আবার চেঁচাচ্ছে। অবেলায় কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে জ্বরটা বাড়ছে আবার। আর কাঁথা নেই চাপা দেবার। যেমন বুদ্ধি বুড়োর, এত বড়ো মেয়েকে পার না করে ঘরে রেখে পুষছে। শুনুর বাপেরও যেন কোনো চাড় নেই বোনটাকে পার করবার। পইপই করে সে বলেছে শুনুর বাপকে, ফের এ বর্ষায় জ্বরে পড়লে যা ছিরি হবে মেয়ের, পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কেউ আর ছোঁবে না তখন। সেরে উঠে ফের একটু মানষের মতো দেখাতে আরও ছ মাস এক বচ্ছর। তা কে শোনে কার কথা ! মরে যদি যায় তো অবিশ্যি আর—সেই আশায় আছে নাকি বুড়ো আর শুনুর বাপ ? যাকগে বাবা যাক, তার অত ভাবনায় দরকার কী। নিজের জ্বালাই বলে তার সয় না। দিনরাত শত বিছায় কামড়ায় আর ছোবল দেয় সাপে।

মা, ওমা, মা, খিদে পায় যে, মা, ওমা, মাগো !...

ওকে ভোলানো গেল না এক কোয়া কাঁঠাল দিয়ে দু দণ্ডের বেশি। ভুতুড়ি তোলা আছে সকালে সিদ্ধ করা হবে বলে, তাই হাতড়ে কোয়াটা মিলেছিল। আর নেই, আর একটি কোয়াও নেই।

এই যে ভাত নামবে যাদু, খাবে। একটু সবুর, সোনা আমার। হল বলে, এই হল বলে।

শুনু ভোলে না, কেঁদে চলে। কথায় কি খিদে ভোলে কেউ।

আমায় খাবি ? মানা খাবি ? খা।

কোলে নিয়ে শুকনো মাই গুঁজে দিতে যায় শুনুর মুখে, সে দাঁতে দাঁত কামড়ে থাকে। তিন বছর মাই ছেড়েছে দুধ না পেয়ে চার বছরের মানুষ, সে কি আর এ ফাঁকিতে ভোলে।

তখন উনানে চাপানো হাঁড়ি থেকে এক হাতা আধসিদ্ধ জাউ আর পাথরের বাটি থেকে একটু কচু শাক তাকে দেয় ফুলু। ঠান্ডা শাকটুকু সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে শুনু। খাওয়ার মতো জুড়োলেই খায় জাউটা। তারপর আরও চেয়ে কাঁদে ঢিমে সুরে নেতিয়ে পড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইখানে।

সময় কি পার হয়ে গেছে শুনুর বাপের আসবার, এসেই যদি থাকে ওই গাড়িতে ? এমনি যদি এসে থাকে মিছিমিছি ° এক কোশ পথ, জলে কাদায় চলার মতো নেই। হেঁটে আসতে সময় লাগবে বইকী।

আসে যদি তো তাকে সে খাওয়াবে কী ? পরশু বাড়ন্ত হবে চাল, কিনে না আনলে। এতগুলি মুখ তো বাড়িতে। বিকালে জাউ বরাদ্দ, নয় তো পচাটে গন্ধের নষ্ট যে চাল বুড়ো সরকারি দোকান থেকে এনেছে সস্তা দরে, ওই চালের ভাত। ভাগ্যে শুনুর বাপের মনিঅর্ডার এসে গিয়েছে ডাকঘর বন্ধ হবার আগে, চাল কেনা যাবে। কটা আর টাকা, কতটুকুই চালই বা কেনা যাবে, যা দর বেড়েছে চালের। চাল বাড়ন্ত হবেই এ মাসে, ও আর ঠেকানো যাবে না, পরশুই হবে না চাল বাড়ন্ত এইটুকু শুধু ভরসা টাকাটা এসে পড়ায়। বুড়ো এগারো টাকা পেনশন পেয়েছে, আগের জমানো দু-দশ টাকা আছেও নিশ্চয় হাতে, কিন্তু বুড়োর ভরসা করা বৃথা ও নিজে খাবে, নাতিকে খাওয়াবে নাতিকে ইংরেজি পড়াবে ইস্কুলে।

শীতকালের জমাট নারকেল তেলের মতো সাদা ঘি আনবে, পাঁপর আনবে লেবেঞ্চুস আনবে শুনুর বাপ, শাড়ি আনবে, শায়া আনবে তার জন্য, এই জাউ আর কচু শাক সে খাওয়াবে নাকি তাকে ? কুলোবে না—এতে তাদেরই আধপেটা হবে না পদীকে বাদ দিয়েও, শুনুর বাপ এলে এতে কুলোবে না। চাট্টি চাল নিয়ে সে আবার ভাত রাঁধবে। দুটি যে ডাল আছে তোলা, তাও দিয়ে দেবে হাঁড়িতে। খিচুড়ি হবে না, ডালেচালে সেদ্ধ একটা জিনিস হবে যা হোক কিছু। ভিন্ন করে ডাল রাঁধতে হলে—

নিবুনিবু উনুনটার দিকে চেয়ে থাকে ফুলু। কাঠির মতো, সরু কটা শুকনো ডাল আর বাকি আছে, পিসি যা কুড়িয়ে এনেছে সব ভিজে চুপসে, কালও জ্বলবে না। ডাল ভাতে একটা চড়াও সে রাঁধবে তবে কী দিয়ে শুনুর বাপ যদি এসেই পড়ে এখন ?

আসবে না এখন আসতেই পারে না। ডাক ধর্মঘট শুরু হয়েছে, এখন কি আর সে ছুটি পাবে একটা দিনের, এমনি অবস্থায় দুমাসের মধ্যে পেল না ? ধর্মঘট শুরু না হলে বরং কথা ছিল। এখন কাজ না করলে তো তাড়িয়েই দেবে একেবারে। বুড়ো তাই বলছিল।

কিন্তু যদি ধর্মঘট করে থাকে শুনুর বাপ ?

নিশুতি রাতের ভিজে অন্ধকারকে ছিঁড়ে দেয় বিদ্বেষী কুকুরগুলির ভীরু আর্তনাদ। শেয়ালের পালা-ডাকের জবাব নয় এটা, শেয়াল ডাকেনি কিছুক্ষণের মধ্যে। কী হল, কে এল পাড়ায়, কে জানে। ফুলুর চোখে ঘুম নেই। মাঝরাত্রি পর্যন্ত পেট ভরে অনেক কিছু খাওয়ার কল্পনার অলীক কষ্ট আর উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখে, চোখ বুজে আর চোখ মেলে সে দেখবার চেষ্টা করে ঘরের আঁধার বেশি কম হল কিনা। তাতেও আনমনা হতে পারে না।

মনাবাবু আসেনি বিকালের গাড়িতে। কানাই ছাড়া কেউ আসেনি। কানাই যে এসেছে তাও ফুলু টের পেয়েছে মাত্র খানিক আগে পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ কানাইয়ের রামপ্রসাদি গান শুনে। এমন সুন্দর গাইতে পারে কানাই রামপ্রসাদি গান, মদ খেয়ে অনেক রাতে সে গান ধরলে এমন আকুল হয়ে ওঠে ফুলুর প্রাণটা। মন তুমি কৃষি কাজ জান না গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ কেন যে থেমে গেল কানাই।

কার সাথে যেন কথা বলছে। শুনুর বাপের গলা!

বাবা শুনছেন ? ওঠেন। ছেলে এয়েছে আপনার।

দোর খুলে দাও ?

খুলি।

আঁধার রাতে একা দোর খুলে দিতে ভয় করে শুনুর বাপকেও। সত্যি যদি না হয়, এমন যদি হয় যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে দরজা খুলবে অজানার ডাকে, কোথায় চলে যাবে বাইরের রহস্যময় রাত্রির জগতে। পিসিকে ঠেলে তুলে দেয়। শুনুকে কাঁদায়। পচাকে ডাকে জোর গলায়। ঘুমের মোহকে করে নেয় বাস্তব। হুড়কো খুলবার আগে শুধোয়, কে গা ?

আমি গো আমি। বীরেন।

বাইরে মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় রাত্রির রং ফিকে, ঘরে গলা শুনে মানুষ চিনতে হয়। ফুলু হাত ধরে বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে তক্তপোশে বসায়। মুখ না দেখে, মানুষ না দেখে, কুশল জানাজানি, কথা বলাবলি কেমন অর্থহীন শোনায়, ব্যঙ্গের মতো মনে হয়।

হঠাৎ যে এলি বীরু ? বুড়ো বলে কাঁপা গলায়।

স্ট্রাইক হল যে ? শোনোনি ?

সব্বোনাশ! বুড়োর গলায় কাঁপুনি নেই, আওয়াজটা দাপড়ানির, তুই করেছিস কি ? অন্য সময় যেমন তেমন, এখন কামাই করলে তাড়িয়ে দেবে যে চাকরি থেকে!

সবাইকে তাড়াবে ?

সবাইকে ? সবাই কখনও ধম্মোঘট করে ? তোর মতো হাবাগোবা দু-চারজন গরম গরম কথা শুনে—

ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব ডাকঘরে কুলুপ আঁটা। কাজ করব কোথা যে কামাই হবে ?

বীরেনের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা দেখাবার রেড়ির তেলের দীপটা জ্বালে ফুলু। তেলটুকু ফুরিয়ে যাবে, কাল মুশকিল হবে সাঁঝকে বরণ করা। তা হোক প্রদীপের আলোয় হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি আমকাঠের সিন্দুক টিনের তোরঙ্গের ঘর সংসার আর মানুষগুলি রূপ নেয়, সব জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাঙা চোরা জীর্ণ পুরানো দারিদ্র্যের রূপ।

বেড়ার ওপাশে পদী কাতরায়, দাদাগো, জ্বরে মরলাম গো। একবারটি এলে না দাদা, দেখলে না মোকে ?

খুব জ্বর ম্যালেরি ধরেছে। বলেছিলাম না তোমায় ? ফুলু বলে বীরেনকে।

অ্যাঁ ? ও, হ্যাঁ। বীরেন বলে আনমনে। শ্রান্তক্লান্ত নয়, তাকে চিন্তিত দেখায়, গম্ভীর।

পিসি বলে অনুযোগ দিয়ে, গেরন গেল, গঙ্গায় ডুব দেওয়ালি না বাবা আমাকে ?

পচা বলে, সবাই স্ট্রাইক করেছে মামা ? বাঃ কি মজা! আমাদেরও স্কুলে কাল থেকে স্ট্রাইক।

কীসের স্ট্রাইক ? বীরেন জিগ্যেস করে। বুড়ো উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

মাইনে বাড়িয়েছে না, সে জন্য। আজ দুজনকে তাড়িয়েছে বলে। শিবুদাকে চেন তুমি, আর একজনকে চেন না, তার নাম সতীশ, সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। মাইনে বাড়াবার জন্য মিটিং করেছিল ছেলেদের নিয়ে, সেক্রেটারির নিন্দে করেছিল, তাই তাড়িয়েছে। ওদের না নিলে, মাইনে না কমালে আমরা আর যাচ্ছিনে স্কুলে।

ইস্কুল যাবি না ? টান হয়ে যায় বুড়ো, রাগে থরথর করে কাঁপে। তোর ঘাড় যাবে ইস্কুল। আমি তোকে কাল ইস্কুল নিয়ে যাব। আট গন্ডা মাইনে বেড়েছে তো তোর বাপের কি ? তুই গুনিস মাইনের টাকা ?

মুখচোরা ভীরু ছেলেটাকে সোৎসাহে মামার সঙ্গে এত কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পদী উঠে আসে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেড়ার ওপাশ থেকে। বীরেনের বিয়ের সময় ঘরের মাঝামাঝি মানুষের চেয়ে হাতখানেক উঁচু এই বেড়া উঠেছিল ছেলে বউকে শুতে দেবার জন্য, এ পাশের সব কথা ও পাশে শোনা যায়। শুধু কথা শুনে চলছিল না পদীর।

তিন্যটুকু খেতে দেয়নি দাদা। কাঁদো কাঁদো সুরে পদী নালিশ জানায়।

জ্বরের মধ্যে কি খাবি ? উঠে এলি কেন আবার ? যা, শুয়ে থাকবি যা।

সবাই ভড়কে যায় তার ধমকে। জ্বর গায়ে বোনটা উঠে এসেছে একটু আদরের জন্য তাকে এমন করে ধমকানো ! ওর ন্যাকামিতে ফুলুরও গা জ্বলছিল, কিন্তু এভাবে ধমকে উঠাতে তারও মন সায় দেয় না। আনমনা গম্ভীর শুধু নয়, শুনুর বাপ যেন কেমন শক্ত আর নিষ্ঠুরও হয়ে গেছে।

খারাপ লাগে সকলের, কিন্তু এমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধমক যে খায় সে খানিক হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে কথা কয় স্বাভাবিক ভাবে, অভিমানের লেশটুকুর হদিস মেলে না।

একটু উঠলে কি হয়, শুয়েই তো আছি। হাঁ দাদা, গুলিটুলি চলছে নাকি ?

এখনও চলেনি।

কিছু খাবে নাকি তুমি ? ফুলু জিজ্ঞেস করে ভয়ে ভয়ে। কিছুই নেই খেতে দেবার। শুনুর বাপ সত্যই বাড়ি এসেছে এ আনন্দে এতক্ষণ বারবার ঝাপটা এসে লাগছিল এই লজ্জা ও দুঃখের যে, বাড়ির মানুষটা বাড়ি ফিরেছে এতকাল পরে তাকে খেতে দেবার কিছুই নেই গেরস্ত বাড়িতে।

বীরেন বলে যে এত রাতে কিছু আর খাবে না, গাড়িতে খেয়েছে। মনে শান্তি আসে না ফুলুর। সামনে যদি ধরে দিতে পারত কিছু, তারপর শুনুর বাপ বলত খাবে না, তা'হলে ছিল ভিন্ন কথা।

স্থান অদল বদল করে শোয়ার ব্যবস্থা হয়। বেড়ার এক পাশে যায় সকলে, অন্য পাশে ফুলু বীরেন আর শুনু। গাদাগাদি করে শুতে হয় সকলকে, কিন্তু উপায় কী, এতকাল পরে ছেলে বাড়ি এসেছে, ছেলে বউকে নিরিবিলি শুতে না দিলে চলবে কেন। নিবু নিবু দীপটা ফুলু হাতের বাতাসে নিবিয়ে দেয়। এবার কথা বলতে হবে চুপিচুপি, প্রায় কানে কানে, নয়তো ওপাশে শুনতে পাবে ওরা।

বুক কাঁপছে শুনে থেকে। কেন করতে গেলে ধম্মোঘট ?

হুঁ।

এখনও আনমনা অনিচ্ছুক মানুষটা, মোটে চাড় নেই, সাড় নেই। এমন তো করে না কোনোবার বাড়ি এসে। আহত অভিমানে নিজেও চুপ করেই থাকবে কিনা মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ফুলু ভাবে। কিন্তু তা কি পারা যায়। টিপি টিপি শুরু হয়ে জোরে বৃষ্টি নেমে ঝমাঝম আওয়াজ তোলে টিনের চালে। এমনি বৃষ্টি খানিকক্ষণ চললেই শোয়ার দফা শেষ। ভাঙা চালার তিন জায়গা থেকে জল পড়বে ঘরের মধ্যে, উঠে সামলাতে হবে। তবে বৃষ্টির শব্দ ওঠায় একটু জোরেই এখন কথা বলা চলবে, শোনা যাবে না।

কী হয়েছে তোমার ?

কী হয়েছে ? হয়নি কিছু। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম, ভালো লাগছে না এখন।

কাজ থাকবে না ? তাড়িয়ে দেবে ? উৎকণ্ঠায় ফুলু ব্যাকুল, তবে যে বললে তালা বন্ধ ডাকঘরে, কিছু হবে না কাজে না গেলে ?

সে কথা নয়। ভাবছি কি, চলে এলাম, কী হচ্ছে না হচ্ছে জানতে পাব না। বীরেনের কথা উৎকণ্ঠায় ভরা, তা ছাড়া, চলে এলাম, পিকেটিংয়ের লোক যদি কম পড়ে ? যদি হেরে যাই আমরা ?

বললে না হাজার হাজার লোক ধম্মোঘট করেছে ? ওরা তো আছে।

তা আছে। কিন্তু—

কী বলবে ঠিক করতে পারছে না শুনুর বাপ। মনের ভাবটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না তাকে, এটা সে বুঝেছে যে হঠাৎ বাড়ি চলে এসে এখন ভারী উতলা হয়ে পড়েছে তার মন। এত বড়ো একটা কাণ্ড করে এসেছে চাকরির ব্যাপার, এ বাঁচন মরণের কথা। সেখানে কী হচ্ছে জানতে পাবে না ভেবে ব্যাকুল তো হবেই মনটা। কিন্তু ও নেই বলে কিছু হবে না, ধম্মোঘট ভেস্তে যাবে, এ কোন দেশি কথা। এ দুশ্চিন্তার মাথামুণ্ডু মাথায় ঢোকে না ফুলুর। ওই কি কম্মকত্তা ছিল, ধম্মোঘট চালাচ্ছিল ? বীরেনের বুকে মাথা রেখে সে তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। বোঝাবার চেষ্টায় বীরেন বলে, কি জান, লড়াই চলছে তো একটা, একজন কম হলে জোর তো একটু কমল ? তা ছাড়া, আমি চলে এলাম, আর দশজন আমার মতো ভাবল, একা একজন চলে গেলে কি হয়, সবাই তো আছে। বুঝলে না ? ভালো লাগছে না আমার।

ভেবে আর কী করবে ?

না, আমার বিশ্রী লাগছে। মিটিং হবে আমি নেই, পিকেটিং হবে আমি নেই,—

অবিরল জল ঝরে টিনের চালে, বিরাট জনতার গর্জনের মতো আওয়াজ চলে অবিরাম। কারও চোখে ঘুম নেই। বীরেন ছটফট করে জ্বরের রোগীর মতো। ফুলুকে উঠে প্রদীপটা আবার জ্বালতে হয়, ঘরে জল পড়ছে। মেঝে ভেসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, মেঝেতে আর শোয়া চলবে না, কিছু রাখাও চলবে না। সেকেলে পুরানো তক্তপোশটি আর ও বছরের বানানো বাঁশের ছোটো নিচু মাচাটিই এখন সম্বল সকলের। পদীকে মাচাটিতে শুতে দেওয়া হয়। কাঁথাকানি জিনিসপত্র নিয়ে অন্য সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে আশ্রয় নেয় তক্তপোশে।

ফুলু বসে মেঝেতে একটা পিড়ি পেতে। প্রদীপ নিভে গেছে তেল ফুরিয়ে।

ভোরের আগে বীরেন বলে, আমি রওনা দি। ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে।

বিষ্টি পড়ছে যে ?

পড়ুক বিষ্টি। ভিজে ভিজেই যাব।

কাগজ মোড়া শুকনো জামা কাপড়ের পুঁটুলিটা বগল দাবা করে ভিজতে ভিজতে বীরেন স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছে অর্ধেক পথ, পিছন থেকে ডাক আসে, মামা !

বীরেন দাঁড়ায়। পচা এসে তার নাগাল ধরে। কেঁদে বলে, আমি কাল ইস্কুল যাব না মামা।

এই কথা বলতে এলি ভিজে ভিজে অ্যাদ্দুর ?

দাদু জোর করে নিয়ে যাবে ইস্কুলে। এখানে থাকব না আমি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

বীরেন হাঁটতে শুরু করে বলে, হাঁট তবে, জোরসে হাঁট। গাড়ি ফেল করলে চড় খাবি।

ওপরে বৃষ্টিপাত, নীচে খাল খন্দ কাদা ভরা পিছল পথ। দু জনে এগিয়ে চলে পাশাপাশি। বীরেন হাত ধরে পচার।

পরিস্থিতি-অন্তর্গত পেট ব্যথা গল্পের মাসিক বসুমতী পত্রিকাভুক্ত প্রথম প্রকাশের শিরোনামচিত্র

চিঠি

চিহ্ন প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

লেখকের কথা

'চিহ্ন' বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। এ ধরনের কাহিনি, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এ ভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।

মাঘ, ১৩৫৩ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের।

বিস্ময় আর উত্তেজনা অভিভূত করে রাখে তাকে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়তে বুঝি খেয়ালও হয় না তার। বিশ-বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেনি, মনেও ভাবেনি। এত বিরাট, এমন মারাত্মক ঘটনা, এত মানুষকে নিয়ে। এ তার ধারণায় আসে না, বোধগম্য হয় না। তবু সবই যেন সে বুঝতে পারছে, অনুভব করছে, এমনি ভাবে চেতনাকে তার গ্রাস করে ফেলেছে রাজপথের জনতা আর পুলিশের কাণ্ড। সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে। ভিড়ে সে আটকা পড়েনি, বন্ধ দোকানটার কোণে যেখানে সে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে পাশের সরু গলিটার মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে যখন ইচ্ছা হবে তার এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু যাবে কি, সে বাঁধা পড়ে গেছে আপনিই। জনতার গর্জনে, গুলির আওয়াজে, বুকে আলোড়ন উঠছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে শিরার রক্ত। ভয় ভাবনা চাপা পড়ে গেছে আড়ালে। ভয়ে নয়, নিজেকে বাঁচাবার হিসাব কষে নয়, হাঙ্গামা থেকে তফাতে সরে যেতে হয় এই অভ্যস্ত ধারণাটি শুধু একটু তাগিদ দিচ্ছে পালিয়ে যাবার। কিন্তু সে জোলো তাগিদ। হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীর স্থির হয়, বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না। এ কেমন গন্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না। তাই, চলে যাবার কথা মনে হয়, তার পা কিন্তু অচল। কেউ না পালালে সে পালাবে কেমন করে।

তা ছাড়া, মনে তার তীব্র অসন্তোষ, গভীর কৌতূহল। এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার ? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ-সমান উঁচু জলের তোড়, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে। কত পূর্ণিমা তিথিতে অনেক রাতে সে চুপিচুপি ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে মা-বাবাকে না জাগিয়ে, দাঁড়িয়ে থেকেছে ভাটার মরা নদীর ধারে কোটালের জোয়ারের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের জন্য।

দিনে ভাটার নদীর কাদায় শুয়ে কত কুমির রোদ পোহায়। দেখে মনে হয়, কত যেন নিরীহ ভালো মানুষ জীব। অল্প জলে হঠাৎ তিরের মতো কি যে তীব্র বেগে জলকে লম্বা রেখায় কেটে হাঙ্গর গিয়ে শিকার ধরে। কাদা-জলে লাফায় কত অদ্ভুত রকমের মাছ। কেমন তখন বিষণ্ণ হয়ে যায় গণেশের মন। আহা, দুঃখী নদী গো, হাঙর কুমির মাছ মিলে কত জীব, তবু যেন জীবনের স্পন্দন নেই, ডাইনে বাঁয়ে যত দূর তাকাও তত দূর তক। এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনিভাবে আসবে প্রাণের জোয়ার। গণেশের প্রাণেও আনন্দ এত, যা মাপা যায় না।

সেই অভ্যস্ত, পরিচিত, অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনায় কোটালের জোয়ার যদি বা মনে ধেয়ে এল গর্জন করে গাঁ ছেড়ে আসবার এতদিন পরে শহরের পথে সে জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল ফুটপাথে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।

গুলি লেগেছে না কি ? না লাঠি ?

ওসমান জিজ্ঞেস করে গণেশকে দ্বিধা-সংশয়ের সুরে, গভীর সমবেদনায়। দোকানের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, ঠিক কোথা থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে লাল করে দিচ্ছে গায়ের ময়লা ছেঁড়া ফতুয়াটা ঠিক বোঝা যায় না। গুলি যদি লেগেই থাকে, যেখানেই লেগে থাক, দাঁড়িয়ে আছে কী করে ছেলেটা, ফতুয়ার বুকের দিকটা যখন চুপসে যাচ্ছে রক্তে ? চোখের চাউনিটা অদ্ভুত। মরা মানুষ যেন বেঁচে উঠে তাকিয়ে আছে বিহ্বলের মতো। কুলি-মজুরিই সম্ভবত করে। মোটটা নামিয়ে রেখেছে।

আঁ ? কি জানি বাবু। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শোনায় গণেশের গলা, এরা এগোবে না বাবু ?

বাবু ! খচ করে একটু আঁচড় লাগে ওসমানের বুকে। কালি-ঝুলি মাখা এই হাফশার্ট পরনে, রংচটা সুতোওঠা নীল প্যান্ট, পায়ে জুতো নেই, দাড়ি কামায়নি সাতদিন। তবু তাকে বাবু বলে ছেলেটা। ঘৃণ্য বাবু বলে গাল দেয়। ট্রামের কাজ ছেড়ে দেবার চলতি আপশোশটা আর একবার নাড়া খায় ওসমানের। এ আপশোশ তেজি হয়েছে ওসমানের গত ধর্মঘটের সাফল্যের পর। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসেও কেউ কোনোদিন তাকে বাবু বলে অপমান করেনি।

তবে হ্যাঁ, এ ছেলেটা মুটে-মজুরি করে। গাঁ থেকে এসেছে বোধ হয় নেহাত পেটের খিদের তাড়নায়। ভিখারি আর মুটে-মজুর ছাড়া সবাইকে বাবু বলা অভ্যাস হয়ে গেছে।

এরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে বাবু ? এগোবে না ?

এবার ক্ষীণ শোনায় গণেশের গলা, শ্লেষ্মায় আটকানো কাশির রুগির গলার মতো, রক্তে আটকানো যক্ষ্মা রুগির গলারও মতো।

এগোবে না তো কি ? ওসমান মৃদু হেসে বলে, নিঃসংশয়ে। পিছু হটে ছত্রখান হয়ে পালিয়ে যখন যায়নি সবাই, লাইন ক্লিয়ার না পাওয়া ইঞ্জিনের মতো শুধু নিয়ম আর ভদ্রতার খাতিরে থেমে থেমে ফুঁসছে এগিয়ে যাবার অধীরতায়, তখন এগোবে না তো কি। এগোবার কল টিপলেই এগোবে।

তবে কি না—গণেশ জোরে বলবার চেষ্টা করে জড়িয়ে জড়িয়ে। দোকানের বিজ্ঞাপন আঁটা দেওয়ালের গায়ে পিঠ ঘষড়ে সে নেমে যায় খানিকটা হাঁটু বেঁকে। পিঠ কুঁজো হয়ে মাথাটা ঝুলে পড়ে। যে বাড়ির কোণে ছোটো একখানি ঘর তার পিছনে হেলান দেবার দোকান, সেই বাড়িরই উঁচু ভিতের বাঁকানো একটু খাঁজে না আটকালে সে হয়তো তখনই ফুটপাতে আশ্রয় নিত, আরও যে মিনিটখানেক পড়ে না গিয়ে আধ-খাড়া রইল তা আর ঘটত না।

কি বলছ ?

ওসমান ঝুঁকে গণেশের মুখের যত কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে যায়। শুনতে পায় শুধু গলার ঘর্ঘর ধ্বনি। সামনের লোকেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে, জমাট বাঁধা জনতাকেও চাপ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে হাতখানেক, জায়গা দিয়েছে গণেশকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার।

রক্তমাখা জামাটা দুহাতে একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে ওসমান। বুকে কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই, একটাও ফুটো নেই। এক ফোঁটা রক্ত বেরোয়নি বুক থেকে ছেলেটার। জামাটা তবে ভিজল কী করে রক্তে ?

না, বাঁ গালটাতেও রক্তের চাপড়া পড়েছে বটে ছেলেটার। ঝাঁকড়া চুলের ভেতর থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। একরাশি ঘন রুক্ষ চুলের আড়ালে আঘাতটা লুকিয়ে আছে।

একে বাঁচানো উচিত, ওসমান ভাবে।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো বাঁচতে পারে। হয়তো। ওসমান কী করে জানবে কী রকম আঘাত ওর লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচবে কিনা শেষ পর্যন্ত ঠিক জানে না বটে ওসমান, কিন্তু এটা সে ভালো করেই জানে, হাসপাতালে পৌঁছতে দেরি হলে নিশ্চয় বাঁচবে না।

বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে ওকে। তাকেই করতে হবে। খুন যখন বেরিয়ে আসছে গলগল করে, তাকেই ছোকরা বারবার জিগ্গেস করেছে, ওরা এগোবে না বাবু ? শহিদ হবার আগে এই একটা জবাব শুধু চেয়েছে ছেলেটা তার কাছে। ওকে বাঁচাবার চেষ্টা না করলে চলে ?

অ্যাম্বুলেন্স ? মোড়ের মাথায় অ্যাম্বুলেন্স আছে, কজনে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়েও যাওয়া যায় ওখানে, জমাট বাঁধা ভিড় ফাঁক হয়ে গিয়ে তাদের পথ দেবে, ওসমান জানে। কিন্তু ওই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারেও সে জানে। বিশেষত এ ছোকরা কুলির ছেলে। অ্যাম্বুলেন্সের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করতে করতে এ খতম হয়ে যাবে। না, ও অ্যাম্বুলেন্সের ভরসা নেই ওসমানের।

রাস্তার ধারে দাঁড় করানো পুরানো খোলা লরিটা আটকা পড়ে গিয়েছিল শোভাযাত্রায়। ওসমান উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকে, লরি কার ?

জিওনলাল বলে, আমার আছে।

ইসকো জানের দায়িক তুমি, খোদা কসম। জোরসে লে চলো হাসপাতালে।

এক মুহূর্তই ইতস্তত করে জিওনলাল বলে, লে আও।

ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে, ততক্ষণে কয়েক জনের সাহায্যে ওসমান লরিতে উঠে গণেশকে কোলে নিয়ে বসেছে।

মানুষের মধ্যে আটকা পড়েছিল লরিটা, দেখতে দেখতে এবার পথ সৃষ্টি হয়ে যায় তার জন্য, হুস করে লরি ঢুকে যায় পাশের গলিতে।

সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাইনি। এটা তবে কী রকম ব্যাপার হল ? হেমন্ত ভাবে।

নিজের ব্যবহার বড়ো আশ্চর্য মনে হয় হেমন্তের নিজেরই কাছে, বিশেষত নিজের মনের চাল-চলন। সভায় গিয়ে দাঁড়াবার খানিক পরেই মন যেন বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে কোনো বিচার-বিবেচনা হিসাব-নিকাশ না করেই বাতিল করে দিল এতদিনকার কঠোর ভাবে মেনে চলা রীতিনীতি। এতদিন ধরে যা সে যে-ভাবে ভেবেছে আজ যেন ও-ভাবে ও-সব ভাববার দরকারটাই শেষ হয়ে গেছে একেবারে। একান্ত পালনীয় বলে যা সে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে এতদিন, আজ তার বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে বিচলিত হবার কিছু নেই, ক্ষোভের কারণ নেই।

এত সহজে কী করে মত বদলায় মানুষের, তার ? এমন আচমকা কী করে নতুন মত মেনে চলা এমন স্বাভাবিক মনে হয় মানুষের, তার ? অথবা আজকের এ ব্যাপারে মতামতের প্রশ্ন নেই, প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনে যে মতামত নিয়ম-কানুন খাড়া করে চলা যায়, এই বিশেষ অবস্থায় সে সব বর্জন করে চলাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ? ধাঁধা লেগে যায় হেমন্তের এ সব চিন্তায়।

না, রাজনীতি বাজে নয়, তুচ্ছ নয় হেমন্তের কাছে। অত অন্ধকার নয় তার মন। বিশেষত এ দেশের রাজনীতি স্বাধীনতার সংগ্রাম, বংশানুক্রমিক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। কিন্তু সব কিছুরই যেমন সময় আছে, বয়স আছে মানুষের জীবনে, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় আছে, বয়স আছে। অতি ভালো কাজও অসময়ে করতে চাইলে অকাজ হয়ে দাঁড়ায়, ফল হয় খারাপ। নিজের যা কর্তব্য সেটুকু ভালোভাবে পালন করতে পারাই সার্থকতার রীতিনীতি, নিয়ম।

সভার একপাশে জায়গা নিয়ে দাঁড়াবার সময়ও বিশ্বাস তার দৃঢ় ছিল,—রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া কোনো ছাত্রের উচিত নয়। ছাত্রজীবনে রাজনীতির স্থান নেই। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার সময় হাতে-কলমে রাজনীতি চর্চা করা তাস পিটে আড্ডা দিয়ে হইচই করে সময় আর এনার্জি নষ্ট করার মতোই অন্যায়। ছাত্রের কাছে রাজনীতি শুধু অধ্যয়নের বিষয়, কোলাহল মত্ততা দলাদলি সংঘাত থেকে দূরে থেকে শান্ত সমাহিত চিত্তে তাপসের সংযত শোভন জীবন যাপন করবে ছাত্র।

সভায় তবে সে কেন থাকে, কী করে থাকে ? শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, ফুটপাতে বসে পড়ে যতক্ষণ দরকার বসে থাকার সংকল্প নিয়ে ? মত তার বদলায়নি, বিশ্বাস শিথিল হয়নি। জোরের সঙ্গে স্পষ্টভাবে শুধু মনে হয়েছে, আজ এই বিশেষ অবস্থায় তার মত বা বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন আসে না, ও-সব বিষয় বিবেচনা করার সময় এটা নয়। অন্য সময় যত খুশি নিষ্ঠার সঙ্গে ও-সবের মর্যাদা রেখে চললেই হবে, এখন নয়। এখন যা করা উচিত, তার মতো হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মিলে যা করছে, তাকেও তাই করতে হবে। তাতে সংশয়ের কিছু নেই, তর্ক নেই।

একটু কৌতূহলের বশে হেমন্ত সভায় দাঁড়িয়েছিল। এত সীমাহীন দলাদলি, এমন কুৎসিত আত্মকলহ যাদের মধ্যে, তারা কী করে একসাথে মিশে সভা করে একটু দেখবে। ছেলেদের বড়ো

একটা অংশ গোল্লায় গেছে। শুধু হইচই, গুন্ডামি, সিগারেট টানা, মেয়েদের পেছনে লাগা, শেষে পরীক্ষার হলে চুরি-চামারি, গার্ডের সঙ্গে মারামারি, গার্ডকে খুন করা। এ অধঃপতনের কারণ সে জানে। রাজনৈতিক মত্ততা এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ি। তার মতকেই সমর্থন করে ছেলেদের মধ্যে এই মারাত্মক দুর্নীতির প্রসার—নিজের কাজকে অবহেলা করে অকাজ নিয়ে মেতে থাকলে এ রকম শৈথিল্য আসতে বাধ্য, ছাত্রই হোক আর যাই হোক তাদের মধ্যে। নিয়মানুবর্তিতাকে চুলোয় পাঠিয়ে, লেখাপড়া তাকে তুলে হইচই হাঙ্গামা নিয়ে মেতে থাকার জন্য রাজনীতি চর্চার চেয়ে ভালো ছুতো আর কী হতে পারে ?

উচ্ছৃঙ্খলার কি মিল হয় ? কী মানে সে মিলে ?

শীতের তাজা রোদে উজ্জ্বল দিন। কী তাজা দেখাচ্ছে এদের মুখগুলি, কত উজ্জ্বল সকলের দৃষ্টি। দুঃখ বোধ করেছিল হেমন্ত। অপচয়ে ক্ষয়ের ছাপ পড়ে না, ভ্রান্ত আদর্শ কাবু করে না, এমন যে অফুরন্ত তরুণ প্রাণশক্তি আর বিশ্বাস, তার কি শোচনীয় অপব্যবহার ! একবার ভেবেছিল হেমন্ত, চলে যায়। কী হবে এদের গরম গরম চিৎকার শুনে ? আর যদি মতভেদ ঘটে, বাদানুবাদ হয়, হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়, আরও তখন বেশি খারাপ হয়ে যাবে মনটা নিজের চোখে সব দেখে। তার চেয়ে কাল খবরের কাগজে পড়লেই হবে কী হল না হল সভায়।

কিন্তু চলে যেতে সে পারেনি।

প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি, আশেপাশের ছাড়াছাড়া কথা ও আলোচনার টুকরোগুলি, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি আর অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপনা তাকে আটকে রেখেছে।

বক্তৃতা যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন হেমন্তের চেনা। বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে তার। খানিক বক্তৃতা শুনে বাকিটা এই তিনজন চেনা ছাত্রের নতুন পরিচয় আবিষ্কার করার বিস্ময় ও উত্তেজনায়। চোখে দেখে কানে শুনেও অবিশ্বাস্য, অসম্ভব মনে হয় এখানে ওদের উপস্থিতি, আন্দোলনে অংশগ্রহণ। বিশেষভাবে শুদ্ধসত্ত্বের—যার সঙ্গে পাল্লা দিতে হওয়ায় গত পরীক্ষায় সে অনার্সে প্রথম স্থানটি পায়নি বলে আজও তার বুকে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে ! আনোয়ার ও শিবনাথের পরীক্ষার ফলও তো কত ভালো ছেলের বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বেলে দিয়েছে। ওরা রাজনীতিও করে আবার শান্তশিষ্ট ভদ্র হয়ে থাকে, ছাত্রজীবনের সাংস্কৃতিক সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করে কী করে ?

মাকে মনে পড়ে হেমন্তের। সীতাকেও। এইখানে এ ভাবে তাকে পুলিশের লাঠি ও গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বসে থাকতে দেখলে মার মুখের ভাব কী রকম হত ভাবতে গিয়ে কল্পনায় যে কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় না মার মুখখানা, বড়ো বড়ো চোখের আতঙ্ক-বিহ্বলতার আড়ালে মুখের বাকি অংশ ঝাপসা হয়ে থাকে। আজ এতদিন পরে মার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল—একেবারে চরম ভাবে। রাজনীতি মাথায় ঢুকলে পড়াশোনায় তার অবহেলা আসবে, সে মানুষ হবে না, হয়তো জেলেও যেতে হবে তাকে ছমাস এক বছরের জন্য, এই হল মার ভয়, দুর্ভাবনার সীমা। মরণের সামনে সে যে মুখোমুখি দাঁড়াবে কোনোদিন আজকের মতো, এ কথা মা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কোনো কালে। রাজনৈতিক সভায় পর্যন্ত কখনও যাবে না বলে যে ছেলে কথা দিয়েছে আর সে কথা পালন করে এসেছে এতদিন অক্ষরে অক্ষরে, তার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হবে যে সভা থেকে শোভাযাত্রার যোগ দিয়েও যথেষ্ট হয়েছে মনে না করে হাঙ্গামার মধ্যে খুন হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, এ কথা জানলে রক্ত বোধ হয় হিম হয়ে যাবে মার।

সে সিগারেট খেতে আরম্ভ করবে এই ভয়ে মার বুক কাঁপে।

কাল জোর করে তার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়েছিল পঙ্কজ, বলেছিল, ওগো ভালো ছেলে, একটু ধোঁয়া দাও বুদ্ধির গোড়ায়, বুদ্ধি সাফ করে। সীতা তাকে ভালো ছেলে বলে ডাকে,

বন্ধুরা ডাকটা লুফে নিয়েছে। সিগারেট হেমন্ত খায় না, পান-সুপারির নেশাটুকু পর্যন্ত তার নেই। সিগারেটটা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল। ভাত খেয়ে জামা পরে বেরোবার সময় পকেটে সিগারেটটা হাতে লাগায় কেন কী খেয়াল জেগেছিল তার সে নিজেই জানে না, দেশলাই খুঁজে এনে সিগারেটটা ধরিয়েছিল কাঠের চেয়ারে আরাম করে বসে। পঙ্কজের অনুকরণে টান দিয়েই কাশতে কাশতে সিগারেটটা সে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঘরের কোণায়, সেখানে সেটা পুড়ছিল। মাথা ঘুরে ওঠায় একটু সামলে নেবার জন্য চেয়ারেই বসেছিল হেমন্ত।

ঘরে ঢুকে সিগারেটের গন্ধ নাকে যেতেই মা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। শূন্য ঘর দেখেও, তিনি যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক খুঁজেছিলেন, হেমন্ত টের পেয়েছিল। অন্য যে কোনো একজন লোক ঘরে থাকলে মা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি পেতেন, নিশ্চিন্ত হতেন।

বেরোসনি ?

কত চেষ্টায় মা গলা কাঁপতে দেননি, সহজ ভাবে কথা বলেছেন, বুঝতে পেরেছিল হেমন্ত।

এই বেরোব এবার। জল দাও তো একটু।

হেমন্ত জল খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখার পরেও মা সোজাসুজি সিগারেটের কথা তুলতে পারেননি। জিজ্ঞেস করার অদম্য ইচ্ছা জোর করে চেপে রেখেছিলেন হেমন্ত কী জবাব দেবে এই ভয়ে। যদি সে বলে বসে, হ্যাঁ, সিগারেট সে ধরেছে ! যদি সে রাগ করে সামান্য সিগারেট খাওয়া নিয়ে পর্যন্ত তার খেঁচখেঁচানিতে,—তার বয়সের কোন ছেলেটা না সিগারেট খায় ? মার ভীরু করুণ দৃষ্টি শুধু বারবার পড়ছিল ঘরের কোণায় জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে, হেমন্তের মুখে বুলিয়ে নিয়েই চোখ নত করছিলেন।

তারপর হঠাৎ সেই চোখ ভরে গিয়েছিল জলে। হেমন্ত তখন ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে মা ? সিগারেট আমি খাই না, তোমার ভাবনা নেই। পঙ্কজ একটা সিগারেট দিয়েছিল, হঠাৎ কী শখ হল, ধরিয়েছিলাম। খেতে পারিনি, তাই ফেলে দিয়েছি।

ওঃ ! বলে মা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন, বলেছিলেন, কেন কেঁদেছি শুনবি হেমা ? তুই সিগারেট খাস ভেবে নয়, আমায় লুকিয়ে খাস ভেবে, খাওয়া অন্যায় জেনে খাস ভেবে। আমি মনে করলাম, আমায় আসতে দেখে তুই তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিস। নইলে সিগারেট খাওয়া দোষের নয় বুঝে তুই যদি খাস হেমা, খেতে ইচ্ছা হলে—

আঁচল দিয়ে চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসিটুকুও যেন মা মুছে নিয়েছিলেন।

এখন আর ভাবনার কিছু নেই তো ?

এমনি করেই কিন্তু হ্যাবিট জন্মায় হেমা, ইচ্ছা না থাকলেও।

মার কথা ভেবে মায়া বোধ করে হেমন্ত, কিন্তু কেমন এক বৈরাগ্য মিশে সে মায়াবোধের ব্যাকুলতা আর উদ্‌বেগকে নিরস্ত করেছে এখন। মাকে মনে হচ্ছে দূরে, বহু দূরে। এখান থেকে ট্রামে বাড়ি যেতে সময় লাগে মোটে মিনিট পনেরো, সেখানে মা হয়তো আকুল হয়ে আছেন তার জন্য, কিন্তু বিরাট এক বাস্তব সত্য যেন দুস্তর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে রাজপথের এই শক্ত ফুটপাথ আর মায়ের অগাধ স্নেহ অসীম শুভ কামনা অনন্ত দুর্ভাবনা ভরা সেই নীড়ের মাঝখানে, শান্তি আর যুদ্ধের সময়কার জগতের মতো অতি ঘনিষ্ঠ অথচ অসীম দূরত্ব ও পার্থক্যের ব্যবধান।

এখন কি যেতে পারে না সে বাড়ি ফিরে ? একেবারে প্রথম দিনের পক্ষে এই কি যথেষ্ট হয়নি, আজ আর নাই বা এগোল ? নিজের মনেই মাথা নাড়ে হেমন্ত।

একা উঠে চলে যাওয়া যায় না একার প্রয়োজনে। না এলে ভিন্ন কথা ছিল, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। তার না হয় মার জন্য অবিলম্বে বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার, একা হলে হারও না হয়

সে মেনে নিত সে জন্য নিজের কাছে অপমানে নিজে কালো হয়ে গিয়ে, কিন্তু এদের সকলকে হার মানাবার অধিকার তো তার নেই। সে উঠে গেলে আর একজন দুজনও যদি তার অনুসরণ করে ?

সীতাকেও মনে পড়ে হেমন্তের।

মার মতোই তাকেও মনে হয় বহু দূর, কুয়াশাচ্ছন্ন। মার মতো বড়ো বড়ো চোখ নেই সীতার, তাই বোধ হয় চোখ দুটি পর্যন্ত তার কল্পনার সীমান্তে সরে গেছে ধারণা হয়। সীতার মৃদু ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, আচমকা ঘনিয়ে আসা গাম্ভীর্য, তিক্ত বিষাদ আর কটু অনুকম্পা ভরা কথা এবং কদাচিৎ হেমন্ত যে কোন শ্রেণির জীব ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না এমনি বিব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, এ সব যেন প্রায় ভুলে যাওয়া অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে, এ সবের জন্য যে প্রতিক্রিয়া জাগত নিজের মধ্যে তাই যেন হেমন্তের অবলম্বন।

অথচ, আজকেই দেখা হয়েছিল সীতার সঙ্গে।

এসো ভালো ছেলে বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সীতা। বলেছিল, ক্লাস হল না বলে কষ্ট হচ্ছে ? মন খারাপ ? কী করব বলো। সবাই তো বিদ্যালাভ করেই খুশি থাকতে পারে না, অন্যায়-টন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাতে চায়।

আজ যেন রীতিমতো ঝাঁজ ছিল সীতার কথায়, শুধু ব্যঙ্গাত্মক খোঁচা নয়। হেমন্তের মনে হয়েছিল, সে যেন শেষ পর্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে। তার সঙ্গে মতে না মিলুক, তার নিরুত্তাপ রক্ষণশীল মতিগতিকে অবজ্ঞা করুক, তার একাগ্র নিষ্ঠা, নিরুপদ্রব সহনশীলতা, দুঃখী মায়ের জন্য তার ভালোবাসা, এ সবের জন্য খানিকটা শ্রদ্ধা তাকে সীতা বরাবর দিয়ে এসেছে। আজ যেন সে শ্রদ্ধাও সে রাখতে পারছে না মনে হয়েছিল হেমন্তের, তাকে যেন সহ্য করতে পারছে না সীতা।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত বইকী।

তবে ?

বিদ্যালাভে অবহেলা করাও অন্যায়, অন্যায় সহ্য করাও অন্যায়।

তবে ?

তখন হেমন্ত বুঝেছিল সীতার জ্বালার মর্ম। কিছু না বলেও সীতা তাকে প্রশ্ন করেছে, আজও তুমি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে তোমার আদর্শবাদী সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অজুহাতে ? আজও তুমি এটুকু স্বীকার করবে না যে শিক্ষার্থীকেও আজ অন্তত ভাষায় ঘোষণা করতে হবে এ অন্যায়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদকে সে সমর্থন করে, সেটা রাজনীতি চর্চা হোক বা না হোক ?

জবাব দিতেই হবে সীতার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের। গভীর বিষাদ অনুভব করেছিল হেমন্ত। সীতা কি বুঝবে তার কথা ?

আমার কি মুশকিল জানো সীতা ? হেমন্ত ভূমিকা করেছিল, আমি সিরিয়াসলি কথা বললেও তুমি সিরিয়াসলি নিতে পার না !

কথা ! তোমার শুধু কথা !

তা ছাড়া কী করার আছে ? প্রতিবাদ যে জানানো হবে, তাও তো কথাতেই ?

তখন কি হেমন্ত জানত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা কথা কত সহজে কি অনিবার্য ভাবে কাজে রূপান্তরিত হতে পারে : কণ্ঠের প্রতিবাদ পরিণত হতে পারে জীবন-পণ ক্রিয়ায় !

সীতা চুপ করে থাকায় আবার সে বলেছিল, কথাকে অত তুচ্ছ কোরো না সীতা। মানুষ বোবা হলে পৃথিবীটা অন্য রকম হত। ও সব বড়ো দার্শনিক কথায় যাব না। আমার কথাটা মন দিয়ে শুনবে কি শান্ত হয়ে ? তুমি তো জানো, আমি যা বলি তাই করি। কথার প্যাঁচও কষি না, ফাঁকিবাজি কথাও বলি না।

শুনি তোমার কথা।

তুমি কি বুঝবে আমার কথা ?

পারবে বুঝিয়ে দিতে ?

অতি বিশ্রী, অতি নীরস নীরবতা এসেছিল কিছুক্ষণের।

সাহস সঞ্চয় করে হেমন্ত বলেছিল তারপর, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু তারও তো নিয়ম আছে, যুক্তি আছে ? ধরো তুমি আমার সঙ্গে আছ, কেউ তোমার অপমান করল। তখন সোজাসুজি ঘুষি মেরেই আমি সে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাব।

সে এক পুরানো ঘটনা। আজকের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার জন্য তার সেই বীরত্বের ইঙ্গিত সে কেন করেছিল হেমন্ত জানে না। এই উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্য খুব সহজে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলা যেত বটে কিন্তু সেটা অন্যভাবেও বলা যেত।

আমি ভুলিনি ভালোছেলে। কৃতজ্ঞ আছি।

সে জন্য তুলিনি কথাটা, হেমন্তকে বলতে হয়েছিল চাবুকের জ্বালা হজম করে, আমার কথা শুনলেই বুঝতে পারবে। ও ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল, করেছিলাম। পরাধীন দেশে হাজার হাজার অন্যায় চলে, তার প্রতিবাদ করতে গেলে আমি দাঁড়াই কোথায় ? দেশে চল্লিশ কোটি লোক, তার মধ্যে আমরা কজন লেখাপড়া শিখছি তুমি জানো। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভালো করে লেখাপড়া শেখাটাই কার্যকরী প্রতিবাদ, লড়াই করা। শিক্ষিত লোকের কত দরকার দেশে, আমরা সামান্য যে কজন সুযোগ পেয়েছি, তারা নাই বা গেলাম হইচইয়ের মধ্যে ?

সীতার চাউনিতে বোধ হয় ঘৃণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সব কিছু থেকে ওভাবে গা বাঁচিয়ে কারা লেখাপড়া শেখে জানো ভালোছেলে ? দেশের প্রয়োজন, দেশের কথা যারা ভাবে তারা নয়, পাশ করে পেশা নিয়ে নিজে আরামে থাকার কথা যারা ভাবে তাবা। স্বদেশি মার্কা মালিকের পাপের ছুতো যেমন এই যুক্তি যে ইন্ডাস্ট্রিতেই দেশের উন্নতি, তোমাদের যুক্তিটাও তাই। ছাত্র-আন্দোলন যারা করে তোমার চেয়ে তারা ভালো করে লেখাপড়ার দরকার বোঝে। তারাই জোর করে বলে ছাত্রদের, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা প্রথম কর্তব্য ছাত্রের, শিক্ষার যতটুকু সুযোগ আছে প্রাণপণে তা গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেক ছাত্রকে, পরীক্ষায় পাশ করাটা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। তাই বলে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ থাকবে না ? তারা প্রকাশ করবে না তাদের রাজনৈতিক মতামত, সংঘবদ্ধ হবে না তাদের দাবি, তাদের ক্ষোভ, তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশকে জোরালো করে তুলতে ?

তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছি ছাত্র-জীবনে।

তার ফল ? ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি বেড়েছে, দুর্মতি বেড়েছে ? সেটা কীসের ফল হেমন্ত ? দেশকে ভালোবাসার, স্বাধীনতা দাবি করার, ছাত্রদের এক করার আন্দোলন চালানো, এ সবের ফল ? তলিয়ে যা বুঝবার চেষ্টা পর্যন্ত করো না, কেন তা নিয়ে তর্ক করো ? খারাপটাই দেখছ, অথচ তার কারণ কী বুঝতে চাও না, মন-গড়া কারণ, মন-গড়া দায়িক খাড়া করে তৃপ্তি পাও—আমার কথাই ঠিক ! ভালো লক্ষণগুলি তো চোখেই পড়ে না।

সে আমার দোষ নয় সীতা। খারাপ লক্ষণগুলিই চোখে পড়ে, ভালোগুলি পড়ে না, তার সোজা মানে এই যে ভালো লক্ষণ বিশেষ নেই চোখে পড়বার মতো।

তুমি আজ এসো হেমন্ত।

রাগে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল হেমন্তের চিন্তা, জ্বালা ধরে গিয়েছিল বুকে। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। সীতা তাকে শুধু সহ্যই করে এসেছে চিরকাল, আজ তার সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হেমন্তের পক্ষে। সীতা চায়ও না চোখ-কান বুজে সে তার মতে সায়

দিক, তার কথা মেনে নিক। মতের বিরোধ তাদের আজকের নয়, অনেকবার তাদের কথা-কাটাকাটিতে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আজকের তর্ক তাদের খুব ঠান্ডাই হয়েছে বলতে হবে। কেন তবে সে অসহ্য হয়ে উঠল আজ সীতার কাছে ? এমন কোনো সিদ্ধান্তে কি সীতা এসে পৌঁছেছে তার সম্বন্ধে যার পর তার সঙ্গে ধৈর্য ধরে কথা বলা আর সম্ভব হয় না ? বুদ্ধি দিয়ে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করেছিল হেমন্ত, কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল, অত জটিলতার মধ্যে যাবার তার দরকার কি ? মনটা হয়তো ভালো ছিল না সীতার কোনো কারণে। মেজাজটা হয়তো বিগড়েই ছিল আগে থেকে। মন কি ঠিক থাকে মানুষের সব সময় !

সীতার তীব্র বিরাগের রহস্য যেন একটু স্বচ্ছ হয়েছে এখন। দুটো-একটা ইঙ্গিত জুটেছে রহস্যটা আয়ত্ত করার। কতগুলি বিষয়ে বড়ো বেশি সে গোঁড়া হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নাই। পৃথিবীটা সত্যই অনেক বদলে গেছে। তার কল্পনাতীত ঘটনা সত্যসত্যই আজ ঘটছে তারই চোখের সামনে ; দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে—নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়। তারই শুধু এ সব চোখে পড়েনি। নিজের পুরানো ধারণা, পুরানো বিশ্বাসের স্তরেই সে ধরে রেখেছিল দেশকে চোখ-কান বুজে, ভেবেছিল তার মন এগোয়নি বলে দেশটাও পিছনে পড়ে আছে তারই খাতিরে !

এই গোঁড়ামি সহ্য হয়নি সীতার। মতের অমিলকে সীতা গ্রহণ করতে পারে সহজ উদারতায়, অন্ধ গোঁড়ামি তার ধৈর্যে আঘাত করে।

ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টার পর ঘোড়সওয়ারেরা তখন ফিরে গেছে। পাশের ছেলেটি বলছিল : কী সুন্দর ঘোড়াগুলি ! তালে তালে পা ফেলছে আর মাসেলগুলিতে যেন ঢেউ খেলছে নেচে নেচে।

বয়স তার পনেরো ষোলো বছরের বেশি হবে না। রোগা চেহারা, ফরসা রং, খুব ঢ্যাঙা। আলোয়ানটা এমন করে গায়ে জড়িয়েছে আরাম করার ভঙ্গিতে যেন আসরে বসেছে গান-বাজনা শুনে বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে উপভোগ করতে।

কত তোয়াজে থাকে। বলেছিলে চশমা-পরা যুবকটি গম্ভীরভাবে। তার উৎসুক দৃষ্টি ক্রমাগত সঞ্চালিত হচ্ছিল এদিক হতে ওদিকে, মনে মনে সে যেন মাপছে ওজন করছে হিসাব কষছে যাচাই করছে ছোটোবড়ো ঘটনা ও পরিস্থিতির বিশেষ এক মূল্য।

এমন ইচ্ছে করছিল ঘোড়ার গা চাপড়ে দিতে। ঢ্যাঙা ছেলেটি বলেছিল নির্বিকার ভাবে, মাথাটা বোধ হয় ফাটিয়ে দিত তা হলে।

দিত কি ? একটা কেমন খটকা লেগেছিল নারায়ণের মনে। তাদের কাছ দিয়ে যে ঘোড়াটি ঘুরে গেছে, ওর ছেলেমানুষি চোখ দেখেছে তার মসৃণ চামড়ার নীচে পরিপুষ্ট মাসেলের নাচ, নারায়ণের চোখ দেখেছে পাগড়ি আঁটা বিশাল গোঁফওলা অতি জবরদস্ত চেহারার ভারতীয় সওয়ারটির ঘোড়া চালাবার কায়দার মধ্যে অনিচ্ছার সংকেত, দ্বিধা, গোপন সতর্কতা। খেলার মাঠে এদের বেপরোয়া ঘোড়া চালানো দেখেছে নারায়ণ অনেকবার। আজকের চালানোটাই যেন অন্যরকম।

সত্যই কি দেখেছে, না সবটাই তার কল্পনা ? অথবা এই রকমই ওদের রাজপথের জনতা ছত্রভঙ্গ করার রীতি ?

রীতি যাই হোক, জখম হয়েছে অনেক।

ইস !

হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ঢ্যাঙা ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। নারায়ণও চেয়ে থাকে। রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছে একটি আহত ছেলে।

আগুনের হলকা যেন বেরোয় নারায়ণের দু চোখ দিয়ে, অসহ্য জ্বালা যেন কথার রূপ নেয়, ওই টুপিওলাটার কাজ, টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে তবে ঠিক হয়। বসে আছে সব হাত গুটিয়ে। সবাই মিলে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে—

গলা বুজে যায় নারায়ণের।

কী যে বলেন ! ছেলেটি ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে বড়ো বড়ো টানা চোখে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখ দুটি।

তোমার ইচ্ছে করে না খোকা—

আমার নাম রজত।

রজত ? রজত নাম তোমার ? তোমার ইচ্ছে করে না রজত, ওটাকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ?

করে তো, সবারি ইচ্ছে করে। কিন্তু শুধু ইচ্ছে করলেই তো হয় না ? যা ইচ্ছে তাই করলে চলে নাকি !

এতটুকু ছেলের মুখে বুড়োর মতো কথা শুনে নারায়ণ একটু থতোমতো খেয়ে যায়। বুঝতে সে পারে যে যাই সে বলুক এরকম বুড়োর মতোই জবাব দেবে ছেলেটা, তবু সে বলে, সবাই মিলে তেড়ে গিয়ে ওদের কটাকে পিষে থেঁতলে দিলে এ রকম করতে সাহস পায় ওরা ?

পায় না ? কিছু বোঝেন না আপনি। গভীর দুঃখের সঙ্গে রজত বলে, তার সেই গুরুমশায়ি আপশোশের সঙ্গে কথা বলা এমন অনুভূত ঠেকে নারায়ণের কানে !—আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা। তাই তো ওরা চায়। আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ওরা জানে, বাড়াবাড়ি করলে চাদ্দিকে কী কাণ্ড বাধবে। দেখছেন না রাগ চেপে শুধু খুচখুচ ঘা মারছে ? আমরা যাতে খেপে যাই ? ইচ্ছে করলে তো দু মিনিটে আমাদের তুলো ধুনো করে দিতে পারে, দিচ্ছে না কেন ? আমরা যেই মারামারি করতে যাব ব্যস, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব। লোকে বলবে আমরা দাঙ্গা করে মরেছি। ঠোঁট গোল করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে রজত, আপনাদের মতো রগচটা লোক নিয়ে হয়েছে মুশকিল। কিছু বোঝেন না, তিড়িংতিড়িং শুধু লাফাতে জানেন।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে নারায়ণের ! কিশোর ঠিক নয়, বালকত্ব ছাড়িয়ে সবে বুঝি কৈশোরে পা দিয়েছে। সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে নবযুগের বেদবেদান্ত উপনিষদ সেকালের ঋষি-বালকদের মতো, পুরাণেই যাদের নাম মেলে। এইটুকু ছেলে যদি এমন করে বলতে পারে এ সব কথা, শক্তিপুত্র পরাশর যে মায়ের গর্ভে থেকেই বেদধ্বনি করে পিতামহ বশিষ্ঠের আত্মহত্যা নিবারণ করবে সে আর এমন কি আশ্চর্য কাহিনি !

তুমি কোন ক্লাসে পড় রজত ?

যে ক্লাসেই পড়ি না।

রাগ করলে ? নারায়ণ অনুনয় করে বলে, যে ক্লাসেই পড়, সে কথা বলিনি। আমি অন্য কথা বলছিলাম।

কী বলছিলেন ?

বলছিলাম কি, স্কুলে তো এ সব শেখায় না, তুমি যে এ সব কথা এমন আশ্চর্যরকম বোঝ, এ সব তোমায় শেখাল কে ?

রজত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমিই শিখেছি, খানিকটা দিদি শিখিয়েছে। মুখ কাছে এনে অতিবড়ো গোপন কথা বলার মতো নিচু গলায় রজত বলে, ওইখানে দিদি বসে আছে—তাকাবেন না। আমি এখানে আছি টের পায়নি।

নারায়ণ গম্ভীর হয়ে বলে, উনি কিন্তু টের পেয়েছেন রজত।

শুনে রজত ভড়কে যাবে ভেবেছিল নারায়ণ, কিন্তু রজত জিভে ঠোঁটে তার সেই অদ্ভুত আওয়াজটাই শুধু করে একবার।

টের পেয়েছে ? আপনি কী করে জানলেন ?

দু তিনবার তোমায় ডাকলেন নাম ধরে। শুনতে পাওনি ?

কোনো বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করা যেন স্বভাব নয় রজতের। ঘাড় উঁচু করে দিদির দিকে মুখ করে সে চেঁচিয়ে ডাকে, দিদি। ডাকছিলেন নাকি আমায় ?

শান্তি বলে, এদিকে আয়। কথা শুনে যা।

কী করে যাব ? রজত প্রতিবাদ জানায়, জায়গা বেদখল হয়ে যাবে আমার। আরও গলা চড়িয়ে বলে, যা বলবার বাড়িতে গিয়ে বোলো, কেমন ?

অনেক দিন পরে নারায়ণ কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে, নিদারুণ হতাশার জ্বালা যেন তার নেই আর। আশ্চর্যরকম শক্ত আর সমর্থ মনে হয় নিজেকে। তারই দুঃসহ আক্রোশের যে চাপ তাকেই ভেঙে চুরমার করে দেবে, সেটা যেন কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে অনুভব করে। পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত যে ঘৃণা, জীবন্ত মর্মান্তিক ঘৃণা, অস্থির চঞ্চল করে রাখে তাকে সব সময়, নতুন করে নাড়া লাগলে যেন উন্মাদ করে তোলে, নিজে বয়লারের মতো শক্ত হয়ে সেই প্রচণ্ড ঘৃণার বাষ্পকে সে যেন আয়ত্ত করেছে এখন, চাকা ঘুরবে এগিয়ে যাবার। তারই মতো এদের সবার বুকে ঘৃণা, এতটুকু ছেলেটার পর্যন্ত। কিন্তু সে আর পরাজিতের, পদদলিতের নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরার ঘৃণা নেই, তা এখন জয়লাভের প্রেরণার উৎস।

রাস্তায় শুয়ে পড়ে যে ছেলেটি মোচড়ামুচড়ি দিচ্ছিল তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও সেই স্থানটির দিকে কেমন এক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে কী যেন ভাবে রজত। এতক্ষণ পাশে বসে আছে, এমন চিন্তিত তাকে নারায়ণ দ্যাখেনি।

দিদি বকবে নাকি বাড়ি গেলে ?

কেন ? বকবে কেন ?

কী তবে ভাবছ এত একমনে ?

কী ভাবছি ? বেশ একটু বিনয়ী, লাজুক ছেলের মতো কথা কয় রজত, ভাবছি কি, ওকে নিয়ে কবিতা লিখতে চাইলে কী করে লেখা যায়।

কাকে নিয়ে ?

ওই যে মোচড়ামুচড়ি দিচ্ছিল ছেলেটা।

তুমি কবিতা লেখো ?

লিখি। ছাপতে দিই না, পরে দেব। দিদি বলে, লিখে লিখে হাত না পাকলে ছাপতে দিতে নেই। আচ্ছা, এ রকম করে যদি আরম্ভ করা যায় ? সাদা সওয়ারের প্রকাণ্ড ঘোড়া নাচে, বুক পেতে দেয় ছেলেরা খুরের নীচে। নাঃ, এ হল না। বুক পেতে দেবে কেন ? অত শখে কাজ নেই। কিন্তু—

রজত ভাবতে থাকে।

আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠিচার্জ হবে।

কপালের ডান দিকে পুরানো ক্ষতের চিহ্নটা চিনচিন করে ওঠে তার। ক্ষতের এ দাগ মিলোবে না কোনোদিন, স্মৃতিও নয়। স্মৃতি মিলিয়ে যাবে হয়তো চোখ বোঁজবার আগেই, ক্ষতের দাগ মিলোবে না যতদিন পর্যন্ত কবরে সে মাটিতে পরিণত হয়ে না যায়।

এবার লাঠিচার্জ হবে মালুম হচ্ছে আবদুল।

হবে না কি ? একটা সিগারেট দে তবে টেনেনি।

ক্ষতটা লাঠির, প্রশস্ত কপালের ডান পাশে চুলের ভেতর থেকে ডান চোখের ভুরু পর্যন্ত চিরস্থায়ী ক্ষতের যে দাগটা আছে। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যে এই পুরস্কার জোটে মানুষের, আজও বিশ্বাস করতে পারে না রসুল। দুর্ভিক্ষের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল, কয়েক জনকেও যদি বাঁচাতে পারে। গাঁয়ের নাম চিরবাগী, জমিদার শ্রীচপলাকান্ত বসু। গাঁয়ে পৌঁছবার তিন দিন পরে দাফন কাফন সারতে হয়েছিল তার নিজের মায়ের। না খেয়ে মা তার মরেননি, অসুখে মারা যান। আকস্মিক এ আঘাতেও সে কাবু হয়নি, কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লেগেছিল গাঁয়ে একটা রিলিফ সেন্টার খুলতে। হঠাৎ একদিন তার কাছে হাজির হয়েছিল জিয়াউদ্দীন, শ্রীচপলাকান্তের নায়েবজাতীয় স্থানীয় কর্মচারী। গাঁয়ের শতকরা আশিজন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন—শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর।

এ গাঁয়ে রিলিফ সেন্টার কেন ? অন্য কোথাও করো গিয়ে। কত্তা বলেছেন, ও সব হাঙ্গামা এখানে চলবে না।

খেতে না পেয়ে গাদা গাদা লোক মরছে, তাদের কয়েকজনকে কোনো মতে জীয়ন্ত রাখার চেষ্টার নাম হাঙ্গামা ! আসল কথা ছিল ভিন্ন। গাঁয়ে রিলিফ সেন্টার হলে, মানুষ বাঁচানো আন্দোলন চললে, বাইরের নজর এসে পড়তে পারে চিরবাগীর ওপর। জমিদারির আয়ে চলে না, তাই শ্রীচপলাকান্ত কারবার করছিল। অন্যায় অনাচার নোংরামি মজুতদারি চোরা কারবার এ সমস্তের কী কার কাছে ধরা পড়ে কে জানে ; ঘুষ খায় না এমন অফিসার একজনও যে নেই তাই বা কে বলতে পারে।

তবু রসুল থামেনি। চালা তুলেছিল, খাদ্য জুগিয়েছিল, ভলান্টিয়ার গড়েছিল—নিজে পেছনে থেকে। খিচুড়ি বিতরণ আরম্ভ করার আগের দিন বিকালে লালদিঘির ধারের মাঠে সভার আয়োজন করেছিল—নিজে পেছনে থেকে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ডাকা সেই সভায় কী করে দাঙ্গা বেধেছিল রসুল জানে না, সভার এক কোণে দাঙ্গা বাধার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাল পাগড়ির আবির্ভাব হয়েছিল তাও সে বুঝতে পারেনি। লাঠির ঘায়ে কপাল ফাঁক হয়ে হাজার ফুলকি দেখে ঘুরে পড়বার ঠিক আগে এক লহমার জন্য লাল পাগড়ির নীচেকার মুখটি সে দেখেছিল, আজও সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে।

কেন এ আক্রোশ ? কেন এ বীভৎস হিংসা ? জগতের কোনো অন্যায়, কোনো অনিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না, এ যেন অন্যায়ের, অনিয়মেরও ব্যভিচার ! মাথা ফাটাবার হুকুম পেয়েছিল, মাথা ফাটাক। ক্ষমতার দম্ভে প্রচণ্ড উল্লাস জাগুক মাথা ফাটাতে, তার মাথা তুলবার স্পর্ধার রাগে ফেটে যাক কলিজা, সব সে মেনে নিতে রাজি আছে মানানসই বলে। কিন্তু সে-ই যেন যুগ যুগ ধরে অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত করেছে, অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে উন্মাদ করে দিয়েছে, এমন অন্ধ উৎকট প্রতিহিংসার বিকার কেন ?

রসুল জানে না। মনের পর্দায় প্রশ্নটা তার স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে আছে ক্ষোভের হরফে।

প্রথম দিকে কোলাহল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল সমবেত মানুষগুলির বিক্ষুব্ধ গর্জনে, এখন শান্ত হয়ে কলরবে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের শৃঙ্খলা ও শান্ত সংযত চালচলনের প্রভাব জনতার মধ্যেও

সংক্রামিত হয়েছে। সংযম হারিয়ে তাদের খেপে উঠবার সম্ভাবনা আর নেই। উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার অভাবটা অদ্ভুত লাগে রসুলের, সে গভীর উল্লাস বোধ করে। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি কিন্তু মাথাগুলি ঠান্ডা আছে। রসুলের মনে হয়, সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনই গরম হৃদয়ে ঠান্ডা মাথার সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা।

নিখুঁত ছাঁটের দামি সুন্দর পোশাক পরা সার্জেন্টরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে, ওদের হৃদয়ে কী ভাব ও মনে কী চিন্তা ঢাকা পড়ে আছে বাইরের রাজকীয় নিশ্চিন্ততা ও অগ্রাহ্যের সর্বাঙ্গীণ উদ্ধত ভঙ্গিতে ? ওদেরই জন্য সৃষ্টি করা চাকরির গৌরব ও গর্বই বেচারিদের সম্বল, তারই মধ্যে ওরা সাত হাজার মাইল দূরের দ্বীপটির মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে জন্মভূমির মাটিতে হাঁটবার সময়। চিরবাগী গাঁয়ের নুরুলের রাজহাঁস দুটির কথা মনে পড়ে যায় রসুলের।

পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেশি পুলিশেরা, নির্বাক নিশ্চল। হুকুমজারি হয়নি এখনও চার্জ করবার। পাশের রাস্তায় ভিড়ের শেষ প্রান্ত যতদূর সম্ভব ভেদ করে গাড়ি এগিয়ে এনে, গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে পুলিশের এলাকায় এসেছেন ব্যস্ত-সমস্ত এক ভদ্রলোক, অত্যন্ত উত্তেজিত বিব্রত আর অসহায় মনে হয় তাঁকে। এই শীতে গায়ে তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিকে মহুয়া রঙের দামি শাল অবশ্য আছে কাঁধে জড়ানো। ওঁর আবির্ভাবের জন্যই হয়তো স্থগিত রাখা হয়েছে লাঠিচার্জের হুকুম।

হাত নেড়ে নেড়ে ভদ্রলোক কী বললেন সার্জেন্টদের দলপতিকে বোঝা গেল না, তারপর অতিকষ্টে তিনি উঠে দাঁড়ালেন একটি পুলিশবাহী লরির উপর। কোনো নেতা নিশ্চয়, রসুল চেনে না।

উনি কে রে আবদুল ?

জানি না। চেনা চেনা লাগছে—

লরির ওপর দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক প্রাণপণে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন, স্বয়ং বসন্ত রায় নির্দেশ পাঠিয়েছেন, হাঙ্গামা না করে সবাই ঘরে ফিরে যাক।

হাজার কণ্ঠের গর্জনে তার জবাব এল, কোথায় বসন্ত রায় ? উপদেশ চাই না। হাঙ্গামা নেই, চুপ করে বসে আছি। বসে থাকব যতদিন দরকার ! উপদেশ চাই না।

অতি কষ্টে লরি থেকে নেমে ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে কিছুক্ষণ কথা কইলেন সার্জেন্টদের দলপতির সঙ্গে, তারপর ব্যস্ত-সমস্তভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ির দিকে পাশের রাস্তায়।

আবার শান্ত হয়ে গেল চারিদিক।

আবদুল বলে, এবার চিনেছি,—অমৃতবাবু। বসন্ত রায়ের একজন ফেউ। সব মিটিং-এ হাজির থাকে, বক্তৃতা দেবার খুব শখ। কিন্তু বিশেষ বলতে পায়ও না, বলতে পারেও না ভালো।

এমন লোককে পাঠানোর মানে ? রসুল বলে বিরক্তির সুরে।

পাঠিয়ে দিল যাকে পেল হাতের কাছে।

এভাবে চলে যাবার হুকুম পাঠানো উচিত হয়নি। নিজে এসে সব জেনে বুঝে—

গরজ পড়েছে। আবদুল বলে অবজ্ঞার সঙ্গে।

হইচই হুল্লোড় নেই, হাঙ্গামা নেই, কিন্তু চারিদিকের থমথমে ভাবটাই কেমন উগ্র মনে হয় রসুলের। ধৈর্যের পরীক্ষা যেন চরমে উঠেছে।

লাঠিচার্জ হবে না বোধ হয়, আবদুল বলে।

কি জানি।

ব্যাপার কোথায় গড়াবে ভাবছি। দু-পক্ষই চুপচাপ থাকবে এমনই ভাবে ?

তাই কখনও থাকে ? এক পক্ষ ভাঙবেই, ধৈর্য হারাবে।

আমরা চুপচাপ আছি। ওরা তো মিছেমিছি হাঙ্গামা বাধাবে না। তবে ?

দেখা যাক। ডর লাগছে ?

কীসের ডর ? আমি তো একা নই।

কথাটা বড়ো ভালো লাগে রসুলের। এমন কিছু নতুন নয় কথাটা চমকে দেবার মতো। কিন্তু তারও অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মনের কথার প্রতিধ্বনির মতো মিষ্টি মনে হয়। জখমের, রক্তপাতের, হয়তো বা মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন মহাপুরুষের কিছুমাত্র ভয় হয় না জানা নেই রসুলের। তার বেশ ভয় করে, বেশ জোর করেই ভয়টা বশে রাখতে হয় তাকে। ভয় তাকে কাবু করতে পারেনি কোনোদিন কোনো অবস্থাতে এইটুকুই সে সত্য বলে জানে, ভয় তার একেবারে হয় না এ মিথ্যাকে স্বীকার করতে লজ্জা তার হয়। নিজের কাছে বা পরের কাছে এর বেশি বাহাদুরি দেখাবার সাধ তার নেই, এইটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। আজ ভয় ভাবনা বেশি রকম ক্ষীণ লাগছিল তার কাছে, বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে নতুন একটা বিশ্বাসের, নির্ভয়ের ভাব অনুভব করছিল। আবদুলের কথায় তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে আবদুল ও তার সমঅনুভূতি : সে একা নয় ! আঘাতের বেদনা বা মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে।

লাঠিচার্জ শুরু হয় খানিক পরে।

এ পরিচিত ঘটনা রসুলের। বিশৃঙ্খলা কোলাহল, মানুষের দিশেহারা ছুটোছুটির মধ্যেও সে অনুভব করে লাঠিচার্জের উদ্দেশ্য সফল হবে না নিরস্ত্র কতগুলি যুবক ও বালক জখম হওয়া ছাড়া। যারা নড়বে না ঠিক করেছে তাদের হঠানো যাবে না। দুজন পুলিশ এগিয়ে এসেছে কাছাকাছি। বেছে নেবার সময় ওদের নেই, এ ক্ষেত্রে সবাই সমানও বটে। রসুল পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ডানদিকের পুলিশটির দিকে। ওদের সকলের মুখ তার চেনা মনে হয়, সবগুলি মুখ যেন এক ছাঁচে গড়া।

মাথা বাঁচাবার জন্য হাত দুটি সে উঁচু করে ধরে। লাঠি এসে পড়ে কাঁধের কাছে, বাহুমূলে—লাঠির গোড়ার দিকটা। লাঠি ধরে ছিল যে হাত, সে হাত ইচ্ছে করে লাঠি তাকে মারে আগা দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়ে নয়, গোড়ার দিক দিয়ে ! ব্যথা একটু লাগে, কিন্তু রসুল তা অনুভবও করতে পারে না। তার চোখ ছিল লাল-পাগড়ির নীচেকার মুখটিতে আঁটা ! সে স্পষ্ট দেখতে পায় লাঠি মারার সঙ্গে তার দিকে চোখ ঠেরে চলে গেল।

আবদুল ! দেখেছিস ?

হুঁ। লেগেছে খুব ? হাড় ভাঙেনি তো ?

লাগেনি। একটুও লাগেনি। দেখিসনি তুই ?

কী ? কী দেখিনি ?

চোখের পলকের ঘটনা, কী দেখতে কী দেখেছে কে জানে ! লাঠির গোড়ার দিকটা হয়তো এসে লেগেছে ঘটনাচক্রে। তবু রাজপথে বসে মনে মনে আকাশ-পাতাল আউড়ে যায় রসুল সে যেন মুক্তি পেয়েছে, স্বাধীন হয়ে গেছে দেশের আকাশে মাটিতে খনিগহ্বরে সমুদ্রে। নিশ্বাসে সে স্বাদ পায় বাতাসের। পথের স্পর্শ তার লাগে অন্যরকম। গাঁয়ের সেই সভায় যেন থেমে গিয়েছিল তার মনের গতি, তারপর থেকে এতদিন যেন সে বাস করছিল সেই সভার দিনটি পর্যন্ত সীমা টেনে দেওয়া পুরানো পরিবর্তনহীন জীবনে, পীড়ন পেষণ মৃত্যু দুর্নীতি হতাশার অভিশাপের মধ্যে। কিন্তু বদলে গেছে,—সব বদলে গেছে। ভোঁতা অন্ধকার হৃদয়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে নতুন চেতনা-স্পন্দন। জোয়ার ঢুকেছে এঁদো ডোবায়।

ক্ষতচিহ্নটা কি মিলিয়ে গেছে ? চিনচিন করছে না যেন আর ! মনে দাগ কেটে লেখা প্রশ্নটা হয়ে গেছে ঝাপসা, অকারণ। কেন যে এত ক্ষোভ, এত অসন্তোষ জাগিয়ে রেখেছিল সে একদিন

একজনের অন্যায় করার নিয়মেরও ব্যভিচারে ! ও রকম হয়। ওটা সৃষ্টিছাড়া কিছু ছিল না, সে যেমন ভাবত। জগতে যে একা করে দেখে নিজেকে, জীবনে কোনো অন্যায় না করেও সেই পারে আত্মহত্যা করতে, অন্যায়ের আত্মগ্লানিতে সেই হতে পারে হিংস্র খ্যাপা পশু। পিছন থেকে অনায়াসে মানুষকে ছুরি মারে যে গুন্ডা সে শুধু গুন্ডাই থাকে যতদিন না পর হয়ে যায় তার অন্য সব গুন্ডারা, একেবারে একা না হয়ে যায়,—তখন সে হয় বিকারেরও ব্যভিচার, শয়তান মানুষ থেকে আসল শয়তান !

আবদুল, এবার কিছু ঘটবে।

কী ঘটবে ?

জবর কিছু। দেখছিস না ছটফট করছে ?

গুলির আওয়াজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রসুলের ডান হাতটা যেন খেয়াল খুশিতেই আচমকা ছিটকে লাফিয়ে উঠে অসাড় হয়ে পড়ে যায়।

আবদুল বলে, কোথায় লাগল দেখি ?

ফাটা কপাল কী না, ডান হাতটাতেই লেগেছে।

দুজনেরই পরনে পাজামা। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় খুলে খানিকটা ছিঁড়ে নেয়, পকেটের রুমালটা দলা পাকিয়ে ক্ষতমুখে চেপে বসিয়ে জোরে কাপড় জড়িয়ে বাঁধতে থাকে।

রসুল বলে চলে, বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু।

আজকেই শেষ, অক্ষয় ভাবে, আজ একটু খেয়ে শেষ করে দেবে। জীবনে আর কোনোদিন ছোঁবে না এ জিনিস। আজ থেকেই আর খাবে না ঠিক করেছিল সত্য, দু পেগের বেশি এক ফোঁটাও খাবে না ভেবে রেখেও জীবনে শেষ দিনের খাওয়া বলেই অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল কালকের পরিমাণ, তাও সত্য। কিন্তু কাল তো সে জানত না আজ এমন অভিজ্ঞতা তার জুটবে, এমন অদ্ভুত অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে দেখবে সে চোখের সামনে। গুলির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক আর বাতাস, আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে আশেপাশের মানুষ, মানুষ তবু নড়ে না, মৃত্যুপণ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। নিজের চোখে দেখেছে ঘটনা এখনও শেষ হয়নি রাজপথের রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত নাটকের রোমাঞ্চকর মর্মান্তিক অভিনয়, তবু যেন সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না এ ব্যাপার সত্যই ঘটেছে, এখনও রাস্তা জুড়ে জেদি মানুষগুলি প্রতীক্ষা করছে এরপর কী ঘটে দেখা যাক। উত্তেজনায় দেহ-মন তার কেমন হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। সে নয় গেল। আজ এই বিশেষ দিনে এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটু যদি সে খায়, একটা কি দুটো মাত্র পেগ, এমন কী দোষের হবে সেটা ?

সাড়ে আটটা বাজে। আধঘন্টার মধ্যে বার বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর হোটেল আছে, কিন্তু সেখানে পেগের দামও বড়ো বেশি। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে একটা কি দুটো গরম পেগ খেয়ে নিয়ে একটু একটু তফাত থেকে এখানকার ব্যাপারের কী পরিণতি হয় কিছুক্ষণ দেখে বাড়ি ফিরে গেলে কী এমন ক্ষতি হবে কার ? কী এমন অপরাধ হবে তার ?

অলকাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার শরীর-মনের অবস্থা বর্ণনা করে সে যদি সব কথা বুঝিয়ে বলে, সে কি বুঝবে না ? বিশ্বাস করবে না যে শুধু এই জন্যই আজ সে একটু খেয়েছে, নইলে সত্যই ছুঁত না, নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন করত ? তবে, হয়তো কিছু বলারও দরকার হবে না অলকাকে। দু-একটা পেগ খেয়ে গেলে অলকা হয়তো টেরও পাবে না। অতটুকুতে কিছুই হয় না তার। বেশ একটু মৌজের অবস্থাতেই তাকে দেখতে অলকা অভ্যস্ত, সে অবস্থা না দেখলেই সে খুশি হবে।

কিন্তু যদি গন্ধ পায় ? ছিটকে সরে গিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে মুখে বেদনা ও হতাশার সেই অসহ্য ভঙ্গি এনে থরথর কাঁপতে থাকে আবেগ উত্তেজনার চাপে ? বুঝিয়ে বলার পরেও যদি সে শান্ত না হয়, সুস্থ না হয় ?

কোথায় গড়ানো জীবন নিয়ে আজ সে দাঁড়িয়েছে জীবনের এই অবিস্মরণীয় পরিবেশে। ধিক্ তাকে। শত ধিক্ !

কিন্তু কী হয় একটু খেলে ? আজকের মতো পেগ খাবার এমন দরকার তো তার কোনোদিন আসেনি। শুধু শখ করে নেশার জন্যই খেয়েছে এতদিন। আজ একটু খেয়ে মাথাটা ঠিক করে নেওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন, মনের একটু জোর না বাড়ালে তার চলবে না। দরকারের সময় ওষুধ হিসাবেও তো মদ খায় মানুষ ?

কী এক দারুণ অস্বস্তিতে টানটান হয়ে গেছে শিরাগুলি অক্ষয়ের। ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার মতো মনটা পাক দিচ্ছে উপরে উঠে নীচে নেমে ঘুরে ঘুরে। আর কখনও কি সে একসঙ্গে অনুভব করেছে মদ খাবার এমন দুরন্ত তৃষ্ণা আর প্রবল বাধা নিজের মধ্যে ? সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ছোটো ব্যালকনিতে। আলসেয় ভর দিয়ে ব্যথা ধরে গিয়েছে হাতে-পায়ে, শরীর আড়ষ্ট হয়ে এসেছে খানিকটা। ওরা তার চেয়ে অনেক আরামে বসে আছে পথে। তার মতো নিরাপদ ওরা নয় কিন্তু সেটা কি খেয়াল আছে ওদের কারও, বিপদ বা নিরাপত্তার কথা ? দোকানের আলোগুলি আজ রাস্তায় পড়েনি। ওপর থেকে স্তিমিত নিস্তেজ আলোয় পথের অবিস্মরণীয় নাটকের এখনকার শান্ত, সম্ভাবনাপূর্ণ দৃশ্যটির অভিনয় ও অভিনেতাদের দিকে চেয়ে ভিতরে তোলপাড় চলতে থাকে অক্ষয়ের। অগাধ বিষাদের সমুদ্রে সাইক্লোনিক মন্থনের মতো। এত ক্লান্তি আর এত শূন্যতা কি আছে আর কারও জীবনে ? এতখানি অসুস্থতা, আত্মবিশ্বাস ? চিন্তা আর অনুভূতির গভীর বিপর্যয়ের মধ্যেও কে যেন তারই মনের মধ্যে বসে মৃদু ব্যঙ্গের সুরে বলছে, নিজের সঙ্গে খেলা এ সব মাতালের, এক পেগ টানো সব ঠিক হয়ে যাবে, বাজে চিন্তা উড়ে যাবে কুয়াশার মতো, জীবন ভরে উঠে থইথই করবে আনন্দে কয়েকটা পেগ চালাবার পরেই !

নিজেই কি সে জানে তার কথারও কোনো মূল্য নেই, ভাবনা চিন্তা অনুভূতিরও কোনো অর্থ হয় না ? অ্যালকোহলের বাষ্প মাত্র সব ?

নিজেকেই সে বিশ্বাস করে না !

অথচ মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তো মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে। মরে যদি মরণটাও তার কাজে লাগবে, এ বিশ্বাস নিয়ে মরতে তো পাবে মানুষ।

এ রকম বিশ্বাস ছাড়া বুঝি স্বাদ থাকে না জীবনের, যেমন তার গেছে। জীবনে স্বাদ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসও থাকে না কোনো কিছুতে, তার যেমন নেই।

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হইচই করে কত রাত কেটে যায়, কিন্তু সেই চরম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সে থেকেছে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, একা। সে শুধু আদায় করেছে নিজের সুখ, কামনা করেছে নিজের উপভোগ, হাজার খুঁটিনাটি হিসাব ধরে মনে মনে বিচার করেছে কতটুকু সে পেল, ওরা তাকে ঠকাল কতখানি ! রাজপথের ওদের সঙ্গেও সে এক-তা বোধ করতে পারছে না, ওদের জন্যই যত চিন্তা জেগেছে তার মনে সব সে পাক খাওয়াচ্ছে নিজেকে কেন্দ্র করে।

কীর্তি ওদের, তাকে ছুতো করে সে একটু মদ খেতে চায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। ওদের মৃত্যুঞ্জয়ী গৌরবকে আত্মসাৎ করে সে মেটাতে চায় তার উৎসবের বুভুক্ষা ! ওরা তার কেউ নয়, তার কাছে ওদের মূল্য আর সার্থকতা শুধু এইটুকু যে ওরা তাকে দার্শনিক করে তুলেছে।

এখন যাবেন কি বাবু ? গেলে পারতেন।

মাখন দিনে আপিসের বেয়ারা, রাতে আপিসের পাহারাদার। বড়ো-ছোটো সাহেব আর বাবুরা কোনকালে বেরিয়ে গেছেন আপিস থেকে ভালোয় ভালোয়, দুশো টাকার এই বাবুটি টিকে আছেন এখন পর্যন্ত। এত কী ভয়, এত কী প্রাণের মায়া ? সবাই বাড়ি যেতে পারল, ছেলেমানুষ সরল বাবু পর্যন্ত, ইনি ভয়ের চোটে তেতলা থেকে নীচেই নামলেন না মোটেই। রাতটা হয়তো এখানেই কাটাবার মতলব। জ্বালাতন করে মারবেন মাখনকে।

আবার বলে মাখন, ভয় নেই বাবু। আমি দুবার বাইরে থেকে ঘুরে এসেছি। ওদিকে যাবেন না, পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বাড়ি চলে যান, কোনো ভয় নেই। একটু হাঁটতে হবে।

মাখন, অক্ষয় বলে, আমি মরতে ভয় পাই না।

আজ্ঞে না বাবু, মাখন বলে সবিনয়ে। সে ভেবে পায় না বাইরে না বেরিয়েও অক্ষয়বাবু মাল টানবেন কী করে। সঙ্গেই থাকে হয়তো শিশিতে !

আমি একটু ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছি মাখন। আমি ঘুরে এলে তুমি ঘুমোবে।

ঘুরে আসবেন ?

ঘুরে আসব। বেশি দেরি হবে না, আধঘণ্টার মধ্যে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় অক্ষয়। দারোয়ান সদরের গেটে একেবারে তালা এঁটে দিয়েছে। অক্ষয়কে দেখে সে অবাকও হয়, কথা শুনে রাগও করে।

ঘুমকে আয়েগা ফিন ?

জরুর আয়গা।

গেটে তালা বন্ধ থাকবে, গেট খোলা রাখতে পারবে না রাম সিং। এতক্ষণ এ বাবু ভয়ে লুকিয়ে ছিল আপিসের ভেতরে, বাড়ি যেতে সাহস পায়নি। অবজ্ঞায় মুখ বাঁকা হয়ে যায় রাম সিং-এর। কেন বাইরে যাচ্ছে বাবু সে বুঝে উঠতে পারে না। খাবার বা বিড়ি-সিগারেটের দোকান খোলা নেই কাছাকাছি, তা ছাড়া ওদের জন্য তো বাবুদের নিজের বাইরে যাওয়া রীতি নয়, তাকেই হুকুম করত এনে দেবার। বাইরেই যখন যাচ্ছে বাবু, বাড়ি না গিয়ে ঘুরে আসবে কেন ?

বাবুদের চাল-চলন বোঝা দায়, রাম সিং ভাবে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতার জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে।

গেট পাশের রাস্তার ভিতরে। ঘটনাস্থলের বিপরীত দিকে এগোতে আরম্ভ করে অক্ষয়, একটু ঘুরে বারে যেতে হবে। ইতিমধ্যে বার যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে ? নটা প্রায় বাজে। বন্ধ না হলেও পেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলতে হবে। তার চেয়ে হোটেলেই কি চলে যাবে একেবারে ? সঙ্গে আবার টাকা আছে কম। আজ ইচ্ছে করে বেশি টাকা নিয়ে বার হয়নি। বারের মালিক তাকে চেনে, সেখানে দু-এক পেগ ধারে খাওয়া যেতে পারে। হোটেলে সঙ্গের পয়সায় দেড় পেগের বেশি হবে না।

বেশি খাবার মতলব তার আছে নাকি ?

মন যেন কথা কয়ে ওঠে জবাবে : আগে বারে চলো, ধারে চটপট দু-তিন পেগ খেয়ে নিয়ে নগদ যা আছে তা দিয়ে হোটেলে বসে যতটা জোটে মৌজ করতে করতে খাওয়া যাবে।

বেশ ঠান্ডা পড়েছে। চাদরটা অক্ষয় ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। এই ঠান্ডায় ওরা কি সারারাত রাস্তায় বসে থাকবে ? শীতে জমে যাবে না ? একটা জোরালো স্নায়বিক শিহরন বয়ে যায় অক্ষয়ের সর্বাঙ্গে, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেরাস্তার মস্ত মোড়ে, আলো সেখানে ঝলমল করছে বিশেষ ব্যবস্থায়। মাথাটায় কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে নেয়। তিন-চার বছর আগে হলেও সেও বোধ হয় পারত গুলির মুখে নির্বিবাদে রাস্তায় বসে থাকতে, সারারাত ধরে শীতে জমতে। চাকরি নিয়েও বেশ ছিল কিছু কাল, যুদ্ধের বাজারে উপরি আয়ের উপায়টা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে এই দশা হয়েছে তার।

পুবদিক থেকে ফুটপাথ ধরে তাদের আপিসের মনমোহন হনহন করে এগিয়ে আসছে, দূর থেকেই অক্ষয় চিনতে পারে। মোড়ে এসে মনমোহন তাদের আপিসের পথে বাঁক নেবে, অক্ষয় তাকে ডাকল।

অক্ষয় এখন এ অঞ্চলে কী করছে মনমোহন ভালোভাবেই জানে ! দুজনে কাছাকাছি হওয়া মাত্র সে বলে, আমি বড়ো ব্যস্ত ভাই।

হাঙ্গামার ওখানে যাবি না কি ?

হ্যাঁ, ওখানেই যাচ্ছি।

তুমি কখন খবর পেলে ? আপিস থেকে বেরোতে দেখিনি তোমায়। আমি সঙ্গেই ছিলাম। টিফিনের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

মনমোহন একটু আশ্চর্য হয়ে অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকায়। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলছে অক্ষয়, মদ যে খেয়েছে বোঝা যায় না।

এখন তবে ? অক্ষয় প্রশ্ন করে, বাড়ি থেকে ঘুরে এলে বুঝি ?

কথা বলার সময় মনমোহন বোতাম খোলা কোটের দুটি প্রান্ত বুকের কাছে দুহাতে ধরে থাকে। খুব শীতের সময়েও অক্ষয় তাকে কোনোদিন কোটের বোতামও লাগাতে দেখেনি, এই অভ্যাসের ব্যতিক্রমও দেখেনি।

বাড়ি যাওয়া হয়নি। একজন নেতার কাছে গিয়েছিলাম। আচ্ছা আসি ভাই আমি।

মদ খাইনি মোহন। বুঝলে ? মদ আমি খাইনি। আমার সঙ্গে দুটো কথা কইলে জাত যাবে না।

তার আহত উগ্র কথার মধ্যে চাপা আর্তনাদের সুরটাই বেশি স্পষ্ট হয়ে বাজে মনমোহনের কানে। মমতা সে একটু বোধ করে অক্ষয়ের জন্য, তার চেয়ে বেশি হয় তার আপশোশ। কোন স্তরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় মদ ! এই সেদিনও সুস্থ, সুখী, স্বাভাবিক ছিল এই মানুষটা। ব্যাঙ্কের কাজের অবসরে, ছুটির পরে কত আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, চাষি-মজুরের ভবিষ্যৎ এ সব বিষয়ে আলোচনা করেছে, স্থায়ী সমস্যা আর সাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত ও পথের কথায় ধরা পড়েছে তার ভিতরের একটা জিজ্ঞাসু, উৎসুক, তেজস্বী দিক। কিছুদিনের মধ্যে কীভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে তার কথাবার্তা, সব বিষয়ে আগ্রহ আর উৎসাহ গেছে ঝিমিয়ে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে পর্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে একজন তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলে আজ তার বিকারগ্রস্ত মন অপমান বোধ করে, অবজ্ঞা খুঁজে নিয়ে উথলে ওঠে ছেলেমানুষি অভিমান। এ ভাবটা যে চেপে রাখবে, একটু সংযম পর্যন্ত নেই।

শান্তকণ্ঠে মনমোহন বলে, ছেড়ে দিয়েছেন ?

ভাবছি ছেড়ে দেব।

উপদেশের কথা কিছু বলা নিরর্থকও বটে, তাতে বিপদের ভয়ও আছে। মনমোহন তাই সহজ সুরে বলে, সামান্য মাইনেতে তুমি ও-সব খাও কী করে তাই আশ্চর্য লাগে। ধার করোনি তো ?

না। অত বোকা নই। কিছু টাকা ছিল।

একটা দরকারি খবর নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়াবার সময় নেই। রাগ কোরো না ভাই। —বলে আর দেরি না করে মনমোহন জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায়।

মনমোহনও আরেকটা জ্বালা হয়ে আছে অক্ষয়ের মনে। ব্যাঙ্কে চাকরিটা নেবার অল্পদিনের মধ্যে অতি সুন্দর একটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল তার ওর সঙ্গে, সহজ সংযত তৃপ্তিকর। হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব মনমোহনের। কথাবার্তা চালচলনে সাধারণ চলতি আত্মাভিমানেরও অভাবের জন্য প্রথমে তাকে খুব মৃদু ও নিরীহ মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে অক্ষয় টের পেয়েছে তার ভেতরটা বেশ শক্ত, মোটেই তলতলে নয়, গোবেচারিত্বের লক্ষণ নয় তার আচরণের মৃদুতা। মনমোহনের যে অনেক

পড়াশোনা আর গভীর চিন্তাশক্তি আছে তা জানতেও সময় লেগেছিল। নিজের কথা বলতে যেমন, বহু কথা বলতেও মনমোহন তেমনই অনিচ্ছুক।

মনমোহন তাকে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। নিশ্চয় করে। অন্যের অশ্রদ্ধা স্পষ্ট বোঝা যায় মুখে কিছু না বললেও, মনমোহন শুধু সেটা গোপন করে রাখে অন্যের সঙ্গে তার অশ্রদ্ধা করার তফাত কেবল এইটুকু। কেন এ দয়া দেখাবে মনমোহন তাকে, কে চেয়েছে তার উদারতা ?

মনমোহনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আজকাল কেমন একটা গ্লানিকর অস্বস্তি বোধ করে অক্ষয়। পরে এর নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বারে গিয়ে বোধ হয় আর লাভ নেই এখন। মনমোহনের কাছে কয়েকটা টাকা ধার চেয়ে নিলে কেমন হত ? জীবনে ও উজ্জ্বলতর করে তুলেছে আলোক, ওর কাছে থেকেই টাকা নিয়ে সে তার জীবনের অন্ধকার বাড়াত ! কী চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে।

ধিক্। তাকে শত ধিক্।

অনিচ্ছুক মন্থর পদে সে রাস্তা পার হয়। মিলিটারি পুলিশের একটা গাড়ি বেরিয়ে যায় তার গা ঘেঁষে, চাপা পড়ে মরলে অবশ্য অন্যায় হত তারই, এ ভাবে যে রাস্তা পার হয় তার জীবনের দায়িক সে নিজে ছাড়া আর কেউ নয়, সেও এক চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে, মনমোহনের কাছে টাকা ধার নিয়ে আজ মদ খাওয়ার মতো। ওখানে ওরা গুলি খেয়ে মরেছে স্বেচ্ছায়, তাই প্রত্যক্ষ করে মনে ভাব জাগায় অসাবধানে রাস্তা পার হতে গিয়ে সে মরত গাড়ি চাপা পড়ে।

বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অক্ষয়। সময় অল্পই আছে, দু-চারজন করে বেরিয়ে আসছে লোক। বাড়ি ফেরার অসুবিধার জন্য লোক আজ কম হয়েছে বোঝা যায়। অন্যদিন এ সময় আরও ভিড় করে লোক বেরিয়ে আসে।

যাবে ভেতরে ? করে ফেলবে এদিক বা ওদিক একটা নিষ্পত্তি ? খুব উত্তেজনা সত্যি আর সওয়া যায় না। বুকের মধ্যে শিরায় টান পড়ে পড়ে ব্যথা করছে বুকটা।

অথবা এমন হঠাৎ একটা কিছু করে না ফেলে আরও কিছুক্ষণ সময় নেবে মনস্থির করতে ? হোটেল তো আছে। কম হলেও পাবে তো সেখানে মদ। এমন হুট করে নাই বা করে বসল একটা কাজ পরে হাজার আপশোশ করলেও যার প্রতিকার হবে না ?

এই চরম মুহূর্তে বড়ো বড়ো কথা আর ভাবে না অক্ষয়। দ্বিধার উত্তেজনা চরমে উঠে মনকে তার ভাব-কল্পনার রাজ্য থেকে স্থানচ্যুত করে বাস্তবে নামিয়ে দিয়েছে। সে ভাবে, আজ ভেতরে গিয়ে মদ খেলে শুধু সুধার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে না, অত্যন্ত অন্যায়ও করা হবে সুধার ওপর।

অন্যদিনের চেয়ে শতগুণে বেশি আঘাত লাগবে আজ সুধার মনে। অন্যদিন জানাই থাকত সুধার যে বাড়ি সে ফিরবে মদ খেয়েই, নতুন করে হতাশ হবার আশা করবার কিছু তার থাকত না। আজ সে আপিসে বার হবার সময়েও প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছে সুধার কাছে, সুধাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে। সুধার কথা ভেবে মনটা কেমন করতে থাকে অক্ষয়ের। সেই সঙ্গে সে অনুভব করে, ভেতরে গিয়ে এখন মদের গ্লাস হাতে নিলে তার সবটুকু শুচিতা, সবটুকু পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়োই নোংরামি করা হবে সেটা।

তখন রাখাল বেরিয়ে আসে টলতে টলতে।

আহা, বেশ বেশ, রাখাল বলে অক্ষয়ের কাঁধে হাত রেখে গলা জড়িয়ে ধরে, কোথা ছিলে চাঁদ এতক্ষণ ?

আঃ, রাস্তায় কী করো এ সব ?—রাখাল হাতটা তার ছাড়িয়ে দেয়।

বটে ? চোখ বুঝি সাদা ? বেশ বেশ। আমার বাবা চলছে সেই তিনটে থেকে, চোখ বুজে নিশ্বাস ফেলে রাখাল আবার চোখ মেলে তাকায়, হ্যাঁ কথা আছে তোমার সঙ্গে। ভারী দরকারি কথা। সেই থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছি কখন আসে আমাদের অক্ষয়বাবু। চীনা ওটাতেই যাবে তো ? চলো যাই। বসে বলব।

আমার টাকা নেই।

টাকা ? টাকার জন্য ভাবছ ? কত টাকা চাও ?

রাখাল সত্যসত্যই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে গুনতে আরম্ভ করে। দু-তিন বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সমস্ত তাড়াটাই অক্ষয়ের হাতে তুলে দেয়।

নাও বাবা, তুমিই গোন। তোমার ভাগ তুমি নাও, আমার ভাগ আমায় দাও। ঠকিয়ো না কিন্তু বাবা বলে রাখছি।

কীসের টাকা ?

অ্যাঁ ? ও হ্যাঁ, বলিনি বটে। বললাম না যে তোমার সঙ্গে কথা আছে ? চৌধুরী কমিশনের টাকা দিয়েছে—গিয়ে চাইতেই একদম ক্যাশ। বড়ো ভালো লোক। টাকার জন্য ভাবছিলে ? নাও টাকা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা ? চলো না এগোই। ওখানে গিয়ে ভাগ হবেখন।

সাদা চোখে কোনোদিন রঙিন অবস্থায় রাখালকে দেখেনি অক্ষয়। দুজনে হয়তো মিলেছে সাদা চোখেই, তারপর রং চাপিয়ে গেছে সমান তালে। মদ খেলে রাখাল যে এরকম হয়ে যায়, একসঙ্গে এতদিন মদ খেয়েও অক্ষয়ের তা জানা ছিল না। এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় কতদিন রাখালকে সে ধরে সামলে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বটে, কিন্তু তখন সে নিজেও হয়ে যেত অন্যমানুষ। এই রকম হত কি সে ? এখনকার এই রাখালের মতো ?

কাল আমার ভাগ দিয়ো।

নোটের তাড়াটা নিয়ে পাঞ্জাবি উঁচু করে ভেতরের উলের জামাটার পকেটে রেখে রাখাল হাসে, কাহিল অবস্থা বুঝি ? কোথায় টানলে আমায় ফাঁকি দিয়ে, অ্যাদ্দিনের পেয়ার আমি ?

আর এক মুহূর্ত এ লোকটার সঙ্গে থাকলে সে সোজাসুজি হার্টফেল করে মরে যাবে, এই রকম একটা যন্ত্রণা হওয়ায় অক্ষয় মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে জোরে জোরে। তেরাস্তার মোড়টা পেরিয়ে আপিসের পথ ধরে চলতে চলতে তালা লাগানো গেটটার সামনে থামে। ওরা কী করছে একবার দেখতে হবে।

দেখতে যদি হয়, তেতালার ব্যালকনিতে উঠে একটা অংশকে মাত্র দেখবে দূর থেকে ? রাস্তা ধরে ওদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ওরা কী করছে দেখতে বাধা কি ? মনমোহনের সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে।

অথবা বাড়ি যাবে ?

এখন শান্ত হয়ে গেছে হৃদয় মন! প্রতিটি ছোটো বড়ো কাজে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় চিন্তার উদভ্রান্ত জটিলতায় পাক খেতে খেতে প্রাণান্ত হওয়ার বদলে এমন সহজ হয়ে গেছে সাধারণ স্বাভাবিক বাস্তব সিদ্ধান্তে আসা। ওখানে গিয়ে ওদের মাঝখানে বসবে না বাড়ি যাবে— প্রশ্ন এই। এর জবাবটাও সহজ। এখন ওখানে গিয়ে হাঙ্গামা বাড়াবার কোনো দরকার নেই তার, তাতে কারও উপকার হবে না, তার নিজের খেয়াল তৃপ্ত করা ছাড়া। বাড়ি যাওয়াও তার বিশেষ দরকার। সুতরাং বাড়িই সে যাবে।

তবে ওরা কী করছে, কী অবস্থায় আছে, একবার না দেখে গেলে তার চলবে না। গায়ের আলোয়ানটাও দিয়ে যেতে হবে। বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত শীতে একটু কষ্ট হবে তার, কিন্তু বাড়িতে

বাকি রাত তার কাটবে লেপের নীচে। ওরা খোলা আকাশের নীচে পথে কাটিয়ে দেবে রাতটা। আলোয়ানটাতে যদি একজনেরও শীতের একটু লাঘব হয়।

অমৃত মজুমদার তার বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে আসে রাত প্রায় দশটার সময়। বিষণ্ণ, হতাশ, গম্ভীর, পরিশ্রান্ত এবং দিশেহারা অমৃত মজুমদার। ছাত্রদের বসন্ত রায়ের বাণী শোনাবার জন্য পুলিশ-লরিতে ওঠবার সময় তার রীতিমতো কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামবার সময় কী করে যেন ব্যথা লেগেছিল বাঁ দিকের কুঁচকিতে। বিশেষ কিছু নয়, তবু ব্যথা তো। বাঁ হাঁটুর বাতের ব্যথাটাও আছে খানিক খানিক। এসব জিমন্যাস্টিক কি পোষায় তার ? কী যেন হয়েছে দেশে। এতকাল রাজনীতি করে এসেও আজ যেন তার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারছে না হঠাৎ কোনদিকে গতি নিচ্ছে রাজনীতি। কোনো হলে বা পার্কে মিটিং করো, বক্তৃতা করবে। সংগ্রামের আহ্বান এলে তখন সংগ্রাম করবে। মোটরে গিয়ে মঞ্চে উঠে যা করার করা যায় সে অবস্থায়। তা নয়, রাস্তায় ওরা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে যে, লরিতে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়।

সে কথা শোনে না পর্যন্ত কেউ !

কী হল ? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে মিসেস অরুণা মজুমদার, বলবার সুযোগ দিয়েছিল তো তোমাকে ?

সব বৃত্তান্ত শুনে অরুণা তার রোগা করা মোটা দেহটি সোফায় এলিয়ে দিয়ে গভীর হতাশার সঙ্গে বলে, তুমি একটা পাগল, তুমি একটা ছাগল, তুমি কোনোদিন কিছু করতে পারবে না।

আমি কী করব ? বসন্তবাবু গেলেন না—

অরুণা ফোঁস করে ওঠে মনের জ্বালায়, বসন্তবাবু যে গেলেন না, সেটা যে তোমার কত বড়ো সুযোগ একবার খেয়ালও হল না তোমার ? একবার মনেও হল না এই সুযোগে একটু চেষ্টা করলে একরাত্রে তুমি নেতা হয়ে যেতে প্যর ? একেবারে ফাঁকা ফিল্ড পেলে, কেউ তোমার কম্পিটিটর নেই, আর তুমি কিছু না করেই চলে এলে ? তুমি সত্যি পাগল। সত্যি তুমি ছাগল। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, কোনোদিন কিছু হবে না।

আমার কী করার ছিল ?

আমি বলে দেব তোমার কী করার ছিল ? ফুঁসতে থাকে অরুণা ক্ষোভে দুঃখে, তুমি না দশ বছর পলিটিকস করছ ? তুমি না সব জানো সব বোঝ, অন্যে তোমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খায় ? একবার উঠতে পারলে সারা দেশটাকে মুখের কথায় ওঠাতে বসাতে পার ? আমার কাছে যত তোমার লম্বা-চওড়া কথা, বনগাঁয়ে শ্যাল রাজা। সবাই ওঁকে দাবিয়ে রাখে তাই উনি উঠতে পারলেন না, নাম-করাদের তাঁবেদার হয়ে রইলেন। নিজের বুদ্ধি নেই, ক্ষমতা নেই, অন্যের দোষ।

অমৃতের ফাঁপড় ফাঁপড় লাগে, দশ বছরের বিফলতা বাতাসকে যেন ভারী করে দিয়েছে মনে হয়। কত ভাবে কত চেষ্টা করল, কত চাল কত কৌশল খাটাল, মরিয়া হয়ে কত আশায় জেলে গেল, কিন্তু না হল নাম, না জুটল প্রভাব প্রতিপত্তি, বড়ো নেতা হওয়ার সৌভাগ্যও হল না এতদিনে। পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলতে মিশতে পায়, সাধারণ বৈঠকে যোগ দিয়ে কথা বলতে পায়, সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট বলতেও পায়—তেমন সভা হলে বেশিক্ষণ। পরদিন খবরের কাগজ কেনে অনেকগুলি, সাগ্রহে সভার বিবরণ পাঠ করে। নিজের নাম খুঁজে পায় না কোথাও। যদি বা পায়, সে শুধু আরও নামের সঙ্গে উল্লেখ মাত্র।

অরুণার সঙ্গে তর্ক বৃথা। কিন্তু কিছু তাকে বলতেই হবে, না বলে উপায় নাই।

কথাটা তুমি বুঝছো না, অমৃত বলে কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে, পাণ্ডারা যা ঠিক করলেন তার বিরুদ্ধে কি যাওয়া যায় ? আমার নিজের কিছু করতে যাওয়া মানেই ওঁদের বিরোধিতা করা। ওঁরা

চটে যাবেন না তাতে ? আমাকেই যে পাঠালেন বাণী দিয়ে, সেও তো একটা বড়ো সম্মান ? কত বিশ্বাস করেন বলো তো আমাকে। এতবড়ো একটা দায়িত্ব—

এ রকম দায়িত্ব পালনের অনুগত ভক্ত না থাকলে কি পান্ডাগিরি চলে ?

বীণার এই ঘরে ঢোকার মন্তব্য আরও কাহিল করে দেয় অমৃতকে। মায়ের মতোই হয়ে উঠেছে মেয়েটা। স্বামী পায়নি এখনও, বাপের ওপরেই কথার ঝাল ঝাড়ে।

চুপ কর বীণা। যা এ ঘর থেকে। অরুণা ধমক দেয়। বীণা অবশ্য যায় না। সে বুঝতে পারে, মার সঙ্গে বাবার খাঁটি বিবাদ বাধেনি, বাবাকে দিয়ে মা কিছু করিয়ে নিতে চান। লাগাম চাবুক সব তাই মা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখতে চান, অন্য কারও এতটুকু হস্তক্ষেপ তাঁর পছন্দ নয়। বীণা তাই একটু তফাতে চুপচাপ বসে পড়ে।

এবার কথার ঝাঁঝ বাদ দিয়ে গম্ভীরভাবে অরুণা বলে স্বামীকে, ওটা কর্মীর দায়িত্ব। তুমি তবে দুঃখ করো কেন ? বিশ্বাসী দায়িত্ববান কর্মীর সম্মান তো পাচ্ছ। নেতা হবার শখ কেন তবে ?

কী জানি।

যাক গে। এবার পলিটিকস ছেড়ে দাও। কাজ নেই আর তোমার পলিটিকস করে। ওসব তোমার কাজ নয়। মুখ হাত ধুয়ে এসো।

কী বলতে চাও তুমি ? স্ত্রীকে নরম দেখে অমৃত এবার ক্রুদ্ধ হয়ে, তোমরা ভাবো আমি বোকা, হাবা গোবেচারি ভালো মানুষ, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানি না। এ বাড়ি করেছে কে ? ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান নিয়ে শাড়ি গয়না পরে এত যে আরামে আছ তোমরা—

বীণা ? অরুণা বলে দৃঢ়স্বরে, তোর এত রাত হল কেন বাড়ি ফিরতে ? কোথা গিয়েছিলি ?

বীণা জবাব দেয় না। সে জানে এটা আসলে তার বাবার কথার জবাব, বাবাকে ধমক দিয়ে চুপ করানো। নইলে বাড়ি ফিরতে এমন কিছু রাত তার হয়নি যে কারণ জানবার জন্য মা মাথা ঘামাবে। অমৃত একটা চুরুট বার করে ধরায়। অরুণা কি হাল ছাড়ল ? বাইরের জগৎ থেকে জীবনকে এবার সে ঘরের সীমায় এনে রাখবে ঠিক করেছে ? অথবা আরও কিছু বলার আছে তার ?

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলে অমৃত আবার পুরানো কথাটাই জিজ্ঞেস করে, আমার কী করার ছিল ?

তোমার ? তোমার বোঝা উচিত ছিল দশ বছর যে সুযোগ খুঁজছ অ্যাদ্দিনে তা এসেছে। বড়োরা কেউ হাজির নেই গুলিগোলার ভয়ে, তুমি যা বলবে তুমি যা করবে কেউ তা ভেস্তে দিতে পারবে না। বাণী যখন ওরা মানল না, তোমার উচিত ছিল ঘোষণা করা যে তুমি ওদেরই পক্ষে। জোর গলায় বলা উচিত ছিল, দশ বছর পনেরো বছর দেশের সেবা করছ, জেল খাটছ, কিন্তু আদর্শের চেয়ে বড়ো কিছু নেই তোমার। তাই, তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ মিটমাটের, ব্যবস্থা করার, এ জন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তোমাকে—

কীসের মিটমাট ? অমৃত বলে আশ্চর্য হয়ে।

তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? তুমি দায়িত্ব নিতে মিটমাটের—মিটমাট হোক বা না হোক তোমার কী এসে যায় ? ওদের সঙ্গে কথা বলতে, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে, বাস, তোমার কাজ হয়ে গেল। দুদিন পরে দেশের লোকের মনের গতি বুঝে অবস্থা বিবেচনা করে তুমি জোর গলায় বলতে, তুমিই বিপদ ঠেকিয়েছ, তুমিই আন্দোলনটা সফল করেছ, তুমিই চেষ্টা করেছ দাবি আদায়ের।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে অমৃত। আগেও অনেকবার তার মনে হয়েছে, আজও মনে হয়, অরুণাকে সামনাসামনি পলিটিকসে নামিয়ে সে যদি পিছনে থাকত, এতদিনে হয়তো প্রবল

প্রতিপত্তি আয়ত্ত করা যেত রাজনীতির ক্ষেত্রে। নিজে দেশনেতা না হতে পারলেও অন্তত দেশনেত্রীর স্বামী হওয়া যেত।

এখনও সময় আছে।

অরুণার মৃদু, সংক্ষিপ্ত, সুদৃঢ় ঘোষণায় হৃৎকম্প হয় অমৃতের !

এখুনি তুমি যাও আবার, অরুণা বলে উৎসাহের সঙ্গে, পান্ডারা শুয়ে শুয়ে ঘুমোক। গিয়ে পুলিশকে বলবে তুমি মিটমাট করতে এসেছ, সবাইকে বাড়ি ফিরে যাবার আবেদন জানাবে। তাহলে বলবার সুযোগ পাবে। কিন্তু খবর্দার, বলতে উঠে যেন ওদের শান্তভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বোলো না। ওদের বীরত্বের প্রশংসা করে, ওরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ, এ সব কথা বলে আরম্ভ করবে। তারপর খুব ফলাও করে বলবে ওদের দাবি যাতে মেনে নেওয়া হয় সে জন্য তুমি কত ছুটোছুটি করেছ। বলবে, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেবার গৌরব আমার জুটল না, কারণ বিদেশি সরকারের গুলি যাতে আমার দেশের ভাইদের বুকে না লাগতে পারে, সেই চেষ্টা করাই বড়ো মনে হয়েছিল আমার। তোমাদেরই বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি। গুলি যখন চলেছে, তোমাদের যখন বাঁচাতে পারিনি, তখন আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনপণ ব্রত হল দেশকে স্বাধীন করা। তোমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছ, আমি ভালো বক্তৃতা দিতে পারি না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ভাই সব, বক্তৃতার দিন আর নেই, এখন আমরা সবাই মিলে—

অরুণা অসহায়ের মতো হঠাৎ থেমে যায়। চল্লিশ কোটি কালো নরনারী তার বক্তৃতা শুনছিল। হঠাৎ সামান্য একটা কারণে, নিজের মুখ থেকে বার করা 'সবাই মিলে' কথাটার প্রতিক্রিয়াগত সাংঘাতিক আঘাতে সে মরণাপন্নের মতো কাবু হয়ে যায়। স্বামীর জীবনকে সার্থক করা গেল না। ঘরে বসে তাকে যদি বক্তৃতা শেখাতে হয় স্বামীকে, এতক্ষণ শেখাবার পর এখন যদি আবার বলে দিতে হয় নিজের কথা সংশোধন করে যে, না, সবাই মিলে এ কথাটা বোলো না, তবে সে কী করতে পারে, সামান্য সে মেয়ে মানুষ !

এতক্ষণ পরে বীণা কথা বলে, কি হল মা ? তোমার সেই হার্টের ব্যথাটা হয়নি তো ?

ডাক্তার বছর দেড়েক আগে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গিয়েছিলেন অরুণার হার্টের ব্যথাটা আবার যদি জাগে জীবনের সহজ নিয়ম রীতিনীতি পালন না করার জন্য, তবে জগতের কোনো ডাক্তার এ দায়িত্ব নিতে পারবেন না যে, হার্টফেল করে মিসেস অরুণা মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে না।

আমি ঠিক আছি, অরুণা বলে, যাবে তুমি ? যাবে ? পারবে এ সুযোগ নিতে ? দশ বছর কাঙালের মতো যা চেয়েছ, আজ তা আদায় করে নিতে পারবে ? যাবে কিনা বলো।

যাচ্ছি যাচ্ছি, অমৃত বলে, এখুনি যাচ্ছি।

বীণা, হালিমকে বল গাড়ি বার করুক—এই দণ্ডে। খেতে বসে থাকলে বলবি পৌঁছে দিয়ে এসে খাবে। যদি না ওঠে, কাল থেকে বরখাস্ত। যাও না তুমি ? দশ বছরে মুটিয়েছ বেলুনের মতো, একটা দিন একটু খাটো ?

যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি, বলে অমৃত।

হালিম খেতে বসেনি। তার যৌবনান্তের দিনগুলিতেও অনেক সমস্যা। আজ সে অনেক ঘুরেছে গাড়ি নিয়ে—এত পেট্রোল বাবু কোথা থেকে জোগাড় করেন তার মাথায় ঢোকে না। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে কারবার বাবুর, বাবুর কথাই বোধ হয় আলাদা। অন্যদিন হয়তো রাগ করত হালিম এত খাটুনির পর আবার এখন গাড়ি বার করবার হুকুম শুনলে, আজ সে কথা কয় না, অমৃতকে নিয়ে অসম্ভব স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

বাড়িতে বীণা তখন বলছে ব্যাকুলভাবে, মাগো, ওমা, কী হল তোমার ? কেন এমন করছ ? ওমা, মা—

ডাক্তার বারবার বলেছিল, সাবধান, সাবধান। এ কোন মরীচিকার লোভে মা সে কথা ভুলে গেল! নিজের মরণ ডেকে আনবার মায়ের এই অদ্ভুত পাগলামির কথাই বীণা ভাবে ভাইবোনের সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ আগলে বাপের প্রতীক্ষায় বসে থেকে। খাওয়া দাওয়ার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন নিখুঁত সতর্কতা, মনে এত উদ্‌বেগ অশান্তি ক্ষোভ জমা করবার কী দরকার ছিল ? এত পেয়েও সাধ মিটল না, যশ মান প্রতিপত্তির উগ্র কামনায় পুড়তে পুড়তে মরতে হল শেষে ? ক্রমে ক্রমে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল মা তার বাবাকে বড়ো একজন নেতা করার জন্য। এতই কি প্রচণ্ড নেতৃত্বের মোহ মানুষের যে বাবার জীবনটা তাব ভরে ওঠে আত্মগ্লানি আর হতাশায় তবু তিনি থামতে পারেন না, মাকে তার জীবনটা দিতে হয়! মা যেন তার আত্মহত্যা করেছে মনে হয় বীণার। নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে বীণার গাল বেয়ে, ভাইবোনদের মতো সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না।

এদিকে গাড়ির গতির মতোই দ্রুত হয়ে ওঠে অমৃতের চিন্তার গতি। তাড়াতাড়ি মনে মনে সে আউড়ে নিতে থাকে ওখানে গিয়ে কী বলবে আর কী করবে, কোন কৌশলে কাজ হবে বেশি। অনেকদিন পরে হঠাৎ আজ যেন তার আত্মবিশ্বাস সজীব হয়ে উঠেছে মনে হয়, বেশ খানিকটা সে উত্তেজনা বোধ করে। অরুণা ঠিক কথাই বলেছে, এ সব সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মানুষ জনসাধারণের মনে আসন পাতে, নেতা হয়। নানা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যেতে থাকে অমৃতের মনে। একটা চিন্তা তাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তোলে, লোভ ও ভয়ের আলোড়ন তুলে দেয়। একটা কাজ সে করতে পারে, অতি চমকপ্রদ নাটকীয় একটা কাজ, সাধারণের মনকে যে ধরনের ব্যাপার প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আজকের ঘটনা নিয়ে সে আন্দোলন করবে, এ কথা সে জানাবে। কিন্তু আরও সে এগিয়ে যেতে পারে। সে ঘোষণা করতে পারে যে গুলি-চালনার প্রতিবাদে এবং ওদের দাবির সমর্থনে এখন এই মুহূর্তে সে ওদের সঙ্গে যোগ দিল—তারপর ওদের মধ্যে গিয়ে পথে বসে পড়তে পারে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে তাকে। তাহলে তো আরও ভালো হয়।

চারিদিকে সাড়া পড়ে যাবে তাকে নিয়ে। কাগজে বড়ো বড়ো হরফে তার নাম বেরোবে—

বেরোবে কি ? এই বিষয়েই মস্ত খটকা আছে অমৃতের মনে। নিজে নিজে সে এতখানি এগিয়ে গেলে বড়োরা চটবেন সন্দেহ নেই। সে আন্দোলন করবে, ওদের হয়ে লড়বে, এইটুকু ঘোষণা করার জন্যই চটবে। ওরা চটলে কোনো বড়ো কাগজে তার নাম বেরোবে না। সে নিজে কোনো বিবৃতি দিলে তাও ছাপা হবে না। তারপর, সে যদি একেবারে রাজপথে গিয়ে বসে পড়ে ওদের মধ্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, রাগে হয়তো চোখে অন্ধকার দেখবেন চাঁইরা। আজকের ঘটনাকে তাঁরা কী ভাবে নেবেন, কী ভাবে নিতে বাধ্য হবেন, এখন সঠিক অনুমান করে বলা যায় না। কিন্তু বড়োদের মনোভাবের খানিকটা ইঙ্গিত আজকেই অমৃত পেয়েছে। ওঁরা যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে চান, ঘটনাটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। এই দলাদলির দিনে কোনো একটি বিশেষ দলের বাহাদুরি নেবার চেষ্টা বলে হয়তো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন। তাহলেই বিপদ অমৃতের। হয়তো তাকে দল থেকে রিজাইন দিতে হবে। নয়তো আজকের প্রকাশ্য ঘোষণা হজম করে ফেলে সরে দাঁড়িয়ে তলিয়ে যেতে হবে তলে।

কিন্তু কথাটা হল কি—অমৃত হিসাব কষে যায় প্রাণপণে মাথা ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করে—যে বিপদ নয় ঘটল, নেতারা নয় বর্জন করলেন তাকে, অন্যদিকে লাভ হবে নাকি কিছুই ? হইচই কি হবে না তাকে নিয়ে ? অন্য দলে গিয়ে কি করতে পাববে না কিছু ? এতকাল নেতাদের মুখ চেয়ে থেকে তো কিছু হল না, সরে গিয়ে অন্য চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি ? কিন্তু সে সুযোগ যদি না পায় ? যদি ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি ? তখন এদিকও যাবে, ওদিকও যাবে।

নরম ঘোষণাটা জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেলে পরিস্থিতি যাই দাঁড়াক সে সামলে নিতে পারবে। কিন্তু গরম ঘোষণা আর চরম কাজটার মতো ফল তাতে হবে না—ওতে একরাত্রেই হয় তো সে

বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে। কী করবে ঠিক করে উঠতে পারে না অমৃত। অরুণা কাছে নেই বলে বড়ো তার আপশোশ হয়। অরুণার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পেলে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা যেত !

পাশের রাস্তা দিয়ে মোড়ের কাছাকাছি এসে অমৃতের গাড়ি থামে। ভিড় এখন বিশেষ নেই। অমৃত গাড়ি থেকে নেমে চলতে আরম্ভ করেছে, বোতাম খোলা কোট গায়ে লম্বা একটি যুবক এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

অমৃতবাবু, একটা কথা আছে।

আপনাকে তো—?

আমায় চিনবেন না। আপনার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনি এখুনি বাড়ি ফিরে যান। আপনার বাড়ি থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে সুব্রত এসেছিল—আপনার মেয়ে টেলিফোন করেছিলেন। আপনাকে জানাতে বলে সুব্রত আপনাদের বাড়ি চলে গেছে।

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ? কী হয়েছে ? কিন্তু আমি যে এদিকে—

অমৃতের অনিচ্ছুক, ইতস্ততভাব অদ্ভুত লাগে মনমোহনের। তারপর সে ভাবে, তার কথা থেকে অমৃত হয়তো খবরটার গুরুত্ব ধরতে পারেনি। সে বলে, হঠাৎ হার্টের অ্যাটাক হয়েছে শুনলাম। অবস্থা ভালো নয়। আপনি এখুনি চলে যান।

হার্টের অ্যাটাক অরুণার পক্ষে মারাত্মক হওয়া আশ্চর্য নয়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাকে সুস্থ দেখেছিল বটে, কিন্তু হার্টের ব্যাপার হলে দু-চার মিনিটে অবস্থা খারাপ দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু এদিকের ব্যবস্থা তবে কী করা যায় ? চরম সিদ্ধান্তটা আজ তবে বাদ দিতেই হল। তাড়াতাড়ি তার কথাগুলি বলে নিয়ে বাড়িই তাকে ফিরে যেতে হবে। অরুণার অসুখের কথাটাও উল্লেখ করে বলতে পারবে যে, ওদের এ অবস্থায় রেখে ফিরে যেতে তার প্রাণ চাইছে না, কিন্তু স্ত্রীর কঠিন অসুখের জন্য একান্ত নিরুপায় হয়েই—

আমি কিছু বলতে এসেছি আপনাদের। মিনিট দশেক বলেই শেষ করে বাড়ি যাব।

আপনাদের কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট ?

ঠিক তা নয়, আমি নিজেই কিছু বলব। দেশজোড়া একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এ ব্যাপার নিয়ে, আমি বলে দিতে চাই যে, সে আন্দোলন গড়ে তুলতে আমার যতখানি ক্ষমতা আছে সব আমি কাজে লাগাব।

নিজেকে হঠাৎ বড়ো শ্রান্ত মনে হয় মনমোহনের। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ভাষা ও গলার গুরুত্বপূর্ণতা বজায় রেখে সে বলে, এখন বলা কি ঠিক হবে ? কেউ বক্তৃতা শোনার মতো অবস্থায় নেই। কাল মিটিং হবে, সেখানে বলাই ভালো হবে।

আমায় বলতে দেবেন না তা হলে ?

বলতে চাইলে বাধা দেব কেন ? বলা উচিত কি না আপনিই বুঝে দেখুন। আমাদের মরাল ঠিক আছে, আপনার বক্তৃতার ফলে বড়ো জোর কয়েকজনের উত্তেজনা বাড়বে। তার চেয়ে আপনি যদি কাল পাবলিকের কাছে বলেন আপনার কথা, তাতে বেশি কাজ হবে।

বাড়িতে ও গাড়িতে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা বেড়ে উঠেছিল, এখন তা অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অমৃতের কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, একটু ভয়ও করে। সশস্ত্র আক্রমণ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে তারই আলোয় এখনকার শান্ত পরিস্থিতিকেও অমৃতের অপরিচিত, ধারণাতীত মনে হয়। সে অনুভব করে, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না আজকের অবস্থা, তার জানাশোনা ধরা বাঁধা পুরানো নিয়মে আজকের ঘটনা ঘটেনি। তার পক্ষে এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন—হয়তো অসম্ভব।

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে নিজেকে অমৃতের মৃত মনে হয়।

হালিম জোরে চালাও।

মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে অমৃতের, চোখের সামনে কতগুলি তারা ঝিকমিক করে ওঠে।

একটু দূরে দূরেই থাকে অজয়, তফাত থেকে উদাসীনের মতো দ্যাখে। মনে তার নালিশ নেই, ক্ষোভ জমা হয়ে আছে প্রচুর। তার উনিশ বছরের মনটা অভিমানে জর্জর।

ওরা শোভাযাত্রা করে এসে বাধা পেয়ে এখানে বসেছে রাস্তায়, এই নতুন উত্তেজনায় আরও মজাদার হয়েছে ওদের দল বেঁধে রাস্তায় নেমে মজা করা। বেশ খানিকটা হইচই হবে চারিদিকে এই ব্যাপার নিয়ে। বড়ো বড়ো লোকেরা ছুটাছুটি করবে বড়োকর্তাদের কাছে, আলাপ-আলোচনা চলবে কিছুক্ষণ তারপর মিটমাট হবে আপস-মীমাংসায়। গর্বে বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরবে সবাই, আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শির কাছে, মেসে হোটেলে চায়ের দোকানে, সচকিতা মেয়েটির কাছে, বলে বেড়াবে ওরা কী ভাবে সংগ্রাম করেছে—সংগ্রাম ! আটমাস আগে হলে সেও যেমন হয়তো থাকত ওদের মাঝে, বাড়ি গিয়ে মাধুকে শোনাত সংগ্রামের কাহিনি, চোখ বড়ো বড়ো করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত মাধু !

আজ সে ওদের মধ্যে নেই। সে আর কলেজের ছেলে নয়। হাজার দুঃখদুর্দশার মধ্যেও হাসিখুশি আশা স্বপ্নের ওই নিশ্চিন্ত সুখের জীবন তার ফুরিয়ে গেছে, শোভাযাত্রা করে এসে লাঠি বন্দুকের বাধা মানব না বলে রাস্তায় বসে পড়ার মজা আর তার জন্যে নয়। সে এখন চাকুরে, কেরানি ! মাসকাবারি চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ—হাওড়ার ওই বস্তি-ঘেঁষা নোংরা পুরানো ভদ্রপল্লির ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেন্টের মেঝেওয়ালা বাড়িটার অংশটুকুতেই আটকে গেছে জীবন তার চিরদিনের জন্য, এই ঘরে-কাচা আধময়লা জামা কাপড় আর সস্তা ছেঁড়া রংচটা আলোয়ানটি তার শুধু বেশভূষা নয়, আগামী পরিচয়ও বটে।

এমনি লোকও বহু জুটেছে ওদের সঙ্গে, পথের রাজপথের সাধারণ পথিক। তার চেনা ওই ছোকরা পর্যন্ত দলে ভিড়েছে, আপিসের সামনে বিড়ির দোকানে যাকে সে বিড়ি বানাতে দেখে আসছে গত কয়েক মাস। তবু অভিমান নরম হয় না অজয়ের। পথিকেরা ভিড় করেছে মজা দেখতে, কৌতূহলের বশে। ওদের মধ্যে গিয়ে ভিড়লে তাকেও ওরা ভাববে দলের বাইরের ওই রকম কৌতূহলী পথিক, ওদেরই মতো সেও যে ছিল কলেজের ছাত্র মাত্র কয়েক মাস আগে, এ পরিচয় ঘোষণা করলেও ওরা তাকে আপন ভাবতে পারবে না ! সে আর ছাত্র নেই, সে পর হয়ে গেছে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দাবি তার নেই।

একটা বিড়ি টানতে ইচ্ছা করে ! সঙ্গে নেই, কিনতে হবে।

বন্ধুদের কাছে সিগারেট মিলত, তার সঙ্গে নিজে দু একটা কিনে চালিয়ে দেওয়া যেত একরকম। একটা সিগারেট তিনবারও ধরানো যায় নিভিয়ে রেখে রেখে। চাকরি নিয়ে পাঁচটা করে সিগারেট কিনছিল রোজ নিজের রোজগারের পয়সায়, কম দামি সিগারেট, পাঁচটা মোটে দু আনা—এক বান্ডিল বিড়ির দাম। ছেড়ে দিতে হয়েছে। ট্রাম বাসের কটা পয়সা বাঁচাতে ব্রিজ থেকে যাকে হাঁটতে হয় আপিস পর্যন্ত, সে খাবে সিগারেট ! বিড়ি ধরেছিল, ঘেন্নায় তাও ছেড়ে দিয়েছে। সিগারেট টানবার সাধ নিয়ে ক্ষমতার অভাবে টানতে হবে বিড়ি ! ধোঁয়া খাওয়াই বন্ধ থাক তার চেয়ে !

মাধু বলেছিল শুনে, লাটসায়েবের মতো একটা বাড়িতে থাকতে সাধ যায় না ?

না।

মিথ্যে বোলো না !

সাধ আর স্বপ্নের তফাতটা মাধু এখনও বোঝে না, এটাই আশ্চর্য। পেট ভরে ভাত খাওয়াও যেন সাধ, পোলাও খাওয়াও তাই। অথচ ওর বোঝা উচিত। দুটো পয়সা রোজগারের উপায় খুঁজে ছটফট করছে।

আঙুলে ধরা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে, টানতেও যেন আলস্য লোকটার। দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও আলসেমিতে ঢিল। কী হয় দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছে কিন্তু আগ্রহের অভাবটা এমন স্পষ্ট ! পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেটের রঙিন টিনটা দেখা যায়।

বিড়ি এক পয়সার কিনে একটা খেলে দোষ নেই। সাধ মিটিয়ে সিগারেট খাবার ক্ষমতা না হলে সিগারেট ছোঁবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, বিড়ি কখনও খাবে না তা বলেনি নিজেকে। এমন বিশ্রী লাগছে ওদের দূরে থেকে দলভ্রষ্ট জাতনষ্ট পতিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে ! একটা বিড়ি টানলে হয়তো একটু ভালো লাগত !

আজ নিয়ে পাঁচদিন হল বিড়ি খায় না। বেশ কষ্ট হয়েছে না খেয়ে থাকতে, এখনও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। খাবার ইচ্ছাটাও যে বেশ জোরালো আছে এখনও, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। একটা বিড়ি খেয়ে পাঁচদিনের লড়াইটা বাতিল করে দেবে ! যাকগে। কী হয় বিড়ি না খেলে !

বাবু ? বাবু, শুনছেন ? শিয়ালদ যামু ক্যামনে ?

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, অজয় ভাবে। গাঁ থেকে যত গেঁয়ো মানুষ নতুন শহরে এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, সবাই যেন তারা হাঁ করে থাকে কখন অজয়বাবুর দেখা মিলবে, তাকে জিগ্যেস করে হদিস মিলবে পথঘাটের, মুশকিলের আসান হবে। কিছু জানবার থাকলে ভদ্রলোক তাকে এড়িয়ে জিগ্যেস করে অন্য লোককে, এরা সকলকে এড়িয়ে জিগ্যেস করে তাকে। এমন গেঁয়ো অজ্ঞ চাষাভুসোর মতোই কি দেখায় তাকে যে দেশ গাঁয়ের আপন লোক ভেবে ওরা ভরসা পায় ? ঘোমটা টানা ছোট্ট একটি কলাবউ আর মাঝবয়সি একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাশের রাস্তায় খানিকটা ভেতরের দিকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লোকটি খানিকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক এর ওর মুখের দিকে চাইছিল, এবার এত লোককে ডিঙিয়ে তার কাছে এসেছে।

একটু ঘুরে যেতে হবে বাপু।

পথ আর উপায় বাতলে দেয় অজয়, লোকটি মাথা চুলকোয়।

এসো আমার সঙ্গে।

পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে ওদিকের মোড়ে রিকশা ডেকে ওদের তুলে দিয়ে অজয় নিজেও একটু ইতস্তত করে পথসংশয়ী পথিকের মতো। বাড়ি ফিরবে না ওখানে ফিরবে ? সে ওদের নয়, তার পথ নয় ওদের পথ।

ইচ্ছে কিন্তু করছে ফিরে যেতে, ওরা কী করে দেখতে, শেষ পর্যন্ত কী হয় সঙ্গে থেকে জানতে। পরের মতোই না হয় সে দেখবে ওদের কার্যকলাপ, সে তো আর দাবি করছে না যে, মোটে আট মাস আমি ছাপ হারিয়েছি, আমায় তোমাদের মধ্যে ঠাঁই দাও !

গুলির আওয়াজটা তখন সে শুনতে পায়, কানে আসে তুমুল কলরব। সব ভুলে সে ছুটতে আরম্ভ করে, তার সমস্ত ক্ষোভ অভিমান পরিণত হয় একটিমাত্র ব্যাকুল প্রশ্নে, কী হল, কী হল ? ভয়াতুর মানুষ ছুটে যায় তার পাশ কাটিয়ে বিপরীত দিকে, সে চেয়েও দেখে না। বরং তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয় যে এদের সংখ্যা বেশি নয়। দু-দশজন পালাক, সকলে কী করছে দেখতে হবে।

তফাতে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে সে ভুলে যায়, সোজা চলে যায় ওদের কাছে, ওদের মধ্যে।

মধুখালিতে তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। গাঁয়ের পূর্ব প্রান্তের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার আগুনের শিখায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। অল্প দূরে নদীর জলও লাল হয়ে গেছে উদয় রশ্মির ছোঁয়াচ লাগার মতো। সমুদ্রের দিকে প্রায় এক মাইল নামায় নদীর ধারে কেশব বদ্যির ঘর, সেখান থেকে মধুখালির আগুন দেখা যায়।

গোঙাতে গোঙাতে যাদব বলে, গণশার মা, শুলে পারতে না একটু ? রাণী তুই শো না একটু বাছা ? কত কষ্ট কত হাঙ্গামা আছে অদেষ্টে এখনও ঠিক কি তার ?

শুয়ে কী হবে ? শুলেই ডাকবে, বলবে, চলো এবার। কপালে দুঃখ্যু আছে তো আছে ! গণেশের মা জবাব দিয়ে মস্ত হাই তোলেন, হাঁ বুজবার আগেই কাঁথাটা ঠিক করে দেন ছোটো ছেলে দুটোর গায়ে। তারা অঘোরে ঘুমোতে আরম্ভ করেছে শোয়ার সুযোগ পাওয়া মাত্র।

রাণী উত্তরের বেড়ার জানালার ঝাঁপ উঁচু করে তাকিয়ে থাকে দূরের রক্ত-চিহ্নের দিকে। শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য যাদবের আবেদন তার কানে পৌঁছেছে মনে হয় না। তার শরীরের শিরা-মাংস মাটিতে আছড়ে পড়ে বিশ্রাম খোঁজার মতো অবসন্ন, হঠাৎ হাঁটু ভেঙে হয়তো সত্যি সত্যি পড়ে যাবে, কে জানে। কিন্তু দূরের ওই আগুনের রক্তিম সংকেত থেকে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। সাদা চুনকাম করা মাটির দেওয়ালের ওপরে সুন্দর করে ছাওয়া কয়েকটা চালা শুধু পুড়ছে না ওখানে, সীতা দেবীর অগ্নিপরীক্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন দেবতারা তার সতীত্ব রক্ষার জন্য, একেবারে শেষ মুহূর্তে ! হইহই রইরই আওয়াজ এসেছিল কানে, মনে হয়েছিল দুকানে এতক্ষণের ঝিমঝিম আওয়াজ এবার বদলে গেল কানের পর্দা ফেটে মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসছে বলে, এবার সে মরবে। যাক বাঁচা গেল, সে ভেবেছিল, মরার পর যা খুশি করুক তাকে নিয়ে বেঁটে মোটা লোকটা, সে তো আর জানবে না বুঝবে না। গাঁ সুদ্ধ লোক হইহই করে তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে রাবণের হাত থেকে তা কী সে জানত ! বিশ্বাস করতে পারেনি, মনে হয়েছিল কোটালের জোয়ার বুঝি আসছে নদীতে, ও তারই গর্জন।

সে লোকটা কি পুড়ছে ওই আগুনে ? ধীরে সুস্থে পোশাক ছেড়ে, তাকে বারবার ভয় নেই ভয় নেই বলতে বলতে, পা পর্যন্ত ঝোলা যে জামাটা গায়ে দিয়েছিল সেই জামা সুদ্ধু ? রাণী জোরে নিশ্বাস টানে—ওখান থেকে এতদূরে ভেসে এসে যেন পোড়া মাংসের গন্ধ তার নাকে লাগা সম্ভব ! সে যখন বেরিয়ে আসে পাগলের মতো কয়েকজন মিলে সেটাকে মারছিল তার মনে পড়ে। খুন করে কি রেখে এসেছে সেটাকে ওরা চিতায় পুড়বার জন্য ? বেঁধে কি রেখে এসেছে নেওয়ারের খাটটার সঙ্গে জ্যান্ত অবস্থায় ? ইস্, একটু ধৈর্য ধরে সবাইকে বাইরে ডেকে সে নিজেই যদি বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে সজ্ঞানে জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মরবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসত !

ঠান্ডা কনকনে হাওয়া মুখে লাগছে। রাণীর শীতবোধ নেই। দূরে ওই অত্যাচারীর চিতার আগুনের তাপটাই সে অনুভব করছে, দেহমনের আর সব অনুভূতি মরে গেছে তার।

নিজে শীতে না কেঁপে, গণেশের মা বলেন যাদবকে, মোদের শোবার লেগে দশগন্ডা হুকুম না ঝেড়ে, নিজে এসে কাত হও না একটু এদের পাশে কাঁথাটা গায়ে দিয়ে ?

শোবার সময় এটা মোর আঁ ?

বসে থেকে কী রাজ্য উদ্ধার কর ? ?—হাই চাপতে গণেশের মা রোগা হাতের মুঠিটাই ঘষতে থাকে হাঁ-য়ে, ভেবে কি হবে ? ছেলে তো আছে শহরে, গিয়ে একবার পড়তে পারলে ভয়টা কি ? নে যাবার সব তো করছে এরাই !

যাদব কথা কয় না।

একা তো নও আর ? খুব তো সামলেছিলে মেয়াকে, বড়াই কত ! সবার ঘরে মেয়ে বউ, সবাই টের পেলে এমনি ব্যাপার চলতে দিলে আর বাঁচোয়া নেই, তাই না গেল সব মরিয়া হয়ে ছুটে।

ধান-তোলা নিয়ে না লাগলে এমন খেপত না লোক—ভগমানের আশীর্বাদ। মেয়াকে তোমার ছিনিয়ে আনলে, আগুন দিলে ঘাঁটিতে, হেথা সরিয়ে আনলে মোদের রাতারাতি, শহরতক পৌঁছে আর দিতে পারবে না ? তুমি কোথা লাগবে উঠে পড়ে, তা নয়, ভয়ে ভাবনায় হাত-পা সেঁধিয়ে বসে আছ পেটের মধ্যে !

ডিবরির শিখাটা অবিরত কাঁপছে উত্তরের হাওয়ায়। গণেশের মার রোগ-জীর্ণ শীর্ণ দেহটা দেখতে দেখতে বাতাসে সরু গেঁটে বাঁশের দোলন মনে পড়ে যাদবের। যে ঝড়ে ঘরের চালা উড়ে যায়, বড়ো বড়ো গাছ মট-মট ভেঙে পড়ে, সেই ঝড়েও গেঁটে বাঁশ শুধু দোল খায় নিশ্চিন্ত মনে। জীবনের ঝড়-ঝাপটা তাকে কাবু করে দিয়েছে, গণেশের মা ঠিক আছে তার নিজের মতিগতি বজায় রেখে। নইলে এত সব ভয়ানক বিপর্যয় কাণ্ডের পর, ঘর-বাড়ি ছেড়ে পরের আশ্রয়ে এসে রাতারাতি শহরের উদ্দেশে অনির্দিষ্ট যাত্রার প্রতীক্ষা করার সময়, তাকে কাঁথার নীচে ঢুকিয়ে একটু আরাম আর বিশ্রাম দেওয়াবার জন্য এত চালের কথা কইতে পারত গণেশের মা। সব ব্যাপারের মোটামুটি মানেটা বুঝেই গণেশের মা নিশ্চিন্ত। মেয়েকে তার জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব্যারাকে, গাঁয়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে খেপে গিয়ে মেয়েকে তার উদ্ধার করে এনেছে, ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, রাতারাতি তাদের সরিয়ে এনে ফেলেছে এখানে শহরে গণেশের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য, এই পর্যন্ত জেনে গণেশের মা কাঁদাকাটা হা-হুতাশ বাতিল করেছে। কত যে আরও ফ্যাকড়া আছে এ ব্যাপারে, সেটা তার খেয়াল নেই ! এ ব্যাপারের জের যে কোথায় গড়াবে, কেন যে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাতারাতি, কত হাঙ্গামা কত দুর্দশা যে জমা হয়ে আছে তাদের জন্য সামনের দিনগুলিতে, সে সব কথা মাথায় আসে না ওর। শহরে গিয়ে ছেলের কাছে গিয়ে থাকবে ভেবেই সে খুশি, তার রোজগেরে ছেলে ! মাসেমাসে টাকা পাঠাচ্ছে ছেলে, সে থাকতে ভাবনা কী তাদের ?

এখনও জ্বলছে বাবা আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে ! রাণী হঠাৎ বলে মুখ না ফিরিয়েই।

তুই তো একটু শুলে পারতিস রাণী ? গণেশের মা বলে আবেগহীন গলায়। এই মেয়েই যে যত ঝঞ্ঝাট যত বিপাকের মূল এ কথা ভেবে তার কোনো জ্বালা নেই। সংসারের আর দশটা ঝঞ্ঝাটে নয় মেয়ে বলে ওকে গঞ্জনা দেওয়া চলে, এই সৃষ্টিছাড়া ভয়ংকর ব্যাপারে ওকে দায়িক ভাবা কি যায় ? গণেশের মার অন্য দুশ্চিন্তা। মেয়ে তার খাঁটিই আছে, কিন্তু লোকে কি তা জানবে না মানবে ! কেউ কিছু না বলুক, সবাই দরদ দেখাক, তবু মেয়ে তার ধর্মনাশের ছাপ মারা হয়ে রইল সকলের কাছে। সুধীর হয়তো মেয়েকে তার নেবে না এই অজুহাতে। এ সব রাণী কী করে সইবে, অসহ্য হলে ঝোঁকের মাথায় কী করে বসবে, তাই ভাবে গণেশের মা। সেবার পদীর কচি মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সাঁতরার ক্যাম্পে, সারারাত পদী মেয়ের কান্না শুনেছিল আর পাগলের মতো পাক দিয়েছিল ক্যাম্পের চারিদিকে। সকালে আধমরা মেয়ে নিয়ে পদী গাঁয়ে ফিরলে কি হইচই পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে, কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল চারিদিকের হিন্দু-মুসলমান চাষাভুসো সব একজোট হয়ে, বড়ো হাকিম নিজে এসে ব্যবস্থা করার কথা না দিলে কাণ্ডই হয়ে যেত একটা। কাণ্ড হল শেষতক, তার মেয়েকে নিয়ে। পদীর মেয়ের দিকে ছিল সবাই, প্রাণ দিয়ে মায়া করেছে তাকে সবাই, সে নিজেও কি একদিন কেঁদে ফেলেনি তাকে বুকে জড়িয়ে দুটো কথা কইতে গিয়ে ? তবু তো পুকুরে ডুবে মরল পদীর মেয়েটা। গাঁয়ে থাকতে হলে রাণীই বা কী করে বসত কে জানে ! তার চেয়ে এ ভালো হয়েছে। ভাঙা ঘর আর ভিটেটুকু বাঁধা পড়ে আছে, ঋণের বোঝা জমে আছে পাহাড় হয়ে। কী হবে এ ভিটের মায়া করে ? তার চেয়ে শহরে অচেনা লোকের মধ্যে রাণীও বাঁচবে শান্ত মনে, তারাও থাকবে সুখে শান্তিতে।

গণেশের মার সুখশান্তির স্বপ্নও খোলা আর খোসা দিয়ে গড়া। তার বেশি চাইতে ভুলেও গেছে, সাহসও হয় না। না খেতে পেয়ে একেবারে না মরলে, রোগে বিপাকে মরণাপন্ন না হলে, মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের অভাব না ঘটলে তার কত শান্তি কত সুখ লাভ হত।

কেশব একটি পুরানো কম্বল হাতে করে ঘরে আসে, ঘরে তৈরি বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে, শীর্ণ মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। সহজ শান্ত ভাব, একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ। মাঝরাত্রে হঠাৎ এই খাপছাড়া অতিথি পরিবারটির আবির্ভাবে তাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত বা বিপন্ন মনে হয় না।

খিচুড়িটা নামবে এবার, কম্বলটা যাদবের কাছে নামিয়ে রেখে সে ঘরোয়া সুরে বলে, খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করেই রওনা দিতে হবে। নৌকোয় ঘুমানো চলবে। নৌকো খুঁজতে গেছে।

মোর তরে সবার বিপদ হল, পালাতে কেমন লাগছে বদ্যি মশায়।

কেশব মাথা নেড়ে যেন তার এই অনুভূতির সঙ্গতিতেই সায় দেয়, বলে, পালাচ্ছ না তো, পালাবে কেন। ওরা তো ছেড়ে কথা কইবে না, কদিন তাণ্ডব চলবে চাদ্দিকে। তোমাদের ওপর ঝাল বেশি, প্রথম ধাক্কাটা পড়বে তোমাদের ওপরে। তোমরা তাই কটা দিন নিরাপদ জাগায় গিয়ে থাকবে। অবস্থা ভালো হলে, দেশের লোক প্রতিবাদ শুরু করলে অতটা যা তা করা চলবে না, যখন আইনসঙ্গত এনকোয়ারি শুরু হবে, কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য, তখন তোমরা ফিরে আসবে সাক্ষী দিতে। তোমার মেয়ে আমাদের তরফের বড়ো সাক্ষী।

সাক্ষী দিতে হবে ? দেব। আমি সাক্ষী দেব। রাণী এতক্ষণে জানালা ছেড়ে সরে আসে।

কেশব নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

কাছাকাছি থাকতে পারি না কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ? যাদব শুধোয় সংশয়ের সঙ্গে।

ছেলের কাছে যাবে বলছিলে না ? তাই ভালো। কলকাতাতেই যাও, কেশব বলে চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, সাক্ষী দেয়ার দরকার হবে কি না শেষ পর্যন্ত তাই বা কে বলতে পারে। দুঁদে প্রজাগুলোকে জব্দ করার এ সুযোগ জগৎবাবু ছাড়বে না। ও আবার কী পরামর্শ দেয়, কী দাঁড় করায়। নাঃ, ছেলের কাছেই যাও তুমি।

কেশবের স্ত্রী মেনকা এসে বিনা ভূমিকায় বলে, এসো দিকি তোমরা খেয়ে নেবে দুটি। ডিবরিটা আনিস তো বাছা তুই, কী নাম যেন তোর মা, রাণী ? ওমা ডিবরি যে নিভল বলে।

তেল তো নেই আর। কেশব বলে।

রসুই ঘরের ডিবরি থেকে দিচ্ছি একটু।

সবাইকে একসাথে বসিয়ে দেয় মেনকা, রাণী আর গণেশের মাকে পর্যন্ত। খিচুড়ি খেতে বসে যাদবের চোখে হঠাৎ জল আসার উপক্রম হয়। তার মতো গরিব হাঘরে তুচ্ছ মানুষের জীবনেরও যে দাম আছে দশজনের কাছে, তার মতো লোকের মেয়ের সম্মান যে নিজের মেয়ের সম্মানের মতো হতে পারে দশজনের কাছে, এ জ্ঞান এ অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় অভিভূত করে রেখেছে প্রথমাবধি। চিরকাল নিজেকে সে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচন মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারও। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়। ডান হাতে চোট লেগেছে, মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেদনা যেন গায়ে লাগে না যাদবের, ব্যান্ডেজের নীচে মাথার ক্ষতটা যে দপদপ করছে সে যন্ত্রণাও বাতিল হয়ে গেছে তার কাছে। ভিতরে একটা ক্ষোভ আর আক্রোশকেই যেন জাগিয়ে বাড়িয়ে চলছে শরীরের আঘাতগুলির যন্ত্রণা। সে ফিরে আসবে, বউ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।

ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিনদিন, যে হাঙ্গামার সুযোগে সাঁজ সন্ধ্যায় মেয়েকে তার টেনে নিয়ে যাবার সাহস ওদের হয়েছে, তাতে ভালো করে যোগ দেয়নি বলে আপশোশ হয় যাদবের। তাকে যারা আপন ভাবে, তার জন্য বাঁচন মরণ তুচ্ছ করে, তাদের ব্যাপারে সে উদাসীন ছিল কেমন করে ?

তাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই নৌকার খোঁজে যে দুজন গিয়েছিল তারা ফিরে আসে।

আধঘণ্টার মধ্যে তাদের নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়। কারও বারণ না শুনে রাণী ছইয়ের বাইরে বসে চেয়ে থাকে, আগুনের রক্তিম আভার দিকে। মধুখালি অতিক্রম করেই নৌকা যাবে।

মরেই যে গেছে, বিশেষ করে যাকে স্পষ্টই চেনা যায় কুলি বা চাকর বলে, তার জন্য হাসপাতালের লোক বেশি আর মাথা ঘামাতে চায় না। মরণের খবর জানবার প্রয়োজন যেন কিছু কম তার আপনজনের, প্রাণহীন শরীরটা যেন কিছু কম মূল্যবান অদের কাছে। বাঁচাবার চেষ্টা সাঙ্গ হবার সঙ্গে অবশ্য প্রধান কর্তব্য শেষ হয়ে যায় হাসপাতালে। জীবিতের দাবিই তখন বড়ো। ওসমান তা জানে। আচমকা বহু সংখ্যক আহত ও মরণাপন্নদের আবির্ভাবে সকলে খুব ব্যতিব্যস্তও বটে। তবু, চটমোড়া মালটা খুলে মৃত লোকটির নাম ঠিকানা জানবার কোনো উপায় মেলে কিনা এটুকু চেষ্টা করে দেখবার অবসর কি কারও নেই ? কোনো একটা হদিস পেলে আজ রাত্রেই খোঁজ নিতে যাবার জন্য সে তো রাজি ছিল, যত রাস্তা হাঁটতে হয় হাঁটবে। কিন্তু কালকের জন্য ও কাজটা স্থগিত রাখা হয়েছে। মিছামিছি হাঙ্গামা করে লাভ নেই আজ। সকলে বড়ো ব্যস্ত।

গণেশের কুর্তার পকেটে এক টুকরো কাগজে পেনসিল দিয়ে ইংরেজিতে লেখা একটা ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। জেমস স্ট্রিটের একজন এল ক্যামাবনের ঠিকানা। অনেক বলে বলে ওখানে ওসমান একটা টেলিফোন করাতে পেরেছিল। ক্যামারন কিছুই জানে না। বর্ণিত মৃতদেহ তার কোনো জানা লোকের নয়। না, কোনো মালের সে অর্ডার দেয়নি, কোনো মাল তার কাছে পৌঁছবার কথা ছিল না।

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল একবার এসে খবর নিয়ে যাবে। এক আত্মীয়কে মৃত রেখে, অজানা রেখে যেতে হচ্ছে মনে হয় ওসমানের। হাসপাতালে আসবার সময়ও ভেতরে ক্ষীণ একটু প্রাণ ছিল ছেলেটার, বাইরে যার কোনো লক্ষণ ছিল না। খানিক পরেই জীবন শেষ হয়ে যায়, নিঃশব্দে, চুপিচুপি। ওর আসল আশ্চর্য মরণ ঘটেছিল রাস্তায় তার কাছে, মাথায় গুলি লাগার পরেও দাঁড়িয়ে থেকে, কথা বলে, হঠাৎ দ্রুতগতিতে নির্জীব নিঝুম হয়ে ঢলে পড়ে। একটি কাতরানির শব্দ বার হয়নি মুখ দিয়ে। একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়নি মারাত্মক আঘাত লাগার, অসহিষ্ণু উদ্‌বেগের সঙ্গে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিল, ওরা এগোবে না ? তখনও তো ওসমান জানত না জীবন ওর শেষ হয়ে এসেছে, এ জগতে আর কোনো কথাই সে জিজ্ঞাসা করবে না কাউকে, এগোতে গিয়ে বাধা পেয়ে যারা থেমেছে তারা এগোবে কিনা জানতে চাইবে না। মাথায় গুলি লাগার জন্য হয়তো এ রকম হয়েছে, মস্তিষ্কের একটা অংশ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোকরা ডাক্তারটি তার বর্ণনা শুনে যা বললেন, হয়তো তাই হবে, ওসমানের জানবার কৌতূহল নেই। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই মরণ। নিকট-আত্মীয়কে হয়তো সে ভুলে যাবে, অদ্ভুত মরণের স্মৃতির মধ্যে ছেলেটি চিরদিন বাস করবে তার মনে। নিজের মরণের দিন পর্যন্ত সে ভুলতে পারবে না ছেলেটির ব্যাকুল প্রশ্ন : ওরা এগোবে না ?

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার দেখা হয় রসুল আর শিবনাথের সঙ্গে। রসুলের ডান হাতে ব্যান্ডেজ, রক্তক্ষরণের ফলে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বসে বসে বোকার মতো, গোঁয়ারের মতো রক্ত নষ্ট করার জন্য শিবনাথ এখনও তাকে অনুযোগ দিচ্ছিল।

ওসমান ওদের চিনতে পারে দেখা মাত্র, কিন্তু নিজে যেচে কথা বলতে তার বাধো বাধো ঠেকে। ওরা তার ছেলের বন্ধু ছিল, হাবিবের বাপ বলে তাকেও চিনত, এই পর্যন্ত। ট্রামের কন্ডাক্টর বলে চিনত। ছেলে আজ নেই, তারও কারখানার মজুরের পোশাক। কথা বলতে গেলে হয়তো দুটো এলোমেলো খাপছাড়া কথাই হবে, অর্থহীন অস্বস্তিকর সে আলাপে কাজ কী ! ওসমানের নিজের কিছু আসে যায় না তাতে, কিন্তু ওদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই।

শিবনাথ চিনতে পেরে প্রথমে বলে, আপনি এখানে ?

রসুল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, এখন হাসপাতালে কী করছেন সাব ? আপনার কেউ কি—?

একটি ছেলের সঙ্গে এসেছিলাম। মাথায় গুলি লেগেছিল, মারা গেছে। ওসমান একটু ইতস্তত করে যোগ দেয়, আমার কেউ নয়। পাশে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ—

বাড়ি যেতে মুশকিল হবে।

পা আছে।

তা আছে বটে।

রসুলের হাতে কী হয়েছে সব যেন জানে ওসমান এমনিভাবে জিগ্যেস করে, হাতটা বাঁচবে তো ?

কী জানি। সন্দেহ আছে।

ইস। ডান হাত।

কথা বলতে বলতে তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। কত রোগ আঘাত যাতনা মৃত্যু শোক দুঃখ হতাশা ভরা হাসপাতালের এলাকা, হৃদয় ভারী তিনজনেরই। তবু তারা সহজভাবেই কথা কয়, জীবন্ত মানুষের যেন জীবনের অকারণ অর্থহীন অভিশাপগুলির জন্য বিচলিত হতে নেই, ব্যাকুল হতে নেই, ব্যথাও পেতে নেই !

রসুল একরকম কথাই বলছিল না, হঠাৎ থেমে গিয়ে সে শিবনাথকে বলে, শরমের কথা ভাই, কিন্তু আর পারছি না। অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগেই—

ওসমান ও শিবনাথ দুপাশ থেকে ধরে তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে বসিয়ে দেয়, নিজে বসে ওসমান তার মাথাটা বুকে টেনে এনে নিজের গায়ে তাকে হেলান দেওয়ায়।

তুই এক নম্বর আহম্মক রসুল।—শিবনাথ বলে গায়ের চাদরটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে।

ওসমান বলে, এ রকম আহম্মক কম মেলে। ভেবেছিল কারও হাঙ্গামা না বাড়িয়ে কোনোমতে বাড়ি পৌঁছে যাবে। হাবিব বলত, নিজের অসুখ হলে রসুল লজ্জা পায়।

তাই তো ছোঁড়াকে সবাই এত ভালোবাসে।

রসুল আপশোশ করে বলে, এত রক্ত বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। তাহলে কি এক লহমা দেরি করি হাসপাতালে আসতে, নিজেই আসতাম।

রসুল হাসপাতালেই থেকে যায়। ওসমান ও শিবনাথ যখন রাস্তায় নামে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, জনহীন স্তব্ধতায় রাত্রিকে যেন ধরা ছোঁয়া যেতে পারছে।

শিবনাথ চিরকাল বাইরে ধীর শান্ত ছেলে, সহজ ও সাধারণ। কখনও কোনো বিষয়ে কেউ তাকে আত্মহারা হতে দ্যাখেনি, যা কিছু ঘটছে বর্তমানে চোখের পলকে তার ভবিষ্যৎ অনুমান করে নিয়ে সে যেন তদনুসারেই যা করা উচিত তাই করে যায়—সব রকম সহজ বা কঠিন সামান্য বা গুরুতর কাজ। কোনো কাজেই তার পরোয়া নেই, সভায় বক্তৃতা করা থেকে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসার কাজ পর্যন্ত—আহত রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কাজও। যে কাজ দেওয়া হোক সে করবে প্রাণ দিয়ে, কিন্তু এক রকমের এক ধরনের কাজে তার মন ওঠে না। ওখানে ওই গুরুতর পরিস্থিতিতে সে অনায়াসে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে, তারপর আর দরকার না থাকায় কাজ পালটে দায়িত্ব নিয়েছে রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার। ফিরে গিয়ে হয়তো চা এনে দেবার ব্যবস্থা করবে শীতে যারা রাস্তা কামড়ে বসে আছে খোলা আকাশের নীচে তাদের জন্য।

না, চায়ের ব্যবস্থা করবে না, ওসমান ভাবে লজ্জিত হয়ে। ও রকম উদ্ভট কাজ শিবনাথ করে না। সহজ স্বাভাবিক কাজই সে করে। ফিরে গিয়ে সে কী করবে ওসমান জানে না।

শিবনাথের কথা সে শুনেছে রসুলের কাছে। সব জায়গায় সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার ওর নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা, কেবল বাইরে নয়, বাড়িতে পর্যন্ত। বাইরের এ সব কাজ ওর বাপদাদা

পছন্দ করে না, কিন্তু সংসারে সব বিষয়ে ওর পরামর্শ নিয়েই নাকি চলে তারা, বিয়ের ব্যাপার থেকে অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার কী ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে পর্যন্ত।

শিবনাথের কথা শুনে ওসমানের মনে হয়, ঠিক কথা, ছেলেটা ওই রকমই, সন্দেহ নেই। ঘটন অঘটনে ভরপুর গভীর রাত, স্তব্ধ বিষণ্ণ পথে চুপচাপ পথ চলাই ছিল খাপসুরত। ছেঁড়া কিছু জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুঁটলির মতো ফুটপাতে শুয়ে আছে মানুষ, মাংসের বন্ধ দোকানটার সামনে তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে ঘেয়ো কুকুর। কোনো কি দরকার ছিল শিবনাথের কথা বলার। কিন্তু কথা যখন সে বলল, ওসমানের মনে হল, এ রকম কথা না বলে মুখ বুজে তার সঙ্গে পথ চললে ভারী অন্যায় হত শিবনাথের।

রসুলের মতো ছেলে পাওয়া ভার। ডান হাতটা গেল, আপশোশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করেছে ডান হাতটা গেলেও বাঁ হাত দিয়ে কী করে সব কাজ চালিয়ে নেওয়া চলবে। রসুল আমার ভাইয়ের মতো।

কী লাগসই কথাটাই বলল শিবনাথ তার মনের কথার সঙ্গে মানিয়ে। এই রকম কথা বলার জন্যই যে উন্মুখ হয়েছিল ওসমান, তা কি জেনেছে শিবনাথ ?

ওসমান বলে, রসুল আমার ছেলেব মতো।

ওসমানের কথার গতি ধরতে না পেরে শিবনাথ চুপ করে থাকে।

ওসমান বলে, সাচ্চা ছেলে, তবে দোষ ছিল একটা। ভাবত কি, রাজা বাদশা খানসাবরা গরিবের দুঃখ ঘোচাবে, বাবুরা বেহেস্ত বানিয়ে দেবে ওদের জন্য। রোজ বাধত হাবিবের সাথে, ঘরে থাকলে আমি শুনতাম চুপচাপ। একদিন হাবিবকে বলেছিলাম, যে শুনবে না বুঝবে না তার সাথে অত কথায় কাজ কি ? হাবিব বলেছিল, ভেতরটা সাচ্চা আছে, ও ঠিক বুঝবে একদিন, এ সব ছেলে যদি না বোঝে না বদলায় তবে কে বুঝবে, কে বদলাবে ?

নীরবে কয়েক কদম হাঁটে ওসমান, রসুল বদলে গেছে। হাবিবের কাজ এটা। হাবিব থাকলে খুশি হত। ওর মধ্যে হাবিব বেঁচে আছে মালুম হল। ছেলের মতো মনে হল ওকে।

সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এতটুকু আনমনা মনে হয় না অনুরূপাকে, তার কোমল ভীরু হাসিটি বারবার দেখা দেয় মুখে, কিন্তু ক্ষীণ একটা অস্বস্তি তিনি অনুভব করেন। এখনও ফিরল না কেন হেমন্ত ? দুটো বাজল বড়ো ঘড়িটায়। কলেজ থেকে সে সোজা বাড়ি চলে আসে, কোনো কারণে ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে যাবার সময়েই বলে যায়, নয়তো বাড়ি ফিরে এসে আবার বার হয়। আজ তো কলেজও নাকি হয়নি। সরকারি কলেজ হেমন্তের, সেখানে ক্লাস যদি বা হয়েই থাকে পুরোপুরি, অনেক আগেই হেমন্তের ফিরে আসা উচিত ছিল আজ।

আধঘণ্টার মধ্যে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে গান শেখাতে। তার আগে কি ফিরবে না হেমন্ত ?

দোকান থেকে চা আনিয়ে দেন অভ্যাগতাদের, অপরাধীর মতো বলেন, দোকানের চা-ই খেতে হবে, ঘরে চিনি নেই।

তাতে কী হয়েছে।

সবারই এক অবস্থা, বাড়িতে কেউ এলে আমিও দোকান থেকে চা আনিয়ে দি, কী করব, নিজেদেরই কুলোয় না।

আমি কিন্তু বাড়তি চিনি পাই। একটাকা সের নেয়, কিন্তু কী করব তাই কিনি, চিনি নইলে তো চলে না। একটা দোকান আছে, তেল আর চিনি দুই-ই পাওয়া যায়। সকলকে দেয় না, দোকানিরও তো ভয় আছে। জানা লোক গেলে দেয়।

আমিও পাই চিনি, মাসের গোড়ায় দু-তিনবার আধসের করে এনে জমিয়ে রাখি, একবারে বেশি দেয় না। একটাকা সের পান আপনি ? আমার কাছে পাঁচসিকে নেয়।

ও রকম তো পাওয়াই যায়, অনুরূপা বলেন, আমি আনাই না। কেমন খারাপ লাগে। ব্ল্যাকমার্কেটকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো ওতে। তাছাড়া বড়ো ছেলে যদি টের পায়—

অনুরূপা ভাবে, দ্যাখো, ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে কী খাপছাড়া কথা বলে ফেললেন। দুটি মুখ ভার হয়ে গেল তার কথায়। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্য মৃদু আপশোশের সঙ্গে আর একটা খুশির চিন্তাও মনে আসে অনুরূপার। বলেই যখন ফেলেছেন তখন আর উপায় কী, হেমন্ত শুনে মজা পাবে, খুশি হবে। হেমন্ত খেতে বসলে বেশ করে সাজিয়ে বলতে হবে গল্পটা তাকে।

কবে যে অবস্থা একটু ভালো হবে।

সত্যি, যুদ্ধ থামল কবে, ভাবলাম যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। অবস্থার উন্নতি হল ছাই, দিন দিন আরও যেন খারাপ হচ্ছে। দ্যাওরের চাকরিটা যাবে সামনের মাসে। আবার এসে ঘাড়ে চাপবে সবাইকে নিয়ে। তিন বছর ছিল না, অন্য সময় হলে কিছু পয়সা জমত হাতে, যুদ্ধের বাজারে তাও পারলাম না। উনি গুঁইগাঁই করছিলেন, আমি স্পষ্ট কথা লিখিয়ে দিয়েছি, যে দিনকাল, আমরা আর পারব না। পারা কি যায়, আপনারাই বলুন ?

আমার তো মেজো সেজো দুটি ছেলেই নোটিশ পেয়েছে। মাথা ঘুরে গেছে ভাই ! বড়ো জন তো একরকম ভিন্নই, দিল্লিতে থাকে, দশখানা চিঠি দিলে একখানারও জবাব দেয় কি দেয় না।

ভয় ও হতাশা উদ্যত হয়েই ছিল দাঁড়ানো কুয়াশার মতো, অতি মন্দ বাতাসের মতো অতি মৃদু এই আলোচনাকে আশ্রয় করে গড়িয়ে আসে ঘরে। অনুরূপা ঢোঁক গেলেন। গলাটা শুকনো মনে হয়, খুশখুশ করে। গলায় যদি কিছু হয় তার, গাইবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো কারণে— হেমন্ত লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠবার আগে ! কত গায়ক গায়িকার অমন গিয়েছে। গান শেখানোও ঝকমারির কাজ। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এমন অত্যাচার চলে গলার ওপর। গান শেখানোর কাজ ছেড়ে দেবেন একটা দুটো বাড়ির ? কিন্তু তাহলে কি চলবে তাঁর সংসার, হেমন্তের পড়ার খরচ ?

গান শোনাবেন একখানা ?

গান ? অনুরূপা তাঁর ক্ষীণ কোমল হাসি হাসেন, গান গেয়ে শোনাবার গলা কি আর আছে ? গান শিখিয়ে শিখিয়েই গলা গেছে। গাইতে পারি না আর।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা বিদায় নেয়। অনুরূপা জানেন ওদের মনের ভাব : একটু গাইতে জানলে, একটু নাম হলে, এমনই অহংকার হয় মানুষের। গলাকে বাড়তি এতটুকু পরিশ্রম করাতে তাঁর যে কত কষ্ট, কত ভয়, ওরা তার কী বুঝবে !

জয়ন্ত বলে, এবার যাব মা খেলতে ?

এতক্ষণ যাওনি কেন ?

জিজ্ঞাসা করা বৃথা, অনুরূপা জানেন। বাড়িতে লোক এলে এ ছেলে ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, বসে বসে বুড়িদের আলাপ শুনতে পর্যন্ত কী যে ভালো লাগে তেরো বছরের ছেলের !

যাও। দূরে যেয়ো না কিন্তু। শিগগির ফিরবে।

রমাও বাড়ি নেই, শান্তাদের ওখানে গেছে। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে নতুন গানটি সেধে রাখবে বলেছে। অন্যের মেয়েকে নটা পর্যন্ত গান শিখিয়ে বাড়ি ফিরে তখন অনুরূপা নিজের মেয়ের গান কেমন তৈরি হল শুনতে পাবেন। তবে, গানের পেছনে বেশি সময় রমার না দিলেও চলে। মোটামুটি ও যা শিখবে তাই যথেষ্ট। ওকে খুব ভালো করে শেখালেও গানে ও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবে না, গানের ধাত নয় ও মেয়ের। অনুরূপা একটা নিশ্বাস ফেলেন। খালি বাড়িতে নিজেকে কেমন শ্রান্ত,

অবসন্ন মনে হয়। সাড়ে ছটা বেজে গেছে কিন্তু গভীর আলস্যে উঠতে ইচ্ছা করছে না আজ। হেমন্ত ফিরে এলে হয়তো আলস্যটা কেটে যেত, জোর মিলত উঠে গিয়ে ছড়া বলার গলা বা সুরজ্ঞান পর্যন্ত নেই যে মেয়ের, নিজের গলার আওয়াজ শুনেই ভাব লেগে যে মেয়ের খেয়াল থাকে না সুর কোথা গেল, তাদের গান শিখিয়ে আসতে !

এই রকম সময়ে, ছেলে বা মেয়ে যখন কাছে থাকে না কেউ, কেমন আর কীসের অজানা সব শঙ্কার ছায়াপাতে হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অনুরূপার। নিরাপত্তার জন্য নিজেকে একরকম ছেঁটে ফেলেছেন, সহজ ও সীমাবদ্ধ করে এনেছেন জীবন ও জীবনের পরিধি, যেমন চেয়েছেন তেমনি দিন চলছে শান্তিতে, ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠছে মনের মতো। কোথা থেকে তবে এত সংকেত আসে বিপর্যয়ের, বিভ্রাটের, বিপদের ? কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে অনুরূপার ভীরু বুক ? পৃথিবী জোড়া যুদ্ধ তাকে বিচলিত করেনি। সে যুদ্ধের যত ধাক্কা এসে লাগুক তার ঘরে, সে অসুবিধা, শুধু টানাটানি, কষ্ট করার ব্যাপার--বোমার ভয়ের দিনগুলিও তাকে এমন সচকিত করে তুলতে পারেনি। মনে হয়েছে ওসব দূরের বিপদ—বহু দূরের। তাদের চারটি প্রাণীর ছোটো নীড়টিতে ও বিপদের ছোঁয়াচ লাগবে না। কিন্তু এ বিপদ যেন বাতাসের গুমোটের মতো, মাথার উপরের আকাশে ঘন কালোমেঘের মতো ঘনিয়ে আসছে অনুভব করা যায়। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মনে হয়, সব খবরের আড়ালে যেন দুরন্ত ক্ষোভ গুমরাচ্ছে মানুষের, পথে ঘাটে লোকের কথা শুনলে মনে হয় সব চিন্তা একদিকে গতি পেয়েছে মানুষের, চারিদিকে সভা আর শোভাযাত্রায় সেই চিন্তা ফেটে পড়ছে হাজার কণ্ঠের গর্জনে। প্রতি মুহূর্তে ঘরে বাইরে চেতনায় যা ঘা দিচ্ছে, জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর সঙ্গে যা জড়িয়ে গেছে, তা কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে ঘরের নিরাপদ সুখশান্তি অব্যাহত রাখতে চেয়ে ?

রমা ফিরে আসে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে।

বেরোও নি তো ? বেশ করেছ। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। জানো মা, ট্রাম চলছে না। ওদিকে খুব হাঙ্গামা চলছে, পুলিশ নাকি গুলি চালিয়েছে—কী ভাবছ মা ?

কিছু না। হেমা ফেরেনি এখনও।

ও। দাদার জন্য ভাবছ ? রমা হালকা সুরে বলে, দাদা কস্মিনকালে ও সবের মধ্যে যায় না, যাবেও না। কোথায় গেছে, এখুনি এসে পড়বে। দাদার জন্য ভেবো না।

রমার কথা আর কথার সুর আঁচড় কাটে অনুরূপার কানের পর্দায়। রমার গলায় তার দাদার সম্বন্ধে অবজ্ঞার সুর শোনা যাবে, এই বিপদের আশঙ্কাও বুঝি তার ছিল !

না, ভাবনার কী আছে। গানটা ভালো করে শিখবি রমা ? কাপড় ছেড়ে আয়।

রমাকে বিপন্ন দেখায়। তার মুখে দারুণ অনিচ্ছা।

আজ থাক গে। গানটান শিখতে আজ ইচ্ছে করছে না মা।

তবে থাক।

জয়ন্ত ফিরে আসে আরও বেশি উত্তেজনা নিয়ে। যত কিছু সে শুনে এসেছে বাইরে থেকে সব অনুরূপাকে শোনায়। তারপর এক মারাত্মক প্রস্তাব করে।

একটু দেখে আসব মা ? একটুখানি ? দূর থেকে একটু দেখেই চলে আসব। যাব ?

না।

কী হয় গেলে ? এসে পড়তে বসব।

আজ পড়তে হবে না। আজ তোর ছুটি। মুখহাত ধুয়ে আয়, গল্প বলব একটা।

বানানো গল্প ভালো লাগে না মা।

বানানো গল্প ভালো লাগে না ! এতটুকু ছেলে তার আজ সে রকম গল্প চাই, যা ধরাছোঁয়া দেখাশোনা যায়।

রাত বাড়ে, হেমন্ত আসে না। অনুরূপা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন সদরের কড়া নাড়ার শব্দের জন্য। অস্বস্তি তাঁর উদ্‌বেগে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রমার মনেও ভাবনা ঢুকেছে।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়লে অনুরূপা বলেন, আমি একটু খোঁজ করে আসি রমা।

কোথায় খোঁজ করবে এত রাত্রে ?

সীতার কাছে যাই একবার। ওদের বাড়ি টেলিফোনও আছে।

সীতা সবে বাড়ি ফিরেছিল। হেমন্তকে বিদায় দিয়ে নেয়ে খেয়ে সেও বেরিয়ে গিয়েছিল। মনটা নাড়া খেলেও খাওয়ায় অরুচি জন্মানোর শখ তার নেই। তার বেশ খিদে পায় এবং সে খায়। তারপর আর কিছু খাওয়ার অবসর পায়নি এ পর্যন্ত। খাওয়ার ইচ্ছাটা মরে গেছে আজকের মতো। চেনা অচেনা প্রিয়জনের আঘাত ও মরণ নাড়া দিয়েছে মনটাকে, সে তো আর ব্যক্তিগত দুঃখের কাব্য নয়। ক্ষোভ ছাড়া কোনো অনুভূতিই তার নেই, যার আগুনে আরও শক্ত ও দৃঢ় হয়ে গেছে তার মন ও প্রতিজ্ঞা।

হেমন্ত ? বাড়ি ফেরেনি ?

সভায় একবার চোখে পড়েছিল হেমন্তকে। সেখানে তার উপস্থিতিকে বিশেষ মূল্য সে দিতে পারেনি। তার সঙ্গে তর্ক করার উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই হয়তো সে সভায় এসে দাঁড়িয়েছে মনে হয়েছিল সীতার। তারপর হেমন্তের কথা আর তার মনে পড়েনি। আর অবসর হয়নি তার কথা মনে পড়ার, ভালোও লাগেনি তার কথা ভাবতে। হেমন্তের সম্বন্ধে আশা-ভরসা কিছু আর রাখা চলে না এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর। অন্যদিন জীবনের সাধারণ কাজ ও ঘটনার মধ্যে ভুলতে পারত না, দুঃখ ও ক্ষোভটা নেড়ে-চেড়ে খাপ খাইয়ে নিতে হত সচেতন প্রচেষ্টায়, আজ নিজের সুখ-দুঃখের কথা মনের কোনায় উঁকি দেবারও অবসর পায়নি। দুঃখবেদনা হতাশার ওই স্তরটাই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে।

অনুরূপার জন্য সে মমতা বোধ করে না। তার মনে হয়, মাতৃস্নেহের এই বিকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে সহানুভূতি দেখালে অন্যায় করা হবে। অনুরূপার মুখে উদ্‌বেগের ছাপটা স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে সে একটু আশ্চর্য হয়। কিন্তু অত বড়ো ছেলে সন্ধ্যা রাতে বাড়ি ফেরেনি বলে পাগল হয়ে খোঁজ করতে বার হবার মধ্যেই উদ্‌বেগ প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট, মুখের ভাব যতই শান্ত থাক। গুলির মুখে ছেলে পাঠিয়ে কত মা বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছে ধৈর্য ধরে, ছেলের বেড়িয়ে ফিরতে দেরি হলে এঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এর জন্যই হয়তো এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে হেমন্ত, অতি আহ্লাদি ছেলেরা যা হয়।

কোথায় গেছে, আসবে। সীতা উদাসভাবে বলে।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?

ও বেলা একবার এসেছিল বারোটা-একটার সময়।

তার কাছে অনুরূপা খোঁজ নিতে এসেছে হারানো ছেলের ! পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তার কাছে ! কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হয় সীতার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা আগামীদিনের জীবনের পরিকল্পনায় তাকেও তবে ওরা মায়ে-ব্যাটায় হিসাবের মধ্যে ধরে রেখেছে ? এমন হাসি পায় সীতার কথাটা মনে করে। অনুরূপা জানেন, মনে মনে অন্তত এই ধারণা পোষণ করেন যে সীতা দুদিন পরে তার ছেলের বউ হয়ে তার বাড়ি যাবে। ছেলের ভাব দেখে তিনি অনুমান করে নিতে পেরেছেন এই মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে, তাই থেকে একেবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি। তার এত ভালো ছেলে, এমন উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ, সীতার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঠাঁইও পায়নি তার।

এবার সীতা বুঝতে পারে অনুরূপার মুখে উদ্‌বেগের দুর্ভাবনার চিহ্ন জোরালো হয়ে ফোটেনি কেন। ভাবী বউয়ের সঙ্গে তিনি ভাবী শাশুড়ির মতো আচরণ করেছেন। ভয়ে-ভাবনায় সীতা কাতর

হয়ে পড়বে, তাকে ভড়কে দেওয়া তার উচিত নয়। সীতাকে ভরসা দেবার, তার মনে সাহস জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই !

সীতার নির্লিপ্তভাব তাই তাকে রীতিমতো ক্ষুণ্ণ করেছে, আঘাতও করেছে।

গম্ভীরমুখে রীতিমতো অনুযোগের সুরে অনুরূপা বলেন—

না জানিয়ে কোনোদিন বাড়ি ফিরতে দেরি করে না সীতা। বুঝে উঠতে পারছি না কী হল।

সীতার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু হাসির রেখাও তার মুখে ফুটল না। সে নিজেও জানত না মনের এ ভাবটা এত ক্ষণস্থায়ী হবে। ক্ষণিকের একটু আমোদ বোধ করে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়, নাড়া খায় গভীরভাবে। হেমন্তের অনেক অন্ধতা, অনেক কুসংস্কার, অনেক দুর্বলতার মানে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হেমন্তের দোষ নেই। এমন যার মা, আঁতুর থেকে আজ এত বয়স পর্যন্ত যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই মা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, তার হৃদয়-মনের গঠনের ত্রুটির জন্য সে নিজে কতটুকু দায়ি। এটুকু সীতা জানে যে শৈশবে মনের যে গঠন হয় জীবনে তার আর পরিবর্তন হয় না। সজ্ঞান সাধনায় পরবর্তী জীবনে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে নূতন ধারা আনা যায় আপসহীন অবিশ্রাম কঠোর সংগ্রামের দ্বারা। নিজের সঙ্গে লড়াই করার মতো কষ্টকর, কঠিন ব্যাপার আর কি আছে জীবনে। বুদ্ধি দিয়ে যদি বা আদর্শ বেছে নেওয়া গেল, কর্তব্য ঠিক করা গেল, সে আদর্শ অনুসরণ করা, সে কর্তব্য পালন করা যেন ঝকমারি হয়ে দাঁড়ায় যদি তা বিরুদ্ধে যায় প্রকৃতির। ইন্টেলেকচুয়ালিজমের ব্যর্থতার কারণও তাই। বুদ্ধির আবিষ্কার, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কাজে লাগানোর চেয়ে অন্ধ অকেজো ভালোলাগা ও পছন্দকে মেনে চলা অনেক সহজ, অনেক মনোরম। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাই অধঃপতন এত বেশি। এত বেশি হতাশা। কথার এত মারপ্যাঁচ। এত ফাঁকিবাজি। বিশ্বাসের এমন নিদারুণ অভাব !

সীতা বলে, মাসিমা, ছেলে আপনার কচি খোকা নেই।

আমার কথাটা তুমি বুঝলে না সীতা। আমার ভয় হচ্ছে, ও তো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েনি ? কিছু হয়নি তো ওর ?

সীতা এবার না হেসে পারে না, যদিও সে হাসিতে দুঃখ ও জ্বালাই প্রকাশ পায় বেশি : হেমন্ত কোন হাঙ্গামার ধারে কাছে যাবে !

এটা তুমি কী কথা বললে ? অনুরূপা বলেন আহত মাতৃ-গর্বের অভিমানে, ছমাস এক বছর আগে বললে নয় কোনো মানে হত। হেমা যে কী ভাবে বদলে যাচ্ছে তুমিও তা লক্ষ করোনি বলতে চাও মা ? আমার তো বিশ্বাস হয় না ও কথা ! ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা এসেছে কিছুদিন থেকে। আমি জানি সেটা কীসের অস্থিরতা, ওর কী হয়েছে। তুমিও দায়ি এর জন্য।

আমি ?

তুমি। তুমি দায়ি। তুমি কি বলতে চাও, তুমি টেরও পাওনি হেমা কী ভাবে ছটফট করছে, বদলে যাচ্ছে ?

অনুরূপার অনুযোগে সত্যই খটকা লাগে সীতার মনে, মনে পড়ে আজ সে হেমন্তকে সভায় দেখেছিল। হয়তো নিছক খেয়ালের বশে সভায় যায়নি হেমন্ত। হয়তো নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতির তাগিদেই সভায় যেতে হয়েছিল তাকে, নবজাগ্রত প্রশ্ন ও সংশয়গুলির নির্ভুল বাস্তব জবাব খুঁজে পাবার কামনায়। আত্মপ্রীতির জেলখানার প্রাচীরে হয়তো সত্যই চিড় খেয়েছে হেমন্তের। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকেই সে যে চলে গিয়েছিল সভা ছেড়ে বিরক্ত হয়ে তাও তো জানা নেই সীতার। শেষ পর্যন্ত চলে হয়তো যেতে পারেনি, শোভাযাত্রায়ও হয়তো যোগ দিয়েছিল। প্রাণ তুচ্ছ করা অভিযানে সে যে অংশগ্রহণ করেনি তাই বা কে জানে !

ভাবতেও এমন অদ্ভুত লাগে সীতার ; নিজের মত সমর্থনের জন্য আজই হেমন্ত আরও বেশি রকম ভোঁতা, বেশি রকম সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা তবে তার কাছে নিজের দুর্বলতা আড়াল

করবার চেষ্টা। ভেতরে লড়াই চলছে বলে, পুরানো বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে বলে, বাইরে এমন অন্ধ একগুঁয়েমির সঙ্গে হার মানার অপমান এড়িয়ে চলতে হবে ! তার কাছে কি কোনোদিন নিজের ভুল স্বীকার করবে হেমন্ত ? পারবে স্বীকার করতে ? নিজের জন্য জয়ের লোভ নেই সীতার। তার কাছে শেষ পর্যন্ত হেমন্ত হার মানল এ সুখ সে চায় না। ভুল বুঝতে পেরে সেটা মেনে নেবার সাহস তার আছে, নতুন সত্যকে চিনতে পারলে সেটাকে গ্রহণ করার ছেলেমানুষি লজ্জা তার নেই, এটুকু জানলেই সে খুশি হবে।

অনুরূপাকে বসিয়ে সীতা নিজেই কয়েক জায়গায় টেলিফোন করে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সে হাসপাতালে সাড়া পায় শিবনাথের। শিবনাথ আহতদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছিল।

কার কথা বলছ ? হেমন্ত ? শিবনাথ বলে, হ্যাঁ হেমন্ত এখানে আছে।

সীতা মনে মনে বলে, সর্বনাশ !

ওর খবর কি ?

সামান্য লেগেছে, বিশেষ কিছু নয়। ড্রেস করে দিলেই বাড়ি যেতে পারবে।

হেমন্ত শোভাযাত্রায় ছিল ?

ছিল।

গুলি চলবার সময় ছিল ?

আগাগোড়া ছিল।

আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে।

কেন ? আশ্চর্য হবার কী আছে ? ওর রক্ত কি গরম নয় ?

তর্ক দিয়ে ছাড়া রক্ত গরম করার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিল। ওকে বলবে, তাড়াতাড়ি যেন বাড়ি চলে যায়। ওর মা খুব উতলা হয়ে আছেন।

অনুরূপা প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, না না, ও কথা বলতে বোলো না সীতা ! বারণ করে দাও। আমার কথা কিছু বলতে হবে না।

শিবনাথ, ছেড়ে দাওনি তো ? শোনো হেমন্তকে ওর মার কথা কিছু বোলো না। শুধু বোলো আমি টেলিফোন করেছিলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলেছি।

হেমন্ত জানুক, সীতা সব জেনেছে, বুঝতে পেরেছে। ও বেলার তর্কটা তাদের বাতিল হয়ে গেছে একেবারে।

অনুরূপা মোহগ্রস্তার মতো বসে থাকেন। ছেলে নিরাপদ আছে জানার পর এতক্ষণে তাঁর মুখ থেকে রক্ত সরে যাবার কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারে সীতা। দ্বিধা-সংশয়ের দিন পার হয়ে গেছে হেমন্তের। সব রকম হাঙ্গামা থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থদুষ্ট হীনতাকে আর সে প্রশ্রয় দিতে পারবে না। সে শুধু মনে মনে এটা করেনি স্থির, একেবারে হাতে নাতে বিদ্রোহ করেছে। সুখের রঙিন স্বপ্ন মুছে যাবার সম্ভাবনায় মুখের চেহারাও তাই বিবর্ণ হয়ে গেছে অনুরূপার।

আপনি অত ভাবছেন কেন মাসিমা ?

ভাবব না ? তোমার নয় খুশির সীমা নেই, হেমন্ত এবার থেকে লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে মিটিং করে বেড়াবে, জেলে যাবে, দেশোদ্ধার করবে। আমার অবস্থাটা বুঝে দেখেছ একবার ? আমার কত আশা-ভরসা হেমন্তের ওপর। তুমি যে আমার কী ক্ষতি করলে শুধু ভগবান জানেন।

আমায় শেষে দায়ি করলেন মাসিমা ? সীতা বলে আশ্চর্য ও আহত হয়ে, ছেলেমানুষি ভুল করলেন একটা। আমার সঙ্গে মেশার জন্য আপনার ছেলে বদলায়নি। অতবড়ো গৌরব দাবি করবার অধিকার আমার নেই। হেমন্ত নিজেই বদলেছে, স্বাভাবিক নিয়মে। দেশের এই অবস্থা, এটা বুঝতে পারেন না যে সব কিছুর মধ্যে এ দেশে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, ছোঁয়াচ-বাঁচিয়ে চলতে হলে তাকে

তালা বন্ধ করে রাখা দরকার ? শত শত আঘাত এসে ওকে সচেতন করে তুলবে, সামলাবেন কী করে ? স্বাধীনতার প্রেরণাই ওকে জাগিয়েছে, দেশপ্রেমের আলোই ওকে পথ দেখিয়েছে। আপনার কথা সত্যি, আমি পেরে থাকলে আমিই নিজেকে কৃতার্থ ভাবতাম মাসিমা। কিন্তু তা হয়নি। আমি তো তুচ্ছ, নেতাও কি মানুষকে জাগাতে পারেন ? মানুষের মধ্যেই জাগরণ আসে, নেতা শুধু তার প্রতিনিধিত্ব করেন।

সীতা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, আপনার আপশোশের কারণটাও মাথায় ঢুকছে না আমার। দেশের জন্য দশের জন্য ছেলে দুঃখ পেলে মার কষ্ট হয়, কিন্তু গৌরবও কি হয় না ?

তুমি বুঝবে না সীতা, অনুরূপা জ্বালার সঙ্গে বলেন, আমার মতো কষ্ট করে ছেলেকে যদি পড়িয়ে মানুষ করতে হত, তবে বুঝতে লেখাপড়ার ক্ষতি করে ছেলে ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে বসলে কেমন লাগে।

আপনি হেমন্তের ওপর অবিচার করছেন মাসিমা। ভুল করছেন।

কেন ?

হেমন্ত লেখাপড়ার ক্ষতি করবেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেই, এটা আপনি ধরে নিলেন কেন ? লেখাপড়ায় ভালো করা ওর কর্তব্য, তাতেই যদি অবহেলা করে, তবে তো ধরে নিতে হবে ওর অধঃপতন হল। দেশের কথা ভাবলে কি লেখাপড়া বাদ দিতে হয় মাসিমা ? কোথাও কিছু নেই, জেলেই বা হেমন্ত যাবে কেন শখ করে ? জেলে গেলেই কি কাজ হয় দেশের, দরকার থাক বা না থাক? হেমন্তেরও ঠিক এই রকম ধারণা ছিল, পড়লে শুধু পড়তেই হবে চোখকান বুজে, আর নয় তো সব ছেড়ে দিয়ে নামতে হবে রাজনীতিতে। মুক্তি-সংগ্রামে ছাত্রদেরও যে একটা অংশ আছে, সাধারণ অবস্থায় সে অংশগ্রহণ করা যে পড়াশোনার এতটুকু বিরুদ্ধে যায় না, বরং চরিত্র গঠনে আর মানসিক শক্তির বিকাশে সাহায্যই করে, এই সহজ কথাটা মাথায় আসে না কেন আপনাদের মাসিমা ?

তোমাদের মতো মাথা নেই বলে বোধ হয়।

মন শান্ত হলে আপনার রাগ কমে যাবে।

আমি না লড়েই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব ভেবেছ বুঝি ?

অনুরূপার কথার উগ্রতায় সীতা একটু আশ্চর্য হয়ে যায়, গভীর তীব্র বিদ্বেষে মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে অনুরূপার। নিরুপায়ের অন্ধ আক্রোশে তিনি যেন কাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন। হেমন্তকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাকে সুমতি দেবার জন্য তিনি কী লড়াই করবেন? ছেলেকে ভালো ছেলে করে রাখতে এতদিন যে লড়াই করে এসেছেন, তার চেয়েও জোরালো লড়াই? কিন্তু সে কথাটা বলতে গিয়েও এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ ফুটে উঠবে কেন তার কথায়, মুখের ভঙ্গিতে ?

সংশয়ের সঙ্গে সীতা জিজ্ঞেস করে, আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মাসিমা। কীসের লড়াই ? কী নিয়ে লড়বেন ? কার সঙ্গে ?

খুকি বুঝিয়ো না সীতা আমায়। পনেরো বছর হল স্বামীর আশ্রয় হারিয়েছি, সেই থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার চালিয়ে এসেছি, ছেলে-মেয়ে মানুষ করছি। তুমি আমাকে যত বোকা ভাবো অত বোকা আমি নই।

এবার সীতা বুঝতে পারে। জোরে এমন নাড়া খায় তার মনটা। খানিকক্ষণ সে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে অনুরূপার মুখের দিকে। অনুরূপাকে তুচ্ছ না ভাবা সত্যই অসম্ভব মনে হয়, তার।

বোকা আপনাকে কখনও ভাবিনি মাসিমা, আজ বোকা মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে লড়বেন বলছেন না কি ? আপনার বুদ্ধি সত্যি লোপ পেয়েছে। আমায় অপমান করুন তার মানে হয়, ও কথা বলে নিজের ছেলেকে কত বড়ো অপমান করছেন বুঝতে পারছেন না ? ছেলের আপনার নীতি নেই

আদর্শ নেই জীবনে, একটা মেয়ের খাতিরে নিজেকে সে চালাচ্ছে ? আমায় খুশি করার জন্য আপনার বিরোধিতা করতে যাচ্ছে, তার ব্যবহারের আর কোনো মানে নেই ? নিজের ছেলেকে এমন অপদার্থ কী করে ভাবলেন ? তাও যদি এতটুকু সত্যি হত কথাটা। আপনার মনের কথা আন্দাজ করলে হেমন্তেরই ঘেন্না ধরে যাবে জীবনে। একটা ভুল ধারণার বশে আমাকে হিংসা করে অশান্তি সৃষ্টি করবেন না মাসিমা। নিজেই জ্বলে পুড়ে মরবেন।

স্পষ্ট রূঢ়তার সঙ্গেই সীতা কথাগুলি বলে যায়, অনুরূপাকে রেয়াত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। কড়াভাষায় খোলাখুলি সোজাসুজি না বললে তার কথার মর্ম অনুরূপা গ্রহণ করতে পারবেন কি না, এ সন্দেহও তার ছিল। স্নেহের বাড়াবাড়ি মাকেও কোথায় নিয়ে যায় ভেবে বড়ো আক্ষেপ হচ্ছিল সীতার। এই সব মায়েরাই ছেলের বউ-প্রীতির জ্বালায় পুড়ে মরে, সব দিক দিয়ে গ্রাস করে রাখতে চায় ছেলেকে চিরকাল। স্নেহ যায় চুলোয়, বড়ো হয়ে থাকে শুধু বিকারটা। মায়ের স্নেহও যদি এমন সর্বনেশে হয়, সে কত বড়ো অভিশাপ মানুষের। তাও এমন মার, অন্তঃপুরের বন্দী জীবনে অন্ধ মমতা বিলিয়ে যাওয়াই শুধু যার কাজ নয়, একা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করে আসছে পনেরো বছর ধরে, বাঁচবার জন্য, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য। এমন বাস্তব যার জীবন, মা বলেই কি তার এতটুকু বাস্তববোধ জন্মায়নি ছেলেমেয়েদের বিষয়ে ? এমন জন্যই নিজেকে ছোটো করে মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না সন্তানের। তাই কি করতে হবে হেমন্তকে ? নইলে যে সমস্যা সৃষ্টি করবেন অনুরূপা, তার সমাধান করা কি সম্ভব হবে হেমন্তের পক্ষে !

কিন্তু অনুরূপা কি সত্যই ও রকম অশান্তি সৃষ্টি করবেন ? হেমন্ত পাশ করে মোটা মাইনের চাকরি করবে, এ আশা তো ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। অনিশ্চিত আশঙ্কাই শুধু পীড়ন করছে তাকে। শান্ত মনে সব কথা বিবেচনা করে দেখবার পরেও কি ছেলের দিকটা খেয়াল হবে না অনুরূপার, মনে হবে না অত বড়ো উপযুক্ত ছেলেকে চলাফেরা মতামতের এতটুকু স্বাধীনতা না দেওয়া পাগলামির শামিল ? স্নেহের শিকলে জোর করে হেমন্তকে হয়তো বেঁধে রাখা যাবে কিন্তু ফলটা তার ভালো হবে না মোটেই ?

অনুরূপার নিজের মুখে লড়াইয়ের উদ্ভট ঘোষণা শোনার পর এখনও যেন বিশ্বাস হতে চায় না সীতার যে, ব্যাপারটা তিনি সত্যসত্যই ও রকম কুৎসিত করে তুলবার জন্য কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগতে পারবেন।

অসহায়ের মতোই চুপচাপ বসেছিলেন অনুরূপা তার ধমকানির মতো কথাগুলি শুনে। তার নীরবতা বা বসে থাকা কোনোটার মানেই ধরতে না পেরে সীতা সংশয়ভরা চোখে তার দিকে তাকায়। নিজের শ্রান্তিও সে আবার অনুভব করে নতুন করে।

তোমার কথা শুনে একটু ভড়কে গেছি মা।

অনুরূপার ক্ষীণ ভীরুকণ্ঠ আশ্চর্য করে দেয় সীতাকে।

ভড়কে যাবেন কেন ?

অনুরূপা একটু ইতস্তত করে তেমনি শঙ্কিত সুরে অসহায়ভাবে বলেন, আমার ওপর রাগ করে হেমাকে ছেঁটে দেবার কথা ভাবছ না তো তুমি ? আমি না শেষকালে দায়ি হই।

এ কথায় অন্য সময় হাসি পেত সীতার, এখন এ আবেদনের করুণ দিকটাই তার মনে লাগে। তাকে ছেলের ভবিষ্যৎ বউ হিসাবে ভাবতে ভাবতে কল্পনাটা অনুরূপার জোরালো বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, হেমন্ত আর সে পরস্পরকে ভালোবাসে, সব ঠিক হয়ে আছে তাদের মধ্যে। এ বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ের লেশটুকু নেই অনুরূপার মনে। হেমন্তকে বিগড়ে দেবার জন্য মনে মনে তাকে স্থির নিশ্চিত ভাবে দায়ি করে খেপে উঠবার কারণ হয়তো তাই।

বিয়ে না হতেই শাশুড়ি-বউয়ের লড়াই !

একটা ব্রতের কথা মনে পড়ে সীতার। ছেলেবেলা মামাবাড়ি গিয়ে মামাতো বোন আর পাড়ার কয়েকটি ছোটো ছোটো মেয়েকে এই ব্রত করতে দেখেছিল। যমপুকুরের ব্রত—যুগ যুগ ধরে শাশুড়িরা ছেলের বউদের যত যন্ত্রণা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে কচি কচি মেয়ের ব্রতের বিদ্রোহ ! ব্রতের প্রচার কথাটা চমৎকার। বউ চায় এ ব্রত করতে, শাশুড়ি বলে, না। কাজেই মরে শাশুড়ি নরকে যায়। নরকের কষ্ট সয় না—ছেলের বউয়ের দয়ায় উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে কোনোমতে নরকের কষ্টও অনেক ভালো মনে করে প্রাণপণে সহ্য করতে চেয়েও সয় না। অগত্যা স্বপ্নে ছেলেকে বলে দিতে হয় যে করে হোক বউকে দিয়ে ব্রতটা করিয়ে আমায় উদ্ধার কর। বউ কম চালাক নয়, বলে, শাশুড়ি নেই এ ব্রত করতে যাব কেন মিছামিছি কষ্ট সয়ে উপোস করে ! এক গা গয়না দাও, দুধ ভাত খাওয়াও তবে করব ব্রত। ব্রত কথায় সে কি ঝাল ঝাড়া শাশুড়ির ওপর, আর তার মধ্যেই শাশুড়ির বউ নির্যাতনের কি অকাট্য প্রমাণ। শাশুড়ি হল খুইদিয়া দাই !

আলো আলো খুইদিয়া দাই, ধানতলা দিলি না ঠাঁই।
আলো আলো খুইদিয়া দাই, মানতলা দিলি না ঠাঁই।
আলো আলো খুইদিয়া দাই, কলাতলা দিলি না ঠাঁই।

ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়নি, তবু যেন অনুরূপা মরে না গিয়ে মোটাসোটা দেহটি নিয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকলেও নরক যন্ত্রণারই প্রতিকারে তাকে দিয়ে শাশুড়ি উদ্ধারের ব্রত পালন করিয়ে নিতে চান !

একটা কথা ভেবে সীতা স্বস্তি পায়। ছেলের দিকটা অনুরূপা বিবেচনা করবেন। এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ভাবে সাবে। যত অন্ধই হোক তার স্নেহ, ওই বিবেচনাটাও তার আছে। ছেলেকে নিজের খুশিমতো চালাতে চেয়ে উনি যে ভাবেই লড়াই করুন, হেমন্তকে অসুখী দেখলে, তার জীবনে অশান্তি এলে, নিজেই তিনি জিদ বিসর্জন দেবেন, সামঞ্জস্য খুঁজবেন। সে যা ভয় করছিল, অনুরূপার দিক থেকে সে ভয়ের কারণ নেই।

অথবা আছে ? কী করে সুনিশ্চিত হবে সীতা, কী করে বিশ্বাস করবে এ রকম মা, ছেলে-প্রাণ এ রকম মা, ছেলেকে বিব্রত দুঃখিত অসুখী দেখলে নিজের খেয়াল খুশিকে সত্যসত্যই ছাঁটাই করে ছেলের সঙ্গে আপস করবে ? বিশেষ করে, যে ছেলের জন্য এতকাল মেয়েমানুষ হয়েও টাকা রোজগার করেছেন এত কষ্টে, এত দুঃখে। একবার যদি খেয়াল হয় যে ছেলে অকৃতজ্ঞ—আর কি তখন সহজ বুদ্ধি টিকবে অনুরূপার আপস করায় সংযম বজায় থাকবে ? কে জানে ! ভালোটা আশা করাই ভালো।

অনুরূপার অদ্ভুত কথাই যেন পুরানো অন্তরঙ্গতা ফিরিয়ে আনে সীতার, সে হাসিমুখে শাসনের সুরে বলে, কী আবোল-তাবোল বকছেন মাসিমা ? যেমন আবোল-তাবোল ভাবছেন, কথাও বলছেন তেমনি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার। বাড়ি যান তো। দাঁড়ান, কাউকে সঙ্গে দি, পৌঁছে দিয়ে আসুক।

থাক, থাক। আমি নিজেই যেতে পারব মা।

ভাগ্যে বউমা বলে বসেননি, সীতা ভাবে।

তা কি হয় মাসিমা ? নকুল গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

অনুরূপা উতলা হয়ে পড়ছেন—এ খবরটা হাসপাতালে হেমন্তকে দেবার নামেই ব্যাকুল হয়ে অনুরূপা কেন বাধা দিয়েছিলেন বুঝতে পারলে, অনুরূপা সম্বন্ধে সীতা বোধ হয় আরও নিশ্চিন্ত হতে পারত। ছেলে পাছে মনে করে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এ ভয়টা কত জোরালো অনুরূপার মনে, কত সাবধান তিনি এ বিষয়ে, সীতা সেটা টের পেত। অত বড়ো ছেলে সন্ধ্যা-রাত্রে

বাড়ি না ফিরলে ব্যস্ত হওয়া সঙ্গত হয় না, সীতার মুখে এ কথা শুনেই তিনি ভড়কে গিয়েছিলেন। তিনি উতলা হয়ে উঠেছেন, অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়েছেন খোঁজ নিতে, এ কথা শুনে তাঁর বাড়াবাড়িতে যদি বিরক্ত হয় হেমন্ত ! একদিন একটু দেরি করে বাড়ি ফেরার অধিকারটুকু পর্যন্ত তার নেই ভেবে যদি ক্ষুণ্ণ হয়।

এত ভয়-ভাবনা নিয়েও কিন্তু এক বিষয়ে মনটা শক্ত করে রাখেন অনুরূপা। ছেলেমানুষি করে হেমন্ত নিজের সর্বনাশ করবে, এটা চুপচাপ বরদাস্ত করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। বাধা তিনি দেবেন, সামলাবার চেষ্টা করবেন, যতটা তাঁর সাধ্যে কুলোয়। সে জন্য যদি রাগ করে হেমন্ত, দুঃখ পায়, বিরক্ত হয়, উপায় কী !

মনের এই লড়ায়ে ভাবটা আগেও ছিল, এখনও আছে উদ্যত হয়ে, তবে সীতার শাসনটা কাজ দিয়েছে। হেমন্ত ফেরামাত্র লড়াই শুরু করে দেবার ঝোঁকটা সংহত হয়েছে। এত বড়ো ছেলেকে বাগাতে হলে সে যুদ্ধটা ধীর স্থির শান্ত সংযতভাবে করতে হবে সীতার মতো, এ বিষয়ে মন সতর্ক হয়ে আছে। তাই, মায়ে ব্যাটায় সংঘর্ষ বাধতে বাধতে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। রমা ও জয়ন্ত যতক্ষণ জেগে থাকে, অনুরূপা সাধারণভাবে কথা বলে যান, হেমন্তের কাজে তাঁর সমর্থন আছে কি নেই, সে ইঙ্গিতও আসে না তাঁর কাছ থেকে। হেমন্ত তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, রমা ও জয়ন্ত হাঁ করে তার কথাগুলি গিলতে থাকে। অনুরূপাও নীরবে শুনে যান। মায়ের ভাবান্তর লক্ষ করেও হেমন্ত কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলে না। মার দিক থেকে কথা ওঠা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই সে ভালো মনে করে। মার চুপচাপ থাকার কোনো কারণ আছে নিশ্চয়। আলোচনা শুরু হবার আগে নিজের মনটাকেই হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছেন মা, হৃদয়কে শান্ত ও আয়ত্তে রাখবার আয়োজন করছেন। তাড়াহুড়ো করে কথা পেড়ে কোনো লাভ হবে না।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়ে আগে। পরে রমাও কয়েকবার হাই তুলে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। খাওয়ার পাট চুকেছিল হেমন্ত বাড়ি ফেরার কিছু পরেই। তখন অনুরূপা কথা পাড়েন !

ঘুম পেয়েছে হেমা ?

না মা। কী বলবে বলো।

আমাকে বলতে হবে ?

হবে না ? নইলে তোমার মনের কথা বুঝবো কী করে ?

নতুন কথা শোনালি আজ। আমার মনের কথা বুঝিস না তুই ? কপাল আমার !

শুনে হেমন্ত ভয় পেয়ে যায়। বুঝতে পারে, অনুরূপার কাছে আজ সে সহজে রেহাই পাবে না। নইলে তিনি এ সুরে কথা শুরু করতেন না। রাগ দুঃখ অভিমান অভিযোগ কাঁদা-কাটা সব কিছু অস্ত্র সাজিয়ে মা প্রস্তুত হয়ে আছেন। আলোচনা গড়ে তুলে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার মার হাতে ছেড়ে দিলে আর রক্ষা থাকবে না, একেবারে মর্মান্তিক কাণ্ড করে ছাড়বেন তিনি। ভেবে-চিন্তে হেমন্ত নিজেই কথা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অনুরূপা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে, শোনো শোনো। তুমি রাগ করেছ, মনে কষ্ট পেয়েছ, তোমার ভয় হয়েছে, সব আমি জানি মা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। তর্কও করব না, তোমার কথার অবাধ্যও হব না। তুমি যদি বারণ কর কোনো কাজ করতে, তোমার কথা আমি মেনে চলব। গোড়াতে এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে রাখলাম। এবার আসল কথা বলে তোমার মত চাইব। তুমি হাঁ কি না বলে দিয়ো, বাস, সেইখানে সব খতম হয়ে যাবে। আমরা আর ও নিয়ে মাথা ঘামাব না।

অনুরূপা একটু বিব্রত বোধ করেন। এ ভাবে কথা চালাবার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবতেও পারেননি হেমন্ত এতটুকু লড়াই করবে না, তাকে বুঝিয়ে দলে টানবার চেষ্টা

পর্যন্ত বাতিল করে দেবে গোড়াতেই, সোজাসুজি তাঁরই ওপর সব সিদ্ধান্তের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে। পছন্দ হোক, অপছন্দ হোক, চোখ-কান বুঝে তাঁর কথা মেনে চলতে সে প্রস্তুত, হেমন্তের এ ঘোষণায় এক দিকে হৃদয় যেমন তার উল্লাসে ভেসে যাবার উপক্রম হয়, অন্যদিকে তেমনি মতামত দেবার দায়িত্বটা যে তার কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অনুভব করে দুর্ভাবনারও তার সীমা থাকে না। শুধু মা হিসাবে অন্যায় আবদার করা চলত, যুক্তি-তর্ক শূন্যে উড়িয়ে দিলেও দোষ হত না। হেমন্ত যেন সে পথটা তার বন্ধ করেছে। মা বলে তাকে আকাশে তুলেছে বটে, আছাড় খেয়ে পড়বার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে দিয়েছে সেই সঙ্গে।

হেমন্ত শান্তকণ্ঠে বলে, ঘটনা সব জানো। কাল একটা প্রোটেস্ট মিটিং হবে, আমি তাতে যোগ দিতে চাই। মিটিং-এর পর আর একটা প্রোসেশনও হয়তো বার হবে, তাতেও আমি থাকতে চাই। এখন তুমি যা বল।

তুই কি লেখাপড়া করতে চাস না ?

কেন ? তার মানে কী ?

এ সব করে বেড়ালে লেখাপড়া হবে কী করে ?

ও ! এই কথা। হেমন্ত এবার হাসে, রোজ এ সব করে বেড়াব না কি ? এ সব করা মানে তো শুধু এই যে, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওটুকু না করলে কি মনুষ্যত্ব থাকে ? লেখাপড়ার অজুহাতে মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলতে পারি না মা, তুমি যাই বল। হাঙ্গামা যে হচ্ছে, সে দোষ আমাদের নয়।

কিন্তু হচ্ছে তো। আজ সামান্য চোট লেগেছে, কাল তো মারা যেতে পারিস।--সোজাসুজি মৃত্যুর কথাটা বলে যান অনুরূপা, গলায় আটকায় না, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে হেমন্ত বুঝতে পারে যে, কথাটা বলতে কী উগ্র আতঙ্কে মড়মড় করে উঠেছে তাঁর দেহ-মন।

হেমন্ত মৃদুস্বরে বলে, হয়তো—সম্ভব। তোমায় মিথ্যে ভরসা দেব না।

তবে ?

শোনো তবে বলি তোমায়, হেমন্ত যেন দম বন্ধ করে কথা বলে, এই ভাবের ভয়ভাবনার জবাবটা আজ পেয়েছি মা, এতদিন পরে ! লেখাপড়ার জন্য কি সব ছাড়া যায় ? তোমাকে কিংবা রমাকে যদি একটা গুন্ডা আক্রমণ করে, আমি যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের বাঁচাতে গেলে লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে যাবে, ব্রেনটা খারাপ হয়ে যাবে, জীবনে লেখাপড়া কিছু আর হবে না আমার— তাই ভেবে কি তখন চুপ করে থাকব ? কী হবে সে লেখাপড়া নিয়ে আমার ! তবে এটাও ঠিক যে, ও হল বিশেষ অবস্থা ! অবস্থাবিশেষে লেখাপড়ার কথা ভাবারও মানে হয় না, লেখাপড়া করাই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বলে সাধারণ অবস্থায় লেখাপড়া করব না কেন ? তাই তো কাজ আমার।

অনুরূপা গুম খেয়ে থাকেন।

যাকগে, হেমন্ত স্বাভাবিক গলায় বলে, বলেছি তো তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি যা বল—হাঁ কিংবা না।

মরতে পারিস জেনেও হাঁ বলতে পারি আমি ? অনুরূপা আর্তকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন।

সেটা কঠিন বটে তোমার পক্ষে বলা, হেমন্ত স্বীকার করে নেয়, এক কাজ করো তবে। হাঁ না কিছুই তুমি বোলো না। আমার ওপরে সব ছেড়ে দাও, আমি যা ভালো বুঝব করব। তাই করো মা।

অনুরূপা নিশ্বাস ফেলেন।—এ আমি আগেই জানতাম হেমা, তোর সঙ্গে পারব না।

এই ভাবে একটা বোঝা-পড়ার মধ্যে মা ও ছেলের সংঘর্ষটা বেঁচে রইল। মার অনুমতি মানেই আশীর্বাদ। সেটা জুটল না হেমন্তের। তবে নিষেধের অভিশাপ যে এল না, অনুরূপার মতো ভদ্র

স্নেহাতুরা মায়ের এ পরিবর্তন কে অস্বীকার করবে ? কে বুঝতে পারবে না যে, অনুরূপার পক্ষেই সম্প্রতি সন্তানকে আশীর্বাদ দেওয়া সম্ভব হবে, আচ্ছা মরবে যাও, এর চেয়ে মহান মৃত্যু মা হয়ে কী করে কামনা করি তোমার জন্য ?

হাতটা গেছে ? জীবনে আর সারবে না ? আমিনার আর্তনাদ যেন চিরে দেয় ঠান্ডা মাঝরাত্রি।

একটা হাত তো আছে, রসুল বলে জোর দিয়ে।

তা আছে।

আমিনা আত্মসংবরণ করেন আর্ত-চিৎকারে ফেটে পড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ! মাঝরাত্রে এ ভাবে হঠাৎ ব্যান্ডেজ বাঁধা গলায় ঝুলানো নষ্ট হাত নিয়ে রক্তমাখা জামা-কাপড় পরা ছেলে হাজির হলে কোন মা আত্মহারা না হয়ে পারে ? তবে নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা আমিনার অদ্ভুত। ছেলেটা আজাদির জন্য অনায়াসে মরতে পারে, মরবার জন্য তৈরি হয়ে আছে, টের পাবার পর থেকে আমিনার মনের এই জোরটা হু-হু করে বেড়ে গেছে !

আদর খেতে এলাম, আমায় মোটে আদর করছ না মা !

তোর মা হওয়ার যা ঝকমারি, আদর করতে মোটে ইচ্ছে যায় না রসুল।

রসুলের মাথাটা আরও জোরে বুকে চেপে ধরে আমিনা বলেন, হাসপাতালে গেছিস জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। জানি তো এমনি ভাবে যাবি একদিন, দুদিন আগে আর পরে। আগে গেলেই বরং চুকে-বুকে যায় সব। তোকে পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা মনে মনে, আমাকেও পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা তোর কথা ভেবে ভেবে—

মা, জানো ? ফিসফিস করে রসুল বলে।

তেমনি ফিসফিস করে আমিনা বলেন, কী ?

আমায় আটকে দিয়েছিল হাসপাতালে। তোমায় দেখতে কেমন করতে লাগল মনটা। চুপিচুপি পালিয়ে এসেছি।

আঁ ? ডাক্তার বলেছিল শুয়ে থাকতে, চুপিচুপি তুই পালিয়ে এসেছিস এই রাতে এক মাইল পথ হেঁটে ?

তোমার একটু আদর না পেলে কি এ যন্ত্রণা সয় ?

রসুল বুঝতে পারে, মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বেশি রক্ত বেরিয়ে যাবার ফলে একদিকে যেমন দুর্বল অশক্ত মনে হচ্ছে শরীরটা, তেমনি আবার কেমন অদ্ভুত রকমের ভোঁতা অবসন্নতা এসেছে অনুভূতিতে। আমিনার কান্না যে অগাধ ও অসহনীয় বিষাদে হৃদয় ভরে দেয়, রসুল জানে সেটা সাময়িক ও কৃত্রিম। রক্তক্ষরণের ফলে শুধু এই প্রতিক্রিয়া এসেছে। নইলে এতরাত্রে এসে মাকে কাঁদাতে তার মোটে ভালো লাগত না, এলেও কাঁদাবার বদলে নিজেই সে হইচই হাঙ্গামায় অস্থির করে ভুলিয়ে রাখত মাকে। কিন্তু আজ এমন দুর্বল হয়ে গেছে মনটা যে মাকে আরও বেশি কাঁদিয়ে দুঃখটা উপভোগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ডাক্তার সত্যি বলেছিল যে, রক্তক্ষয়ের কতগুলি অদ্ভুত খাপছাড়া প্রতিক্রিয়া আছে—নিজেকে হঠাৎ অতিরিক্ত সবল মনে করে সে যেন বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা না করে। তাই সে করেছে শেষ পর্যন্ত ! বেড ছেড়ে উঠে এক মাইল রাস্তা হেঁটে মাকে কাঁদাতে এসেছে !

দাঁতে দাঁতে ঘষে রসুল মনে মনে বলে, না, বিকারের ঝোঁকে মাকে সে কাঁদাতে আসেনি, ভেবে-চিন্তে যা করেছে সে কাজকে ওই সস্তা দুর্বলতায় পরিণত হতে সে দেবে না, রক্তক্ষয় হবার জন্য তো নয় শুধু, গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যও বটে। হাসপাতালে গ্রেপ্তার না হলে কি তার মাকে এ ভাবে দেখতে আসবার ঝোঁক চাপত ! আবার কবে দেখা হয়, মার মনে একটু শান্তি ও শক্তি দেবার চেষ্টা

করা তার উচিত, এ সব হিসাব করেই সে এসেছে মাকে দেখতে। মাকে কাঁদিয়ে খুশি হয়ে যেতে নয়।

তবে তুমি কাঁদো, আমি যাই।

কাঁদছি কই !

এবার যে কথা বলব শুনে কিন্তু ভেউ-ভেউ করে কাঁদবে।

ইস্ !

না সত্যি। হাঙ্গামার কথা। সেই জন্য তো রাত দুপুরে পালিয়ে এলাম তোমায় দেখতে।

সুতরাং তখন মনটা শক্ত করতে হল আমিনার। চোখের জল চলে গেল আড়ালে, অন্য সময়ের জন্য। ছেলে যদি মুশকিলে পড়েই থাকে, তাকে এখন সাহস জোগানো দরকার, নিজের দুর্বলতা দিয়ে তাকে কাবু করে আনা সঙ্গত হবে না। রসুলও জানত, তার বিপদের খবর শুনে মার পক্ষে আত্মসংবরণ করা সহজ হবে। হাতে গুলি লেগেই সব শেষ হয়নি, এখনও হাঙ্গামা সঞ্চিত আছে তার জন্য, এ কথা শুনলেই মার কান্না স্থগিত হয়ে যাবে।

আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার ? কেন ?

হাঙ্গামায় ছিলাম বলে।

তোর হাতে গুলি লাগল, তোকেই গ্রেপ্তার করল কী রকম ?

ওই তো খাঁটি প্রমাণ যে আমি হাঙ্গামায় ছিলাম। নইলে আহত হব কেন ?

বাঃ, বেশ !

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে রসুল, শরীরটা সত্যই বড়ো দুর্বল লাগছে। মনে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু শান্ত গম্ভীর সেই করুণ বিষাদের ভাবটা কাটছে না।

আনমনা ছেলের চুলের ভেতরে আঙুল দিয়ে আমিনা তার মাথাটা তোকিয়ে দেন ধীরে ধীরে। মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র জিজ্ঞাসা করা যায়, বাকিগুলি চিরকাল অবোধ আকুল মনের প্রশ্ন হয়েই থাকবে।

গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল ?

না, হাসপাতালে গ্রেপ্তার করেছে।

জামিন দিল ?

না, জামিন দেয়নি।

তবে ?

পালিয়ে এসেছি, তোমার জন্যে। ভোরে আবার ফিরে যেতে হবে।

কেন ? ফিরে যাবি কেন ?

যাব না ? আরও তো কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা কেউ পালায়নি। ফিরে না গেলে লোকে বলবে না তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে একা পালিয়েছে ?

তবে এখন ঘুমো, আর কথা নয়।

আমিনাও কিছু কিছু বুঝতে পারেন যে আঘাতের ও রক্তপাতের ফলে এমন কোনো একটা প্রক্রিয়া ঘটে গেছে রসুলের মধ্যে যার ফলে হঠাৎ মাকে কাছে পাবার ঝোঁক জাগায় নিজেকে সামলে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পেরে ওঠেনি। শিশুর মতো কেন রসুল এমন পাগল হয়ে উঠল মায়ের জন্য ? আর দশটি শান্ত-শিষ্ট ভালো ছেলের মতো হয়ে না থেকে এই সব বিপজ্জনক আজাদির ব্যাপারে যোগ দিয়ে দুঃখিনী মাকে আরও দুঃখ দিচ্ছে, এ রকম কোনো কাঁটা কি আছে ওর মনে তিনি তো কোনোদিন সমালোচনা করেননি, আপশোশ জানাননি। ও রকম নিরীহ গোবেচারা

ছেলেই বা কজন আছে দেশে যে, তাদের সঙ্গে তুলনায় দেশের ও দশের জন্য নিজের মাকে কষ্ট দেবার চেতনা ওর লেগেছে। আমিনার তো মনে হয় দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মতো—অন্য কোনো পথ তাদের নেই। আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো রসুল ঘুমিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ বার হয়। আমিনা জেগে বসে চুপ করে চেয়ে থাকেন তার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে। তার অশ্রুহীন দুটি আরক্তিম চোখে শুধু ইঙ্গিত ফুটে থাকে হৃদয় তার কী ভাবে রক্তাক্ত হয়ে আছে।

শেষ রাত্রে আবদুল ঘরে ঢোকে।

এবার যেতে হবে রসুল।

হেঁটে ফিরতে পারবে ? আমিনা বলেন।

না, হাঁটতে হবে না। গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।

আবদুলেরও ঘুম হয়নি, তার চোখ দুটিও টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমন্ত শহরের শেষ রাত্রির স্তব্ধতা যেন প্রশ্ন হয়ে ওঠে আমিনার কাছে : তোর কি শুধু একটি ছেলে ?

কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দু দণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে, রসুলের মতোই সে তার চেনা-জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ করা সন্তান।

সুধাই বাইরের দরজা খুলে দেয় প্রতি রাতের মতো। মুখ খুলে ব্যথিত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আজ আর তাকায় না অন্যদিনের মতো পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে থাকে।

অক্ষয় উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই ?

কী জানি। চেঁচামেচি জুড়ো না।

তোমার হল কী ?

সুধা জবাব দেয় না। মাথাও সে হেঁট করেই রাখে। অক্ষয় চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে এলে নিঃশব্দে সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়। অক্ষয়ের অনুভূতি হয় দুরকম। তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কী অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন, সুধাকে চোখে দেখবার পর, প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজ অবশ্য সুধার মনে আঘাত লেগেছে চরম, আজকের লজ্জা দুঃখ হতাশার তার সীমা নেই, মনে মনে আজ সে মরে গেছে। আজ অক্ষয় শুধু মদ খেয়ে আসেনি, আর কোনোদিন ও জিনিস স্পর্শ করবে না এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে খেয়ে এসেছে। আজ তার বিশেষ দুঃখ বিশেষ হতাশা, কিন্তু আগেও কি কম ছিল ? অধঃপতন শুরু হয়ে গিয়েছে স্বামীর, দিন দিন বাড়ছে তার নেশা, কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা কি ভাবতে পারত সুধা ? আগে এতটা অনুমান করতে পারেনি বলে, অনুমান করতে চায়ওনি বলে, অক্ষয়ের সমবেদনা ছিল জলো খেয়াল। হালকা মেঘের মতো সে সমবেদনা খুশি মতো মনে ভেসে আসত, দরকার মতো উপে যেত। পশুর মতো কী ভাবে সুধাকে সে নির্যাতন করে এসেছে, এতকাল পরে আজ প্রথম পশুর মতো জমজমাট নেশা না করে বাড়ি ফিরে হঠাৎ সেটা অনুভব করে আজ প্রথম আন্তরিক অনুতাপ দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। তবু তারই মধ্যে সে বুঝতে পারে যে এ অনুতাপের তীব্র মধুর জ্বালা জেগেছে শুধু এই জন্য যে আজ সে মদ খেয়ে আসেনি, আজ তাকে মদ না খেয়ে আসার নেশায় ধরেছে। কাল যদি ওজন মতো, আজ বাদ গেছে বলে খানিকটা বেশি

খেয়ে আসে, সুধাকে পশুর মতোই নির্যাতন করবে। তার কালকের কাণ্ডের জন্যই সুধা আজ বেশি রকম ভয়ার্তা হয়ে আছে। কাল বাড়ি ফিরেই সে ফতোয়া দিয়েছিল : ঝুলো মাই, বুড়ি মাগি, শাড়ি শেমিজ পরে কচি বউ সাজতে লজ্জা করে না ? খোল, খোল শিগগির খোল !

সুধা তা ভুলতে পারেনি। সুধা আজও আশঙ্কা করছে ওই রকম একটা ভয়ংকর মাতলামির। শুধু সেটা কীভাবে আসবে ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে তার, অনেক প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে অনেক দিন ধরে দলে পিষে ছিঁড়ে ধুনে চলতে হবে। নেশা করার দুরন্ত, অবাধ্য দৈহিক মানসিক সর্বাঙ্গীণ সাধ শুধু নয়, সে যে মাতাল হওয়া বরবাদ করেছে এ বিষয়ে বহুকাল ধরে ঘরে বাইরে সকলের অবিশ্বাসের পীড়ন। মাথাটা আজ যেন আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা যেভাবেই হোক ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে—কঠিন, কঠিন এ কাজ।

কিন্তু অন্য এক ভয়ংকর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু একবারের বেশি আর খাবে না, কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।

এমনিভাবে উদ্ভট প্রক্রিয়া চলে অক্ষয়ের মনের।.... তবে পরম মুক্তির, মহান আত্মজয়ের, দুঃস্বপ্নের অবসানের বাস্তব, কার্যগত জীবন্ত অনুভূতিও আজ খুব প্রবল অক্ষয়ের। মিথ্যা ধারণা ভেঙে দিয়ে সুধার মৃত্যু-ম্লান মুখে জীবনের জ্যোতি, আশার আলো ফুটিয়ে তোলার কল্পনা তার হৃদয়কে উৎসুক, উৎফুল্ল করে রেখেছে—প্রথম প্রেমে প্রিয়াকে পাওয়ার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে ফেলার মতোই রসালো সে আনন্দ। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে সুধাকে দেখতে থাকে। খাটে বসে মেঝেতে চোখ বিঁধিয়ে রেখেছে সুধা। বিছানায় উঠে কেন সে শুয়ে পড়ছে না দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, অক্ষয় তা বুঝতে পারে। রাত দুপুরে মাতাল অক্ষয়কে সামলাবার দায়িত্ব সুধা পালন করে এসেছে বরাবর, রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে সে যাতে নেশার ঝোঁকে হইচই কেলেঙ্কারি কিছু না করে। অক্ষয় না শুয়ে পড়লে সে শোয় না, অক্ষয় না ঘুমোলে সে ঘুমোয় না। আজ সে মরে গেছে অক্ষয়ের কাণ্ডে, তবু আজও তার সে দায়িত্ব পরিহার করতে সে পারছে না। হৃদয়-মনে কোটি বসন্ত আসে অক্ষয়ের। তার মনে হয়, আজ সে নেশা করায় অপরাধ করেনি জানিয়ে কয়েক বছরের পুরানো বউকে সে খুশি করবে না, আমি তোমায় ভালোবাসি বলে এই আশাহীনা লজ্জিতা অপমানিতা মেয়েটিকে সে আজ পুলকিতা রোমাঞ্চিতা করে তুলবে। আজ তাদের আবার বিয়ে হবে নতুন করে।

মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন সুধা ?

কী জানি।

বোসো। এখুনি আসছি।

কোথা যাবে ? সুধা আর্তনাদ চেপে বলে।

মাকে প্রণাম করে আসি।

বলে অক্ষয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বারান্দার কোণ ঘুরলেই মার শোবার ঘরের দরজা—মা আর অক্ষয়ের বোন ললিতা শোয় ও ঘরে। বারান্দার কোণটা ঘুরবার সময় সুধার দেহটা একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ায় অক্ষয়কে থামতে হয়।

পায়ে পড়ি তোমার, রাত দুপুরে কেলেঙ্কারি কোরো না। মা ঘুমুচ্ছেন।

অক্ষয় বলে, আরে ! কী করছ তুমি ! এতরাতে ফিরে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি কেন বুঝতে পারছ না ? আজ খেয়ে আসিনি। মা খুশি হবেন শুনে।

ঘুম ভাঙালে মার শরীর খারাপ হয়। কাল সকালে মাকে প্রণাম কোরো।

অক্ষয় আহত হয়, সুধা বিশ্বাস করেনি।

সত্যি খাইনি সুধা।

জানি। কিন্তু মাকে ঘুমোতে দাও। ঘরে চলো।

চলো। আগে তোমাকে বোঝাতে হবে দেখছি।

ঘরে গিয়ে সুধা বলে, এক কাজ করো, কেমন ! শুয়ে পড়ি এসো। আমারও ঘুম পেয়েছে, দুজনে শুয়ে পড়ি।

খাব না ?

খেয়ে আসনি ? অন্যদিন তো—? এসো তবে, বোসো।

সুধা তাড়াতাড়ি আসন এনে পেতে দেয়—ঘরের কোণে অন্ন-ব্যঞ্জন ঢাকা ছিল, আসন ভাঁজ করা ছিল আলনায়। বাড়ি ফিরে অক্ষয় কদাচিৎ খায়, কিন্তু আহার্য তার প্রস্তুত হয়ে থাকে প্রতিদিন। খাক বা না খাক !

অক্ষয় ধীরে ধীরে আসনে বসে। সাজিয়ে গুছিয়ে সব ঠিক করে সামনে দেবার পরও সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সুধার গৃহিণীপনা দেখতে দেখতে চোখে তার পলক পড়ে না। সে আজ সত্যই গন্ধও শোঁকেনি মদের। কিন্তু সুধা জানে সে মাতাল হয়ে এসেছে। জেনেও সুধা হাল ছাড়েনি, বিশ্বাস হারায়নি, আশা বাদ দেয়নি ! মরে তো সুধা তবে যায়নি, আজ সে মদ খেয়ে এসেছে জেনেও, যা সে ভাবছিল এতক্ষণ। তার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের আঘাত পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সে আঘাত সামলে নিয়ে সুধা তো আবার আশা করেছে ! আজ পারেনি, কাল হয়তো পারবে, কিংবা দুদিন দশ দিন না পেরে ক্রমে ক্রমে একদিন হয়তো পারবে, ইতিমধ্যেই এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে সুধা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা করছে বাঁচবার অপরাজেয় প্রেরণায় !

মরা সোজা, তাই সে ভেবেছিল আজ যদি সে মদ খায়, সুধা সোজাসুজি মরবে। সে কি জানত জীবনকে এত বেশি শ্রদ্ধা করে সুধা যে, মরা সহজ মনে হলেও বাঁচবার জন্য সে এমনভাবে লড়বে চরম হতাশায় আশা না ছেড়ে, ব্যর্থতার পরম প্রমাণকে শেষ বলে ধরে না নিয়ে ? সাধারণ পতিপ্রাণা বউ বলে সুধাকে জানত অক্ষয়। তাকে অসাধারণ সে ভাবতে পারে না এখনও। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম জীবন-যুদ্ধে সাধারণ একটি নারীর স্বাভাবিক সংগ্রাম-শক্তির স্বরূপ আঁচ করে সে স্তম্ভিত, অভিভূত হয়ে যায়।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি তোমার ?

হচ্ছে বইকী, বাঃ। খাও।

সত্যি বলছি, খাইনি আজ। তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। খাইনি বটে, কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরি নেই। খাব না বলেছিলাম বলে খাইনি, তা সত্যি নয়। খাবার জন্য হোটেলের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। অন্যদিনের চেয়ে বেশিই হয়তো আজ খেতাম সুধা। কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে-শোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতোমতো খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনও ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কীসের নেশা ? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ও রকম নেশা হতে পারে, আমি তবে কেন বোকার মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি ! ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয় !

বেশ তো, বেশ তো, সুধা বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যাহত গলায়, শুনবখন সব কথা কাল। খেয়ে নাও।

অক্ষয় স্তম্ভিত হয়ে থাকে। সুধা এখনও বিশ্বাস করেনি ! তার কথা আবোল-তাবোল ঠেকছে সুধার কাছে। তার কথা শুনে সুধার বিশ্বাস শুধু আরও দৃঢ় হয়েছে যে আজ সে অন্যদিনের চেয়ে বেশি মদ খেয়েছে, হইচই করার স্তর পার হয়ে উঠে গিয়েছে দার্শনিকতার স্তরে !

মদ খেলে মুখে গন্ধ থাকবেই সুধা।

কেন ভাবছ। গন্ধ কেউ পাবে না। কাল সকালে সেই গার্গল্ আর—

গন্ধ পাচ্ছ ?—অক্ষয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুধাকে নিশ্বাসের গন্ধ শোঁকায় ! আগেই এ প্রমাণ তার দেওয়া উচিত ছিল সুধাকে। ভাবপ্রবণ, অভিমানী, বিকারগ্রস্ত মন তার, তাই না সে চেয়েছে বড়ো বড়ো কথার প্যাঁচে সুধাকে বিশ্বাস করাতে—রাত দুপুরে যে ধরনের কথা বললে অজানা লোকেরও সন্দেহ হবে লোকটা মাতাল !

সত্যি খাওনি তো তুমি !

সত্যি খাইনি।

মুখের চেহারা বদলিয়ে সুধা তার দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে বিশ্বাস করেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তার এত বড়ো সৌভাগ্য কী করে সম্ভব !

একদিন না খেলে কী হয় ?

তা ঠিক।

সহজভাবেই সায় দেয় অক্ষয়। তার অভিমানও হয় না, রাগও হয় না। একদিন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে সুধা সেটা সহ্য করে এই জন্য যে, একদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা চরম নয়, শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাটা রাখাই আসল কথা। এটা অক্ষয় আজ জেনেছিল খানিক আগে। তাই একদিন আজ সে মদ খায়নি এটা যে অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়, কাল পরশু তরশু যদি না খেয়ে থাকতে পারে তবেই জানা যাবে সে সত্যসত্যই জয়ী হয়েছে, সুধার এই ইঙ্গিত তাকে ক্ষুণ্ণ করে না। সুধা ঠিক কথাই বলেছে। কেউ ঠিক কথা বললে খুশি না হওয়া বোকামি।

বোকামিকে প্রশ্রয় দিতে আজ রাত্রে অন্তত অক্ষয় একেবারেই রাজি নয়।

মাকে প্রণাম করার ঝোঁকটাও তার কেটে গেছে। এমন এক জায়গায় উঠে গিয়েছিল তার মনটা সেখানে কোনো মনেরই বাস্তব আশ্রয় নেই, সুধার কল্যাণে সেখান থেকে নেমে এসে সে এখন বুঝতে পারছে সে মদ খেয়ে আসেনি বলে রাত দুপুরে মাকে ঘুম থেকে তুলে প্রণাম করতে গেলে সে পাগলামিকে লোকে চেনা মাতালের মাতলামিই মনে করবে।

অনেকদিন পরে এমন সাদাসিদে সহজ কথা সাদাসিদে সহজ ভাবে ভাবতে বড়ো ভালো লাগে তার। যদিও রোগের অস্বস্তি, সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবার সব কিছু ফুরিয়ে যাবার উৎকট অনুভূতি, মনকে খিঁচে রাখা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধ আতঙ্ক সে মাথা কপাল খুঁড়লেও আজ রাত্রে এক চুমুক পাওয়া যাবে না, এ সব পুরো মাত্রায় বজায় আছে।

গাঢ় নীল বৈদ্যুতিক আলোয় লেখা 'বিদ্যুৎ লিমিটেড' সাইনটা বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড চওড়া নতুন রাজপথ, দুদিকে বিরাট অট্টালিকা, মোড় থেকে যত দূর চোখ যায় সিধা চলে গেছে। শহরের উন্নতির আধুনিক চিহ্ন। আঁকাবাঁকা নোংরা গলি আর বস্তিগুলিকে অট্টালিকার পিছনে আড়াল করে রেখে শহরে যে বড়োলোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তার এই সব প্রমাণ-সৃষ্টির পরিকল্পনা যুদ্ধের কিছু আগে কার্যকর হচ্ছিল। যুদ্ধ বাধলে অবশ্য সব স্থগিত হয়ে যায়। বিরাট বিরাট লোহার কঙ্কালগুলি আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে কত অকস্মাৎ গঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময়

এ সব রাস্তাও ছিল অন্ধকার ! যুদ্ধের পর এখন আবার অমাবস্যার রাতেও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিতরণ করতে আরম্ভ করেছে অসংখ্য চোখ ঝলসানো আলো।

'বিদ্যুৎ লিমিটেড' তিনতলা বাড়িটির নীচের তলায় রাস্তার দিকে পাঁচটি বড়ো বড়ো দোকানের একটি। এন দাশগুপ্তের প্রকাশ্য ব্যবসাকেন্দ্র এই বিদ্যুৎ লিমিটেড। তার আরও অনেক অপ্রকাশ্য ব্যবসা যুদ্ধের সময় ছিল, এখনও আছে—কারণ, এ কথা সবাই জানে যে যুদ্ধ থামলেও অনেক চোরাগোপ্তা কারবারের সুদিনের জের মহাসমারোহে চলেছেই বেশ কিছুকাল চলবার ভরসা রেখে। উপরে উত্তরের দিকে দোতলার ফ্ল্যাটে সে বাস করে। ঠিক উপরের তেতলার ফ্ল্যাটটাও অন্য নামে সে ভাড়া করে রেখেছে। অনেকের উপকারের জন্য ওখানে বেনামি ঘরোয়া হোটেল, নাইট ক্লাব ও বার চালু আছে। অনেক পদস্থ লোক সন্ধ্যার পর সঙ্গিনী নিয়ে আসে, কেউ থাকে, কেউ চলে যায়। অনেক পদস্থ লোক মাঝরাত্রে সঙ্গিনীকে নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে না পেলে, অন্য পদস্থ লোকের কাছে আগে থেকে নির্দেশ পাওয়া থাকলে, নির্ভয়ে এখানে এসে জোটে, খাদ্য পানীয় ঘর শয্যা সব কিছু তার জোটে। কোনো কিছুর অভাব ঘটে না।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বহুক্ষণ দাশগুপ্ত ভ্রু কুঞ্চিত করে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। এ সব ব্যবসায়ে এইগুলি হল আসল হাঙ্গামা—সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারের অভাবনীয় পরিণতি। দশ-বিশ-পনেরো হাজার টাকার কত বড়ো বড়ো ডিল কত সহজে আপনা থেকে হয়ে যায়, ভীষণ রিস্ক নিয়েও এক মুহূর্তের দুর্ভাবনা দরকার হয় না। আর সামান্য কয়েক শো টাকার ব্যাপারে এই রকম ফ্যাকড়া বাঁধে। গণেশ আগেও কতবার মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওই সায়েবের বাড়িতে। স্বপ্নেও কখনও সে ভাবতে পারেনি গণেশ রাস্তার হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তাকে এ ভাবে হাঙ্গামায় ফেলবে !

ভাবলেও গা জ্বালা করে দাশগুপ্তের। যে দিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করেনি, ঠিক সেই দিক থেকে এই বিপদ এল, দুর্ভাগ্য ছাড়া কী বলা যায় একে। জ্বালা বেড়ে গেল এই ভেবে যে, গেঁয়ো ছেলেটা বোধ হয় নিছক কৌতূহলের বশেই রাস্তার হাঙ্গামা হইচই দেখতে দাঁড়িয়েছিল, গুলি লেগে যে বজ্জাত ছোকরাগুলো নিছক বজ্জাতি করার ঝোঁকে গুলির সামনে বাহাদুরি করছে তাদের বদলে সেই গেল মরে। ওর নাম-ঠিকানা-পরিচয় আবিষ্কার করতে গিয়ে এখন বেরিয়ে পড়বে তার চোরা মাল চালান ! হাসপাতালে কে তাকে খাতির করে ? কে অনুভব করবে যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া দরকার ? হয়তো হইচই পড়ে যাবে। হয়তো কোনো উপায় থাকবে না তাকে টানাটানি না করে ! নিজেদের বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে হয়তো তাকেই বলি দেবে বড়োকর্তারা, যাদের হাতে নোট পাবার হাত চুলকানি শান্ত করতে তার প্রাণান্ত !

কিছুই হয়তো হবে না তার শেষ পর্যন্ত, সামলে নিতে পারবে। কিন্তু দাশগুপ্তের বিদ্যুৎ লিমিটেড থেকে রেডিয়োর বাক্সে চোরাই বিলাতি মদ চালান যায় এটা প্রকাশ পেলে অপদস্থ হতে হবে তো তাকে ! কিছু কি করা যায় না ? সামলানো যায় না আগেই ? এত গণ্যমান্য ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে তার খাতির, আগে থেকে চাপা দিয়ে দেওয়া যায় না ব্যাপারটা ?

দাশগুপ্ত ডাকে, চন্দর !

চন্দ্র ওপরে বাবু।

ডেকে দে। শিগগির।

দাশগুপ্তের পরম বিশ্বাসী ধূর্তশ্রেষ্ঠ চন্দ্র এসে দাঁড়ায়। মাঝবয়সি ঈষৎ স্থূলকায় মানুষটা, মুখখানা গোলাকার। আই এ পর্যন্ত পড়েছিল, বুদ্ধিটা তাতে শাণিত হয়েছে। তিনতলা একরকম সেই চালায়, বড়োলোক, মাঝারি লোক সবাইকে খুশি রাখে এবং যার কাছে যত বেশি সম্ভব খসিয়ে নেয়। হিসাব রাখে, অন্য চাকরদের হুকুম দেয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের যে মেয়েরা শিকার খুঁজতে আসে, তাদের প্রয়োজন

মতো সবিনয়ে ও সসম্মানে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেয়, আবার দরকার হলে প্যাট্রনের সোডার বোতল নিজ হাতে খুলে দেওয়া থেকে পা-ও চাটে।

দাশগুপ্ত কিছু বলার আগেই সে শুরু করে নিরুত্তেজ কণ্ঠে, গণেশ ফেরেনি বাবু ? ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। মাল শুধু পৌঁছে দেবে, ওর হাতে টাকা দেবার তো কথা নয় ! টাকা হাতে পেয়ে লোভের বশে পালাত সে বরং সম্ভব ছিল, মাল নিয়ে পালাবার ছোকরা তো ও নয় !

চন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করবে ? মনে মনে কথাটা নাড়াচাড়া করে দাশগুপ্ত। চন্দ্র তার মস্ত সহায়, মানুষ চিনতে ও ওস্তাদ, এমন কি গণেশের মতো তুচ্ছ লোককে যে শুধু একতলায় দোকানের কাজে রাখতে হবে, তেতলার ব্যাপার টের পেতে দেওয়া চলবে না, এ পরামর্শও সেই দিয়েছিল। সে নিজে অতটা গ্রাহ্য করেনি, বরং ভেবেছিল এ ধরনের গেঁয়ো বোকা ছোকরাকেই তেতলার কাজে লাগানো নিরাপদ। দরকারের সময় তেতলার খুঁটিনাটি কাজ সে গণেশকে দিয়ে করিয়েও নিয়েছে কয়েকবার। ম্যাকারন টেলিফোনে যা বলেছে তাতে বোঝা যায় মরবার আগে গণেশ কিছু বলে যেতে পারেনি, তা হলে তার নাম-ঠিকানা-পরিচয় জানবার জন্য ম্যাকারনের কাছে খোঁজ নেওয়া হত না। কিন্তু গুলি লেগে যদি এ ভাবে মরে না যেত গণেশ, সজ্ঞানে যদি সব কথা বলে যেতে পারত, হয়তো তেতলার ব্যাপারও তা হলে ফাঁস করে দিয়ে যেত। ভাবলেও শিউরে ওঠে দাশগুপ্ত !

গণেশের খবর পেয়েছি চন্দর। একটা মুশকিল হয়েছে। কে কে এসেছে আজ ?

অনেকে আসেনি। হাঙ্গামাটা হল। দত্ত সায়েব, বিনয়বাবু, পিটার সায়েব, রায়বাবু, ঘোষ সায়েব—

ঘোষ সায়েব এসেছেন ?

হ্যাঁ। ছোটো একটা মেয়েকে এনেছেন, পনেরো হবে কি না। এক চুমুক খেয়ে বমি করে দিল। চন্দ্রর মুখে অদ্ভুত একপেশে হাসি ফোটে, গণেশের ব্যাপারটা কী বাবু ?

বোকা পাঁঠা তো, হাঙ্গামার মধ্যে গিয়েছিল। গুলি খেয়ে মরেছে। এখন মালটা সুদ্ধ হাসপাতালে আছে। নাম-ঠিকানা খুঁজছে, ম্যাকারনকে ফোন করেছিল। গণেশ দুবার গেছে ম্যাকারনের বাড়ি, স্লিপে ঠিকানা লিখে দেবার কি দরকার ছিল ? সুধীর একটা গাধা।

চন্দ্র প্রায় নির্বিকারভাবেই সব জেনে নেয় এবং মেনে নেয়।

কী করবেন ঠিক করলেন বাবু ?

ঘোষকে বলব ভাবছি। ঘোষ চেষ্টা করলে মালটা সরিয়ে ফেলে সামলে নিতে পারবে।

চন্দ্রকে চিন্তিত দেখায়।

তা নয় পারবেন, আজও কিন্তু উনি সেবারেরটা ভাঙিয়ে চালাচ্ছেন। এমন তুখোড় লোক আর দেখিনি। সামান্য ব্যাপার, কী আর করতে হয়েছিল ওনার। তাই টানছেন আজ পর্যন্ত। মদের দামটা পর্যন্ত আদায় করা যায় না। ফের ওঁকে কিছু করতে বললে পেয়ে বসবেন একেবারে।

মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে সায় দেয় দাশগুপ্ত, জ্বালার সঙ্গে বলে, কী করা যায় বলো, এ সব লোকের কত ক্ষমতা, এদের হাতে না রাখলে কি ব্যাবসা চলে। ঘোষের মতো বেহায়া আর কেউ নেই। আর সকলে কাজ করে দেয় সে জন্য টাকা নেয়, কিন্তু এখানে যা খরচা করে তা দেয়। ঘোষের সেটুকু চামড়াও নেই চোখে। ব্যাটা পেয়ে বসবে, কিন্তু বুঝতে পারছ তো, ওরা খোলবার আগে মালটা সরিয়ে আনা চাই। এমনি কোনো ভাবনা ছিল না। ছোঁড়া গুলি খেয়ে মরল কিনা, মুশকিল সেখানে।

চন্দ্রর মনটা তবু খুঁতখুঁত করে। ঘোষ সায়েব যে শুধু তেতলার ভোগ সুখ আরাম বিরামের জন্য খরচা পর্যন্ত দেয় না তা নয়, চন্দ্রর ব্যক্তিগত পাওনাও তার কাছ থেকে জোটে যৎসামান্য, একটা সাধারণ বয়-এর বকশিশের মতো। এটা যেন তারই বাড়ি, সবাই তার মাইনে-করা চাকর, এমনি ব্যবহার করে ঘোষ সায়েব।

এক কাজ করলে হয় না ?

বলো কী করব ! দাশগুপ্ত খুশি হয়, দেখি আমাদের চন্দরের বুদ্ধির দৌড়।

আপনি নিজে গিয়ে যদি গণশাকে চিনে দেন আর মালটা দাবি করে নিয়ে আসেন ? মালটা সরিয়ে আনার পর ওতে কী ছিল কে জানবে, আপনি যা বলবেন তাই।

দাশগুপ্ত সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়, মনে মনে তারিফ করে চন্দ্রের বুদ্ধির। নিজেকে কূটবুদ্ধি খাটাতে হয় দিবারাত্রি, জীবনে একমাত্র অবলম্বন এই বুদ্ধি খাটিয়ে সাফল্য লাভের মাদক গর্ব, অন্যের কাছে সামান্য একটু ধূর্ততার পরিচয় পেলেই তাই আশ্চর্য মনে হয় দাশগুপ্তের।

আমিও তা ভেবেছি চন্দর। ওই যে বললাম, খুনের ব্যাপার, মালের গায়ে কোনো ছাপ নেই। দাবি করলেই কি ছাড়বে ? চেনা অফিসার কেউ থাকলে বরং—

পিটার সায়েবের একখানা চিঠি নিয়ে যান না ?

ওকে জানাতে চাই না। হাজার টাকা চেয়ে বসবে।

জানাবেন কেন। মাল আপনাকে দিয়ে দেবার জন্য চিঠি তো চাইবেন না। কী দরকার ? শুধু আপনি অমুক লোক, আপনাকে ও চেনে এই বলে একটা চিঠি দেবে। বাস। বলবেন, যদি দরকার লাগে তাই দু লাইন সার্টিফিকেটটা রাখছেন। এক বোতল স্কচ দিলেই খুশি হয়ে লিখে দেবে।

চন্দ্রের বুদ্ধিতে এবার এত বেশি আশ্চর্য হয়ে যায় দাশগুপ্ত যে, ঈর্ষায় জ্বলে যায় তার বুকটা ! সত্যই যায়। চন্দ্র তার চাকর, সে তাকে বাবু বলে, তবু। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, আসলে চন্দ্রই চালাচ্ছে তার সমস্ত কারবার নিজে আড়ালে থেকে তাকে সামনে খাড়া করে রেখে, চন্দ্র তার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। আয়ের মোটা ভাগটাই তার বটে, কিন্তু সেটাও এক হিসাবে চন্দ্রের বুদ্ধিরই পরিচয়। তার যেমন আয় বেশি তেমনি সমস্ত দায়িত্ব তার ঘাড়ে, সমস্ত বিপদ তার, নিজেকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে চন্দ্র তো কম রোজগার করছে না। যুদ্ধের আগে তার ও চন্দ্রের অবস্থা যা ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে হিসাব ধরলে তার চেয়ে চন্দ্রের সাফল্য আর উন্নতি কি শতগুণ বেশি হবে না ? তার মতো একজনকে অবলম্বন না করে চন্দ্রের পক্ষে এত বড়ো স্কেলে কারবার চালানো সম্ভবও ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ফ্যাশন-কায়দা-দুরস্ত মোটামুটি অবস্থাপন্ন বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে অন্তত পক্ষে মৌখিক পরিচয়যুক্ত তার মতো একজনকে না পেলে এত কাণ্ড করতে পারত না চন্দ্র। তার মোটা টাকা, তার মোটা প্রতিপত্তি, তার মোটা দায়িত্ব—তাকে মোটা আয় দিয়ে নিজের স্বপ্ন সফল করতে আপত্তি হবে কেন চন্দ্রের ! তার স্বপ্ন সফল হয়নি। অনেক সে পেয়েছে কিন্তু দুহাতে দিতেও হয়েছে অনেক। চন্দ্র যে এত টাকা মারছে, তার দশ হাজার উপার্জন হলে চন্দ্রের যেখানে দশ টাকা হওয়া উচিত সেখানে সে যে হাজার টাকা গাপ করছে, চোখ-কান বুজে তার সেটা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চন্দ্রকে ছাড়া তার চলবে না, চন্দ্রই যেন সব চালাচ্ছে।

এ জ্বালা আগেও দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে অনুভব করেছে, তবে এমন তীব্র ভাবে নয়। জীবনের একমাত্র বাহাদুরির ফানুস কয়েক মুহূর্তের জন্য ফেঁসে যাওয়া কয়েক মুহূর্তের আত্মহত্যার চেয়ে কম যাতনাদায়ক নয়।

তারপর অবশ্য সামলে নেয় দাশগুপ্ত, পুরোপুরি। সস্তা মানুষ ফুঁ দিলেই ফাঁপে। কত আর করেছে চন্দ্র ? বিশ-পঁচিশ হাজার ? তাই নিয়ে তার ক্ষোভ। এ যেন নায়েব-গোমস্তা দারোগার দুটো পয়সা হয়েছে দেখে রাজার হিংসা করা।

বাবু—

দাঁড়াও দাঁড়াও—। দাশগুপ্ত বলে সেনাপতির মতো, ওসব ভেবেছি। তোমার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কি জানো, গণেশকে আমি আইডেন্‌টিফাই করতে চাই না, যদি না করে

চলে। এখন মনে পড়ল। হাসপাতালে হট্টগোল চলছে, সুযোগ বুঝে মালটা সরিয়ে আনা চলতে পারে। যদি ফ্যাকড়া বাঁধে, পিটারের চিঠি দেখালেই হবে। বললেই হবে ফ্রুটস আছে, খারাপ হয়ে যাবে বলে সরিয়ে নিচ্ছি। তখন গণেশকে আইডেনটিফাই করব। ফ্যাকড়া কিছু হবে না মনে হয়। দোকানের একটা চাকর, তার জন্য কে মাথা ঘামায় ?

আপনার কি বুদ্ধি বাবু। চন্দ্র সবিনয়ে বলে।

শিয়ালদার কাছে বস্তির ঘরে ভোরে ঘুম ভাঙে ওসমানের। তার আগে অনেক কারা জেগেছে, কথা বলছে। অনেকের কথার সমগ্র আওয়াজটাই কানে লাগে প্রথম, চেতনায় সে আওয়াজ শব্দ হয়ে ওঠে গণেশের সেই কথা : ওরা এগোবে না ? শব্দিত চেতনা হয়েই যেন ছিল প্রশ্নটা তার মনেরও মধ্যে, জেগে উঠে মনে পড়াব বদলে যেন জাগরণটাই পরে এল।

শূন্য ঘরে ঘুম ভেঙে গণেশের ওই প্রশ্নটা মনের ধ্বনির মতো শোনার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে দেশের বাড়িতে বউ ছেলে মেয়ের ভাবনা, তারা কেমন আছে এই জিজ্ঞাসা।

কাজে আজ সে যাবে না। যাওয়া উচিত হবে না। তারও নয়, কারও নয়। এক অফুরন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অনুভব করে ওসমান, সবাই যখন এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দেশ দিতে হয়নি নেতাদের, এমন অকারণ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদও সবাই করবে এক হয়ে, কাউকে বলে দিতে হবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা অদ্ভুত সমর্থন অনুভব করে ওসমান, শুধু তার ভিতরের বিশ্বাসে নয়, বাইরে থেকেও যেন বহু লোকের সমর্থন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। ঘরের বাইরে গিয়ে বস্তির বহু কণ্ঠের কলরব কানে এলে তখন সে বুঝতে পারে। রাত্রি শেষেই বস্তি প্রায় খালি করে যারা কাজে চলে যায়, তারা এখনও কেউ যায়নি। তার মানেই কাজে তারা আজ যাবে না, কাজে যেতে হলে ভোরের আলোয় বস্তিতে বসে উত্তেজিত আলোচনার বৈঠক বসানো চলে না। তার উঠতে দেরি হলে রহমান সিদ্দিক গোলামেরা কেউ বেরোবার সময় তাকে ডেকে দিয়ে যায়, আজ ভোর পর্যন্ত কেউ তাকে ডেকে তোলেনি কেন এতক্ষণে ওসমান বুঝতে পারে। নিজেরা যখন তারা কাজে যাবে না, ওসমানও অবশ্যই যাবে না, এটা তারা নিজেরাই ধরে নিয়েছে। সুতরাং কাজ কি অনর্থক ঘুমন্ত মানুষটাকে ডেকে তুলে।

তার কারখানার লোকেদের একতা গড়ে উঠতে উঠতে বারবার ভেঙে যাচ্ছে নানা শয়তানি কারসাজিতে। ট্রামের কাজে ইস্তফা দিয়ে এখানে কাজ নিতে হওয়ায় মনে তার একটা অভাব বোধ জেগে ছিল। সব সময় মনের মধ্যে সে গভীর ঔৎসুক্য অনুভব করে ভেদহীন বৃহৎ এক সংগঠনের একজন হয়ে থাকতে। এই কারখানায় সে সাধটা তার যেন কিছুতেই মিটছে না।

এদিকে সেদিন ট্রামকর্মীদের পরিপূর্ণ একতার পরম প্রমাণ দেখা গেল। সেই থেকে নিজেকে তার যেন বঞ্চিত মনে হয়েছে। অহরহ মনে হয়েছে ট্রামের কাজে থাকলে আজ তো সে নিজেকে ওদেরই একজন ভাবতে পারত, চব্বিশ ঘণ্টা আপনা থেকে অনুভব করত হাতে হাত মেলানো হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে স্থান পেয়েছে। কালও এ অভাববোধ তাকে পীড়ন করেছে। কাল কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব। আজ সকালে বস্তিতে ঘুম ভেঙে উঠে শুধু যে সে অভাববোধ মিটে গেছে তা নয়, আশা পূর্ণ হয়েও অনেক বেশিই যেন সে পেয়েছে। ঘরের কোণে শুধু তার একার মনে সংকল্প জেগেছিল, আজ সে কাজে যাবে না। ঘরের বাইরে এসে সে দেখেছে শুধু তার একার নয়, সকলের মনেই আপনা থেকে সেই সংকল্প দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে আর হাজার হাজার কেন, সংখ্যাহীন কত মনের সঙ্গে তার মন হাত মিলিয়েছে কে বলতে পারে।

খলিল বলে, দাদা, কাণ্ড হল। ট্রাম বাস স-ব বন্ধ।

ওসমান সায় দেয়, তা হবে না। ও তো জানা কথা।

রেজ্জাক উত্তেজিত হয়ে বলে, রেলগাড়ি আটকে দিলে হয় না ? লাইনের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে ? ইঞ্জিন খালি সিটি দিয়ে যাবে একধার থেকে, এগোতে পারবে না ?

ওসমান বলে, না না, রেলগাড়ি আটকানো ঠিক হবে না।

লাল ইটের লম্বা প্রাচীরের পাশে নোংরা ফাঁকা স্থানটিতে একে একে বহু লোক এসে জড়ো হয়। গায়ে মাথায় দু ফোঁটা জল ঢেলে তার টিনের পাত্রটি ভরে একটু জল আনতে কলতলায় গিয়ে ধন্না দেবার জন্য গুটিগুটি চলতে চলতে বয়সের ভারে বাঁকা নানিও খানিক দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েরা ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে, খুঁটিনাটি আরও বিবরণ জানতে চায়, ঝাঁঝালো গলায় ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে। অদম্য ক্রোধ ও ক্ষোভের চাপে অপূর্ব গাম্ভীর্য ও ধৈর্যের ছাপ পড়ে মুখগুলি যেন বদলে গিয়েছে মেয়ে-পুরুষের। প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঢোঁক গেলা, প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি দৃষ্টিপাত শুধু প্রতিবাদ। কালকের ঘটনায় আছে যুগ-যুগান্তরের অমানুষিকতা, যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ক্ষোভ তাদের করে দিয়েছে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ। এতে আশ্চর্য কি যে, শান্ত শীতল শীতের সকালে কাপড়ের সামান্য আবরণে ঠান্ডায় কেঁপেও কেউ কেউ ভেতরের তাপে দাঁতে দাঁত ঘষবে।

তখন তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় হানিফ।

কথা বলে সে উত্তেজনাকর, মারাত্মক। ক্ষুব্ধ মানুষগুলিকে সে যেন খেপিয়ে দিতে চায়। বলতে বলতে নিজেও সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ভয়ানক রকম।

চলো যাই সব। আজ হাঙ্গামা হবে ভীষণ। মোরা চুপ করে থাকব ? চলো যাই সবাই মিলে। বহুত আদমি জড়ো হবে। দোকান-পাট ভেঙে সব চুরমার করে ফেলব। মোরা শুরু করে দিলে কাণ্ডটা যা বাধবে একচোট—

হানিফের সঙ্গে এসেছিল বুধুলাল, সে বলে ওঠে, সাবাস ! সাবাস !

কয়েকটি অল্পবয়সি ছোকরা চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু অন্য সকলে আরও যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে মনে হয়। এমন কী যারা দাঁতে দাঁত ঘষছিল তাদের চোয়াল ঢিল হয়ে যায়।

কী বলছ মিঞা ? মাথা খারাপ না কি ? ওসমান বলে।

হানিফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, কেন ?

আমরা গিয়ে দোকানপাট ভাঙব, গুন্ডাদের লুটপাটের সুবিধা হবে। ও কি একটা কথা হল ? ওসমান জোর গলায় চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, দোকানপাট ভাঙার কথা ওঠে কীসে ? সভা করো, মিছিল করো, হরতাল করো। দোকান বন্ধ থাক। বাস।

গুন্ডা বলছ কাকে ? সামনে এগিয়ে রুখে ওঠে হানিফ। হানিফ বাড়াবাড়ি করলে তাকে রুখবার জন্য উপস্থিত কয়েক জন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে।

কাকে বলব ? শহরে গুন্ডা নেই ? আমরা দোকানে হানা দিলে তাদের মজা, এ তো জানা কথা।

বড়ো বাড় বেড়েছে তোমার। হানিফ শাসায়।

হাঙ্গামা কোরো না হানিফ।

সিদ্দিক বলে এক পা আরও এগিয়ে হানিফের সামনে গিয়ে। আরও কয়েক জন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে। সেদিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে হানিফ চলে যায় সঙ্গী কজনকে নিয়ে। বুধুলাল দুবার মুখ ফিরিয়ে ওসমানের দিকে তাকিয়ে যায়। সে দৃষ্টির অর্থ খুব পরিষ্কার, আচ্ছা দেখে নেব। বুধুলাল এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুন্ডা নেতা। হানিফের চেয়েও তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেশি।

আধঘন্টার মধ্যে ওসমান পথে বেরিয়ে পড়ে। গণেশের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে আর একটু বেলা করেই হাসাপতালে যাবে, এত সকালে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আগে একবার রসুলের বাড়ি যাবে। রসুলের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলার জন্য মনটা ছটফট করছিল ওসমানের। রসুল তার ছেলের মতো সাহসে তেজে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভুল-ভ্রান্তি বোকামিতে, সব দিক দিয়ে টান একটা বরাবর ছিল রসুলের দিকে তার, কিন্তু আজকের মতো সে টানে কখনও টান পড়েনি এত জোরে, আগে শুধু ছিল এই পর্যন্ত।

কত ভাবে মনটা আজ তার নাড়া খাচ্ছে, তবু তারই মধ্যে ভেসে ভেসে আসছে পারিবারিক একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আবছা চিন্তা। পরীবাণু সেয়ানা হয়ে উঠেছে অনেক দিন, এবার তার সাদির ভাবনাটা রীতিমতো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাঁ থেকে প্রতি পত্রে তাগিদ আসছে পরীবাণুর মার। এদিক-ওদিক ছেলে খুঁজছে ওসমান, আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে সন্ধানও আসছে মাঝে মাঝে। কিন্তু পছন্দ যেন তার হচ্ছে না একজনকেও। হবু জামাইয়ের কতগুলি রকমারি বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি যেন আগে থেকে মনের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে, সেই মাপে খাপ খাচ্ছিল না একজনও পুরোপুরি। যে ছেলে তার নেই, জামাই খুঁজছিল সে সেই ছেলের মতো—যত দূর সম্ভব সেই ছেলের মতো। এ ধারণা তার কাছে পরিষ্কার নয়, মনের এই খামখেয়ালি আবদার। টের পেলে নিজেকে সে সংযত করে ফেলত সঙ্গে সঙ্গেই। আজও সে বুঝতে পারেনি কীসে কী ঘটেছে মনে। রসুলের সঙ্গে পরীবাণুর সাদি হলে তো মন্দ হয় না, এই কথাটা মনে পড়ছে ঘুরে-ফিরে মনের গভীর তলানো ইচ্ছার ভাসা-ভাসা ইঙ্গিতের মতো।

রসুলের বাড়ি বেশি দূরে নয়। এইটুকু পথ যেতে অনেকটা সময় লাগে ওসমানের। ইতিমধ্যেই মানুষ জড়ো হতে আরম্ভ করে দিয়েছে রাস্তায়, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে মৃদুভাবে। সমবেত কোলাহলের বিশিষ্ট সুরটাই বিক্ষোভের। উৎসব-পার্বণে আরও বড়ো জনতার কলরব ওসমান শুনেছে, তার সুর একেবারে অন্যরকম। কোনো রকম গাড়িঘোড়াই একরকম চলছে না রাস্তায়। মোড়ে ওসমানের সামনে একটি মোটর গাড়িকে আটকে জবরদস্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল। পরক্ষণে আর একটি গাড়িকে দাঁড় করানো হল, কিন্তু আরোহীর সঙ্গে দু একটি কী কথা হবার পর সকলে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল, দুজন যুবক দুপাশে হেঁটে মোড়ের ভিড়টা পার করে এগিয়ে দিয়ে এল গাড়িটাকে।

ডাক্তারের গাড়ি। একজন বলল ওসমানের জিজ্ঞাসার জবাবে !

শহরের অন্যান্য জায়গাতেও কি এই রকম শুরু হয়ে গেছে ?—ওসমান ভাবে। রাইফেলধারী পুলিশ-বোঝাই গাড়ি চলে যায়। ধ্বনি উঠে জয় হিন্দ ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। ওসমান আবার ভাবে, কর্তারা যদি ফের বোকামি করে, লাঠি আর বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে এই রাগ-দুঃখের প্রকাশ, কী হবে তা হলে ?

আমিনা নিজেই দরজা খুলে দেন। তাঁর রাতজাগা চোখ দেখেই ওসমান শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, রসুল—?

সে তো হাসপাতালে ফিরে গেছে ? আসুন বসুন।

ওসমানকে মোড়া দিয়ে আমিনা নিজে রসুল যে টুলে বসে কেরাসিন কাঠের টেবিলে পড়াশোনা করে সেটাতে বসেন। মোড়ার পাড়ের সুতোয় কাজ-করা কাপড়ের ঢাকনিটি ভারী সুন্দর।

ফিরে গেল কেন ?

আমিনার মুখে রসুলের বাড়ি আসা ও হাসপাতালে ফিরে যাবার বিবরণ ও কারণ শুনে ওসমান খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অনেক খুন বেরিয়ে গেছে।

সেটাই ভাবনা এখন। আমিনা ধীরে ধীরে বলেন।

ওসমান বলে, খুন না কি জমা থাকে বোতলে, গায়ে ঢুকিয়ে দেয় ?

তাই দিত ওকে, ও নিজে নিতে চায়নি শুনলাম। বোতলের খুন কম ছিল, অনেকের দরকার ছিল জরুরি, তাইতে।

হাঁ।

আচমকা স্পষ্টতর প্রবলতর হয়ে রসুলকে জামাই করার সাধটা আছড়ে পড়ে ওসমানের মনে। —হাসপাতালে যাই একবার, দেখে আসি ওকে।

এখন ও সব কথা তোলার সময় নয়, আমিনা শুনে হয়তো কী ভাববেন, এ সব জেনেও ওসমান হৃদয়ের তাগিদটা বুঝতে পারে না, বলে, এক আরজ আছে আপনার কাছে, জানিয়ে রাখি। মেয়েটা বড়ো হয়ে গেছে, পরীবাণু। ওকে তো দেখেছেন আপনি ?

কতবার দেখেছি।

পরীবাণুর কথা কোথা থেকে আসে ভেবে আমিনা আশ্চর্য হয়ে যান।

ওর জন্য ছেলে খুঁজছি। তা আমার আরজ রইল আপনার কাছে, রসুল ফিরলে আমার মেয়েকে আপনার নিতে হবে। আমি মজুর বটে, লড়ি হাঁকাই, আমার মেয়ে নিলে ঠকবেন না।

এ তো খুশির কথা। আমিনা বলেন আন্তরিকতার সঙ্গে তবে কি জানেন, রসুলের মত থাকা চাই।

তা চাই না ? রসুলের মত চাই আগে।

আপনার সাথে হাসপাতালে যাব ? আমিনা যেন নিছক প্রশ্ন করেন তার ব্যাকুল আগ্রহ চেপে রেখে।

যাবেন ? ওসমান চিন্তিত ভাবে বলে, হেঁটে যেতে হবে। রাস্তায় হাঙ্গামা চলছে। পরে নয় যাবেন। সেই ভালো। আমি দেখে আসি, ঘরে ফিরবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাব কেমন আছে।

সেই ভালো তবে !

আমিনা জানেন ওসমানের ছেলে-হারানোর ইতিহাস, তারই রসুলের মতো জোয়ান ছেলে। দেশসেবার পথ নিয়ে কাদেরের সঙ্গে তার মতান্তর ছিল বরাবর। বড়ো তেজি ছিল ছেলেটা। মানত যা, করত তাই। খান বাহাদুরের শেষবারের নির্দেশ মানতে তার নাকি দ্বিধা হয়েছিল, ওসমান নিজেই বলেছে আমিনাকে। তারপর হাসপাতালে মরবার তিনদিন আগে বাপের কাছে সে মাপ চেয়েছিল, এস ডি ও-র গাড়িতে চেপে আমাদের ফেলে খান বাহাদুর পালালেন, গাড়ির পেছনের চাকা আমার ডান পাটা পিষে দিয়ে গেল, সে জন্য দোষ দিই না। প্রজাদের মারতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তা কি জানতাম ? আজ এসে প্রজাদের কজনের নাম করে বললেন কি, ওরা আমাদের মেরেছে বলতে হবে ! তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। প্রজারা কেউ আমাদের মারেনি। যাদের নাম করলেন, আমি জানি তারা ভিন্ন গাঁয়ে কিষাণ-সভা করছিলেন। তোমার কথাই ঠিক হল। এবার বেরিয়ে তোমার কথা, জিয়াউদ্দীন সাহেবের কথা শুনব, নিজে তলিয়ে বুঝব, তবে কিছু করব। মরবার তিনদিন আগে যে ভাষায় যে ভাবে কথাগুলি সে বলেছিল, ওসমানের মুখে শুনে, হয়তো ছেলেহারা ওসমানের মুখে শোনার জন্যই, মনে আমিনার গাঁথা হয়ে আছে মুখস্থ করা ইস্তাহারের মতো। ছেলে বাঁচবে এটাই জানা ছিল ওসমানের। ছেলে মরবে, তিনদিনের মধ্যে মরবে, জানা ছিল না তার। সমবেদনায় বুক ভরে গিয়ে আমিনার চোখের জল উপচে পড়তে চায়।

তারা কথা বলছে, ওসমান উঠি উঠি করছে, রসুলের খবর জানাতে সীতা আসে। সমস্ত রাস্তা সীতা ভাবতে ভাবতে এসেছে ঠিক কী ভাবে মার কাছে হাসপাতালে ছেলের অবস্থার কথা বলে মার মনে ছেলের সম্বন্ধে কতখানি আশা আর কতটুকু ভয় জাগানো চলে, যা সঠিক। রসুল মোটামুটি ভালো আছে, এবং ভালো সে দুচার দিনের মধ্যে হয়ে উঠবে, এটাই হল প্রধান কথা। কিন্তু ভয়েরও

কারণ একটু আছে সামান্য, কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার মতো নয়। আমিনাকে তা জানানো দরকার। তার কাছে অনায়াসে গোপন করে যাওয়ার মতো তুচ্ছ নয় আশঙ্কাটা। আমিনাকে আজ ভয়ের কিছুই নেই জানিয়ে যাবার পর আবার কাল যদি চরম দুঃসংবাদটা তাকে জানাতে হয়, সেটা তার সঙ্গে বীভৎস শত্রুতাই করা হবে শুধু।

পথে মনে মনে কথা সাজিয়েছিল সীতা, এখানে এসেই সেগুলি সে ছেঁটে ফেলে। সহজ সরল ভাবে কথা বলাই সে মনে করে উচিত।

রসুলের খবরটা জানাতে এলাম। রসুল ভালো আছে, ঘুমোচ্ছে।

তবে—?

ভয় পাবেন না। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে, তার ওপর রাত্রে আবার বাড়ি এসে ফিরে যাবার হাঙ্গামা করায় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওকে রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতক্ষণে বোধ হয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অল্পসময়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে জানেন তো, খুব দুর্বল অবস্থায় একটু ভয় থাকেই।

ও ! দুজনে একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সীতাকে চমকে দিয়ে বলে, ভয় তো আছেই।

সীতা নিজেও স্বস্তি বোধ করে বলে, তাই বলছিলাম। শুধু দুর্বল তো রক্তক্ষয়ের জন্য, রক্ত দিলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শক-এর ভয়টুকু আছে। সেটা সব ক্ষেত্রেই থাকে, সাধারণ অপারেশন, ডেলিভারি—

সীতা যেন লজ্জা পেয়েই থমকে থেমে যায় আমিনার দিকে চেয়ে।

আমিনা সায় দিয়ে বলেন, তা ঠিক। ধরো নবছর পরের এ জঞ্জালটা দু-তিনমাস পরে বিয়োতে হবে, মরেই যাব হয়তো ! দুমাস আগে জেলে গেলেন, তিনখানা চিঠি পেয়েছি আজতক তার। প্রতি চিঠিতে শুধু জিজ্ঞেস করছেন, আমার কী হল, আমি কেমন আছি, কী হল যেন চটপট জানাই, কারণ এই ভয়ে উনি মরছেন। জানো মেয়ে, ছেলের চেয়ে আমার জন্য তার ভয় বেশি। ছেলের যা মতামত জানতেন, তাতে কেউ খুন না করলে ছেলের কিছু হবে না ধরাই ছিল। তাছাড়া, উনি ভাবতেন, ছেলের বয়স হয়েছে, ছেলে মরদ। মরদ যদি মরদের মতো মরে—

এর ওর কাছে রসুলের মার কথা সীতা শুনেছিল, এমনটি ভাবতে পারেনি। রসুলকে বাদ দিলে এই অবস্থায় এখন তাঁর দশ বছরের একটি ছেলে মাত্র সম্বল ! রসুলের জেল হলে কী করবেন সে কথাটা কি ভাবছেন না উনি ? ভাবছেন নিশ্চয়। ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন এ আত্মবিশ্বাস আছে। যা হবার হবে ভেবে হাল ছেড়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মানুষ তো ওকে মনে হয় না।

সীতা একটা খাপছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে হঠাৎ—

আগে আপনার পর্দা ছিল ?

ছিল না ? আমিনা বলেন জোর দিয়ে, বাঙালি মেয়ের পর্দা আজও ঘোচেনি—তার আর আগে ছিল কি বলো ?

ওসমান সায় দেয়, তা ঠিক।

হাসপাতালে বিশেষ করে ওসমানের জন্যই যেন চমকপ্রদ এক ধাঁধা তৈরি হয়েছিল।

মাল ? মাল ছিল নাকি ওর সঙ্গে ?

ছিল না ? ওর সঙ্গে যে এল প্যাক করা মালটা ?

দাঁড়াও, দেখি খোঁজ করে।

আধঘণ্টা পরে—।

কই, মাল তো নেই। কীসের মাল ? কী ছিল ?

তখনও ধাঁধা লাগে না ওসমানের। জিনিসটা অবশ্যই সরিয়ে রাখা হয়েছে নিরাপদ জায়গায়, যেখানে সেখানে তো ফেলে রাখা যায় না।

কী ছিল কে জানে, প্যাক করা বাক্সের মতো। কাল টেলিফোন করা হল যদি খোঁজ মেলে কার কাছে মালটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কাল রাতে কিছু জানা যায়নি। কথা ছিল, আজ মালটা খুলে দেখা হবে ভেতরে নাম-ঠিকানার কোনো হদিস মেলে কি না। কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো—

না, না। ওর সঙ্গে মাল ছিল না। সকালে লিস্ট করা হয়েছে। এই তো নাম—গণেশ। বয়স একুশ-বাইশ—

নাম-পরিচয় জানা গেছে ? ওসমান সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

শুধু নামটা—গণেশ। হাতে উল্‌কি দিয়ে লেখা ছিল। মালের কথা কিছু নেই।

কী হল মালটা ?

ছিলই না মাল, কী হল মালটা ! মানে ? তোমার নাম কি ? ওসমান ? ওর নাম তো গণেশ। তোমার এত মাথা ঘামানো কেন ওর জন্য ?

ওসমান একটু চুপ করে থাকে।

কী জানি, মাথাটা নিজে থেকে ঘামে।

ভদ্রলোকের মনে অপমানিত বোধ করার ভ্রুকুটি ফুটে উঠতে দেখে ওসমান যেন খুশিই হয় একটু।

সকালে হেমন্ত জামা গায়ে দিচ্ছে বেরোবার জন্য, অনুরূপা সামনে এলেন মুখ ভার করে।

এত সকালে বেরোচ্ছিস যে ?

সীতার কাছে যাব একবার।

অনুরূপার মুখ আর একটু লম্বা হয়ে যায়।

চা খাবি না ?

সীতার ওখানে খাব।

এ সব তোরা কী আরম্ভ করেছিস হেমা ? অনুরূপা বলেন দুরন্ত দুঃখের ভাষায়, খোকা কখন কোথায় চলে গেছে আমাকে কিছু না বলে। তুইও বেরিয়ে যচ্ছিস। বলে কি যেতে নেই একবার আমাকে ? এতই তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি ?

বেরিয়ে তো যাইনি মা এখনও ? বলেই যেতাম তোমাকে।

ভুল-ঘরে লাগানো জামার বোতামটা খুলতে খুলতে হেমন্ত বলে অনুযোগের সুরে। সকালে আবার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল মার মনে কে জানে ! এত সকালেই সংযম হারিয়ে অনুরূপা মান-অভিমানের পালা গাইতে শুরু করবেন হেমন্তের বিশ্বাস হতে চায় না। এমন সোজাসুজি জ্বালা বা দুর্বলতা প্রকাশ করাও তো মার স্বভাব নয়।

আবার বলে হেমন্ত সহজ সুরে, সকালে বেরোব, তোমায় তো বলাই আছে। একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, সীতা হয়তো বেরিয়ে যাবে। তাই ভাবলাম, ওখানেই চা খেয়ে নেব। চায়ের জল চাপিয়েছ না কি ? তাহলে খেয়েই যাই।

একা আমি কতদিক সামলাব হেমা ? কতকাল সামলাব ? হেমন্তের কথা যেন কানেও যায়নি এমনিভাবে অনুরূপা বলেন, রোজগার করে সংসারও চালাব, তোমাদের কার মাথায় হরদম কী পাগলামি চাপবে তাও খেয়াল রাখব, অত আমি পারব না হেমা। এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম। বড়ো হয়েছ, ভাইটার দিকে একটু তাকাতে পারো না ? না বলে কোন ফাঁকে খোকা কোথায় চলে গেছে। কিছু খায়নি পর্যন্ত। খুঁজে ডেকে এনে শাসন করতে পার না একটু ওকে ?

কোথায় গেছে, এখুনি আসবে। এতে আবার শাসন কীসের ?

তুই কিছু বুঝিস না হেমা। এমনি না বলে একটু এদিক ওদিক যায়, সে আলাদা কথা। ছোটো ছেলে অমন করেই। কাল হইচই করতে যেতে চাইছিল, আমি যেতে দিইনি। সকাল হতে না হতে তাই ইচ্ছে করে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি পালিয়েছে।

বেশি আটকালে এ রকম হয়। পাড়ার সব ছেলে রাস্তায় বেরিয়েছে, খোকা বন্দী হয়ে থাকবে ?

বলে যেতে পারত।

কেন বলেনি জানো ? যদি মানা করো এই ভয়ে। তা হলে তো তুমি আরও বেশি রাগ করতে, মানা করলাম, তবু চলে গেল ! তোমার মনে কষ্ট দিতে চায়নি খোকা, বুঝতে পারছ না ? আমারও তো ভয় হচ্ছিল কাল, তুমি যদি বারণ করো, কী করে তোমার মনে কষ্ট দেব।

বুঝেছি। কোনো কথা শুনবে না ঠিক করাই থাকে তোমাদের, আমার সঙ্গে শুধু একটু ভদ্রতা করো।

মার সঙ্গে অভদ্রতা করতে হয় না কি ?

হেমন্ত হাসে। অনুরূপাও এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন মনে হয়।

যাকগে, যা খুশি করো। আমি তো এবার পেনশন নেব সংসার থেকে। তোমাদের ঘাড়েই চাপবে ভাইবোনের ভার।

তোমাদের ? তোমাদের কে কে মা ? ও ! আমি আর তোমার ছেলের বউ। তুমি এত হিসেব জানো মা ?

কতদিন এ ভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলবে, ঠেকিয়ে রাখা যাবে ? হেমন্ত ভাবে পথে নেমে। এই তো সবে সূচনা, শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে এই মায়ার লড়াই কে জানে ! অথবা ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে সব, সময় পেলে সম্ভব হবে মানিয়ে নেওয়া, শান্তি পাওয়া মার পক্ষে—তার পক্ষেও ? বুঝে উঠতে পারে না হেমন্ত। পরিবেশ গড়ে মানুষকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাই সহজ মানুষের পক্ষে, অতি দরকারি লড়াইও এড়িয়ে চলতে মানুষ তাই এত ব্যাকুল, পলাতক মনোভাব তাই এত প্রবল। পালিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে চলার দিন তার পক্ষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কী করতে হবে তাকে আগামী দিনগুলিতে, ঠিকমতো তার জানা নেই। বিশেষ অবস্থায় আজকের দু-চার দশদিনের বিশেষ কর্তব্য হয়তো তার জানা আছে, কিন্তু তারপর যখন দৈনন্দিন জীবনকে গড়তে হবে নতুন করে তার নিজের, মার, রমা ও খোকনের, চেনা ও অচেনা সব মানুষের জীবন গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, খাপ খাইয়ে, সম্মুখের দিকে গতি বজায় রেখে, শত শত গ্রহণ বর্জন নিয়ন্ত্রণ পরিমার্জনের মধ্যে ভীরুতা ও দুর্বলতা, হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের খেলা ও লড়াই-এ বাঁচা ও বাঁচানোর সংগ্রামে, তখন কী ভাবে কী করবে ভেবেও পাচ্ছে না সে। আজ অবশ্য ভাবার সময় নয় ও সব—

কেন নয় ? সীতা আশ্চর্য হয়ে যায় তার কথা শুনে, ভাববার যা আজ থেকে তা ভাবতে শুরু করলে দোষটা কি ? ওই ভাবনায় মশগুল হয়ে তুমি তো আর সব ভুলে যাচ্ছ না ? একদিনে সব ভাবনা শেষ করে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠছ না ? সেটা তাহলে ভাবা হবে না, কাব্য হবে। একদিনে মানুষ বদলায় না। হঠাৎ বিবাগী হয়ে যে ঘর ছাড়ে, তারও ওই ঘর ছাড়াটাই ঘটে হঠাৎ, বৈরাগ্যটা নয়। আর তুমি তো সংসারে থেকে কাজ করবে। ভাবো, মাথা গুলিয়ে ফেলো না। একদিনে সব ভাবনা মিটিয়ে দিতে চেয়ো না। রোজকার ভাবনা রোজ ভাবলে, রোজকার কাজ রোজ করলে, দেখবে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ ধীর স্থির শান্ত ভাবে—

নিশ্চয় ! ওটা দরকার। বিশেষ করে তোমার পক্ষে। মনকে একটু বশে না আনলে কেউ ভাবতে পারে না, সে এলোমেলো ভাবনার শেষ আছে ? রাগ কোরো না, নিজেকে তুমি একা বলে জানো। তুমি

ভাবতে শেখোনি সংসারে আরও দশজন আছে, আরও দশজনে ভাবে, আরও দশজনে কাজ করে। নিজেকে দশজনের একজন বলে জানলে, দশজনের সঙ্গে ভাবতে আর কাজ করতে শিখলে, তোমার ভাবনা চিন্তার আসল গোলমালটা কেটে যাবে। ওটা হঠাৎ হয় না। মানুষ একদিনে বদলায় না হেমন্ত।

কিন্তু মার কী হবে ?

সব ঠিক হয়ে যাবে। কেন ভাবছ ? সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কিছু তুমি হতেও যাচ্ছ না, করতেও যাচ্ছ না। যদিও তোমার হয়তো ওই রকম কিছু মনে হচ্ছে। তোমার যেমন নাট্যবোধ, জীবন-নাট্য তেমন নয় হেমন্ত। সীতা একটু থেমে বলে, উপদেশের মতো লাগছে ?

হেমন্ত সায় দিয়ে বলে, তা লাগছে কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে।

কথাগুলি কিন্তু আমার উপদেশ নয় হেমন্ত। সীতা জোর দিয়ে বলে, তোমারও কিছুদিন আগে থেকে আমার বেলা যা ঘটতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এ শুধু পরামর্শ। আস্তে আস্তে আজকাল কি বুঝতে পারছি জান ? দেশ কাকে বলে তাই আমি জানতাম না দুবছর আগে, এই ভীষণ সত্যটা ! অথচ কী প্রচণ্ড অহংকার ছিল দেশকে ভালোবাসি বলে !

চায়ের কাপ মুখে তুলে চুমুক দিতে গিয়ে হেমন্ত চেয়ে থাকে সীতার মুখের দিকে। নিজের ভুল আবিষ্কার করতে পারার জন্য সীতা কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ। যে বিশ্বাস মুখে এমন দীপ্তি, চোখে এমন উজ্জ্বল স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি এনে দিতে পারে, সরল ও নম্রও বুঝি মানুষ হয় সেই বিশ্বাসের জোরেই। সীতাকে নিয়ে বহু দিনের বহু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশার অভিজ্ঞতা তো মুছে যায়নি হেমন্তের হৃদয় থেকে আজ এখানে আসবার সময়েও, এত ঘনিষ্ঠ হয়েও সীতাকে ভালো করে চিনতে না পারার জ্বালাটাই বুঝি তার ছিল বেশি—সীতাই যেন নানা কলাকৌশলে ওই দুর্বোধ্যতার ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেকে তার নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছিল, দূরে যে সরিয়ে রাখা হয়েছে এটুকু জানতে বুঝতে দেবার দয়াটুকুও দেখায়নি। হৃদয়ে অনেক কাঁটার অনেক ক্ষতে আজ যেন প্রলেপ পড়ে হেমন্তর। নিজেকে তার ছোটো ভাবতে হয়, কিন্তু সে জন্য তার খুব বেশি দুঃখ বা ক্ষোভ হয় না। বরং তৃপ্তির সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই সে এ জ্ঞানকে মেনে নেয় যে, নিজের ছোটোমি দিয়েই সে পার্থক্য রচনা করেছিল তাদের মধ্যে, সীতা তাকে ঠেকিয়ে রাখেনি। কৃত্রিম আকর্ষণও সীতা সৃষ্টি করেনি তার জন্য, কৃত্রিম রহস্যের আবরণেও নিজেকে ঘিরে রাখেনি। সেই তার ছোটো মাপকাটিতে সীতাকে মাপতে গিয়ে, তার গরিবের মূল্য বিচার দিয়ে দাম ঠিক করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, দুঃখ পেয়েছে। সীতার যে একটা সহজ স্বাভাবিক সরলতার গুণ আছে, তার পুরো দাম দিতে পর্যন্ত সে তো কোনোদিন রাজি হয়নি। সীতার যা আছে সে তা মেনে নিতে পারেনি, কেটে-ছেঁটে কমিয়ে নিয়েছে নিজের প্রয়োজনে, তার নিজের অল্পতার সঙ্গে, দৈন্যের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রাখতে। যতই হোক, সীতা তো মেয়ে !

কী ভাবছ ? চা-টা খেয়ে নাও। একটু ইতস্তত করে সীতা, যেচে সহজ সরল হতে গিয়ে সেটা অনর্থক হলে বড়ো বিশ্রী লাগে। নিজের চা সে শেষ করে। ভূমিকা যা করবে ভেবেছিল সেটা বাদ দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, মাসিমা কী ভাবে নিলেন ?

কাল রাত্রে ভালোভাবেই নিয়েছিলেন। সকালে যেন কেমন দেখলাম। মার মনে একটা খটকা লেগেছে—খটকা কেন বলি, মার খুব হিংসা হয়েছে।

জানি। সীতা চোখ তোলে, কাল তোমায় খুঁজতে এসেছিলেন, বলেই ফেলেছেন আমার কাছে। তোমায় নাকি পুতুল করে ফেলেছি আমি, খুশিমতো নাচাচ্ছি। একেবারে বিশ্বাস জন্মে গেছে।

হেমন্তের কথায় নিরুপায়ের আপশোশ ফুটে ওঠে, আমরা কী করব। কাল রাত্রে মার সঙ্গে কথা কয়ে কত খুশি হয়েছিলাম। সকালে পাঁচ মিনিটে মনটা বিগড়ে দিলেন। ঠিক কথাই বলেছ তুমি, মানুষ একদিনে বদলায় না।

না হেমন্ত, সীতা মাথা নাড়ে, আমরা কী করব বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মাসিমাকে সময় দিতে হবে।

মানে ?

মানে মাসিমাকে বুঝে উঠতে, সয়ে নিতে সময় দিতে হবে। কাল আমিও চটে গিয়েছিলাম মনে মনে, ছেলেমেয়েদের পঙ্গু করে রাখতে চায় এ কেমন অন্ধ স্নেহ। কিন্তু চটলেও মনটা খচখচ করছিল, কী যেন ভুল হচ্ছে। ভেবে দেখলাম, মাসিমার স্নেহ অন্ধ হোক, মোহগ্রস্ত হোক, তুমি তা উড়িয়ে দিতে পার না হেমন্ত ! আমিও পারি না ! অবশ্য বিশেষ অবস্থায় বড়ো দরকারে এসব স্নেহমমতার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না আমাদের। সে আলাদা কথা। সে কারণ ভিন্ন। বড়ো ব্যাপারে ঘরোয়া লাভক্ষতির হিসাব বাদ দিতেই হয়। কিন্তু এখানে তো কথাটা ঠিক তা নয়। তোমার আমার বন্ধুত্ব নিয়ে যত গন্ডগোল। কাজেই, মাসিমা অন্যায় করলেও তাঁর স্নেহকে অবজ্ঞা করা যায় না, তাঁকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিশেষ করে আমরা যখন জানি, মাসিমাকে একটু প্রশ্রয় দিলে, একটু সময় দিলে উনি সামলে উঠতে পারবেন। মাসিমা স্বার্থপর নন, তোমাদের নিয়েই ওঁর স্বার্থ। আমাকে নিয়ে ওঁর হয়েছে মুশকিল। এটা ওঁর দুর্বলতা, অন্যায়, তা বলব। কিন্তু দুর্বলতাটা জয় করার সময় আর সুযোগ ওঁকে না দিলে সেটা আমাদের অন্যায় হবে। তোমাকে তাই একটা কথা বলতে চাই।

বলো।

কিছুদিন তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দাও।

কত দিন ?

তোমায় আমি কেড়ে নিয়ে বশ করেছি এ ধারণাটা মাসিমার যদ্দিন না কাটে। শুধু মেলামেশা কমানো নয়, তোমার চালচলন থেকে মাসিমা যেন আবার ধারণা না করে বসেন, মিশতে না পেয়ে আমার জন্য তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে ! এটাও তোমার খেয়াল রাখতে হবে। তাই বলে এমন ভাবও দেখিয়ো না যেন সীতা বলে কেউ ছিল তুমি তা স্রেফ ভুলে গেছ—মাসিমা তাহলে ভাববেন একটা খেলা করছি আমরা ওঁর সঙ্গে।

হেমন্ত সংশয়ভরে বলে, ওটা কি মার সঙ্গে ছলনা করা হবে না সীতা ?

সীতা জোর দিয়ে বলে, না। কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করলেও মাসিমা সেটাকে এখন বিকৃত দৃষ্টিতে বিচার করবেন, খুঁজে খুঁজে শুধু বার করবার চেষ্টা করবেন আমার জন্য ওঁকে কীসে তুমি অবহেলা করলে, কীসে তুচ্ছ করলে। ওঁর বিকারটাই তাতে জোরালো হবে। শান্ত মনে ভাববার বুঝবার সময় পেলে উনি এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। মা অসুস্থ, কিছুদিন তুমি তাঁর চিকিৎসা করবে। এতে ছলনার কী আছে ?

হেমন্ত চুপ করে ভাবে। তার মুখে মৃদু হতাশা ও অসহায়তার ভাব ফুটে উঠতে দেখে দুঃখের সঙ্গে সীতা ভাবে, তাকে ছেড়ে দূরে দূরে কী করে থাকবে তাই কল্পনা করতে আরম্ভ করেছে কি হেমন্ত নিজের মধ্যে গভীর বেদনা জাগাতে ? হেমন্ত কথা কইতে সে স্বস্তি পায়। অত হাল্‌কা নয় হেমন্ত !

এই সময়টাতেই তোমাকে আমার বেশি দরকার ছিল।

না হেমন্ত, বিনা দ্বিধায় সীতা বলে, এটা তোমার ভুল। আমি সব সময় পেছনে লেগে না থাকলে যদি তুমি ভেস্তে যাও, তবে তাই যাওয়াই ভালো। কিন্তু তা সত্যি নয়, ভেবো না। তোমার নতুন বিশ্বাস শিথিল হবে না, মনের জোরে ঘাটতি পড়বে না। এমন অনেককে পাবে, যারা বরং ওদিক দিয়ে আমার চেয়ে বেশি কাজে লাগবে তোমার এ সময়। তা ছাড়া, সীতা স্নিগ্ধ হাসি হাসে, আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে তো বলিনি তোমায়।

জয়ন্তের মনে শুধু এই ভয়, বাড়ি ফিরলে মা বকবে। আর সব ভয়-ডর সে ভুলে গেছে। সে আর তার দশ-বারোজন সঙ্গী আজ পৃথিবী জয় করতে পারে। পাড়ার এই ছেলেদের সঙ্গে কত রকম খেলা সে খেলেছে, কত অ্যাডভেঞ্চার করেছে রায়বাবুদের বাড়ির সামনের লোহার গেট ও প্রাচীর ঘেরা ছোটো বাগানের ফুল চুরি করা থেকে বগলস খুলে ডিকসনের কুকুরটাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত, বারো বছর বয়সের জীবনে আজকের মতো এমন উত্তেজনা এমন উন্মাদনা আর কোনোদিন সে পায়নি। এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে বলেই সে বেরিয়েছিল, শিশির, মনা, অশোকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেলা দুপুর হয়ে এল, এখনও তারা ফিরতে পারেনি। বড়ো মোড়ে মিলিটারি লরিটাতে আগুন ধরামাত্র ওখানে ছুটে গিয়েছিল দল বেঁধে দেখতে, তারপর চারটে লরি পোড়ানো দেখে এতক্ষণে তারা পাড়ার গলির মোড়ে ফিরে এসেছে। তার আগে কি ফেরা যায় ? বাড়িতে নয় একটু বকবেই। হাজার হাজার লোকে যখন রাস্তায় নেমে এসেছে, একটি গাড়ি পর্যন্ত চলতে দেবে না পণ করে, সে কী করে বাড়ি ফেরে।

শিশির জিজ্ঞেস করেছিল, কেন গাড়ি চলবে না ভাই ?

জয়ন্ত—তেরো বছরের জয়ন্ত, ন বছরের ছেলের প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, জানিস না ? গুলি করবে কেন ? এটা আমাদের দেশ, আমরা যা খুশি করব। ওরা গুলি করবে কেন ?

অশোক বলেছিল, তাছাড়া, আমাদের স্বাধীনতা চাই তো। পরাধীন হয়ে থাকব কেন শুনি ?

মনা সায় দিয়েছিল, বাবা বলে, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি, তাই স্বাধীনতা পাই না। আমরা তাই এক হয়েছি। দেখছিস না ? এই দ্যাখ।

বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য শান্তি বাহিনীর একটি গাড়ি তিন দলের পতাকা উড়িয়ে মোড়ের মাথায় থেমেছিল, লাউড স্পিকার থেকে ভেসে এসেছিল : সংযম হারালে, দুচারখানা গাড়ি পোড়ালে, অন্যায়ের প্রতিকার হবে না, স্বাধীনতা আসবে না। শান্ত হয়ে সকলে বাড়ি ফিরে যান, কিংবা প্রতিবাদ সভায় যোগ দিন। সংঘবদ্ধ আন্দোলনে দাবি আদায় করুন।

জয়ন্ত বলেছিল, তোকে বলিনি ঢিল ছুড়িস না মনা ? শুনলি তো !

তারপর তারা ফিরে এসেছে এই গলির মোড়ে। গলা শুকিয়ে গেছে তাদের ইনক্লাব, জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বড়োদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা চেঁচিয়েছে, তারা তো তুচ্ছ নয়। খিদেয় অবসন্ন হয়ে এসেছে শরীর। তবু গলির ভেতরে ঢুকে যে যার বাড়ি চলে যাবে সে ক্ষমতা যেন পাচ্ছে না তারা। তাদের শিশু-মনের স্বপ্ন, আর রূপকথা যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে আজ তাদের সামনে শহরের রাজপথে, অফুরন্ত সুযোগ জুটেছে রাজপুত্রের মতো বীরত্ব দেখাবার।

এ মোড়ের অল্পদূরে, একটা লরি পুড়ছিল। তাই দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে থাকে। সৈন্য-বোঝাই একটি লরি আসছে দেখা যায়, শব্দও পৌঁছায় এখানে।

জয়ন্ত বলে দৃঢ়স্বরে, সৈন্যবাহিনীর কম্যান্ডারের মতো, এই শেষবার। এদের শুনিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরব। আমি যা বলব, তোমরা ঠিক তাই বলবে। দু-তিন পা এগিয়ে দাঁড়াই চলো। রেডি ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম। ইনক্লাব—

মনার গায়ে ঢলে জয়ন্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ে। উঠবার যেন চেষ্টা করছে এমনি করে নড়েচড়ে কয়েকবার। দুবার কাশে রক্ত তুলে। তারপর নিস্পন্দ হয়ে যায়। তেরোটি শিশু তাকে ধরাধরি করে গলির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনের প্রথম যে বারান্দা মেলে তাতে শুইয়ে দেয়।

অনুরূপা তখন ধৈর্য হারিয়ে ছেলের খোঁজে গলি দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন।

সাড়ে আটটা বাজে, অজয় এখনও স্নান করতে গেল না। বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই যে কথা আরম্ভ করেছিল, সুধীর আর নিরঞ্জনের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরে, এখনও মশগুল হয়ে কথাই বলে চলেছে। যেন ভুলে গিয়েছে যে দশটায় ওর আপিস, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপিসে পৌঁছতে একঘণ্টার কম লাগে না। হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত হেঁটে না গিয়ে আজ ট্রামে বাসে যাবে যদি ভেবে থাকে, তা ও ভাবুক, কারও তাতে কিছু বলার নেই, মাঝে মাঝে দু একদিন এইটুকু পথ হাঁটার বদলে শখ করে মিছিমিছি ট্রামে বাসে কটা পয়সা বাজে খরচ যদি করতে চায় কেউ তাতে কিছু মনে করে না। কিন্তু এখন স্নান করতে না গেলে ট্রামে বাসে পয়সা নষ্ট করেও যে আপিসে লেট হয়ে যাবে সেটা তো খেয়াল থাকা দরকার ওর।

মৃদু অস্বস্তি বোধ করে বাড়ির লোক, মাধু ছাড়া। ওদের সঙ্গে এত কথাই বা কীসের সবাই ভাবে, মাধু ছাড়া। ক্লাসফ্রেন্ড বটে, এখন তো আর নয়। ওরা কলেজে পড়ছে, অজয় চাকরি করছে। এত ভাব ওদের সঙ্গে এখন না রাখাই উচিত।

অনন্ত সইতে না পেরে মেয়েকে বলে, মাধু আরেকবার ডাক।

এই তো ডাকলাম।

আবার ডাক। কটা বাজল ? আটটা পঁয়ত্রিশ। ডেকে বল পৌনে নটা হয়ে গেছে।

বলেছি তো একবার। দাদার কি সে হিসেব নেই ভাব ? অত খোঁচানো ভালো নয়। মাধু শান্ত গলাতে বলে। আশ্চর্য রকম সে শান্ত হয়ে গেছে আজকাল। সে রকম এলোমেলো মেজাজ আর নেই, একের পর একটা বিয়ের চেষ্টা ফসকে যাবার ক বছর যেমন ছিল। সে যেন ওদিকের সব আশা ভরসা মুচড়ে ফেলে হাল ছেড়ে দিয়ে সুস্থ হয়েছে।

কপালে চাপড় মেরে অনন্ত বলে, তুই আর আমাকে উপদেশ দিসনে মাধু, দিসনে। গলায় দড়ি জোটে না তোর ?

দাও না জুটিয়ে ? মাধু হেসে বলে, দড়ি কিনতেও পয়সা লাগে বাবা। একঘণ্টা ধরে চুল ঘষে দিলাম, দত্তবাড়ির বউটা পয়সা দিলে চার আনা। চার আনায় গলায় দেবার দড়ি হয় না। রোজগার বাড়ুক, দড়িও জুটিয়ে নেব ! .

অনন্ত কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় মেয়ের দিকে।

তার তাক লেগে যায় নিজের ছেলেমেয়েগুলির রকম দেখে। এত যে তার দুঃখ দুর্দশার সংসার, শুধু শুধু অশান্তি আর হতাশা, ওরা কেউ যেন তার অস্তিত্ব মানবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। লড়াই থামতে না থামতে তাকে বুড়ো বয়সে খেদিয়ে দিল চাকরি থেকে, পড়া ছেড়ে চাকরি নিয়ে দুটো পয়সা আনছে ছেলেটা তাই আধপেটার হাঁড়িটা চড়ছে কোনোমতে, যে কাপড় পরে আছে মাধু ওর দিকে তাকানো যায় না, অজয় যে বেশে আপিস যায় যেন কুলি-চাষির ছেলে, আজ বাদে কাল কী হবে ভেবে বুকের রক্ত তার হিম হয়ে আছে, কিন্তু ওরা যেন গ্রাহ্যই করে না কোনো কিছু ! আগে যখন আরও সহজে সংসার চলত, অজয়ের পড়া চালানো, মাধুর বিয়ে দেওয়া, এ সব ব্যবস্থা একরকম করে করা যাবে মরে বেঁচে এ ভরসা করা চলত, তখন যেন কেমন হতাশ, মনমরা ছিল সকলে, রাগারাগি চুলোচুলি কাঁদাকাটা অশান্তি লেগেই ছিল ঘরে—এখন আরও শোচনীয় অবস্থায় এসে ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা হারিয়ে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় জামায় দিন চালিয়ে গিয়েও সবাই যেন জীয়ন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—ভয় নেই ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব, এই ভাব সকলের। মায়ের গঞ্জনায় মাধু একদিন মরতে গিয়েছিল ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে, অজয় গিয়ে সময়মতো না ধরলে সর্বনাশ হয়ে যেত। এখনও গলায় সে দাগ আছে মাধুর। আজকাল গালাগাল গঞ্জনা উপহাস কিছুই সে গায়ে মাখে না। রাগ তো করেই না, হেসে উড়িয়ে দেয় !

অথচ আজ ওর গায়ে আঁটা আছে এই সত্যটা যে কাপড় ও পরে আছে, ওর দিকে তাকানো যায় না।

অনন্ত ঝিমোয়। তার সাধ যায় ছেলেমেয়ের কাছে হার মেনে মাপ চেয়ে বলতে যে এই ভালো ! এই ভালো !

কিন্তু সে চমকে উঠে গর্জেই বলে, অজয় ! আপিস যেতে হবে না আজ ? আড্ডা দিলেই চলবে সারাদিন ?

অজয় ভেতরে এসে বলে, আজ আপিস যাব না বাবা। আজ সব আপিস কারখানায় হরতাল। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

অনন্ত সোজা হয়ে বসে উদ্‌বেগে, আতঙ্কে, উত্তেজনায়। জোর দিয়ে বলে, শিগগির যা, না খেয়ে চলে যা আপিসে। কিনে খাস কিছু খিদে পেলে। হেঁটে চলে যা, দেরি হলে কিছু হবে না। অন্যদিন কামাই করিস যায় আসে না, আজ আপিসে যেতেই হবে। গিয়ে ম্যানেজার সায়েবকে বলবি, ট্রাম বাস বন্ধ, হেঁটে আসতে হল বলে দেরি হয়েছে। বলবি, কয়েক জন জোর করে তোকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিল, তুই অনেক কষ্টে কারও কথা না শুনে আপিসে এসেছিস—

অনন্ত কাশতে শুরু করে। কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে। তবু তারই মধ্যে কোনোমতে বলে, সায়েব খুশি হবে, মাইনে বাড়বে, উন্নতি হবে, আপিস যা।

কাশি থামলে গুটলি মুটলি পাকিয়ে মরার মতো পড়ে থাকে অনন্ত।

মাধু হাওয়া করে, অজয় বুকে পিঠে হাত ঘষে দেয়। গোলমাল শুনে নিরঞ্জন ভেতরে এসেছিল, মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ তোলে না। ছেঁড়াকাপড়ে অনেক যত্নে মাধু যখন নিজেকে মোটামুটি ঢেকে রাখে, তখনও তার দিকে চাওয়া যায় না। এখন সে ব্যাকুল হয়ে নিজের কথা ভুলেই গেছে।

আধঘণ্টা পরে একটু সুস্থ হয়ে অনন্ত ডাকে, অজয় ?

বাবা ?

আজ আপিস যেয়ো না। সবাই যখন আপিস যাচ্ছে না, তোমার যাওয়া উচিত হবে না। সবাই যা করে, তাই করাই ভালো।

নিরুদা, যেয়ো না। কথা আছে। মাধু তার বাইরে বেরোবার আস্ত শাড়িখানা পরে আসতে যায়।

আপনার একটা ওষুধ খাওয়া দরকার কাশির জন্য। নিরঞ্জন বলে।

দরকার তো অনেক কিছুই বাবা। সব দরকার কি মেটে ! ক্ষোভের সঙ্গে বলে অনন্ত।

পাল ডাক্তারকে কতবার ডাকতে চেয়েছি, আপনিই বারণ করেন। অজয় মৃদুস্বরে বলে। অনন্তের মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিমানের নালিশ জানাতে নয়, বাপকে সান্ত্বনা দিতে। অনন্ত নিজেকে সংশোধন করে বলে, ডাকবার দরকার কি ? আমি যেতে পারি না ? ডাক্তারি ওষুধ আমার সয় না।

একখানা মাত্র সম্বল শাড়িখানা পরে এসে মাধু বলে নিরঞ্জনকে, ঘোষেদের বাড়িতে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিলে, আজ নিয়ে চলো। কাল থেকেই কাজ করব, চায় তো ওবেলা থেকেই। কিন্তু ভাবছি কি, মাধু মৃদু সংশয়ের হাসি হাসে, আমার রান্না কি রুচবে ওদের, এতো বড়োলোক মানুষ।

অনন্ত অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। তার মত নেই, তিনি বারণ করেছেন, তবু তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে তারই সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে তার অনায়াসে লোকের বাড়ি রাঁধুনির কাজে ভর্তি করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছে দাদার বন্ধুকে ! লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, অপমান বোধ নেই। অজয় চোখ পেতে রাখে মেঝেতে। লাল সিমেন্টের মেঝে দুবেলা মুছে মুছে তেল চকচকে করে তুলেছে মাধু। মাধু ঝি হোক রাঁধুনি হোক এতে তার লজ্জা নেই। সে থাকতে ওকে রাঁধুনি হতে হয় এমন সে নিরুপায়, এই ক্ষোভে কান দুটি তার ঝাঁঝাঁ করে।

আজ তো হবে না মাধু।

রাঁধুনিদের কাজে যাওয়াও বারণ নাকি আজ ?

নিরঞ্জন হাসে।—আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। আজ কি নিশ্বাস ফেলার সময় আছে ? দশটায় এখানে একটা মিটিং আছে, তারপর বড়ো মিটিং, তাছাড়া আরও কত কাজ।

তোমরা মানে ? দাদাও যাচ্ছ নাকি ? চলো তবে আমিও বেরোই তোমাদের সঙ্গে। একটু দেখে শুনে আসি।

মাধুর চোখ জ্বলজ্বল করে।—বাড়িতে মন টিকছে না আজ। খালি মনে হচ্ছে কোথায় যাই, কী করি।

হাঙ্গামার ভাসা-ভাসা এলোমেলো খবর তারা শোনে গাড়িতেই। কাল থেকে গুলি চলছে কলকাতায়, চারিদিকে লড়াই শুরু হয়েছে সারা শহরে, ভীষণ কাণ্ড। কালকের ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে আজকের ভোরের কাগজে, তাদের গাড়িতেই পাঁচ-সাতজন বাংলা কাগজ কিনে পড়েছে এবং সকলকে পড়ে শুনিয়েছে। আজকের খবর সব ছড়িয়েছে মুখে মুখে। কলকাতার যত কাছে এগিয়ে এগিয়ে স্টেশনে গাড়ি থেমেছে তত ঘন আর ফলাও হয়েছে খবর।

শহরেও হাঙ্গামা, কলকাতা শহরে ? গণেশের মা বিচলিত হয়ে বলেছে, গণশার যদি কিছু হয় ?

যাদব বলেছে তাকে ভরসা দিয়ে, গণশার কী হবে ? লাখো লাখো লোক কলকাতা শহরে, তার মধ্যে তোমার গণশারই কিছু হতে যাবে কী জন্য ?

চিঠিটা ঠিক আছে তো ? গণশার ঠিকানা লেখা চিঠি ? এ কথা এর মধ্যে কম করে—দশ বারোবার শুধিয়েছে গণেশের মা।

বললাম তো ঠিক আছে কতবার। হাঁ দ্যাখো—যাদব ছেঁড়া কুর্তার পকেট থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা পোস্টকার্ডটি বার করে নিজেও আর একবার দেখে নেয় নিঃসন্দেহ হবার জন্য, যদিও দশজনকে দিয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে ঠিকানাটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে, চিঠিখানা হারিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই।

স্টেশন ও স্টেশনের বাইরের অবস্থা দেখে যাদব একেবারে হকচকিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। দু-চারবার সে কলকাতা এসেছে, প্রতিবার সে স্টেশনে নেমে মানুষের গমগমে ভিড় আর স্টেশনের বাইরে গাড়ি ঘোড়ার অবিরাম স্রোত দেখেই হকচকিয়ে গেছে ভয়ে বিস্ময়ে, তার তুলনায় ঘুমন্ত পুরীতে যেন পা দিয়েছে মনে হয় তার আজ। স্টেশনে লোক কিছু আছে, এতটুকু ব্যস্ততা কারও নেই, সবার মুখে যেন গুমোটে মেঘ। বাইরে গাড়ি-ঘোড়ার স্রোতটি অদৃশ্য। যাদবের মনে হয়, একদিন ঘুম ভেঙে উঠে তাদের গাঁয়ের পাশের নদীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখলেও বোধ হয় এমন তাজ্জব লাগত না তার।

হেঁটেই যেতে হবে গণশার মা।

উপায় কি তবে আর ? হবে তো যেতে, না কি ?

পথটা শুধোও কাউকে ? রাণী বলে।

পুল পেরোই আগে। তারপর শুধোব।

তবে সাথে চলো যারা যাচ্ছে দেরি না করে, একলাটি পড়ে গেলে ভালো হবে শেষে ?

মোটঘাট বিশেষ কিছু নেই, সেও রক্ষা। মেটে হাঁড়িতে দুমুঠো সিদ্ধ করার চাল জুটলে যে ভাগ্য বলে মানে তার আবার মোটঘাট। কাঁথা বালিশের বান্ডিলটা যাদব বাঁ হাতের বগলে নেয়, গাড়ির

ঝাঁকানিতে ডান হাতের ব্যথা বেড়ে অবশ অবশ লাগছে। মনাকে কাঁখে নিয়ে গণেশের মা কাপড়ে বাঁধা চালের পুঁটলিটা হাতে নেয়, সের চারেক চাল আর দুটো বেগুন আছে। কটা গেলাস বাটি আর জামাকাপড়ের বাঁশের ঝাঁপিটা নেয় রাণী, দু বছরের কালীর হাতটা ধরে। ঘুমকাতুরে খিদেকাতুরে মেয়েটা এত ঘুমিয়ে এত খেয়েও একটানা কেঁদে চলেছে।

কোথা যাবে তোমরা ?

রাণী মুখ বাঁকায়। সেই বাবুটা, চশমা কোট পালিশকরা জুতোর সেই বদ মার্কা। যে শুধু তাকাচ্ছিল, তাকাচ্ছিল, তাকাচ্ছিল। চোখ দিয়ে যেন কাপড়ের নীচে তার গা চাটছে।

যাদবের মুখে ঠিকানা শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে যায়, সে যে অনেক দূর, যাবে কী করে ? এমনি যদি বা যেতে পারতে অন্যদিন, আজ সে রাস্তাই বন্ধ ওদিকের। পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। লোকেরা ইট ছুঁড়ছে, গাড়ি পোড়াচ্ছে, মারা পড়বে সবাই তোমরা।

ছেলে আছে ওই ঠিকানায়। ছেলের কাছে যাচ্ছি বাবু।

আজ যেতে পারবে না, ভদ্রলোক বলে জোর দিয়ে, দ্যাখো দিকি গাঁ থেকে শহরে এসে কী বিপদে পড়লে।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ভাবে, অনেক ইতস্তত করে, তারপর যেন নিরুপায়ের মতো অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, আজ যেতে পারবে না। এক কাজ করো বরং, আমার বাড়ি কাছে আছে, সেখানে আজ থেকে যাও। হাঙ্গামা কমলে কাল-পরশু যেও ছেলের কাছে, আমি না হয় ছেলেকে তোমার একটা খবর পাঠাবার চেষ্টা করব।

রাণী ফুঁসে ওঠে। কতটা হাঁটতে হবে, দাঁড়িয়ে থেকোনি বাবা। যেতেই হবে তো দাদার কাছে আজ। চলো এগোই মোরা। চলো---

যাদব তাকায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে, মুখটা সত্যি সুবিধের নয়। আর তাও বটে, নজরটা বাবুর আটকে আছে রাণীর ওপর।

ছেলের কাছে যেতেই হবে বাবু, মরি আর বাঁচি।

চলো না এগোই ?—রাণী ধমকের সুরে বলে নিজে চলতে আরম্ভ করে দিয়ে, যাদবও চলতে শুরু করে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, সিগারেট ধরিয়ে পুলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাবু গঙ্গার শোভা দেখছেন একমনে।

পুল পেরিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে রীতিমতো খটকা লাগে যাদবের যে, বাবুটি মিছে বলে ভাঁওতা দিতে চেয়েছিল তাদের, না সত্যি যা ঘটছে তারই সুযোগ নিতে চেয়েছিল সত্যি কথা বলে। বড়ো একটা গাড়ি দাউদাউ করে পুড়ছে মোড়ের মাথায়, এ পাশে পুড়ে কালো হয়ে কঙ্কাল পড়ে আছে দুটো ছোটো গাড়ির। ইটপাটকেলে ভরে আছে রাস্তা। এ ধারে একপাশে কয়েকজন মিলিটারি সায়েব আর একদল গুর্খা সেপাই দাঁড়িয়ে দেখছে, ওধারে মোড়ের মাথা থেকে রাস্তার ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত লোকারণ্য, এমন আওয়াজ তুলেছে তারা যেন অনেক গন্ডা আহত বাঘ ফুঁসছে এক সাথে।

কী করে কোথা দিয়ে তারা যাবে ?

আশেপাশের লোকদের মধ্যে ছিটের শার্টের ওপর কমদামি পুরানো আলোয়ান জড়ানো গরিব গোছের একটি ভদ্রলোকের ছেলে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকবার তার মুখটি খর-নজরে দেখে যাদব গণেশের পোস্টকার্ডখানা বার করে। কিন্তু কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ছেলেটি হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। বাঁয়ে যে দিকের রাস্তার মোড়ে ও ভেতরে ভিড় জমেছে সে দিকে নয়, ডাইনে যে দিকে প্রায় ফাঁকা রাস্তা মিলিটারি দখল করে আছে, সে দিকে।

হাসপাতালে আহত একটি ছেলের আত্মীয়ের আসবার কথা ছিল, অজয় স্টেশনে এসেছিল তাকে ছেলেটির খবর জানিয়ে দিয়ে যাবার জন্য। ছেলেটির অবস্থা ভালো নয়। আত্মীয়টি আসেননি, অথবা এসে থাকলেও চেহারার বর্ণনা শুনে চিনে উঠতে পারেনি। ফিরবার সময় পুল পার হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত অসহনীয় দৃশ্য দেখছিল অজয়। ভিড় সরে এসে জমা হয়েছে এ পাশে, ও পাশের রাস্তা দিয়ে লোক চলছে খুব কম—জরুরি দরকার না থাকলে ওপথে প্রাণ হাতে করে অকারণে কে চলতে চাইবে। ইট পাটকেলে ভর্তি হয়ে আছে রাস্তাটা, সেই রাস্তা সাফ করছে দশ-বারো জন ভদ্রলোক। ওদের ধরে জোর করে রাস্তা সাফ করানো হচ্ছে। সাদা নীল স্ট্রাইপ কাটা শার্ট গায়ে এক ভদ্র যুবককে বেঁটে লালচে গোঁফওলা একজন অফিসার ফুটপাথ থেকে টেনে নামিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দিল। ওরা কি জানে না মুখ বুজে এ জুলুম সহ্য করা পাপ ? কী বলে ওরা হুকুম পেল আর ইট পাটকেল সরাবার কাজে লেগে গেল ? অজয়ের মনে হয়, ওরা যে মুখ বুজে এ অপমান সইছে এ জন্য দায়ি সে। তারও তো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার, কিন্তু হাঙ্গামার ভয়েই তো না এগিয়ে এতক্ষণে সে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। লোক চলছে ও রাস্তায়, সবাইকে ধরে রাস্তা সাফের কাজে লাগাচ্ছে না। যদি তাকে ধরে, এই তো তার ভাবনা। সে তো কোনোমতেই হুকুম শুনে ইটপাটকেল সাফ করার কাজে লেগে যেতে পারবে না ওই ভদ্রলোক কজনের মতো। তাহলেই তখন গোল বাধবে।

কিন্তু তাই বলে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভীরু কাপুরুষের মতো ? সে হাঙ্গামা করতে আসেনি, কাজে এসেছে। ও রাস্তায় লোক চলা নিষিদ্ধ হয়নি। তার হেঁটে যাবার অধিকার আছে ও রাস্তা দিয়ে। সে যদি অন্যায় না করতে, অধিকার বজায় রাখতে ভয় পায়, ওরা ইঁটপাটকেল সাফ করতে লেগে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

অজয় এগিয়ে যায়।

হুই ! বলে লালচে গোঁফওলা অফিসার, কাছে এসে সোজা সহজ হুকুম জারি করে, সাফ করো।

অজয় প্রশ্ন করে, এ রাস্তায় কি ট্র্যাফিক বন্ধ ?

প্রশ্ন শুনেই বোধ হয় রেগে যায় লালচে গোঁফ, আর রেগে যায় বলে ধৈর্য ধরে বলে, সাফ করো। সাফ করো। তুম ইটা ফিকা, তুম সাফ করোগে।

ইউ আর ম্যাড। অজয় বলে।

তখন দুহাতে ধাক্কা দিয়ে অজয়কে সে ফেলে দেয় রাস্তায়। মাথায় সামান্য একটু চোট লাগে অজয়ের। ডান হাতের কাছে একটি ইট। মাটি পোড়ানো ইট নয়, শক্ত পাথুরে ইট, যা দিয়ে রাস্তা বাঁধায়। চোখে অন্ধকার দেখছে অজয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এখন উন্মাদ। হাতে তার জোর আছে। এই ইটটা ছুড়ে মেরে সে মাথার ঘিলু বার করে দিতে পারে লালচে গোঁফের। তারপর যা হয় হবে।

না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে অজয় বলে, না। সে ভদ্রলোকের ছেলে, কে একজন তাকে অপমান করেছে, এই ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্ধ হয়ে কিছু তার করা চলবে না। হাসপাতালের আহত ছেলেদের মুখ তার মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাস্তায় বসা একদল তরুণের মুখ। না, নরক থেকে শয়তান এসে তাকে বিগড়োবার চেষ্টা করলেও সে খাঁটি থাকবে। সে সংযত থাকবে। সে শান্ত থাকবে।

ধীরে ধীরে অজয় উঠে দাঁড়ায়। বাঁ হাতটা কি ভেঙে গেছে ? গেছে যদি যাক, এখন তা ভাববার সময় নয়, ভাঙা হাত জোড়া লাগবে।

লাল গোঁফ তাকিয়ে থাকে। সিমেন্টের শক্ত ইটটা সে দেখেছে, অজয় যখন ইটটা নামিয়ে রাখছে। তার মাথায় ছুঁড়ে মারবার জন্য ইটটা তুলেছিল। মারল না কেন ? ও ইট মাথায় লাগলে সে বাঁচত না। কিন্তু মারল না কেন ? লালগোঁফ বোধ হয় বুঝে উঠতে পারে না, তাই তাকিয়ে থাকে।

উঠে দাঁড়াবার পর অজয় টের পায় একটি গেঁয়ো পরিবারের মেয়ে পুরুষ তাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। ক্রমাগত প্রশ্ন হচ্ছে, লাগেনি তো ? বেশি লাগেনি তো বাবু ?

না। লাগেনি।

তখন যাদব আবার পোস্টকার্ডটি বার করে সামনে ধরে বলে, বাবু এ ঠিকানায় কোনদিকে যাব ?

দাঁড়াও বাবু একটু, অজয় বলে তার দিকে বা ঠিকানার দিকে না তাকিয়েই।

খানিক পরে নিজে চলতে আরম্ভ করে অজয় থেমে যায়। যাদবকে বলে, কী বলছিলে তুমি ?

ঠিকানা পড়ে বলে, ডালহাউসি স্কোয়ার চেনো ? লালদিঘি ? লালদিঘি ? চিনি বাবু।

বাঃ, তবে আর ভাবনা কি ? লালদিঘি চারকোনা তো, পুবে দুটো কোণ আছে। পুব-উত্তর কোণে একটা, পুব-দক্ষিণ কোণে একটা। যে কোনো কোণ থেকে পুবের রাস্তা ধরে এগোবে বুঝলে ?

যাদব মাথা নাড়ে।

কেন, বুঝলে না কেন ? দুকোণ থেকে দুটো রাস্তাই পুবে গেছে, দশটা নয়। লালবাজারের সামনে দিয়ে গেলে বউবাজারের মোড় হয়ে ডাইনে বাঁকবে, মিশন রো হয়ে গেলে ট্রাম-রাস্তা পার হবে, তারপর একজন কাউকে জিজ্ঞেস করলেই—

যাদব নীরবে পোস্টকার্ডটি ফিরিয়ে নেয়।

অজয় এবার গম্ভীর মুখে বলে, তবে আমার সঙ্গে এসো। আমিও লালদিঘি যাচ্ছি। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাব আমি। অন্য রাস্তা নেই। সঙ্গে এসে মেয়েছেলে নিয়ে মুশকিলে পড়তে পার। বুঝে দ্যাখো।

রাণী বলে, চলুন যাই।

জোরে জোরে হেঁটে সে এগিয়ে যায়। লাল গোঁফের কাছ দিয়েই হাঁটতে থাকে। এবার কিন্তু লাল গোঁফ তাকিয়েই থাকে শুধু। খানিক দূরে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় যাদবদের জন্য অজয় থেমে দাঁড়ায়। আবার এগোয়, আবার থামে। তার বিরক্তিভরা মুখ দেখে যাদব অস্বস্তিবোধ করে। তবে জাল পেতে বোকা হাবা গেঁয়ো লোক ধরা শহুরে বেদে এ ছোকরা নয়, এটা সে বিশ্বাস করে অনায়াসে।

একবার বলে যাদব কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষায়, মোদের তরে মিছিমিছি হাঁটতে হল বাবু আপনাকে।

না বাবু হাঁটতে আমাকে হতই, একটু বেশি হাঁটা হচ্ছে। কী করি বল, তোমরা তো নাছোরবান্দা।

জেটি শেড ডাইনে রেখে তারা সোজা এগোতে থাকে। চারিদিকে কর্মহীন স্তব্ধতা, উগ্র প্রতীক্ষার মতো। শেডের ফাঁক দিয়ে রাণী মস্ত চোঙাওলা বিদেশি জাহাজের দিকে তাকায় মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ভালো করে না দেখতে দেখতে আড়াল হয়ে যায় সেগুলি।

বিদ্যুৎ লিমিটেড খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই—এতখানি রাস্তা হেঁটে গিয়ে খুঁজে বার করার কষ্টটা ছাড়া। কিন্তু দোকান বন্ধ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। যাদব বলে, কী সব্বোনাশ !

অজয় রাগ করে বলে, তোমার ঠিকানা ভুল হয়েছে। যা খুশি কর তোমরা, আমি চল্লাম।

সে অবশ্য যায় না। শোভাযাত্রায় যোগ দিতে মনটা যতই ছটফট করুক, এ বেচারিদের একটা হিল্লে না করে ফেলে যাওয়া যায় কেমন করে। যাদবের কাছ থেকে গণেশের চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে আরেকবার সে ঠিকানা মিলিয়ে দ্যাখে। ঠিকানা ঠিক আছে। এই দোকানেই গণেশ কাজ করে। এখন দোকানের মালিকের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে। তার কাছে যদি গণেশের খোঁজ মেলে।

অত বড়ো আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা চিঠিখানা পড়ে অজানা গণেশকে ভালো লেগেছিল অজয়ের। চিঠির প্রতি ছত্রে অশুদ্ধ গ্রাম্য কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে মা-বাপ-ভাই-বোনের জন্য

গণেশের মমতা ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য শহরে তার প্রাণপণ লড়ায়ের ইঙ্গিত : কত যে ভরসা দেওয়া আছে চিঠিতে আর তাতেই ধরা পড়ছে অতি কঠিন অবস্থাতেও গণেশের তেজ আর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু গণেশের বুদ্ধি বড়ো কম। যে দোকানে কাজ করে সেখানকার ঠিকানাটা শুধু না দিয়ে, যেখানে সে থাকে সে ঠিকানাটা তার দেওয়া উচিত ছিল।

বাড়ির দরোয়ানকে প্রশ্ন করে তার জবাব শুনে অজয় স্বস্তি বোধ করে। গণেশের বুদ্ধির ত্রুটিটাও মাপ করে ফেলে। বিদ্যুৎ লিমিটেডের মালিক এই বাড়িরই ওপরে থাকে এবং গণেশও তার কাছেই থাকে এ খবর জেনে যাদবেরাও নিশ্চিন্ত হয়।

রাণী বলে খুশি হয়ে, মা গো ! ভড়কে গিয়েছিলাম একেবারে ! বাঁচা গেল।

অজয় বলে, আমি তবে যাই এবার ?

যাদব গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, হ্যাঁ বাবু, আপনি এবার আসুন। অনেক করলেন মোদের জন্য।

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তার কৃতজ্ঞতাকে গ্রহণ করে অজয় নীরবে বিদায় হয়ে যায়।

যাদব আবেদন জানায় দরোয়ানকে, গণেশকে একবার ডেকে দেবেন দরোয়ানজি ?

দরোয়ানজি উদাসভাবে বলে, ও হ্যায় কি বাহার গিয়া মালুম নেই। যাও না, উপর চলা যাও না ?

গণেশের বাড়ির লোক তার খোঁজ করতে এসেছে শুনে দাশগুপ্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে আসে। গণেশের কথা কী বলবে মনে মনে তার ঠিক করাই আছে। দোকানের জিনিস নিয়ে গণেশ পালিয়েছে, সে চোর। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, গণেশকে একবার ধরতে পারলে জেল খাটিয়ে ছাড়বে। এ-সব বলে ভড়কে দিতে হবে ওদের, যাতে কোনো রকম হাঙ্গামা করতে সাহস না পায়। দাশগুপ্তের অবশ্য ভয়-ভাবনার কিছু আর নেই, তবু সামান্য হাঙ্গামাও সে পোয়াতে চায় না গণেশের বোকার মতো গুলি খেয়ে মরার ব্যাপার নিয়ে। এমনিতেই সর্বদা তাকে কত ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকতে হয়। তার ওপর আবার গণেশের সম্বন্ধে খোঁজখবর-তদন্তের জন্য দশটা মিনিট সময় দিতে হবে ভাবলেও তার বিরক্তি বোধ হয়।

ফ্ল্যাটের সদর দরজার ঠিক সামনে ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে কাঁখে নিয়ে রাণী দাঁড়িয়েছে বাঁকা ও পরিস্ফুট হয়ে। তার দিকে নজর পড়তেই দাশগুপ্তের চোখ পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে কয়েকবার দেখে নেয়, রাণীর মুখে যে মৃদু বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে তাও তার চোখে ধরা পড়ে। চিন্তাধারা সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে শুরু করে দাশগুপ্তের। তাই, গোড়াতেই প্রেস্টিজ হারাতে না চেয়ে সে ইচ্ছে করে মস্ত হাই তুলে মুখ-চোখের ভাব বদলে নির্বিকার গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে।

গণেশকে খুঁজতে এসেছ ?

যাদব বলে, আজ্ঞা হ্যাঁ। আছে না গণেশ ?

এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে দাশগুপ্ত বলে, তুমি কে গণেশের ?

গণেশ চুরি করে পালিয়েছে বলে ওদের ভড়কে দিলে চলবে না, অন্য কিছু বলতে হবে। লাগসই কী বলা যায় দাশগুপ্ত ভাবতে থাকে।

গণেশ আমার ছেলে বাবু। দেশ গাঁ থেকে আসছি আমরা।

ও ! দাশগুপ্ত বলে উদাসভাবে, এখন তো গণেশ এখানে নেই।

কখন ফিরবে বাবু ?

গণেশ কি জানো, ছুটি নিয়ে গেছে কদিনের। কোথায় যেন যাবে বলল, নামটা মনে পড়ছে না। কারা সব সঙ্গী জুটেছে তাদের সঙ্গে গেছে। তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরবে।

হাসপাতালে অথবা মর্গে যার মৃত-দেহটায় হয়তো এখন পচন ধরেছে, অনায়াসে দাশগুপ্ত তার বাপ-মা-ভাইবোনদের জানায় সে ফিরে আসবে তিন-চার দিনের মধ্যে। এতটুকু বাধে না। তার ভাব-ভঙ্গিটা শুধু রাণীর কাছে একটু কেমন কেমন লাগে।

তবে তো মুশকিল। আমরা এখন যাই কোথা ! যাদব বলে হতাশ হয়ে।

কোনো খবর না দিয়ে কিছু ঠিক না করে এ ভাবে এলে কেন বোকার মতো ?

দাশগুপ্ত বলে রাগ আর বিরক্তি দেখিয়ে, কয়েক মুহূর্ত ভাববার ভান করে, তার পর যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, এইখানেই থাকো এখনকার মতো কি আর করা যাবে।

বলে সংযম হারিয়ে রাণীর ওপর একবার নজর না দিয়ে পারে না।

রাণী বলে, বাবা, বদ্যিমশায়ের ছেলে তো আছেন। তাঁর কাছে গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

যাদব ইতস্তত করে। কেশব বদ্যিব ছেলে থাকে হাওড়ায়, আবার সেখানে ছুটবে এত পথ হেঁটে। গিয়ে যদি তাকেও না পাওয়া যায়, কী উপায় হবে তখন।

দাশগুপ্ত বলে, কোথায় যাবে আবার, এখানেই থাকো। একটা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের।

রাণী বলে, বাবা, শোনো।

যাদব কাছে এসে চুপিচুপি বলে, না বাবা, এখানে থাকা চলবে না। বাবু লোক ভালো না। মোর ভরসা হচ্ছে না মোটে। শেষকালে গোলমাল হবে, চাকরিটা যাবে দাদার ?

যাদব তখন বলে দাশগুপ্তকে, আজ্ঞে, দেশের এক ভদ্দর লোক পত্র দিয়েছেন, আমরা তার ছেলের ওখানেই যাই। আপনার এখানে হাঙ্গামা করব না বাবু।

যা খুশি তোমাদের। দাশগুপ্ত বলে।

সময়টা তার খারাপ পড়েছে সত্যি দাশগুপ্ত ভাবে।

ধীরে ধীরে আবার তারা পথে নেমে যায়। আবার দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে। স্টেশন থেকে এত দূর হেঁটে এসেছে, এবার স্টেশন পার হয়ে অনেক দূরে যেতে হবে। যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার তারা লালদিঘির দিকে চলতে আরম্ভ করে।

গণেশের মা বলে, ছুটি নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেল গণেশ ? মোদের জানাল না কিছু চিঠিতে, কিছু বুঝি না বাবু ব্যাপার-স্যাপার।

শহরে এসে স্যাঙাত জুটেছে ছেলের। যাদব বলে ঝাঁঝের সঙ্গে।

অমন কথা বোলো না গণশার নামে। সে আমার তেমন ছেলে নয়।

লালদিঘির দিকে বাঁক ঘুরবার মোড়ের কাছাকাছি এলে দূরাগত জনতার কলরব তাদের কানে ভেসে আসে।

লালদিঘির সামনা-সামনি পৌঁছে তাদের থামতে হয়। চারিদিকে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোনো অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদিঘির এদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিন রকম বড়ো পতাকা উত্তুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ এখনও দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজার কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।

সামনে তারা দেখতে পায় অজয়কে।

মানুষ ঠেলে তারা অজয়ের কাছে যায়। যাদব ডাকে, বাবু !

অজয় ফিরে তাকায় না। যাদব শুনতে পায় সে নিজের মনে বলছে : আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি !

ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রচনাসমগ্রের অন্তর্গত গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের মূলপাঠে, শিরোনামসহ, সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির চরিত্রনামের ক্ষেত্রে আদি বানানের রূপান্তর ঘটানো হয়নি। কেবল গ্রন্থপরিচয় অংশে, গ্রন্থসমূহ এবং অন্তর্গত রচনাবলির শিরোনামের ক্ষেত্রে, মূল মুদ্রিত বানান রক্ষা করা হয়েছে।

মূলে কোনো চরিত্রের লিখিত জবানিতে (যেমন চিন্তামণি-র দিদির লেখা পত্রাদির ক্ষেত্রে) লেখকের স্বেচ্ছাকৃত ভাষা-ত্রুটি বা বর্ণাশুদ্ধি থাকলে তা অবস্থিত রাখা হয়েছে।

সহরবাসের ইতিকথা

'সহরবাসের ইতিকথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেরোতম উপন্যাস, বাইশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫২ (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬), প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ ৪ + ১২০, মূল্য দু টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে আশ্বিন ১৩৪৯ (অক্টোবর ১৯৪২) শারদসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক সরোজ দত্ত 'ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে উক্ত উপন্যাসের দু-একটি অসংগতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লাবণ্যকে একবার সন্তানহীনা বলা হয়েছে, অথচ অন্যত্র খুকি ও খোকাখুকির উল্লেখে লাবণ্যের সন্তানরূপেই তাদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দু-একটি অপ্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রেও নামবিভ্রাট ঘটে গেছে। দেহপসারিনি চাঁপা কোথাও পাঁচী রূপে এবং মোহনের ড্রাইভার জ্যোতি কোথাও মদন রূপে উল্লিখিত।

১৯৫৩-র মার্চে সহরবাসের ইতিকথা দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে লেখক ২৩ মার্চ ১৯৫৩ ডি এম লাইব্রেরির কর্ণধার গোপালদাস মজুমদারকে পত্রে লেখেন,

> সহরবাসের ইতিকথা আগাগোড়া সংশোধন ও ঘষামাজা করে দিলাম। কিছু ভুল ও অস্পষ্টতা ছিল। কাল সকালেই বাকি কাজটুকু শেষ হবে। বিকালে ৪টে নাগাদ বইটা নিয়ে যাব।
>
> বইটা এতখানি ভাল হয়েছে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ছাপা সুবিধা হয়নি। বইটাতে রস পরিবেশন করেছি খুব ঘন—ঠাসবুনানি মস্ত মস্ত প্যারা করে ছাপানোয় পাঠকের গ্রহণ করা হজম করা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।
>
> বইটা কিছু বাড়বে। যে দাম আছে সেই হিসাবেই কাল চুক্তি হবে—বই কতটা বাড়বে এবং দাম বাড়াতে হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আমি দাম না বাড়ানোরই পক্ষপাতী।
>
> আশা করি কুশল। ইতি
>
> প্রীতিকামী
>
> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
>
> পু : নূতন কভার ডিজাইন চাই। এ ছবিটা বিশ্রী।

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩১৩)

কিন্তু কয়েকদিন পরে অজ্ঞাত কোনো কারণে ডি এম লাইব্রেরির উপর লেখক ক্ষুব্ধ হন ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব দেন বেঙ্গল পাবলিশার্সকে। তাঁর ডায়েরির ২৭.৩.৫৩ তারিখের পৃষ্ঠায় এরূপ মন্তব্য আছে :

> সহরবাসের ইতিকথা ২য় সং নিয়ে ডি এম-এর ছোটলোকামি—রেগে বইটা বেঙ্গলকে দিলাম.....

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৭৯)

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে সহরবাসের ইতিকথার দ্বিতীয় সংস্করণ এর অল্পকাল পরে আষাঢ় ১৩৬০-এ প্রকাশিত হয়। এই সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণে লেখকের একটি ভূমিকাও ছিল। বর্তমান মানিক রচনাসমগ্রের গ্রন্থসূচনায় সেই ভূমিকাটি যুক্ত করা হয়েছে এবং পরিশিষ্টে উপন্যাসের

এই দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক কর্তৃক সংশোধন পরিবর্ধনের রূপরেখাগুলি যথাসম্ভব তুলনামূলকভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এই সংশোধন ও পরিবর্ধন এত ব্যাপক যে, খুব অনুল্লেখ্য ছোটোখাটো পরিবর্তনগুলি নির্দেশিত হয়নি।

সহরবাসের ইতিকথার পরবর্তী সংস্করণ হয়েছে লেখকের জীবনাবসানের পর যথাক্রমে ১৯৪৯ (প্রকাশক তুলি কলম, কলকাতা) এবং ১৯৪৯ (প্রকাশক নব-প্রকাশ, কলকাতা) সালে। গ্রন্থটির সর্বশেষ প্রচলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৯ সালে, প্রকাশক প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

সহরবাসের ইতিকথা-র ভূমিকায় লেখক তাঁর উক্ত ভূমিকাকে 'আমার সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা'-রূপে গণ্য করলেও তথ্যগতভাবে তাঁর 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের ভূমিকা দীর্ঘতর।

ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের গ্রন্থনাম ছিল 'শহরবাসের ইতিকথা' এই বানান, পরবর্তী দুটি সংস্করণে 'সহরবাসের ইতিকথা' এবং সর্বশেষ সংস্করণে হয়েছে 'শহরবাসের ইতিকথা'। রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে কেবল নামলেখে নয়, সর্বত্রই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি নির্ধারিত বানান অবলম্বিত হয়েছে।

লেখকের একটি নোটবই-এ পরিকল্পিত প্রস্তাবিত ও অলিখিত কোনো রচনার প্লটনির্দেশ বা তথ্যের ইঙ্গিত লিখিত রাখার সূত্রে সহরবাসের ইতিকথা-র উল্লেখ আছে। (দ্র অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৪৩)।

মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে সহরবাসের ইতিকথা-র আষাঢ়, ১৩৬০ সালে প্রকাশিত উল্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভিটেমাটি

ভিটেমাটি

'ভিটেমাটি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং মুদ্রিত গ্রন্থতালিকায় তেইশ-সংখ্যক গ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এর মে মাসে, বৈশাখ ১৩৫৩। প্রকাশক স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ ৪ + ৯৬। দাম দেড় টাকা। প্রচ্ছদ শচীন দত্ত।

ভিটেমাটি নাটকটির কোনো পুনর্মুদ্রণ হয়নি, গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এমন তথ্যও পাওয়া যায় না। কোনো গোষ্ঠী নাটকটির অভিনয় করেছিল কিনা তাও জানা যায় না। গণনাট্য সংস্থা ভিটেমাটি অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, তাও হয়নি। ভিটেমাটি নাটকের অনুবাদ সম্পর্কিত তথ্যও কিছু নেই। নাটকে মহাযুদ্ধ-চলাকালীন কালোবাজারি, ফাটকা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ থাকলেও, ভিটেমাটি ত্যাগের আকস্মিক হিড়িকই নাটকের ঘটনাকেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার নাট্যগুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, এই আশঙ্কায় নাটকটির অভিনয়ের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত মনে হয়।

ভিটেমাটি নাটকের কোনো পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত হয়নি।

মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে ভিটেমাটির প্রথম ও একমাত্র সংস্করণের পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে ৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে 'নতুন নাটকে হাত দিলাম' এই মন্তব্য ছাড়া অন্য কোথাও আর নাটক রচনা সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ নেই।

আজ কাল পরশুর গল্প

'আজ কাল পরশুর গল্প' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবম গল্পসংগ্রহ, চব্বিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। গল্পগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (মে-জুন ১৯৪৬), প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৪ + ১৭০, মূল্য আড়াই টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী সূর্য রায়। সজনীকান্ত দাস জানিয়েছিলেন আজ কাল পরশুর গল্প প্রকাশিত হয় এপ্রিল-মে ১৯৪৬, প্রকাশক সংকেত ভবন। সময়কাল কাছাকাছি কিন্তু প্রকাশক সংক্রান্ত তথ্যটি সঠিক নয়। তবে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি. প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৪৯) গ্রন্থপরিচয় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, 'সংকেত-ভবন ও সাধারণ পাবলিশার্স কর্তৃক আরো দুটি সংস্করণ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়'। সংকেত-ভবন সংস্করণটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলী-র প্রথম ভাগে (১৯৫০) আজ কাল পরশুর গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণে মোট গল্পসংখ্যা ষোলো, শিরোনাম যথাক্রমে : আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ী, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, নেশা, বেড়া, তারপর, স্বার্থপর ও ভীবুর লড়াই, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ী, সামঞ্জস্য।

গ্রন্থসূচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকাস্বরূপ লিখেছিলেন :

> গল্পগুলি একটা বিশেষভাবে পরপর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, যাতে 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামটির সংগতি হয়তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে। 'সামঞ্জস্য' গল্পটি শেষে যাওয়া একেবারে উচিত হয়নি। অন্য গল্পগুলিও এ রকম আগে পরে চলে গেছে।
> গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।
>
> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
> বৈশাখ ১৩৫৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবৎকালে উপন্যাসটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক সাধারণ পাবলিশার্স, কলকাতা। বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন প্রা. লি., প্রকাশকাল ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭। মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডের জন্য প্রথম সংস্করণের পাঠই নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির কয়েকটির প্রকাশসূত্র :

স্বার্থপর ও ভীবুর লড়াই	অলকা	আশ্বিন ১৩৪৭
নেড়ী	পরিচয়	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২
শত্রুমিত্র	চতুরঙ্গ	আষাঢ় ১৩৫২
দুঃশাসনীয়	শারদীয় যুগান্তর	আশ্বিন ১৩৫২
বুড়ী	শারদীয় পূর্ণিমা	১৩৫২
নেশা	শারদীয় রূপমঞ্চ	১৩৫২
বেড়া	শারদীয় কৃষক	১৩৫২
কৃপাময় সামন্ত	শারদীয় পরিচয়	১৩৫২
মঙ্গলা	পূর্বাশা	কার্তিক ১৩৫২
আজ কাল পরশুর গল্প	মাসিক বসুমতী	অগ্রহায়ণ ১৩৫২

প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে পত্রিকার পাঠ কোথাও কোথাও পরিমার্জিত হয়েছে। কিছু কিছু অসংগতি থেকে গেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পাঠের কিছু পরিবর্তন নির্দেশিত হল :

স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই

'অলকা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে গল্পটি সাধুভাষায় লেখা, পরে আজ কাল পরশুর গল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়ে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ও অন্য কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যথা :

পত্রিকার প্রথম পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
পত্রিকাপাঠে লাইনটি নেই	অবিনাশের হাত দাঁত সুড়সুড় করে, কৈলাসের গালে এক ঘা বসিয়ে দিতে। গায়ের কোথাও কামড়ে দিতে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২০৮
ধরা পড়া এবং গ্রামান্তরে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার সময়	গ্রামান্তরে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার সময় মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২০৮
একি কথা বলা ? এ ভাবে কথা বলা আর মুখ বুজিয়া থাকা সমান কথা।	একি কথা বলা ? আলাপ করা ? এ ভাবে কথা বলার চেয়ে মুখ বুজে থাকা কি ভালো নয় ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২০৮
আসলে বদনামটা কিন্তু বেশি রটে নাই। দু-চারজন দু-চারদিন একটু ফিসফাস করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল। কেদারের বেশ সুনাম আছে।	আসলে বদনামটা কিন্তু বেশি ছড়ায়নি। দু চারদিন একটু ফিসফাস করে চুপ করে গিয়েছিল। কেদারের চরিত্রগত বেশ সুনাম আছে চারিদিকে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১০
তার উদ্দেশ্য কত মহৎ। সে যায় নিছক নিজের দরকারে। অনেকে তার কাছে টাকা ধারে।	তার ভালো ছাড়া মন্দ কোনো উদ্দেশ্য আছে। নিছক তার নিজের দরকারে। ওখানকার অনেকেই তার কাছে টাকা ধারে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১০
তবে আর ভাবনা ছিল কি ? ক্ষতি করতেই বা কত ছাড়েন ? কবে আপনি আমায় জেলে পাড়ায় নিজের চোখে দেখেছিলেন মশায় ? অভিযোগটা কৈলাস আগাগোড়াই অস্বীকার করায়	তবে আবার ভাবনা ছিল না। ক্ষতি করেই বা কত ছাড়েন ! কবে আপনি আমায় জেলেমাগির ঘরে যেতে নিজের চোখে দেখেছিলেন মশায় ? অভিযোগটা কৈলাস আগাগোড়াই অস্বীকার করল। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১২
মানুষের যেমন বেশি আস্থা থাকে.... পরের জন্য একটু আগ্রহ দেখা গেল।	মানুষের যেমন আস্থা থাকে.... পরের ভালো করার জন্য একটু আগ্রহ দেখা গেল। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১২
দেশের বৃহৎ ব্যাপারকে রূপ দিতে চেয়েছে ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারের তাদেরও কয়েকজন কৈলাসের দিকে ভিড়েছে।	দেশের ব্যাপারকে রূপ দিতে চাহিয়াছে। ঘরোয়া ব্যাপারের তাদের মধ্যে পর্যন্ত কয়েকজন কৈলাসের দিকে ভিড়িয়াছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১৩

গরীবদের জন্য কৈলাস কিছু করিবেই করিবে, কেবল এই উদ্দেশ্যেই সে দাঁড়াইয়াছে। কৈলাস কিছু করিতে পারিবে কি না এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকিলেও, তার উদ্দেশ্যটা যে কিছু করা, প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করিয়াছে।

গরিবদের জন্য কৈলাস অনেক কিছু করতে পারবে কি না এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও, তার উদ্দেশ্যটা যে কিছু করা প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করেছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১৩

তারপর অনুপস্থিত কেদার আর কৈলাসকে লইয়া কি করিয়া মারামারি বাধিবার উপক্রম হইয়াছে।

তারপর কীভাবে যেন অনুপস্থিত কেদার আর কৈলাসকে নিয়ে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১৪

কেদার কিছুতেই গেল না। নকুড় আর ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস ছুটিতে ছুটিতে দাঙ্গা থামাইতে গেল।

মাঝখান থেকে মাথাটা ফাটবে শুধু। পুলিশ সামলে নেবে লাঠির ঘায়ে।

কাজেই কৈলাসও দাঙ্গা থামাতে গেল না।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১৪

নেড়ী

বাঁচন মরণের কথাতেও তারা মন দিতে পারে না দুদণ্ডের বেশি, স্থির হয়ে বসতে পারলে তো স্থির করতে পারবে

বাঁচন-মরণের কথাতেও তারা মন দিতে পারে না। দু দণ্ডের বেশি স্থির হয়ে বসতে পারলে তো স্থির করতে পারবে মন !

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৩০

সাঁঝ ববণের চাঁদ উঠে ফিকে হয়ে আসে।

তাবা বুঝতে পারে ছেলে দুটো তার হৃদয়পণ্ডিতের দাওয়ার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাঁঝ বরণের অন্ধকার চাঁদ উঠে আসায় ফিকে হয়ে আসে।

তারা বুঝতে পারে, তার ছেলে দুটো হৃদয়পণ্ডিতের দাওয়ার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৩২

দুঃশাসনীয়

এই সংগত লাগসই পরিবেশ। গ্রাম তো এই রকমি বাংলার রাত্রে, সব গ্রাম। গা ছমছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পেয়ে নয়।

আজ ভয় পাবে।

এই সংগত লাগসই পবিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছমছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে.

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৩

যে সব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তা-বোঝায় ফেটে যাচ্ছে....

সে বিষয় একান্ত অনভিজ্ঞ এই রকম স্বদেশি কোন ভদ্রলোক....

দাঁত কপাটি লেগে সে মূর্ছা যাবে

দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিবুদ্ধার। তারপর সেই গাঁয়ে....

তার কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে সে ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে....

বেড়া দেখা যায়।

যে সব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে. ..

সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এইরকম ভদ্রলোক....

দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে।

দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিবুদ্ধার এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে....

তাদের কী সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

বাড়ির সামনে ভাঙা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে।

ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর—।	ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে।
দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় বূপক বস্ত্রের মত।	কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় বূপক বস্ত্রের মতো।
সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনীকে নিজের কাছেই উলঙ্গিনী করে রাখে,	সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে,
পালা করে বাইরে বেরোয়।	...পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৩
ভোলার মেজছেলে (বড় ছেলে জেলে জেলে পচছে, গন্ধ সকলের নাকে লাগে) পটলের বৌ পাঁচী...	ভোলার মেজো ছেলে পটলের বউ পাঁচী...
'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা ?' বলে পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে। 'আর সয় না।'	কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকব মা ? পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে। আর সয় না। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৪
দু বিঘে ধানজমির লাগাও	তার কাছে দু বিঘে বিচ্ছিন্ন ধানজমির লাগাও .
আড়াই কুঁড়ের মধ্যে	আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে....
বাড়াবাড়ি করতেছিস বড্ড।	বাড়াবাড়ি করছিস বড়ো।
কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরার জয়-জয়কার।	কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হিরা। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৪
'অ বিন্দী ! দাঁড়া।'	অ বিন্দু ! দাঁড়া। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৪
মাথা ভাঙব তুমার আমি	মাথা ভাঙব তোমার আমি
সন্ধ্যার পর সোয়ামির কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কি ?	সন্ধ্যার পর সোয়ামির কাছে মেয়েমানুষের কাছে লজ্জা কী ?
চোখ শুধু জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।	চোখ শুকনো, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৫
খেতে দিতে না পারার দোষ ওর চোখে ধরা পড়েনি	খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৫
সলজ্জিত করেছিল।	লজ্জিত করেছিল। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৬
কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মানিক শা'র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে।	এবার কাপড়ের ভাবনা কারও ভাবতে হবে না। মনোহর শার প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে।

হাতিপুরের নির্দিষ্ট করা কাপড়ের ভাগ

গাঁয়ের লোক পথ চেয়েছিল তাদের।

[পত্রিকাপাঠে লাইনটি নেই]

হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট করা কাপড়ের ভাগ...

তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছাযারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৬

বঙ্কুর সাঙ্গোপাঙ্গদের একজন কলেরায় মরমর হওয়ায় মারপিঠের নালিশে সে হাজতে যেতে পারেনি, সে প্রশ্ন করে

রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবাব উপক্রম করে।

বঙ্কুর সাঙ্গোপাঙ্গোদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরোমরো থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে....

রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদেব সামনে রাস্তার সেই মোড়ে।

মা বচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৬

লাল ধূলায় মেঘারণ্য সৃষ্টি হয়।

বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পরা সুদেববাবু

কিসের যেন বোতল আব চ্যাপ্টা সোডার শিশি

সুদেববাবু ধরাল, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ল যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আখা ধরেছে মানুষের ভিড দেখার উত্তেজিত রাগে।

লাল ধূলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোশাক পরা সুদেব

কীসের যেন চ্যাপটা শিশি আর সোডার বোতল...

সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁযা ছাড়ে যেন ভেতরে কাঁচা কয়লায় আগুন ধরেছে মানুষের ভিড দেখার উত্তেজিত রাগে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৭

তবে কেন এ অবস্থা তাদের ?

বড় অদ্ভুত বকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে।

তবে কেন ও অবস্থা তাদেব ? সবাই ভাববাব চেষ্টা করে..

অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে।

মা বচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৭

'ফের নেযে লি।'

এমন মরদের ঘর না করে

ফের নেয়ে নি।

এমন মরদের পাশে আর শোবে না...

মা বচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭৮

মঙ্গলা

পৌষের গোড়াতেই হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে মাঘের বাঘ মারা শীত সইবে কতক্ষণ !

আঁচল জড়িয়ে বেঁধেও....

অঘ্রানের শেষেই হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে, পোষ মাঘের বাঘ মারা শীত সইবে কতক্ষণ !

আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেও....

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯১

খপর পেয়ে পুলিশ এসেছিল

খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯২

প্রায় ঝিমিয়ে নিয়ে,....	একটু প্রায় ঝিমিয়ে নিয়ে....
খুব তো দেখলি মাকে, গাঁ শুদ্ধ লোককে ফের হাঙ্গামায় ফেলে গেলি।	খুব তো দেখলি, গাঁ সুদ্ধ লোককে হাঙ্গামায় ফেলে গেলি ফের। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯২
মঙ্গলা বড় পুকুরে নাইতে যায়।	আরও বেলায় মঙ্গলা বড়ো পুকুরে নাইতে যায়।
না, তাদের পেটে কথা থাকে না।	মঙ্গলার হঠাৎ খেয়াল হল অধরের কথার আসল মানেটা। না, তাদের পেটে কথা থাকে না।....
খপর নিতে কি আসতে পারে না একবার।	খবর নিতে কি আসতে পারে না একবার মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯৩
কুয়াশা গোয়ালের খড়ের ধোঁয়া মিশে ভারি হয়েছে। কোথা যাবে ? চল না দাদা।	কুয়াশা গোয়ালের খড়ের ধোঁয়ায় ভারী হয়েছে। কোথা যাবে ? চল না দাদা। মঙ্গলা কাতরে ওঠে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯৪

কৃপাময় সামন্ত

পত্রিকার পাঠে কৃপাময় অনেক জায়গায় কৃপানাথ হয়ে গেছে :

এ সব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, আপশোষেব আওয়াজও করে না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে।	এ সব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২২৬
যে ভাবটা কেটে গেলে তাকে তখন তার মনে হয় ক্ষণিকের জন্যে মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠা।	সে ভাবটা কেটে গেলে তক্ষন তার মনে হয় ক্ষণিকের জন্য মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২২৭
লাই পেলে এরা বেড়ে যায়।	নাই পেলে এরা বেড়ে যায়। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২২৭
তার সম্পদ আছে, আত্মীয়বন্ধু আছে, লোকজন আছে, কৃপাময় গরীব, একা।	তার সম্পদ আছে, লোকজন আছে—কৃপাময় গরিব একা। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২২৮
সোনা জেলের বৌ এইটুকু একখানা মোটা কাপড়ে	সোনা জেলের বউ কাতু এইটুকু মোটা কাপড়ে মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২২৮

আজ কাল পরশুর গল্প

পত্রিকার পাঠ এবং প্রথম সংস্করণের পাঠে দুটি লাইন লক্ষণীয় :

'চালটা কেশব আর তোলেনি।'

এখানে কেশব না হয়ে রামপদ হবে ?

'বনমালীর বউ চোখভরা জল নিয়ে' কিন্তু একটু আগে বলা হয়েছে বনমালীর বউকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য।

খানিকটা তারা সঞ্জীবন হয়ে ওঠে।	খানিকটা তারা সঞ্জীব হয়ে ওঠে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৬৩
যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ ?	যাবে বলেছিলে, গেল না কেন রামপদ ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৬৫
এই সত্যটা বেরিয়ে আসে।	এই সত্যতা বেরিয়ে আসে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৬৭
ক'দিক সামলাবেন ?	ক দিন সামলাবেন ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৬৭
জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি	ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭০
বলে 'বউকে যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই ?'	বলে যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭১
ঘরসংসার আর যোগ্য থাকে না তার	ঘর সংসার আর যোগ্য না তার মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭১

আজ কাল পরশুর গল্পগ্রন্থের বর্তমানে প্রচলিত চিরায়ত প্রকাশন সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অংশে লিখিত নিম্নরূপ অভিমতটি পাঠকদের কাছে আগ্রহজনক হতে পারে :

> লক্ষণীয় এই যে, আজ কাল পরশুর গল্প-র ভূমিকায় লেখক যদিও বলেন, 'গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা, তবু স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই-শীর্ষক গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় আলোচ্য গ্রন্থের প্রায় ছ-বছর আগে, ১৯৪০ সালে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যবর্তী সময়কালে প্রকাশিত হয় লেখকের চারটি গল্পগ্রন্থ—এর যে কোনো একটিতে উক্ত গল্প সংকলিত হতে পারত। সম্ভবত বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এবং গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে ভিন্নতর পরীক্ষার প্রয়োজনে, লেখক সচেতনভাবেই গল্পটি পরবর্তী কোনো গ্রন্থের জন্য তুলে রাখেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের বিভিন্ন পর্বের আরো কোনো কোনো গল্পের প্রথম প্রকাশ ও গ্রন্থভুক্তির সময়কালের মধ্যে এ-জাতীয় কম-বেশি সময়ের ব্যবধান লক্ষ করা যায়। লেখকের সমগ্র গল্পের প্রথম প্রকাশ-সম্পর্কিত কালানুক্রমিক তথ্য তাঁর ধারাবাহিক পরীক্ষা ও সচেতন পরিণতির ইতিহাস বুঝে নেবার জন্যই অবশ্য প্রয়োজনীয়। (পৃ ১১৩-১৪)

আজ কাল পরশুর গল্প সংকলনভুক্ত নাম গল্পটি ছাড়া, যাকে ঘুষ দিতে হয়, নমুনা, ও দুঃশাসনীয় এই চারটি গল্প জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫০)-এ স্থান পেয়েছিল। উক্ত গ্রন্থের যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত সংস্করণে (আষাঢ় ১৩৭২) যাকে ঘুষ দিতে হয় ও দুঃশাসনীয় গল্প দুটি গৃহীত হয়েছে। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৬) সংকলনে লেখক গ্রহণ করেছেন রাঘব মালাকর গল্পটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পের বিষয়বস্তুকে যে যুদ্ধ কালোবাজারি ঘুষ মন্বন্তর অন্নাভাব বস্ত্রাভাব মধ্যবিত্তের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে গ্রামীণ মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ ও কখনও প্রতিরোধ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়, এই গল্পগুলিতেই তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ'-এ (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৩) বর্তমান গল্পসংকলনভুক্ত আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ি, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয় ও নেড়ী এই আটটি গল্প গৃহীত হয়েছে।

আজ কাল পরশুর গল্প গ্রন্থভুক্ত, নাম গল্পটি Today, Tomorrow and The Day After নামে মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত Manik Bandyopadhyay : Selected Stories (Thema, Calcutta 1918) সংকলনে আছে। অনুবাদ সুপ্রিয়া চৌধুরির। নমুনা গল্পটি A Sample নামে ঐ একই সংকলনে স্থান পেয়েছে, অনুবাদ মিহির ভট্টাচার্যের। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বিভিন্ন অনুবাদকের তর্জমা করা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের Primeval And Other Stories (People's Publishing House দিল্লি, ১৯৫৮) সংকলনে যাকে ঘুষ দিতে হয় He Who Has To Be Bribed গল্পটি আছে। অনুবাদ অশোক মিত্রের। কল্পনা বর্ধন সম্পাদিত একাধিক বাঙালি লেখকের গল্পসংকলন Women Outcastes, Peasants and Rebels : A Selection of Bengali Short Stories (University of California Press, Berkely আমেরিকা ১৯৪৯) গ্রন্থে আজ কাল পরশুর গল্প A Tale of These Days এবং বুড়ী The Old Woman গল্প দুটি স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদ কল্পনা বর্ধনের।

চেক ও চৈনিক ভাষাতে এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়েছে। আজ কাল পরশুর গল্প (POVÍDKA DNEŠKA, ZÍTŘKA A POZÍTŘÍ), যাকে ঘুষ দিতে হয় (KDO MÁ DÁT ÚPLATEK), দুঃশাসনীয় (VÁLKA) ও নমুনা VZORKY) গল্প চারটি OPIUM—A Jiné Povídky (প্রাহা, ১৯৫৬) এই চেক সংকলনে গৃহীত হয়েছে অনুবাদ অজিত মজুমদারের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ১৪টি গল্পের চীনা অনুবাদ-সংকলনের কথা জানা গেছে (মানিক রচনাসমগ্র ৩য় খণ্ড, ১৯৪৯, পৃ ৪৫১ দ্রষ্টব্য), তাতে নমুনা, বুড়ী ও আজ কাল পরশুর গল্প এই তিনটি আছে।

১৯৪৯-তে আজ কাল পরশুর গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়, পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তারও পূর্বে 'প্রভাত' নামে ১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি চলচ্চিত্রটি এই গ্রন্থভুক্ত নমুনা গল্পের চিত্র রূপায়ণ। প্রযোজনা মুকুল এন্টারপ্রাইজেস। প্রাগৈতিহাসিক, যাকে ঘুষ দিতে হয় ও ছোট বকুলপুরের যাত্রী এই তিনটি গল্পের তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র রূপ একত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় নির্মিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক-এর চিত্র পরিচালক জোছন দস্তিদার, যাকে ঘুষ দিতে হয় গল্পটির চিত্রপরিচালক সৈকত ভট্টাচার্য এবং ছোট বকুলপুরের যাত্রী-র চিত্রপরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী।

চিন্তামণি

'চিন্তামণি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোদ্দতম উপন্যাস এবং পঁচিশ সংখ্যক গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৫৩ (জুলাই ১৯৪৬), প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২ + ১০১, দাম একটাকা বারো আনা, প্রচ্ছদপট আশু বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে পূর্বাশা পত্রিকায় উপন্যাসটি 'রাঙামাটির চাষী' নামে ১৩৫০ আশ্বিন থেকে চৈত্র এবং ১৩৫১ কার্তিক থেকে ফাল্গুন মোট বারো কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত ভিটেমাটি নাটকে সম্পন্ন গৃহস্থের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ ও গ্রামত্যাগ দেশত্যাগের পরিণামের ইঙ্গিত ছিল। বর্তমান উপন্যাসে ভূমিসম্পদ হারিয়ে কৃষিজীবীর সর্বহারা শ্রমজীবীতে রূপান্তরের তৎকালীন বৃত্তান্ত কুশলী কলমে বিবৃত হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম পাঠ প্রায় যথাযথভাবেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গৃহীত হয়েছিল। তবে কিছু পাঠভেদ ছিল, সেগুলির কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। কোথাও কোনো বাক্য সংস্কারে স্পষ্টতর করার প্রয়োজনে, কোথাও সংলাপকে অধিকতর স্বাভাবিক করার কারণে, কোথাও কাহিনির নিজস্ব দাবিতে, কোথাও গ্রাম্য উচ্চারণকে স্বাভাবিক করার খাতিরে, কোথাও সর্বনামের পরিবর্তনে কোথাও নিছক শব্দ-সংস্কারে এই সংশোধন-পরিবর্তনগুলিকে শনাক্ত করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
আর জায়গা নেই রাসমণি। [নাম-প্রমাদ]! এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন ? না কেন ? খামে লেখো না কেন ?	আর তো জায়গা নেই চিন্তামণি। এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন ? তা—তা— কী হল তুমার ? সত্যি কথাই বটে তো। কী সত্যি কথা ? খামে লেখো না কেন ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৪১-৪২
তা হাওড়ায় তাঁর দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলেনি। বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে গেছে কালীঘাটে....	তা হাওড়ায় তাঁর দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলেনি—বয়স আছে স্বাস্থ্য ভালো! এমন মেয়েই কম গাঁয়ে। দুটো-চারটের বেশি কোনোকালে ছিল না। আজ তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও কি হয়েছে? না রোগাপটকা বনে গাঁয়েই আছে তাই ওই বন্না খাটে না ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৪২
সেলানো পাড়ের ঢাকনা....	নানা বর্ণের নানা ধাঁচের সেলানো পাড়ের ঢাকনা... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৪৩
বীজধানের অভাবে জমি ভাড়া হয়ে গেল অনেকের। এ কাণ্ডটা ঘটল চাষীদের নিজেদের মধ্যে। এক চাষী ভাড়া নিল আর এক চাষীর ক্ষেত—বীজধানের জোরে। মহাজন, দালাল, সরকারী কৃষিবিভাগ, বেসরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে বীজধান তখন নেমে এসেছে চাষীদের ঘরে।	বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু ছিল বাঁধা পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান—জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের করতলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারি কৃষিবিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দশার বীজ হয়ে চাষিদের ঘরে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৪৬
বাঁজা হয়ে থাকবে বিধবা মেয়ের মতো।	বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মতো। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৪৬
ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায়নি।	পোয়াতি একটা মেয়েছেলের প্রাণ বাঁচাতে একটা ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায়নি। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৫৩
বাঁড়ুয্যে বলল, 'গবুর চামড়া ? খেপেছ! গবুর চামড়ার জুতো পরব আমি! এমন সময় গৌর আর রহিমকে....	বাঁড়ুয্যে বলল, গোবুর চামড়া ? খেপেছ ? গোবুর চামড়ার জুতো পরব আমি ? চামড়ার মধ্যেও যেন সে টের পায় কোনটা গোবু কোনটা ছাগল। সবার বুদ্ধি ভোঁতা তাই রক্ষা, নইলে হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করে বসত : গোবুর চামড়া আর ছাগলের চামড়ার জুতোর তফাত জানবেন কী করে ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৬০

পত্রিকা পাঠের কিছু কিছু অসংগতি মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠে রয়ে গেছে। কাহিনির নায়ক গৌর। তার সংসারে তার মা ও ছোটো বোন আন্নার উল্লেখ করা হয়েছে গোড়ায়। উপন্যাসের শেষের দিকে গৌরের কাকা চন্দ্রকান্ত বা চাঁদ সপরিবারে শুকিয়ে মারা গেছে। বেঁচে আছে কেবল তার ছোটো একটি মেয়ে পুঁটু। পুঁটু গৌরের সংসারে আশ্রয় পেয়েছে। তারপর মৃত্যুর স্পর্শ লেগেছে গৌরের সংসারে। সেই প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন 'পৈঁছের টাকায় কিছুদিন গেল। তারপর গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা।'

পরিস্থিতি

'পরিস্থিতি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশম গল্প সংকলন ও ছাব্বিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। পরিস্থিতির প্রকাশকাল লেখকের পূর্ববর্তী গল্পসংকলন আজ কাল পরশুর গল্প প্রকাশের অব্যবহিত পরে, আশ্বিন ১৩৫৩ (অক্টোবর ১৯৪৬), প্রকাশক অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬ + ১৬১, দাম আড়াই টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অলংকরণ করেছিলেন রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিস্থিতি প্রথম সংস্করণের মোট গল্পসংখ্যা বারো, শিরোনাম যথাক্রমে : প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসীপিসী, অমানুষিক, পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রীট, রিকসাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির কয়েকটির প্রথম প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য :

প্যানিক	সাপ্তাহিক দেশ	৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯
সাড়ে সাত সের চাল	অর্চনা	বৈশাখ ১৩৫১
প্রাণ	দিগন্ত	চৈত্র ১৩৫২
ছেঁড়া	চতুরঙ্গ	চৈত্র ১৩৫২
মাসীপিসী	পূর্বাশা	চৈত্র ১৩৫২
পেটব্যথা	মাসিক বসুমতী	বৈশাখ ১৩৫৩
অমানুষিক	পূর্বাশা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
কংক্রীট	পরিচয়	আষাঢ় ১৩৫৩
রাসের মেলা	পূর্বাশা	শ্রাবণ ১৩৫৩
প্রাণের গুদাম	গল্প ভারতী	প্রথম বার্ষিকী ১৩৫৩
শিল্পী	সীমান্ত পত্রিকা	১৯৪৬

সাড়ে সাত সের চাল এবং প্রাণের গুদাম গল্পদ্বয়ের প্রকাশ-সংক্রান্ত তথ্য অশোক উপাধ্যায়ের সূত্রে পাওয়া গেছে। 'দিগন্ত' পত্রিকার সম্পাদকের নাম অজিত দত্ত এবং 'সীমান্ত'-র সম্পাদক মণীন্দ্র রায়। ১৩৫৯-এর ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় শিল্পী নামে স্বতন্ত্র একটি গল্প প্রকাশিত হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি গ্রন্থপ্রকাশকালে লেখক কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত হয়েছিল, সেই কারণে সামান্য পাঠগত ভেদ দেখা যায়। তবে সেগুলি সবই শব্দবর্জন বা শব্দযোজনা জাতীয় ও উৎকর্ষ-বাচক। ক্বচিৎ বানানগত সংস্কার, অশুদ্ধ উচ্চারণের উন্নয়ন বা অনুরূপ। কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হল :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
প্রাণ	
আগ্রহেন সঙ্গে—ভানে অটল। মনে মনে ছ্যা ছ্যা করে।	আগ্রহের সঙ্গে কথাটা যতবার ভাবে অটল ততবারই মনে মনে ছ্যা ছ্যা করে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০১
লোনা ঘন জল... এই ভাঙা চালা থেকে তারা...	নোনা ঘন জল.... এই ভাঙা চালার আশ্রয় থেকে এখন তারা.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০১
কাপড় তার মাটির মত ময়লা, আরেক পরল ধুলোর আস্তরণ..	কাপড় তার মাটির মতোই ময়লা, তারও ওপর আরেক পরল ধুলোর আস্তরণ... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০২

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণ গল্পের সূচনালিপি

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
এখানে চুপটি করে ঘুমটি মেরে বসে না থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবুর মাথায় এখুনি বসিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার ইচ্ছেটা তার প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে, মনে হয় এভাবেই কাজটা সহজ হবে, ভয়ভাবনার কিছু থাকবে না।	এখানে চুপটি মেরে ঘুপটি মেরে বসে না থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবুর মাথায় এখুনি লোহার ডাণ্ডাটা বসিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার ইচ্ছাটা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে, মনে হয় এ ভাবেই কাজটা সহজে হবে, ভয় ভাবনার কিছু থাকবে না। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০৫
রাসের মেলা	
আর এদিকে আছে শাখা রাস্তার ফাঁপালো মোড়।	আর এদিকে আছে পাশের রাস্তাটার ফাঁপোলো মোড়। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০৮

কি কিনবে কি কিনবে ভাবতে ভাবতে	কী কিনবে ভাবতে ভাবতে.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১০
পুবের আকাশের সন্ধ্যাকে যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাসে করে রেখেছে	পুবের আকাশের যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাশে করে রেখেছে সন্ধ্যাকে.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১২
কথা কইবার চাইয়া ডরে পারি নাই	কথা কইবার চাইয়া ডরাইছি। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১২
সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মতো ? খাপছাড়া হাস্যকর লাগছে চাবাভুষো ঘরের মেয়ের বাবুর ঘরের রাঁড়ীর বেশ ধরা ?	সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মতো খাপছাড়া আর হাস্যকর, চাষাভুসো ঘরের মেয়ে হয়ে বাবুর ঘরের রাঁড়ির বেশ ধরে ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১২
নাচ দেখতে ভেতরে যাবার কথাও হয়নি তখন,	নাচ দেখতে তাদের মধ্যে ভেতরে যাবার কথাও হয়নি তখন পর্যন্ত, মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১২
বুঝদার বিশ্বাসী সাথীর মতোই, মতলব যা আছে তা মনেই থাক। পরে দেখা যাবে।	বুঝদার বিশ্বাসী সাথির মতোই সে সাথে থাকবে, মনখোলা আলাপি কথায় হাসিতামাশায় খুশি থাকবে দুজনেই, ভালো লাগবে মেলা দেখা। মতলব যা আছে তা মনেই থাকবে ওর চাপা পড়া। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১২
তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে দোল খাওয়া দেখে গলে যেতে দেখে, তার রোমাঞ্চ হয়। কতকাল ধরে কি ধৈর্যের সঙ্গে তপস্যা করে যে এমন কসরৎ আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে !	তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে একটি মেয়ের দোল খাওয়া দেখে.... গলে যেতে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়, ভাবে, কতকাল ধরে কি ধৈর্যের সং–তপস্যা করে না জানি এ সব কসরত আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৩
কংক্রীটের পুলের গোড়ায় বড় রাস্তায় পড়ে লোকটা রিকসা ডেকে বসে একটা, খাঁদুকে চমকে আর ভড়কে।	কংক্রিটের পুলের গোড়ায় বড়ো রাস্তার পাড়ে লোকটা রিকশা ডেকে বসে একটা, খাঁদুকে চমকে আর ভড়কে দিয়ে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৪
পাশে গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনেটা শুধু দু'পাট কপাট, ওপরে নিচে দুটো তালা আঁটা।	পাশে গায়ে গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনে দোকানের মতো মস্ত দুপাট কপাট, ওপরে নীচে দুটো তালা আঁটা। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৫

মাসীপিসী

দেড় হাত চওড়া হয় কি না।	দু হাত চওড়া হয় কি না হয়। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৭
মাসীপিসী ফিরছে কৈলাস।	মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ, মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৭

সে যাতে শুনতে পায়....	কারণ, সে যাতে শুনতে পায়... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৭
কইলে না যে খপর আছে কি ?	বললে না যে খপর আছে কি ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৭
জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে গিয়ে।	জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে।
তাইতে চটে আছে।	তাতেই চটে আছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৮
দুর্ভিক্ষের সময় তাদের লড়তে হয়েছিল সাংঘাতিক।	দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৯
সালতি বেয়ে অতদূর যাওয়া-আসাও. .	সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া আসাও.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৯
ভদ্রলোক বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দিয়েছে।	গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১৯
আতঙ্কে পাংশু মেরে যায় ?	আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায় ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২০
গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য	ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২১
মেয়াটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায়. .	মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সবিয়ে ফেলায়.. . মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২২

অমানুষিক

রসগোল্লা পান্তোয়া খাবারের দোকান ...	রসগোল্লা পানতোয়ার দোকান.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২৪
আর সেই শিউলিতলায়....	আব সেই তলায়.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২৬
তুমি ! ফিব্যা আসছ ?	তুমি ফির‍্যা আসছ ? মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২৬

পেটব্যথা

মানো কিন্তু না খেয়ে মরেনি।	তার মেয়ে মানো কিন্তু সত্যিই না খেয়ে মরেনি। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৩১

পত্রিকায় প্রকাশকালে গল্পের শেষ লাইনটি ছিল—

'মনে হয় রক্তবমি করে তার পেটব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে। তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।'

গল্পটির গ্রন্থভুক্তিকালে আরও পাঁচটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়ে গল্পটি নতুন তাৎপর্য পেয়েছে।

কংক্রীট

মদের দাম দিত বখশিস।	মদের দাম বখশিশ। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৪৪
তাতে সে রাগ করেনি।	সে রাগ করেনি। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৪৬

ছেঁড়া

একেলে বুড়ো গোমড়া মুখে তার সামনে একগাদা বইখাতা নিয়ে বসে থাকে প্যাকিং কাগজের ছেঁড়া মলাট দেওয়া ইংরাজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল।	একেলে বুড়ো তার সামনে এক গাদা বই খাতা নিয়ে বসে থাকে গোমড়া মুখে। ছেঁড়া প্যাকিং কাগজের মলাট দেওয়া ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৮
উৎসাহের রেশ আছে।	উৎসাহ বেশ আছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৮
ঈর্ষায় সুর মেলানো।	ঈর্ষার সুর মেলে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৮
তিন মাস ধরে....	দিন মাস ধরে.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৮
ঘনাবাবুর....	মনাবাবুর.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৯
হঠাৎ জাগা কোনো মনের খেয়ালে....	হঠাৎ কোনো মনের খেয়ালে.... মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৯
ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে এদিকের রাস্তা দিয়ে।	ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে। মা বচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৫৯
পচাটে গন্ধ নষ্ট যে চাল বুড়ো সবকারি দোকান থেকে কিনে এনেছে....	পচাটে গন্ধের নষ্ট যে চাল বুড়ো সরকারি দোকান থেকে এনেছে সস্তা দরে ... মা রচনাসমগ্র ৫ পৃ ৩৬০
ধর্মঘট শুরু হয়েছে।	ডাক ধর্মঘট শুরু হয়েছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৬০
একা একজন চলে গেলে কি হয়, সবাই তো আছে। এই ভেবে তারাও চলে গেল।	একজন চলে গেলে কী হয়, সবাই তো আছে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৬৩

'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে যুগান্তর চক্রবর্তী লিখিত টীকাভাষ্য থেকে জানা যায়, পরিস্থিতি গল্পসংকলনটির প্রথম প্রস্তাবিত নাম ছিল রাসের মেলা। 'প্রকাশকের সঙ্গে এই নামেই চুক্তি হয়েছিল' (পৃ ৩৬৫)। রাসের মেলা গল্পটিও পরিচয় পত্রিকার জন্য নির্ধারিত ছিল, পরে পূর্বাশা-য় ছাপা হয়।

জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৭ শ্রাবণ) সংকলনে পরিস্থিতি সংকলন-ভুক্ত কংক্রীট এবং শিল্পী গল্প দুটি গৃহীত হয়। স্বয়ং লেখক কর্তৃক বাছাই-করা কুড়িটি গল্পের সংকলন স্বনির্বাচিত গল্পে (১৩৬৩ আষাঢ়) উক্ত শিল্পী গল্পটি গৃহীত হয়েছে। কংক্রীট গল্পের অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত একটি নাট্যরূপান্তর প্রথমে 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকায়, পরে গ্রন্থাকারে একই নামে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

দিল্লির পিপলস্ পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের Primeval And Other Stories অনুবাদ গল্প-সংকলনে (১৯৫৮) গৃহীত Craftsman নামে শিল্পী গল্পটি অনুবাদ করেছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই একই অনুবাদ ঈষৎ পরিমার্জিত হয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত Manik Bandyopadhyay : Selected Stories সংকলনেও (১৯৪৭) স্থান পেয়েছে। একই গ্রন্থে কংক্রীট গল্পের অনুবাদ করেছেন সুতপা নিয়োগী Concrete নামে।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের চেক অনুবাদ OPIUM—A JINÉ POVÍDKY গ্রন্থে (১৯৫৬) 'শিল্পী' ও 'কংক্রীট' গল্প দুটি গৃহীত হয়েছে। শিরোনাম যথাক্রমে UMĚLEC এবং BETON।

পূর্বোল্লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চীনা অনুবাদেও (১৯৪৭) কংক্রীট, অনূদিত ১৪টি গল্পের অন্যতম। তাছাড়া পেইচিং গণসাহিত্য প্রকাশনালয় প্রকাশিত নির্বাচিত ভারতীয় ছোটোগল্পের একটি সংকলনে (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭) ফং চিন শিং অনূদিত শিল্পী গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ন্যাশনাল ফিল্‌ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের যৌথ প্রযোজনায় ১৯৪৭ সালে শিল্পী গল্পটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

চিহ্ন

'চিহ্ন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনেরোতম উপন্যাস ও সাতাশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৫৩, জানুয়ারি ১৯৪৭-এ, উপন্যাসে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই, 'লেখকের কথা' শীর্ষক ভূমিকা থেকে সময়কাল নির্ণয় করা যায়। প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ১৯৬, দাম তিন টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী গোপাল ঘোষ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে চিহ্ন 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার ১৩৫৩ নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চিহ্ন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের কিছু সংশোধন পরিবর্তন করেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত প্রথম পাঠের প্রতিলিপি সংরক্ষিত না হওয়ায় আপাতত সে বিষয়ে কোনো তথ্যনির্দেশ সম্ভব হয়নি। লেখক উক্ত ভূমিকায় উপন্যাসটি সম্পর্কে জানিয়েছেন যে এটি 'নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই'। দ্রুতবহমান ঘটনা, সমকালীন কলকাতার অস্থির রাজনৈতিক ঘূর্ণি, পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণে ছাত্রের মৃত্যু ইত্যাদি সংবাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজনিত বিবরণ চিহ্ন উপন্যাসটিকে একটি তথ্যকাহিনির গুরুত্ব দিয়েছে। উপন্যাসের অক্ষয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেন স্বয়ং লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পরবর্তী মানিকের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির কিছু অনিবার্য প্রভাব অব্যবহিত পরবর্তী চিহ্ন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন থেকে চিন্মোহন সেহানবীশের কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ মন্তব্য অধ্যাপক সরোজমোহন মিত্র তাঁর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' (গ্রন্থালয় প্রা. লি., ১৯৪৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন :

> মনে এল নৌবিদ্রোহের, রসিদ আলি দিবস বা ২৯শে জুলাইয়ের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এ সব দিনে মানিকবাবুকে দেখেছি কখনও মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্র মনে চলেছেন, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে, কখনও সঙ্ঘ অফিসে অথবা কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে বসে তুমুল আলোচনা করছেন, কখনও বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা খবর। আর এইসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে কখনও রূপ পেয়েছে চিহ্নে, কখনও জ্বলন্ত বিবৃতির, কখনও বা বড়ো উপন্যাসের উপাদানের। (পৃ ৭০)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির দু-এক পৃষ্ঠায় চিহ্ন উপন্যাসটির কয়েকটি উল্লেখ আছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে চিহ্ন উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্পর্কে প্রথম প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির ও অন্যান্য প্রকাশকের মনোভাব-বিষয়ক এই উল্লেখটি গুরুত্ব দাবি করে :

[৪ জানুয়ারি ১৯৫২ শুক্রবার]

বসুমতীতে খোঁজ নিতে গেলাম চিহ্ন সম্পর্কে। বইখানা নাকি ৮/১০ কপি আছে—তবে বসুমতী আবার ছাপবে কি না ক'দিন পরে জানাবে। তারাশঙ্কর আর আমার বই নিয়ে পরীক্ষা নাকি ব্যর্থ হয়েছে—বসুমতীর পাঠকের বাজারে আমাদের চাহিদা নেই।

কথাটা আমি অনেকদিন থেকে জানতাম। বাংলার পাঠক সমাজ স্পষ্ট তিন-ভাগে ভাগ করা : উচ্চশিক্ষিত বিদেশি প্রভাবপুষ্ট এক ভাগ, যারা 'কালচার' 'কালচার' করে, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ আর নীচের তলার অল্প শিক্ষিত রক্ষণশীল সমাজ। সাহিত্য করতে নেমে এই রুচিভেদ সম্পর্কে আজ সচেতন না হয়ে উপায় নেই।

ফিরবার পথে মনোজবাবু 'চিহ্ন' ২য় সং নিতে রাজি হলেন না—উনি একটু প্রগতি বিরোধের দিকে যাচ্ছেন।

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৫৯-৬০)

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে চিহ্ন উপন্যাসটি চেক ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনার সংবাদও ডায়েরি থেকে পাওয়া যায় এবং সে বাবদ অর্থপ্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে। উক্ত উপন্যাসের চেক-সংস্করণ প্রকাশ সম্পর্কে Czechoslovak Theatrical and Literary Agency-র সঙ্গে লেখকের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। তবে যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অন্যান্য কাগজপত্র থেকে যতদূর জানা যায়, উপন্যাসটির আয়তন পৃথক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের উপযোগী না-হওয়ায়, চিহ্ন শেষ পর্যন্ত চেক-ভাষায় প্রকাশিত লেখকের একটি গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৯৬) পূর্বোল্লিখিত চেক-ভাষায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন A Jiné Povídky (Praha, ১৯৫৬) গ্রন্থে লেখকের ১৬টি গল্পসহ চিহ্ন উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। সবগুলিরই অনুবাদক অজিত মজুমদার।

সম্পাদকমণ্ডলী

পরিশিষ্ট

পাঠান্তর

সহরবাসের ইতিকথা : সংস্করণগত পাঠভেদ

শারদীয় আনন্দবাজারে (১৩৪৯) প্রকাশিত সহরবাসের ইতিকথা-র শিরোনাম পৃষ্ঠা

শারদীয় আনন্দবাজারে (১৩৪৯) প্রকাশিত সহরবাসের ইতিকথা উপন্যাসের পাঠ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকালে লেখক যথেষ্ট সংস্কারের সুযোগ পাননি। কিছু শব্দযোজনা অথবা শব্দবর্জন অথবা বাক্যের সামান্য পুনর্লিখনের মধ্যেই এই সংস্কার সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন :

পত্রিকার পাঠ	প্রথম সংস্করণের পাঠ
নদীর মত রাজপথে আর নালার মত গলিতে মানুষের স্রোত, ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির প্রয়োজনে সমষ্টির শোভাযাত্রা। পত্রিকা পৃ ৯	নদী আর নালার মত বড় রাস্তা আর গলিতে মানুষের স্রোত, ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির প্রয়োজনে সমষ্টির শোভাযাত্রা। উপন্যাস পৃ ১
চিন্ময়ের বাবা কেদারনাথ স্মার্ট আপিসি বেশে গাড়িতে উঠিতেছিল, গতি-স্বপ্নের স্থির প্রতিমূর্তির মতো গাড়িটির পালিশে সূর্যের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে মনে হয়। গত পাঁচ বছরে কেদারের বয়স ষাটে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু বয়স তার বাড়িয়াছে মনে হয় না। কাঁচা পাকা চুল একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছে, টান করা মুখের চামড়া হয়তো একটু শিথিল হইয়াছে নিষ্প্রভ হয় নাই। পৃ ১২	চিন্ময়ের বাবা কেদারনাথ স্মার্ট আপিসি বেশে গাড়ীতে উঠিতেছিল, গতি-স্বপ্নের স্থির প্রতিমূর্ত্তির মত গাড়ীটির পালিশে সূর্য্যের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে মনে হয়। কাঁচা পাকা চুল একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছে, টান করা মুখের চামড়া হয়তো একটু শিথিল হইয়াছে, নিষ্প্রভ হয় নাই। পৃ ১৯
ওদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসাভাসা, সে শুধু আবর্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলা আলো জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে। পৃ ২২	ওদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসাভাসা, সে শুধু আবর্জ্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলার বাতি জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বস্তি দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে। পৃ ৬৫
একদিন ধৈর্য হারাইয়া সে তাকে শাসন করিতে গিয়াছিল—শুধু একদিন। উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় উঁচু করিয়া নগেন কী যেন বলিতে গিয়াছিল, বলে নাই। ভাগ্যে বলে নাই ! এখনও তবু তাকে কাছে ডাকা যায়, কথা বলা যায়, আশা করা যায়। কী সর্বনাশই ঘটিয়া যাইত নগেন কথাগুলি বলিয়া ফেলিলে। যেরকম তার মনের অবস্থা এখন হাজার অনুতাপ বোধ করিলেও মাথা নিচু করিয়া ছল ছল চোখে দাদার কাছে সে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, গায়ে পড়িয়া সেও পারিত না তাকে ক্ষমা করিতে। পৃ ৩৩	একদিন ধৈর্য্য হারাইয়া সে তাহাকে শাসন করিতে গিয়াছিল,—তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় উঁচু করিয়া নগেন কী যেন বলিতে গিয়াছিল, কী ভাবিয়া ভাগ্যে বলে নাই ! এখনও তবু তাকে কাছে ডাকা যায়, কথা বলা যায় গল্প করা যায়। কী সর্বনাশই ঘটিয়া যাইত নগেন কথাগুলি বলিয়া ফেলিতে। তখন তার মনের অবস্থা এমন, হাজার অনুতাপ বোধ করিলেও মাথা নত করিয়া ছল ছল চোখে দাদার কাছে সে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, গায়ে পড়িয়া সে তাকে পারিত না ক্ষমা করিতে। পৃ ১১৮

'আগাগোড়া সংশোধন' ও 'ঘষামাজা'-র ফলে প্রথম সংস্করণের তুলনায় পরবর্তী সংস্করণে যে পরিবর্তন-রূপান্তর-সংশোধন ইত্যাদি ঘটেছে, তার পরিমাণ কম নয়। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তুলনায় লেখকের জীবৎকালের সর্বশেষ সংস্করণ অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থোদ্ধৃত পাঠ অবলম্বনে এই পরিবর্তনের কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত হল :

প্রথম সংস্করণের পাঠ	গ্রন্থোদ্ধৃত পাঠ
রাস্তা পার হওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকার সময় এই কথা একজনের মনে হইয়াছিল। গতিপথে, বৈচিত্র্য পথে, অস্থিরতা পথে। প্র সং পৃ ১	রাস্তা পার হওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকার সময় এই কথা একজনের মনে হইয়াছিল। শহরের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রান্ত ক্লান্ত একজন প্রৌঢ়বয়সি মানুষের। গতিপথে, বৈচিত্র্য পথে, অস্থিরতা পথে। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৫
নিজেদের স্বচ্ছলভাবে চলিয়া যায় সম্পত্তি এমন থাকা সত্ত্বেও ওদের অন্ন যোগাইতে গিয়া কোনদিন টানাটানি ঘোচে নাই। তবু নিকট হোক, দূর হোক সম্পর্ক একটা তাদের সকলের সঙ্গেই আছে। প্র সং পৃ ৩	নিজেদের স্বচ্ছলভাবে ভালোভাবে চলিয়া যায় এ রকম বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কর্মহীন পরাশ্রয়ী ওদের অন্ন যোগাইতে গিয়া কোনোদিন তাদের অভাব ঘোচে নাই। দ্র সংযোজন

সংযোজন

জোঁকও কষ্ট করিয়া জীবজন্তুর গায়ে নিজেকে সাঁটিয়া দিয়া রক্ত শোষণ করে—নিজের চেষ্টায়। আর এই আশ্রিত আশ্রিতার দলটা তাদের বাড়িতে বাস করিয়া তাদের অন্নবস্ত্র ধ্বংস করাটাই একমাত্র কাজ বলিয়া মনে করে, জন্মগত অধিকার বলিয়া গণ্য করে। তবু নিকট হোক, দূর হোক, সম্পর্ক একটা তাদের সকলের সঙ্গেই আছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৬

প্রথম সংস্করণের পাঠ	গ্রন্থোদ্ধৃত পাঠ
নিজে উপস্থিত না থাকায় সম্পত্তির আয় যতটুকু কমিবে আর সহরে বাস করিতে খরচ যতটুকু বাড়িবে, তার চেয়ে অনেক বেশিই নিশ্চয় সে উপার্জন করিবে। সহরে অনেক সুবিধা, অনেক সুযোগ। প্র সং পৃ ৪	নিজে উপস্থিত না থাকায় সম্পত্তির আয় যতটুকু কমিবে আর শহরে বাস করিতে খরচ যতটুকু বাড়িবে, তার চেয়ে অনেক বেশিই নিশ্চয় সে উপার্জন করিতে পারিবে এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে। শহরে টাকা রোজগারের অনেক সুবিধা, অনেক সুযোগ। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৬
মস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এই গ্রাম (কাছাকাছি নদী নাই, আশেপাশে বিশেষ কোনো পণ্যও উৎপন্ন হয় না, কোনোদিন হইত কিনা সন্দেহ)। প্র সং পৃ ৫	মস্ত বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এই গ্রাম (কাছাকাছি নদী নাই, আশেপাশে বিশেষ কোনো পণ্য উৎপন্ন হয় না, কোনোদিন হইত কিনা সন্দেহ। তবু কি করিয়া গ্রামটা মস্ত বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা অবশ্য পীতাম্বরকে কেহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলে না)। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭
কথাগুলি বলিবার সময় আনমনে পৈতাটি সে আঙুলে জড়াইতেছিল, পৈতা হাতে অভিশাপ দেওয়ার মতো শোনাইল। প্র সং পৃ ৫	কথাগুলি বলিবার সময় আনমনে পইতাটি সে আঙুলে জড়াইতেছিল, তার কথাগুলি তাই—পইতা হাতে করিয়া অভিশাপ দেওয়ার মতো শোনাইল। মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৭
বছর পাঁচেক মোটে বিবাহ হইয়াছে মনোমোহনের, ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় যায় নাই। এ স্ত্রীর সন্তান না হইলে আর একটা বিবাহ করিতে বা তার বাধা কীসের ? পীতাম্বরের বাড়াবাড়িটা অনেকের পছন্দ হইল না।	পথের ভিখারি হইয়া একেবারে বংশলোপের অভিশাপ ! বছর পাঁচেক মোটে বিবাহ হইয়াছে মনোমোহনের ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় যায় নাই। এ স্ত্রীর সন্তান না হইলে আর একটা বিবাহ করিতেই বা তার বাধা কীসের ?

পূর্বপুরুষের গল্প বলিতে চাও বলো, এভাবে মানুষকে শাপ দেওয়া কেন ? পীতাম্বরের এতখানি জ্বালার কারণটাও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

প্র সং পৃ ৬

পীতাম্বরের বাড়াবাড়িটা অনেকের পছন্দ হইল না। পূর্বপুরুষের গল্প বলিতে চাও বলো কিন্তু কবে কোন যুগে কী ঘটিয়াছিল, সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল কিনা ঠিক নাই। সে প্রসঙ্গ তুলিয়া আজ এভাবে মানুষকে শাপ দেওয়া কেন ?

কেহ আপত্তি করিলে পীতাম্বর বলে, পাগল ! আমি কেন শাপ দিতে যাব ? আমি বলছি ভগবানের বিচারের কথা।

পীতাম্বরের এতখানি গায়ের জ্বালার কারণটাও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৮

তোমার বাবা স্নেহভক্তি করে দিতেন, হিসেব তো কিছু ছিল না।

প্র সং পৃ ৭

তোমার বাবা স্নেহভক্তি করে দিতেন, হিসেব তো কিছু ছিল না।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

কথা বলিতে বলিতে পীতাম্বর এমন জায়গায় থামিয়া যায় যে শ্রোতাদের প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হয়। একজন প্রশ্ন করে, তারপর কী হল ?

পীতাম্বর বলে আমার কথা শুনে ছোঁড়া যেন খিঁচিয়ে উঠল, আপনার বাপ-দাদার সম্পত্তি ভোগ করার পাপ যেন না লাগে, সেই বাবদে আপনার সাত টাকা করে বরাদ্দ ছিল তো ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৮

কী যেন সব ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটিতে পারিতেছে না, অনির্দিষ্ট অনেক সম্ভাবনা যেন বাতিল হইয়া যাইতেছে, দূরে কী যেন তার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, কাছে আগাইয়া যাওয়া হইতেছে না—এমনি এক অনাবশ্যক রহস্যময় অনুভূতি তাকে সর্বদা পীড়ন করে, আর গ্রামের সংকীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন তার ছটফট করিতে থাকে।

নানা আপত্তি তুলিয়া, রাগ করিয়া চোখের জল ফেলিয়া মা ছেলের প্রস্তাবটা বাতিল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন মনোমোহনের প্রচণ্ড ধমকে তার চেষ্টা থামিয়া গেল।

প্র সং পৃ ৭-৮

কী যেন সব ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটিতে পারিতেছে না, অনির্দিষ্ট অনেক সম্ভাবনা যেন বাতিল হইয়া যাইতেছে, দূরে কী যেন তার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, কাছে আগাইয়া যাওয়া হইতেছে না—এমনি এক অনাবশ্যক রহস্যময় অনুভূতি সর্বদা তাকে পীড়ন করে আর গ্রামের সংকীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন তার ছটফট করিতে থাকে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

শহরে গিয়া অর্থোপার্জনের কথা অবশ্য সে ভাবে কিন্তু সেটা দেশের সম্পত্তির জন্য আর কম হওয়া ও খরচ বাড়ার মধ্যে সামঞ্জস্য করার হিসাব। শহরে গিয়া অর্থোপার্জন করা তার আসল উদ্দেশ্য নয়।

শহরে গিয়া কোনো উপায়ে যদি লাখপতি হইয়া যাইতে পারে, তা হইলে অবশ্য তার আপত্তি কিছু নাই। কিন্তু শহরের আকর্ষণটা তার লাখপতি হওয়ার জন্য নয়।

নানা আপত্তি তুলিয়া, রাগ করিয়া চোখের জল ফেলিয়া মা ছেলের প্রস্তাবটা বাতিল করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন মনোমোহনের প্রচণ্ড ধমকে তার চেষ্টা থামিয়া গেল।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯

একটি কেবল অনুরোধ জানাইলেন ছেলেকে।

'কর্তার বার্ষিক কাজটা এখানে সেরে যা মনু।'

সহরে যাওয়া মাস তিনেক পিছাইয়া গেল। মোটে

একটি কেবল অনুরোধ জানাইলেন ছেলেকে।

কর্তার বার্ষিক কাজটা এখানে সেরে যা মনু।

দ্র সংযোজন

তিন মাস, ত্রিশ বছরের সঙ্গে আর শুধু তিনটি মাস যোগ দেওয়া।

প্র সং পৃ ৮

সংযোজন

এ অতি সঙ্গত অনুরোধ। সে মানুষটার সারাজীবন এখানে কাটিয়াছিল, দেশের লোকেও প্রত্যাশা করে যে তার প্রথম বার্ষিক কাজটা দেশেই সম্পন্ন হইবে। আগে শহরে গিয়া বাসা বাঁধিলেও এই কাজের জন্য সকলকে নিয়া তাকে অন্তত কয়েকদিনের জন্য দেশে ফিরিতে হইবেই।

মনোমোহন বলিল, বেশ, তাই হবে।

শহরে যাওয়া মাস তিনেক পিছাইয়া গেল।

মোটে তিন মাস, ত্রিশ বছরের সঙ্গে আর শুধু তিনটি মাস যোগ দেওযা।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১৯

চিন্ময় খুসী হইয়া বলিল, 'মোহন ? আশ্চর্য করে দিলে যে !'

তাকে দেখিয়াই চিন্ময় খুশি হইয়া বলিল, মোহন ? আশ্চর্য কবে দিলে যে !

অভ্যর্থনার আন্তরিকতাতেই কয়েক বছরের অদর্শনের সংকোচ অনেকখানি কাটিয়া যায়, দুজনেই স্বস্তি বোধ করে। কিছুদিন যোগাযোগ না থাকিলে মনের মধ্যে বন্ধুও কেমন বদলাইয়া যায় ? দেখা হইলে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, এ তো সে নয় !

প্র সং পৃ ১১

অভ্যর্থনার আন্তরিকতাতেই কয়েক বছরের অদর্শনের সংকোচ অনেকখানি কাটিয়া যায়, দুজনেই স্বস্তি বোধ করে।

আরেক দিক দিয়া মনোমোহন একটু বিস্ময়ও অনুভব করে।

কিছুদিন যোগাযোগ না থাকিলে মনের মধ্যে বন্ধুও কেমন বদলাইয়া যায় ? দেখা হইলে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, এ তো ঠিক সে নয় ! এতদিন মনের মধ্যে বন্ধু বলিয়া যাকে স্মরণ করিতাম ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১

শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন আর রুচির দিক দিয়া প্রায় বিভিন্ন একটা মানুষের সঙ্গে কেমন সহজ অন্তরঙ্গতা গড়িয়া তুলিয়াছে।

প্র সং পৃ ১২

দুজনেই ভাবে যে শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন, আর রুচির দিক দিয়া প্রায় ভিন্ন রকম একজন মানুষের সঙ্গে অনায়াসে কেমন সহজ অন্তরঙ্গতা গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু খানিক পরেই টের পাওয়া যায় দূরে সরিয়া থাকিলে বন্ধুর সঙ্গের সহজ অন্তরঙ্গতা বজায় থাকা এত সহজ নয়।

তারপর খবর কী ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২১

খবরাখবরের আদানপ্রদান হইল প্রায় আধঘন্টা, তারপর হঠাৎ মোহন বলিল, 'আসল কথাই জিজ্ঞাসা করিনি। কেমন লাগছে ?'

প্র সং পৃ ১৪

খবরাখবরের আদানপ্রদান হইল প্রায় আধঘন্টা, তারপর হঠাৎ মোহন বলিল, আসল কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি। সত্যি আমি গেঁয়ো। একজনের সঙ্গে জীবন কাটাতে কেমন লাগছে ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২২

সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্ময় বলে, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ মোহন। তোমার মাথার ঠিক নেই।'

সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্ময় বলে, তুমি পাগল হয়ে গেছ মোহন। তোমার মাথার ঠিক নেই।

সন্ধ্যার কথাটা মোহনকেই উল্লেখ করিতে হইল, আধঘণ্টা আলোচনা ও তর্কের পর বিদায় নেওয়ার সময়।

প্র সং পৃ ১৭

চিন্ময়ও সন্ধ্যাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, সন্ধ্যাও খবর পাইয়া আপনা হইতে উঁকি দিয়া যায় নাই।

সন্ধ্যার কথাটা মোহনকেই উল্লেখ করিতে হইল, তার শহরবাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্ময়ের সঙ্গে আলোচনা ও তর্কের পর বিদায় নেওয়ার সময়।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৪

ব্যক্তিগত আলোচনাটা মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল বহুরূপী সভ্যতার বহুমুখী পরিণত সম্ভাবনার বিচারের এবং এক মুহূর্তে দূরে থাকার কয়েকটা বছর গিয়াছিল বাতিল হইয়া। তার ফলে একটু যে সংকোচ ছিল তাও কাটিয়া গিয়া যাচিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে দেখার করার দাবি জানানো সহজ হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময় বলিল, 'বলিনি তোমায় ? সন্ধ্যা এখানে নেই।'

প্র সং পৃ ১৭

আজও ব্যক্তিগত আলোচনাটা মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল বহুরূপী সভ্যতার বহুমুখী পরিণতি ও সম্ভাবনার বিচারে এবং এক মুহূর্তে এতকাল দূরে দূরে থাকার জন্য দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধানটা গিয়াছিল বাতিল হইয়া। একটু যে সংকোচ ছিল তাও কাটিয়া যাওয়ায় মোহনের পক্ষে যাচিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করার দাবি জানানো সহজ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার কথা উঠিতেই চিন্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, বলিনি তোমায় ? সন্ধ্যা তো এখানে নেই।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৫

খোকাখুকীর ব্যাপারেই ও বাপের বাড়ি গেছে বটে, তবে ঠিক উল্টো কারণে। বছর দুই পরে ফিরে আসবে বলেছে, তারপর যদি দরকার হয়, তোমার কারণে গেলেও যেতে পারে বাপের বাড়ি।

প্র সং পৃ ১৮

খোকাখুকির ব্যাপারেই ও বাপের বাড়ি গেছে বটে, তবে ঠিক উলটো কারণে। আমি খোকাখুকি চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম বলে আমাকে ঠেকাবার জন্য। এখন কিছুদিন ওসব হাঙ্গামা চায় না। বছর দুই পরে ফিরে আসবে বলেছে, তারপর যদি দরকার হয়, তোমার ওই কারণে গেলেও যেতে পারে বাপের বাড়ি।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৫

ওসব তুমি বুঝবে না, মাথা ঘামিও না। —চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হোটেলে থেকো।'

মোহনকে বিদায় না দিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

প্র সং পৃ ১৯

ও সব তুমি বুঝবে না ভাই, ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

ব্যাপারটা মোহন বুঝিতে পারে ভালো ভাবেই। সন্ধ্যার প্রসঙ্গে চিন্ময়ের রাগ আর জ্বালার বহর দেখিয়া সে আর কিছু বলে না।

চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হোটেলে থেকো। মোহনকে বিদায় না দিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৫

সের দুই হবে। প্র সং পৃ ২৫

সের দুই হবে। দ্র সংযোজন

সংযোজন

দু সেরি একটা মাছ একটা মস্ত বড়ো মাছ চিন্ময়ের কাছে। তাদের মস্ত পুকুরটা এখন জেলেদের কাছে জমা দেওয়া হয়, আজকাল দু সেরি মাছ তার কাছেও অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু ওই পুকুর হইতে কতবার সাত আট সের রুই-কাতলা ধরিয়াছে—খুব বেশিদিনের কথা নয়। সে কথা চিন্ময়কে বলিয়া লাভ নাই, সে বুঝিবে না।

বড়ো মাছ ছিপে গাঁথিয়া ধরার সুখ আর বড়ো মাছ রান্না করিয়া খাওয়ার সুখের পার্থক্য তার জানা নাই।

মাছ ধরার সুখের স্বাদটা তার জানা আছে, কিন্তু সুখটা পাওয়ার আগ্রহ আছে কি ? জেলেদের পুকুরটা জমা দিলেও ছিপ ফেলিবার অধিকার সে হারায় নাই। কিন্তু গত কয়েক বছরে কতবার সে পুকুরে ছিপ ফেলিতে গিয়াছে ? একেবারেই তাগিদ অনুভব করে নাই।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৮

চিন্ময় হঠাৎ জবাব দেয় না। রাগ আয়ত্তে আসিলে ধীরে ধীরে বলে, 'হাসি পেলে হেসো মোহন।'

প্র সং পৃ ২৩

চিন্ময় হঠাৎ জবাব দেয় না।

মোহন বুঝিতে পারে হঠাৎ সে ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছে—মুখ বন্ধ করিয়া সে রাগটা সংযত করিবার

চেষ্টা করিতেছে। চিন্ময় মুখ খুলিলে তবে মোহন তার রাগের কারণটা বুঝিতে পারে। তার প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ মনে করিয়া চিন্ময়ের রাগ হইয়াছে।

রাগ আয়ত্তে আসিলে চিন্ময় ধীরে ধীরে বলে, হাসি পেলে হেসো মোহন।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৮

তুমি পনেরো সের মাছ তুলেছিলে মনে আছে। কিন্তু আমি জীবনে কখনও ছিপে মাছ ধরিনি।'

সন্ধ্যার সময় চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল, বড় একটা মাটির প্রদীপ। শূন্য ঘরে প্রদীপের শিখাকে কাঁপিতে দেখিয়া তখন মোহনের মনে হইল সহর সত্যই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

প্র সং পৃ ২৩

তুমি পনেরো সের মাছ তুলেছিলে মনে আছে কিন্তু আমি জীবনে কখনও ছিপে মাছ ধরিনি। আট দশ সেরি মাছ তুমি হেসে খেলে তুলে থাক।

ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য মোহন সত্যই শীতকালে খালি মেঝেতে বসার সমস্যাটা টানিয়া আনিয়াছিল। সে লজ্জিতভাবে বলে, মনে মনে হাসিনি ভাই, কথাটা শুধু চাপা দিচ্ছিলাম। ছিপে মাছ ধরতে তুমি যে আনাড়ি, সেটা তুমিও জানো আমিও জানি। মুখে বলে কী হবে ?

সন্ধ্যার সময় চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল—বড়ো একটা মাটির প্রদীপ। শূন্য প্রদীপের শিখাকে কাঁপিতে দেখিয়া তখন মোহনের মনে হইল শহর সত্যই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৮

এ হল বছর দুই আগের কথা। নিতাই এখন বার্থ কণ্ট্রোলের পরম ভক্ত।

'আমার ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আছে।'

প্র সং পৃ ২৫

এ হল বছর দুই আগের কথা। কিন্তু শেখালে কী হবে, ও সব কি ধাতে পোষায় নিতাইদের ? আরেকটি বাচ্চা হয়েছে নিতাইয়ের বউয়ের—এবার আর কোনো গোলমাল করেনি। ডাক্তার আচ্ছা করে ধমক দিয়েছিল—কিন্তু নিতাই বলে অন্য কথা।

কী বলে ?

বলে, না বাবু। ও সব ভালো নয়। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। আমি বললাম, তবে সেবার ও রকম কাণ্ড করতে গিয়েছিলি কেন ? বউটা মরত, নিজে জেল খাটতে।

নিতাই বলল, অত বুঝিনি বাবু। ছেলেপিলে কষ্টার দশা দেখে মরিয়া হয়ে পাপ করেছি।

আমার ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ২৯

সন্ধ্যার সম্বন্ধে এত বড়ো গুরুতর কথা আলোচনা করার সময় গ্রামের নিতাই পিয়নের গল্প আরম্ভ কর—

'তোমরা কি এ ঘরেই থাকবে দাদা ;

প্র সং পৃ ২৫

সন্ধ্যার সম্বন্ধে এত বড়ো গুরুতর কথা আলোচনা করার সময় গ্রামের নিতাই পিয়োনের গল্প আরম্ভ করা বোধ হয় তার উচিত হয় নাই।

প্র সংযোজন

সংযোজন

কিন্তু গ্রামকে গ্রামের সরল শান্ত জীবনকে ভালোবাসিতে গেলে নিতাই পিয়োনের সমস্যাটা তুচ্ছ করা যায় কেমন করিয়া ? গ্রামের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অশিক্ষা কুসংস্কার এ সব বাদ দিয়া গ্রাম্য জীবন কল্পনা করা যায় কী করিয়া ?

তাকে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া চিন্ময় বিরক্ত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়, ধীরে ধীরে বলে, আসল নীতিটাই তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ মোহন। কারও কারও বেলা সত্যিকারের অজুহাত থাকতে পারে—যেমন ধর, স্বাস্থ্যের জন্য যা দরকার হয়। কিন্তু খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্বাধীন চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটবে—এ সব কি বার্থ কন্ট্রোলের অজুহাত ? নিতাই ছেলেপিলেকে খেতে দিতে পারে না, সেটা একেবারে আলাদা একটা অন্যায়। নিতাই অন্যায়টা মানবে কেন সে ভগবানের দোহাই দেয়—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। কিন্তু আসল কথাটা তো ঠিক। আহারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ বাড়বে কমবে—সে জন্য বার্থ কন্ট্রোল দরকার হয় না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে বলেই মানুষ মরতে মরতে দুর্ভিক্ষ ঠেকাবার ব্যবস্থা করবে, মানুষ জন্মানো বন্ধ করে কি দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায় ? গরিব সুখে থাকে ?

হঠাৎ চিন্ময় হাসে।

প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম ভাই। সন্ধ্যা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে এখন থেকে একটা উপকার করেছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে মাথা অনেক সাফ হয়ে এসেছে।

আচমকা সে প্রশ্ন করে, তোমার কি তবে এই ব্যাপার ? শহরে আসবে স্বাধীনভাবে দু জনে স্ফূর্তি করবে, তাই ছেলে মেয়ে চাও না ?

মোহন বলে, এবার আমার রাগ করা উচিত। লাবণ্যকে ডাক্তার দেখাতে কলকাতা এসেছিলাম মনে নেই ?

সত্যি মনে ছিল না ভাই।

তোমরা কি এ ঘরেই থাকবে দাদা ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০

গ্রামে পুকুরঘাটে একটি স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া অকথ্য গালাগালি দিতেছে, এই রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন ঘটিয়া গেল।

প্র সং পৃ ২৫

গ্রামে পুকুরঘাটে একটি স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া অসভ্য অবিবেচক মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, শহুরে ভাবে সেই রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন ঘটিয়া গেল।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩০

গ্রামের স্ত্রীলোক গালাগালি দেয়। এরা ক্ষমা করে।

পরদিন চিন্ময় একটি বাড়ির খবর দিল।

প্র সং পৃ ২৬

গ্রামের স্ত্রীলোক গালাগালি দেয়, ক্ষমাও করে নীরবেই। এরা চোখের দৃষ্টিতে শাসন করে আবার ক্ষমাও করে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

পরে সে চিন্ময়কে ব্যাপারটা বলে। সরলভাবে প্রাণ খুলিয়া বলে, এমন লজ্জা পেলাম ভাই ! আমার মনে কিছু নেই, অবাক হয়ে দেখছিলাম যে কায়দা জানলে কত সিম্পল ভাবে রূপকে কী আশ্চর্যরকম ফুটিয়ে তোলা যায়। গেঁয়ো মানুষ, খেয়াল ছিল না ও ভাবে তাকাতে নেই।

তাকালে দোষটা কি ? এ হল ঝরণার ন্যাকামি। সবাই দেখবে বলেই তো সাজগোজ করেছে ! সোজাসুজি খোলাখুলি স্পষ্টভাবে চেয়ে দেখলেই বুঝি দোষ হয়ে গেল ?

একটু থামিয়া চিন্ময় নালিশের সুরে আবার বলে, তোমার কাছে গ্রামের সব কিছুই খারাপ। কেউ অসভ্যতা করলে মেয়েরা সোজাসুজি গালাগালি দেবে—সেটাই তো উচিত। কিন্তু ও রকম কি সত্যি ঘটে ? আমি তো দেখেছি এক ঘাটে মেয়েপুরুষ কয়েক হাত তফাতে নাইছে—পুরুষেরা আগাগোড়া মেয়েদের দিকে পিছন ফিরে থাকে, তাও দেখেছি।

মোহন বলে, তা না হলে কি চলে ? সবাইকে পুকুরেই তো যেতে হবে। কাজেই ও রকম নিয়মনীতি দরকার। মেয়েরা নাইছে বলে তুমি এক ঘণ্টা হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? ওদের দিকে পিছন ফিরে একটু তফাতে তোমার নাওয়ার কাজ সেরে তুমি চলে যাও !

চিন্ময় খুশি হইয়া বলে তবে ? দ্যাখো তো কি সহজ সুন্দর নিয়ম।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩১

বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মোহন খুব সমারোহ করিল। দেশে এই তার শেষ সামাজিক কাজ, সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পরেও বহুদিন যেন মানুষ তার প্রশংসা করে। আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসিল, একটি বৃষ উৎসর্গ করা হইল,

বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মোহন খুব সমারোহ করিল।

দেশে এই তার শেষ সামাজিক কাজ, সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পরেও বহুদিন যেন মানুষ তার প্রশংসা করে।

নানা জাতের আরও অনেক লোক ছাড়া শুধু ব্রাহ্মণই ভোজন করিল সাড়ে সাতশো, দু হাজার কাঙ্গালীর পেট জীবনে হয়তো এই প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার ভরার মতো ভরিয়া গেল।

প্র সং পৃ ২৭

আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসিল, বন্ধু-বান্ধবেরা আসিল, একটি বৃষ উৎসর্গ করা হইল, নানা জাতের আরও অনেক লোক ছাড়া শুধু ব্রাহ্মণই ভোজন করিল সাড়ে সাতশো, দু হাজার কাঙালির পেট জীবনে হয়তো এই প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার ভরার মতো ভরিয়া গেল। দ্র সংযোজন

সংযোজন

চিন্ময় আসিয়া তিন দিন থাকিয়া গেল। এত টাকা খরচ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধে এমন সমারোহ করিয়াও বন্ধুর কাছে সে কিন্তু প্রশংসা পাইল না।

চিন্ময় স্পষ্টই বলিল, লোকজন খাওয়াচ্ছ তাতে কিছু বলার নেই। বাজে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এত টাকা নষ্ট করার মানে হয় ?

না করলে লোকে নিন্দা করবে।

মা রচনসমগ্র-৫ পৃ ৩২

হয়তো লাবণ্যের মুখ সন্ধ্যার মুখ নয় বলিয়া। তবু রূপ যে ধারে কাটে না লাবণ্যের ভারে কাটে, এটা জানা থাকায় মোহন মুখ মাজাঘষার চেষ্টায় স্ত্রীকে প্রশ্রয় দেয়, উৎসাহও দেয়।

প্র সং পৃ ২৮

হয়তো লাবণ্যের মুখ সন্ধ্যর মুখ নয় বলিয়া। অথবা হয়তো নিজের রূপকে ঘষামাজা করার কলাকৌশল লাবণ্য জানে না। তবু রূপ যে ভারে কাটে না লাবণ্যের ধারে কাটে, এটা জানা থাকায় মোহন মুখ মাজাঘষার চেষ্টায় স্ত্রীকে প্রশ্রয় দেয়, উৎসাহও দেয়।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩২

এই একটি মাত্র ভরসা তার সম্বন্ধে মোহন করে, তার পড়াশোনা আছে। তার গরীব বাপ মেয়েকে স্কুল কলেজ পড়াইতে তালি দেওয়া জুতাজামা পরিয়া দিন কাটাইয়াছে। লেখাপড়া জানা মেয়ের বিবাহে খরচ নাই, বিবাহের সময় যে মোটা টাকা লাগিবেই, সেটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে অল্পে অল্পে খরচ করিয়া গেলে দোষ কি ? মোহনকে জামাই করার সময় বোধহয় ভদ্রলোকের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। লাবণ্যের মার গায়ে একখানা গহনাও অবশিষ্ট নাই, দু'হাতে শুধু দুটি সোনা বাঁধানো শাঁখা। মোহন বই কেনে, লাবণ্য পড়ে।

প্র সং পৃ ২৯

এই একটিমাত্র ভরসা তার সম্বন্ধে মোহন করে, তার কিছু পড়াশোনা করা আছে। তার গরিব বাপ মেয়েকে স্কুল কলেজে পড়াইতে, তালি দেওয়া জুতাজামা পরিয়া দিন কাটাইয়াছে। এটা অবশ্য তার কন্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ অথবা উদারতার প্রমাণ নয়—আরও অনেকেই যে হিসাবে মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়, তারও ছিল সেই একই হিসাব, লেখাপড়া জানা মেয়ের ভালো পাত্র জোটে, বিবাহে খরচ কম লাগে, বিবাহের সময় যে মোটা টাকা লাগিবেই, সেটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে অল্পে অল্পে খরচ করিয়া গেলে দোষ কি ?

মোহনকে জামাই করার সময় বোধ হয় ভদ্রলোকের ভুল ভাঙিয়াছে।

মোটা টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে, লাবণ্যের মার গায়ে একখানা গয়নাও অবশিষ্ট নাই, দু হাতে শুধু দুটি সোনা বাঁধানো শাঁখা ! দ্র সংযোজন

সংযোজন

তবে এ কথাও সত্য যে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখাইলে মোহনকে জামাই করার ভাগ্য তার হইত না।

মোহনের বাপের জন্য লাবণ্যের কলেজে পড়া বন্ধ হইয়াছিল, পিছনে সায় ছিল মার। এ বিষয়ে ছেলের সঙ্গে সে আপস করে নাই। কলেজে পড়া মেয়ে আনিয়াছে তাই যথেষ্ট—এবার তাকে অন্তঃপুরে বউ হইয়াই থাকিতে হইবে।

মোহন তাকে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করিতে দেয় নাই—কর্মহীন অলস দিন কাটাইতে লাবণ্যও বই পড়া একটা অবলম্বন করিয়াছে।

মোহন বই কেনে, লাবণ্য পড়ে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৩

কখন যে পড়ে, মোহন ভাল বুঝিতে পারে না, নূতন বই নিজের শেষ হওয়ার আগে সে যখন উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'তাড়াতাড়ি পড়ে নিও, আলোচনা করব'—লাবণ্য বলে, 'পড়েছি। শেষ বয়সের লেখা বোঝা যায়।'

অন্য সব দিকে লাবণ্য তাকে হতাশ করিয়াছে। তার খানিকটা ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস, কারণে-অকারণে হাসি-কান্নার মধ্যে যার প্রকাশ, বাকিটা পরের মুখ চাওয়া পরাধীনতায় সন্তুষ্ট আড়াল-খোঁজা নিষ্ক্রিয় জড়তা।

সময় সময় মনে হয়, ভয় ও সংকোচে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে শ্যাওলা আর পানাভরা পুকুরের মত, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষীর বুদবুদ উঠে, ছোটবড় মাছের মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা আত্মচেতনা লেজের ঝাপটায় একটু সময়ের জন্য পানা সরাইয়া দেয়।

রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগেও মোহন তাই ভাবে, শুধু লাবণ্যকে নিয়া গেলেই বোধ হয় ভালো হইত।

প্র সং পৃ ২৯

কখন যে পড়ে, মোহন ভালো বুঝিতে পারে না। নূতন বই নিজের শেষ হওয়ার আগে সে উৎসাহের সঙ্গে তাগিদ দিয়া বলে, তাড়াতাড়ি পড়ে নিয়ো আলোচনা করব—

লাবণ্য বলে, পড়েছি। শেষ বয়সের লেখা বোঝা যায়।

অন্য সব দিকে লাবণ্য তাকে হতাশ করিয়াছে।

তার খানিকটা ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস, কারণে-অকারণে হাসি-কান্নার মধ্যে যার প্রকাশ, বাকিটা পরের মুখ চাওয়া পরাধীনতায় সন্তুষ্ট আড়াল-খোঁজা নিষ্ক্রিয় জড়তা। সময় সময় মনে হয়, ভয় ও সংকোচে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে শ্যাওলা আর পানাভরা পুকুরের মতো, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষির বুদবুদ উঠে, ছোটোবড়ো মাছের মতো ভাঙা ভাঙা আত্মচেতনা লেজের ঝাপটায় একটু সময়ের জন্য পানা সরাইয়া দেয়।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

এত বইপড়া, ইংরাজি সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করা তার মনের গড়ন, স্বভাব আর চালচলনে কোনো পরিবর্তনই যেন আনিতে পারে না।

ওইটুকু ভরসাই মোহনের আছে। পড়াশোনার প্রভাব চেতনায় পড়িবেই—শুধু পরিবেশের জন্য লাবণ্যের চেতনায় সে প্রভাবটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। পরিবেশ বদল হইলে সেটা নিশ্চয় আত্মপ্রকাশ করিবে।

রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগেও মোহন তাই ভাবে, সকলকে দেশের এই বাড়িতে রাখিয়া শুধু লাবণ্যকে নিয়া গেলেই বোধ হয় ভালো হইত।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৩-৩৪

সকলে তাদের গাড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে যায়।

প্র সং পৃ ৩২

বেচিবার জন্য বেসাতি নিয়া বসিবার স্থানও সকলের বহুকাল ধরিয়া সুনির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সকলে তাদের গাড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে যায়।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৬

কলিকাতার হাটে বোমা পড়িতে থাকিলেও কেহ এক পা নড়িবে না, এমনিভাবে সেখানে সকলে শিকড় গাড়িয়াছে।

প্র সং পৃ ৩৩

কলিকাতার হাটে বোমা পড়িতে থাকিলেও এবং বহুলোক পালাইয়া গেলেও টের পাওয়া যায় না হাটের ভিড়ের চাপ একটু কম হইয়াছে। শহরের হাট ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া গিয়াছে এমনিভাবে শহরের মানুষের সেখানে সকলে শিকড় গাড়িয়াছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৬

ট্রেণে মোহন একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়াছিল। চিন্ময় স্টেশনে আসিতে পারে। মা ম্লানমুখে এক কোণে বসিয়া থাকেন।

প্র সং পৃ ৩৩

ট্রেনে মোহন একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়াছিল। চিন্ময় স্টেশনে আসিতে পারে। রিজার্ভ করা সেকেন্ড ক্লাস কামরা ছাড়া মান বজায় রাখিয়া তার সামনে নামা যায় না।

মা ম্লানমুখে এক কোণে বসিয়া থাকেন।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৩৬

গাড়িভাড়ার টাকাটাও রেখে এলাম, এটা ওটা খাওয়াতে পারবে মেয়েকে।

প্র সং পৃ ৪৪

গাড়িভাড়ার টাকাটাও রেখে এলাম, এটা ওটা খাওয়াতে পারবে মেয়েকে। নইলে বাঁচবে না মেয়েটা।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

মোহন ভাবে গরিবের কি আর অজুহাতের অভাব হয়। টাকাটা যে তাকে দেওয়া হইয়াছিল গাড়ি ভাড়া বাবদ, অন্যভাবে যে ও টাকা খরচ করা চলে না, এ যুক্তি পীতাম্বর বুঝিবে না।

শ্রীপতিকে জ্যোতির ঘরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, পাশের ছোটো ঘরটি দরকার হইয়াছে মার। পীতাম্বরকে কোথায় থাকিতে দেওয়া যায় মোহন মনে মনে তাই ভাবিতেছিল। গ্যারেজের সঙ্গে ছোটো একটি বাড়তি ঘর ছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া পীতাম্বর নিজেই সেখানে থাকিবে স্থির করিয়া ফেলিল।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৪২

এমন না হইলে কার কাছে বাহাদুরি করিয়া সুখ হয় মানুষের ? জ্যোতির কবি মন নিজেকে কেন্দ্র করিয়া গৌরবগাথা সৃষ্টি করে, উদাহরণসমেত জীবনের ব্যাখ্যা শোনায়, দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত ললনাকুলের হৃদয়রাজ্য জয় করে, চাণক্যের মত বুদ্ধি কৌশলে শত্রু নিপাত করে, শুধু ভাঁওতা দেওয়ার ক্ষমতায় বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পায়।

প্র সং পৃ ৫০

কথা শুনিতে শুনিতে এমন অভিভূত বিচলিত হইয়া না পড়িলে কি আর কারও কাছে বাহাদুরি করিয়া সুখ হয় মানুষের ?

জ্যোতির কবি মন নিজেকে কেন্দ্র করিয়া গৌরবগাথা সৃষ্টি করে, উদাহরণসমেত জীবনের ব্যাখ্যা শোনায়, দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো ললনাকুলের হৃদয়রাজ্য জয় করে, চাণক্যের মতো বুদ্ধি কৌশলে শত্রু নিপাত করে, শুধু ভাঁওতা দেওয়ার ক্ষমতায় বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পায়।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

বিব্রত হইয়া অভিভূত হইয়া উত্তেজিত হইয়া শ্রীপতি তার কথা শোনে। বুঝিতে পারা যায় সে ভাবিয়া পাইতেছে না এই বীরপুরুষটি, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি সতেরো টাকা বেতনে মোহনের বাড়ি চাকরের কাজ করিতেছে কেন।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৪৫-৪৬

এককোণে উপুড় করা ঘষামাজা বাসন, কাঠের আলনায় মোটে দুটি শাড়ি, একটি সেমিজ আর একটি গামছা, পুরাণো পাড়ে তৈরি ঢাকনা দেওয়া একটি বাক্স, দেয়ালে আটা দিয়া আটকানো আর পেরেকে লটকানো অনেকগুলি ছবি, কোনটা ক্যালেণ্ডারের, কোনটা মাসিকের, কোনটা বাজারের, মিলের কাপড়ে যে ছবি আঁটা থাকে তাও আছে। হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে নধর বালগোপাল, স্থূলাঙ্গী উলঙ্গিনী, দেবদেবী, বাগানের মত বন, উইটিবির মত পাহাড় আর নালার মত নদীতে প্রকৃতি, দেয়ালে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া আছে। একটি ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে। শিশুকে এক জননী স্তন দিতেছে।

শিল্পী ভারি চালাক, সদ্যস্নাতার চেয়ে নারীটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু কে অশ্লীল বলিবে এই ছবিকে, এমন সুমহান পবিত্র দৃশ্য যে ছবির বিষয়বস্তু।

প্র সং পৃ ৫১

এককোণে উপুড় করা ঘষামাজা বাসন, কাঠের আলনায় মোটে দুটি শাড়ি, একটি শেমিজ আর একটি গামছা, পুরানো পাড়ে তৈরি ঢাকনা দেওয়া একটি বাক্সো, দেওয়ালে আঠা দিয়া আটকানো আর পেরেকে লটকানো অনেকগুলি ছবি, কোনোটা পুরানো ক্যালেন্ডারের, কোনোটা মাসিক পত্রের, মিলের কাপড়ে যে ছবি আঁটা থাকে তাও আছে। হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে নধর বালগোপাল, স্থূলাঙ্গী উলঙ্গিনী দেবদেবী, বাগানের মতো সাজানো বন, উইঢিবির মতো পাহাড় আর নালার মতো নদীতে মূর্তিমতী প্রকৃতি দেওয়ালে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া আছে।

একটি ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে। ছেলে কোলে এক মায়ের ছবি দেখিয়া।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৪৬

নগেনকে সে নিজের ছায়ায় ঢাকা দেয় নাই। জগদানন্দের বেদনাবোধ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় এখন তার ভয় করিতে থাকে। প্র সং পৃ ৫৭

নগেনকে সে নিজের ছায়ায় ঢাকা দেয় নাই।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

সংসারে সাধারণত বড়ো ভাইয়ের কাছে ছোটো ভাই যতটা প্রশ্রয় পায়, যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার অনেক বেশিই সে বরাবর নগেনকে দিয়া আসিয়াছে। গোপনে সিগারেট খাওয়া ধরিয়াছে জানিয়া উদারভাবে সে তাকে সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি পর্যন্ত দিয়াছিল। কোনোরকমে ছোটোভাইকে দাবাইয়া রাখিবার, দমাইয়া দিবার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড় করাইতে পারিবে না।

নগেন কিন্তু সিগারেট খাওয়া সম্পর্কে তার উদারতার মানে বুঝিয়াছিল উলটো, ভাবিয়াছিল সে তিরস্কার করিতেছে।

আরও অনেক প্রশ্রয় দেওয়া, স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারেও কি নগেন এইরকম উলটা বুঝিয়াছে ?

জগদানন্দের বেদনাবোধ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় এখন তার ভয় করিতে থাকে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৪৯

তার কেবলই মনে হইতে থাকে এতকাল এ বিষয়ে উদাসীন থাকা উচিত হয় নাই।

প্র সং পৃ ৫৭

তার কেবলই মনে হইতে থাকে এতকাল এ বিষয়ে উদাসীন থাকা তার উচিত হয় নাই।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

নগেনের মতো ভাই বয়স্ক পুত্রের মতো। বাপ বাঁচিয়া থাকিলে আলাদা কথা ছিল। গ্রামে হোক শহরে হোক, ভাইকে মানুষ করিবার দায় এড়াইয়া গেলে এই ভাইটার জন্যই তার নিজের জীবনেও অনেক অবাঞ্ছিত বিপর্যয় দেখা দিবে।

মা বচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫০

উল্লেখ না করার মতো তুচ্ছ নয় কথাটা।

এই জন্য কি এতদিন সে যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যার কাছে যায় নাই ?

প্র সং পৃ ৫৯-৬০

একেবারে উল্লেখ না করার মতো তুচ্ছ নয় কথাটা।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

সন্ধ্যা তাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে কয়েক বছরের মতো। দুজনের মধ্যে চিঠি লেখা পর্যন্ত বন্ধ। এ অবস্থায় সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে চিন্ময়ের কাছে তা গোপন করা যায় না।

এই জন্য কি এতদিন সে যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যার কাছে যায় নাই চিন্ময়কে পরে বলিতে হইবে, এই ভয়ে ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫১

যেমন ধরো আমার কিছু বাড়তি টাকা চাই। আমি ফোন করে বলি, 'ও লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেয়।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ধ্যা মোহনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে, ভুরু কুঁচকাইয়া বলে, 'খারাপ লাগছে শুনতে ? আমাকে ভোগ করতে দিই না, তবু টাকা চেয়ে নিই, খাপছাড়া মনে হচ্ছে ?....

প্র সং পৃ ৬৩

সন্ধ্যা একটু হাসিল।

যেমন ধরো আমার কিছু বাড়তি টাকা চাই। আমি ফোন করে টাকার কথা বলি, ও লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেয়।

শুধু টাকার কথা বলো ? আর কোনো কথা হয় না ?

হয় বইকী।

সন্ধ্যার মুখের হাসি নিভিয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে মোহনের মুখের ভাব লক্ষ করে, ভুরু কুঁচকাইয়া বলে, খারাপ লাগছে শুনতে ? আমাকে ভোগ করতে দিই না তবু টাকা চেয়ে নিই, এটা খুব খাপছাড়া মনে হচ্ছে ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫৩

মোহন যে জিদের কথা বলিয়া অনুযোগ দিয়াছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণের মত এমন স্পষ্ট জবাব দিলে আর কি বলা যায় ?

প্র সং পৃ ৬৪

মোহন যে জিদের কথা বলিয়া অনুযোগ দিয়াছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণের মতো এমন স্পষ্ট জবাব দিলে আর কী বলা যায় ?

দ্র সংযোজন

সংযোজন

ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। বাস্তব জীবনে যেসব চলতি এবং সর্বজন স্বীকৃত ফাঁকি আছে সেগুলিকে ফাঁকি বলিয়া মানিতে চায় না। সব ফাঁকি নয়—যেগুলি না মানিলে তার নিজের সুবিধা হয়, কেবল সেইগুলি। যেমন বিবাহের আগে প্রেমের উন্মাদনায় চিন্ময় যেসব আবোল-তাবোল কথা বলিয়াছিল প্রতিজ্ঞার মতো, চুক্তির মতো ওই কথাগুলি চিন্ময়কে সারা জীবন মানিয়া চলিতেই হইবে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫৪

এ বিষয়ে আর আলোচনা হইল না। ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও রহিল না।

মোহনকে সন্ধ্যা তখন ছাড়িয়া দিল না।

প্র সং পৃ ৬৪

এ বিষয়ে আর আলোচনা হইল না। ভবিষ্যতে হইবার আর কোনো সম্ভাবনাও রহিল না।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

মোহনের একবার ইচ্ছা হইল সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করে চিন্ময় টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সে কী করিবে? কিন্তু ইচ্ছাটা সে চাপিয়া গেল।

কারণ তার মনে পড়িয়া গেল, সোজাসুজি ওদের ঝগড়া হয় নাই। এ ভাবে চিরকাল চলিতে পারে না, ঝগড়া একদিন ওদের হইবেই। সন্ধ্যার পক্ষেও আজ বলা সম্ভব নয় যে হয় আপস করা অথবা সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার ওই বাস্তব সমস্যা দেখা দিলে সে কী করিবে!

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫৪

সকলে জানায় কি? সহরে উজ্জ্বল আলোর গাঢ় ছায়ান্ধকারে যারা বাস করে? ওদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসাভাসা, সে শুধু আবর্জ্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলায় বাতি জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বস্তি দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে। সকলে জানায় কি?

প্র সং পৃ ৬৫

সকলে জানায় কি? শহরে উজ্জ্বল আলোর গাঢ় ছায়ান্ধকারে শহরের সব রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত যারা বাস করে?

ওদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসাভাসা। সে শুধু আবর্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলায় বাতি জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বস্তি দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে।

ও সব স্থান ও ঘরের সকলে নালিশ জানায় কি?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫৫

তারা চুপ করিয়া থাকে। সহরের মালিকেরা তাদের কাছে মানুষ নয়, দেবতা, দেবতার বিরুদ্ধে তারা গ্রামের মানুষের মতই নালিশ জানায়। রাস্তায় জল জমিলে যাদের মোটর আটকাইয়া যায় তারাই শুধু রাগ করে।

প্র সং পৃ ৬৫

সর্বশেষ সংস্করণে এই পঙ্‌ক্তি কয়টি নেই।

এখানে আসা স্পোর্টসের আনন্দের জন্য। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই জলকাদায় এত কষ্ট করিয়াও সে আনন্দ চাই? —কি জবাব দিবে কে জানে!

একজন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার মাত্র মোহন রেস দেখিতে আসিয়াছিল, থার্ড এনক্লোজারে।

প্র সং পৃ ৬৬

এখানে আসা স্পোর্টসের আনন্দের জন্য। সন্ধ্যাও যা বলিয়াছে—রেস খেলিতে মজা লাগে তাই সে রেস খেলে, টাকা জিতিবার জন্য নয়।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

আনন্দ চাই, আনন্দ! যার আরেক নাম মজা! যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই জলকাদায় এত কষ্ট করিয়াও সে আনন্দ চাই!—এরা কী জবাব দিবে সে জানে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই একই কথা সকলে বলিবে—কষ্ট করা ছাড়া, অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া কি আনন্দ পাওয়া যায়?

আবার যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া কষ্ট করিলে, খাটিয়া এবং বেকারি করিয়া হাড়মাস কালো করিবার কষ্ট করিলে, রোগে আর দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে বহিবার কষ্ট করিলে, আনন্দ মেলে কি? রোমাঞ্চ মেলে কি?

এ প্রশ্নেরও এরা কী জবাব দিবে সে জানে।

বলিবে, ওটা আলাদা প্রশ্ন, ওটা কমিউনিস্টদের প্রশ্ন।

একজন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার মাত্র মোহন রেস দেখিতে আসিয়াছিল, থার্ড এনক্লোজারে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫৫

যাওয়ার অনেক বাড়ি আছে সন্ধ্যার, বন্ধুর তার অভাব নাই। আজ সে কোথাও যাইতে চায় না, অন্য কারো সঙ্গ কামনা করে না। কারণ সে আজ সঙ্গে আছে, অনেকদিন পরে সঙ্গে আছে। তাই তো মানে সন্ধ্যার কথার ? শেষ বেলার সঙ্গে সন্ধ্যার ম্লান রূপের সামঞ্জস্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শাড়ির রঙটাও কি বদলাইয়া যাইতেছে সন্ধ্যার ?

প্র সং পৃ ৬৮

যাওয়ার অনেক বাড়ি আছে সন্ধ্যার, বন্ধুর তার অভাব নাই। দু-তিনটা হোটেলের যে কোনো একটাতে গেলেই বন্ধু আর বান্ধবীদের সঙ্গে হইচই করিয়া রাত চারটা বাজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আজ সে কোথাও যাইতে চায় না, অন্য কারও সঙ্গ কামনা করে না। কারণ মোহন যে আজ সঙ্গে আছে, অনেকদিন পরে সঙ্গে আছে।

তাই তো মানে সন্ধ্যার কথার ?

শেষ বেলার সঙ্গে সন্ধ্যার ম্লান রূপের সামঞ্জস্যে স্পষ্ট হইয়াছে। শাড়ির রংটাও কি বদলাইয়া যাইতেছে সন্ধ্যার ?

দ্র সংযোজন

সংযোজন

আকাশে দিনান্তের সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ? এই অদ্ভুত রকম আধুনিক শাড়ি কিনিতে সন্ধ্যা না জানি কত টাকা আদায় করিয়াছে চিন্ময়ের কাছে।

দিনে সূর্যের আলোয় শাড়িটা এক রকম দেখায়, সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঠেকাইবার জন্য বানানো আলো উজ্জ্বল হওয়ার সঙ্গে বদলাইয়া যায় শাড়িটার রঙের বৈচিত্র্য।

সন্ধ্যা তাকে একটা সাধারণ বিলাতি হোটেলে নিয়া যায়। দেশি মালিকের বিলাতি হোটেল, বিলাতি হোটেলের মতো সহজ জাঁকজমক নাই কিন্তু ঠাট আছে। রেস খেলার থার্ড এনক্লোজারে যারা আজ জিতিয়াছে তারা এই হোটেলে ভিড় করিবে। আসল বিলাতি হোটেলে যাইতে তারা অবশ্য কিছুমাত্র ভয় পায় না—রেসে একদিন দাঁও মারিতে পারিলে টাকাগুলি পকেটে নিয়া ওই বিলাতি হোটেলেই তারা যায়—ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া সগর্বে সগৌরবে বয়কে হুকুম দিয়া পেগ আনাইয়া পান করে। সায়েবের চেয়েও কড়া গলায় বয়কে ধমক দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বয়ও জানে মানুষটা আজ দরাজ হাতে বখশিশ দিবে।

সন্ধ্যা মিষ্টি হাসি হাসে।

বুঝতে পারছি তোমার ভালো লাগছে না। একেবারেই ভুলে গেছিলাম তুমি গাঁ থেকে আসছ, মেয়ে বন্ধু নিয়ে রেস খেলা হোটেলে পেগ খাওয়া তোমার পছন্দ নয়।

গাঁ থেকে এসেছি বলেই কি—

রাগলে ? রেগো না। এটুকু তোমার বোঝা উচিত, আমি মোটেই ও ভাবে কথা বলছি না, তোমায় খোঁচা দিচ্ছি না। আমি কি বলছি জানো ? এতদিন শহর থেকে দূরে ছিলে বলেই বোধ হয় তুমি আমার একমাত্র বন্ধু আছ—খাঁটি বন্ধু আছ।

মোহন চমৎকৃত হইয়া যায়, অভিভূত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সে একমাত্র বন্ধু—খাঁটি বন্ধু !

সন্ধ্যা ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৫৭

তবু সে এই পরিবারের গুরুবংশের গুরুত্বের বর্তমান উত্তরাধিকারী। তাকে যত খুসী শ্রদ্ধা করা চলে, দেখানোও চলে।

প্র সং পৃ ৭৫

তবু সে এই পরিবারের গুরুবংশের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তির বর্তমান উত্তরাধিকারী। তাকে যত খুশি শ্রদ্ধা করা চলে, ছেলেমানুষের মতো ছ্যাবলামি করার মতো সেটা প্রকাশ করিয়া দেখানোও চলে। তাই একমাত্র মোহন ছাড়া তার ছেলেমানুষিতে কেহ বিরক্ত হয় না। তার সরলতা সন্ধ্যার ভালোই লাগে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৬১

তারপর জোরে ঢোক গিলিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কিছু ভাল লাগছে না মোহন।'

প্র সং পৃ ৭৫

তারপর জোরে ঢোক গিলিয়া বলিয়াছিল, আমার কিন্তু কিছু ভালো লাগছে না মোহন।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

তা হলে আর দেরি না করে শুয়ে পড়ো। একা ঘরে ভয় করবে না তো, তা হলে মেয়েরা কেউ বরং—

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট মুখে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, ভয় করবে ? একটা ঘরে রোজ একলা শুই জান না ?

সেটা তোমার নিজের বাড়ি।

এটা বুঝি পরের বাড়ি ? আমি বুঝি পরের বাড়িতে রাত কাটাই ? তুমি অবশ্য আমাকে পর ভাব—

সন্ধ্যা চেষ্টা করিয়া আবার একটু হাসিয়াছিল।

মোহন তখন ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই কথার পর্ব শেষ করিয়া দিল। ঘুমে কাতর লাবণ্যের উপর সন্ধ্যাকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বসিবার ঘরে চলিয়া গেল।

মা রচনাসমগ্র ৫ পৃ ৬২

না, যাওয়ার ক্ষমতা তার নাই। আজ এত রাত্রের বর্তমান জীবনের তাছাড়া কোন অর্থ হয় না। সন্ধ্যার বদলে সে নিজে যদি এই সুযোগটা সৃষ্টি করিত।

প্র সং পৃ ৭৬

না, ও ঘরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নাই।

এই অক্ষমতাকে স্বীকার না করিলে আজ এত রাত্রের বর্তমান জীবনের কোনো অর্থ হয় না।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

ফাঁকা ঘরে একা শুইয়া সন্ধ্যার ঘুম আসিয়াছে কিনা কে জানে। সন্ধ্যা যে বলিয়াছিল তার কিছুই ভালো লাগিতেছে না সেটা কিন্তু ছলনা নয়। কথার পর্ব শেষ করিয়া সন্ধ্যাকে বিছানায় আশ্রয় নিতে দেওয়ার প্রয়োজনটা খেয়াল হওয়া মাত্র মোহন সেটা টের পাইয়াছিল।

বেশি খাওয়ার জন্যই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক, সন্ধ্যার খুবই খারাপ লাগিতেছিল— দেহ এবং মন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্মার্ট থাকিতেই হইবে সন্ধ্যাকে—কথায় হারিয়া যাওয়া তার স্বভাব নয়।

জগদানন্দের সঙ্গে তর্কে সে হার মানে নাই, এমনভাবে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া তর্ক শেষ করিয়াছিল যেন তার মোট কথাটা জগদানন্দ মানিয়া নিয়াছে, খুঁটিনাটি নিয়া আর তর্ক করিয়া লাভ নাই।

সন্ধ্যার স্বাস্থ্য সত্যই ভালো নয়। সত্যই তার গা বমি বমি করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, কিছুই ভালো লাগিতেছিল না।

তবু যে আজ সে অভিসারিকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছে তার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি দেয় নাই। তার উপায় নাই ফাঁকি দেওয়ার।

মোহনকে জয় না করিতে পারিলে নিজে সে মিথ্যা হইয়া যাইবে।

চিন্ময়ের কাছে হার মানিবে।

সন্ধ্যার বদলে সে নিজে যদি এই সুযোগটা সৃষ্টি করিত !

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৬২

ঝরণা আসিয়াছে। কাল রাত্রে দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেও বুঝি কিছু টের পাইয়াছিল, সকালে উঠিয়াই সন্ধ্যার বাড়িতে ফোন করিয়াছিল। সন্ধ্যা এখানে আছে শুনিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। প্র সং পৃ ৭৮

সকালে ঝরণা আসে।

কাল রাত্রে দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেও বুঝি কিছু টের পাইয়াছিল, সকালে উঠিয়াই সে সন্ধ্যার বাড়িতে ফোন করিয়াছিল। দ্র সংযোজন

সংযোজন

সকালে সন্ধ্যা এখন কোথায় আছে তার বাড়ির লোক বলিতে পারে নাই। শুধু জানাইয়াছে যে সে কাল সন্ধ্যায় মোহনের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে বাহির হইয়াছিল।

ঝরণারও নিমন্ত্রণ ছিল। সে অভিমান করিয়া আসে নাই। অভিমানের কারণ, মোহন নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাকে সে নগেনকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিল। কিন্তু নগেন যায় নাই।

কিন্তু দাদার সমস্যা অভিমানের চেয়ে বড়ো।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৬৪

'চিন্ময় তোমায় ভালবাসে মনে হয়।'

'না পেলে ভালবাসে।' প্র সং পৃ ৭৯

চিন্ময় তোমায় ভালোবাসে মনে হয়।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

তুমিও তো আমায় ভালোবাসো ?

না, তোমার জন্য আমার একটা মোহ আছে সত্যি, কিন্তু আমি জানি সেটা ভালোবাসা নয়। দশজনকে সমাজকে না মেনে ভালোবাসা হতেই পারে না। জীবনের আর সব তুচ্ছ করে দু-চারদিনের পাগল হওয়ার ঝোঁকটা কি ভালোবাসা ? জগৎ সংসার ভুলে গেলাম, সব মানুষের ভালোবাসার অধিকার আছে ভুলে গেলাম, সারাটা জীবনের কথা ভুলে গেলাম। জীবন্ত মেয়ে পুরুষের মধ্যেই ভালোবাসা হওয়া সম্ভব—জীবনের হিসাব ছাড়া কি ভালোবাসা হয় ? কাল রাত্রে তোমার ঘরের দরজায় গিয়েছিলাম জানো ? দরজা ঠেলেছিলাম।

জানি বইকী। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি টোকা দিলেই ছিটকিনি খুলে দিতাম।

তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি না। তাই ছিটকিনিটা খুলে রাখতে ভরসা পাওনি। গাঁ থেকে শহরে এসেছে মানুষটা, যদি না বুঝতে পারে ছিটকিনি খোলা রাখার মানে ? ভালোবাসার খেলা মিটে যাওয়ার পরেও যদি একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আর দাবি করে মুশকিলে ফেলে ?

সন্ধ্যা খানিক চুপ করিয়া থাকে।

উপদেশ দিচ্ছ ? স্নেহ কর বলে ?

না। আমার মনে হয় চিন্ময় তোমাকে ভালোবাসে।

না পেলে ভালোবাসে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৬৫

'ওঁর ভীষণ ভালবাসা সইতে পারিনি বলে। তবে—' প্র সং পৃ ৮১

ওঁর ভীষণ ভালোবাসা সইতে পারি না বলে। তবে—
দ্র সংযোজন

সংযোজন

ভীষণ ভালোবাসা ! চিন্ময়ের মতিগতি ভালো করিয়া জানা না থাকিলে মোহনও হয়তো ভীষণ ভালোবাসার মানে বুঝিয়া নিত কড়া ভালোবাসা, দুর্দান্ত ভালোবাসা। সন্ধ্যা কী অর্থে 'ভীষণ' বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে মোহন বুঝিতে পারে। চিন্ময়ের ভালোবাসা শুধু কড়া বা দুর্দান্ত নয়—কোমলও বটে, এদিকে আবার বড়ো বেশি গভীর, বড়ো বেশি সজাগ।

সন্ধ্যার জন্য নিজের প্রেম সম্পর্কে সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা সচেতন হইয়া থাকে, সন্ধ্যাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিবার সুযোগ দেয় না যে সে তাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে !

সন্ধ্যাও তাই বলে। বলে, একেই তো মানুষটা সব বিষয়ে সিরিয়াস—ভালোবাসা পর্যন্ত অত সিরিয়াস হলে মানুষের সয় ? তবে—

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৬৬

'ডক্টর উপেন সা কে এনেছিলাম। আমার বাড়িতেও চিকিৎসা করেন।'

'আমি তবে যাই এবার ?' জগদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

লাবণ্য বলিল, 'হ্যাঁ, আসুন। আপনার বোধ হয় খাওয়াও হয়নি।'

খাওয়া মোহনেরও হয় নাই। স্নানাহারের পর বিছানায় চিৎ হইয়া মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া তার ঘুম পাইতেছে, মা ঘরে আসিলেন।

প্র সং পৃ ৮২

গুরুদেবের বড়ো ভাই বলিয়া জগদানন্দ যে তার মায়েরও প্রণম্য, লাবণ্যের সঙ্গে তার যে পিতার মতো সম্পর্ক এটা মোহনের খেয়াল থাকে না।

জগদানন্দ বলে, ডক্টর উপেন সা-কে এনেছিলাম। আমার বাড়িতেও উনি চিকিৎসা করেন।

জগদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি তবে যাই এবার ?

লাবণ্য বলিল, হ্যাঁ, আসুন। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, আপনার বোধ হয় খাওয়াও হয়নি।

খাওয়া মোহনেরও হয় নাই।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

কিন্তু লাবণ্য যে তার খাওয়ার কথা উল্লেখ করে না, সেটা অন্যায় নয়। সন্ধ্যাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে গিয়া সে বাড়ি ফিরিয়াছে বেলা দেড়টায়—তারা কী করিয়া ভাবিবে যে সন্ধ্যা তাকে খাইতে না দিয়া বিদায় করিয়াছে ?

লাবণ্যের সকাতর আবদার উপেক্ষা করিয়া সে সন্ধ্যাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যা স্নানাহার না করিয়া তাকে আসিতে দেয় নাই বলিয়াই তো ফিরিতে তার এত বেলা হইয়াছে।

এ সব মোহন বোঝে। খিদেয় তার পেট জ্বলিয়া যাওয়ার জন্য সন্ধ্যা যে দায়ি নয় এরা তা কেমন করিয়া জানিবে।

সন্ধ্যাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার খানিক পরেই সে বিদায় নিয়াছিল। এতক্ষণ শুধু শহরের রাস্তায় রাস্তায় পাক দিয়া বেড়াইয়াছে।

কেনাকাটা সারিয়া তার বাপের যেমন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল পায়ে হাঁটিয়া শহরের পথে ঘুরিয়া বেড়ানোর— বিষণ্ণ হাসি বিনিময় করিয়া সন্ধ্যার কাছে বিদায় নিবার পর তারও তেমনি একটা অদম্য ঝোঁক চাপিয়াছিল গাড়ি চালাইয়া শহরটা চষিয়া বেড়ানোর।

শহরের পথে হাঁটিবার ঝোঁকে তার বাবা মরিয়াছিল দুর্ঘটনায়।

কয়েকটা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা হইতে সে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।

বিলাতি দোতলা বাসের রোগা কালো মাঝবয়সি বাঙালি ড্রাইভার কীভাবে ব্রেক করিয়া অ্যাকসিডেন্ট ঠেকাইয়াছিল ! শুধু আধ হাত—অত বড়ো দোতলা বাসটার গতি রুখিতে আর আধহাত বেশি আগাইতে হইলে মোহনও হয়তো আজ পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বর্গে যাইত।

ঘণ্টা তিনেক সে অকারণে চক্র দিয়াছে, তেল ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং পকেটে টাকা না থাকায় দামি হাতঘড়িটা জমা দিয়া তেল কিনিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। এ সব বাড়ির লোকের জানিবার কথা নয়।

তবু মোহনের বুকে অভিমান উথলাইয়া উঠে। একবার কি জিজ্ঞাসা করিতে নাই : তুমি খাইয়া আসিয়াছ কি ?

দেশে থাকিতে সকালে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়া বেলা তিনটায় ফিরিলেও তো লাবণ্য এবং মা ছাড়াও বাড়ির তিন-চারজন মানুষ জিজ্ঞাসা করিত, খেয়ে এসেছ ?

তার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বাড়ির মানুষ উদাসীন হইয়া গিয়াছে।

লাবণ্য এবং মা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় না যে সত্যই সে খাইয়া আসিয়াছে।

জগদানন্দ বিদায় নেওয়া মাত্র মোহন বাড়ির মানুষের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া দেয়।

স্নানের ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটির জন্য জ্যোতিকে ধমকায়, মাছ না থাকায় শুধু ডাল তরকারি এবং তাড়াতাড়ি মোড়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনা দই মিষ্টি দিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিতে হওয়ায় গর্জন করিয়া ওঠে।

মা গিয়াছিলেন দামি গরদের শাড়ি পরিয়া শহরের পাড়া বেড়াইতে। আরও ঘণ্টাখানেক পাড়া বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গরদের কাপড় ছাড়িয়া থান ধুতি পড়িয়া তিনি একটু শুইতেন।

মোহনের পরিত্যক্ত ধুতি পরা আশ্রিত মঙ্গলা তাঁকে ডাকিয়া আনিল। জানাইল, মোহন বাড়ি ফিরিয়া পাগলের মতো করিতেছে, লাথি মারিয়া সকলকে দূর করিয়া দিবার কথা বলিতেছে।

গরদের শাড়ি ছাড়িয়া থান ধুতি পরিতে পরিতে মা মোহনের গর্জন আর ধমকানি শুনিলেন। তারপর ছেলের সামনে গিয়া শান্ত সুমিষ্ট সুরে বলিলেন, তুই নিজেই একটা হুকুম দিবি, বাড়ির লোক তোর হুকুম মতো কাজ করলে নিজেই আবার রাগারাগি করবি ? এ কোন দেশি বুদ্ধি বিবেচনা মেজাজ হয়েছে তোর ?

কী হুকুম দিয়েছিলাম ?

তোর মনে থাকে না বলেই তো মুশকিল। এই সেদিন বেলা দুপুর করে বাড়ি ফিরলি, তোর জন্য উনান জ্বলছে মাছ টাছ সব রাখা হয়েছে দেখে যেন খেপে গেলি একেবারে। মনে নেই সবাইকে ডেকে চালাও হুকুম দিলি, বারোটার মধ্যে উনান নেবাতে হবে, খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে ? বারোটার পর তোর জন্য কিছু রাখতে হবে না, তুই বাইরে থেকে খেয়ে আসবি।

মিষ্টতা পরিহার করিয়া হঠাৎ যেন রাগিয়া টং হইয়া যান মা।

বাইরে খেয়ে খেয়ে কী চেহারাই করেছিস। দেখলে মনে হয় যেন বাড়িতে মা বউ ভাই বোন মাসিপিসি নেই, খেতে দেবার যত্ন করার কেউ নেই। শহরে এসে এমনভাবে তুই অধঃপাতে যাবি—

কথা শেষ না করিয়াই মা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। এ যে তাঁর রাগ নয়, এতবড়ো ছেলেকে ধমক দেওয়া নয়, এ শুধু মায়ের অভিমানের তিরস্কার—ও ছেলে কি আর তা বুঝিবে !

মোহন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইবার কথা ভাবিতেছিল। মা চলিয়া যাওয়ায় সে আবার খাইতে আরম্ভ করিল।

সত্যই তার মনে ছিল না কবে ঝোঁকের মাথায় অপচয় কমাইবার জন্য সে হুকুম দিয়াছিল—তার জন্যও বেলা বারোটার পর উনান জ্বলিবে না, বাড়ি না থাকিলে তার জন্য বিশেষ পদ কটাও রাঁধা হইবে না।

মাঝে মাঝে চেনা লোকের বাড়িতে এবং প্রায়ই সে হোটেলে খাইয়া আসে।

স্নানাহারের পর বিছানায় চিত হইয়া মেজাজ ঠান্ডা হইয়া তার ঘুম পাইতেছে, মা ঘরে আসিলেন।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৬৭-৬৮

পরদিন ঝরণাকে নূতন মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসাইয়া বজবজ যাইতে গিয়া একশো গজ গিয়াই নগেন একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাইয়া দিল। গাড়ি আস্তেই চলিতেছিল, এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়া আর ঝরণার বাঁ হাতটা একটু মচকাইয়া যাওয়া ছাড়া দুজনের বিশেষ কিছু হইল না। মোহন বুঝিতে পারিল না এই দুর্ঘটনায় মনে সে কেন খুসী হইয়াছে। ভয়ানক কিছু অনায়াসেই ঘটিতে পারিত, কিন্তু ঘটে নাই বলিয়া ?

প্র সং পৃ ৮৯

পরদিন সকালে ঝরণাকে নূতন মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসাইয়া বজবজ বেড়াইয়া আসিতে বাহির হইয়া একশো গজ পথ যাইতে না যাইতেই নগেন একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাইয়া দিল।

গাড়ি আস্তেই চলিতেছিল, এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়া আর ঝরণার বাঁ হাতটা একটু মচকাইয়া যাওয়া ছাড়া দুজনের বিশেষ কিছু হইল না।

মোহন বুঝিতে পারিল না এই দুর্ঘটনায় মনে মনে সে কেন খুশি হইয়াছে। ভয়ানক কিছু অনায়াসেই ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই বলিয়া ?

দ্র সংযোজন

সংযোজন

দূরে গিয়া জোরে গাড়ি চলার সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া দুজনের মারাত্মক রকম আহত হওয়া, এমন কী মরিয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না।

সেটা ঘটে নাই বলিয়া সে খুশি হইয়াছে?

অথবা ওদের দুজনের বজবজ গিয়া সারাটা দিন কাটাইয়া আসা সম্ভব হইল না বলিয়া ?

এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে ছেলের উপর মা আরেক চোট গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন।

বাড়ির শ খানেক গজ দূরে অ্যাকসিডেন্ট করিয়া দুজনে ফিরিয়া আসিলে নগেনের এখানে ওখানে সামান্য ছড়িয়া যাওয়া কাটিয়া যাওয়ার সামান্য রক্তপাত দেখিয়াই একেবারে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া মোহনকে বলিলেন, কেন তুই এ সব কিনে দিস ওকে ? ভাইটাকে মারতে চাস ?

দুর্ঘটনায় নগেন ব্যথার চেয়ে লজ্জা পাইয়াছিল বেশি।

সে তাড়াতাড়ি বলে, আমার কিছু হয়নি মা। একটু শুধু কেটে ছড়ে গেছে।

মোহন গম্ভীর মুখে কঠোর সুরে বলে, তুমি অনেকদিন থেকে মোটর-বাইকের জন্য আবদার করছিলে—জন্মদিনে তাই ওটা প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম। তোমায় মারবার জন্য দিইনি। ওটা আমি ফিরিয়ে নিলাম।

মচকানো হাতের ব্যথায় ঝরণা কাতরাইতেছিল—তার কাতরানি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

মোহন আরও কঠোর সুরে বলে, এবার থেকে আর কোনো আবদার জানিয়ে আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমার যা দরকার হবে মার কাছে চাইবে। মা বললে কিনে দেব।

সকলে মুখ কালো করিয়া থাকে।

সত্যই তো ?

সকলেই জানে নগেনের একটি মোটর সাইকেলের সাধ অনেকদিনের। বাপের কাছে অনেকবার চাহিয়া পায় নাই। বাপের মৃত্যুর পর মোহন ভাইয়ের জন্মদিনে উৎসব করিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভাইয়ের পুরানো সাধটা মিটাইয়াছে।

সে কি দুর্ঘটনার জন্য দায়ি ? মার কি উচিত হইয়াছে ও রকম বিশ্রী মন্তব্য করা যে ভাইকে মারিয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যই সে তাকে মোটর সাইকেলটা উপহার দিয়াছে ?

ছেলের কাছে মা আরেকবার হারিয়া গেলেন। ডাক্তার এবং ডাক্তারখানা বাড়ির প্রায় পাশেই বলা যায়। ডাক্তার আসিয়া ঝরণার মচকানো হাতে ওষুধের প্রলেপ দিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া এবং দুজনের কাটাছড়ায় ওষুধ লাগাইয়া বলিয়া গেলেন, খুব অল্পের উপরেই গেছে। আর কিছু করতে হবে না।

ঝরণাকে বলিলেন, দু একদিন খুব ব্যথা হবে, বাস। ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর ঝরণা আবার কাতরাইতে আরম্ভ করিলে মোহন বলে, তোমার নিজেরই দোষ। ছেলেমানুষ নতুন গাড়িটা পেয়েছে, তোমায় ক্যারিয়ারে চাপিয়ে চালাতে পারে ? স্পিডে চলার সময় অ্যাকসিডেন্ট হলে কী হত বলো তো ? নগেনের হয়তো আজ প্রাণ যেত ।

বলিয়াই মোহন টের পায় এটা তার কঠোরতা নয়, নিষ্ঠুরতা নয়, স্রেফ গ্রাম্যতা। সামান্য আহত নগেনকে দেখিয়া মা যেমন আর্তনাদ করিয়া তার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িতে চাহিয়াছিলেন, ঝরণা ক্যারিয়ারে চাপিয়াছিল বলিয়াই অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়াছে ঘোষণা করিয়া সেও ঠিক একই রকম গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছে ।

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়।

বলে, যাই বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকি।

কী কাতরতা ফুটিয়াছে নগেনের মুখে। লজ্জায় দুঃখে মরিতে চাওয়ার মতো মাথা হেঁট করিতে চায়, নিজের হাত পা কামড়াইতে চায়। সকলের সামনে সেটা তো করা যায় না। নীরবে ঝরণার মুখের দিকে কাতর চোখে চাহিয়া থাকে।

নিজের মনে একটা লড়াই করিতে করিতে জয়-পরাজয় তুচ্ছ করিয়া মোহন বলে, তোমার তো বেশি লাগেনি নগেন। ঝরণাকে পৌঁছে দিয়ে এসো না ? একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি।

রাত্রে মোহনের বক্ষলগ্না হইয়া লাবণ্য যেন নালিশের সুরে বলে, ধন্য তুমি। কীভাবে সকলকে খেলালে !

খেলালাম ?

বক্ষলগ্না হয়ে থাকার সময় লাবণ্যের অসীম সাহস দেখা যায়, মোহনের পক্ষে চরম অপমানজনক কথাও সে অনায়াসে যেন খেলার ছলেই বলিয়া যাইতে পারে।

কীভাবে মাকে জব্দ করলে ! কীভাবে ঝরণা হারামজাদিকে বুঝিয়ে দিলে তোমার ছেলেমানুষ ভাইটির সঙ্গে ইয়ারকি চলবে না। আবার কীভাবে ভাইটিকে দিয়েই এক রিকশায় ঝরণাকে—

মোহন উঠিয়া গিয়া আলো জ্বালে, সোফায় বসিয়া মোটা একটা বই তুলিয়া নিয়া পাতা উলটাইতে উলটাইতে বলে, তুমি ঘুমোও। আমি কয়েকটা হিসাব নিকাশের কাজ সেরে শোব।

লাবণ্যের কান্নার শব্দ শুনিয়া বিলাতে ছাপানো ইংরাজি বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খাটের কাছে গিয়া বলে, কেঁদো না। কাঁদলে মারব—তোমার এই ছিঁচকেমি কান্না বন্ধ করে অন্য কান্না কাঁদাব।

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কান্না থামাইয়া মড়ার মতো কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে লাবণ্য। ভাবে, কী তার লাভ হল শহরে বাস করতে এসে ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৭৩

ছয়

অপরাহ্ণে বাতাস যেন একেবারে মরিয়া যায়, ভাসিয়া যাওয়ার বদলে ধোঁয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কুণ্ডলী পাকাইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। চোখ জ্বালা করে, মনে বিষাদ জাগে। এর চেয়ে অন্ধকার যেন ভাল। বিষণ্ণতার চেয়ে যেমন ভাল অচেতন মন।

শ্রীপতির মনের বিষাদ কিন্তু কমিয়া গিয়াছে। একবার সে দেশের গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছে। দুদিনের বেশী কদম তাকে তিনদিন থাকিতে দেয় নাই, তাড়া দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে কলিকাতায়। ক মাস দুটি পয়সা রোজগার করিয়াই রোজগারের সাধ মিটিয়া গেল নাকি শ্রীপতির ? আর ভাল লাগে না ? বৌ আর ছেলেমেয়ের পেটে দুটি অন্ন যাইতেছে, অমনি বুঝি শনি ভর করিল কাঁধে ? কদম বিদায় করিয়া দিলেও শ্রীপতির মনে কিন্তু দুঃখ হয় নাই।

প্র সং পৃ ৯০

সাত

অপরাহ্ণে বাতাস যেন একেবারে মরিয়া যায়, ভাসিয়া যাওয়ার বদলে ধোঁওয়া অতি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কখনও কুণ্ডলী পাকাইয়া সোজা উপরে উঠিতে থাকে।

চোখ জ্বালা করে, মনে বিষাদ জাগে।

এর চেয়ে অন্ধকার যেন ভালো লাগে। ভোঁতা বিষণ্ণতার চেয়ে যেমন ভালো লাগে অচেতন মন।

শ্রীপতির মনের বিষাদ কিন্তু কমিয়া গিয়াছে।

একবার সে দেশের গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছে।

দুদিনের বেশি কদম তাকে তিনদিন থাকিতে দেয় নাই, তাড়া দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে কলিকাতায় ।

ক মাস দুটি পয়সা রোজগার করিয়াই রোজগারের সাধ মিটিয়া গেল নাকি শ্রীপতির ? আর ভালো লাগে না ? বউ আর ছেলেমেয়ের পেটে দুটি অন্ন যাইতেছে, অমনি বুঝি শনি ভর করিল কাঁধে ?

দ্র সংযোজন

সংযোজন

না, আরামে আলস্যে ঘরে বসিয়া দিন কাটানো চলিবে না শ্রীপতির, ঢিল দিলে চলিবে না। পয়সা রোজগারের যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে পুরোমাত্রায় তার সদ্‌ব্যবহার করিতে হইবে।

কদম নিজেও তো মরিয়া যাইতেছে না, ফুরাইয়া যাইতেছে না। শ্রীপতির হইয়া সে দেশের ঘরে কষ্ট করিয়া দিন কাটাইবে—সুখের দিনের জন্য।

জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে কদম এই একটা বিষয়ে বারবার তাকে আশ্বাস দিয়াছে—

শ্রীপতির কোনো ভয় নাই, কদম তারই আছে এবং চিরদিন তারই থাকিবে। কোনো পুরুষের সাধ্য নাই কোনো প্রলোভনে তাকে ভুলায়। স্বামী বিদেশে পয়সা কামাইতে গেলে তার মান কী করিয়া বজায় রাখিতে হয় কদম তা ভালো করিয়াই জানে।

বলিয়াছে, টের পাই না ভেবেছ নাকি ? তুমি খালি ডরাচ্ছ—একলা পেয়ে কদমকে কে বিগড়ে দেবে। কদমকে চেন না তুমি ? এতকাল এত কষ্ট সয়ে এলাম না ? আজ কদমের জন্য তুমি গেছ পয়সা কামাতে কদম বিগড়ে যাবে ! কেন, কদম মরতে জানে না ?

গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছে, আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে ? শহরে কত ডাইনি থাকে জানি না বুঝি ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৭৫

'আছে। দেশে।'

প্র সং পৃ ৯৩

আছে, দেশে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

দুর্গার মুখে এবার একটু হাসি ফোটে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে শ্রীপতির সব খবর জানিয়া নেয়—সে কত রোজগার করে এই খবরটা পর্যন্ত !

শ্রীপতি বুঝিতে পারে দুর্গা তাকে সরল হৃদয় বোকাসোকা গেঁয়ো লোক বলিয়া ধরিয়া নিয়াই এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—মনে মনে তার একটু রাগও হয়। কিন্তু দুর্গাও এমন সহজ সরল ভাবে প্রশ্ন করে যে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব না দিয়া সে পারে না।

সত্য কথাই যে সব বলে তা নয়। রোজগারের অঙ্কটা বাড়াইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়া বলে।

দুর্গা একটু হাসে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৭৮

মোহনেব এক নবপরিচিত বন্ধু বলে, 'কোয়াইট রাইট।'

জগদানন্দ বলে, 'সহরে যারা থাকে কুলি মজুর থেকে ভদ্রলোক পর্যন্ত, আজ যদি তাদেব সপরিবারে সহরে বাস করবার ক্ষমতা হয়, অর্ধেকের বেশী খারাপ স্ত্রীলোক কাল সহর ছেড়ে চলে যাবে।

সহরের নিন্দে করে সবাই, তলিয়ে কোন কথাই কেউ তো ভেবে দ্যাখে না।

প্র সং পৃ ৯৪

মোহনের নব পরিচিত প্রতিবেশী অসীম বলে, কোয়াইট রাইট।

জগদানন্দ বলে, শহরে যারা থাকে, কুলি-মজুর থেকে ভদ্রলোক পর্যন্ত, আজ যদি তাঁদের সপরিবারে শহরে বাস করবার ক্ষমতা হয়, অর্ধেকের বেশি খারাপ স্ত্রীলোক কাল শহর ছেড়ে চলে যাবে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

অসীম বলে, আপনার কথাটা একটু জড়িয়ে যাচ্ছে।

একটু থামিয়া সে জোর দিয়া, একটু ভুল বললেন। ও রকম হলে শহরের অর্ধেক খারাপ স্ত্রীলোক শহর ছেড়ে চলে যাবে—এ কথাটা ভুলও বটে বলা অন্যায়ও বটে। মানেটা দাঁড়ায় যে শহরের দুর্নীতির জন্য ওরাই যেন দায়ি ! ভাতকাপড়ের উপায় থাকলে ওরাও কি নিজেদের দুর্নীতির শিকার হতে দিত ? শহরের সব মানুষের সপরিবারে সচ্ছলভাবে শহরে বাস করার ক্ষমতা হওয়া মানেই তো এখনকার অবস্থাটা একেবারে বদলে যাওয়া। ও রকম অবস্থায় মেয়েদের দেহ বিক্রি করবার দরকার থাকবে না।

জগদানন্দ খুশি হইয়া সায় দেয়, বলে খারাপ স্ত্রীলোক আমি ঠিক ওই অর্থে বলিনি। বাধ্য হয়ে খারাপ পেশা নিতে হয়েছে, এই অর্থেই বলেছি। এ রকম পেশা নিয়ে শহরের পয়সায় ভাগ বসাবার দরকার হবে না—শহরের একদিন সে রকম অবস্থা আসবে বইকী। শহরের নিন্দে করে অনেকে, তলিয়ে কোনো কথাই কেউ তো ভেবে দ্যাখে না।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৭৮

কটা হাসপাতাল আছে সহরে, খুঁজে বার করবে। সহরতলীগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে আসবে।

প্র সং পৃ ৯৫

শহরে কটা হাসপাতাল আছে খুঁজে বার করবে। আর দেখবে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কী রকম।

শহরতলিগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে আসবে। এত লোকের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—ফুটপাতে শুয়ে কত লোক রাত কাটায় দেখে সেটা অনুমান করবে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৭৯

আগাগোড়া সমান করিয়া ছাঁটা ছোট ছোট চুল লইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এখন তার চুল বেশ বড়

আগাগোড়া সমান করিয়া ছাঁটা ছোটো ছোটো চুল নিয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এখন তার চুল বেশ বড়ো

হইয়াছে। স্মার্ট ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়া রোজ সে সযত্নে চিরুণী চালাইয়া টেরি কাটে। ফাজিল ছোকরার বাঁকা টেরি নয়, সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত ভারিক্কি টেরি। দাড়িও সে কামায়। প্রত্যেকদিন।

প্র সং পৃ ৯৭

হইয়াছে। স্মার্ট ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়া রোজ সে সযত্নে চিরুনি চালাইয়া টেরি কাটে। ফাজিল ছোকরার বাঁকা টেরি নয়, সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত ভারিক্কি টেরি।

দাড়িও সে কামায়, প্রত্যেকদিন।

নিজেই কামায়। এ জন্য সে ভালো একটি ক্ষুর কিনিয়াছে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

ব্রাহ্মণ বলিয়া তাকে শ্রীপতি আগেও সম্মান করিত কিন্তু সেটা ছিল শুধু তার ব্রাহ্মণত্বটুকুর সম্মান, মানুষটার নয়। আজকাল শ্রীপতি মানুষ হিসাবে তাকে সম্মান করিতে শুরু করিয়াছে।

আগে দরকার হইলেই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিত কিন্তু তার সামনে কখনও কখনও তার সঙ্গেও, হাসি তামাশা খোশগল্প করিতে শ্রীপতির বাধিত না। পীতাম্বরকে অবশ্য খোশগল্পে টানা যাইত না, সে ম্লান গম্ভীর মুখে চুপ করিয়াই থাকিত— শ্রীপতি সেটা তেমন গ্রাহ্য করিত না।

আজ শ্রীপতি ঠিক গুরুজনের মতোই তাকে মান্য করিয়া চলে, নম্রভাবে সবিনয়ে তার সঙ্গে কথা বলে।

মাঝে মাঝে সে বিস্ময়ভরা চোখে পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া থাকে। অবাক হইয়া ভাবে, কী মানুষটা এই সেদিন গাঁ হইতে শহরে আসিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে সে কী হইয়া গিয়াছে ! চোখের সামনে বদলাইয়া না গেলে হঠাৎ দেখিয়া হয়তো সে পীতাম্বরকে চিনিতেই পারিত না !

বাড়ির লোকেও অবাক হইয়া তাকে দ্যাখে, নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে।

লাবণ্য বলে, চালাক চতুর মানুষ তো, ফন্দিফিকির করে পয়সা উপায় করছে।

মোহন বলে, কিছু কিছু উপায় করছে সেটা বোঝাই যায়—কী ভাবে করছে তাই ভাবছিলাম।

পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াও এই জন্য মোহন সংকোচ বোধ করিতেছিল।

সদুপায়ে—পাঁচজনকে অনায়াসে জানানো যায় এমন উপায়ে—পীতাম্বর ইতিমধ্যেই কলিকাতা শহরে পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

জিজ্ঞাসা করিয়া পীতাম্বরকে শুধু বিব্রত করা হইবে—বানাইয়া বানাইয়া কতগুলি লাগসই মিথ্যা বলিতে বাধ্য করা হইবে।

একদিন মোহনের মনে হইল যে পীতাম্বর তার বাড়িতে থাকে, পীতাম্বরের পয়সা রোজগারের উপায়টা প্রকাশ পাইয়া গেলে তাকে বিব্রত হইতে হইবে না তো ?

পরদিন সকালে পীতাম্বরের বাবু সাজিয়া বাহির হওয়ার সময় সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, কাজকর্ম কিছু করছেন না কি ?

এই ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি এটা-ওটা।

মোহন আশ্চর্য হইয়া যায়। এটা-ওটা বিক্রি করিতে হইলে আগে তো এটা-ওটা কিনিতে হয়। সে টাকা পীতাম্বর পাইল কোথায় ? ওর কলিকাতায় আসিবার গাড়ি ভাড়াটা পর্যন্ত তাকে দিতে হইয়াছিল।

কী বিক্রি করেন ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮০-৮১

প্রথম প্রথম কিছু মিথ্যা বলিত, বাহাদুরি করিত, চাল দিত, কত যে চেষ্টা করিত মানুষের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জ্জনের জন্য। এখন সে সব একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, নিজের সম্বন্ধে নিজের যা ধারণা তাই প্রকাশ করে, অন্য কিছু বলিয়া প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করে না।

প্র সং পৃ ৯৯

প্রথম প্রথম সে কিছু মিথ্যা বলিত, বাহাদুরি করিত, চাল দিত, কত যে চেষ্টা করিত মানুষের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জনের জন্য। এখন ও সব সস্তা চালাকি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে যে এত পাকা ধাপ্পাবাজ শহরে আছে, এত রকমের ছলনা চাতুরী ধাপ্পাবাজির সঙ্গে শহরের লোকের পরিচয় যে তার গ্রাম্য বুদ্ধি দিয়া শহরের লোককে ভাঁওতা দিবার সাধ্য তার নাই।

তাই সে নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছে। সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, নিজের সম্বন্ধে

নিজের যা ধারণা তাই প্রকাশ করে, অন্য কিছু বলিয়া প্রমাণ করিবার কোনো চেষ্টা করে না যে সে একজন চালাক-চতুর কাজের লোক।

মা রচনাসমগ্র-৫' পৃ ৮২

সহজ বুদ্ধিতে আরও একটা কথা সে বুঝিতে পারে, কারো কাছে টাকা ধার চাওয়া চলিবে না. অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলিবে না।

প্র সং পৃ ৯৯

সহজ বুদ্ধিতে আরও একটা কথা সে বুঝিতে পারে কারও কাছে টাকা ধার চাওয়া চলিবে না, অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলিবে না।

সে দয়া চায় অনুগ্রহ চায়, নিজের দুঃখ ও জীবন-সংগ্রামের কাহিনি বলিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া কিছু আদায় করিতে চায়, এ ধারণা সৃষ্টি হইতে দিলে চলিবে না।

ওটা ভিক্ষা করারই রকমফের। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ. কথাটা পীতাম্বরের অজানা নয়।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮২

এক মাসের বেশি লাবণ্যকে সে চোখেও দ্যাখে নাই। না ডাকিলে আরও কয়েক মাসের মধ্যে হয়তো একটিবার তার মনেও পড়িত না লাবণ্য আছে।

'আপনি তো টোটকা জানেন অনেক রকম, আমায় দিন না একটা কিছু ?'

প্র সং পৃ ১০১

এক বাড়িতে থাকিয়াও এক মাসের উপর লাবণ্যকে সে চোখেও দ্যাখে নাই। লাবণ্য নিজেই তাকে ডাকিয়া না পাঠাইলে আরও কয়েক মাসের মধ্যে হয়তো একটিবার তার মনেও পড়িত না যে এ বাড়িতে লাবণ্য বলিয়া কেহ আছে

দ্র সংযোজন

সংযোজন

লাবণ্য তাকে খাতির করিয়া বসিতে বলে। তারই জন্য যে চেয়ারটা আগেই এ ঘরে আনিযা রাখা হইযাছিল, সেই চেয়ারে বসিতে বলে।

এবং পীতাম্বরও দ্বিধামাত্র না করিয়া ধীরে সুস্থে সেই চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ মা ?

শহরে এসে শরীরটা টিকছে না।

পীতাম্বর চুপ করিয়া থাকে।

তারপর লাবণ্য তাকে ডাকিয়া আনিয়া খাতির করিয়া ঘরে বসানোর আসল কথাটা বলে।

আপনি তো টোটকা জানেন অনেক রকম, অনেককে সারিয়ে দিয়েছেন। আমায় দিন না একটা কিছু ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৪

পীতাম্বর কিছুই অনুভব করে না, লাবণ্যের অস্তিত্ব তার কাছে হৃদয়ের স্বাদগন্ধহীন হইয়া থাকে। 'টোটকা চাইছ ? দেব বৌমা তোমায় দেব। তা অসুখটা কি তোমার ?'

লাবণ্য চোখ বড় করিয়া তাকায়।

পীতাম্বর কিছুই অনুভব করে না, লাবণ্যের অস্তিত্ব তার কাছে হৃদয়ের স্বাদগন্ধহীন হইয়া থাকে।

মোহনের রুগ্‌ণ বউটির জন্য সে কিছুমাত্র মমতা অনুভব করে না।

টোটকা ওষুধ চাইছ ? দেব বউমা, তোমায় ভালো ওষুধ দেব। তা, অসুখটা কী তোমার ?

লাবণ্য চোখ বড়ো করিয়া তাকায়।

তার অসুখের খবর রাখে না এমন মানুষও যে জগতে আছে একথা বিশ্বাস করিতেও কষ্ট হয়।

এমনি অসুখ।

প্র সং পৃ ১০২

তার অসুখের খবর রাখে না এমন মানুষও যে জগতে আছে এ কথা বিশ্বাস করিতেও তার কষ্ট হয়।

আর এ লোকটা এতদিন এক বাড়িতে আছে, বড়ো বড়ো ডাক্তার ডাকিয়া এত সমারোহ করিয়া তার চিকিৎসা হইল, আজ ও জিজ্ঞাসা করিতেছে তার কী অসুখ।

এমনি অসুখ।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৪

তার মনে একটা ভাসাভাসা সন্দেহ জাগিয়াছে, ওই লোকটার জন্যই তার অসুখ বুঝি সারিতেছে না, আরও বেশী ভুগিতেছে। মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক কিসব খাটাইতেছে লোকটা কে জানে।

প্র সং পৃ ১০৩

হঠাৎ তার মনে একটা ভাসাভাসা সন্দেহ জাগিয়াছে, ওই লোকটার জন্যই তার অসুখ বুঝি সারিতেছে না, আরও বেশি ভুগিতেছে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

পীতাম্বর যে মোহনদেব নির্বংশ হইবার শাপ দিত, গ্রামে থাকিতে এ কথাও লাবণ্যের কানে গিয়াছিল। মোহনের এক বুড়ি পিসি তাকে এমন কথাও বলিয়াছিল যে পীতাম্বরের শাপেই তার ছেলেপুলে হইতেছে না—তাকে সন্তুষ্ট করিয়া সে যাতে অভিশাপ ফিরাইয়া নিয়া তাকে আশীর্বাদ করে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

মনে তখন জোর ছিল—কলেজে পড়া ইংরেজি সাহিত্য পড়া মনে। গ্রাম্য কুসংস্কার তুচ্ছ করিবার জন্য মোহনের তাগিদও ছিল কড়া। বুড়ি পিসির কথাটাকে সে আমল দেয় নাই।

আজ মনে হয় অসম্ভব কী ? অসুখ তার মিথ্যা নয় কিন্তু পীতাম্বরের জন্যই হয়তো তার অসুখ হইয়াছে। অসুখের জন্য অসুখ নয়, তার যাতে ছেলেপিলে না হয়, মোহন যাতে নির্বংশ হয় সেই জন্যই অসুখ। মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক কীসব খাটাইতেছে লোকটা কে জানে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৫

স্তরটা ভিন্ন বলেই হয়তো ওদের হামবাগ মনে করি। ফুটপাতে ফোঁটা তিলক আঁটা জ্যোতিষী দেখলেই আপনার গা জ্বালা করে, আমার করে না।

প্র সং পৃ ১০৫

স্তরটা ভিন্ন বলেই ওদের হয়তো হামবাগ মনে করি। আপনার লজিকটা একপেশে, সবদিক বিবেচনা করছেন না। আপনি ভাবছেন অপদার্থ কিন্তু তুকতাক খাটাবার বিশেষ ক্ষমতার জন্য হয়তো ওই রকম হতে হয়। আপনার আমার মতো মানুষ হলে ওই বিশেষ প্রতিভা থাকে না। ফুটপাথে ফোঁটা-তিলক-কাটা জ্যোতিষী দেখলেই আপনার গা জ্বালা করে, আমার করে না।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৬

বিশ্বাসী ভণ্ডরা যদি নেগেটিভ অপদার্থ, নেগেটিভ হামবাগ হয়, আমরা পজিটিভ অপদার্থ, পজিটিভ হামবাগ।

প্র সং পৃ ১০৫

বিশ্বাসী ভণ্ডরা যদি নেগেটিভ অপদার্থ নেগেটিভ হামবাগ হয়, আমরা পজিটিভ অপদার্থ পজিটিভ হামবাগ।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

মোহন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করে, আপনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন ?

জগদানন্দ মৃদু হাসিয়া বলে, না। আমিও তাই ভাবছিলাম—আমার কথা শুনে আপনি হয়তো মনে করেছেন আমি অলৌকিকে বিশ্বাসী। আমি এতক্ষণ বললাম আমাদের একপেশে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের এখনকার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে যা অসম্ভব মনে হয়, তাই আমরা অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিই। একটা ব্যাপার কেন ঘটে কীভাবে জানি না বলেই কি সেটা অলৌকিক হয়ে যাবে, ভূতুড়ে ব্যাপার বলে বাতিল হয়ে যাবে ? একদিন হয়তো জানা যাবে ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত কিছু নয় বাস্তব নিয়মেই ঘটে থাকে।

কিন্তু বিজ্ঞানকে ডিঙ্গিয়ে কোন মাপকাটিতে তবে বিচার করব ? বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে কোন যুক্তিতে সেটা সম্ভব ভাবব ?

আপনি আমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছেন না। আমি বিজ্ঞানকে ডিঙিয়ে যেতে বলিনি। বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে সেটা অসম্ভব বলে মানতে হবে বইকী ! কিন্তু বিজ্ঞান আন্দাজে কোনো কিছুকে অসম্ভব বলে না, কেন অসম্ভব তার অকাট্য বাস্তব ব্যাখ্যাও দেয়। কিন্তু আজও বিজ্ঞানের অনেক কিছু অজানা আছে—আজও নানা আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে। আজও বিজ্ঞান যা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না সেটাকেই আমরা অলৌকিক অবাস্তব ভাবব কেন ? জগতে সবই যখন বাস্তব, চিন্তায় অবাস্তবের অলৌকিকের ফাঁকি থাকবে কেন ? ম্যাজিক দেখে তো আমরা ভাবি না অলৌকিক কিছু ঘটছে। বাস্তব জগতে দুর্বোধ্য কিছু ঘটলে হয় ভাবব অলৌকিক, নয় একেবারে উড়িয়ে দেব।

মোহন বিব্রত বোধ করে। জগদানন্দ ঠিক গুরুর মতোই কথা বলিতেছে।

জগদানন্দ তার মুখের ভাব দেখিয়া নিজের মুখে হাসি ফুটাইয়া বলে, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের কথা বাদ দিন। ভালোবাসার কথাই ধরুন। বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না ভালোবাসাটা ঠিক কী ব্যাপার। বিজ্ঞান বলছে প্রেম কবির ফাঁকা কল্পনা নয়, মানুষের প্রেম বাস্তব ব্যাপার। পশুপাখির যৌন ব্যাপারের মতোই মানুষেরও যৌন ব্যাপার—নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করা আর বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাওয়া। মানুষের যৌন ব্যাপারে আরেকটা বাড়তি বাস্তব ব্যাপার আছে—প্রেম। কাব্যে সাহিত্যে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রং দিয়ে এই বাস্তব রহস্যটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়ে আসছে। ফেনা আর রংটা ব্যাখ্যা করে বাতিল করে যৌন বিজ্ঞান প্রেমের মানে বোঝাতে চেয়ে পারেনি। শরীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যৌন বিজ্ঞান, প্রেমের এদিক ওদিক সেদিকটা বুঝিয়েছে, প্রেমকে বোঝাতে পারেনি।

বিজ্ঞান প্রেমকে বাস্তব ব্যাপার বলে নাকি ?

বলে বইকী। কাব্য সাহিত্যে প্রেমের ভাববাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়। বিজ্ঞান বলে, দেহ আর মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হল প্রেম। ওটা কেন আর কীভাবে ঘটে বিজ্ঞান সঠিক বলতে পারে না। আজ পারে না, একদিন নিশ্চয় পারবে।

রাত্রে ইজিচেয়ারে চিত হইয়া মোহন একটি বিলাতি ম্যাগাজিনে গল্প পড়িতেছে, গল্পটির শেষে পাওয়া গেল একজন বিখ্যাত যাদুকরের সচিত্র প্রবন্ধ।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৭

'থাক গে কাজ নেই। আচ্ছা, মা যে বলে ছেলেপিলে হলে আমি সেরে যাব, সত্যি ?'

প্র সং পৃ ১০৭

থাক গে কাজ নেই।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

এত লোক তোমার ঘাড়ে খাচ্ছে, ওকে তাড়িয়ে আর কী হবে।

অবাক হওয়ার উপায় নাই। একরাশি দিনরাত্রি লাবণ্যের সঙ্গে কাটিযাছে। জানিতে কি আর বাকি আছে যে এমনিভাবে বদলানোই তার প্রকৃতি !

মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক খাটাইয়া পীতাম্বর তাদের সর্বনাশ করিতেছে ভাবিয়া লাবণ্য যখন গেঁয়ো মেয়ের মতো লোকটাকে তাড়াইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল তখন হয়তো তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে এই লাবণ্যই আবার আধা শহুরে কলেজে পড়া মেয়ের মতো গ্রাম্যভাবের ঝোঁকটা কাটাইয়া উঠিয়া ওই পীতাম্বরের টোটকা ওষুধের লোভ এবং তার মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের ভয় তুচ্ছ করিয়া উদারভাবে লোকটাকে ক্ষমা করিবে।

চিরদিন এমনি করিয়া আসিয়াছে।

শুধু এই ব্যাপারে নয়, অনেক ব্যাপারে। পীতাম্বরকে তাড়ানোর প্রশ্ন যেন চুকিয়া গিয়াছে এমনিভাবে লাবণ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে, আচ্ছা মা যে বলে ছেলেপিলে হলে আমি সেরে যাব, তা কি সত্যি ?

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৮-৮৯

তাও পীতাম্বরের মত লোক, এই হাস্যকর ধারণায় মোহন কখনো ভয় পাইতে পারে ? তবু, কাজ নাই তার লোকটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়া।

পরদিন সকালেই তাই সে পীতাম্বরকে বলিল, 'একটা ভারি মুস্কিল হল যে পীতু কাকা !'

প্র সং পৃ ১০৭

তাও পীতাম্বরের মতো লোক, এই হাস্যকর ধারণায় মোহন কখনও ভয় পাইতে পারে ?

তবু কাজ নাই তার লোকটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়া।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

এ জগতে কীসে কী হয় কে তা বলিতে পারে ?

ভোরবেলাই মা কিন্তু তাকে আবার ধাঁধায় ফেলিয়া দিলেন।

পীতাম্বরকে তাড়াইবার সংকল্পে ঢিল পড়িয়া গেল, পীতাম্বর রীতিমতো একটা সমস্যা হইয়া উঠিল তার চেতনায়।

মোহন ভোরের চা খাইতেছিল—আবছা ভোরে শুধু এককাপ চা। ছেলেবেলা হইতে বাবা চিরদিন ডাকিয়া তুলিতেন রাত্রির আঁধার ম্লান হইতে শুরু করা মাত্র। গ্রামের সংসারের একাংশ শহরে আনিয়া বাসা বাঁধিয়া শহরের জীবনের সঙ্গে এত অল্পদিনে মানাইয়া ফেলিয়াও সে বিছানায় শুইয়া সূর্যোদয় ঘটিতে দিতে পারে না।

দামি খাটের আধুনিক শয্যা যেন কামড়ায়।

মা ইতিমধ্যেই স্নান সারিয়াছেন।

মা বলিলেন, লাবু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়াতে চাইছে। তুই কী ঠিক করেছিস জানিনে। কিন্তু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়ানো কি উচিত হবে ?

উচিত হবে না কেন ? চিরকাল ওকে পুষব বলে তো আনিনি ? পয়সা রোজগার করছে, এবার নিজের পথ দেখুক।

আপশোশের আওয়াজ করিয়া মা বলেন, তুইও বউমার মতো এলোমেলো চিন্তা করিস। তুই না তুকতাকে বিশ্বাস করিস না ? লাবু বলল তুকতাক করে আমাদের সর্বনাশ করছে—তুইও অমনি ওকে তাড়াতে রাজি হয়ে গেলি ? বউমা যে উলটো বুঝেছে, ছেলেমানুষি করছে এটা বুঝলিনে তুই ? ওনাকে অপমান করলে তাড়িয়ে দিলেই যে সর্বনাশ হবে আমাদের। ও ভাবে ক্ষতি করতে চাইলে শত্রুভাবে করতে হবে তো ? তোর বাড়িতে থেকে তোর অন্ন খেয়ে তোর সর্বনাশের জন্য তুকতাক চালাতে গেলে পীতু ঠাকুর নিজেই মারা পড়বে না ?

লাবণ্য তবে নিজের উদারতায় পীতাম্বরকে ক্ষমা করে নাই, মার যুক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়াছে !

পরদিন সকালেই তাই সে পীতাম্বরকে বলিল, একটা ভারী মুশকিল হল যে পীতুকাকু...

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৮৯

মানুষটা কিন্তু বদলাইয়া গিয়াছে। আগের মত আর সে বিচলিত হয় না, তুচ্ছ কারণেও নয়, বড় কারণেও নয়। পীতাম্বরের মত তাকেও মোহন তাড়াইয়া দিতে পারে, এ চিন্তায় আর আতঙ্ক জাগে না, কদমকে কাছে আনিয়া রাখিতে দু মাস এক বছর বিলম্বের সম্ভাবনা কাতর করে না, আজকালের মধ্যে বড়লোক হওয়া যাইবে না বলিয়া দিশাহারা হতাশ কল্পনা অসম্ভব ফন্দিফিকিরের জাল বোনে না। কিসে কি হয় কে বলিতে পারে ? দেখা যাক কি হয়। শ্রীপতি আজকাল এমনিভাবে ভাবে।

প্র সং পৃ ১১৪

মানুষটাই সে বদলাইয়া গিয়াছে।

আগের মতো আর সে বিচলিত হয় না। তুচ্ছ কারণেও নয়, বড়ো কারণেও নয়। পীতাম্বরের মতো তাকেও মোহন তাড়াইয়া দিতে পারে, এ চিন্তায় আর আতঙ্ক জাগে না। কদমকে কাছে আনিয়া রাখিতে ছ মাস এক বছর বিলম্বের সম্ভাবনা আর তেমনভাবে কাতর করে না। আজকালের মধ্যে বড়োলোক হওয়া যাইবে না বলিয়া দিশেহারা হতাশ কল্পনা নিয়া সে টাকা করার উদ্ভট অসম্ভব ফন্দিফিকিরের জাল বোনে না। কীসে কী হয় কে বলিতে পারে ? দেখা যাক কী হয় !

পুরুষ মানুষ কারখানায় খাটিয়া খায়, কী আছে তার যে হারাইবার ভয়ে কাবু হইয়া থাকিবে ?

শ্রীপতি আজকাল এমনিভাবে ভাবে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

একটা ধীর শান্ত বেপরোয়া ভাব জাগিতেছে। ধরিতে গেলে সে তো সর্বত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী !

তার কীসের ভয়, কীসের ভাবনা ? কদম ছিল অভ্যাস। নিছক অভ্যাস, পুরুষানুক্রমিক একটা নেশা।

কদমের জন্যই দুর্গার মোহ সে জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়াছিল—কদমকে বাদ দিয়া দিন কাটাইতে কাটাইতে তার জন্য ছটফটানিও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

দুর্গার মতো কদমও মনের মধ্যে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া একটু মন কেমন করে, আর কিছু নয়।

নেশা কাটিয়া আসিয়াছে। আর সে পাগল হইবে না কদমের জন্য। দেশের ওই কদমের অভ্যাস কদমের নেশায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় পাগল হইয়া আর তাকে ছুটিতে হইবে না কদমের প্রতিনিধি অন্য কোনো চাঁপা বা দুর্গার কাছে।

দেহ মনে একটা অদ্ভুত শান্ত দৃঢ়তা ও তেজ অনুভব করে শ্রীপতি।

পুরানো নেশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছে, পচা বাঁধন খসিয়া পড়িতেছে—সে মুক্তি পাইতেছে প্রতিদিন।

নূতন জীবনের স্বাদ গন্ধও মিলিতেছে।

জ্যোতির সঙ্গে আর তেমন তার বনিবনা নাই। নতুন সাঙাত জুটিয়াছে।

কারখানায় তার সহকর্মী ভূপাল। জ্যোতির সঙ্গে কীভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল সাঙাতি আর ভূপালের সঙ্গে কীভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে আঁতাতি !

কাজে ভর্তি হইয়া শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কাজ শিখিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত, এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিত না সে গেঁয়ো কামার।

সহকর্মীদের চালচলন কথাবার্তা প্রায় কিছুই বুঝিত না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার কোনো চেষ্টাই করিত না। কোনো রকমে শুধু মানাইয়া চলিত।

এদের সঙ্গে উদয়াস্ত খাটিবে, কাজের জন্য দরকারি সম্পর্ক রাখিবে কিন্তু এই শহুরে পাকা ঝানু মজুরের সঙ্গে তার কি সমঝাওতা করা চলে।

শহুরে সাঙাত জ্যোতি। মোহনের বাড়ির চাকর হইয়াও ফরসা হাফ শার্ট আর ধুতি পরে, পায়ে স্যান্ডেল দেয়, পাঁচীর ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া মদ খাওয়ায় গান শোনায়—শ্রীপতি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কোন ভাগ্যে তার এমন শহুরে বন্ধু জুটিয়াছে শহরে আসিয়াই !

প্রথম প্রথম জ্যোতির মুখে বড়ো বড়ো লোকের বাড়ি চাকরি করা আর একধার হইতে বাড়ির মেয়ে বউদের সঙ্গে পীরিত করার অশ্লীল গল্প শুনিতে শুনিতে শ্রীপতির মনে হইত, কলির কোনো দেবতা কি পৃথিবীতে জন্ম নিয়া শৌখিন বাড়ির শৌখিন চাকরের বেশে লীলাখেলা করিতেছেন !

শুধু পাঁচীর ঘরে গিয়া মাতলামির লীলাখেলা করার ঝোঁকটার জন্য সে তাকে চাকররূপী দেবতা বলিয়া মানিতে পারে নাই।

এখন সে টের পাইয়া গিয়াছে যে জ্যোতির দৌড় বস্তির ওই সস্তা পাঁচী পর্যন্তই। বয়স কম, চেহারায় জলুস আছে, চাকরের কাজে ঢুকিয়া দু একটা বাড়িতে দু একটা কেলেঙ্কারি হয়তো করিয়া থাকিতে পারে--একধার হইতে ভদ্রঘরের বালিকা তরুণী বয়স্কা নারীর হৃদয়রাজ্য জয় করিবার উদ্ভট উৎকট কাহিনিগুলি সবই তার বানানো।

নিজের মনের বিকারকে খাতির করিবার জন্য বানানো। তার মতো গেঁয়ো সরল মানুষকে শ্রোতা হিসাবে না পাইলে তাই তার মিথ্যা গল্প বলার রস জমে না।

হাতে পয়সা থাকিলে সে পাঁচীদের ঘরে গিয়া মাতলামি আর হল্লার লীলাখেলা করে, পয়সা না থাকিলে মন-মরা হইয়া তাকে উৎকট বীভৎস রসে রসাইয়া রসাইয়া গল্প বলিয়া নিজের বিকারকে সামলানোর চেষ্টা করে।

শুনিতে শুনিতে বিচলিত অভিভূত হইয়া যাইত ভাবিলে এখন শ্রীপতির নিজের গ্রাম্যতার অজ্ঞতায় লজ্জা বোধ হয়, হাসি পায়।

একটা গেঁয়ো বউ কদমের তাল সামলাইতে তার প্রাণান্ত হয়, দুর্গাকে পর্যন্ত ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়—মোহনের পেয়ারের চাকর বলিয়া এবং চেহারায় একটু জলুস আছে বলিয়া জ্যোতির বেলা যেন প্রেম করিতে গেলে দায় ঘাড়ে করার নিয়মটা বাতিল হইয়া যাইবে।

কদম পর্যন্ত তাকে এতটুকু রেহাই দেয় না, শহরের চালাক চতুর মেয়েরা যেন কদমের চেয়ে বোকা !

গ্রামে থাকিতে শ্রীপতি বিশ্বাস করিত, দাম দিয়া পীরিত হয় না। এখন সে জানিয়া গিয়াছে পীরিত করার দামও পুরুষকে দিতে হয় !

জানিয়া কত দিক দিয়া যে সে স্বস্তি বোধ করিয়াছে।

ভূপালও তাকে নানারকম গল্প শোনায়—শ্রমিকের লড়াই হইতে শহরের জীবন ও ঘটনা হইতে কেচ্ছা পর্যন্ত অনেক বিচিত্র কাহিনি। তার কেচ্ছা জ্যোতির নিজের বাহাদুরির বানানো কাহিনির চেয়ে কম অশ্লীল হয় না—কারণ, শুনিলেই বুঝা যায় অন্যের ব্যাপার হইলেও ভূপাল বানাইয়া বলিতেছে না, হয়তো খানিকটা রং চড়াইয়াছে।

যখন বলে একেবারে চুটাইয়া বলে, তবে জ্যোতির মতো তার এই একটিমাত্র রসই সম্বল নয়।

প্যাঁচ কষে না, কায়দা করে না, সোজা স্পষ্ট কাটাকাটা কথা বলে, তবু জীবনের কত রকমারি দিক, আশ্চর্য দিক রূপ নেয় ভূপালের কথায়। মনে হয় প্রতিদিন তার যে নতুন অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে একেবারে অজানা বিষয়ে ভূপালের বর্ণনার সঙ্গেও যেন তার কেমন একটা মিল আছে।

মজুরের লড়াইয়ের কথা শুনিতে শ্রীপতির খুব আগ্রহ জাগে। কীসের লড়াই আর কেন লড়াই তার আসল কথাটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া গিয়াছে। এ সব তারও লড়াই, তার স্বার্থের সঙ্গেও এ সব জড়িত।

মজুরি বাড়ানোর লড়াইটাই ধর। মজুরি বাড়িলে সে কদমদের আনিতে পারে। কাজ শিখিলে তার মজুরি বাড়িয়া কাজ পাকা হওয়ার কথা।

নিজের ছোটো গেঁয়ো কামারশালায় হাতুড়ি পিটিয়া তার জীবন কাটিয়াছে, কী এমন কঠিন কাজটা তাকে এখানে করিতে দেওয়া হইয়াছে যে এতদিনেও ভালো করিয়া কাজ শিখিতে বাকি থাকিবে ?

কিন্তু কেউ এ কথা কানেও তোলে না যে সে ভালো কাজ শিখিয়াছে, এবার তার পাকা কাজের মজুরি পাওয়া উচিত !

ভূপাল এক গাল হাসিয়া বলে, যা যা বড়াই করিস নে ! এর মধ্যে কাজ শিখে গেছেন, পাকা কাজ চাই, বেশি হপ্তা চাই। তোর শালা ঢের দিন বাকি কাজ শিখতে।

কাজ শিখিনি ? ঠিকমতো কাজ করছি না ?

শিখেছিস তো শিখেছিস ! ঠিকমতো কাজ করছিস তো করছিস ! তাতে কী হয়েছে রে ব্যাটা ? সময় হবে, মর্জি হবে, তবে কাজ পাকবে।

সুর পালটাইয়া মুখ বাঁকাইয়া একজন মধ্যস্থ কর্তা ব্যক্তির হাবভাব নকল করিয়া ভূপাল বলে, তেড়ি-বেড়ি করিস নে বাবা, তেড়ি-বেড়ি করিস নে—দোহাই তোর। তবু তো খেটে খাচ্ছিস ? খেদিয়ে দিতে জবরদস্তি করিসনে বাবা, করিসনে—দোহাই তোর, আখেরে ভালো চাস তো চুপচাপ খেটে যা। গা থেকে পাঁকের গন্ধ যায়নি, কাজ শিখে গেছিস !

শ্রীপতি হাসিয়া ফেলে।

কাজ পাকা করার কথা বলিতে গেলে ঠিক এইভাবে এইরকম ভঙ্গি করিয়া এই কথাগুলিই শঙ্করবাবু তাকে বলিয়াছিল বটে।

তেমন বনিবনা না থাকিলেও জ্যোতির সঙ্গে বিবাদ বা বিচ্ছেদ হয় নাই। জ্যোতির অশ্লীল গল্প আজও কিছু কিছু শুনিতে হয়। তবে শুনিতে শুনিতে সে অভিভূত হইয়া পড়ে না বলিয়া, মাঝে মাঝে খাপছাড়া প্রশ্ন করে এবং খাপছাড়া ভাবে হাসিয়া ওঠে বলিয়া, তাকে গল্প শুনাইবার উৎসাহ জ্যোতির ঝিমাইয়া আসিয়াছে।

আগে জ্যোতি ছিল বক্তা, শ্রীপতি ছিল নীরব শ্রোতা। আজকাল শ্রীপতি কখনও কখনও তার অভাব অভিযোগ রাগ দুঃখ আপশোশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে—একটি কলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে জ্যোতির পিরীত জমিয়া নোংরামির ক্লাইমেক্সে উঠিবার মুখে শ্রীপতির আপশোশ ফাটিয়া পড়িলে—কয়েক মিনিট তাকে চুপচাপ শ্রীপতির কথা শুনিয়া যাইতে হয় !

খানিকটা অভিভূত ও বিচলিত হইয়াই শোনে।

মনটা যে তার ধাক্কা খাইয়াছে, নড়িয়া উঠিয়াছে, খানিকক্ষণ শ্রীপতির কথা শুনিবার পর তার অস্থিরতা শুরু হইলেই সেটা বোঝা যায়।

কত যে আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, তুই বড়ো বোকা ভাই। তোর কোনোদিন কিছু হবে না। সংসারের চালচলন কিছুই বুঝিস নে তুই।

কি বুঝিনে ?

কিছুই বুঝিস নে। কাজ কি তুই বাগিয়েছিস ? নিজের চেষ্টায় ? কাজ যারা বাগিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যা না বোকারাম হাঁদারাম ! কাজ যারা জুটিয়ে দিল, কাজটা তারা পাকা করে দিতে পারবে না ?

কথাটা যে শ্রীপতি ভাবে নাই তা নয়। কিন্তু মোহনকে কাজের বিষয় কিছু বলিতে সে বড়োই সংকোচ বোধ করে। তার লজ্জা হয়।

মোহন জগদানন্দকে বলিয়া তাকে যে কারখানায় ভর্তি হইবার সুযোগ দিয়াছে, কাজ করিয়া কাজ শিখিবার সামান্য মজুরি পাইয়াও সে যে মোহনের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কদমকে নিয়মিত দু চার টাকা পাঠাইতে পারিতেছে— এই তো যথেষ্ট করিয়াছে মোহন।

সাহায্য করিয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য শ্রীপতি ভুলিতে পারে না যে মোহন তাকে অনুগ্রহ করে নাই, কাজটা তাকে ভিক্ষা হিসাবে জুটাইয়া দেয় নাই।

যতই দুঃস্থ হোক, নিচু জাতের লোক হোক, মোহনের সে গ্রামবাসী। উঁচুজাতের ওই পীতাম্বরের মতোই সেও তার প্রজা নয়, তার এক কাঠা জমির ধারও সে কোনোদিন ধারে নাই।

শ্রীপতির স্পষ্ট মনে আছে তার প্রায় সমবয়সি পনেরো ষোলো বছরের মোহন একদিন লুকাইয়া তাদের বাড়ি আসিয়াছিল, বহুকালের পুরানো একটা তলোয়ারে ধার করিয়া দিবার জন্য তার বাবাকে অনুরোধ জানাইয়াছিল।

যেটুকু ধার ছিল তলোয়ারটায় সেটা আরও খানিকটা ভোঁতা করিয়া দিয়া তলোয়ারটা শুধু ঝকঝকে করিয়া দিয়াছিল তার বুড়ো বাবা।

মোহন খুশি হইয়া পুরো একটা টাকা মজুরি দিতে চাহিলে তার বুড়ো বাবা ফোকলা মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল, তোমার খেলনা বানিয়ে দিয়ে পয়সা নেব কি গো ! মোটেই পাবি না কো নিতে !

গ্রামবাসী শত শত প্রজা আছে, খাতক আছে মোহনের। তারা একজন কেউ আবদার করিলে মোহন কি তাকে সাথে নিয়া কলিকাতা আসিতে রাজি হইত !

তারা দু জন গরিব কিন্তু প্রজা নয়, গ্রামবাসী।

মোহন যথেষ্ট করিয়াছে, গরিব গ্রামবাসী হিসাবে আবার তাকে মজুরি বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইবে, ভিক্ষা চাওয়া হইবে।

মোহন যদি বিরক্ত হয়, যদি বলে যে একটু প্রশ্রয় দিলেই শ্রীপতিরা মাথায় উঠিতে চায়, বড়োই সেটা অপমানের কথা হইবে শ্রীপতির।

আগে ছিল না, মান অপমানের এই জ্ঞান শ্রীপতি শহরে আসিয়া অর্জন করিয়াছে। কারখানায় অর্জন করিয়াছে।

কয়েক মাস আগে হইলে অনায়াসে সময়মতো সুযোগমতো ভিখারির মতোই মোহনকে সে তার প্রার্থনা জানাইতে পারিত।

কিন্তু ভালোভাবে কাজ শেখা হইয়াছে, পাকা কাজ ও বেশি মজুরির দাবি জন্মিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসটা তখনও জন্মে নাই। সুতরাং দাবিটা আদায় করিয়া দিবার জন্য মোহনের কাছে আবেদন জানাইবার প্রশ্নও ওঠে নাই।

ন্যায্য দাবির বোধটা জন্মিতে জন্মিতে জন্মিয়া গিয়াছে মান-অপমানের নূতন বোধটাও।

মোহনের বাড়িতে চাকরদের ঘরে হইলেও বিনা ভাড়ায় পাকা ঘরে থাকিবার এবং আশ্রিত ও চাকর-বাকরের জন্য ভিন্ন রান্না করা অন্ন হইলেও দুবেলা পেট ভরাইবার অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে শ্রীপতির নবজাগ্রত আত্মসম্মান বোধে বাধে না কেন?

আশ্রয় আর অন্ন দেওয়ার বদলে মোহন এবং মোহনের সংসার তাকে চাকরের মতোই খাটাইয়া নেয় বলিয়াই বাধে না!

জ্যোতি শৌখিন চাকর—মোহনের শৌখিন জীবন যাপনের প্রয়োজনেই শুধু তাকে রাখা।

বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নামে একটা ঠিকা ঝি রাখিলেও তার সাধ্য কি এতবড়ো সংসারের বৃহত্তম অংশটার কাজ চালায়?

আশ্রিতা কিন্তু নিকট আত্মীয়াদের মধ্যে তিন জনকে মোহন দেশের বাড়িতে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—মার জন্য সঙ্গে আনিতে হইয়াছে। বলিতে গেলে তাদের মধ্যে অনাদৃতা দু জন ঠিকা ঝিয়ের সঙ্গে সংসারের ওইসব কাজ সারে।

অন্যজন মার পেয়ারের লোক। তার কাজ শুধু মার মন জোগাইয়া চলা।

কতগুলি কাজ আছে যে কাজ করিবার লোক নাই। শ্রীপতি করিয়া না দিলে মোহনকে আরেকজন সাধারণ চাকর রাখিতে হইত।

জ্যোতি বাজারে যায়, মুদি মনোহারি দোকানেও যায়। কিন্তু সে বাজার করে সওদা আনে শুধু মোহনদের এবং তার বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগতদের জন্য—যাদের জন্য রান্নাবান্না হয় ভিন্ন, টেবিলে যারা ডিসে প্লেটে খায়।

মার নেতৃত্বে সংসারের অন্য অংশের—আমিষ নিরামিষ রান্নার বাজার এবং অন্যান্য কেনাকাটা শ্রীপতি করিয়া দেয়।

সে-ই প্রতিদিন গাড়িটা ধোয়া মোছা সাফসুফ করে বলিয়াই মোহনকে একজন ক্লিনার রাখিতে হয় নাই।

অনেক বাড়ির অনেক গাড়ির ড্রাইভার নিজেই এ সব কাজ করে—কিন্তু মোহনকে বেশি বেতনের বাবু ড্রাইভার রাখিতে হইয়াছে। এ গাড়িতে অন্য ড্রাইভার মানায় না।

বাবু ড্রাইভার ইঞ্জিনটা সাফ করে। ধুলা কাদা সাফ করা তার কাজ নয়।

মার এবং তার পেয়ারের আশ্রিতা বিধবাটির অনেক ফাইফরমাশও শ্রীপতির উপর দিয়া চলে।

কাল একাদশী গিয়াছে।

আজ সকালে মার ফরমাশে সে গোপনে পাঁচ রকম শহুরে মিষ্টি শহরের নাম করা দোকান হইতে আনিয়া দিয়াছে।

কাকপক্ষী যেন টের না পায় ছিপতি।

কাকপক্ষী টের পায় নাই।

কে জানে মোহন জানে কিনা যে সেও তার একজন বিনা মাইনের চাকরের শামিল হইয়াই চাকরের জন্য বরাদ্দ আশ্রয় ও অন্ন ভোগ করিতেছে।

জানা অবশ্য উচিত। অন্য কাজ করে কি করে না সেটা অজানা থাক—প্রায় প্রতিদিন ভোরে সে তো তাকে গাড়িটা সাফ করিতে দেখিয়া আসিতেছে। তার বাবু ড্রাইভার নাক ডাকিয়া ঘুমায়। চিরদিনের অভ্যাসের বশে ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া মোহন নতুন গাড়ির টানে গ্যারেজের দিকে আসে—দেখিতে পায় তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দামি গাড়িটা শ্রীপতি কত যত্নে সাফ করিতেছে।

শুধু দ্যাখে না।

গাড়িটার ঝকঝকে তকতকে নতুনত্ব বজায় রাখিবার জন্য মাসে মাসে তাকে এখানটা ভালো করিয়া ঝাড়িতে ওখানটা ভালো করিয়া মুছিতে বলে।

অর্থাৎ হুকুম দেয়।

বলে, মার্ডগার্ডের ওখানে একটু ময়লা জমেছে শ্রীপতি।

ময়লা নয়। চলটা উঠে মর্চে ধরেছে।

কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য জায়গাটা সে বারবার ঘষিয়া পুঁছিয়া দেখায়।

হাজার ঘষিয়াও চাঁদের কলঙ্কের মতো মার্ড গার্ডের কলঙ্ক ওঠে না।

মোহন আপশোশ করিয়া বলে এর মধ্যে চলটা উঠে গেল ? কি করে গেল ?

অন্য কোনো কথাই মোহন তার সঙ্গে বলে না। শ্রীপতি গামছা পরিয়া তার গাড়িটা সাফ করিতেছে দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, তোমার কাপড় নেই শ্রীপতি ? পায়জামা প্যান্ট নেই ?

পীতাম্বরকে তাড়াইবার আগের দিনের ভোরে শুধু একটি নিয়ম ছাড়া প্রশ্ন সে তাকে করিয়াছিল—পীতাম্বর ঠাকুর সাধক পুরুষ না রে শ্রীপতি ? তুই তো ওকে জানিস অনেক কাল। উনি যোগ সাধনা ক্রিয়াকর্ম খাটাতে পারেন ?

প্রশ্ন শুনিয়া বড়োই ক্ষোভ জাগিয়াছিল শ্রীপতির। তার মতো লোককে মোহনের এ রকম প্রশ্ন করা কি উচিত ?

চার হাত লনের ফুল পাতাবাহারের এদিকে ঠেকিয়া দেওয়া চাকর-বাকরের গ্যারেজ সন্নিহিত টালির ঘরে একসাথে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই তো সে ঘনিষ্ঠভাবে পীতাম্বরের বাঁচার কায়দা জানিয়াছে ?

তাকে কি উচিত জিজ্ঞাসা করা পীতাম্বরের বিষয়ে কোনো কথা ?

কোনো জবাব না দিয়াই সে বালতি নিয়া জল আনিতে গিয়াছিল।

কে জানে কোথায় গিয়াছিল মোহন অথবা নগেন, গাড়িটাতে কাদা মাখাইয়া আনিয়াছে। কাদা সাফ করিতে তাকে কমপক্ষে সাত আট বালতি জল টানিতে হইবে।

জবাব না পাওয়ায় মোহনের হইয়াছিল রাগ। ধমক দিয়া সে বলিয়াছিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম, জবাব দিলি না যে ?

কী জবাব দেব বলুন ? পীতম ঠাকুরকে আপনে এনেছেন বামুন সাধক বলে। আমি কলে কুলি খাটি, আপনার ঘরে চাকর খাটি—

চাকর খাটো মানে ?

বাজার করি, মশলা বাটি, আপনার গাড়ি সাফ করি—

কী চালাক হইয়া উঠিয়াছে শ্রীপতি ! এমনি লাগসই ভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল মোহনের।

কে তোমায় বাজার করতে, মশলা বাটতে বলে ?

আপনার মা বলেন।

মার কাছে মাইনে চাও না কেন ? মা তোমাকে চাকর খাটায়, মার কাছে মাইনে আদায় না করে আমার কাছে নালিশ কর কেন ?

মাথা গুঁজে আছি, দুবেলা খাচ্ছি—

সে তো আমার ব্যবস্থা শ্রীপতি। মার চাকর খাটতে আমি তো বলিনি তোমায় !

শ্রীপতি দমিয়া যায়। মোহন তাকেও কাজে লাগাইতে চায় তার ঘরোয়া যুদ্ধে। মার কোনো ভাগ নাই, নগেন কিন্তু বাপের টাকা আর সম্পত্তির সমান অংশীদার।

নগেনকে বাগাইয়া মা যুদ্ধ শুরু করিয়াছেন মোহনের বিরুদ্ধে। মোহন চায় যে শুধু তার গাড়িটাই সাফ করিবে—মার কোনো হুকুম মানিবে না।

অথচ তার দুবেলা পেট ভরার ব্যবস্থা যে মার হাতে এটা মোহন জানিয়া শুনিয়া মানিয়া নিয়াছে।

মার হুকুম না শুনিলে তাকে যে না খাইয়া খালি পেটে কারখানায় খাটিতে যাইতে হইবে এই সোজা কথাটাও কি খেয়াল নাই মোহনের ?

আট

সন্ধ্যা সেদিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া আসে এবং বিস্মিত মোহনকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দিয়াই একেবারে ব্যাখ্যাটা শুনাইয়া দিয়া মোহনকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

তোমার বন্ধুর বাড়িতেই স্বামী সোহাগিনি হয়ে রাত কাটিয়েছি মোহন। অমন করে তাকিয়ো না মোহন। আমি যেচে আসিনি, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে।

ঝরণার সেই হুমকি মোহনের মনে ছিল। যে ভাবে পারে সন্ধ্যাকে সে জব্দ করিবে বলিয়াছিল, দরকার হইলে বন্ধুকে দিয়া দাদাকে নষ্ট করাইয়া সন্ধ্যাকে জব্দ করিবে।

ঝরণা ?

দূর ! আমায় আসতে বাধা করবে ঝরণা ? অত মুরোদ থাকলে বোকাসোকা ছেলেমানুষদের বাগাতে যেত না।

ঝরণা আর নগেনের নিদারুণ সমস্যাটা সে যেন খেলার ছলেই উল্লেখ করে, তার কাছে যেন একেবারে তুচ্ছ কথা বয়সে ছ সাত বছর বড়ো ঝরণার নগেনকে বাগানোর প্রচেষ্টা।

মোহন মুখ খুলিতে যাইতেই সন্ধ্যা অপরূপ ভঙ্গিতে আঙুল উঁচাইয়া তাকে থামাইয়া দেয়।

বলে, ওদের কথা পরে বলব মোহন, আগে আমার কথা শোনো।

বলিয়া সে হাসে, শুধু নিজের কথা বলতে এসেছি ভেব না। নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে তোমাকে এক বিষয়ে সাবধান করে দিতেও এসেছি।

নিজের কথাটাই সন্ধ্যা আগে বলে, ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে সে কেন চিন্ময়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

এতদিনে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে তোমার বন্ধুর। পাগলের মতো ভালোবেসেই যে বউকে বশে রাখা যায় না এটা বুঝে গেছে।

টেলিফোন করিযা সন্ধ্যা টাকা চাহিলেই চিন্ময় লোক মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিত। কিছুদিন হইতে সে টাকা পাঠাইতে টালবাহানা শুরু করিয়াছিল—টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য, সন্ধ্যার দাবির চেয়ে কম টাকা পাঠানোর জন্য, খুব আপশোশের সংগে নানা রকম জটিল আর এলোমেলো কৈফিয়ত দিতে শুরু করিযাছিল !

এমন করে কথা বলত চিঠি লিখত যেন সময়মতো আমার দরকারের সব টাকাটা পাঠাতে না পেরে নিজের হাত-পা কামড়ে মরে যেতে চাইছে। আমি যেন রাগ না করি সে জন্য সে কী করুণ মিনতি—চিঠি পড়লে বন্ধুর জন্য তোমার চোখে জল আসত মোহন। আমিও প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সত্যিই বুঝি মুশকিলে পড়েছে। তারপর বাড়াবাড়ি দেখে টের পেলাম যে এটা নতুন চাল। একেবারে মরিয়া হয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করে আমাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে।

ভুল চাল দেয়নি দেখাই যাচ্ছে।

এটা বিষম খোঁচা। সন্ধ্যা কোনোদিন খোঁচা দেওয়া ঠেস দেওয়া কথা সহিতে পারিত না। আজ সে অনায়াসে হাসে।

তুমি ছাড়া আমার বন্ধু নেই—তাই মনের ভেতরের কথাটা তোমায় খুলে বলছি। মেয়েমানুষ মনের কথা কারও কাছে ফাঁস করে না—মুশকিল হয়, বিপদ বাড়ে বলেই ফাঁস করে না। আমাদের বাঁচার যে কত কষ্ট কত বিড়ম্বনা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তুমি বন্ধু বলেই তোমায় খুলে বলছি।

মোহন চুপ করিয়া থাকে। লাবণ্যের মুখেও এই রকম কথা সে শত শতবার শুনিয়াছে যে তার যন্ত্রণা পুরুষ মানুষ সে কী বুঝিবে !

সন্ধ্যা সোফায় এলানো গা তুলিয়া সোজা হইয়া বসে, তার একমাত্র পুরুষ বন্ধুর দিকে আগুনের ঝলক-মাখা চোখে চাহিয়া বলে, তোমরা পুরুষরা আমাদের কি মনে করো বলো তো ? তোমরা ব্যবস্থা করবে, আমরা তাই মেনে নেব ? তোমাদের আইন-কানুন উলটে দেবার জন্য আমরা তাই কোমর বেঁধে লড়ছি।

লড়ছ ?

লড়ছি।

যারা আইন বানায় তাদের সঙ্গে সোজাসুজি নয়, তোমাদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়ছি। সব কিছু পালটে না দিলে আমাদের আর হাসিমুখে পাশে পাবে না।

টাকা বন্ধ করেই পাশে টেনে এনেছে, এ কেমন লড়াই তোমার ?

পাশে আগে ছিলাম—বনিবনা হল না, সরিয়ে দিল। চাপ দিয়ে আবার পাশে টেনে এনেছে। হাসিমুখে এসেছি ভেবেছ নাকি ? গায়ের জোর—মানে টাকার জোরে পায়ে টানার মজাটা বন্ধু তোমার টের পাবে !

আবার গা এলাইয়া দিয়া সে সহজ সুরে বলে, যাকগে। ও সব কথা নিয়ে থিয়োরির তর্ক জুড়তে আসিনি। হিসাব নিকাশটা খুলে বলি তোমাকে।

সে একটু থামে।

বুঝলাম, একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হয়তো একদিন টাকা আর রিভলবার নিয়ে যাবে, টাকাটা হাতে দিয়ে আমায় গুলি করে নিজের মাথায় গুলি করবে। তাই বাধ্য হয়ে সামলাতে আসতে হল।

সামলে কি করবে ?

জানি না। ঠিক করিনি।

সোফায় এলানো সন্ধ্যা যেন সাপিনির মতো ফণা তুলিয়া সামনে ঝুঁকিয়া ফুঁসিয়া বলে, সামলাবার দায় আমার কেন বলো তো ? টাকায় কেনা বউ বলে ? সামলাতে দু-চারমাস লাগবে। ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা ঘুষ দিতেই হবে এবার—নইলে সামলানো যাবে না। টাকায় জব্দ করে আমাদের মা করো, ধিক তোমরা পুরুষমানুষ !

মোহন ভাবে, পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যার নীতি কি আজও চালু আছে—চিন্ময় সন্ধ্যাদের সামাজিক স্তরেও ?

নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে সন্ধ্যার মন্তব্য শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

নগেনের সমস্যা তাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা একরকম যাওয়ার মুখে নগেন ও ঝরণার প্রসঙ্গ তোলে।

এ ব্যাপারে একদম চুপচাপ থাকবে নগেন, কিছুই করবে না। কিছুই বলবে না। তুমি হস্তক্ষেপ করতে গেলেই তুমি ঝরণাকে জিতিয়ে দেবে। তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বুঝিয়ে বলো।

সোজা কথাটা বুঝতে পার না ? সব কিছুতে নগেনেরও সমান ভাগ। ঝরণা ওকে খেলাচ্ছে ভোলাচ্ছে ওই ভাগটার লোভে। নগেনকে টের পেতে দেয় না—সম্পত্তির ভাগটাই আসল, নগেন আসল নয় টের পেতে দিলে কি রক্ষা থাকবে ? একেবারে বিগড়ে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবে নগেন।

কিছুই করব না ?

কিছুই করবে না ! শুধু স্নেহ দেখাবে, বিবেচনা দেখাবে। রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে মাছ দুধ মাংস খাওয়াবে, বেড়ানো দরকার বলে কাশ্মীর বেড়াতে পাঠাবে—

মোহনের মুখ দেখিয়া সন্ধ্যা গলা নামাইয়া বলে, একালের ছেলে তো ? অনেক কিছু জানে বোঝে। কর্তালি করতে গিয়ে ওর বোধ চাপিয়ো দিয়ো না, বিচার বুদ্ধি চুলোয় দেবার ঝোঁক চাপিয়ো না। ঝরণার খেলা নিজে বুঝে নিজেকে ও সামলে নেবে। এ সুযোগটা ওকে তোমায় দিতেই হবে।

মোহন আচমকা জিজ্ঞাসা করে, ক দিন এখানে থাকবে ?

সন্ধ্যার মুখে রাত্রির কালো ছায়া নামিয়া আসে।

কে জানে, কদ্দিনে পেটে ছেলে আসবে বলা যায় কি ? তারপর দশ মাস দশ দিন। ছেলেটাকে পাঁচ-ছ মাসের না করে নড়তে পারব কি ?

সন্ধ্যা যেন ধরিয়া লইয়াছে তার ছেলেই হইবে—যেহেতু চিন্ময় ছেলে চায়।

মেয়ে যেন তার হতে পারে না।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ৯৪-১০২

তার তো শুধু অনুমান, তার কাছে মার স্পষ্ট অভিযোগ আর ভাইবোনের রকমসকম দেখিয়া আন্দাজ করা।

প্র সং পৃ ১১৭

নগেনের সঙ্গে মা কী এত পরামর্শ করেন সে বিষয়ে তার তো শুধু অনুমান, তার কাছে মা-র স্পষ্ট অভিযোগ আর ভাইবোনের রকমসকম দেখিয়া আন্দাজ করা।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

হয়তো সবই সে ভুল আন্দাজ করিতেছে—আগাগোড়া ভুল বুঝিতেছে। হঠাৎ শহরে আসিয়া শহুরে হইবার তার অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারিয়া পিছাইয়া থাকিবার ক্ষোভ দুঃখ অভিমানে ব্যাকুল হইয়া নিজেদের মধ্যে অবিরাম পরামর্শ চালাইতেছে কী করিয়া তার নাগাল ধরা যায়। ওরা তার কাছে আসিতেই চায়, সেই হয়তো ওদের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়াছে।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১০৪

যত কৌশলেই সে প্রশ্ন করুক ওর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

মা তার এক ছেলের সঙ্গে কি বলাবলি করে, মার আরেক ছেলেকে গোপনে সে খবর দেওয়ার মধ্যে হইবে নতুন এক পাকামিতে হাতেখড়ি, বাকী জীবনটা একের গোপন কথা বলিয়া বেড়াইবে অন্যকে।

নগেনের নীরব ও নিষ্ক্রিয় উপেক্ষাই সবচেয়ে মর্মান্তিক।

প্র সং পৃ ১১৮

যত কৌশলেই সে প্রশ্ন করুক ওর কিছুই বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

মা তার এক ছেলের সঙ্গে কী বলাবলি করে, মার আরেক ছেলেকে গোপনে সে খবর দেওয়ার মধ্যে হইবে নতুন এক পাকামিতে হাতেখড়ি, বাকি জীবনটা একের গোপন কথা বলিয়া বেড়াইবে অন্যকে।

দ্র সংযোজন

সংযোজন

কী তার আসিয়া যাইবে তাতে ?

এতই কি সে স্নেহ করে বোনকে যে ভবিষ্যতে সে বিগড়াইয়া যাইবে ভাবিয়া টাকা পয়সা সম্পত্তিতে সমান অংশীদার ছোটো ভাইটার সঙ্গে মা কী পরামর্শ করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে তার মন চায় না ?

জটিল আবর্তে পাক-খাওয়া তার চেতনাকে শান্ত সংহত করিতে নলিনীও যেন চাবুক কষায়, লাগাম আঁটিয়া দিতে চায়।

জুতো ছিঁড়ে গেছে, একটা ভালো শাড়ি নেই, ব্লাউজ নেই। কী করে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে চালাই বলো তো ? তোমারই তো নিন্দে হবে।

যে প্রশ্ন তুলিতে পারিতেছিল না, যে প্রসঙ্গ আড়ালে ছিল নলিনী ছেলেমানুষি অভিমানে সেই প্রশ্ন সেই প্রসঙ্গ সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

মা কিনে দেয় না ? নগেন কিনে দেয় না ? কী নিয়ে এত গুজগাজ ফুসফাস চলে তোদের ?

সে তো মা আর ছোড়দা ভাগ হবার কথা বলাবলি করে। আমি কিছু চাই না কি ওদের কাছে ? চাইলেই তো মুখ খিঁচিয়ে বলবে দাদার কাছে যা। আমারই হয়েছে মুশকিল।

বাড়ির সাধারণ বেশ নলিনীর ! মিলের রঙিন ফাইন শাড়িটির দাম কম নয়। জামাটি দেখিয়াই চেনা যায়—সন্ধ্যার দেখাদেখি কিনিয়াছে। পায়ে রঙিন হালকা লপেটা। নলিনী আজকাল বাড়িতেও লপেটা পায়ে দিয়া চলে।

মোহন অসহায় বোধ করে। অগত্যা উদারভাবে বলে, আজ যখন বেরোব, সঙ্গে যাস, নিজে পছন্দ করে কিনে নিস যা দরকার। ওরা ভিন্ন হতে চাইছে, না ?

চাইছে তো। মার সঙ্গে ছোড়দার বনছে না, নইলে কবে ভাগ হয়ে যেত। মা বলছে সব ভাগাভাগি করে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে, ছোড়দা চাইছে কলকাতায় ভিন্ন থাকবে। দু জনে বনছে না বলেই তো !

নগেনের নীরব ও নিষ্ক্রিয় উপেক্ষাই সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে হয়।

মা রচনাসমগ্র-৫ পৃ ১০৪ ১০৫

সম্পাদকমণ্ডলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কবিতা-লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'ব্যথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় অগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় , ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy-র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন---চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান ; 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু ; পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূণ উপন্যাস 'সহরতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ' ; সম্ভবত এব পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকাবে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টেব প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচার ও আরও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব'-নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছবে, বা পরবর্তী বছব, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশেব প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেব তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীব অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভাবতীয় সংস্থাব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘেব বাংলা শাখাব নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘেব পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প'-পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবর-ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকার-বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ ;

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি : উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ : গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।
চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'— ২৮ জুলাই মুক্তি পায়।
একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্য এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।
'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে-জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।
ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।
১১-১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।
প্রকাশিত গ্রন্থ : 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—'আত্মরক্ষা' এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।
বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।
প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি উপন্যাস, 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসার্ধককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।
বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দু' মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।
একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।
২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।
৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যুষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।